দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ । শনিবার, ১লা ভাদ্র, ১৩৫২ সাল। Saturday, 18th August, 1945 । ৪১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নূতন সাম্রাজ্যবাদ

জাপান আত্মসমর্পণ করিয়াছে; সুতরাং এশিয়া এবং ইউরোপ, সর্বত্র যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল। জাপ পররাজ্যগ্রাসী। তাহার এই পরাজয়ে স্বাধীনতাকামী জাতি মাত্রেই স্বস্তি বোধ করিবেন; কিন্তু আমরা ভারতবাসী, জাপানের এই পরাজয়ে আমাদের বিশেষভাবে সান্ত্বনা লাভ করিবার কোন কারণ আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। জাপ সাম্রাজ্যবাদ হইতে এশিয়া এখনও মুক্তি লাভ করে নাই। জাপ সাম্রাজ্যবাদের স্পর্ধা চূর্ণ হইয়াছে; কিন্তু ... বলীয়ান হইয়া দেখিতেছি, ইংরেজ এবং মার্কিণ উভয়ে মিলিত ... সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটিয়াছে। ... দিন যে আমেরিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে গৌরবময় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জগতে ... আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল; ... সেই আমেরিকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে হাত মিলাইয়া এশিয়ার উপর প্রভুত্ব বিস্তারের ... উন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। ... বোমা আবিষ্কারের ফলে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতে নূতন যুগের সৃষ্টি হইবে বলিয়া বিজ্ঞানবিদগণের মুখে ... অনেক আশার কথা শুনিতেছি; কিন্তু লণ্ডনের 'অবজারভার' সংবাদপত্রের সংবাদদাতা আমাদিগের ... আণবিক বোমার অন্তর্নিহিত একটি নৈতিক গূঢ় তথ্য উন্মুক্ত করিয়াছেন। ... বলিয়াছেন, আণবিক বোমা ... এবং মার্কিনকে অবিচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিবে। এই বোমার প্রস্তুত কৌশল এই দুই শক্তির মধ্যে একচেটিয়া থাকাতে এই দুই শক্তিই আপাততঃ প্রাধান্য ... করিবে। মার্কিন সিনেটর আলবার্ট ... এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সম্প্রতি লিখিয়াছেন, জাপ সাম্রাজ্যবাদ চূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এশিয়ার সমস্যার সমাধান হয় নাই। যেখানে সাম্রাজ্যবাদের মূল ও সুদৃঢ় হইয়াছে এবং এশিয়ার ... নিচয়কে শোষণ করিবার স্পৃহা যতদিন পর্যন্ত প্রবল শক্তিসমূহের অন্তর হইতে বিদূরিত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত এশিয়ার সর্বত্র হিংসা ... এবং অশান্তি চলিবে, এমন আশঙ্কা ... কারণ রহিয়াছে। প্রচণ্ডতর ... শক্তিসম্পন্ন ইউরোপ এবং আমেরিকার এই ... সাম্রাজ্যবাদের সম্মুখে এশিয়ার ... আগামী জাতিনিচয়ের আশা ও ... কতখানি মূল্য আছে, ইহাই ... প্রশ্ন। যদি এই প্রশ্নের সমাধান ... পশুবলে পীড়িত এবং দলিত মানবের ... বিক্ষোভ অর্থাৎ ... ভবিষ্যতেই ... পুনরায় ... ধ্বংসকর শোণিত ... অধ্যায় উন্মুক্ত করিবে। মানব ... এবং ... এই সমস্যা সমাধানে ভারতের অবদান কতখানি, ... এবং সেক্ষেত্রে কতটা ... সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিকূলতার ... সঙ্গে ... হইয়া ভারতবর্ষ তাহার মহত্তর আদর্শ ... আত্মবলের মহিমা অপরিম্লান ... রাখিতে সমর্থ হইবে কি না, ... তাহাই সর্বপ্রথম বিবেচ্য।

নূতন ভারত সচিবের।

ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলে ... হিসাবে শ্রমিক দলের নেতৃবৃন্দ ... প্রতিষ্ঠিত ... দেখিয়াছিলাম ... মন্ত্রিত্ব ... তাঁহাদের ... রূপে ... রকম হইয়া দাঁড়াইবে ... কথা ... রাখিয়াছিলাম। ভারত সচিবের ... প্রতিষ্ঠিত হইবার ... দেখা যাইতেছে, শ্রমিক দলের অন্যতম ... মিঃ পেথিক লরেন্স সুর সম্পূর্ণ ... দাঁড়াইয়াছে। মন্ত্রিত্বলাভ করিবার ... শ্রমিক দলের নেতারা এ পর্যন্ত বিশেষ সাবধানতার সঙ্গেই ভারত সম্পর্কে সকল কথা এড়াইয়া চলিতেছেন। মিঃ পেথিক লরেন্সও আপাততঃ মুখ খুলিবেন না, আমরা ইহাই মনে করিয়াছিলাম; কিন্তু সম্প্রতি তিনি ... দিগের এক সম্মেলনে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেকটা উপযাচক হিসাবে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই বিবৃতিতে বিলাতের মন্ত্রীরা সাধারণত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ধরণের সস্তা সদিচ্ছা প্রকাশ করেন, তাহা ছাড়া অন্য কিছুই নাই। ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশ ইংলণ্ডের মত সমাধিকার লাভ করে, শ্রমিক দলের ইহা লক্ষ্য। মিঃ লরেন্সের এই উক্তি আমেরীর উক্তির প্রতিধ্বনি ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ১৯১৭ সাল হইতেই সংরক্ষণশীল দলের মন্ত্রীদের মুখে আমরা এই ধরণের কথা শুনিয়া আসিতেছি। ভারতে দায়িত্বমূলক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠান করাই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের লক্ষ্য একথা একটুও নূতন নয়। শ্রমিক দলের ভারত সচিবের মুখে এই এক ঘেয়ে পুরাতন বুলি শুনিবার জন্য আমাদের একটুও আগ্রহ ছিল না। মিঃ পেথিক লরেন্স এক্ষেত্রে নিজের অজ্ঞতার যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইণ্ডিয়া আফিসের কাজকর্ম আমি এখনও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে সময় পাই নাই। এমন অবস্থায় ভিতরের কথা না জানিয়া বাহির হইতে পাকাপাকি রকমে কোন নীতি নির্দেশ করা চলে না। বলা বাহুল্য, এই ধরণের যুক্তিকে ধাপ্পা-বাজী ছাড়া অন্য কিছুই বলা চলে না; কারণ, ভারতবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভারতের সকল দলের দাবী সম্বন্ধে মিঃ পেথিক লরেন্স অজ্ঞ নহেন; সুতরাং সাধারণভাবে ভারতের মূল দাবী সম্বন্ধে তাঁহাদের দলের বর্তমান নীতি নির্দেশ করিবার পক্ষে তাঁহার কোন অন্তরায়ই ছিল না; কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মিঃ লরেন্স তাঁহার দেশের রাজনীতিক স্বার্থ সম্পর্কিত বিচারের দিক হইতে বর্তমানে তাহা সমীচীন বোধ করেন নাই। সে প্রসঙ্গ একেবারে চাপিয়াই গিয়াছেন এবং গুরু গম্ভীর ভাষায় ভারতের ব্যাপার সম্পর্কে 'নানা সমস্যা'র চাতুরীময় ভাষার ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে স্পষ্ট ভাষাতেই এই কথা বলিয়া রাখিতেছি, "নানা সমস্যা"র এই চাল-

বাজারে ভারতবাসীরা আর প্রবঞ্চিত হইবে না। কারণ তাহারা বুঝিয়া লইয়াছে যে, ঐ সব সমস্যা ব্রিটিশেরই সৃষ্ট এবং ভারতবর্ষের শাসন ব্যাপার যতদিন ব্রিটিশের প্রভাব হইতে মুক্ত না হইবে, ততদিন পর্যন্ত এসব সমস্যা থাকিয়াই যাইবে। ভারতবাসীরা দেশের শাসন বিভাগে নিজেদের ষোল আনা কর্তৃত্বই চাহে এবং ব্রিটিশ শাসকেরা এখন ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, ইহাই তাহাদের অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডেশ্বরের অভিভাষণও আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। সে বক্তৃতাতেও শুধু সদিচ্ছা প্রকাশই করা হইয়াছে। ব্রিটিশ শ্রমিক দল, ভারতের দাবী স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন কি না; যদি তাঁহারা সে দাবী না মানিয়া লইয়া শুধু এমন ফাঁকা সদিচ্ছা প্রকাশের দ্বারাই যুদ্ধোত্তর শোষণ-ক্ষেত্রস্বরূপে ভারতবর্ষকে পরিণত রাখিয়া নিজেদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ফিকিরে থাকেন, তবে তেমন সংকীর্ণ নীতির ফল বিশেষ শুভ হইবে না। তাঁহাদিগকে প্রবলতর জনবিপ্লবেরই সম্মুখীন হইতে হইবে; ইহা তাঁহাদের অনভিপ্রেত হইলেও ইহা সত্য।

দুর্নীতির গোড়ার কথা

বাঙলার গবর্ণর মিঃ কেসি ঢাকায় পুলিশ প্যারেডে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লাভখোরদের পাপ ব্যবসা এবং কালোবাজার উৎখাত করিবার দিকে পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এই সব পাপ ব্যবসায়ী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণের বিধি-নিষেধ এড়াইয়া চলিতেছে এবং হীন উপায়ে জনসাধারণের রক্ত শোষণ করিয়া নিজেদের উদরপূর্তি করিতেছে। ইহারা সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া বিশেষভাবে দরিদ্র জনগণের দুর্দশার কারণ ঘটাইতেছে। গভর্নর এই প্রসঙ্গে শাসন বিভাগের দুর্নীতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু এই সম্পর্কে পুলিশ বিভাগকে কিছু রেহাই দিবার পক্ষে তিনি কি কারণ দেখিতে পাইলেন, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আজকাল সরকারী কর্মচারীদের কাছে উৎকোচ স্বরূপে নানারকমে প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হয়, গভর্নর এ কথা স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু পুলিশ বিভাগ এই প্রলোভনের কোন অংশে যে অতীত আমরা ইহা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। পুলিশের কুচকাওয়াজে উপরওয়ালারাও দস্তুর হিসাবে পুলিশের প্রশংসা করিয়া থাকেন, আমরা বাঙলাদেশে প্রতি বৎসরই ইহা দেখিয়া আসিতেছি। সম্ভবত মিঃ কেসিও এক্ষেত্রে চিরাভ্যস্ত সেই নীতিকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারস্বরূপে অনুসরণ করিয়াছেন। নতুবা পুলিশ বিভাগ উৎকোচের প্রলোভন হইতে অপেক্ষাকৃত মুক্ত, তিনি সোজাসুজি এমন কথা বলিতে পারিতেন না; কারণ, শাসন বিভাগে উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দুর্নীতি যদি সম্প্রসারিত হইয়া থাকে, তবে ক্ষেত্রে পুলিশের দায়িত্বের প্রশ্নই সর্বাগ্রে উঠে। উৎকোচ গ্রহণ যে দণ্ডনীয় অপরাধ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অপরাধীকে দণ্ডিত করিবার ভার যাহাদের উপর রহিয়াছে, যদি তাহাদের মধ্যে কর্তব্যবিমুখতা কোন কারণে দেখা না দেয়, তবে অপরাধ সম্প্রসারিত হইবার পক্ষে কোন যুক্তি থাকে না এবং অপরাধপ্রবণতা যদি সত্য তাই সমগ্র সমাজে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তবে সেক্ষেত্রে পুলিশের অযোগ্যতাই প্রতিপন্ন হয়। সমাজের নৈতিক অধঃপতনের ফলে এই সব পাপ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, আমরা ইহা বুঝি এবং এই সব পাপের অনুষ্ঠাতারা যে সুচতুর, আর তাহারা যে আইনে ফাঁকি দিবার সকল রকম কৌশল জানে [illegible] উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার পক্ষে তাহাদের [illegible] ও ধনবল দুই-ই আছে, ইহা [illegible] আছে। কিন্তু বাঙলাদেশে [illegible] সাধারণ [illegible] করিতে পারে, [illegible] কথা আমরা শুনিতে [illegible] রাজনীতিক অপরাধের গন্ধ পাইলে [illegible] তাহাদের দল কেমন দশগুণ বাড়িয়া যায় এবং তাহারা স্বর্গ মর্ত্য [illegible] করিয়া তোলে, ইহা আমাদের জানা [illegible] ভাবে ছুটিয়ে [illegible] বাঙলায় [illegible] রূপে একটি [illegible] প্রবাদ আছে; কিন্তু [illegible] হাতে তবু [illegible] নিস্তার আছে; কিন্তু [illegible] দেশের তরুণেরা স্বদেশসেবার প্রেরণায় [illegible] যদি একবার রাজনীতিক অপরাধে [illegible] কোন পড়ে, তবে আর তাহার নিস্তার [illegible] তাহাদের গতিবিধি পুলিশের নখদর্পণে [illegible]। এমন শক্তিশালী পুলিশ লাভখোর [illegible] চোরাকারবারীদের যে দমন করিতে [illegible] রে না এবং শাসন বিভাগে দায়িত্বসম্পন্ন [illegible] অধিষ্ঠিত হইয়াও যারা উৎকোচ [illegible] করিয়া সে সব অপরাধীকে [illegible] গোপনে পোষণ করিতেছে, [illegible] উৎসাহিত করিতে [illegible] হয়, [illegible] কি [illegible] পুলিশ বি[illegible] ইহা নিজের পরিচয় না এবং [illegible] বিভাগও [illegible] দুর্নীতি হই[illegible] সহায় বৃদ্ধিতে ইহা প্রতিষ্ঠ[illegible] পুলিশ বিভাগের মাত্রা প্রদর্শিত [illegible] না [illegible] তাহাদিক এই কঠোর এবং [illegible] সত্যটি উপেক্ষা করানোই [illegible] গবর্ণরের [illegible] ছিল।

পূর্ববঙ্গবাসীদের প্রতি বাঙলার লাট

ঢাকা বেতার কেন্দ্র হইতে সম্প্রতি বাঙলার লাট মিঃ আর জি কেসি পূর্ববঙ্গবাসীদের উদ্দেশ্যে এক বেতার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি পূর্ববঙ্গের নানা সমস্যা যেমন খাদ্যসমস্যা, উৎপাদনের সমস্যা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, রাস্তাঘাটের অসুবিধা ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের যাহা সাম্প্রতিক সমস্যা তৎসম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য কোন কথা তাঁহার বক্তৃতায় নাই। [illegible] বস্ত্রশিল্প একদা ঢাকার তথা পূর্ববঙ্গের গৌরব ছিল, এবং যে ঢাকার বিখ্যাতিসম্পন্ন মসলিন পৃথিবীর বিস্ময় [illegible] স্থল সেই ঢাকায় তথা পূর্ববঙ্গে শোচনীয় [illegible] সমস্যার আশু সমাধানকল্পে গভর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে মিঃ কেসি কিছু বলেন নাই। মোটের উপর বর্তমানে অন্নবস্ত্রের সমস্যাই দেশবাসীর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রধান ও গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যা সম্পর্কেই দেশবাসী বাঙলার লাটের নিকট হইতে নিশ্চিত [illegible] ভরসার কথা শুনিতে চায়। কিন্তু [illegible] বেতার বক্তৃতায় এতৎসম্পর্কে পূর্ববঙ্গবাসীকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। মিঃ কেসি ঢাকার সাম্প্রদায়িক সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—ইংরাজ রাজত্বের পূর্বে ঢাকায় আধুনিককালে হিন্দু মুসলমানের ভিতরে [illegible] সংঘটিত সংঘর্ষ অনুরূপ কোন ঘটনার নজির ইতিহাস হইতে উল্লেখ করিতে পারেন কি? মোটের উপর পূর্ববঙ্গের যে হিন্দু মুসলমান সমস্যা এতদূর তিক্ত ও কুখ্যাত হইয়াছে, তাহা ইংরেজ শাসনের দুর্নীতিরই ফল। পূর্ববঙ্গে দুইটি সুদীর্ঘ রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনার কথা মিঃ কেসি বলিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য অনুষ্ঠিত হইলে দেশের [illegible] নীতির পক্ষে তাহা যথেষ্ট সহায়ক হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের সাম্প্রতিক কালের অন্নবস্ত্র, রোগ মহামারী, পথ্য ও ঔষধ পথ্যের যে সমস্যা [illegible] হইতেই দেশবাসী সর্বপ্রথমে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চায় এবং ৯৩ ধারার ক্ষমতাবলে মিঃ কেসি যখন সর্ব কর্তৃত্ব স্বহস্তে লইয়াছেন, তখন তাঁর নিকট হইতেই দেশবাসী এ সম্পর্কে আশার বাণী শুনিতে চাহিবে, ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু সে ক্ষেত্রে দেশের লোক আজ নিরাশ হইয়া পড়িতেছে। অনাবৃষ্টিজন্য পশ্চিম বঙ্গের চাউলের ফসল নষ্ট হইয়াছে, এদিকে অকালে অতিবৃষ্টিতে [illegible] অংশের সর্বত্র বন্যার আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। আজ বাঙলায় [illegible] দুর্ভিক্ষের আতঙ্ক সৃষ্টি হইয়াছে; অথচ এই অবস্থার মধ্যেই সরকার বাঙলার বাহিরে চাল রপ্তানি করিতে সংকল্পারূঢ় হইয়াছেন। মিঃ কেসি এই সংকল্পের মূলীভূত অপরিণামদর্শিতা এখনও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। এ

সম্পর্কে দেশের জনমতকে অন…ভাবে উপেক্ষা করা হইতেছে …নি বলিয়াছেন পূর্ববঙ্গের অধিবাসি…সম সাহসী। "অন্ততঃপক্ষে দুইটি…লা (চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী) নাবিকদের… ভূমি হিসাবে বহু যুগ হইতে… অর্জন করিয়া আসিয়াছে।" কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব… দের এই অসম সাহস প্রদর্শনে… কোথায় ? স্বদেশী আন্দোলনের … এ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের এই …ই তাহার অপরাধরূপে পরিগণিত…য়া আসিতেছে। তরুণেরা রাজরোষে…ত হইয়াছে এবং তৎসহ …ও দারিদ্র্যে তাহাদের প্রাণশক্তি …য়া পড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গের দুর্নিবার… জাতির সমৃদ্ধি সাধনে বাস্তব …ান সুযোগ লাভ করিতে পারি…ই; পক্ষান্তরে শাসকদের স্বৈরাচারের উপর নিরন্তর আঘাতই …ত হইয়াছে। সৈন্য বিভাগ, …গ, বিমান বিভাগ কোন দিকেই …র তরুণদের মানবোচিত মর্যাদার… মনোবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশের …াই এবং এখনও আমাদের …কা হয় যে, দেশে জাতীয় …ন্ট যতদিন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হবে, ততদিন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের …দর প্রচণ্ড প্রাণবল এবং দুর্দৈবের …নি হইবার জন্য তাহাদের স্বাভাবিক…বং শৌর্য কর্তৃপক্ষের মনে …ও সংশয়েরই উদ্রেক করিয়া …কে প্ররোচিত করিবে। এমন অবস্থার পূর্ববঙ্গবাসীর প্রাণের প্রাচুর্য …ম সাহসের যে প্রশংসাসূচক …খ করিয়াছেন, তাহাতে …পী স্বভাবতঃই উৎফুল্ল হইতে পারি…

মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসী

গত ৭ই আগস্ট ভাগলপুর জেলে মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসী হইয়াছে। বিগত ১৯৪২ সালের আগস্টের সময় মহেন্দ্র চৌধুরী নরহত্যা …র অভিযোগে ধৃত হন। মুঙ্গেরের জজ তাঁহাকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করেন। হাই-কোর্ট ও প্রিভি-কাউন্সিলও …শ বহাল রাখেন। গভর্নর ও বড়লাটের প্রাণভিক্ষার আবেদন করা …হা অগ্রাহ্য হয়। মহেন্দ্র চৌধুরীর …র পরিবর্তে তাঁহাকে যাবজ্জীবন …র দণ্ড দিবার প্রার্থনা জানাইয়া …ও মুঙ্গেরের বহু জনপ্রতিষ্ঠান …র নিকট এক আবেদন পত্র …। বিহারের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও প্রাক্তন অর্থসচিব শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ-নারায়ণ সিংহও গবর্ণরের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট প্রেরিত উক্ত আবেদনের বিবেচনা সাপেক্ষে মৃত্যুদণ্ড স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান। প্রকাশ, সিমলা সম্মেলনের সময় মহাত্মা গান্ধীও আস্তি-চিমুর বন্দিগণের সহিত মহেন্দ্র চৌধুরীরও মৃত্যুদণ্ড রহিত করার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু দেশবাসীর ও দেশের বরেণ্য নেতৃবৃন্দের সমস্ত অনুরোধ-উপরোধ, আবেদন-নিবেদন অগ্রাহ্য, পদদলিত করিয়া অবশেষে মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসী হইয়া গেল। এই ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন এবং তিনি আরও এক সপ্তাহ মৌনব্রত পালনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই মৌনব্রত পালনের সংকল্প হইতে এই শোচনীয় ঘটনায় মহাত্মাজী যে গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন এবং তাহার ফলে তাঁহার হিমাদ্রিসদৃশ অটল ম… যে বিচলিত হইয়াছে তাহাই অনুমিত হ… তাঁহার শোক-বিচলিত চিত্তের সাম্য-… …র জন্যই যে এই মৌনব্রত পালনের … …, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ম… …চৌধুরীর ফাঁসী সম্পর্কে এক বিবৃ… তিনি সম্প্রতি বলিয়াছেন,—"মহেন্দ্র… …ধুরীর ফাঁসী হইতে আমরা কি শিখিলাম… দেখা যাউক। প্রথমতঃ, গভর্ন-মেণ্টের কথ… তাঁহারা মহেন্দ্রের ডাকাতিকে রাজনৈতিক …কাতি বলিতেছেন না।...এখন দেশবাসীর … ধরা যাউক। তাহারা জানে যে, মহেন্দ্র চৌধুরী ২৫ বৎসরের এক যুবক ছিলে… পেশাদারি ডাকাতি বা রাজনৈতিক …কাতি, ইহার কোনটিতেই তিনি যোগ… করিতে চাহিতেন না। তিনি আত্মগোপন… …া ছিলেন। তাঁহার বিচার হয় এবং স… …নক প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া তা… দণ্ড দেওয়া হয়। বিচারকগণ … …ষ ধারণার বশবর্তী হইয়া … …দেন।" মহাত্মাজীর এই বিবৃতি … স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, বিচারকগণ … মন লইয়া মহেন্দ্র চৌধুরীর বিচা… করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বিশেষ …ণ বশবর্তী হইয়া, অর্থাৎ তাঁহার… …আনী… অভিযোগ সম্পর্কে তিনি …গেরপ্তী ইহা পূর্ব হইতে ধরি… লইয়াই …হার করিয়াছেন এবং সন্দেহজনক … …উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের … আদেশ দিয়াছেন। যে …ব ক্ষেত্রে …রাধ প্রমাণ সম্পর্কে সন্দে… অবকাশ থাকে, সাধারণতঃ সে সব ক্ষেত্রে …র প্রাণদণ্ড দেওয়া হয় না। কিন্তু মহেন্দ্র চৌধুরীর বেলায় তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে মহাত্মাজীর ইহাই অভিযোগ। ইহা হইতে দেশের লোকের মনে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে, এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ প্রতিহিংসা বৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছেন, এই সন্দেহ নিরসনের জন্য মহাত্মাজী এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ আইনজ্ঞদের দ্বারা তদন্তের দাবী করিয়াছেন। মহাত্মাজীর উক্তিতে জাতির অন্তরের ব্যথাই অভিব্যক্ত হইয়াছে।

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার

স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার গত ১২ই আগস্ট রবিবার মধ্যাহ্নে ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল যাইতেছিল না। কিন্তু এত শীঘ্র যে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিবে, তাহা ধারণা করিতে পারা যায় নাই। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী, 'ফার্স্ট-বুক' প্রণেতা প্যারীচরণ সরকার মহাশয়ের পৌত্র ছিলেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রথমে ভাগলপুর জেলা আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি আগ্রা কলেজে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য আহূত হন, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যা-খ্যান করেন। ইহার পর মুন্সেফের পদ গ্রহণ করিয়াও তিনি সে কার্য ত্যাগ করেন। অতঃপর ব্যারিস্টারী পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া অসাধারণ দক্ষতা ও খ্যাতির সহিত বারো বৎসর ব্যারিস্টারী করিবার পর তাঁহাকে হাইকোর্টের বিচারপতির পদ প্রদান করিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। প্রথম জীবন হইতেই তাঁহার মনে যে উচ্চাভিলাষ ও স্বাধীনচিত্ততা জাগ্রত ছিল, তাহার জন্য তিনি কোন চাকুরীর বশ্যতা স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার চরিত্রের এই তেজস্বিতা ও স্বাধীন মনোভাবের জন্যই তিনি সরকার পক্ষের, দেশবাসীর এবং এমন কি মডারেটপন্থী হইয়াও উগ্রজাতীয়তাবাদী দলের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ অর্জন করিয়া-ছিলেন। বাঙলার হিন্দুগণের প্রতিনিধি-রূপে তিনি তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। গোলটেবিল বৈঠকে ও যুক্ত পার্লামেণ্টারী কমিটির সদস্যরূপে তিনি বাঙলার প্রতি সুবিচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি রাজা-গোপালাচারীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার কুফল প্রদর্শনে এবং তাহার পরিবর্তন সাধন চেষ্টায় অসামান্য দূরদৃষ্টি ও জ্ঞানবত্তার পরিচয় প্রদান করেন। অসাধারণ বিচক্ষণতা ও কৃতিত্বের জন্য আইন সদস্যরূপে শাসন পরিষদে তাঁহার প্রভূত প্রভাব-প্রতিপত্তি ঘটিয়াছিল। তাঁহার পরলোকগমনে দেশে একজন অনন্যসাধারণ তীক্ষ্ণধী বহুদর্শী ব্যবহারজীবী ও শাসন-তান্ত্রিক বিশেষজ্ঞের অপূরণীয় অভাব ঘটিল। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পত্নী, পুত্রগণ ও অন্যান্য পরিবার-পরিজনকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

দেশের কথা

(২২শে শ্রাবণ—২৮শে শ্রাবণ)

মুক্তি সপ্তাহ—স্যার নৃপেন্দ্রনাথ—চাউলের কথা

মুক্তি সপ্তাহ—সমগ্র দেশে "মুক্তি সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার "মুক্তি সপ্তাহ" অনুষ্ঠানে একেবারেই যে হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাহা নহে। শ্রীযুত বিজয় সিং নাহার লিখিয়াছেন —গত ৯ই আগষ্ট (২১শে শ্রাবণ) কলিকাতা ১৪নং ওয়ার্ডের কংগ্রেসকর্মীরা "মুক্তি সপ্তাহ" অনুষ্ঠানের বিষয় আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়ান মীরার স্ট্রীটে "কুমার সিং হলে" সমবেত হন, তখন গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের একজন ইন্সপেক্টার সদলে তথায় প্রবেশ করিতে চান। উহা যে জনসাধারণের সভা নহে, সেকথা তাঁহাকে বলা হইলে তিনি চলিয়া যান বটে, কিন্তু উপরওয়ালাদিগের নির্দেশ লইয়া ফিরিয়া সদর্পে বলেন, তিনি ঐ স্থানে গমন করিবেন। তখন তাঁহাকে তথায় যাইতে দেওয়া হয় এবং ফলে সভাপতি বলেন, পুলিশের ব্যবহারের প্রতিবাদে ত্যাগীদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ দুই মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান হইয়াই সভার কার্য শেষ করা হইবে।

বহরমপুরে (গঞ্জাম) শোভাযাত্রা বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্বে একজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টার আসিয়া বলে, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী হইবে—তাহার আয়োজন চলিতেছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরে ঐ আদেশ জারী না হওয়ায় শোভাযাত্রা আরম্ভ হয়। তখন পুলিশ তাহাতে বাধা দেয়। কিন্তু দলপতি লিখিত আদেশ চাহেন। তখন পুলিশ লিখিত নিষেধাজ্ঞা বাহির করে। দলপতি শোভাযাত্রার লোকদিগকে শান্তভাবে চলিয়া যাইতে বলেন। তখন পুলিশ কংগ্রেস পতাকাটি লইতে চাহে। দলপতি তাহাতে বলেন, পুলিশ যদি পতাকাটি কাড়িয়া লয়, তবে তাহার ফলে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিলে তিনি সেজন্য দায়ী হইবেন না। পুলিশ আর পতাকা লইবার চেষ্টা করে নাই এবং পতাকাটি দলপতি শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাসের গৃহে শ্রীমতী লক্ষ্মীবাঈ কর্তৃক উড্ডীন করা হয়।

'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সংবাদদাতা পুণা হইতে জানাইয়াছেন—

৯ই আগস্টের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সাগর জেলার দক্ষিণাংশে করদ অঞ্চলে প্রায় একশত কংগ্রেস ও রাষ্ট্রসেবাদল কর্মী গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ঐ অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। করদের নিকটবর্তী টেম্বু গ্রামে পুলিশের গুলী চালনায় একটি বালক আহত হইয়াছে। প্রায় ৫ শত পুলিশ লইয়া পুলিশ অফিসারগণ কার্লে গ্রাম হইতে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৩০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা আদায় করিয়াছে। ঐ গ্রামের লোকসংখ্যা মাত্র সাড়ে ৩ হাজার।

দামোদর সম্বন্ধে পরিকল্পনা—গত জানুয়ারী মাসে কলিকাতায় যে স[illegible] হয়, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের, বিহা[illegible] কারের ও বাঙলা সরকারের প্রতি[illegible] দামোদর উপত্যকায় নানা কার্যে[illegible] করিবার উপযোগী সংবাদাদি সং[illegible]রবেন স্থির হয়। ব্যয়ের বিষয় ঐ[illegible] ভারত সরকারের বিবেচনাধীন। কিন্তু [illegible]রত সরকার অনুসন্ধান কার্য আরও [illegible]সর করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। কারণ ত[illegible] না হইলে প্রকৃত কাজ আরম্ভ করা যা[illegible] না। সেই জন্য অপর এক বৈঠক হই[illegible] বিশেষজ্ঞগণ যে প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়া[illegible]নে, তাহাতে আনুমানিক ব্যয় ৫০ কোটি [illegible]। এই টাকা কিভাবে সরকারসমূহের ম[illegible]ভক্ত হইবে, তাহা জানা যায় নাই। কে[illegible]ন কাজের জন্য পরিকল্পনা হইবে—[illegible]ষয়েও বিস্তৃত সংবাদ প্রকাশ করা হয় [illegible]। তবে দামোদরের জলস্রোত নিয়ন্ত্রি[illegible] করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হ[illegible] তাহাতে বাঙলার নানারূপে উপ[illegible] হইতে পারিবে, তাহা বলাবাহুল্য।

বাঙলায় চাউলের অব[illegible]—বাঙলা সরকার যে বাঙলা হইতে চা[illegible]ল[illegible]নি করিতেছেন, তাহার প্রতিবাদ করা [illegible]ছে ও হ[illegible]তেছে। এবার যে বাঙলার [illegible] শে প্রয়োজনানুরূপে বর্ষণ হয় নাই, [illegible]রও অ[illegible]দিত নাই। গত ৯ই আগ[illegible] [illegible]কুড়া ছাত্র [illegible]ঘর সম্পাদক জানাইয়াছেন:—

"বাঁকুড়ার ডাক্তারী [illegible]বা প্রায় [illegible]বাসে আছে। বাজারে চাউল নাই।"

বাঙলার গভর্নর বলিয়াছেন, প্রভূত [illegible]মাণ চাউল বাঙলা সরকার সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে কলিকাতা হইতে অদূরে বাঁকুড়ার বাজারে চাউল না থাকিবার কারণ কি, তাহা অনেকেই মনে করিবেন। যদি বণ্টন ব্যবস্থার দোষই একমাত্র কারণ হয়, তবে সেজন্য কে [illegible] কারণ এখন বাঙলা ভারতশাসন [illegible]র ৯৩ ধারা অনুসারে গভর্নরের [illegible] শাসিত হইতেছে, বাঙলায় সচিব- [illegible] নাই।

প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয়—কৃষাণ পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে, মেদিনীপুরে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—ঘাটালে চাউল দুষ্প্রাপ্য। কৃষাণ সভার বক্তব্য—[illegible]কার বিশেষভাবে অবস্থা বিবেচনা কর্তব্য স্থির করুন। বাঙলা হইতে [illegible]রপ্তানি করা সংগত কি না, তাহা [illegible]। যদি বাঙলায় অভাব ঘটে, তবে [illegible]রপ্তানি করা সংগত হইবে না।"

[illegible]কে বর্ধমান হইতে সংবাদ পাওয়া [illegible] (১০ই আগস্ট)—প্রায় এক লক্ষ ৮০ [illegible] টাকা মূল্যের ১৫ হাজার মণ আটা [illegible]রের গুদামে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে থাকিয়া পচিয়াছে। তাহা মানুষের এবং [illegible]সার করিবার জন্য লোককে [illegible] হইতেছে। বর্ধমান সদরের বে-সামরিক [illegible] বিভাগের সদর ডিভিশনাল [illegible]ার বলিয়াছেন ঐ পচা আটা [illegible]যা ফেলিলেই ভাল হইত। কিন্তু আবার জ্বালানীর ব্যয় হয়; কাজেই [illegible]ার করিবার জন্য বিতরিত হইতেছে। [illegible]র বর্ষণাভাবে শস্যহানির সম্ভাবনা [illegible]কারের অজ্ঞাত নাই, তাহার প্রমাণ—[illegible] পাম্প ব্যবহার করিয়া সেচের ব্যবস্থা [illegible] বলিয়াছেন। কিন্তু বাঙলায় কতগুলি [illegible] ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাইতে পারে, কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব পাওয়া [illegible]।

বাঙলা হইতে যে চাউল রপ্তানি করা [illegible]ছ বা হইবে তাহা বিকৃত হয়, তবে [illegible] অন্যান্য প্রদেশ লইতে স্বীকার [illegible] তাহা মনে করা সংগত নহে। বিশেষ [illegible]ল প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নাই।

[illegible]বিদ্যালয়ের পরীক্ষা—প্রকাশ, কলি- [illegible] বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা প্রথার [illegible]না করিবেন, স্থির করিয়াছেন। গত [illegible] আগস্ট সিণ্ডিকেটের অধিবেশনে নানা [illegible]ইতে বিষয়টি বিবেচনা করিবার জন্য [illegible]লি সমিতি গঠিত করা হইয়াছে। [illegible]ল সমিতিতে কেবল যে সিণ্ডিকেটের [illegible]লওয়া হইয়াছে, তাহা নহে—বাহির [illegible]শিক্ষা বিষয়ে কয়জন বিশেষজ্ঞও কাজ

করিবেন। আরও প্রকাশ, বিশ্ববি লয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সিলেবা কমিটি বর্তমানের জন্য স্থির করিয়াছেন রেজী পরীক্ষায় ৩খানির স্থানে ২খানি শনপত্র দেওয়া হইবে। কলিকাতা বিশ্ববি লয়ের গত পরীক্ষাসমূহে সাফল্যলাভক দিগের সংখ্যা পূর্বানুপাতে অল্প য়াছে। পরীক্ষার সহিত সম্পর্ক না থাকি আর একটি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা াছে — ছাত্রদিগের অনাচারপ্রিয়তা।

নৃপেন্দ্রনাথ সরকার—গত ২ শ্রাব কয়মাস রোগ ভোগের পরে স্যার পেন্দ্র নাথ সরকার লোকান্তরিত হইয়াছে তিনি প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী প্যারীচরণ সর মহাশয়ের পৌত্র। ১৮৭৬ খৃষ্টা ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। সাগ মহাশয়ের মেট্রোপলিটান বিদ্যাল হইতে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে রসায়নে এম এ ও সুরেন্দ্রনাথে রপ কলেজ হইতে বি এল ীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া অল্পদিন পুরে ওকালতি ও কিছুদিন মুঙ্গেরে কা করিয়া বিলাত হইতে ব্যারিস্টার হইয়া আসেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি লাটের শাসন পরিষদে সদস্য পদ গ্রহণ করেন তাহাতে তাঁহাকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ক্ষতিস্বীকার করিতে হইয়াছিল।

তিনি তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠ ভারতীয় শাসন-সংস্কার সম্বন্ধীয় যু পার্লামেণ্টারী কমিটিতে সদস্য ছি তিনি সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার বিরোধী এবং তিনি তৎকালীন ভারত সচিব স্যামুয়েল হোরকে যে জেরা করিয়াছি তাহাতে ঐ অন্যায় ব্যবস্থার স্বরূপ পায়।

বড়লাটের পরিষদ হইতে অবসর করিয়া তিনি আর কলিকাতা হাই ব্যবহারাজীবের কাজ করেন নাই।

বাঙলায় গত দুর্ভিক্ষের প্রথম তিনি সে বিষয়ে বড়লাটের মনোযোগ করিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতেও বড়লাটের মনোযোগ হয় নাই।

নৃপেন্দ্রনাথ বহু ছাত্রকে শিক্ষা দান করিতেন।

তিনি বাঙলার স্মরণীয় সন্তা অন্যতম তিনি বিধবা পত্নী ও ৮ পুত্র গিয়াছেন।

নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার—গত ১১ই আগস্ট ভিজাগাপট্টমে মিস্টার প্রকাশম জনসভায় বলিয়াছেন, আগামী ৩ মাসের মধ্যে ভারত সরকারের ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের ব্যবস্থা পরিষদসমূহে নূতন সদস্য নির্বাচন হইবে—আশা করা যায়। নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছেনঃ—

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যে কংগ্রেসের নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, সেজন্য বড়লাটের শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্যগণই দায়ী। কারণ, যদিও কংগ্রেসের নির্ধারণ এই ছিল যে, বড়লাটের সহিত আলোচনা না করিয়া কংগ্রেসের "ভারতবর্ষ ত্যাগের" প্রস্তাবানুসারে কাজ করা হইবে না, তথাপি ঐ প্রস্তাবের পরেই ঐ সকল সদস্য নেতৃগণকে গ্রেপ্তার ও আটক করিবার জন্য বড়লাটকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কাজেই সেজন্য বড়লাটকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

মিস্টার প্রকাশম যে সময়ের কথা বলিয়া ন, সে সময়ে শাসন পরিষদের সদস্যদিগের স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল, স্যার রেজি ক্সওয়েল, স্যার এণ্ডরু ক্লো, স্যার রেইসম্যান—এই কয়জন বিদেশীকে বাদ অবশিষ্ট থাকেন—স্যার রামস্বামী মুদালিয় (বাণিজ্য বিভাগ), স্যার হর্মাসজী মোদী (বরাহ বিভাগ), স্যার ফিরোজ খাঁ নুন (শ্রম বিভাগ), স্যার আকবর হায়দারী (সংবাদ বি াগ), মিস্টার রাঘবেন্দ্র রাও (বে-সামরিক রক্ষা বিভাগ), শ্রীযুত মাধব শ্রীহরি ানে (ভারতীয় বিভাগ), স্যার সুল আমেদ (আইন বিভাগ), শ্রীযুত রঞ্জন সরকার (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বি ।

পুলিশে নাচার—সম্প্রতি শ্রীরামপুরের একটি মাম জানা গিয়াছে, তুষ্কা কুমী নাম এক ব্যক্তি বেকার অবস্থা সন্দেহজনকভাবে ঘুরিয়া বেড়ানর গে গত ৩রা মে গ্রেপ্তার হয়। ৩।৭ মাসকাল গ্রেপ্তার অবস্থায় ছিল সে েশের জিলা হইতে শ্রমিকের কা রবার জন্য আসিয়াছিল। সে যা দিগকে ক্রী আনিয়াছিল, পুলিশ এতদি তাহাদের সন্ধান করে নাই তাহাদিগের স গ্রহণ করা ত পরের কথা। অথচ আদালতের তলব পাইয়াই তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে বেকসুর খালাস দিয়া বলিয়াছেন দারুণ দুঃসময়ে পুলিস দরিদ্র শ্রমিকের অজ্ঞতার ও দারিদ্র্যের সুযোগ লইয়া তাহার প্রতি অনাচার করিয়াছে। তাহার সম্বন্ধে আবশ্যক অনুসন্ধানও না করিয়া পুলিস তাহার বিরুদ্ধে মামলা করিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কোন্ অধিকারে পুলিস দারোগা এইভাবে এই নিরপরাধ ব্যক্তিকে আটকাইয়া সোপর্দ করিয়াছে? আসামী কি উদরান্ন সংস্থানের চেষ্টায় ঘুরিতেছিল বলিয়াই অপরাধী? দরিদ্র শ্রমিকরা কি এইরূপ ব্যবহার লাভ করিবে? তিনি বলিয়াছেন—"আসামী যে নিরপরাধ, কেবল তাহাই নহে; সে যে মাসের পর মাস গৃহস্থদিগকে কিছুই পাঠাইতে পারে নাই, সেজন্য সরকারের পক্ষে তাহাকে উদারভাবে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা করা কর্তব্য। যেভাবে তাহাকে বিব্রত করা হইয়াছে, সেজন্য সরকারের তাহার বিষয় দয়াসহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। তাহাকে বে-আইনীভাবে অর্থার্জনে অক্ষম করা হইয়াছে এবং এতদিন তাহাকে আটক রাখায় তাহার প্রতি অনাচার করা হইয়াছে। ইহা বিষম পরিতাপের বিষয়।"

মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসী—গত ৭ই আগস্ট ভাগলপুরে সেণ্ট্রাল জেলে মহেন্দ্র চৌধুরীর প্রাণদণ্ড পালিত হইয়াছে। বোম্বাই হইতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সমিতি ইহাতে অত্যন্ত বেদনা ও বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। গান্ধীজী প্রমুখ ব্যক্তিরাও তাঁহার জীবন ভিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। গান্ধীজী গত ১১ই আগস্ট এ সম্বন্ধে এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—আজও যাঁহারা জীবিত রহিলেন, তাঁহাদিগকে বাঁচাইতে হইবে, এইরূপ আরও শোচনীয় ঘটনা ঘটিবে এবং আমাদিগকে প্রত্যেকটি হইতে শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। কেবল তাহাই নহে—অনেকের বিশ্বাস মহেন্দ্র যে সাক্ষ্যে অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়াছেন, তাহা নির্ভরযোগ্য নহে। ইহার পরে অস্টি ও চিমুরের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে অনেকে আর আশার অবকাশ পাইতেছেন না।

পূর্ববঙ্গ ও গভর্নর—বাঙলার গভর্নর গত ৯ই আগস্ট ঢাকায় পূর্ববঙ্গের সমস্যা সম্বন্ধে বেতারে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—বাঙলায় পূর্ববঙ্গ ইসলামের প্রবল কেন্দ্র—তবে তাহাতে শক্তিশালী হিন্দু সংস্কৃতি বিদ্যমান।

নানাদিকে বন্যা—বিহারের কতকগুলি স্থানে ও বাঙলার সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বন্যায় বিশেষ ক্ষতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আসামে ও নেপালেও অনুরূপ অবস্থা। কোথাও ক্ষতির পরিমাণ এখনও পরিমাপ করা সম্ভব নহে।

পাওয়া গেছে। জাপানের আত্মসমর্পণে এখনকার মত পৃথিবীতে অস্ত্রের ঝনৎকার স্তব্ধ থাকবে এ আমরা আশা করতে পারি। কিন্তু অস্ত্রের আন্দোলন নিবৃত্তিতেই যুদ্ধ সমাপ্তির দাঁড়ি টানে না, অস্ত্রের যুদ্ধ রূপান্তরিত হয়ে কূটনৈতিক সংগ্রামে পরিণত হয়—শান্তি বৈঠকে হয় সে সংগ্রামের অবসান।

গত দু'তিন সপ্তাহে আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে এত দ্রুত এত সব অভিনব নাটক অভিনীত হয়েছে যে, তা যেন কল্পনাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।

গত ২৭শে জুলাই পটসডাম থেকে মিঃ চার্চিল, মিঃ ট্রুম্যান ও জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেকের স্বাক্ষরিত এক ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়। এতে জাপানকে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের জন্য আহ্বান করা হয় এবং বলা হয় অন্যথায় জাপানকে ধ্বংস করা হবে। তা ছাড়া এই ঘোষণায়ই সর্বপ্রথম জানান হয় যে, মিত্রপক্ষ জাপানের আত্মসমর্পণ অর্থে কি বোঝেন। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কে তাঁরা যে সব সর্ত দেন ও আত্মসমর্পণের যে ব্যাখ্যা করেন তার সংক্ষিপ্ত মর্ম নিম্নে দেওয়া গেল—

(১) জাপানী জঙ্গীবাদ ধ্বংস করা হবে, (২) জাপানের জঙ্গীবাদ ধ্বংস করে নূতন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাপানের কোন কোন অঞ্চল মিত্রপক্ষের দখলে রাখা হবে, (৩) জাপানের রাষ্ট্রাধিকার হনশু, হোকাইদো, কিউশু, সিকোকু ও মিত্রপক্ষ নির্দিষ্ট কয়েকটি ছোট দ্বীপে সীমাবদ্ধ রাখা হবে, (৪) সামরিক শক্তিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করার পর সৈন্যদিগকে গৃহে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হবে, (৫) জাপানকে দাস-জাতিতে পরিণত করা বা রাষ্ট্র হিসাবে ধ্বংস করা উদ্দেশ্য না হলেও যুদ্ধাপরাধীদের ও যারা যুদ্ধবন্দীদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে। (৬) জাপানী গভর্নমেণ্টকে জনসাধারণের গণ-তান্ত্রিক বোধ উদ্বুদ্ধ করার সব বাধা দূর করতে হবে, (৭) ভাব প্রকাশের, ধর্মের, চিন্তার স্বাধীনতা ও মানুষের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। (৮) জাপানের সমরশিল্প ধ্বংস করা হবে, কিন্তু আর্থিক ব্যবস্থা রক্ষা ইত্যাদির জন্য শিল্পপ্রসারের ও পরে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে যোগ দিতে দেওয়া হবে, (৯) জাপানে শান্তিকামী ও দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হলে এবং পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই জাপানের অধিকৃত অঞ্চল থেকে মিত্রপক্ষের সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হবে।

জাপানের এই আত্মসমর্পণের ঘোষণাপত্রে রুশিয়া স্বাক্ষর করে নাই। যা' হক, ঘোষণা-পত্রের উত্তরে জাপান সঙ্গে সঙ্গেই জানিয়ে দেয় যে, তারা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধই করবে, আত্মসমর্পণ কিছুতেই করবে না। অবশ্য

সমরপ্রসঙ্গ

জাপান যে মিত্রপক্ষের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের একটা প্রচেষ্টা ভিতরে ভিতরে করছিল নানা সংবাদ থেকে তারও আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু মিত্রপক্ষের দিক থেকে তার অনুকূলে কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

এই অবস্থায় যখন সকলেরই মনে হচ্ছিল যুদ্ধ আরও কিছুকাল স্থায়ী হবে, তখন একটা ব্যাপারে ঘটনার চাকা একেবারে ঘুরে গেল।

গত ৭ই আগস্ট আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা শহরে একটি আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। ইতিপূর্বে মানুষের আবিস্কৃত আর কোন মারণাস্ত্র ধ্বংসশক্তিতে এর কাছাকাছিও পৌঁছতে পারে নি। জাপান ও আমেরিকা উভয়ের প্রচারিত সংবাদ থেকেই বোঝা যায় যে, এই একটি মাত্র বোমা প্রয়োগেই হিরোশিমা শহর তার বাড়িঘ[র] সামরিকবস্তু, লোকজন, পশুপক্ষী স[হ] প্র[ায়] সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। জাপানী [রে]ডি[ও] প্রচার করা হয়েছে—যারা বাইরে ছি[ল] [তারা] পুড়ে মরেছে—যারা ঘরের ভিতরে [ছি]ল তারা অবর্ণনীয় চাপ আর উত্তা[পে]র ফলে মারা গিয়েছে। বাড়িঘর সব চূর্ণ-বি[চূ]র্ণ হয়ে গেছে। হিরোশিমা শহরের লোকস[ংখ্য]া ৩ লক্ষ ১৮ হাজার। এর পর নাগাসাকিতে ও একটি আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয় ব[লে] জানা গেছে। তার ফলেও প্রায় দুলক্ষ লোকের জীবনান্ত হয়েছে বলে জানা [গেছে]।

সংবাদে বলা হয়েছে যে, এ[ই] আণবিক বোমা বিস্ফোরণ শক্তিতে ২০ [হা]জার টন ট্রাই-নাইট্রো টলুয়েন (টি-এ[ন-টি]) নামক অতি উগ্র বিস্ফোরকের সম[ান]।

আণবিক বোমা নির্মা[ণের] মোটামুটি বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে [...] কাগজে বৈজ্ঞানিকেরা আলোচনা [করে]ছেন। ইউরেনিয়াম নামক তেজ[স্ক্রিয়] ধাতুকণাকে ভাঙ্গার ফলে যে শক্তি (energy) বিমুক্ত হয়, তাই এই বিরাট ধ্বংসল[ীলা]র সৃষ্টি করে। মিঃ চার্চিল ঠিক বিবৃতিতে বলেছেন, এই আবিষ্ক্রিয়া মানব প্রতিভা[র] বি[রা]টতম সাফল্যের নিদর্শন। [এ]ই বিরাট শক্তির সৃষ্টি-রহস্যকে মানুষ করায়ত্ত করতে পেরেছে, এ মানুষের অতুলিত কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নাই, কিন্তু সে শক্তিকে মানব কল্যাণের [কা]জে নিয়োগের কোন পথের সন্ধান মানুষের প্রতিভা দিতে পারে নি, পেরেছে—মানুষ ধ্বংসের কাজে নিয়োগ করতে—মানুষের প্রতিভার এ যে কত বড় ব্যর্থতা আর অপচয় তা আজ মানুষ জোর গলায় বলতে না পারলেও ভবিষ্যতের মানুষ যে

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বলেছেন—জাপান যে পটসডামের অবিলম্বে বিনাসর্তে আত্ম-সমর্পণের আহ্বানে এবং ধ্বংসের ভীতি প্রদর্শনে কর্ণপাত করে নি, তার জন্যই এই ভীষণ বোমা প্রয়োগ করা হয়েছে। যখন পৃথিবীব্যাপী উন্মত্ত হিংসার তাণ্ডব চলেছে, তখন নীতির প্রশ্ন তুলে আমরা হিংসার এই প্রচণ্ড ও নবতম রূপের বিচার করতে বসব না। তবে এই ধ্বংসের প্রতিযোগিতায় মানুষ যে কোন্ পথে নিয়ে যাচ্ছে বা যাবে, সেদিকে মানুষমাত্রেরই দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করবো। প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বলেছেন এই আণবিক বোমা পৃথিবীতে যুদ্ধের অবসান ঘটাবে। কেউ কেউ আশঙ্কা করছেন হয়তো যুদ্ধের অবসান না ঘটিয়ে পৃথিবীর অবসানই ওতে ডেকে আনবে। জাপানের উপর আণবিক বোমা-ক্ষেপ পৃথিবীর কোন দেশের মানুষই যে সমর্থন করতে পারে নি তার পরিচয় আমরা সংবাদ-পত্রের মারফতই পাচ্ছি।

যে আণবিক বোমা-ক্ষেপের পরদিনই সোভিয়েট রুশিয়াও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, জাপানের সঙ্গে রুশিয়ার নিরপেক্ষতা চুক্তির মেয়াদ এখনও অতীত হয়নি। রুশিয়া জানিয়েছে যে, মিত্রপক্ষের অনুরোধে সে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এখানেও নীতির প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। আণবিক বোমার আবিষ্কারের সঙ্গে রুশিয়ার যোগদানের কোন সম্পর্ক আছে কি না সে সম্বন্ধে বিচারেরও আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। তবে রুশিয়ার পক্ষে একটা কথা এখানে বলা যেতে পারে। তা এই যে, দুদিন আগে হোক আর পরে হোক মিত্রপক্ষের বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পরাজয়কে ঠেকিয়ে রাখা জাপানের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব হত না মনে হয় না। রুশিয়া যদি এ ... যুদ্ধ ঘটানোর ব্যাপারে অংশীদার না হত তা হলে প্রাচ্যের রাজনীতিতে রুশিয়ার হস্তক্ষেপ অনধিকার চর্চা বলেই বিবেচিত হত। অথচ বর্তমান আন্ত-র্জাতিক পরিস্থিতিতে রুশিয়াকে বাদ দিয়ে প্রাচ্যের যুদ্ধান্তর ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবনীয় হতো বলে মনে হয় না। কাজেই রুশিয়ার নিজের স্বার্থেও বটে এবং আন্তর্জাতিক প্রয়োজনেও বটে, রুশিয়ার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া রাজধর্ম সম্মত হয়েছে বলেই মনে হয়।

যা হোক, পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিগুলির দ্বারা চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে এবং আণবিক বোমার ভয়াবহরূপে সন্ত্রস্ত হয়ে জাপান বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়েছে। এবার আমরা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর কি সুরাহা হয়, দেখার জন্যই উৎসুকভাবে অপেক্ষা করবো। —বিষ্ণুগুপ্ত

আকাবেরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৪

দীর্ঘ দিবানিদ্রার পর অজয় চাটুজ্যে অপরাহ্নে বৈঠকখানার বারান্দায় ব'সে তামাক খাইতেছিল, এবং অদূরে অপরিচ্ছন্ন গদীর উপর বসিয়া গোমস্তা নিতাই সম্মুখে একটা বড় কাঠের বাক্স লইয়া কি লিখিতেছিল। আলবোলার নলটা মুখ হইতে নামাইয়া অজয়নাথ বলিল, "দীন ঘোষের খতের হিসেবটা ক'রে রেখেচ নিতাই?"

নিতাই বলিল, "আজ্ঞে বড়বাবু, দীন ঘোষের হিসেব কালই ক'রে রেখেচি। পেশ করব কি?"

অজয়নাথ বলিল, "না, এখন খাম দেখতে চাচ্ছিনে,—কাল সকালে দেখব। সুদে আসলে কত হ'ল?"

বাক্স হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া দেখিয়া নিতাই বলিল, "পাঁচশ' পঁচিশ টাকা চার আনা সাড়ে দশ পাই।"

"আসল ছিল কত?"

"পঁচাত্তর টাকা।"

"সুদের হিসেবে শোধ দিয়েচে কত?"

"এক শ' তেইশ টাকা।"

একটু চিন্তা করিয়া অজয়নাথ বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে খুচরোটা মাপ ক'রে পুরো পাঁচ শ' টাকার নালিস কোরো। সোমবারে সাতক্ষীরেয় গিয়ে আর্জি দাখিল করা চাই।"

ঘাড় নাড়িয়া নিতাই বলিল, "যে আজ্ঞে।"

বার পাঁচ সাত নল টানিয়া অজয়নাথ বলিল, "আর দেখ নিতাই—"

উৎসুকনেত্রে নিতাই প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু প্রভুর কথাটা শেষ করিবার সময় হইল না, দশ এগার বৎসরের একটি বালিকা আসিয়া ডাকিল, "দাদা মশাই!"

চাহিয়া দেখিয়া অজয়নাথ বলিল, "কি দিদি?"

"মুখুজ্যে বাড়ির ভবতারা দিদি এসেচেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে।"

"চল, যাচ্ছি।" বলিয়া বড় বড় দুই টানে কলিকার বাকি তামাক প্রায় নিঃশেষ করিয়া অজয়নাথ উঠিয়া পড়িল।

মুখুজ্যে বংশের অবনতির পর হইতে অজয় চাটুজ্যেদের চাটুজ্যেবংশই তিলে-শিবানীপুরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সংগতিপন্ন পরিবার। দুই ভাই অজয় এবং অনাদি। অজয় তেজারতি কারবার পরিচালিত করে, এবং অনাদি চাষবাস এবং গৃহস্থলীর কাজ-কর্ম দেখে। ধোপা নাপিত বাগ্‌দী চাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ পর্যন্ত শিবানীপুর গ্রামে এমন পরিবার অতি অল্পই আছে যাহারা চাটুজ্যে পরিবারের ঋণ হইতে মুক্ত। অভাবপীড়িত পরিবারের মধ্যে শুধু মুখুজ্যেরাই এ পর্যন্ত চাটুজ্যে-দের কবল হইতে নিজেদের বাঁচাইয়া আসিয়াছে। প্রতিষ্ঠানাশের আশঙ্কায় দুর্গাপদ গ্রামের মহাজনের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ না করিয়া গ্রামান্তরের মহাজনের সহিত কারবার করিত। তাই মুখুজ্যেদের অবশিষ্ট যৎসামান্য সম্পত্তিটুকুর উপর অজয়ের লোভের অন্ত ছিল না। সে মনে মনে জানিত একদিন-না-একদিন মুখুজ্যে পরিবারকে—অন্তত শক্তির বিবাহের সময়ে—তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেই হইবে। তাই সহসা এমন সময়ে ভবতারার আগমন সংবাদ পাইয়া সেই বহু-অপেক্ষিত সুযোগই হয়ত বা উপস্থিত হইল ভাবিয়া কতকটা উৎফুল্লচিত্তে অজয় অন্দরে প্রবেশ করিল। ভবতারার নিকট বসিয়া অজয়-গৃহিণী কথোপকথন করিতেছিল, স্বামীর আগমনে সে অন্যত্র প্রস্থান করিল।

যুক্তকরে ভবতারাকে প্রণাম করিয়া অজয় বলিল, "বউঠাকরুণের পায়ের ধুলো এতদিন পরে আমাদের বাড়িতে পড়ল, এ কম সৌভাগ্যের কথা নয়। বাড়ির খবর সব কুশল ত?"

বিষণ্ণমুখে ভবতারা বলিল, "স্বয়ং নারায়ণ যাকে মেরেছেন তার আর কুশল কোথায় ঠাকুরপো! কপাল যার আমার মতন ক'রে পোড়ে ব্যাঙেও তাকে লাথি মেরে যায়। তোমার কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে এসেচি, আমার কথাটা তোমাকে শুনতে হবে।"

ব্যস্তভাবে জিভ কাটিয়া অজয় বলিল, "প্রার্থনা ব'লে অপরাধী কোরোনা বউ-ঠাকরুণ আদেশ বল।"

ভবতারার মুখে অবিশ্বাসের মৃদু হাসি দেখা দিল; বলিল, "আদেশ-হুকুমের দিন তোমার দাদার সঙ্গেই চ'লে গেছে। এ আমার সত্যি-সত্যিই প্রার্থনা।"

কথার ভাবে ঠিক ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব বলিয়া মনে হইতেছিল না, তথাপি অজয়-নাথের মনে কৌতূহল উদগ্র হইয়াছিল; বলিল, "কি কথা বল শুনি।"

কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবে এক মুহূর্ত মনে মনে ভাবিয়া লইয়া ভবতারা বলিল, "তোমাদের এই তিলে-শিবানীপুর সমাজের সমাজপতি কে? তুমি?—না, পঞ্চানন গোঁসাই?"

এই কথাটা লইয়া শিবানীপুর গ্রামে একটা বিরোধ বর্তমান ছিল। দুর্গাপদর জীবিতকালে সকলেই দুর্গাপদকে সমাজ-পতি বলিয়া মানিয়া চলিত। দুর্গাপদর মৃত্যুর পর তাহার আদ্যশ্রাদ্ধের দিন কোনো একটা ব্যাপার উপলক্ষ করিয়া গ্রামে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়; একদল অজয়নাথকে নেতা বলিয়া স্বীকার করে, অপর দল করে পঞ্চানন গোঁসাইকে। কালের গতির সহিত মহাজনী কারবারের সুযোগে অজয়নাথের প্রভাব প্রতিপত্তি বিশেষভাবে বাড়িয়া উঠিলেও একদল লোক এখনও পঞ্চানন গোঁসাইকে সমাজপতি বলিয়া মানিয়া চলে। মুখুজ্যে বংশ প্রকাশ্যভাবে কোনো পথ অবলম্বন না করিলেও তাহারা যে মনে মনে চাটুজ্যেদের প্রতি প্রসন্ন নয়, এ কথা অজয়নাথের অজ্ঞাত ছিল না। তাই ভবতারার প্রশ্নের সমস্যা এড়াইবার অভি-প্রায়ে সে বলিল, "আমি ত' মনে করি বউ-ঠাকরুণ, দুর্গাদাদার মৃত্যুর পর থেকে তুমিই সমাজের মাথা।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া ভবতারা বলিল, "ও বাজে কথা, মেয়েমানুষ সমাজের মাথা হয় না। আমি বলছি, তুমি শিবানীপুর সমাজের সমাজপতি। আমার নালিশ তোমাকে শুনতে হবে।"

ভবতারার কথা শুনিয়া অজয়নাথের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; বলিল, "তুমি যদি আমাকে ও পদ দাও বউঠাকরুণ, তা হ'লে কার সাধ্য পঞ্চানন গোঁসায়ের দলে যোগ দেয়। তোমার মনে নেই?—সেবার হরিপদর অবিবেচনার ফলেই ত' পঞ্চাননের অতটা বাড় বেড়ে গেল না?—নইলে তার সাধ্যি হয় কি যে, তারিণী পাইনের মামলার সালিশীতে আমাকে তার বৈঠকখনায় ডেকে পাঠায়!"

ভবতারা বলিল "ঠাকুরপোর কথা ছেড়ে দাও। সে কি সমাজই চিনতো যে,

সমাজপতি হবার যোগ্য কে তা চিনবে। পঞ্চানন গোঁসাইয়ের পেড়াপিড়িতে দ্বদিনের জন্যে কলকাতা থেকে এসে একটা কাণ্ড ক'রে দিয়ে চ'লে গেল।"

হরিপদকে বাঁশী করিয়া ভবতারাই যে তাহাতে ফ্ব দিয়াছিল তাহা অজয়নাথ ভাল করিয়াই জানিত, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সে কথা তোলা স্ববুদ্ধির পরিচায়ক হইবে না ব্বঝিয়া সে একেবারে উল্টা গাহিল; বলিল, "সে কি আর আমি জানিনে বউঠাকর্বণ, তোমার পরামর্শ নিলে কি আর ও কাজ কখনো সে করত,—সে আমি ভাল ক'রেই জানি। যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি, যা হ'য়ে গেছে তার জন্যে দ্বঃখ ক'রে কোনো লাভ নেই, এখন কি তোমার কথা বল শ্বনি। বলছিলে তোমার নালিশ আমাকে শ্বনতে হবে, কার বিরুদ্ধে তোমার নালিশ তা'ত ব্বঝতে পারচিনে।"

একট্ব ইতস্ততঃ করিয়া ভবতারা বলিল, "আমার ছোট জার বির্বদ্ধে।"

অজয়নাথ চমকিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে বলিল, "ছোট বউমার বির্বদ্ধে?—কেন, কি তাঁর অপরাধ?"

"তার অপরাধ, এতদিনের বনেদী ম্বখ্বজ্যে বংশের মান-ইজ্জৎ সে দ্ব-পায়ে চট্কে নষ্ট ক'রে দিতে চায়। আমি কিন্তু প্রাণ থাক্তে তা হ'তে দেবোনা ঠাকুরপো! তার চেয়ে আমার হাত-পা বেঁধে তোমরা আমাকে কপোতাক্ষর জলে ফেলে দাও সে ভাল।"

অজয়নাথের বিস্ময়ের পরিসীমা ছিল না; বলিল, "আমার সাধ্যে যতটা করবার তা আমি করব—কিন্তু কথাটা তুমি খ্বলে বল বউঠাকর্বণ।"

তখন ভবতারা একে একে অনেক কথা বলিল। শক্তির বয়স আঠার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে; এ পর্যন্ত গ্রামের কোনো পরিবারে অন্বঢ়া কন্যার বয়স বার বৎসর অতিক্রম করে নাই; ভবতারার এক উপয্বক্ত বোনপোর সহিত বিনা যৌতুকে সে বিবাহ স্থির করিয়াছিল, কিন্তু গিরিবালা তাহা ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়া কলিকাতার কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল য্ববককে আসিবার জন্য পত্র দিয়াছিল; সে আসিলে ম্বখ্বজ্যেদের পবিত্র বাস্তুভিটা একটা কুৎসিত প্রণয়লীলার পাপক্ষেত্রে পরিণত হইত, যদি-না দৈবক্রমে চিঠিটা ভবতারার হাতে আসিয়া পড়িত; কিন্তু একটা চিঠি হাতে আসিয়াছে বলিয়া সবগ্বলাই যে আসিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়?

চিঠিখানা অঞ্চলের ভিতর হইতে বাহির করিয়া অজয়নাথের হাতে দিয়া ভবতারা বলিল, "এই নাও, পড়ে দেখ।"

আদ্যন্ত চিঠিখানা মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া অজয়নাথ তন্মধ্যে পবিত্র ম্বখ্বজ্যে বংশের অকলঙ্ক খ্যাতি নাশের তেমন কোন আশঙ্কার কারণ খ্বঁজিয়া পাইল না। তথাপি ম্বখখানা অতিশয় গম্ভীর করিয়া বলিল, "তাইত! এ যে বড় গ্বর্বতর কথা! আমাকে তুমি কি করতে বল?"

"তুমি শাসন কর!"

"কেমন ক'রে শাসন করব?"

"যেমন ক'রে পার। বল, এই শ্রাবণের মধ্যে আমার বোনপোর সঙ্গে শক্তির বিয়ে না দিলে ওদের তুমি একঘরে করবে; ওদের ধোপা-নাপিত বন্ধ করবে; গ্রাম ছেড়ে চ'লে যেতে ওদের বাধ্য করবে।"

ক্ষণকাল অজয়নাথ নীরবে চিন্তা করিল, তাহার পর প্রায় একঘণ্টাকাল নিম্নকণ্ঠে ভবতারার সহিত নানাপ্রকার পরামর্শ করিয়া বলিল, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমার কথা ঠিক থাকবে ত' বউঠাকর্বণ?"

ভবতারা বলিল, "নিশ্চয় থাকবে। তুমি দেখে নিয়ো এই ব্যাপারেই পঞ্চানন গোঁসাইকে তোমার বৈঠকখানায় এসে বসতে হবে।"

অজয় বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে কাল সকাল আটটার সময়ে আমি তোমাদের বাড়ি যাব!"

"এসো।" বলিয়া ভবতারা প্রস্থান করিল।

সন্ধ্যাকালে বারান্দায় বসিয়া গিরিবালা শক্তির চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, ভবতারা নিকটে আসিয়া বসিল। দ্বই একটা অন্যান্য কথার পর সে বলিল, "খাসা মেয়ে তোর ছোটোবউ, আমি ভেবে দেখলাম এমন মেয়ের সঙ্গে নবার বিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। আচ্ছা, আমি আমার দাদাকে চিঠি দেওয়াচ্ছি ভাল পাত্তর খ্বঁজে বার করবার জন্যে।"

একট্ব চুপ করিয়া থাকিয়া গিরিবালা বলিল, "তুমিও ত' শক্তির মার মতই দিদি, তুমি যে ওর মঙ্গল কামনা করবে তার আর আশ্চর্য কি? বেশ ত' তোমার দাদাকে লিখে দিয়ো।"

ইহার পর আরও অনেক কথা ভবতারা বলিল। আজ তাহার সব কথাতেই মধ্ব, কাঁটার অস্তিত্ব একেবারেই নাই।

জননীকে একান্তে পাইয়া শক্তি সহাস্যে বলিল, "একট্ব সাবধানে থেকো মা, জেঠাইমার হঠাৎ এতখানি ভালবাসা আমার ভাল ঠেকছে না।"

ঈষৎ হাসিয়া গিরিবালা বলিল, "হ্যাঁ, একেবারে অসি ফেলে বাঁশী ধরেচেন! লক্ষণ স্ববিধের নয় বোধ হয়।"

৫

পরদিন সকাল, বেলা তখন ঠিক আটটাই হইবে, বারান্দায় বসিয়া গিরিবালা তরকারি কুটিতেছিল এবং ভবতারা মালা জপ করিতেছিল, এমন সময়ে বাহিরে ডাক শোনা গেল, "বউঠাকর্বণ, বাড়ি আছ?"

গিরিবালা বলিল, "কে যেন তোমাকে ডাকচে দিদি।"

ডাকিতেছে অজয় চাট্বজ্যে, তাহা ব্বঝিতে বাকি ছিল না,—তথাপি মালা বন্ধ রাখিয়া ভবতারা বলিল, "বোধ হয় ভুবন বাগ্দী খাজনা দিতে এসেছে। শক্তি, উঁকি মেরে দেখে আয় ত মা, কে ডাকে। ভুবন যদি হয় ত' ভেতরে ডেকে নিয়ে আয়।"

গিরিবালা বলিল, "ভুবন নয় দিদি,—ঠাকর্বণ ব'লে ডাকচে।"

ঠিক সেই সময়ে প্বনরায় ডাক শোনা গেল, 'বউঠাকর্বণ বাড়ি আছো?' এবার উচ্চতর কণ্ঠে এবং অন্দরের দরজার ঠিক বাহিরে।

নিম্নকণ্ঠে ভবতারা বলিল, "ওমা! এ যে অজ্ব চাট্বজ্যের গলা। খাতক নই, তব্ব ওর ডাক শ্বনলে ব্বক কাঁপে। কিসের জন্যে সকাল বেলা জ্বালাতে এল কে জানে!" তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এস ঠাকুরপো, ভেতরে এস।"

তরকারি ফেলিয়া গিরিবালা ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

বাহির হইতে অজয়নাথ জিজ্ঞাসা করিল, "ভেতরে যাব?"

ভবতারা বলিল, "এস, এস, ভেতরে এস। তুমি ঘরের মান্বষ ভেতরে আসবে তা তোমার অত জিজ্ঞেস-পড়া কেন? তা ছাড়া বাইরে ভদ্রলোককে বসাবার ঠাঁই-ই বা কোথায় বল?"

ততক্ষণে অজয়নাথ অন্দরের উঠানের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; ভবতারা উচ্চকণ্ঠে শক্তিকে ডাকিয়া বলিল, "শক্তি, তোর জ্যেঠামশায়ের জন্যে একটা আসন পেতে দিয়ে যা ত মা।"

বারান্দায় উঠিয়া অজয়নাথ বলিল, "আসনের দরকার নেই বউঠাকর্বণ, এ ত' খাসা পরিষ্কার জায়গা, আমি মাটিতেই বসছি।"

ব্যস্ত হইয়া ভবতারা বলিল, "ওমা, সে কি কথা! মাটিতে বসবে কি! শক্তি, শীগ্গির এনে দে মা, একটা আসন।"

শক্তি আসন লইয়া উপস্থিত হইয়া অজয়নাথ যেখানে দাঁড়াইয়াছিল তথায় পাতিয়া দিল, তাহার পর ভূমিলগ্ন হইয়া অজয়নাথকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

যতক্ষণ দেখা গেল অজয়নাথ নির্নিমেষ-নেত্রে শক্তির বিকচ দেহসৌষ্ঠবের দিকে চাহিয়া রহিল। ঘরের ভিতর শক্তি প্রবেশ করিলে আসন গ্রহণ করিয়া অর্থব্যঞ্জক চক্ষে ভবতারার দিকে সে দৃষ্টিপাত করিল; ভাবটা,—তাই ত! যা বলেছিলে ঠিক তাই দেখচি যে!

গিরিবালা দেখিতে না পায় সেইট্বকু

সতর্কতা অবলম্বন করিয়া ভবতারাও চোখের ভাষায় উত্তর দিল,—দেখলে ত? তারপর প্রকাশ্যে বলিল, "তোমার বাড়ির খবর সব ভাল ত ঠাকুরপো? বড় বউ, ছোট বউ—ভাল আছে?"

অজয়নাথের কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিল; বলিল, "আছে কি নেই, সে খবরও তুমি একবার গিয়ে নাও না! অথচ দুর্গাদাদার সময়ে আমরা যে চাটুজ্যে মুখুজ্যে দুই পরিবার ছিলাম তা বোঝা যেত না। মনে হ'ত, যেন একই পরিবার দুটো বাড়িতে বাস করছে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে। বলি, মনে আছে ত?"

পাশাপাশি দুইটা ধানক্ষেতের আল-কাটা লইয়া বহুদিন যাবৎ উভয় পরিবারের মধ্যে যে বিবাদ এবং মনোমালিন্য চলিয়াছিল সে কথা ভবতারার মনে পড়িয়া গেল; বলিল, "মনে আবার নেই!—সবই মনে আছে। তবে আর যেন কিছুই পেরে উঠিনে ঠাকুরপো! মনে হয়, দেহে যে কটা দিন জীবন আছে, মনের মধ্যে রাধানাথজীকে ধ'রে রাখতে পারলেই বাঁচি। তা ছাড়া আর কিছু চাইনে।"

এইরূপে আরো কিছুকাল কপট আত্মীয়তার মিথ্যা কথোপকথন চলিবার পর আসল কথাটা আসিয়া পড়িল। অজয়নাথ বলিল, "একটা বড় গুরুতর কথা তোমাকে বলতে এসেছি বউঠাকরুণ। ছোটোবউমারও কথাটা শোনা দরকার। তিনি নিকটে আড়ালে কোথাও এসে বসলে ভাল হয়।"

ভবতারার মুখে চোখে দুশ্চিন্তার গভীর রেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "ছোটোবউ এই ঘরের মধ্যেই আছে, সে তোমার সব কথা শুনতে পাবে।" উঠিয়া গিয়া গিরিবালাকে অনাবশ্যক সচেতন করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "শীগ্‌গির বল ঠাকুরপো, কি কথা। কোনো ডিক্রিদার-টার নয় ত?"

ডিক্রিদারের উৎপাত যে কিছুদিন হইল শেষ হইয়াছে, সে কথা ভবতারা এবং অজয়নাথ উভয়েই জানিত। কিন্তু যেখানে চলিয়াছে অভিনয়, সেখানে সব কথাই বলা চলে, এবং কোনো কথারই উত্তর দেওয়া আটকায় না। তাই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অজয়নাথ বলিল, "ডিক্রিদার হ'লে আমার বৈঠকখানা থেকেই তাকে বিদেয় করবার ব্যবস্থা করতাম। তেমন যদি কোনো ডিক্রিদার এসে হাজির হয়, আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ো বউঠাকরুণ। কিন্তু এ ডিক্রিদারের চেয়েও অনেক কঠিন ব্যাপার এ সমাজ!"

ভবতারার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "সমাজ?—কেন, সমাজের কাছে আমরা কি অপরাধ করেছি? তা ছাড়া, তুমি ত নিজে সমাজপতি।"

অজয়নাথ বলিল, "সেই জন্যেই ত' আরো বিপদ! একেবারে হাত-পা বাঁধা। আমি যদি সমাজপতি না হ'য়ে বাইরের লোক হতাম তা হ'লে হয় ত অনেক কিছু করতে পারতাম। কিন্তু তোমার বিপদকে ত' নিজের বিপদ নয় ব'লে মনে করতে পারিনে, তাই বিচারক হ'য়েও আসামীর বাড়ি ছুটে এসেছি পরামর্শ করতে! গরজ, বুঝলে কিনা বউঠাকরুণ, গরজের মতো বালাই নেই।" বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘরের মধ্যে গিরিবালা এমন স্থানে আসিয়া বসিয়াছিল যেখান হইতে ভবতারাকে দেখা যায়। উদ্বিগ্নমুখে ভবতারা বলিল, "তা ত' বুঝলাম, কিন্তু কথাটা খুলে বল ঠাকুরপো, দেরি কোরো না।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া অজয়নাথ বলিল, "কথাটা শুধু তোমার আর ছোটোবউমার শুনলেই ভাল হয়। ছেলেমানুষদের এ-সব কথার মধ্যে না থাকাই উচিত।"

ভবতারা বলিল, "বুঝেছি।" তাহার পর শক্তিকে ডাকিয়া বলিল, "যা ত' মা, তরকারিগুলো রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে কুটে ফেল্। এখানে আমাদের একটু কথাবার্তা আছে।" তরকারি এবং বঁটি লইয়া শক্তি প্রস্থান করিলে অজয়নাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "এবার বল, কি কথা।"

অজয়নাথ বলিল, "যত শীঘ্র পার শক্তির বিয়ে দিয়ে ফেল বউঠাকরুণ, যদি সম্ভব হয় ত' এই আষাঢ় মাসের মধ্যেই।"

উদ্বিগ্নকণ্ঠে ভবতারা বলিল, "কেন বল দেখি?"

"আজ সকলে ভট্‌চাষ্যি পাড়ার মধু ঘোষাল, তারক মুখুজ্যে আরও কয়েকজন লোক আমার বাড়ি এসে উপস্থিত। তারা বলে, এত বয়স পর্যন্ত শক্তিকে বিয়ে না দিয়ে রাখা এমন একটা সামাজিক অনাচার, যার জন্যে গ্রামের ছেলে-ছোকরাদের অনিষ্ট হবার আশঙ্কা আছে। গত ফাল্গুনমাসে তারকমুখুজ্যে না-কি তার ভাগ্নের সঙ্গে শক্তির বিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু তোমরা রাজি হওনি।"

ভবতারা বলিল, "কি ক'রে রাজি হই ঠাকুরপো? ছেলেটা মাস খানেকের জন্যে আমার বাড়ি বেড়াতে এসে মদ-ফদ নিয়ে যে রকম ঢলাঢলি করলে তা'তে মেয়েটাকে অমন অপাত্রে অর্পণ করা যায় কি ক'রে?"

অজয়নাথ বলিল, "কিন্তু তারক মুখুজ্যে তার ভাগ্নেকে একেবারেই অপাত্র মনে করে না। গত বোশেখ মাসে তার না-কি বাগেরহাটের এক উকিলের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। সে যাই হ'ক, ঐ ঘটনা নিয়ে তারক মুখুজ্যের মনে বেশ একটু আক্রোশ আছে। একটা দল পাকিয়ে তারক মুখুজ্যেরা বলছে যে, এই আষাঢ় মাসের মধ্যে শক্তির বিয়ে না দিলে তারা তোমাদের সমাজচ্যুত করবে। আমার বিশেষ অনুরোধ বউঠাকরুণ, যে রকমে পার আষাঢ় মাসের মধ্যে শক্তির বিয়ে দিয়ে ফেল, তা নইলে তোমাদের চেয়ে আমি নিজে কম বিপদে পড়ব না।"

অজয়নাথের কথা শুনিয়া ভবতারা ক্ষণকাল গুম্ হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; তাহার পর গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু এ ত' নিতান্ত জুলুমের কথা ঠাকুরপো! আমরা যদি আমাদের মেয়েকে চিরজীবন আইবুড়োই রেখে দিই তা'তে তারা জবরদস্তি করবে কেন? এ ত' ভারি অন্যায় কথা!"

ভবতারার কথা শুনিয়া অজয়নাথ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "জুলুম চিরকালই জুলুম,—তার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বিচার নেই। এই যে ডাকাতেরা এসে জবরদস্তি করে' গৃহস্থের কত কষ্টের উপার্জন করা ধনরত্ন লুঠ ক'রে নেয়, সেটা কি জুলুম নয়? না, তাদের আচরণ অন্যায় ব'লে আপত্তি করলেই তারা মানা মানে?"

ভবতারা বলিল, "কিন্তু তুমি ত এদের দলপতি ঠাকুরপো!"

অজয়নাথ বলিল, "রাজাও ত' প্রজাদের দলপতি, কিন্তু প্রজারা যখন একজোট হ'য়ে সমস্বরে কিছু দাবী করতে থাকে, তখন রাজারই কি সব সময়ে ন্যায়-অন্যায় বিচার করা চলে? তাই ত' একটু আগে বলছিলাম যে, আমি যদি সমাজপতি না হ'য়ে সাধারণ হতাম তা হ'লে হয়ত অনেক কিছু করতে পারতাম। সমাজপতি হয়ে যে হাত-পা বাঁধা।"

গভীর উৎকণ্ঠার স্বরে ভবতারা বলিল, "তবে আমাদের কি হবে ঠাকুরপো? বাড়িতে ত' একটা পুরুষমানুষ নেই, শুধু আমরা দুটো অকেজো বিধবা। তুমিই ত' হ'লে আমাদের যা-হয় উপায় কর, তুমিই একটি সৎপাত্রের খুঁজে-পেতে দাও। এ গ্রামে কি তেমন কোনো ছেলে নেই?"

মৃদু হাসিয়া অজয়নাথ বলিল, "এ ছোট গ্রামখানাকে আমার চেয়ে তুমি কম জান না বউঠাকরুণ,—এ গ্রামে কোথায় পাত্র? আর, দু-একটা থাকলেও কেউ বিয়ে দিতে রাজি হবে না। মেয়ের সঙ্গে বয়সে সামঞ্জস্য হওয়াও ত' চাই। যা হোক, তুমি যখন বলছ, আমি খোঁজ তল্লাসে থাকব; কিন্তু আমার ওপর নির্ভর কোরো না,—জান ত' আমার সময় কত কম। তোমার জানা-শোনা কোনো পাত্র নেই বউঠাকরুণ?—তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে?"

তখন নবগোপালের কথা উঠিল; অর্থাৎ, গৌরচন্দ্রিকা শেষ হইয়া আসল পালা আরম্ভ হইল। ভবতারা বলিল, "একটি ত আছে। দক্ষিণ হরিপুরের রামগোপাল চাটুজ্যেকে চেন?—যদু চাটুজ্যের মেজো ছেলে?"

অজয়নাথ বলিল, "কি আশ্চর্য! রামগোপাল চাটুজ্যেকে চিনি নে? পশ্চিমে

সরকারী অফিসে' বড় চাকরি ক'রে মেলা মেলা টাকা জমিয়ে এসে বসেছে। তার ত' এখন ভাল অবস্থা।"

"তিনি সম্পর্কে আমার ভগ্নীপতি হন। তাঁর বড় ছেলে নবগোপাল,—বাইশ-তেইশ হবে। তার সঙ্গে আমি হস্তুকী দান দিয়ে বিয়ে দিইয়ে দিতে পারি, কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"ছোটোবউএর ইচ্ছে নয়। আমার আগে ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এখন আমারও আর তেমন ইচ্ছে নেই।"

বিস্ময় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অজয়নাথ বলিল "কেন?"

"ছেলেটি দেখতে একটু ময়লা,—তা ছাড়া লেখাপড়া তেমন করেনি,—পাশ দেয়নি। ঠাকুরপো মেয়েকে ইস্কুলে পড়িয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছে,—তুমিই ভেবে দেখ ঠাকুরপো, মুখখু ছেলের হাতে লেখাপড়া জানা মেয়েকে কেমন ক'রে দেওয়া যায়।"

ক্ষণকাল নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া গভীর কণ্ঠে অজয়নাথ বলিল, "আমি ভেবে দেখলাম, এ কথাটা তুমি আমাকে না জানালেই ভাল করতে। কারণ, এখন আর আমি কাউকে বলতে পারব না যে, তোমাদের হাতে ভাল পাত্র নেই ব'লে তোমরা বাধ্য হয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছ না। রামগোপাল চাটুজ্যের ছেলেকে সৎপাত্র মনে করে না এতবড় মাতব্বর আমাদের এ তল্লাটে নেই। অনেক পুণ্যের ফলে সে পাশ করেনি, তাই কলকাতার সদাগরি অফিসের কুড়ি টাকা মাইনের চাকরি থেকে বেঁচে গিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি বজায় রাখতে পারবে। রামগোপাল চাটুজ্যের ক্ষেতে কতগুলো কিষাণ কাজ করে, যারা কুড়ি টাকা ক'রে মাইনে পায়, খবর নিয়ে এসো বউঠাকরুণ।"

অজয়নাথ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর গিরিবালাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আমি প্রার্থনা করি বউমা, তোমার মনোমত পাত্রে তুমি তোমার মেয়েকে যেন অর্পণ করতে পার। আষাঢ় মাসের মধ্যে হ'লে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু আমাকে এমন অবস্থায় নিয়ে যেয়ো না যেখানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তোমাদের বিপদে ফেলতে হয়। আমাকে তোমরা পাঁচজনে সমাজপতি করেছ, তার মানে আমি তোমাদের হ'য়ে সমাজের সেবা করব। সে সেবা করতে যদি আমার নিজের ছেলেকেও আঘাত দিতে হয়, তাতেও আমাকে ইতস্তত করলে চলবে না। আচ্ছা, বউঠাকরুণ, এখন আমি চললাম।" বলিয়া অজয়নাথ তাড়াতাড়ি বারান্দা হইতে নামিয়া পড়িল।

ভবতারা বলিল, "এসো। কিন্তু মনে রেখো ঠাকুরপো, তুমিই আমাদের ভরসা।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া অজয়নাথ বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

অজয়নাথ চলিয়া গেলে গিরিবালা বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "এ ত' ভারি অন্যায় কথা দিদি! শক্তি আইবুড়ো থাকলে গ্রামের ছেলে-ছোকরাদের অনিষ্ট হবার ভয় আছে, একি বিশ্রী কথা! এত বড় কথা ব'লে একটা উত্তর না পেয়ে লোকটা চলে গেল?"

কটুকণ্ঠে ভবতারা বলিল, "তা, উত্তর তুই দিলি নে কেন।"

গিরিবালা বলিল, "আমি যদি কথা কইতাম তা হ'লে নিশ্চয় দিতাম।"

ক্রোধে ভবতারা উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। ভ্রূকুটি করিয়া কহিল, "কি উত্তর দিতিস শুনি?"

"বলতাম, গ্রামের ছেলে-ছোকরাদের যাতে অনিষ্ট না হ'তে পারে তার জন্যে যদি শক্তির তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার দরকার, তা হ'লে ঠিক সেই কারণে অজু চাটুজ্যের সতেরো বৎসরের বিধবা মেয়েরও বিয়ে দেওয়া দরকার!"

একথা শুনিয়া ভবতারার ক্রোধকে অতিক্রম করিয়া বিস্ময় দেখা দিল। এত বড় কথার উত্তরে কি বলিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া তাহার কম্পিত অঙ্গুলীর মধ্যে শুধু মালা জপার গতিই বাড়িয়া গেল।

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া গিরিবালা বলিল, "তা ছাড়া আমরা ত' পঞ্চানন গোঁসাইকে সমাজপতি বলে জানি। ইনি হঠাৎ আমাদের সমাজপতি ব'লে নিজেকে খাড়া করে ব্যস্ত হয়েছেন কেন?"

ঝঙ্কার দিয়া ভবতারা বলিল, "বেশ ত', পঞ্চানন গোঁসাইয়ের বাড়ি গিয়ে সেই নালিশ তুমি ক'রে এস! কিন্তু একথা তোমাকে বলে রাখছি ছোটবউ, শ্রাবণ মাস পড়বে আর আমি এ বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়ব। গ্রামে বাস ক'রে ধোপা নাপিত বন্ধ হবে, মুখুজ্যে বাড়ির বউ হয়ে এ অপমান আমি সহ্য করব না!" বলিয়া সবেগে নিজ কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল।

বিরক্ত এবং ক্রুদ্ধ মন লইয়া গিরিবালা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর রান্নাঘরে গিয়া দেখিল শক্তি কুটনা কুটিয়া বসিয়া আছে।

মাতাকে দেখিয়া মৃদু হাস্যের সহিত শক্তি বলিল, "মা, তুমি আজকের ব্যাপার ঠিক বুঝতে পেরেছ ত?"

শক্তির কথা শুনিয়া অবিস্মিত কণ্ঠে গিরিবালা বলিল, "তুই এখান থেকে কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলি না-কি শক্তি?"

শক্তি বলিল, "না, তা পাইনি। তবে যেটুকু ভূমিকা শুনে এসেছিলাম তাই থেকেই বুঝেছি, জ্যেঠাইমার কাছ থেকে নেমন্তন্ন পেয়ে আজ আমাদের বাড়িতে অজু চাটুজ্যের পায়ের ধুলো পড়েছে। কেন, তোমার এ কথা মনে হয় না?"

গিরিবালা বলিল, "হয়। কিন্তু এখন যে মহা দুর্ভাবনায় পড়লাম শক্তি, জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ, কোথায় যাই বল দেখি?"

গিরিবালার মুখের উপর তাহার অন্তরের সুতীব্র বেদনা এবং উপায়হীনতার ছাপ লক্ষ্য করিয়া শক্তির মুখ সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। এক মুহূর্ত ইতস্তত করিয়া, একবার জননীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া, সে বলিল, "মা, তুমি আমার একটা কথা রাখবে?"

"কি কথা?"

"নবোর কথায় তুমি রাজি হও।"

শক্তির প্রস্তাব শুনিয়া গিরিবালা এতই বিস্মিত হইল যে, সহসা তাহার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না। ক্ষণকাল তাহার দিকে অপলকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "একথা তোর মুখ দিয়ে বের হ'তে পারল শক্তি?"

শক্তি বলিল, "হ্যাঁ মা, তুমি একটু শান্তি পাও! আচ্ছা, এমন ক'রে আর কত অপমান, কত নির্যাতন সইবে বল ত?"

কঠিন স্বরে গিরিবালা বলিল, "কপোতাক্ষর জলে তোকে ফেলে দিয়ে আসবো শক্তি, তবু তোকে নবোর হাতে দোব না!" হাসিয়া শক্তি বলিল, "তবে তাই ফেলে দিয়ে এস।"

ইহার কয়েকদিন পরে ভবতারা-অজয় চক্রান্তের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হইল। সেদিনও আটটা আন্দাজ অজয়নাথ আসিয়া ভবতারাকে বলিল, "শুভ সংবাদ আছে বউঠাকরুণ।"

ঔৎসুক্যের সহিত ভবতারা বলিল, "ছোটো বউ-এর ছেলে হয়েছে বুঝি?"

সহাস্যমুখে অজয়নাথ বলিল, "সে শুভ সংবাদ আমি জানাতে আসব কেন? তার জন্যে অন্য লোক আছে; আর উপস্থিত তার মাসখানেক বিলম্বও আছে। আমি এসেছি শক্তির বিয়ের কথার সম্পর্কে।"

কপট আনন্দে অযথা উৎফুল্ল হইয়া ভবতারা বলিল, "ভাল পাত্র পেয়েছ বুঝি ঠাকুরপো?"

"পাইনি এখনো,—তবে পাবার সুযোগ পেয়েছি।"

"তার মানে?"

"তার মানে, তিরিশে শ্রাবণ দক্ষিণ হরিপুরের রামগোপাল চাটুজ্যের ছেলের সঙ্গে শক্তির বিয়ে স্থির হ'তে চলেছে বলে উপস্থিত তারক মুখুজ্যেদের আমি থামিয়ে দিয়েছি। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে একদিন রামগোপাল চাটুজ্যে এসে শক্তিকে দেখে পছন্দ করে গেলে আর তাদের মনে কোনো সন্দেহ থাকবে না। তারপর এই দুমাসের মধ্যে অন্য ভাল পাত্র স্থির করে

শক্তির বিয়ে দিলে রামগোপাল চাটুজ্যে যে কোনো গোলযোগ করবে না, তার জামিন আমি রইলাম।"

মুখে উৎকট দুশ্চিন্তার চিহ্ন ফুটাইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া দ্বিধাকুণ্ঠিত স্বরে ভবতারা বলিল, "কিন্তু তিরিশে শ্রাবণের মধ্যে যদি তেমন কোনো পাত্র স্থির করতে না পারা যায় ঠাকুরপো?"

অজয় চাটুজ্যে কহিল, "তা হ'লে, এখানকার বাড়িতে তালা চাবি দিয়ে কলকাতায় গিয়ে পাঁচ বছরই হোক আর দশ বছরই হোক, মনোমত পাত্রের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থেকো তোমরা—তারক মুখুজ্যেরা জব্দ হয়ে যাবে।"

ঈষৎ অপ্রতিভ কণ্ঠে ভবতারা বলিল, "তুমি রাগ করছ ঠাকুরপো!"

অজয়নাথ বলিল, "রাগই যদি ক'রে থাকি তা হ'লে অকারণে করছি কি বউ-ঠাকরুণ? চার পাঁচ বছর আগে যে মেয়ের বিয়ে হ'য়ে যাওয়া উচিত ছিল, অন্য পাত্রের সন্ধানের জন্যে দুমাসের বেশি সময় পেয়েও রামগোপাল চাটুজ্যের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ের কথা ভেবে তোমার মুখ শুকিয়ে উঠ্‌ছে। কিন্তু এ কথাও তোমাদের ব'লে যাচ্ছি, কাল যদি শোনো অন্য মেয়ের সঙ্গে রামগোপালের ছেলের বিয়ে স্থির হ'য়ে গেছে, তখন তোমরাই হায় হায় করতে থাক্‌বে। যে মাছটা সহজে জালে পড়ে সেইটেই ছোট হয় কি-না!" ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা হ'লে তারক মুখুজ্যেদের ব'লে দেবো কি, রামগোপাল চাটুজ্যের ছেলের সঙ্গে তোমরা বিয়ে দেবে না?"

গভীরভাবে ভাবিয়া দেখিবার একটু ভাণ করিয়া ভবতারা বলিল, "না, এখন উপস্থিত সেকথা ব'লে কাজ নেই। দুমাস সময়ের ব্যবস্থা ক'রে দিলে ত তুমি, দেখাই যাক-না এর মধ্যে কতদূর কি হয়ে ওঠে।"

গিরিবালা নিকটেই ছিল,—অজয়নাথ প্রস্থান করিলে ভবতারা বলিল, "শুনলি ত' সব ছোটবউ?"

গিরিবালা বলিল, "শুনলাম।"

ভবতারা বলিল, "যে রকমেই হোক্ দুমাসের মধ্যে ভাল পাত্র খুঁজে বার করতে হবে; উঠে প'ড়ে লাগ্।" মনে মনে বলিল, ভালই বল, আর মন্দই বল, পাত্র হচ্ছে নবগোপাল। তা যদি না করতে পারি তা হ'লে আমার নামই নয় ভবতারা। দেখি তোমারই জেদ বড়, না আমার।

৮

নিষ্পেষণের যন্ত্রে প্যাঁচ কষা যে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে গিরিবালার বাকি ছিল না। ভবতারার কথায় আর কোনো উত্তর না দিয়া সে প্রস্থান করিল।

(ক্রমশ)

ধর্ম ও স্বাধীন চিন্তা

রেজাউল করিম এম.এ.,বি.এল.

প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি, আচার ও ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে মানুষ যখন কোনপ্রকার বিরুদ্ধমত প্রকাশ করে, তখন সে ধর্মদ্রোহী বলিয়া স্ব-সমাজে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হইয়া থাকে। ধর্মদ্রোহী ব্যক্তি কোন সমাজে স্থান পায় না। বিক্ষুব্ধ সমাজ তাহার সমস্ত শক্তি লইয়া ইহার উচ্ছেদ সাধনে উদ্যত হয়। সমাজের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি ও প্রচণ্ড বাধার ভয়ে অনেক সময় মানুষ স্বাধীনভাবে কোন মত প্রকাশ করিতে সাহস করে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এত সব বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কোন কোন মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করে এবং যাহারা এই সব বাধাবিঘ্ন সহ্য করিয়াও মাথা নত করে না, পরবর্তী যুগে তাহাদিগকে মহাপুরুষ বলিয়া অভিনন্দন করিতে কাতর হয় না। কালক্রমে এই সব ধর্মদ্রোহীদের পূজা আরম্ভ হয়। তাহাদের যশোগানে দশ দিক মুখরিত হয়। জগতের বড় বড় ধর্মদ্রোহীদের ভাগ্যে এইরূপ সম্মানলাভ ঘটিয়াছিল। এক যুগে যিনি ধর্মদ্রোহী, পরবর্তী যুগে তিনি ধর্মগুরু। এক যুগে যিনি ধর্মের ও সমাজের শত্রু পরের যুগে তিনি ধর্মের স্তম্ভ ও সমাজের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। কেনই-বা এক ব্যক্তি এক যুগে নিন্দিত ও ধিক্কৃত হন এবং কেনই-বা তিনি পরের যুগে আদৃত ও সম্মানিত হন, তাহা জানিতে হইলে স্বাধীন চিন্তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস পাঠ করা দরকার। জনসাধারণের মন সর্বদাই চঞ্চল ও অস্থির। তাহারা সত্যের সব দিক দেখিতে পারে না। যে অংশটা দেখে, মনে করে সেইটাই সমগ্র সত্য। ইহা ব্যতীত আর কিছুই সত্য নহে। কিন্তু সমগ্র সত্যটা যখন প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন সে সত্যের তেজ ও দীপ্তি তাহারা সহ্য করিতে পারে না। চক্ষু ঝলসিয়া যায়। তাই তাহারা ইহাকে নির্বাপিত করিতে উদ্যত হয়।

প্রথমেই ধরা যাক, যিশুখৃষ্টের কথা। শান্তশিষ্ট নম্রধীর যিশুখৃষ্ট এক অতি অশুভক্ষণে ইহুদীদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাহাদের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন এবং তাহাদের সম্মুখে এক নূতনতর আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতি তুলিয়া ধরিলেন। কিন্তু তাহা বিফল হইল। সঙ্গে সঙ্গে ইহুদী সমাজ তাঁহাকে ধর্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করিল এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রাণনাশ না করিয়া ছাড়িল না। কিন্তু কিছুদিন পরে এই যিশুই তাহাদের নিকট বরণীয় ও আদরণীয় হইয়া উঠিলেন। প্রশংসা পাইতে পাইতে একেবারে খোদার পুত্রের স্থান গ্রহণ করিলেন। হজরত মহম্মদের ভাগ্যে প্রায় এইরূপ নির্যাতন ঘটিয়াছিল। তিনি কোরেশগণের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, আচার-পদ্ধতিকে অধর্ম ও পাপ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উপর পতিত হইল ধর্মদ্রোহিতার ফতোয়া। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এই অবস্থা উল্টাইয়া গেল। ধর্মদ্রোহী হজরত মহম্মদ ধর্মগুরু ও মানবত্রাতা বলিয়া আরবের সর্বত্র সম্মানিত হইলেন। মার্টিন লুথার এক সময় ধর্মদ্রোহী বলিয়া অভিশপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি ধর্মসংস্কারক ও ধর্মরক্ষক বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়কে-হিন্দু-সমাজ ধর্মদ্রোহী বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তিনি আজ হিন্দুধর্মের একটি স্তম্ভ বলিয়া সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছেন। এই সব উদাহরণ হইতে একটা কথা বুঝা যাইতেছে যে, জনসাধারণের মতের সহিত কাহারও মতের বিরোধ বাধিলেই তাহাকে ধর্মদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করা সবসময় ঠিক নহে। নূতন কথা মাত্রই অগ্রাহ্য নহে, পুরাতন কথাকে যেমন নূতন করিয়া বলা যায়, সেইরূপ পুরাতন কথা অগ্রাহ্য করিয়াও নূতন কথা বলা যায়। বহু ক্ষেত্রে একটা নূতন কথাকে এক যুগ পরিত্যাগ করিয়াছে, আবার পরবর্তী যুগ সেইটাকেই আগ্রহের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছে। কোন নূতন কথাটা অসত্য ও পাপ আর কোনটাই-বা সত্য ও ধর্ম তাহা চলতি যুগ সবসময় ঠিকভাবে নির্ণয় করিতে পারে না। সেইজন্য সকল প্রকার মত, ধর্মমত, সর্ববিধ নূতন কথা ও চিন্তাকে বিকশিত ও প্রকটিত হইবার পরিপূর্ণ অবসর দেওয়া কর্তব্য। যাহা অসত্য ও অধর্ম, যাহা পাপ ও দুর্নীতি তাহা প্রায় ক্ষেত্রে আসল সত্যের সামনে স্থায়িভাবে দাঁড়াইতে পারে না। চিরন্তন সত্যই জগতে টিকিয়া থাকে। মিথ্যা যে একেবারে টিকে না তাহা বলিতেছি না, অনেক মিথ্যা ও অধর্ম স্থায়ী হইতে বসিয়াছে। টুঁটি চাপিয়া এই মিথ্যাকে বধ করা যাইবে না। একমাত্র সত্যের আলোতে ইহা বিনষ্ট হইতে পারে। অন্য কিছুতে নহে। সহস্র প্রকার রুদ্রনীতি পৃথিবী হইতে মিথ্যাকে দূরে করিতে পারে না। আর কোন যুগে পারিবে না।

যুগান্তকারী মহাপুরুষদের জীবনের ইতিহাস হইতে আমরা এই অভিজ্ঞতা পাই যে, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিবাদ মাত্রই ধর্মদ্রোহিতা নয়। এক যুগের জন্য প্রয়োজনীয় কতগুলি নীতি বা কর্ম-ধারাকে সর্বযুগের জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া ধরিয়া লইয়া এক শ্রেণীর মানুষ তৎপ্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, যুগধর্মের প্রভাবে সেই নীতি ও ধর্মধারার মধ্যে কোনওরূপ গলদ প্রবেশ করিতে পারে এ ধারণা তাহারা করিতে পারে না। কোন মতের নিজস্ব গুণাগুণ ও স্থায়িত্বের উপাদান অপেক্ষা তাহার প্রাচীনত্বটাই সাধারণ লোকের সেই মতের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহাদের যুক্তি এই যে, মতটি উৎকৃষ্ট যদি না হইবে, তবে এতদিন টিকিয়া থাকিল কিরূপে। ইহাদের বিবেচনায় কোন মতের ভালমন্দ তাহার দীর্ঘায়ুর উপর নির্ভর করে। কিন্তু এ যুক্তির বিপদ আছে যথেষ্ট। অনেক ভাল আদর্শ বেশিদিন টিকে না, আবার অনেক মন্দ বস্তু নানাকারণে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সাধারণ লোক এতসব যুক্তিতর্ক বুঝে না। প্রাচীনত্বই তাহাদের নিকট বড়। তাই তাহারা নূতন মত, নূতন আদর্শ ও চিন্তাধারাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে। আর এই নূতনত্ব যদি ধর্মনীতি ও ক্রিয়াকাণ্ডকে লইয়া দেখা দেয়, তবে তাহা ধর্মদ্রোহিতা বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। তাহারা বুঝে না যে বিভিন্ন যুগের নীতি, প্রথা, আচার বিচার তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের সহিত এমন বেমালুমভাবে মিশিয়া যায় যে, প্রথম যুগের বিশ্বাসের সহিত পরবর্তী যুগের বিশ্বাসের সাদৃশ্য খুব কম থাকে। এই সাদৃশ্যের অভাবটি যিনি দেখাইতে প্রয়াস পান, অথবা যিনি বহু যুগ সঞ্চিত সংস্কারকে আঘাত করিতে চান, তিনিই ধর্মদ্রোহী হইয়া পড়েন। কিন্তু এই মনোভাব বেশিদিন থাকে না। কালক্রমে প্রত্যক্ষ সত্যের স্পর্শে ও বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে জনসাধারণের মনের অজ্ঞতা দূর হইয়া যায়, অথবা তাহাদের বিশ্বাসের দোষত্রুটি ও ভেজালগুলি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, তখন তাহারা অনুভব করে যে, যাহাকে তাহারা ধর্মদ্রোহিতা বলিয়া নিন্দা করিয়াছিল, তাহা আদতে ধর্মদ্রোহিতা নয়, তাহা ধর্মসংস্কার মাত্র। তখন তাহারা এই সংস্কারিত ধর্মকে সাগ্রহে গ্রহণ করে। তারপর কিছু দিন গত হইলে এই সংস্কারিত মতবাদ আবার কুসংস্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। নানাবিধ প্রথা ও আচার বিচারের চাপে তাহা ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। তখন আবার হয়ত কোন

দূরদর্শী মানুষ এইসব কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনিও নির্বিবাদে এরূপ করিতে পারেন না। তাঁহারও বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার ফতোয়া জারী হইয়া যায়। অবশেষে হয়ত তাঁহারই মত জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে যুগে যুগে স্বাধীন চিন্তার সহিত কুসংস্কার ও গতানুগতিক মনোবৃত্তির সংগ্রাম হইয়া আসিতেছে। এই সংগ্রামে সব সময়ে যে স্বাধীন চিন্তার জয় হয়, তাহা নহে। অনেক সময় কুসংস্কারই জয়যুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ জ্ঞানের পথ বন্ধ করিয়া দেয়।

এখন প্রশ্ন এইঃ দেশ-প্রচলিত যে কোন ধর্মবিশ্বাস কি কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া বিবেচিত হইবে? তাহার প্রত্যেকটার বিরুদ্ধেই কি প্রতিবাদ করিতে হইবে? আমি তাহা বলি না। কিন্তু বিনা বিচারে ও বাক্যব্যয় না করিয়া প্রত্যেকটাকেই মানিয়া লইবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, নিরপেক্ষভাবে ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সবকিছু পর্যালোচনা করিতে হইবে। যদি কোন বিষয় কাহারও নিকট অন্যায়, অবৈজ্ঞানিক ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া অনুভূত হয়, তবে সে কথা বলিবার অধিকার অথবা সে কথার প্রতিবাদ করিবার অধিকার তাহার থাকা উচিত। চিন্তা প্রকাশের এই স্বাধীনতাটুকু না দিলে জ্ঞানের প্রসার হয় না। ন্যায়, অন্যায়, সত্য ও অসত্যের চরম বিচারক তুমি আমি নহি। সময় বিচার করিবে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা। আজ যাহাকে আমি অন্যায় বলি, অসত্য বলি, তাহা বাস্তবিকই অন্যায়, অসত্য ও মিথ্যা কিনা, সে বিষয় ধীরভাবে বিচার করিবার মত ধৈর্য অনেকের থাকে না। যাহাকে অন্যায় বলি তাহাই যদি সত্য হয়, তবে প্রচার করিবার ক্ষেত্র না পাইলে অন্যায় স্থায়ী হইয়া রহিবে। ক্ষেত্রের অভাবে একটা সত্য আদর্শ হইতে মানুষ বঞ্চিত হইবে। এমন বহু বিষয় আছে, যাহা প্রথমে অন্যায় ও অসত্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইবার ক্ষেত্র পাইয়া নানা বিঘ্ন বিপত্তির সমুদ্র পার হইয়া পরিশেষে তাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। যদি আমরা গোড়াতেই তাহাকে মিথ্যা বলিয়া দাবাইতে থাকি, তবে তাহা স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে বিকশিত হইবার প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইবে না। এইভাবে উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে হয়ত একটা মূল্যবান সত্য বহুদিন চাপা থাকিবে। মানব জাতি তাহার কল্যাণকর স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হইবে। আর যদি তাহা মূলত মিথ্যা হয়, তবুও তাহাকে প্রচারিত করিবার ও বিকশিত হইবার অবসর দেওয়া দরকার। জগতে কত মিথ্যা চলিতেছে তাহার সহিত আর একটা মিথ্যা যোগ দিলে মানবের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। সেই মিথ্যার প্রতিবাদে অন্য পক্ষ হইতেও ত' আলোচনা হইবে। পরিশেষে দেখা যাইবে যে যাহা মিথ্যা তাহা কোণঠাসা হইয়া গিয়াছে। মিথ্যা ও ভুল মনে করিয়া কোন মতকে জোর করিয়া দমন করিবার বহু কুফল আছে। স্বাধীন মত প্রকাশের মূল্যবান অধিকার হইতে একজন বঞ্চিত হইলে কালক্রমে বহু লোক বঞ্চিত হইতে থাকিবে। ইহাতে একজন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, সমগ্র মানবজাতির অপরিসীম ক্ষতি হইবে। সেই মত যদি বাস্তবিকই সত্য হয়, তাহা হইলে মানবজাতি তাহাদের বহুজনের ভ্রান্ত মত সংশোধনের সুযোগ পাইবে না। আর তাহা যদি আদতে মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে মিথ্যার পার্শ্বে তাহাদের সত্য মতকে উন্নতির আলোতে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে। মিথ্যা মতকে প্রকাশিত হইবার অবসর দিলে সত্য মতটা সেই মিথ্যার সংঘর্ষে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সত্যের স্বরূপটা আরও পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিবে। সেইজন্য আমি বিশ্বাস করি, প্রত্যেক মানুষকে তাহার মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া দরকার, সে মত যদি ধর্মবিশ্বাসকে আঘাত করে, তবুও স্বাধীনতা দেওয়া কর্তব্য। কেহ ধর্মকে আঘাত করিতে চায় করুক, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করিতে চায় করুক, যুগ যুগ ধরিয়া যেসব সংস্কার ও আচার-বিচার ও ক্রিয়াপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে চায়, করুক—তবুও মানুষের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার ক্ষুন্ন করা চলিবে না। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, এই স্বাধীনতা ধর্মদ্রোহিতার নামান্তর মাত্র। মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে যদি কেহ ধর্মদ্রোহিতা বলেন, তাহা হইলে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিব অন্ধবিশ্বাস অপেক্ষা এইপ্রকার স্বাধীনতা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। প্রশ্ন হইবে স্বাধীন চিন্তার সীমা কতদূর? অতি সহজ উত্তর এই যে, কোন সীমার মধ্যে ইহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব নহে। সরল বিশ্বাসে কেহ যদি কোন চিরন্তন সত্যকে মিথ্যা বলিতে চায়, তবে সে তাহা বলুক না কেন, অল্পদিন পরেই হয় তাহার ভ্রম সংশোধন হইয়া যাইবে, অথবা সে একক তাহার মিথ্যা আদর্শ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবে। ইহাতে জগতের কোন অকল্যাণ হইবে না। ধর্ম রক্ষার নামে যাঁহারা স্বাধীন চিন্তাকে সংকুচিত করিতে চান, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, আক্রমণে ধর্ম নষ্ট হয় না। কারণ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কাহারও আক্রমণ ও সমর্থনের উপর নির্ভর করে না। ধর্ম তাহার নিজস্ব শক্তি, সৌন্দর্য মাধুর্যের উপর নির্ভর করে। সেই সৌন্দর্য শক্তি ও মাধুর্য যদি ধর্মের মধ্যে থাকে, তবে ভয়ের কোন কারণ নাই। অধর্ম ও মিথ্যার পার্শ্বে ধর্ম সহস্র ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তি পাইবে।

ধর্মালোচনার পথে কোন সীমা নির্দেশ করার অর্থই হইতেছে স্বাধীন চিন্তার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা। মানুষের স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র কি কখনও সীমাবদ্ধ হইতে পারে? জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন কলাশিল্প, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি—এই সব ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীন চিন্তার অবাধ অধিকার থাকা দরকার, ধর্মালোচনার ব্যাপারেও তাহার স্বাধীন চিন্তার অবাধ অধিকার স্বীকার করা কর্তব্য। পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রকৃত জননী হইতেছে স্বাধীন চিন্তা। সার্থকভাবে যেসব ধর্মবিপ্লব হইয়াছে, তাহারও মূলে আছে স্বাধীন চিন্তা। জগত আজ যে এত উন্নত হইয়াছে, তাহার মূলে আছে স্বাধীন চিন্তার অধিকার। যেখানে স্বাধীন চিন্তা ব্যাহত, সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ। স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অপরাধে যেখানে মানুষের উৎপীড়ন হয়, সেখানে গোটা সমাজেরই অধঃপতন হইয়া থাকে! স্বাধীন চিন্তার অভাবে জাতির সমস্ত চিন্তাশক্তি খর্ব হইয়া যায়। তাহার মানসিকতা হীন হইয়া পড়ে। আবার যখন নানা উৎপীড়ন সহ্য করিয়া জাতি স্বাধীন চিন্তার অধিকার পায়, তখন হইতে তাহার উন্নতির সূত্রপাত হয়। মার্টিন লুথারের আবির্ভাবের পূর্বে সমগ্র ইউরোপের মানসিকতা রোমের পোপের নিকট বন্ধক দেওয়া হইয়াছিল। তাই সে যুগকে Dark Age বলা হইয়া থাকে। এই যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বাধীন আলোচনা ছিল না। বাইবেলের বিরুদ্ধ-সমালোচনা করা ত দূরের কথা, বাইবেলের মতের সহিত খাপ খায় না, এমন কথা বলিবার অধিকার কাহারও ছিল না। পৃথিবী ঘুরিতেছে, ইহা নাকি বাইবেলের শিক্ষার বিরুদ্ধে। সেইজন্য গ্যালিলিওকে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এই Dark Age-এর শেষের দিকে মার্টিন লুথার প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া একটা নূতন যুগের প্রবর্তন করিলেন। ধর্ম ব্যাপারে তিনি Private right of Private Judgment দাবী করিলেন। তাঁহার Reformation আন্দোলনের পর হইতে ইউরোপে স্বাধীন চিন্তার পথ মুক্ত হইল। তারপর আরম্ভ হইল জ্ঞানবিজ্ঞানের বিজয় অভিযান। ইউরোপময় একটা অপূর্ব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল। ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে চতুর্দশ লুইয়ের দুর্দান্ত শাসনে ফ্রান্সের মানসিকতা নিম্নস্তরে পতিত হইয়াছিল। বড় বড় কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ স্বাধীনভাবে

মতামত ব্যক্ত করিতে পারিতেন না। রুশো ভলটেয়ারের মত যুগান্তকারী লেখকদের দুর্দশার সীমা ছিল না। কিন্তু ফরাসী বিপ্লব প্রচন্ড বেগে আসিয়া দেশের অবস্থা একেবারে বদলাইয়া দিল। এই বিপ্লব স্বাধীন চিন্তার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। খালিফাশাসিত তুরস্কের অবস্থা মধ্যযুগের পোপশাসিত ইউরোপের মতই হইয়া পড়িয়াছিল—তুরস্কে স্বাধীন চিন্তা অবরুদ্ধ ও মানসিকতা শৃঙ্খলিত অবস্থায় ছিল। কিন্তু কয়েক শতাব্দীর অত্যাচারের পর কামালের মত নেতা আবির্ভূত হইয়া তুরস্কে স্বাধীন চিন্তার বাধাগুলি একে একে অপসারিত করিয়া দিলেন। আজ তুরস্কে স্বাধীন মতের জন্য কোন পীড়ন নাই। নবজাগ্রত তুরস্ক আজ এশিয়ার পথপ্রদর্শকরূপে স্বাধীন চিন্তার জয় ঘোষণা করিতেছে; মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে অবরুদ্ধ করিবার জন্য হিটলার ও মুসোলিনী যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা মধ্যযুগের বর্বর পন্থা ব্যতীত কিছুই নহে। অদূরভবিষ্যতে ইউরোপ তাহার কুফল পাইবে।

যে দিক দিয়াই আলোচনা করি না কেন, স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। যখন স্বাধীন চিন্তার কোন সীমা থাকিতে পারে না, তখন ধর্মবিষয়ে আলোচনার অধিকারে কোনওরূপে সীমারেখা নির্দেশ করা ঠিক নহে। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য খুব কম লোকই ধর্মদ্রোহিতা করে। ধর্মের কোন কর্মধারা, আচার ও পদ্ধতি যখন কাহারও নিকট অন্যায় অযৌক্তিক ও অশোভন বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সে যখন মনে করে যে, এইগুলি দেশের ও সমাজের অকল্যাণ করিতে পারে, তখন সে তাহার বিচারবুদ্ধি বিবেকের তাড়নায় সেগুলির বিরুদ্ধ-সমালোচনা করে। ইহা তাহার বিপ্লবী মনের পরিচয় দেয়। ধর্মদ্রোহী বলিয়া এই শ্রেণীর লোককে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দন্ড দেওয়া অসঙ্গত। যদি কেহ কোন ধর্মমতকে অন্যায় বলিয়া মনে করে, তবে কেন সে তাহা বলিবার অধিকার পাইবে না। কেন সে তাহার নিজের মতকে জগৎ মাঝে প্রতিষ্ঠিত করিবার অধিকার পাইবে না, জায়দ ও রাম পছন্দ করেন না বলিয়াই কি অপরের অধিকার সংকুচিত করিতে হইবে? বরং শ্রেষ্ঠ পন্থা হইতেছে, তাহাকে তাহার কথা বলিতে দাও। তাহার মত প্রচার করিবার পূর্ণ অধিকার তাহাকে ছাড়িয়া দাও। সাধারণত কয়েকটি বিষয়কে আমরা ধর্মদ্রোহিতা বলি; যথা—(১) নাস্তিকতা প্রচার; (২) ধর্মের অসারতা ও অপ্রয়োজনীয়তা প্রচার; (৩) ধর্মের প্রচলিত স্বরূপের পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা; (৪) উপাসনা-পদ্ধতির সমালোচনা; (৫) কতকগুলি সামাজিক আচার-বিচারকে নিন্দনীয় প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা ইত্যাদি। অনেক লোক স্বাধীন চিন্তাকে মোটামুটিভাবে সমর্থন করেন। কিন্তু তাঁহারাও উক্তবিধ বিষয়ে কাহাকেও স্বাধীনতার অধিকার দিতে চান না। আমার বক্তব্য, তা দিলে দোষ কি? সর্ববিষয়ে স্বাধীন চিন্তার অধিকার দিতে হইবে এবং সর্বপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কেহ এ অধিকার প্রয়োগ করিয়া কোন ধর্মকে আক্রমণ করিলে তাহাতে ধর্মের বা সমাজের কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ প্রত্যুত্তর দিবার অধিকারও ত অন্য পক্ষের থাকিবে। সমাজের যুগ যুগ সঞ্চিত গলদ দূর করিবার ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এক পক্ষ দোষত্রুটি দেখাইয়া না দিলে সাধারণ লোক আপনা হইতে নিজেদের গলদ দেখিতে পায় না। ধর্মের যেসব বিষয় ত্রুটিপূর্ণ নহে, সেগুলি আক্রমণে বিধ্বস্ত হইবে না। স্বাধীন চিন্তাকে এত ভয় কেন? অপরের আক্রমণ সহ্য করিবার মত উদারতা যদি কাহারও না থাকে, তবে সে মনুষ্য নামের অযোগ্য। আক্রমণ সহ্য করিতে অভ্যস্ত হই না বলিয়া আমাদের নিজেদের চিন্তাশক্তি বিকশিত হয় না। প্রচলিত সব কিছুকেই খারাপ মনে করা যেমন অন্যায়, সেইরূপ প্রচলিত সব কিছুকেই খাঁটি সত্য ও দোষ-ত্রুটিবিবর্জিত মনে করাও অন্যায়। ধর্মে, সমাজে রাষ্ট্রে সংস্কারের ও সংশোধনের ক্ষেত্র কখনও শেষ হইয়া যায় না। যাহাকে আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহার প্রত্যেকটি ধারা ও উপধারা সত্য নাও হইতে পারে। তাহাতে মানুষের অগোচরে নিশ্চয়ই বহু ভেজাল আসিয়া মিশিয়া যাইতে পারে। আবার এক যুগে যাহা প্রয়োজনীয় ছিল, তাহা হয়ত পরবর্তী যুগের পরিবর্তিত বিভিন্ন পরিস্থিতির মধ্যে প্রয়োজনীয় নাও হইতে পারে। যিনি সাহস করিয়া এই কথাটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেন, তিনি ত আমাদের বন্ধু। তিনি নিন্দা ও নিগ্রহের পাত্র নহেন; বরং তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। সুতরাং যে কেহ সমাজের গলদ দূর করিতে চায়, ধর্মবিষয়ে আলোচনা করিতে চায়, প্রতিষ্ঠিত সত্য সম্বন্ধে তর্ক করিতে চায় এবং আমাদের যুগ যুগ প্রচলিত মতকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে চায়, সন্দেহ দ্বারা বিশ্বাসকে টলাইতে চায়, কোন স্থির বিশ্বাসকে শাশ্বত বলিয়া অস্বীকার করিতে চায়, এমন কি, যদি কেহ ধর্মদ্রোহী হইতে চায়, তবে তাহাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ইহা উন্নতির পরিপন্থী নহে, বরং ইহা মানসিক উন্নতির লক্ষণ! এ বিষয়ে একটি নীতি সব সময় স্মরণ রাখা দরকার—"Doubt what is believed and tolerate what is hated."

"যাহা সাধারণে বিশ্বাস করে, তাহাকে কেহ যদি সন্দেহ করে, তবে সে তা করুক এবং যাহা সাধারণে ঘৃণা করে, সে বিষয়ে উদার ভাব অবলম্বন কর।" অন্ধবিশ্বাস হইতে সত্য তথ্যে আসিবার প্রথম পথ হইতেছে সন্দেহ। এই সন্দেহ হইতে অনুসন্ধানের স্পৃহা জাগে এবং অনুসন্ধান হইতে সত্য তথ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। সন্দেহ না থাকিলে অনুসন্ধান অসম্ভব এবং অনুসন্ধান না করিলে বিজ্ঞান অসম্ভব। এই পথ সত্যে পেঁছিবার একমাত্র পথ। মনে রাখিতে হইবে যে, ধর্ম ও স্বাধীন চিন্তা পরস্পর-বিরোধী শব্দ নহে। মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাধীন মতকে পিষ্ট দলিত করিবার জন্য ধর্মের উদ্ভব হয় নাই। বরং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করাই ধর্মের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু সাধারণ লোক ধর্ম সম্বন্ধে ভুল ধারণা বশত স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়া বসে। এইখানে আসল গলদ। এই গলদ দূর না হইলে সমাজের কোন কল্যাণ নাই।

অনেক প্রাচীনপন্থী লোক বিশ্বাস করেন যে, ধর্মে স্বাধীন চিন্তার প্রশ্রয় দিলে অথবা তাহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলে দেশ ও সমাজ হইতে ধর্ম জিনিসটা একেবারেই লোপ পাইবে। তাঁহারা ইউরোপের দৃষ্টান্তগুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইতে চাহেন যে সেখানে স্বাধীন চিন্তার ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানা ধরণের বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করিয়াছে। মুসলমান সমাজকে ইহার কু-প্রভাব হইতে রক্ষা করিতে হইলে স্বাধীন চিন্তা অস্বীকার করিতে হইবে। আমার মনে হয়, তাঁহারা ইউরোপের ইতিহাস ঠিকভাবে পাঠ করেন নাই। এই স্বাধীন চিন্তার ফলেই ইউরোপ মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের প্রভাব হইতে মুক্তি পাইয়াছে। পোপ-প্রভাবিত ইউরোপ অপেক্ষা বর্তমান ইউরোপ বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। যেখানে যুক্তির মর্যাদা ছিল না, স্বাধীন মতের সম্মান ছিল না, মত প্রকাশের জন্য মানুষকে জ্বলন্ত অনলকুন্ডে নিক্ষেপ করা হইত, বলপূর্বক কর্তৃপক্ষের আদেশ মানুষের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবার ব্যবস্থা ছিল, সে যুগের স্বাধীন চিন্তাবিবর্জিত যুক্তিহীন আদর্শ ও অন্ধবিশ্বাস জগতের জন্য মঙ্গলজনক, না বর্তমান যুগের জননায়কের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও যুক্তি বিচারবুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত আদর্শ মঙ্গলকর, তাহা ধীরভাবে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে। যুক্তি, বিবেচনা, স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি সত্ত্বেও ইউরোপ খৃষ্ট ধর্মকে বিসর্জন দেয় নাই। ইউরোপে ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিবার পরিপূর্ণ অধিকার আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বে ইউরোপের বহু লোকের অন্তর হইতে এখনও যেমন মধ্যযুগীয় মনোভাব সম্পূর্ণভাবে দূর হয় নাই, অন্যদিকে সেইরূপ

স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে বহু লোক সংস্কার-মুক্ত মন লইয়া সকল বিষয় বিবেচনা করিতে শিখিয়াছে। স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে ইউরোপ মোটের উপর উপকার অধিক মাত্রায় পাইয়াছে। স্বাধীন চিন্তার অধিকার পাইয়া ইউরোপের যে ঐহিক উন্নতি হইয়াছে, মধ্যযুগের ভাবধারার মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে সে প্রকার উন্নতি হইত না। আমরা (মুসলমান) একটা কথা খুব জোর গলায় বলিয়া থাকি যে, ইসলাম যুক্তির ধর্ম, ইসলামের প্রত্যেক শিক্ষা ও আদর্শ বিজ্ঞান-সম্মত। ইহাই যদি বিশ্বাস করি, তবে স্বাধীন চিন্তাকে এত ভয় কেন? ধর্মের যেসব বিষয়কে সমাজ অভ্রান্ত ও চির-শাশ্বত বলিয়া মনে করে, তাহার বিরুদ্ধে যদি কেহ কিছু বলিতে চায়, তবে তাহাতে শঙ্কিত হইবার কোন কারণ নাই। তাহার স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত মন চিন্তার অবাধ স্বাধীনতা পাইলে হয়ত সে সমাজকে তথা জগৎকে অনেক কিছু দান করিতে পারিবে। কিন্তু অঙ্কুরেই তাহার চিন্তাশক্তিকে দাবাইয়া দিলে কাহারও লাভ হইবে না। তাহাকে স্বাধীন চিন্তার অধিকার দিলে ধর্মের কোন ক্ষতি হইবে না। ধর্মের শাশ্বত আদর্শের ভিত্তিমূল উৎপাটিত হইবে না। বর্তমান যুগে মুসলমান সমাজে চিন্তার বড়ই অভাব। স্বাধীন চিন্তার অভাববশত সমাজের নানাদিকে নানারূপ ক্ষতি হইতেছে। সমাজের ধর্মান্ধতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই ধর্মান্ধতা অপসারিত না হইলে সমাজের চিন্তাশক্তির সম্যক বিকাশ হইবে না। ধর্মান্ধতার প্রভাবে স্বার্থপর ও অবিবেচক ব্যক্তিগণ সমাজকে নানাভাবে প্রতারিত করিতেছে। এই সমাজে স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইলে পুরোহিত শ্রেণীর লোকের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস হইয়া যাইবে। সমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ পাইবে।

ইসলামের ইতিহাসে স্বাধীন চিন্তার যুগ যে একেবারেই আসে নাই, তাহা সত্য নহে। প্রসঙ্গক্রমে "মোতাজেলা" মতবাদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। "আসহাবুল ইতে আল ওর্‌রায়" অর্থাৎ "যুক্তি ও বিবেচনা-কারী দল" বলিয়া যে একটি সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল, তাহার সদস্যগণ স্বাধীনভাবে সকল বিষয় চিন্তা করিতেন। ইঁহাদের মতবাদ সাধারণত "মোতজালা" মতবাদ নামে অভিহিত। এই মতবাদ ইসলামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট আসন লাভ করিয়াছে। কিন্তু ইহার আদর্শ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। এক দিকে "জাবরিয়া" মতবাদ, অন্যদিকে ইমাম আল গাজ্জালীর প্রভাব "মোতাজালা" মতবাদকে বিতাড়িত করিয়াছে। মুসলিম রাষ্ট্রনায়কগণ "মোতাজেলা" মতবাদকে ধ্বংস করিতে কম সাহায্য করেন নাই।

৩

তাহার পর মুসলিম জগতের উপর ধর্মান্ধতার এমন এক আবরণ পড়িয়া গেল, যাহা আজিও সম্যকভাবে অপসারিত হয় নাই। আজি হইতে বহু শতাব্দী পূর্বে মুসলিম জগতে Dark Age আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া কষ্ট হয় যে, এখনও আমরা সেই Dark Age-এ পড়িয়া আছি।

ভারতবর্ষে দুইজন মহাপুরুষের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা স্বাধীন চিন্তার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিবেন—রাজা রামমোহন রায় ও স্যার সৈয়দ আহমদ। এই দুইজন মহাপুরুষ স্বাধীন চিন্তা ও সংস্কারমুক্ত বুদ্ধির দ্বারা সমাজের গলদ দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এই দুইজন চিন্তাবীরকে ভারতবাসী আজিও সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। পশ্চিমাগত ভাবধারাকে বিতাড়িত করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের ও ইসলামের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি রীতিনীতিকে অসম্ভবরূপে গৌরবান্বিত করিয়া দেখাইবার প্রবৃত্তি এদেশের একদল সুধীলোককে এমনভাবে পাইয়া বসিয়াছে যে, তাঁহাদের প্রভাবে রাম-মোহন ও সৈয়দ আহমদের সাধনা একরূপ ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে। রামমোহনের পরবর্তী যুগের বহু সুধীজনের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব হিন্দুদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার গতিকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে। আর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার দ্বারা ইউরোপকে পরাস্ত করিয়া ইসলামে দীক্ষিত করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার গতিকে ব্যাহত করিয়াছে। তাই আজ সৈয়দ আহমদ আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ভিন্ন অন্য কোন কারণে সম্মানিত নহেন। সৈয়দ আহমদের সংস্কারমুক্ত স্বাধীন চিন্তা-ধারাকে এদেশের কয়জন মুসলমান শ্রদ্ধার চোখে দেখিয়া থাকে? ইসলামে যাহা আছে, তাহা সবই সত্য—ইহা না হয় সহ্য করা গেল। কিন্তু বিগত তের শত বৎসর ধরিয়া মুসলিম শাসক, সুধী, পণ্ডিত ও সুধী-সজ্জন যাহা করিয়া গিয়াছেন, যাহা বলিয়া গিয়াছেন, অথবা যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সবই সত্য, শাশ্বত ও সর্বাঙ্গসুন্দর এরূপ মতবাদ চালাইতে গেলে এবং অহরহ প্রচার করিতে থাকিলে স্বাধীন চিন্তার যে মৃত্যুপাত হইয়া যাইবে। ইসলামের বিভিন্ন মিশনারী প্রচারকগণ, পৃথিবীর নানা দেশে এইভাবে ইসলাম প্রচার করিয়া যতজন বিধর্মীকে ইসলামের শীতল আশ্রয়ে আনিয়াছেন তাহার চেয়ে অধিক সংখ্যক মুসলমানকে তাঁহারা অতি মাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল করিয়া তুলিয়াছেন। স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধি ব্যতীত এ ব্যাধির প্রতিকার নাই। মুসলমানদের মধ্যে ধর্মবিপ্লব ও সামাজ-বিপ্লবের একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সমাজদেহে বহু গলদ প্রবেশ করিয়াছে তাহা অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যে, আবার সেই সপ্তম শতাব্দীতে প্রত্যাবর্তনই এই গলদ দূর করিবার একমাত্র প্রতিকার। কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা ভুল। পর্বত গাত্র হইতে যে নদী প্রবাহিত হইয়া সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িয়াছে তাহাকে আবার সেই পর্বতে প্রত্যাগত করা অসম্ভব। প্রাচীনের মোহ হইতে সরিয়া আসাই হইতেছে এ ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু স্বাধীন চিন্তা ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে।

বর্তমানে মুসলমান সমাজের সব চেয়ে বড় অভাব হইতেছে বিপ্লবী মনের। আমাদের যুবকগণ স্বাধীনভাবে কোন বিষয় চিন্তা করিতে ও তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করে না। কি জানি যদি ধর্মদ্রোহী হইয়া পড়িতে হয়। এই ভয়ে মনের আবেগ চাপিয়া রাখিতে চায়। এই মনোভাব "পরহেজগারী" ও "তাকওয়ার" প্রমাণ নহে। ইহা দুর্বল ও দূষিত মনের পরিচায়ক। পৃথিবীতে কত দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম-বিপ্লব ও সমাজ বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, এগুলি কি মানব সভ্যতাকে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে পিছাইয়া দিবার জন্য হইয়াছে? ইতিহাস উত্তর দিবে, পিছাইয়া ত দেয় নাই, বরং প্রত্যেক বিপ্লব মানব সভ্যতাকে বহু দূরে আগাইয়া দিয়াছে। সভ্যতা ও জ্ঞানের মারাত্মক শত্রু হইতেছে গতানু-গতিকতার মোহ এবং নির্বিচারে সব কিছুকে স্বীকার করিবার প্রবৃত্তি। এই মোহ ও প্রবৃত্তি মানুষের চিন্তাধারার স্বচ্ছন্দ গতিকে প্রতি পদে ব্যাহত করিয়াছে। আমাদের যুবক সম্প্রদায়কে এই গতানুগতিকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অনেকে হয়ত বলিবেন যে, ইসলাম ধর্ম পূর্ণাঙ্গ। মুসলমান সমাজ এরূপ বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যে এখানে বিপ্লবের ও স্বাধীন চিন্তার কোন স্থান নাই। কিন্তু ইসলামের পূর্ণতা অস্বীকার না করিলেও একথা জোর গলায় বলিতে পারি যে, ইসলামে বিপ্লবের ক্ষেত্র সংকুচিত নহে। ইসলামের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের ইতিহাস যাহা সাক্ষ্য দেয় তাহা এই যে, ইসলামে ও মুসলমান সমাজে বহু বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। আজিও সেই বিপ্লবের ধারা অক্ষুণ্ণ আছে এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা আজিও নিঃশেষ হয় নাই। আমাদের প্রাচীন ইমাম ও শাস্ত্রকারগণ ধর্মের ব্যাখ্যায় বহু বিষয়ে স্বাধীন মত খাটাইয়াছেন। কোন কোন 'আলেম' বহু বিষয়ে প্রচলিত মতবাদকে পরিত্যাগ করিয়া নূতনের ইঙ্গিত

দিয়াছেন। কোন্ 'অথারিটি' এ যুগের মুসলমানের সে অধিকার কাড়িয়া লইতে পারে? কেহ কাড়িতে গেলে আমরাই বা তাহা সহ্য করিব কেন? সুতরাং ধর্ম ব্যাপারে আমাদের স্বাধীন মত প্রকাশ করিবার অধিকার আজিও অক্ষুণ্ণ আছে। আচার বিচার ও ক্রিয়াকাণ্ডের খুঁটিনাটি বিষয়ের ত কথাই নাই, কতকগুলি প্রধান ও মৌলিক বিষয়ে মুসলমান সমাজে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। এই সব বিষয় প্রমাণ করিতেছে যে ইসলামে স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র কোন দিনই সীমাবন্ধ ছিল না। সিয়া সুন্নির মতভেদ, চারি 'আম্‌হাবের' মতভেদ হানিফি মোহাম্মাদীর মতভেদ, কাদিয়ানী ও অকাদিয়ানীর মতভেদ এইসব ত আছেই, তাছাড়া ধর্মের দার্শনিক ও সুফী মতানুসারে ব্যাখ্যার বিষয় লইয়া বিভিন্ন দলে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান আছে। 'মোতাজালা' ও জাবরিয়া মতবাদের মধ্যে পার্থক্য এত মৌলিক যে একদল অপর দলকে খাঁটি মুসলমান বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই সব বিভিন্ন মতবাদের জন্য এক সময়ে পরস্পরের মধ্যে বহু বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে সকলই আমরা সহ্য করিয়া লইয়াছি। এই ধরণের পরস্পর-বিরোধী মতবাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছে যে ইসলামে স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্র সংকীর্ণ নহে। কাদিয়ানী ও অকাদিয়ানী দলের মতভেদের কথাটা একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে বলি। ইহাদের পার্থক্য একেবারেই মৌলিক। কারণ Finality of Prophet লইয়া এই মতভেদের সৃষ্টি। সুন্নি ও শিয়া সমাজের সমস্ত মুসলমান Finality of Prophet থিওরীতে বিশ্বাস করেন। কিন্তু কাদিয়ানীগণ তাহা করেন না। অথচ এই দুই সম্প্রদায়ের কোনটাই ইস্‌লামের গণ্ডীর বাহিরে নহে। আমরা আচার বিচারকে বড় করিয়া দেখি বলিয়া অনেক সময় প্রকৃত সত্যকে ধরিতে পারি না। রাষ্ট্র সংস্কারের মত সমাজ সংস্কার ও ধর্ম সংস্কার সব যুগেই হইয়াছে এযুগেও হইবে। স্বাধীন চিন্তাকে রুদ্ধ করিলেও তাহা কেহ বন্ধ করিতে পারিবে না। সংস্কার পূর্বে হইত, না হয় কিছুকাল পরে হইবে। পর্দা সমস্যা, সুদের সমস্যা, চিত্র সমস্যা, এই সব বিষয়ে মুসলিম সুধিগণ স্বাধীনভাবে অশঙ্কিতচিত্তে নিজেদের মত প্রকাশ করিয়াছেন। যুগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আমাদের বহু আলেম প্রাচীন পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নূতন নূতন পথের ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই ইঙ্গিত হইতে বুঝা যাইবে যে তাঁহারা স্বাধীন চিন্তার দাবীকে পদদলিত করেন নাই। যত বাধা কি পরবর্তী যুগের জন্য? আমরা এ সীমারেখাকে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বাঙলা দেশে নবযুগে দুচারজন মুসলিম সুধী এ বিষয়ে যে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। শ্রদ্ধেয় কাজী আবদুল ওদুদ, স্বর্গীয় আবুল হোসেন, ঢাকার শিখা দল স্বাধীন চিন্তার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে এ যুগের precursor বলিয়া অভিনন্দন করিতে পারি। যাঁহারা মুসলিম-জাগরণের স্বপ্ন দেখেন, তাঁহাদের অনেকেই স্বাধীন চিন্তার প্রয়োজনীয়তার দিকটা একবারও ভাবিয়া দেখেন না। গোঁড়ামী, অন্ধসংস্কার ও মধ্যযুগীয় মনোভাবের প্রতি অহেতুকী আগ্রহ প্রকাশ করিলে মুসলমানের সত্যিকারের জাগরণ হইবে না। স্বাধীন চিন্তা হইতে মুসলিম-জাগরণের সূচনা হইবে, তাহার পূর্বে নহে। স্বাধীন চিন্তার দুইটি প্রধান শত্রু, রাষ্ট্র ও সমাজ। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে রাজনৈতিক আলোচনা একেবারেই বাদ দিয়াছি। সুতরাং রাষ্ট্রের দিক হইতে স্বাধীন চিন্তার প্রতিবন্ধকগুলির কোন কথা উত্থাপন করিব না। সমাজ সকল দেশেই রাষ্ট্র অপেক্ষা নির্দয়ভাবে মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে দলিত ও পিষ্ট করিয়া থাকে। ব্যক্তির সহিত সমাজের একটা সম্বন্ধ আছে। সেইজন্য সমাজ ব্যক্তিকেও নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে অনেক সময় সমাজ শাসন ও শৃঙ্খলার নামে ব্যক্তিকে ও ব্যক্তির মতকে দাবাইতে কম চেষ্টা করে নাই। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে তাহার ধর্মমতকে, তাহার আচরণকে একটা নির্দিষ্ট পথে চালাইবার জন্য সমাজ বহু অত্যাচার করে। সমাজের কঠোর শাসনশৃঙ্খলা হইতে আত্মরক্ষা করা ব্যক্তির পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয় না। সমাজের চাপে ব্যক্তিকে তাহার সর্বস্ব, তাহার নিজস্ব মত, স্বাধীন চিন্তা এমন কি তাহার বিবেককে পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়। শুধু রাজশক্তির হাত হইতে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে বাঁচাইলে চলিবে না, তাহার চেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় সমাজের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা। দেখিতে হইবে যেন প্রচলিত মত, প্রথা বিশ্বাসধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ধ্বংস করিতে না পারে। সমাজ যাহা চাহে না, বা যাহা ঘৃণা করে, তাহাকেই বিনষ্ট করিতে হইবে, ইহা কোন উন্নত শাসন নহে। ব্যক্তি স্ফুরণ চায়, তাহার স্বাধীন মতের বিকাশের জন্য বন্ধনহীন আবহাওয়া চায়; নতুবা কেবল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় কোন কল্যাণ হইবে না। সমাজ ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া মত প্রকাশের স্বাধীনতা যদি থাকে, তবে ইহাকে নিকৃষ্ট বলিবার অধিকার কেন থাকিবে না? বিবেকের স্বাধীনতাই সর্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা। সকল বিষয়ে ধর্ম, রাষ্ট্র, নীতি বিজ্ঞান, সাহিত্য—মানুষের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা আছে। ইহা হইতে বঞ্চিত হইলে মানুষে পশুর সমান হইয়া পড়ে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা যতই থাকুক, যে দেশে সমাজের অত্যাচারের জন্য চিন্তার স্বাধীনতা থাকে না, সে দেশ কার্যত স্বাধীন নহে। যে সমাজে মতের জন্য পীড়ন নাই, সে সমাজে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসিতে বেশী বিলম্ব হয় না।

বাসবদত্তা ও উপগুপ্ত

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

উপগুপ্ত রায় সন্ন্যাসী হয়ে গেলেও কেউ বিস্মিত হত না, কিন্তু সন্ন্যাসী না হয়ে সে হলো কবি। অবশ্য সেও এক রকমের সন্ন্যাসী হওয়াই। এম্ এ পাশ করেছিলো সে ইংরেজী সাহিত্যে; বন্ধুরা বল্‌তো রহস্য করেঃ "উপগুপ্ত পড়েছে যতো, তার চাইতে না-পড়েছে বেশী। পাশ যে করেছে সেটা পড়ার জন্যে ততটা নয়, যতটা নতুন কথা বলে' চমক লাগিয়ে দেবার ক্ষমতার জোরে।" কথাটার ভেতরে সত্য ছিলো। সাধারণত ছাত্ররা যে উপায়ে আমাদের দেশে ভালো নম্বর পেয়ে পাশ করে' থাকে, উপগুপ্ত সে উপায়ে পাশ করেনি। অর্থাৎ সাহিত্য সম্বন্ধে কোন্ কোন্ সমালোচক কি কি বলেছেন পরীক্ষার খাতায় তার ফিরিস্তি সে লেখেনি; এতটা বৈষ্ণব বিনয় তার ছিলো না যে নিজের একটা মন এবং তাতে রসবোধ থাকা সত্ত্বেও সে পরের মুখে ঝাল্ খাবে। এমন কি শেক্সপীয়রের নাটক সম্বন্ধে কোল্‌রীজ, হ্যাজ্‌লীট, ব্র্যাড্‌লে প্রমুখ সমালোচনা-ঋষিদের অভিমত সম্বন্ধে কোনো মাথাব্যথা ছিলো না উপগুপ্তের। সাহিত্যিকদের লেখাই সে পড়্‌তো, লেখা সম্বন্ধে পড়্‌তো না। পরীক্ষার খাতায় সে যা লিখ্‌তো তা ছিলো সম্পূর্ণ তার নিজেরি মতামত, সাহিত্যবাজারের মার্কামারা সমালোচকদের মতামতের সঙ্গে তাদের কতকটা মিল্‌তো, অনেকটাই মিল্‌তো না। তবু তার মতামতের মধ্যে ছিলো এমন একটা স্বকীয়তা এবং বলিষ্ঠতা, এবং কখনো কখনো মেঘ-পুঞ্জের মাঝখানে হঠাৎ বিদ্যুৎ-ঝলকের মতোই চমকে দেওয়া নূতনত্ব, যে পরীক্ষক মহাশয়েরা তাকে মোটামুটি ভালো নম্বর না দিয়ে পারতেন না, যদিও সাহিত্য-সমালোচনা জগতের মহাজনদের চরণচিহ্ন আঁকা পথের বাইরে সে চল্‌তো বলে' খুব বেশী ভালো নম্বর তাকে দেওয়া বে-আইনী হবে বলে' তাঁরা ভয় পেতেন। এ জন্যে দুঃখও ছিলো তাঁদের মনে। তাঁরা প্রায়ই বল্‌তেন এই জাতীয় কথা নিজেদের ভেতরঃ "ছোক্‌রার ওরিজিনালিটি আছে মান্‌তেই হয়, লেখার স্টাইলও চমৎকার। কিন্তু অত্যন্ত একগুঁয়ে। নিজের কথা ছাড়া পরের কথা ও কিছুতেই বল্‌বে না, তাই সমালোচক পণ্ডিতদের ছায়াও মাড়ায় না সময়ের বাজে-খরচ হবে বলে'। এই পাগ্‌লামীটি না থাক্‌লে ছোকরা স্কলার-শিপ পেতো নিশ্চয়।"

পাগ্‌লামীটা ছিলো বলেই বোধ হয় স্কলারশিপ কখনো পায়নি উপগুপ্ত এবং পায়নি বলে' কখনো দুঃখও বোধ করে নি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটিমাত্র সম্মান সে পেয়েছিলো একটি স্বর্ণপদক, সেটা পরীক্ষার খাতায় শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার জন্যে পুরস্কার। একটি বেছে নেওয়ার জন্য যে পাঁচটি বিষয় দেওয়া ছিলো প্রবন্ধ লেখার জন্যে, তা থেকে উপগুপ্ত বেছে নিয়েছিলো এমন একটা বিষয় যার খোলা মাঠে নিজের কল্পনার ঘোড়াকে খুশীমতো দৌড় করানো যায়। ফলে পরীক্ষার হল থেকে যখন সে বেরিয়ে এলো তখন তার ফেলে আসা খাতায় একটি কুড়ি পৃষ্ঠা জোড়া এমন উপাদেয় রচনা লেখা হয়ে গেছে যাকে প্রবন্ধ না বলে কোনো সরসতর নামে অভিহিত করাই উচিত। পরীক্ষার ফল যখন বেরুলো তখন দেখা গেল পরীক্ষা-সাগর-পার-হয়ে-আসা তরুণ-তরুণীদের সাধারণ তালিকায় কয়েকজনের নীচে পড়লেও প্রবন্ধ লেখক হিসেবে সকলের চেয়ে উঁচুতে আছে উপ-গুপ্ত রায়—পুরস্কার একটি স্বর্ণপদক।

উপগুপ্ত এতে যে খুব খুশী হয়েছিলো তা নয়; কোনো কিছুতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠা তার ধাত-বিরুদ্ধ। তা ছাড়া মৌলিক রচনার দৌড়ের শেষে পুঁথিমুখস্থকারী এবং কারিণীদের দেখতে হলে তাকে যে পিছনদিকে ফিরে চোখে দূরবীণ লাগাতে হবে, এ তার নিঃসংশয়ভাবে জানা ছিলো বলেই অপ্রত্যাশিত আনন্দের কোনো কারণ ছিলো না তার।

নিজের সম্বন্ধে যে উপগুপ্তের তেমন খেয়াল নেই সেটা তার দিকে একবার চেয়ে দেখলেই বোঝা যেতো। প্রতি মুহূর্তেই কি যেন সে ভাবছে। তাই হঠাৎ একটা অতি সরল প্রশ্ন করলেও সে কখনো কখনো এমন চমকে উঠে জবাব দিতে না পেরে হতভম্ব হয়ে তাকাতো যে সাধারণ লোক অতি জটিল প্রশ্নের ঘায়েও অতটা ঘায়েল হয় না। যারা উপগুপ্তকে জানতো তাঁদের এটা সয়ে গিয়ে-ছিলো। কিন্তু যারা তাঁকে জানতো না তারা এর অর্থ করতো অন্য রকম। তাদের এই ভুল করাটা উপগুপ্তের অজানা থাকতো না, কিন্তু জেনেও দুঃখিত হতো না সে, কেননা অন্যেরা তাকে যতটা জানে সে নিজেকে যে তার চাইতে ঢের বেশী জানে একথা সে নিঃসংশয়ে জানতো।

বাসবদত্তা সেন থাকতো উপগুপ্তের দু'বাড়ী পরে। উপগুপ্তের এম এ পাশ করার খবর যখন গেজেটে দেখা গেল, বাসবদত্তা তখন বি-এ পড়ছে ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স নিয়ে। ভালো ছাত্রী বলতে এদেশে যা সাধারণতঃ বোঝায় বাসবদত্তা তা ছিলো না বললে মিথ্যা বলা হবে। এবং ভালো ছাত্রী বলতে এদেশে সাধারণতঃ সেই সব ছাত্রীদেরই বোঝায় যারা মুখস্থ বিদ্যায় আশ্চর্য রকম পটু এবং বোঝার চাইতে মন বোঝাই করার দিকেই যাদের ঝোঁক এবং পারদর্শিতা বেশী। বাসবদত্তা যে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেতো তার এক নম্বর কারণ এই মাত্র বলেছি যে সে ছিলো ভালো ছাত্রী; দু নম্বর কারণ —সে ছিলো ছাত্রী এবং যাঁরা তার খাতা পরীক্ষা করতেন তাঁরা সবাই ছিলেন পরীক্ষক। ছাত্রদের খাতা পরীক্ষা করবার সময় তাঁরা ভাবতেন ছাত্রেরা তাঁদের স্বজাতীয় বলে' তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দোষের খুবই প্রবল সম্ভাবনা আছে, অতএব এই দোষটাকে খণ্ডন করে সাম্য বজায় রাখার জন্য তাঁরা ছাত্রদের খাতা খুব কড়া করে দেখতেন এবং নম্বর ছাড়তেন টিপে টিপে, প্রায় ব্রিটেনের ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন দেবার মতো। ছাত্রী-দের খাতা পরীক্ষা করবার সময় তারা বিপরীত জাতের বলে তাদের প্রতি অবিচার করার সম্ভাবনা থাকায় পরীক্ষকরা অবিচার করার ভয়ে তাদের খাতা যথাসাধ্য উদার-ভাবে দেখে উদারভাবেই নম্বর বিতরণ করতেন। ফলে উদারতা যেতো মাত্রা ছাড়িয়ে।

কলেজে কলেজে ক্রমে এই বার্তা রটে গিয়েছিলো যে, বাসবদত্তা সেন বিশ্ববিদ্যা-লয়ের পরীক্ষায় বাজী মারবেই। ছাত্রমহলেও যেমন, অধ্যাপকমহলেও তেম্নি মুখে মুখে ফিরতে লাগলো বাসবদত্তার নাম। বাসব-দত্তার বাবা চঞ্চল সেন বার-অ্যাট-ল আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

এখানে হয়তো চঞ্চল সেন সম্বন্ধে খানিকটা না বললে অভদ্রতা হবে। যে সব ব্যারিস্টারের 'বারে' যাওয়ার দরকার হয় না, মিঃ সেন ছিলেন সেই সব সৌভাগ্যবান ব্যারিস্টারদের মধ্যে একজন। যে সব বাবা মরবার সময় বেশ কিছু পয়সা রেখে যান সেই সব বাবাদের কোনো একজনের একমাত্র সন্তান হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না; চঞ্চল সেনের ভাগ্যে ঘটেছিলো। তিনি আই সি এস হয়ে ফিরে আসার উদ্দেশ্যে বিলেতে গিয়ে বার বার দুবার পরীক্ষা শেষ করতে না পেরে বার-অ্যাট-ল হয়ে ফিরে এসে বিয়ে করেছিলেন। বিলেত থেকেই সস্ত্রীক হয়ে ফিরবার ইচ্ছা তাঁর ছিলো, কিন্তু অপর পক্ষ এদেশে আসতে রাজী না হওয়ায় অস্ত্রীক অবস্থায় বাঙলায় ফিরে এসেই তাঁকে এদেশে সস্ত্রীক হতে হলো। তার কিছুদিন পরেই তিনি পিতৃহীন হয়ে পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হলেন, এবং তারই কিছুদিন পরে পিতৃত্ব লাভ করলেন বাসবদত্তার। সে প্রায় বাইশ বছর আগেকার কথা। তখন থেকে

বাইশ বছর পরে ফিরে এসে আবার বাসবদত্তার কথা বলছি।

বাসবদত্তা উর্বশীর মতো সুন্দরী হলেই গল্পের পক্ষে হয়তো ভালো হতো, কিন্তু অতটা সে ছিলো না। আপনারা কেউ বাসবদত্তাকে দেখেছেন কিনা জানি না, কিন্তু যিনি দেখেছেন তিনিই জানেন তাকে সুন্দরী বলে স্বীকার করা কঠিন হলেও সে সুন্দরী নয় একথা মেনে নেওয়াও তার চাইতে কিছু কম কঠিন ছিলো না। এবং এইটেই ছিলো বাসবদত্তার এত বড় আকর্ষণ যা এড়ানো ছিলো একান্তই অসম্ভব না হলেও কঠিন।

পাড়ায় এবং কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে ছিলো বাসবদত্তার সঙ্গপিয়াসী নানা রকমের তরুণ। এদের মধ্যে যাদের বাপের পয়সা ছিলো না তাদের বাসবদত্তা পাত্তা দিতো কিনা বাসবদত্তাই জানতো, কিন্তু তারা পাত্তা পাবার ভরসা করতো না বলে থাকতো দূরে দূরে; মনে উচ্ছ্বাস জাগলে কবিতা লিখতো গদ্য-ছন্দে এবং কাগজের সম্পাদকের সঙ্গে যাদের খাতির ছিলো তারা ছাপাতোও।

একটি উপাসক দল যে তার আছে সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলো বাসবদত্তা; এসম্বন্ধে মেয়েরা ক্বচিত অচেতন থাকে। যারা থাকে বলে মনে হয় তারা থাকে না, থাকার ভাণ করে। মাঝে মাঝে টি-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করতো বাসবদত্তা দুচারজন সহপাঠিনীর সঙ্গে দুচারজন সহপাঠীকেও; শেষোক্তরা নিমন্ত্রিত হয়ে নিজেদের ধন্য মনে করতো। কিন্তু তাদের সকলের প্রতিই বাসবদত্তার মামুলী মনোযোগ ছিল এমন নিখুঁতভাবে সমান, যে তারা সবাই প্রায় একই রকম মর্মাহত হ'ত বাসবদত্তার বিশেষ পক্ষপাতের বিফল আশা করে। রবি ঠাকুরের "শেষের কবিতা" ভালো করেই পড়েছিলো বাসবদত্তা, একবার নয়, দুবার নয় অনেকবার। পড়ে পণ করেছিলো বোধ হয় অমিট্ রায়ের মেয়ে সংস্করণ হবার।

বলতে ভুলে গেছি, নিজের ভালো ছাত্রীত্ব সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন ছিল বাসবদত্তা। এটা বাসবদত্তার চরিত্রের কোনো বিশেষত্ব অবশ্য নয়, কেন না গর্ব করবার মত নিজের কিছু থাকলে অথবা আছে বলে মনে হলেও গর্ব বোধ করে না এমন মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। বাসবদত্তা জানতো সে দস্তুরমতো তাক লাগিয়ে দেওয়া ভালো ছাত্রী, বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড শীগগীরই তার কলমের খোঁচায় বিচূর্ণিত হবার অপেক্ষা করছে; এও জানতো যে তাকে যারা জানে তারা সবাই জানে সে একজন অসাধারণ ভালো ছাত্রী। তাই সকলের সঙ্গে সমান অমায়িকভাবে মিশে বাসবদত্তা সকলকেই সমানভাবে ধন্য করে মনে মনে এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করত যে, তার দেমাক করবার এত প্রচুর কারণ বিদ্যমান থাকতেও তার একটুও দেমাক নেই। এই দেমাকহীনতার দেমাকে বাসবদত্তার মন থাকতো ভরে।

ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো ফুরিয়ে যেতে যেতে পরীক্ষার দিনগুলোকে এগিয়ে আনতে লাগল। বাসবদত্তা তত চিন্তিত হল না, যত হলেন বাসবদত্তার কলেজের প্রফেসর গুপ্ত এবং প্রফেসর মজুমদার। গুপ্ত ক্যামব্রিজ ফেরৎ, পড়ান ইংরেজী সাহিত্য; মজুমদার অক্সফোর্ড থেকে ভালো ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন, পড়ান ইংরেজি সাহিত্যের এবং ইংরেজি ভাষার ইতিহাস। গুপ্ত একদিন এসে ব্যারিস্টার চঞ্চল সেনকে অনেক করে বুঝিয়ে বাসবদত্তাকে বাড়িতে এসে মাঝে মাঝে একটু-আধটু দেখিয়ে-টেখিয়ে দেবার অনুমতি আদায় করে নিলেন। অনেক না করলেও যে চঞ্চল সেন গররাজি হতেন না, এই সহজ সত্যটা খেয়াল করার মত মনের অবস্থা প্রফেসর গুপ্তের ছিল না। কাজেই চঞ্চল সেনের অমায়িকতায় তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

এদিকে প্রফেসর মজুমদারের মনে হল শুধু সাহিত্য পড়ে নিশ্চিন্ত থাকাটা বাসবদত্তার উচিত হবে না, সাহিত্যের এবং ভাষার ইতিহাসটাও সঙ্গে সঙ্গে খুবই ভালোরকম তৈরী করা দরকার। অন্য সব দিকেই অদ্ভুত রকম তৈরী থেকেও শুধু এদিকটাকে হাতের পাঁচ ভেবে অবহেলা করে যে কত অসাধারণ ছাত্র এবং ছাত্রীর শোচনীয় সর্বনাশ হয়ে গেছে, তারই করুণ কাহিনী বর্ণনা করে প্রফেসর মজুমদার ব্যারিস্টার চঞ্চল সেনকে সহজেই বশ করে ফেললেন। ফলে এই স্থির হলো, মজুমদার মাঝে মাঝে এসে বাসবদত্তাকে একটু-আধটু সাহায্য করবেন, তাতে চঞ্চল সেন কোনরকম আপত্তি তুলবেন না।

চঞ্চল সেন এঁদের দুজনের বেলায়ই পারিশ্রমিকের কথাটা তুলেছিলেন এবং

দুবারই যা শুনেছিলেন তার ভাবার্থটি এই রকম : "ছি ছি! ও-কথা তুলে কেন লজ্জিত করেন? কুমারী সেন আমাদের কলেজের মুখ উজ্জ্বল করবেন; তাঁকে এই মহান্ অভিযানে এগিয়ে দেবার জন্যে মজুরি নেব, আমরা কি এমনই হীন মজুর? আরে রাম রাম, কি যে বলেন আপনি।" ইত্যাদি।

দুজনেই পড়াতে লাগলেন সপ্তাহের দিনগুলোকে ভাগাভাগি করে নিয়ে। প্রফেসর গুপ্ত বললেন, "দেখুন মিস সেন, সাহিত্য অংশটাই হচ্ছে আসল। ইতিহাসের অংশটা স্রেফ মুখস্থ করার ব্যাপার।" বাসবদত্তা হেসে সায় দিল। প্রফেসর মজুমদার বাসবদত্তাকে বোঝালেন, সাহিত্য এবং ভাষার ইতিহাস ভালো করে না আয়ত্ত করে সাহিত্য বুঝতে যাওয়াটা নিতান্তই হাস্যকর। শুনে বাসবদত্তা মৃদু হাস্য করে বুঝিয়ে দিল, সত্যিই যে সেটা হাস্যকর সে সম্বন্ধে তার সন্দেহ নেই। সুতরাং দুজনেই পরমোৎসাহে পড়াতে লাগলেন বাসবদত্তাকে।

দুজন কুমার একজন কুমারীর জয়যাত্রায় সাহায্য করতে কোমর বেঁধে লাগলেন। এখানটায় কোন সাবেকি চালের লেখক হলে লিখতেন "বিধাতা অলক্ষ্যে হাস্য করিলেন।" কিন্তু আমি আধুনিক লেখক, বিধাতাকে নিয়ে অনর্থক টানাটানি করবো না। শুধু বলব, প্রফেসর গুপ্ত ভাবতে লাগলেন তাঁর পড়ানোটাই বাসবদত্তার সত্যিকারের উপকার করছে, প্রফেসর মজুমদারের কাছে নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেই পড়ে সময় নষ্ট করতে হচ্ছে বাসবদত্তাকে। প্রফেসর মজুমদারও প্রফেসর গুপ্ত সম্বন্ধে অনুরূপ কথাই ভাবতে লাগলেন।

কবি উপগুপ্তকে অনেকক্ষণ ভুলে থাকা গেছে। এইবারে তার কথাও খানিকটা বলা যাক। উপগুপ্তের পৈতৃক টাকা নেই, কিন্তু টাকার প্রয়োজন আছে। এই টাকার প্রয়োজনেই সে প্রথমে নিল একটি কেরানি-গিরি; পরে বিরক্ত হয়ে সেটা ছেড়ে দিয়ে নিল একটা প্রাইভেট টুইশন। ছাত্রের বাবার সুপারিশে একটা ইস্কুলে মাস্টারীও জুটে গেল; মাইনে আমাদের সোনার দেশের পক্ষে আশাতীত রকম ভালো—আশীটি টাকা। প্রধানত উঁচু ক্লাসগুলোতেই সে পড়াতে লাগল ইংরেজি এবং বাঙলা সাহিত্য। উপগুপ্তের ভক্ত হয়ে উঠল ছাত্রেরা ক্রমেই; এই আপনভোলা কবিটিকে প্রথম প্রথম ভালো মানুষ পেয়ে নাস্তানাবুদ করতে গিয়ে পরে অনুতপ্ত হয়ে তারা নিজেরাই অত্যন্ত ভালো মানুষ হয়ে উঠল।

দৈবক্রমে একটি গ্রামোফোন রেকর্ড প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের একজন আবিষ্কার করলেন, উপগুপ্তের কবি-প্রতিভাকে গীতি-রচনার কাজে লাগালে চমৎকার ফল লাভের সম্ভাবনা আছে। ফলে উপগুপ্তের লেখা গান রেকর্ড-জগতে চালু হয়ে গেল। পরে রেকর্ড-জগৎ থেকে চিত্র-জগতে। এতটা আশা করেনি উপগুপ্ত। এতটা হয়তো ভালোও লাগল না তার: সে তৃপ্তি পায় লোকচক্ষুর আড়ালে থেকেই! তার সৃষ্টির আদর হোক, এই সে চায়; তার নিজের আদর হোক, এ তার ইচ্ছা নয়। তার আত্মভোলা ভালো মানুষির জন্যেই নিজের প্রাপ্য সে আদায় করে নিতে পারে না, নিতে পারার আগ্রহও তার নেই। তার রচনা অনেককে আনন্দ দিচ্ছে, এতেই তার আনন্দ, বিনিময়ে আর্থিক দক্ষিণা সে যা পাচ্ছে, তার বেশী আদায়ের চেষ্টা করার আগ্রহ তার নেই।

এবার ব্যারিস্টার চঞ্চল সেনের কথায় আসা যাক। তিনি সৌভাগ্যক্রমে বিলেত-ফেরৎ হতে পেরেছিলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঝানু হতে পারেন নি এবং দুর্ভাগ্যক্রমেই তাঁর একটি ঝানু বন্ধু ছিল শেয়ার-মার্কেটবিশারদ প্রতুল চম্পটি। এই বন্ধুটি তাঁকে নজির দেখিয়ে এবং নানা-রকম অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিলেন, টাকা ব্যাংকে ফেলে রেখে তিলে তিলে না বাড়িয়ে শেয়ার-মার্কেটে খাটিয়ে তালে তালে বাড়ানোর পন্থাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের পন্থা এবং কুবেরত্ব লাভের একেবারে নির্ঘাত উপায়। গোপনে গোপনে, অর্থাৎ মেয়েকে না জানিয়ে চঞ্চল সেন শেয়ার-মার্কেটে বেপরোয়াভাবে টাকা খাটাতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, ব্যাংকের কুয়োতে টাকা রাখা মানেই টাকাকে কুয়োর ব্যাঙ্ করে রাখা, এই চম্পটিউক্ত নীতিতে বিশ্বাস করে তিনি তাঁর ব্যাংকের প্রায় সমস্ত টাকাই তুলে নিয়ে এহেন নানা কাজে (অথবা অকাজে) লাগালেন যাকে চম্পটি বললো ব্যবসা, কিন্তু অন্য যে কেউ বলত রীতিমত মারাত্মক জুয়া খেলা। কৃত্রিম বন্ধুর অকৃত্রিম বন্ধুত্বের ফলে চঞ্চল সেন শীগগিরই এমন জায়গায় এসে পৌঁছালেন, যেখান থেকে দেউলিয়া দুর্গের তোরণ বেশী দূরে নয়। এদিকে প্রতুল চম্পটির নামে ব্যাংকে বেশ কিছু টাকা জমা হয়েছে। ক্রমে কমতে কমতে চম্পটির যাতায়াত শেষটায় একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন চঞ্চল সেন। বাইরের চাল বজায় রাখতেই হবে, অথচ টাকা নেই। সুতরাং ঋণ করতে হল। ঋণের পর ঋণ বেড়েই চলল।

চঞ্চল সেনের একমাত্র ভরসা এই যে, বাসবদত্তা এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড ভাঙবেই; বেশী দেরি নেই তার। বাসবদত্তার ভক্তদের মধ্যে কয়েকজন আছে রীতিমত বড়লোকের ছেলে। তাদের মধ্যে একজনকে বেছে নিলেই হবে বাসবদত্তার পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই। বিয়েটা হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত নিজের শোচনীয় অবস্থাটা গোপন করে রাখতেই হবে চঞ্চল সেনের। তারপর যা হয় হোক্।

এক রবিবার বিকেলের কিছু পরে, সন্ধ্যার কিছু আগে—কি ছিল বিধাতার মনে, মনটা হঠাৎ উদাস হয়ে উঠল বাসবদত্তার। মনের ভাবটা হল সেই রকম, যাতে একা বেরিয়ে পড়তে ভালো লাগে। একা বেরিয়ে পড়লো বাসবদত্তা, একা বেড়াতে লাগল কর্নওয়ালিস স্কোয়ারে। বেড়াতে বেড়াতে চোখে পড়লো কর্নওয়ালিস স্কোয়ারের পুকুরের ধারের রেলিংয়ে হাত রেখে পুকুরের জলের দিকে তাকিয়ে প্রায় পাথরে খোদাই-করা মূর্তির মতই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উপগুপ্ত রায়, একা। উপগুপ্তের কাছে তখন যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্য সব কিছু মিথ্যা হয়ে গেছে, সত্য হয়ে জেগে আছে ঐ পুকুরের জল আর তারি বুকে আকাশের প্রতিবিম্ব।

উপগুপ্তকে অনেক দিনই দূর থেকে দেখেছে বাসবদত্তা ছাতে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে একটানা বহুক্ষণ ধরে। লোকটাকে অদ্ভুত বলে, সৃষ্টিছাড়া বলে মনে হয়েছে বাসবদত্তার, কিন্তু পরক্ষণেই ভেবেছে দুনিয়ায় যারা সবচেয়ে বেশী সৃষ্টিছাড়া, তারাই সবচেয়ে মহান্ সৃষ্টি করতে পারে। আলাপ করতে ইচ্ছা হয়েছে অনেক দিন, কিন্তু আলাপ হয়নি কখনো।

ধীরে ধীরে উপগুপ্তের কাছে এসে দাঁড়াল বাসবদত্তা। খেয়াল করল না, অথবা হয়তো খেয়াল করেও করল না উপগুপ্ত। বাসবদত্তার মন বিরূপ হয়ে উঠল উপগুপ্তের এই অভদ্র ঔদাসীন্যে। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই সে কণ্ঠস্বর দিয়ে উপগুপ্তকে স্পর্শ করে বলল "দেখুন!" চমকে উঠে বাসবদত্তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে রইল উপগুপ্ত; যে জগতে সে ছিল, তা থেকে এ-জগতে ফিরে এসে নিজেকে সে অত তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিতে পারেনি। বাসবদত্তা বলল, "নমস্কার।" উপগুপ্ত খানিকক্ষণ কি যেন ভেবে তারপর বলল, "নমস্কার।"

বাসবদত্তা বলল, "আমায় চিনতে পারেননি আপনি?"

এইবারে এ-জগতে ফিরে এসেছে উপগুপ্ত। বলল, "অতটা অন্ধ আমি নই, কুমারী সেন। আপনি শ্রীযুত চঞ্চল সেনের একমাত্র কন্যা বাসবদত্তা সেন।"

খুশী হল বাসবদত্তা। বলল, "কিন্তু কি আশ্চর্য দেখুন। এত কাছাকাছি থাকি, অথচ এতদিনেও আলাপ-পরিচয় হয়নি।"

"পরিচয় হয়েছে।" উপগুপ্ত বলল। "কিন্তু আলাপ হয়নি। আলাপ হবার কথাও তো নয়, কুমারী সেন।"

মন্দ বলে নি উপগুপ্ত। সে দরিদ্র, আর বাসবদত্তা ধনী পিতার একমাত্র সন্তান। কিন্তু সে প্রভেদের প্রসঙ্গ আজ অবান্তর হয়ে

গেছে বাসবদত্তার কাছে। সে হেসে বললো, "কিন্তু আজ তো হলো উপগুপ্ত বাবু?" সম্বোধনটা যেন কেমন কাঠখোট্টা শোনালো বাসবদত্তার নিজেরি কানে; কিন্তু কি করা যাবে? 'বাবু'-টাকে তো আর বাদ দেওয়া চলবে না!

উপগুপ্ত বললো "লগ্ন যখন আসে, তখন এমনি করেই আসে, কুমারী সেন। তখন তাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না।"

বাসবদত্তার মনে হলো অতি সাধারণভাবে একটি অতি অসাধারণ সত্য উচ্চারণ করেছে কবি উপগুপ্ত। এতদিন শুধু আন্দাজই করেছে, আজ বাসবদত্তা যেন উপলব্ধি করলো এই লোকটি দেখতে সাধারণ হলেও এর ভেতরে লুকিয়ে আছে অসাধারণত্ব। ইচ্ছা হলো আজ অনেকক্ষণ আলাপ করে এর মনের অনেকখানি জেনে নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে ভাবী রেকর্ড ভঙ্গকারিণী বাসবদত্তা সেনকে এভাবে হেদুয়ার পুকুরের ধারে রেলিং-এ হাত রেখে স্কুল মাস্টার কবি উপগুপ্তের সঙ্গে আলাপ করতে দেখলে কেউ কিছু ভাববে কি না এ প্রশ্নও এলো না বাসবদত্তার মনে।

বাসবদত্তা বললো, "আমি লক্ষ্য করছিলুম আপনি অনেকক্ষণ এই পুকুরের জলের দিকে চেয়ে ছিলেন। কি দেখছিলেন এতক্ষণ বলুন তো?"

উপগুপ্ত বললো, "যা দেখছিলুম তা শুধু দেখাই যায়, বলা যায় না কুমারী সেন। তবু বলতেই যদি হয় তো বলতে হয় আমি দেখছিলুম চার ধারে ঘিরে আছে অচল মাটি, শহুরে ভিড়, ট্রাম, বাস, ট্যাক্সী, দালান কোঠা—মাঝখানে বন্দী হয়ে আছে এই পুকুরটা। এ যেন এখানে খাপছাড়া, অথচ খাপছাড়া বলেই এত ভালো লাগছে একে। চার ধারের এই রেলিংএর খাঁচায় যেন বন্দী হয়ে আছে পুকুরটা, চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দী জানোয়ারের মতো। চারধার থেকে আমরা তাকে দেখছি, কিন্তু সে আপন মনে আকাশের স্বপ্নে মগ্ন হয়ে আছে। স্বপ্ন দেখতে জানে বলেই বন্দী হয়েও সে বন্দী নয়।"

"এই হেদোর পুকুরের ভেতর যে এত রহস্য ছিলো এতো কোনোদিন ভাবতে পারিনি উপগুপ্ত বাবু।" বাসবদত্তা বললো। "আচ্ছা আপনারা কবিরা কি একটা সাধারণ জিনিসকে সাধারণভাবে কিছুতেই দেখতে পারেন না?"

উপগুপ্ত বললো, "জগতে নিছক সাধারণ কিছুই তো নেই কুমারী সেন। যাকে নিতান্তই সাধারণ বলে মনে হয়, তার ভেতরেও রয়েছে অসাধারণত্ব—শুধু চিনে নেবার চোখটি চাই। সাধারণের ছদ্মবেশের আড়ালে লুকানো অসাধারণকে যারা চিনে নিতে পারে, কবিরা সেই সৌভাগ্যবান।"

বাসবদত্তা বললো, "কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি। এই রূঢ় বাস্তবের যুগে কি কবিদের কোনো প্রয়োজন আছে?"

"এ যুগেই তো কবিদের প্রয়োজন আরও বেশী। এ কথা সত্যি, যারা নতুন নতুন ব্যবসা, নতুন নতুন কারখানা গড়ে তুলে অনেকগুলো পরিবারের আর্থিক দুঃখ লাঘবের ব্যবস্থা করছেন তাঁরা নমস্য। জগতের দুঃখ-লাঘবের গৌরব আছে; আনন্দ বর্ধনের কোনো গৌরব কি নেই? কিন্তু সে কথা থাক। নইলে শেষটায় নিজের জন্যে ওকালতি করছি বলে' ভেবে বসবেন হয় তো। আমি আবার একটু আধটু কবিতা-টবিতা লিখি কি না মাঝে মাঝে!"

এভাবে আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চললো। বাসবদত্তাই চালালো বলা চলে। আলোচনা করাটা অবশ্য উদ্দেশ্য নয়—উদ্দেশ্য আলাপ করা। শেষে বিদায় নেবার সময় এলো। বাসবদত্তা বললো—"একটা অনুরোধ করবো?" পুকুরের

জলের দিকে তাকিয়ে উপগুপ্ত বললেন, "স্বচ্ছন্দে।" "কাল বিকেলে আমাদের বাড়িতে আপনার চায়ের নেমন্তন্ন রইলো। কথা দিন যাবেন। আপনার কবিতাও তখন শোনা যাবে আপনার মুখে।"

"চা তো আমি খাইনে কুমারী সেন।" নির্লিপ্তভাবে জবাব দিল কবি উপগুপ্ত রায়। চা না খেলেও যে চায়ের নেমন্তন্ন রক্ষা করা যায়, সে কথা কি জানে না সে? ক্ষুণ্ণ হলো বাসবদত্তার মন। আশা করেছিলো উষ্ণ আগ্রহ, পেলো শীতল প্রত্যাখ্যান।

"তা ছাড়া আমার আজকাল সময়ও নেই।" যোগ করলো উপগুপ্ত।

প্রথমটা বাসবদত্তার ইচ্ছা হলো রাগ করতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠলো না রাগ করা। কারণ এক নম্বর, রাগ করলেও সে রাগকে খেয়াল না করারই যার পৌনে ষোলো আনা সম্ভাবনা তার ওপর রাগ করে' সুখ নেই কোনো; দু নম্বর, বাসবদত্তার মনে হলো হয় তো উপগুপ্ত নিজের খাপছাড়াত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন বলেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে অন্যের কাছে নিজের খাপ-ছাড়াত্বটাকে জাহির করতে অনিচ্ছুক।

বাসবদত্তা বললো "ও! সময় হলে যাবেন বুঝি।" তার এই বলার মধ্যে খানিকটা শ্লেষের ভাব হয় তো প্রচ্ছন্ন ছিলো, কিন্তু উপগুপ্ত স্বাভাবিক প্রশান্ত স্বরেই জবাব দিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়। সময় হলেই আমি যাবো।"

তারপর যতই দিন যেতে লাগলো, ব্যারিস্টার চঞ্চল সেনের অবস্থা ততই বেশী সঙ্গীন হয়ে উঠতে লাগলো। চঞ্চল সেন ক্রমেই চঞ্চল, আরো চঞ্চল, আরো আরো চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগলেন। মন অত্যন্ত খারাপ লাগলে ক্লাবে গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলতে লাগলেন। বিলিয়ার্ডের মধ্যস্থতায় আলাপ হলো কুমার বাহাদুর শান্তনু চৌধুরীর সঙ্গে। অগাধ পয়সার মালিক বলে' নাম আছে শান্তনু চৌধুরীর, আর নাম আছে তার সুশৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খলতার জন্যে। পয়সা তিনি ওড়ান যথেষ্ট, কিন্তু ঠিক বাজেট অনুযায়ী তার এক চুল বেশী নয়। চেহারাটি দিব্বি নাদুস-নুদুস গোলগাল, দেহের বর্ণ গৌর—অর্থাৎ কুমার বাহাদুর নাম শুনলে সাধারণত যে ছবি আমাদের মনের চোখে ভেসে ওঠে, শান্তনু চৌধুরীর চেহারা সেই রকমই।

শান্তনু চৌধুরীকে একদিন চায়ের নেমন্তন্ন করলেন চঞ্চল সেন। বিরাট রোলস্ রয়েস্ কারে চড়ে চা খেতে এলেন কুমার বাহাদুর শান্তনু চৌধুরী। পরিচয় হলো বাসবদত্তার সঙ্গে। বলা বোধ হয় বাহুল্য, এই নেমন্তন্নের আসল উদ্দেশ্যেই ছিলো এটা। কুমার বাহাদুর আই-এর পর আর বি এর দিকে পা বাড়ান নি; কেননা পা বাড়াবার ইচ্ছাও হয়নি, প্রয়োজনও হয়নি।

"মিস্ সেনের নাম আমি অনেক শুনেছি।" চা খেতে খেতে বললেন, কুমার বাহাদুর। "শুধু নাম নয়, নামের সঙ্গে প্রশংসা। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা আমি খুব ভালোবাসি। আমাদেরি দেশে জন্মেছিলেন খনা, মৈত্রেয়ী, গার্গী লীলাবতী। মিস্ সেনের প্রতিভাও নাকি—"

আগে থেকেই রুজ মাখা না থাকলে বোঝা যেতো বাসবদত্তার গাল দুটি হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। বাসবদত্তা বললো, "ওঁদের সঙ্গে আমার নাম এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করবেন না কুমার বাহাদুর।"

"এ আপনার অযথা বিনয় মিস্ সেন। যাঁরা আগে এসেছিলেন তাঁরা বড় বলেই যাঁরা পরে আসবেন তাঁরা বড় হতে পারবেন না, তার কোনো মানে নেই। সেকালের তানসেনের চাইতে একালের নাসিরুদ্দীন, আবদুল করীম ফৈয়াজ খাঁকে ছোট বলতেই হবে, এ আমি মানি না।" বলে চায়ের কাপে আরেকটি চুমুক দিয়ে কুমার বাহাদুর বলতে লাগলেন, "দেশকে জাগিয়ে তুলতে হলে চাই আপনাদেরই মতো কালচারড মহিলা।"

অজস্র কথা কইতে পারেন কুমার বাহাদুর; বিশেষ করে মেয়েদের সঙ্গে এবং মেয়েদের সম্বন্ধে কথা কইতে তাঁর জুড়ি মেলা কঠিন। তা ছাড়া তাঁর অর্থ প্রচুর এবং চেহারা ভালো, কাজেই তাঁর কথার একটা বিশেষ রকমের মর্যাদা আছে, বিশেষ করে মেয়েদের কাছে। অল্পক্ষণের

পরিচয়েই মুগ্ধ হয়ে গেল বাসবদত্তা; তার মনে হলো তার মহিমা এমন করে কেউ বুঝতে পারেনি যেমন বুঝেছে কুমার শান্তনু চৌধুরী। শান্তনু চৌধুরী আয়নার মতো তার সামনে এসে দাঁড়াবার আগে সে নিজের চেহারা তো এমন ভালো করে কোনোদিন দেখতে পায়নি। শান্তনু চৌধুরী অত্যন্ত অমায়িকভাবে বলতে লাগলেন, "কালচার বলতে য়ুনিভার্সিটির শিক্ষা বোঝালে আমি কালচারের রাস্তায় বেশী দূর যেতে পারি নি বটে, কিন্তু কালচারের কদর বুঝি। তাই আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ ছিল অনেকদিন থেকেই, কিন্তু সুযোগ পাই নি। সে সুযোগ এসে পড়লো একান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে। এ যে কত বড় সৌভাগ্য আমার!"

যখন যে মেয়ের সঙ্গেই আলাপ হয় তখন তাকে ঠিক এই কথাই বলেন, কুমার শান্তনু চৌধুরী, অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এবং ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গীতে। কিন্তু বাসবদত্তার সে কথা জানা ছিলো না। তার মনে হলো জগতে সেই একমাত্র নারী যার সঙ্গে পরিচিত হয়ে শান্তনু চৌধুরী নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করছেন।

"সৌভাগ্য আপনার একার নয় কুমার বাহাদুর।" বললো বাসবদত্তা।

কুমার বাহাদুর বললেন, "তা আমি জানি মিস সেন। আমার মতো আরো অনেকেই এ সৌভাগ্য লাভ করেছেন।"

লজ্জিত হয়ে উঠে বাসবদত্তা বললো, "আমি সে কথা বলছি না কুমার বাহাদুর। আমি বলছি আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়া আমার পক্ষেও কম সৌভাগ্যের কথা নয়।"

কুমার বাহাদুর সসম্ভ্রমে মাথা নত করে বললেন, "ধন্যবাদ। এমন সম্মানের কথা আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম। আপনার এই কথাটুকু চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবো।" কুমার বাহাদুরের কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে এলো শেষের দিকে। কণ্ঠস্বর প্রয়োজনমত হাল্কা অথবা ভারী করবার ক্ষমতা ছিলো তাঁর। বাসবদত্তার দুটি চোখ ছলছল করে উঠলো। মনে মনে খুশী হয়ে উঠলেন চঞ্চল সেন। ঠিক এমনটি হবে এই আশা করেই তিনি চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন কুমার বাহাদুরকে; এমনটি না ঘটলে তিনি দুঃখ পেতেন মনে।

বিদায় নেবার সময় কুমার বাহাদুর বললেন, "আজকের সন্ধ্যাটা চমৎকার কাটলো। আপনার এই ইনভিটেশনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, মিঃ সেন। আমার বাড়িতে কবে যাচ্ছেন বলুন। রিটার্ন ভিজিট একদিন অন্তত দিতেই হবে।"

এভাবে এ-বাড়ি ও-বাড়ি মাঝে মাঝেই চায়ের নেমন্তন্ন চলতে লাগলো। ফলে পাঠক পাঠিকারা যা আন্দাজ করেছেন ঠিক তাই হলো। বাসবদত্তা বললো "পরীক্ষাটা হয়েই যাক না। আর তো কটা মাস মাত্র। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

শান্তনু চৌধুরী বললেন, "কিন্তু আমার কাটবে না দত্তা। আমার এক একটি ঘণ্টা এক একটি বছরের মত লম্বা মনে হবে। দেরী করার যে ক্ষেত্রে কোন প্রয়োজন নেই সেক্ষেত্রে অনর্থক দেরী করা কেন?"

সুতরাং মত দিতেই হলো বাসবদত্তাকে। অনেকের মনে দুঃখ জাগিয়ে বিয়ে হয়ে গেল বাসবদত্তার, কুমার শান্তনু চৌধুরীর সঙ্গে। জাঁকজমক হলো রীতিমতো, তার ফলে দেনার বহর প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেল চঞ্চল সেনের। তা হোক, তবু মান তো বজায় রাখা চাই। পৈতৃক বাড়িখানা বাঁধা পড়লো এক অবাঙালী লক্ষপতির কাছে। খবরের কাগজে ছাপা হলো বিয়ের খবর অনেকখানি জায়গা জুড়ে। পড়ে কেউ কেউ বললো, "বিশ্ববিদ্যালয়কে তাক লাগিয়ে দেওয়া বিদুষী ছাত্রী বাসবদত্তা সেন কি করে বরমাল্য পরালো ঐ মুর্খাদপি মুর্খ শান্তনু চৌধুরীকে?" তার জবাবে কেউ কেউ বল্লো, "রোল্স রয়েস্ দেখে।"

বাসবদত্তা সেন সম্বন্ধে অনেকের যে উৎসাহ ছিল, বাসবদত্তা চৌধুরীর বেলায়

তার অনেকখানিই নিষ্প্রভ হয়ে গেল। অক্সফোর্ড ফেরৎ প্রফেসর মজুমদার এবং ক্যাম্ব্রিজ ফেরৎ প্রফেসর গুপ্ত—দুজনই কি যেন জরুরী কাজের দরুণ বাসবদত্তাকে আর পড়াতে পারবেন না বলে দুঃখ জানালেন। ছাত্র-বন্ধুদের মধ্যে যারা আগে কবিতা লিখতো তারা কবিতা লেখা ছেড়ে দিল, যারা আগে লিখতো না তারা লেখা শুরু করলো। বান্ধবীদের অনেকেরি মনে জাগলো ঈর্ষা। পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিয়ে স্বামীগৃহে চলে গেল বাসবদত্তা।

আসল গল্পের শুরু এর পর থেকেই; এতক্ষণ যা বলা হলো তা প্রকৃত পক্ষে গৌড়চন্দ্রিকা মাত্র। আনাড়ী লিখিয়েরা গৌড়চন্দ্রিকাটা সহজেই করতে পারে, আসল গল্পের বেলাই এলিয়ে পড়ে। কাজেই অল্প কথায় যা বলা যেতো তা বলতে এতক্ষণ যেমন অনেক কথা লাগিয়েছি, এখন আবার তেমনি সবিস্তারে যা বলা উচিত তাই সংক্ষেপে বলবো।

দেনার দায়ে ব্যারিস্টার চঞ্চল সেনের বাড়ী হাত বদলালো। চঞ্চল সেন থাকতে লাগলেন ছোটখাট একটা ভাড়াটে বাড়িতে। তলে তলে ব্যাপার যে এতদূর গড়িয়েছে এ খবর এতদিন বাসবদত্তার অজানা ছিলো। এবারে সেটা প্রথম জেনে বাসবদত্তা মর্মাহত হলো। আমি যতদূর জানি সত্য কথাই বললুম, পাঠক পাঠিকারা বিশ্বাস না করেন তো নাচার। বাসবদত্তা এতদিন বিশুদ্ধ সাহিত্যের চর্চাতেই মশগুল ছিল, দেনার দায়ের মতো অসাহিত্যিক ব্যাপার তার অগোচর থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয় বলেই আমার ধারণা।

বাসবদত্তা একদিক দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই যেমন পেলো দুঃখ অন্য দিক দিয়ে তেমন পেলো লজ্জা। পিতার এই অবস্থান্তরে তার মনে হলো স্বামীগৃহে তার মাথা অনেকখানি হেঁট হয়ে গেছে। অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে উঠলো তার মন। পরীক্ষা আসতে লাগলো এগিয়ে, কিন্তু পড়ায় আর মন রইলো না বাসবদত্তার।

কৌমার্য ঘুচে যাওয়ার অল্প দিনের ভেতরেই কুমার শান্তনু চৌধুরী ক্রমে উপলব্ধি করলেন তিনি যে বাসবদত্তাকে বিয়ে করেছেন সেটা ঠিক প্রেমে পড়ে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ছাত্রীকে বিয়ে করে বাহাদুরী নেবার বাসনাটাই তাঁর মনে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবল ছিল। বিদ্যার দিক দিয়ে তিনি বাসবদত্তার চাইতে অনেক নীচুতে; কাজেই বাসবদত্তাকে লাভ করতে পারা যাবে কি না সে বিষয়ে সংশয় ছিলো তার মনে। আর এই সংশয়ই তাকে লাভ করার আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু বাসবদত্তা রত্ন লাভ যখন হয়েই গেল তখন তার সম্বন্ধে আগ্রহ দ্রুতবেগে ঝিমিয়ে এলো। তখন তাঁর আগ্রহ আগেকার মতই গৃহের বাইরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো মর্ত্যবাসিনী উর্বশীদের পেছনে, অর্থব্যয়ের স্রোত বয়ে চললো আগেকার মতই প্রবল-বেগে। সহ্য হলো না বাসবদত্তার, কিন্তু প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে সে পেলো অপমান।

তিলে তিলে নীরবে যন্ত্রণা সইতে লাগলো বাসবদত্তা। তারপর একদিন চঞ্চল সেন এসে মেয়েকে দেখে শিউরে উঠলেন। এ কি হয়েছে বাসবদত্তার? কোথায় গেল তার পরিপূর্ণ যৌবন শ্রী, কোথায় গেল তার চোখের আলো আর মুখের স্নিগ্ধ হাসিটুকু? বাসবদত্তার জীবন-পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কোন্ অদৃশ্য দানব যেন সমস্ত রসটুকু শুষে নিচ্ছে। মেয়ের কাছে সব কথা শুনে চঞ্চল সেন দুঃখে অনুতাপে স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। বাসবদত্তা বললো, "আমি আর একমুহূর্তে এখানে থাকা সইতে পারছি না। আমায় তোমার সঙ্গে নিয়ে যাবে বাবা?"

চঞ্চল সেন একটু চিন্তা করে বললেন, "কিন্তু"......বাপের কিন্তু ভাব দেখে চিন্তিত হয়ে মেয়ে বললো, "কিন্তু নয় বাবা। ভুল করেছি, আজীবন তার দুঃখ সইতে হবে। কিন্তু সে দুঃখ এখানে থেকে সইতে পারবো না, তোমার কাছে থাকলে কতকটা সইবে।"

একথা শুনে চঞ্চল সেন আবার কিন্তু করার উদ্যোগ করেই মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন 'বেশ'। ভাবলেন কুমার বাহাদুরের কুমারত্বের মোহে প্রথম ভুল করেছিলেন তিনি, দ্বিতীয় ভুল করেছিল বাসবদত্তা। কুমার বাহাদুরও ভুল করেছিলেন বাসবদত্তার বিদুষীত্বের মোহে ভুলে, সেই ভুল ভেঙে গিয়ে তারই প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে প্রবল-ভাবে। বিদুষী পত্নীর কাছে প্রতিদিনের হীনতাবোধ ক্রমে পরিণত হয়েছে তার প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণায়।

কুমার শান্তনু চৌধুরীর কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে চঞ্চল সেনের বাসায় চলে গেল বাসবদত্তা। বিদায়-বেলায় কুমার বাহাদুর শুধু বলেছিলেন, "বেশ।"

দুঃখ যে এত দুঃসহ হতে পারে, বাসবদত্তা এর আগে কখনো ধারণা করতে পারেনি। মনের স্বাস্থ্য ভেঙে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে গেল তার দেহের স্বাস্থ্য। ক্রমে শয্যা নিল বাসবদত্তা। চঞ্চল সেনের এক ডাক্তার বন্ধু বললেন, "অবিলম্বে হাওয়া-বদল দরকার।" কিন্তু হাওয়া-বদলের জন্য যা দরকার, চঞ্চল সেনের তা ছিল না। ফলে হাওয়া বদলানো গেল না, সেই হাওয়াতেই রাখতে হল বাসবদত্তাকে। লেখাপড়া বন্ধ, ডাক্তারের মানার জন্যেও বটে, দেহ ও মনের অসামর্থ্যের জন্যেও বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো; বাসবদত্তার কলমের খোঁচা তাকে আর সহ্য করতে হবে না।

উপগুপ্ত কিন্তু গিয়েছিলো হাওয়া বদলে; অবশ্য নিজের পয়সায় নয়। এক বন্ধু ছিল মাসিক কাগজের পরিচালক, উপগুপ্ত সেই কাগজের জনপ্রিয় কবি। কবিতা এদেশে জনপ্রিয় হয় না বলে যে প্রবাদ আছে, উপগুপ্তের কবিতা তাকে ভুল বলে প্রমাণিত করেছিল। পরিচালক বন্ধু নাছোড়বান্দা হয়ে বললে, "হাওয়া বদলে যাচ্ছি। তোমাকেও যেতে হবে—যেতেই হবে।" সুতরাং যেতেই হয়েছিল উপগুপ্তকে।

বড়লোক বন্ধুর পয়সায় কবি উপগুপ্ত যখন বেশ কিছুদিন হাওয়া বদল করে খাতা বোঝাই নূতন কবিতা নিয়ে ফিরে এল, বাসবদত্তা তখন শয্যা নিয়েছে। বাসবদত্তার করুণ কাহিনী সর্বত্রই জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। হওয়াটাই স্বাভাবিক। বাসবদত্তার এই পরিণামে অনেকে খুশী হল, অনেকে দুঃখিত হল। দুঃখিত হল সবচেয়ে বেশী উপগুপ্ত। তার মনে হল, এমনটি যে হবে তা তার আগেই তো মনে হয়েছিল। কেন সে কুমার শান্তনুর সঙ্গে একই ভেলায় ভেসে পড়বার আগেই কুমারী বাসবদত্তা সেনকে সাবধান করে দেয়নি?

একদিন গোধূলি বেলায় বাসবদত্তার মনে হল, তার জীবনেও গোধূলির লগ্ন এসেছে; এবার বুঝি বিদায় নিতে হবে। শিয়রের পাশে বসে আছেন চঞ্চল সেন। চেয়ারে বসে আছেন ডাক্তার। ও-ধারের দরজাটা ভেজানো ছিল। সেটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। দেখা গেল প্রবেশ করছে কবি উপগুপ্ত।

বাসবদত্তার শীর্ণ দেহ যেন শয্যার সঙ্গে মিশে গেছে। দেখে মনে মনে চমকে উঠল উপগুপ্ত; কিন্তু সে চমক প্রকাশ পেল না বাইরে। উপগুপ্তের পরিচিত পদশব্দেই যেন চোখ দুটি ধীরে ধীরে খুলে তার দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি ফুটে উঠল বাসবদত্তার মুখে। অতীতের একটি ব্যর্থ অনুরোধ মনে জেগে উঠল।

"এসেছো কবি? সময় হয়েছে?" প্রশ্ন করল সে।

"সময় হয়েছে। এসেছি বাসবদত্তা।" বলে উপগুপ্ত বাসবদত্তার শয্যার পাশে বসে তার শীর্ণ হাত তুলে নিল নিজের হাতে।

একবার উপগুপ্তের দিকে তাকিয়ে বাসবদত্তা ধীরে ধীরে যেন গভীর তৃপ্তিতেই চোখ বুজল।

ট্রামে-বাসে

ভারত সচিবের পদে মিঃ (সম্প্রতি লর্ড) পেথিক লরেন্সের নির্বাচনে কেহ কেহ অনির্বচনীয় আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছেন। এই আনন্দের হেতু পেথিক লরেন্স নাকি ভারতবর্ষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। শুধু সহানুভূতিতে কতদূর কি হইবে তা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। তবে আমাদের ট্রামে-বাসের সহযাত্রিনীদের পক্ষ



হইতে এই নির্বাচনে একটু একটু গদগদতা প্রকাশ একেবারে অবান্তর হইবে না। কেননা আমরা শুনিলাম লর্ড পেথিক লরেন্স মেয়েদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ভোটাধিকার আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তা এতই যদি তিনি করিলেন তাহা হইলে আমাদের ট্রামের জেনানাদের জন্য অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর মেয়ে-যাত্রীদের জন্য একটি পাখা আর বসিবার গদির ব্যবস্থা হয়ত তিনি সুপারিশ করিয়া দিতেও পারেন। অবশ্য এর মধ্যে যদি কোন আইনগত বিতর্ক না থাকে।

* * *

কথা প্রসঙ্গে মিঃ চার্চিলের কথাটাও মনে পড়িয়া গেল। শুনিতেছি তাঁহার জীবনীকে চিত্রে রূপ দেওয়ার জন্য নাকি হলিউড তোড়জোড় করিতেছেন। আবাল্য-বন্ধু আমেরির স্থান সে চিত্রে নিশ্চয়ই থাকিবে। তবু আমরা বলি টলিউডের কোন চিত্র নির্মাতা যদি আমেরির জীবন চিত্রে রূপায়িত করেন, তাহা হইলে প্রাক্তন ভারত সচিবের যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। রোমাঞ্চ-কর কাহিনীর দিক হইতেও ছবিটি বঞ্চিত হইবে না, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, ট্রেণ দুর্ঘটনা প্রভৃতি অনেক কিছুই থাকিবে। বিশুখুড়ো বলিলেন—যৌন আবেদনটাও বাদ পড়িবে না! বস্ত্র সমস্যাটাকে পটভূমিকা করিয়া একটি দর্শনীয় ছবি নির্মাণ অসম্ভব হইবে না।

জার্মানীর সংগে যুদ্ধবিরতির কিছুদিন পরে শুনিয়াছিলাম "জার্মান আবার জাগিবে"—জায়গায় জায়গায় এই ধরণের গানই নাকি সেখানকার নরনারীরা গাহিতেছে। কিন্তু একটি সাম্প্রতিক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ পটস্‌ডাম সম্মেলনের পর জার্মানী নাকি জাতীয় সংগীত হিসাবে গাহিতেছে—"আমরা চাষ করি আনন্দে, মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে" শুনিতেছি হিটলার বাঁচিয়া আছেন, সুতরাং একদিন হয়ত শুনিতে পাইব—তিনি জার্মানীর কোন মাঠে বেগুনের চারা রোপণ করিতে করিতে মিত্র-শক্তির হস্তে বন্দী হইয়াছেন।

* * *

একটি সংবাদে পাঠ করিলাম—আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের একটি পরি-চারকের বেতন নাকি মাত্র তের টাকা! বুঝিলাম উন্নত ধরণের জীবন-যাত্রার কথা যা এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি, তা কেবল কথা মাত্রই। আমাদের দেশের বাজারে গেলে তেরটি টাকা দুইটি ইলিশ মাছ কিনিতেই উড়িয়া যাইত! অথচ আমরা কিন্তু ইলিশ মাছ হইতে "উদয়ের পথে" সবই মাখো-মাখো করিয়া চালাইয়া নিতেছি।

* * *

আমেরী সাহেব তাঁহার পুরাতন ভারত দপ্তরে শেষ দেখা করিতে গিয়া বেশ খানিকটা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া সংবাদদাতা জানাইয়াছেন। "দুনিয়ামে ঘরবাড়ী কারে দিয়া যাও" বলিয়া গুন গুন



করিয়া গান গাহিয়াছিলেন কি না সে সংবাদ অবশ্য আমরা পাই নাই, কিন্তু গাহিয়া থাকিলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই। কেননা বেড়াল আহ্নিকে বসেন ভবনদীর পারে গিয়াই! যাহা হোক, Beecham's Pills বাঁচিয়া থাকুক—তাঁর জন্য আমরা এই প্রার্থনাই করিতেছি।

* * *

পটস্‌ডামের হাঁড়িতে যা রান্না হইয়াছিল তার বেশীর ভাগই নাকি সাবাড় করিয়াছেন—স্বয়ং স্ট্যালিন। এ্যাটলি আর ট্রুম্যানের ভাগ্যে ছিটে ফোঁটা যা পড়িয়াছে, তা দিয়া নাকি তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তিই হয় নাই।



এসব খাদ্য-খাওয়ার ব্যাপারে দেখা যাইতেছে স্ট্যালিন সাম্যের চাইতে উদারনীতিবাদটাই বেশী মানেন।

* * *

জনাব জিন্না বলিতেছেন—"সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ না হইলে—আমি শুধু টাকা চাহিতাম না, আমি তার চাইতেও বেশী কিছু চাহিতাম, আমি চাহিতাম আপনাদের সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ।" বিশুখুড়ো বিবৃতিটির উপর টীকা করিয়া বলিলেন—"তাহা হইলে সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হইয়া ভালই হইয়াছে দেখিতেছি। লীগপন্থীরা এখন তো তবু টাকা দিয়াই বাঁচিয়া গেলেন, সম্মেলন সার্থক হইলে সবস্ব দিয়া যে তাঁরা একেবারে দেউলিয়া হইয়া পথে গিয়া দাঁড়াইতেন।" যাহা হউক জিন্না সাহেব কথাটা পাড়িয়া রাখিয়া ভালই করিলেন। ভবিষ্যতে অনুরূপ সম্মেলন ব্যর্থ করার জন্য লীগপন্থীরা চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না!

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ব্রাডম্যান নাকি আর বিলাতে যাইবেন না। সেঞ্চুরি করিতে করিতে এবং বক্তৃতা দিতে দিতে নাকি তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সেঞ্চুরি করার ক্লান্তিটার সংগে আমাদের বিশেষ পরিচয় নাই, কিন্তু বক্তৃতা দিতে ক্লান্তি বোধ করার কথা আমরা জীবনেও শুনি নাই। ক্লান্ত না হইয়া বক্তৃতা দেওয়ার টেক্‌নিক্‌ শিক্ষা করিতে হইলে ব্রাডম্যানকে আমাদের দেশে আসিতে অনুরোধ করিব। রাজনীতি হইতে খেলার মাঠে সকলেই তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কিছু-না-কিছু শিখাইতে পারিবেন।

কাহিনী খবর ভবঘুরে

পেত্যাঁর বিচারে লাভালের সাক্ষ্য

ভিসি সরকারের আমলে ফ্রান্সের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী পিয়ের লাভাল মার্শাল পেত্যাঁর বিচারে দু' দিন ধরে সাক্ষ্য দিয়েছেন এ খবর জানেন নিশ্চয়ই। তবে গত ৫ই আগস্ট তাঁর সাক্ষ্যের দ্বিতীয় দিনটিতে যে কি কি ঘটেছে—তা হয়তো এখন টের পাননি। দ্বিতীয় দিনের সাক্ষ্য প্রসঙ্গে লাভাল এমন অনেক কথাই বলেছেন—যা আগে সারা পৃথিবীর লোক কেউ জানতে পারেনি। যেমন ধরুন—লাভাল বলেছেন—যে তাঁর কার্যকালে ফরাসী অন্তরীণদের সংখ্যা পঁচিশ হাজার থেকে কমিয়ে পাঁচ হাজারে আনা হয়েছিল এবং মার্শাল পেত্যাঁ সে ব্যবস্থা অনুমোদনও করেছিলেন। তিনি যখন এই কথা বললেন, সমস্ত বিচারঘরে একটা গুঞ্জন ধ্বনি উঠলো। এতে লাভাল সাহেব উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করে বলেন—"মার্শাল পেত্যাঁর কাছে ভাল লাগবে না বলেই কি আমি সত্যি কথা বলবো না?"

কিন্তু মজা কি জানেন? যাঁকে নিয়ে এত উত্তেজনা ও বক্তৃতা বা সাক্ষ্যপ্রমাণ চলছিল, সেই বৃদ্ধ মার্শাল পেত্যাঁ তখন বিচার সভায় একটি চেয়ারে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মঁসিয়ে লাভাল পেত্যাঁর বিরুদ্ধে তাঁর সব সাক্ষ্যবক্তৃতা শেষ করে যখন বিচারসভা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি "মার্শাল পেত্যাঁর সামনে দিয়ে অবনত মস্তকে পেরিয়ে গেলেন এবং পেত্যাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন। "Au revoir Monsieur Le Marechal"—বিদায় মার্শাল মহাশয়! পেত্যাঁর বিচারে লাভালের সাক্ষ্য, জগতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করলো, তাতে কোনও সন্দেহ নেই!

চ্যাং-পুত্রের মতি পরিবর্তন

কিছুদিন আগে জেনারেলিসিমো চ্যাং-কাই-শেকের ভায়রাভাই এবং বর্তমান প্রধান মন্ত্রী তথা বৈদেশিক সচিব টি ভি সুং একদল রাজনীতিজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে মস্কো গিয়ে জেনারিলিসিমো স্ট্যালিনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে ফিরে এসেছেন এবং আবার আলোচনা চালাতে মস্কো গেছেন এ খবরটা কাগজে পড়েছেন। কিন্তু এই দলে চ্যাং-কাই-শেকের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র চ্যাং চিং কুয়ো মহাশয়ও গিয়েছিলেন, সে খবরটা বলি যদি তাহলে কাহিনীর মতই শোনাবে। কারণ আপনারা জানেন চ্যাং পুত্র—চ্যাং চিং কুয়ো ছিলেন গোঁড়া কমিউনিস্ট—বাপের চিরশত্রু। ছিলেন বটে তাই—কিন্তু বর্তমানে তিনি আর কমিউনিস্টদের দলে নেই। তিনি এখন কুয়োমিনটাং যুবক-বাহিনীর অধিনায়ক, বাপের অনুগত সুপুত্র। চ্যাং পুত্রের বুদ্ধি আছে: উপযুক্ত সময়েই মতিগতি পাল্টিয়েছেন।



চ্যাং পুত্র—চ্যাং চিং কুয়ো

পাকা নাৎসীর স্পষ্ট কথা

আমেরিকার খবরে প্রকাশ যে, এক আমেরিকান সংবাদদাতার কাছে—অধিকৃত জার্মানীর সিগেন অঞ্চলে যখন দলে দলে জার্মান বন্দীরা শপথ করে বলছিল—"যে তারা কোনওকালেই নাৎসী ছিল না, তারা রুশদের বরাবরই ভয় করতো এবং আমেরিকানদের ভালবাসতো।" তখন কার্ল উইন্টারার বলে এক পাকা নাৎসী সব শুনেটুনে বলে উঠলো—"তোমরা আমেরিকানরা শিশু—তোমরা সবই বিশ্বাস করো। তোমাদের কাছে এসব কথা বলতে আমাদের শেখানো হয়েছে। তবে মনে রেখো আমেরিকান বন্ধু—ফরাসীরা আমাদের ঘৃণা করবে—রুশরা আমাদের কাজে লাগাবে—বৃটিশরা আমাদের অবজ্ঞা করবে—আর আমেরিকানরাই আমাদের সাহায্য করবে।" বুড়োর কথাগুলো বেখাপ্পা হলেও, বেশ যেন মানে আছে বলেই মনে হয়।

ল্যাস্কীর মোলায়েম ঘোষণা

হ্যারল্ড জে ল্যাস্কী ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের চেয়ারম্যান, রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক—১৯খানি পুস্তক ও অসংখ্য পুস্তিকার রচয়িতা—রক্ষণশীল দলের বড়শত্রু—মাত্র কয়েকদিন আগে এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কাছে ঘোষণা করেছেন—"শ্রমিক দলের জয়ে সাধারণ মানুষদের যুগ শুরু হলো।" এছাড়া আরও অনেক কথাই বলেছেন তিনি। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"শ্রমিক দল ইতিপূর্বেই ভারতের



মিঃ ল্যাস্কী স্পষ্ট ক'রে বলুন!

স্বাধীনতার স্বপক্ষে মত গড়ে তুলেছেন এবং ভারতবাসীরা নিজেরাই যে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে এ নিয়েও তাঁরা যথেষ্ট লড়ালড়ি করেছেন।" এছাড়া অধ্যাপক ল্যাস্কির সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র দেখা করায় তিনি বলেছেন যে,—তিনি বরাবরই ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সমর্থক। পণ্ডিত জওহরলাল ও অন্যান্য ভারতীয় নেতাকে মুক্তি দেওয়ায় তিনি খুশি হয়েছেন। ল্যাস্কী নিজের দেশ সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছেন বা বলেন সেগুলো যতটা জোরালো হয়, এ ঘোষণাগুলি সে তুলনায় ঢের মোলায়েম এবং অস্পষ্ট নয় কি?

সিংহাসনচ্যুত ইংলণ্ডাধিপতির স্বদেশ পরিদর্শন

খবরের কাগজে মাত্র কয়েকদিন আগে পড়েছেন—ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব সম্রাট অষ্টম এডোয়ার্ড, বর্তমানে ডিউক অব উইণ্ডসর এবং তাঁর পত্নী এই সপ্তাহেই ইংলণ্ড পরিদর্শনে আসবেন। এ খবরটা রটায় বৃটেনবাসীদের মধ্যে এক চাঞ্চল্য পড়ে গেছে—সবার মুখে এককথা! "কে আসবেন?"—ডিউক ও ডাচেস্ অব উইণ্ডসর? সত্যি।"—কারণ ১৯৩৬ সালে তাঁর সিংহাসন পরিত্যাগের পর থেকেই তিনি একরকম নির্বাসন-বাস করছিলেন কিনা তাই! রাজ-পরিষদের পারিষদবর্গ কিন্তু এ খবরে অবিচলিত ও অবিস্মিত রয়েছেন, তার কারণ তাঁরা আগেই জেনেছিলেন রাজা ষষ্ঠ জর্জ তাঁর দাদার দেশে প্রত্যাবর্তন অনুমোদন করেছেন। সবই হয়েছে। কিন্তু মজা কি জানেন? ওঁরা দুজনে যখন দেশে ফিরবেন—তখন ডিউকের ভ্রাতৃজায়া রাণী এলিজাবেথ ও মাতা মেরী এবং রাজপরিবারের সবাই তখন থাকবেন, স্কটল্যাণ্ডের 'ব্যালমোরাল' ক্যাসেলে এই ব্যবস্থাই হয়েছে। অর্থাৎ রাজপরিবার এঁদের সঙ্গে মাথামাথিটা ঐভাবেই এড়াতে চান আর কি?

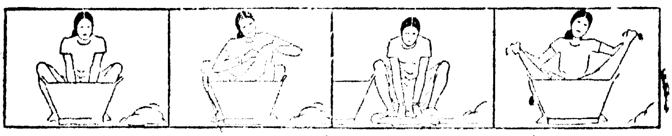


আবার ধোপা কাপড় ছিঁড়েছে!

—আর কাপড়ের যা দাম

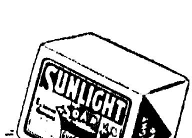
আজকের দুর্ম্মূল্যের বাজারে ধোপাকে কিছুতেই কাপড় আছড়ে কুটি-কুটি করতে দেবেন না। এর চেয়ে কাপড় ধোওয়ার কোনও মোলায়েম উপায় আবিষ্কার করা চাই, যাতে প্রত্যেকটি পোষাকই যতদিন সম্ভব টেঁকে। নিজের বাড়ীতে সান্‌লাইটের "সাবান-মেখে-বাঁচানোর" পন্থায় কাপড় কাচ্‌তে আরম্ভ করবার এই হচ্ছে উপযুক্ত সময়। কাপড় কাচ্‌বার এই মোলায়েম পন্থা ধোপার আছ্‌ড়ানোর চাইতে সব হিসাবেই ভাল এ তার চেয়ে ঢের সহজ; এতে কাপড় অনেক বেশী পরিষ্কারও হয়, এবং একটি সুতোও নষ্ট হয় না। সান্‌লাইটের স্বয়ং-ক্রিয় ফেনা নোংরা কাপড় থেকে ময়লা সহজে এবং সম্পূর্ণভাবে বার করে দেয়, এবং তার জন্যে কাপড় আছ্‌ড়াতেও হয় না, বা জোরে ঘস্‌তেও হয় না। কাপড়ও, যেন কৃতজ্ঞতার খাতিরেই, ঢের পরিষ্কার হয় এবং বেশীদিন টেঁকে। আপনার চাকরকে আজই সান্‌লাইটের এই "সাবান-মেখে-বাঁচানোর" উপায় বুঝিয়ে দিন।

আপনার চাকরকে সান্‌লাইটের "সাবান-মেখে-বাঁচানোর" উপায় শিখিয়ে দিন

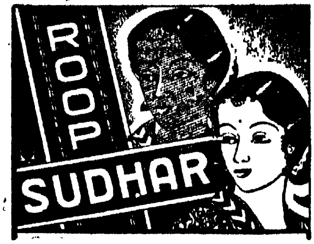


১। কাপড় খুব ভিজিয়ে নিন, যাতে সাবান মাখাতে সুবিধা হয়। **২।** কাপড়ে সান্‌লাইট ঘঁসে নিন। বেশী নোংরা জায়গাগুলিতে বেশী করে সাবান দিন। **৩।** মোলায়েমভাবে নিংড়ে নিন, যাতে সাবান সারা কাপড়ে মেখে যায়। আছাড় মারবার কোনই দরকার নেই। সান্‌লাইটের স্বয়ং-ক্রিয় ফেনা কাপড় থেকে সব ময়লা ছাড়িয়ে নিয়ে, আঁকড়ে ধরে থাকবে। **৪।** বেশ করে ধুয়ে নিন — সমস্ত ফেনা ধুয়ে ফেলা চাই, কারণ এখন সব ময়লা ফেনার মধ্যে চলে গেছে। খুব বেশীরকম ময়লা কাপড়ে দু'বার সাবান মাখাতে হতে পারে।

সান্‌লাইট সাবান কাপড় বাঁচায়



LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED



রূপ সুধার

রূপসুধার মুখের ব্রণ, মেচেতা, বসন্তের দাগ ও অন্যান্য বিশ্রী দাগ দূর করে। ইহা ব্যবহারে মুখশ্রী পরিষ্কার, সুন্দর, সুদর্শন ও ফুটন্ত গোলাপের মত চিত্তাকর্ষক হয়। আয়ুর্বেদিক মতে কৃষ্ণত্বককে ফরসা করার বিশেষ গুণ ইহার আছে। ইহা কাল রংকে ফরসা করে।

ভিঃ পিঃ খরচাসহ মূল্য ১ বাক্স—২।৶ আনা, ৩ বাক্স—৬ টাকা ও ৬ বাক্স—৯৸০, এক ডজন—১৮।০ আনা।

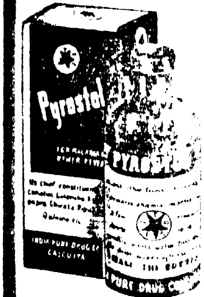
সম্ভব হইলে ইংরেজীতেই চিঠিপত্রাদি লিখিবেন।

আয়ুর্বেদ সেবা আশ্রম

২২নং ফিলখানা, কাণপুর। (AD 2920)

পাইরোষ্টল

ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য জ্বরের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মহৌষধ



*

দুই শিশি সেবনে পুনরাক্রমণের ভয় থাকে না। ডাক্তারগণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

•

মূল্যঃ প্রতি ৪ আঃ শিশি ৩।০। (ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)। পত্র লিখিলে বিবরণী পুস্তিকা পাঠান হয়।

ইণ্ডিয়া পিয়োর ড্রাগ কোং,

সিটি আফিস:
১৩, ডেভিড জোসেফ লেন,
কলিকাতা।



অফিস:—১।১, দুর্গা পীতুরি লেন
বহুবাজার, কলিকাতা।

লঘু-গুরু

অ·কৃ·ব

জনৈক পাঠক লিখিয়াছেন তিনি কিছুদিন যাবৎ এই পৃথিবীর vulgarity সম্বন্ধে বিশেষ রকমে চিন্তান্বিত অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন। তাহার জনৈক বন্ধুও নাকি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে সারা দুনিয়ায় vulgarity ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং অন্যান্য বহু রকমের ism আসে যায়। কিন্তু vulgarity চিরন্তন। অর্থাৎ কবি টেনিসনের ভাষার অনুকরণে বলা যায়ঃ

"Other isms may come and go
But vulgarism goes on for ever."

* * * *

পাঠক বন্ধুটি (এতদিন আমার ধারণা ছিল আমার লঘু-গুরু আমি, কম্পোজিটার, প্রুফ-রীডার এবং সম্পাদক মহাশয়, অথবা হয়তো প্রথমোক্ত তিনজন ছাড়া আর কেহই পড়েন না। যখন দেখিলাম এই চতুষ্টয়ের বাহিরেও এই বিশাল দুনিয়ায় অন্তত একজন আছেন, যিনি লঘু-গুরু পড়েন, তখন তাঁহাকে বন্ধু বলিব বই কি)......

পাঠক বন্ধুটি জানাইয়াছেন দুনিয়ার যত্রতত্র vulgarity ছড়াইয়া আছে, এমন কি আমার লঘু-গুরুতেও; এবং অনুরোধ জানাইয়াছেন vulgarity সম্বন্ধে আমি কি ভাবি তাহা লঘু-গুরু মারফৎ তাঁহাকে জানাইতে।

* * * *

প্রথমটা মনে করিয়াছিলাম আমার লঘু-গুরুও vulgarity মুক্ত নহে বলিয়া আমার পাঠক বন্ধুটি হয়তো কৌশলে আমাকে vulgar বলিয়া গালি দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিয়া ফেলিলাম—কিছুদিন যাবৎ আমার এইরূপ চট্‌পট্‌ বুঝিয়া ফেলার ক্ষমতা আশ্চর্য রকম বাড়িয়া গিয়াছে—vulgar বলিয়া কাহাকেও গালি দেওয়া যায় না, কেন না মানুষমাত্রেই vulgar এবং vulgar মাত্রেই মানুষ। মানুষকে vulgar বলিলে যদি গালি দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহাকে মানুষ বলিলেও গালি দেওয়া হয়। (এখানে হয়তো ব্র্যাকেটে বলিয়া রাখা দরকার যে মানুষেতর প্রাণীর vulgarityর প্রশ্নই ওঠে না, পাথরের অন্ধত্ব সম্বন্ধে যেমন প্রশ্ন ওঠে না।)

Vulgarity আমাদের মজ্জাগত, মজ্জা যতদিন থাকিবে vulgarityও ততদিন থাকিবে, ইহাতে লজ্জা পাইবার কিছু নাই, বন্ধু ধনপতির ইহাই অভিমত। এ সম্বন্ধে কবি Alter Baxtonএর "Vulgarity" কবিতা হইতেও নিম্নে খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি। Vulgarity নিজেই মানুষকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে:

"Bow down your head, you fool!
That's not the way to look at me—
I am vulgarity,
Born with the first man
To live so long as man lives.
God took a pinch of dust,
Charged it with his magic breath.
And hey presto!—
There stood Adam,
The first of men.
God smiled on Adam
And on Me in Adam;
The Magician with His magic eyes
Saw the endless future at a glance.
He saw Adam's descendants
Descending, descending, desending
Age after age.
Generation after generation,
Passing on the lamp of life
In an endless relay,—
And passing Me on too
With the lamp of life.
Adam went back to dust
Centuries and centuries ago,
But I, Vulgarity, born with Adam,
Am living still!
Between the world's first-born
And the latest born
I am the link."

বিদ্যাপতি 'ভাল্‌গারিটি' (Vulgarity) কথাটার তর্জমা করিতে পারে নাই বলিয়া এই কথাটা তর্জমা না করিয়াই ইংরাজী কবিতা নির্ম্মলাখিতভাবে বাঙলায় রূপান্তরিত করিয়াছেঃ

"মূর্খ, মাথা নোয়াও।
অমন করে' আমার দিকে তাকিও না—
আমি ভাল্‌গারিটি,
জন্মেছি প্রথম মানুষের সঙ্গে,
কিন্তু বেঁচে থাক্‌বো চিরদিন,
যতদিন না মানুষ নিঃশেষে মরে' যায়।
ভগবান নিলেন এক খামচা ধুলি,
দিলেন তাতে ফুঁ,
অম্নি যাদুমন্ত্রে সৃষ্ট হ'লো আদম,
পৃথিবীর প্রথম মানুষ।
ভগবান হাস্‌লেন আদমকে দেখে,
আর আদমের মধ্যে আমায় দেখে।
যাদুকর তার যাদুভরা চোখ দিয়ে
অনন্ত ভবিষ্যৎ দেখ্‌লেন এক চাহনিতে।
দেখ্‌লেন আদমের বংশধরেরা
যুগ থেকে যুগান্তরে,
পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে
জীবন-প্রদীপ হস্তান্তরিত করে যাচ্ছে
অন্তহীন জীবন-যাত্রার পথে—
প্রদীপের সঙ্গেই রেখে যাচ্ছে
আমাকেও।
আদম ধুলোতেই আবার মিশিয়ে গেছে
বহু বহু বহু শতাব্দী আগে,
কিন্তু আমি, ভাল্‌গারিটি,
জন্মেছিলাম আদমের সঙ্গে,
বেঁচে আছি আজও।
পৃথিবীর প্রথম মানুষ
আর পৃথিবীর শেষ মানুষের সঙ্গে
আমিই হচ্ছি যোগসূত্র।"

বিদ্যাপতি যে Baxton-এর কবিতার শুধু তর্জমাই করিয়াছে তাহা নহে, Baxton-এর কবিতায় যে মতটি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সহিত তাহার নিজের মতও মিলিয়া গিয়াছে।

ধনপতি পাগল মানুষ, কবিতা টবিতার সে ধার ধারে না। সে কহিল "বসনের তলায় যেমন সবাই নগ্ন, তেমনি কালচার, ভদ্রতা ইত্যাদির তলায় আমরা সবাই ভালগার। কাপড় চোপড় হচ্ছে দেহের ওপর আলগা খোলস মাত্র, খোলস বদলে গেলেও দেহ দেহই থেকে যায়। তেম্নি কালচার ফালচার সবই বদলায় রে ভাই, বদলায় না শুধু ভালগারিটি। ওটা থেকেই যায়, আর সর্বদাই আত্মপ্রকাশের সুযোগ খোঁজে। আমাদের সামাজিক ভদ্রতা, মার্জিত রুচি টুচি কি জানো? ওরা হচ্ছে শুধু আমাদের ভালগারিটিটাকেই কাপড়চোপড় চাপা দিয়ে রাখা। মানুষের ডেফিনিশান (deffnition) আমরা লজিকে পড়ে এসেছি Man is a rational animal, অর্থাৎ মানুষ হচ্ছে বিবেচনাশীল প্রাণী। আমার তো মনে হয় মানুষের সব চেয়ে ভালো ডেফিনিশান হচ্ছে Man is a vulgar animal, মানুষ একটি ভালগার প্রাণী। কি বলো তোমরা?"

আমরা বলিলাম যে এ বিষয়ে আমরা তাহার সহিত একমত।

ধনপতি কহিল "এবার তাহলে ভাল-গারিটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যাক। অর্থাৎ বুঝে দেখা যাক ভালগারিটি জিনিসটা কি। এটা আগে ঠিক করে না নিয়ে এলোমেলো আলোচনা চালালে কোথায় কোন অজায়গায় গিয়ে ঠেকবো তার ঠিক নেই।"

বিদ্যাপতি কহিল "তা ছাড়া কথাটার একটা বাঙলা পরিভাষা ঠিক করা যায় কিনা সেটাও একটু চেষ্টা করে দেখতে হবে।"

ধনপতি কহিল "ভালগারিটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটা পরিভাষা হয় তো বেরিয়ে পড়তেও পারে। দেখাই যাক না।" বলিয়া ধনপতি চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। লম্বা বক্তৃতা শুরু করিবার পূর্বে ধনপতি প্রায়ই এভাবে চুপ করিয়া ভাবে।

আমরাও কিছু না বলিয়া ধনপতির মুখের পানে তাকাইয়া চুপ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।



খেলার আরো ফল

—কালীপদ চট্টোপাধ্যায়—

সত্যমিথ্যা জানি না,—শুনিয়াছি, মোহনবাগান শীল্ড পাইতে পারে নাই বলিয়া অথবা অন্য কথায় ইস্টবেংগল শীল্ড পাইতে পারিয়াছে বলিয়া কোন এক তরুণ নাকি অসহনীয় দুঃখে মরিয়াই গিয়াছে। ছোঁড়া নাকি বিবাহিত ছিল না, সুতরাং মরিয়া সে বাঁচিয়াছে, বাঁচাইয়াছেও। কিন্তু আমাদের চোখের উপর শম্ভু আর নন্দ এ কি করিল? মরিলে তাহারা বাঁচিত, আমরাও বাঁচিতাম, কিন্তু না মরিয়া এ তাহারা কি হইল?



আত্মদেহে তৈল মর্দন করিতেছিলাম

বাঙলার (শহরতলী সমেত কলিকাতার) ইতিহাসে সদ্য বিখ্যাত ৯ অগাস্টের সকালবেলা অফিস যাত্রার উদ্যোগে তাম্র দেহে তৈলমর্দন করিতেছিলাম—মনের সুখে একটু প্রবলভাবেই করিতেছিলাম, কেননা সেদিনকার খেলা দেখিবার একখানা তিন টাকার টিকেট আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। এমন অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছে যে দেহের মালিক সে দেহে তৈলমর্দনে সুখ আছে।

হঠাৎ একটু বেগেই শম্ভু প্রবেশ করিল। তাহার চোখ বসিয়া গিয়াছে, চুল আলুথালু, বেশ এলোমেলো, চলন টলমল, কাল সারারাত নিশ্চয়ই ঘুম হয় নাই, দেখিয়া আঁতকিয়া উঠিলাম। তাহার বধূটি রোগে ভুগিতেছিল। তবে কি...!

শম্ভু আমার হাতখানি জড়াইয়া ধরিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'টিকিট পেলাম না দাদা!'

শক্ত হইয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম, 'অনেকেই পারেনি।'

বিগলিত কণ্ঠে কহিল, 'তুমি তো একখানা পেয়েছ, দাদা!'

রূঢ়কণ্ঠে বলিলাম, 'হ্যাঁ, একখানাই পেয়েছি।'

ফস্ করিয়া পকেট হইতে এক দশ টাকার নোট বাহির করিয়া সামনে মেলিয়া ধরিল। ইচ্ছা হইল ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিই। ভাব দেখিয়া সে আরেক খানা দশ টাকা বাহির করিল। পরুষকণ্ঠে নির্দেশ দিলাম, 'বেরিয়ে যাও তুমি।'

অকস্মাৎ ভূপাতিত হইয়া সে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। পা ছাড়াইতে গিয়া যে কসরত আমাকে করিতে হইল এবং পা জড়াইয়া থাকিবার জন্য যে কসরত সে করিল, উভয়ের সেই ঘোরতর প্রচেষ্টাকে কুস্তি-লড়া ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে! জয়লাভ করিয়া তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলাম। সে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়াই আরো একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল—'দশ গুণ দিচ্ছি দাদা ,তিন টাকার জিনিস তিরিশ—'

দড়াম করিয়া তাহার নাকের উপর দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। শব্দে বুঝিলাম, সে চলিয়া গেল। ভাবিলাম, আপদ গেল।

স্নান করিয়া খাইয়া-দাইয়া অফিসের উদ্দেশে বাহির হইয়াছি, পথে আবার আক্রমণ করিল। তাহার হাতে তাহার স্ত্রীর গলার হার। কিছু বলিতে দিলাম না, তীব্র ভাষায় তাহাকে অনর্গল বকিলাম। দম ফুরাইলে প্রশ্ন করিলাম,—'অফিস যাবে না?'

সে কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, 'বলো দাদা বলো, ভগবান তোমায় রসিকতা করবার দিন দিয়েছেন।'

আমার একটু হতভম্ব হইবার অবকাশে সে কথাটা পাড়িয়া ফেলিল, 'এই হারটা



সে আমার পা জড়াইয়া ধরিল

বাঁধা রেখে দাদা,—কি করব, আমার কাছে আর টাকা নেই।'

হাতখানা ঠেলিয়া দিয়া হন্‌হন্‌ করিয়া চলিয়া আসিলাম। অফিস হইতেই তো খেলা দেখিতে যাইব। যাত্রা পথে এ কি বাধা! মোহনবাগানের জন্য চিন্তিত হইলাম। পিছন হইতে উচ্চস্বরে শম্ভু অভিশাপ দিতে লাগিল, 'যাও যাও, বড় আশায় ছাই পড়বে আজ, বলে দিচ্ছি, ছাই পড়বে; মুখ তোলো হাঁড়ি করে বাড়ি ফিরতে হবে, তোমার পেয়ারের মোহনবাগান—'

কথা শেষ করিতে হইল না, কয়টি তরুণ পথিক তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল



আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "হারিয়ে দিয়ে এলি......?"

এবং চোখের নিমেষে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিল।

সর্বদ্রষ্টা ভগবান মনের কোন পাপের ফলে কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটাইয়া বসিতে পারেন কে জানে, তাই মনে মনে তাঁহাকে উদারতার গান শুনাইতে শুনাইতে চলিলাম, মোহনবাগানই জিতুক আর ইস্টবেংগলই জিতুক, আমার তাতে সমান আনন্দ। দুই পক্ষই যদি আজ জিতিয়া যায় তবেই আমার আনন্দ।

কিন্তু মোহনবাগানের অকল্যাণ ডাকিতে শম্ভু পারিল কি করিয়া! টিকেট না পাইয়া কি ছোঁড়ার মাথা বিগড়াইয়া গিয়াছে?

খেলা শেষে সন্ধ্যাবেলা মুখ তোলো হাঁড়ি' করিয়াই ফিরিলাম। অনেকের মতো মনে করিয়াছিলাম, ফিরিব না; শেষে হুঁশ হইয়াছে, পথে পথে ঘুরিয়া কি গাড়ি চাপা পড়িব?

পাড়ায় প্রবেশ করিয়াই দূর হইতে দেখিলাম, এক বাড়ির রকের উপর শম্ভু বসিয়া আছে। তাহার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সারাদিন বোধ হয় কিছু খায় নাই, গায়ের কাপড়-গেঞ্জি বিশ্রী রকম ময়লা হইয়াছে, মাথার লম্বা চুলগুলি রুক্ষ হইয়া কপালের উপর চোখের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আমার বুক কাঁপিয়া উঠিল, হতভাগার মনে দুঃখ দিয়াছি বলিয়াই কি তাহার অনিচ্ছার অভিশাপ ফলিয়া গেল! টিকেটখানা তাহাকে দিলেই হইত।

আমাকে দেখিয়া সে টলিতে টলিতে উঠিয়া আসিল, উদাস দৃষ্টিতে চিঁ চিঁ করিয়া বলিল, 'টিকিটটা দিলে, দাদা'?

টিকিট দিব কি? বলিলাম, 'এখন আর টিকিট কি হবে'?

আমার চোখের দিকে দৃষ্টিটা স্থাপিত করিয়া বলিল, 'খেলা হয়ে গেছে?'

পরুষকণ্ঠে বলিলাম, 'হ্যাঁ হয়ে গেছে, তুমি শুনলে সুখী হবে যে তোমার অভিশাপ ফলেছে, মোহনবাগান এক গোলে হেরে গেছে।'

বুকফাটা একটা আর্তনাদ ছাড়িয়া সে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া আর্তস্বরে কহিল, 'হারিয়ে দিয়ে এলি?'

'ও—হো—হো—হো—হো—' করিয়া আর একটা আর্তনাদ ছাড়িল। তাহার পরই আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে কি কান্না! চোখের জলে আর ঘামে আমাকে ভিজাইয়া দিল।

কোনো রকমে অব্যাহতি পাইয়া ঘরে ফিরিলাম।

কিছুক্ষণ পরে রাস্তায় কোলাহল শুনিয়া সেদিকে গেলাম। দেখিলাম, লোক জড়ো হইয়া গিয়াছে। শম্ভু যাহাকে পাইতেছে তাহারই গলা জড়াইয়া ধরিয়া আর্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিতেছে, 'ওরে হারিয়ে দিয়ে এলি?' তারপরেই তাহার বক্ষলগ্ন হইয়া 'ও-হো-হো' করিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। আক্রান্ত ব্যক্তি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে। যত চ্যাংড়ার দল রাস্তায় জড়ো হইয়া হাততালি দিয়া কোলাহল করিতেছে।

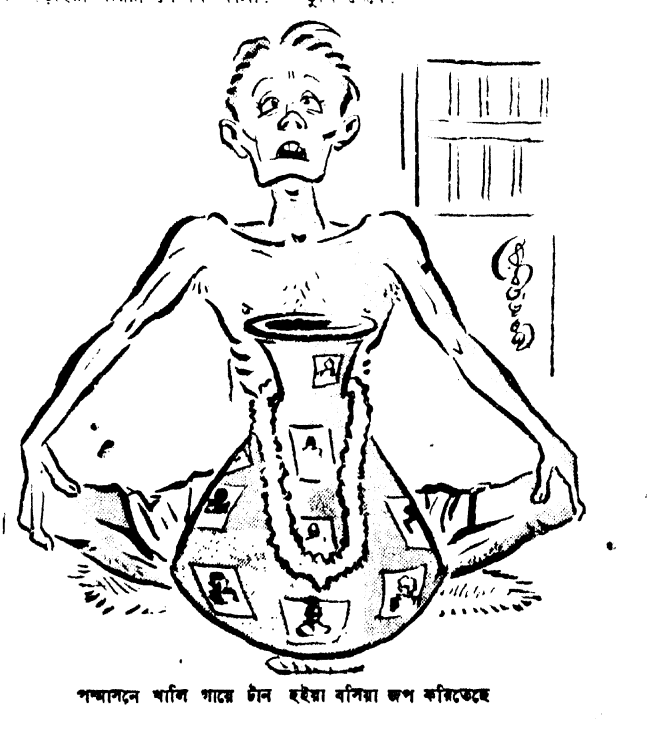
সেদিকে গেলাম না, পাছে শম্ভু আমাকে পুনরায় জড়াইয়া ধরে।

নন্দর ব্যাপার অন্যরকম।

যে টিকেট দিয়া আমি খেলা দেখিয়াছি, সেটি নন্দের নিকট হইতেই কিনিয়াছি। নন্দ আমাদের মেসেই থাকে। আগের দিন অফিস ফেরত দুজনে এক সংগেই বাসায় পদার্পণ করি। চিঠির বাক্সে তাহার একখানা চিঠি ছিল। তাহা নিয়া সে পড়িতে পড়িতে উপরে আসিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'বাড়ির চিঠি বুঝি? কি খবর? ভালো তো সব?'

বলিল, 'উঁহুঃ, ছেলেটার টাইফয়েড।'

রাত্রে নন্দ আমার ঘরে আসিয়া চুপি চুপি বলিল, 'আমি একটা টিকিট পেয়েছি দাদা, তুমি নেবে?'



পদ্মাসনে খালি গায়ে টান হইয়া বসিয়া জপ করিতেছে

তৎক্ষণাৎ টাকা বাহির করিয়া কিনিয়া ফেলিলাম। নন্দ একটি পয়সাও বেশী দাবী করিল না, তিন টাকার টিকেট তিন টাকাতেই দিল, সেল্‌ট্যাক্স পর্যন্ত নিল না। বলিলাম, 'তুমি খেলা দেখবে না?'

'নাঃ' বলিয়া চলিয়া গেল। ভাবিলাম, তাহার ছেলের বোধ হয় অসুখ বেশী।

শেষ রাত্রে ঘুম ভাঙিতে বাহির হইয়া দেখিলাম নন্দর ঘরে আলো জ্বলিতেছে। রুদ্ধ জানালার ফাঁক দিয়া চাহিয়া দেখিলাম, মেজেতে টান হইয়া পদ্মাসনে বসিয়া হাতে পৈতা জড়াইয়া নন্দ চোখ বুজিয়া বসিয়া আছে, ওষ্ঠাধর মাঝে মাঝে ঈষৎ নড়িতেছে, জপ করিতেছে বলিয়া মনে হইল। কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে দেখি, খালি গায়ে চাদর জড়াইয়া গামছা বাঁধা একটা পুঁটুলি-বগলে সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণটির মতো নন্দ বাহির হইয়া যাইতেছে। প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, কালীঘাটে চলিয়াছে। বলিলাম, 'ছেলের অসুখ বেশী বুঝি?'

বলিল, 'হ্যাত্তের ছেলে, আগে তো ইস্টবেঙ্গলকে বাঁচাই'।

হন্‌হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল। আমি হাঁ করিয়া রহিলাম।

সকালে খাইতে যাইবার সময় দেখি, সে ফিরিয়া আসিয়াছে। অফিস যাইবার সময় জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, একটি মেটে কলসীর গায়ে খবরের কাগজ হইতে কাটা ইস্টবেঙ্গলের বহু খেলোয়াড়ের ছোট ছোট ছবি আঁটা, তাহার গায়ে সিঁদুরের লক্ষ্মী মূর্তিও অঙ্কিত হইয়াছে, মুখে আম্রপল্লবও রহিয়াছে, গলায় পুষ্পমাল্যের বেষ্টনী। তাহার সম্মুখে কুশাসনে নিমীলিত নেত্রে পদ্মাসনে খালি গায়ে টান হইয়া বসিয়া নন্দ সেই জপ করিতেছে।

সন্ধ্যাবেলা সর্বপ্রথম আমিই খেলার খবর লইয়া ফিরিয়াছি। রাস্তায় শম্ভুর আলিঙ্গন হইতে ছাড়া পাইয়া মেসে ফিরিয়া দেখি, নন্দ তখনো সেইভাবে কাঠ হইয়া বসিয়া আছে। ঠাকুর বলিল, সারাদিন নাকি জল গ্রহণও করে নাই। নাম ধরিয়া ডাকিতে নন্দ চোখ মেলিয়া চাহিল। বলিলাম, 'ওঠ এবার, তোর উইলফোর্স সার্থক হয়েছে, ইস্টবেঙ্গল এক গোলে জিতেছে'।

এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইয়া নন্দ তাহার কণ্ঠের সর্বসামর্থ্যে এক হুঙ্কার ছাড়িল, 'কালী মায়ী কি জয়! জিতা দিয়া!'

ব্যস, সেই শুরু হইল। ঘটের গলার ফুলমালা ছিঁড়িয়া ফুল ছিঁড়িয়া ফুলের পাপড়ি ছড়াইয়া ঊর্ধ্বনৃত্য করিয়া সে মুহুর্মুহু হুঙ্কার ছাড়িয়া চলিয়াছে, 'কালী মায়ী কি জয়! জিতা দিয়া!'

রহিয়া-রহিয়াই মেসবাসীদের দুর্বল হৃদযন্ত্র চমকাইয়া দিয়া সে হুঙ্কার ছাড়িতেছে। গলা ধরিয়া গিয়াছে, তথাপি থাকিয়া থাকিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। কাহারো তোয়াক্কা রাখিতেছে না। চিৎকারের সাথে মাঝে মাঝে উল্লম্ফনও করিতেছে।

কদিন তো চলিয়া গেল, দিনে দিনে অবস্থা খারাপ হইয়াই চলিয়াছে। শম্ভু রাস্তার ইতরভদ্র সকলেরই গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে, 'ওরে, হারিয়ে দিয়ে এলি'? একবার আক্রান্ত লোক দ্বিতীয়বার আর এ পাড়ার পথে চলিতেছে না।

নন্দ রহিয়া রহিয়াই হাঁকিয়া উঠিতেছে, 'কালী মায়ী কি জয়! জিতা দিয়া?' মেসের লোককে, পাড়ার লোককে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। দুইজনেরই নাওয়া নাই। খাওয়া নাই, কী যে চেহারা হইয়াছে!

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাকিয়াছিলাম। উভয়কেই পরীক্ষা করিয়া ভিজিটের টাকা গুণিয়া লইয়া তিনি মুখ বেঁকাইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাঙলার সমস্যার আলোচনা করিয়া বাঙলার গভর্নর মিস্টার কেসি পূর্ণকাম হইতে পারেন নাই এবং ঢাকায় যাইয়া তথায় এক বেতার বক্তৃতায় পূর্ববঙ্গের কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সেই বক্তৃতায় বলিয়াছেন—তিনি বাঙলার গভর্নর হইয়া আসিবার পূর্বে পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে শুনিয়াছিলেন—পূর্ববঙ্গ 'সমস্যা অঞ্চল'—ইহার খাদ্যদ্রব্য অধিবাসীদিগের পক্ষে যথেষ্ট নহে। ইহার পথঘাট ভাল নহে—ইহা সাম্প্রদায়িকতার প্রবল ক্ষেত্র। কিন্তু তিনি আসিয়া দেখিতেছেন—ইহা বিপুল-তোয়া নদীর জলে স্নিগ্ধ ও সরস; ইহার ভূমি পশ্চিমবঙ্গের ভূমির তুলনায় অধিক উর্বর এবং ইহার অধিবাসীরা অধিক শক্তিশালী ও সাহসী। আর পূর্ববঙ্গ বাঙলায় ইসলামের প্রবল কেন্দ্র—তবে ইহাতে উচ্চাঙ্গের হিন্দু সংস্কৃতি পরিব্যাপ্ত।

তিনি কোথায় পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ধারণা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে সে ধারণা যে সত্য নহে, তাহাতেই বুঝা যায় বিদেশীদিগের সব বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নহে।

পূর্ববঙ্গের খাদ্যদ্রব্যাভাবের কারণ তিনি নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত অধিক পাটের চাষ হয়। পাট-চাষের পরিমাণ কমাইয়া বাঙলায় ধান্যের চাষ বৃদ্ধির প্রয়োজন সম্বন্ধে মিস্টার কেসি কোন কথা বলেন নাই। পাট বিক্রয় করিয়া বাঙলা অর্থ লাভ করে সত্য, কিন্তু পাট-চাষের বৃদ্ধিতে যখন খাদ্যশস্য সম্বন্ধে বাঙলার স্বাবলম্বিতার অবসান ঘটে, তখন সে অবস্থা বাঞ্ছনীয় কি না, তাহা গত দুর্ভিক্ষের পরে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যুদ্ধের পরে আবার ব্রহ্ম হইতে চাউল আসিবে এবং তাহাতেই বাঙলার অভাব দূর হইবে, ইহা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে। কারণ, জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্বেও আংশিক স্বায়ত্তশাসন পাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ব্রহ্ম আকিয়াব হইতে চট্টগ্রামে চাউল প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়া ছিল। ভবিষ্যতে কি হইবে বা হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু যুদ্ধ যে আবার হইতে পারিবে না—এমনও বলা যায় না। কাজেই অন্ন সম্বন্ধে বাঙলাকে স্বাবলম্বী করিবার চেষ্টা সর্বদা সমর্থন-যোগ্য বলিয়া মনে করা যায়।

পূর্ববঙ্গের পথঘাট ভাল নহে। মিস্টার কেসি বলিয়াছেন, যুদ্ধের পরে কলিকাতা হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি ও কলিকাতা হইতে আসাম পর্যন্ত আর একটি পথ রচিত হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে কি জিজ্ঞাসা করা অসঙ্গত—কেন এতদিন তাহা হয় নাই? কিন্তু এই দুটি পথ রচিত হইলেই কি পূর্ববঙ্গের পথের সমস্যার সমাধান হইবে? যাহাকে "ফিডার রোড" অর্থাৎ শাখা পথ বলা হয়—সে সকল কি সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্তুত করা হইবে না? পূর্ববঙ্গের জল-পথের অবনতিরোধের কি উপায় হইবে? যে সকল ব্যবস্থাকারী কচুরী পানা নিবারণের উপায়ও করিতে পারেন নাই, তাঁহারা বা তাঁহাদিগের পরবর্তীরা জল-পথের অবনতিরোধ কি উপায়ে করিবেন?

মিস্টার কেসি পূর্ববঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার কারণ তিনি সামান্য চেষ্টায় জানিতে ও বুঝিতে পারিবেন।

লর্ড মর্লির সময়ে বঙ্গ বিভাগ উপলক্ষ করিয়া প্রবল আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে স্যার হেনরী কটন—তাঁহার দীর্ঘকালের ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি স্নিগ্ধ অভিজ্ঞতায় লিখিয়াছিলেনঃ—

"পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা প্রায় সকলেই নিম্ন বর্ণের বা আদিম সম্প্রদায়ের হিন্দু-দিগের বংশীয়। তাহাদিগের পূর্বপুরুষরা বহুদিন পূর্বে সামাজিক উন্নতি লাভের আশায় বা বাধ্য হইয়া মুসলমান হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ে বিবাদের কোন কারণ ছিল না। সরল কৃষকরূপে তাহারা নির্বিবাদে প্রতিবেশীরূপে—একই ভাষা ব্যবহার করিয়া বাস করিত। (বঙ্গ-বিভাগ উপলক্ষ করিয়া) ইতিহাসে প্রথম ধর্মগত বিবাদের সৃষ্টি করা হইল। প্রথম শাসক সম্প্রদায়ে নীতি প্রবর্তিত হইল—ভেদ সাধন করিয়া শাসন করিতে হইবে! মুসলমানদিগকে আশ্বাস দেওয়া হইল, বাঙলায় মুসলমান রাজা বা শাসকদিগের তিরোভাবের পরে তাহারা আর যে ঐক্য সম্ভোগ করিতে পারে নাই—বঙ্গ বিভাগের ফলে সেই ঐক্য লাভ করিবে। সরকারী কর্মচারীরা সর্বপ্রকারে মুসলমানদিগকে অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই মনোভাব কতকটা হীনভাবে প্রকাশ করিবার জন্য পূর্ববঙ্গ প্রদেশের ছোট লাট স্যার ব্যামফাইল্ড ফুলার বলিলেন। — মুসলমানেরা তাঁহার 'প্রিয় পত্নী'। একজন জেলা জজ বিচারে যে সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, হাইকোর্ট সেজন্য তাঁহাকে নিন্দা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতি লোক ঢাকা হইতে গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইয়া প্রচার করিতে লাগিল—ইসলামের পুনরাগমন হইয়াছে। ঐ সকল লোক উৎকট উগ্র ব্যবহার করিতে বলিতে লাগিল—বলিতে লাগিল, বৃটিশ সরকার তাহাদিগের পক্ষে এবং হিন্দু-দিগের প্রতি অত্যাচার করিলে অপরাধীর কোন দণ্ড হইবে না। এই ভয়াবহ প্রচার কার্য নিবারণ করিবার জন্য সরকারের কর্ম-চারীরা কিছুই করিলেন না। ফলে দাঙ্গা আরম্ভ হইল, নরহত্যা হইতে লাগিল, হিন্দুদিগের দোকান লুণ্ঠ হইতে লাগিল, হিন্দুদিগের দেবস্থান কলুষিত হইতে ও হিন্দু নারীরা অপহৃতা হইতে লাগিলেন। কোন কোন সহর হইতে লোক পলাইল—নারীরা রাত্রিকালে পুষ্করিণীর জলে আত্ম-গোপন করিয়া রক্ষা পাইলেন—গ্রামসমূহে ভীতির ছায়া পড়িল। সরকার পক্ষ হইতে বলা হইল, বিদেশী পণ্য বর্জনের জন্যই হাঙ্গামার উদ্ভব হইল। কিন্তু ইহার মূলে সত্য ছিল না। হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে যে বিরোধ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা যে সকল স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সেই সকল স্থান পূর্বোক্ত প্রচারকারী-দিগের প্রচারফলে বিষাক্ত হইয়াছিল। বিচারকদিগের অনুসন্ধান ফলে প্রমাণিত হইয়াছিল—হিন্দুদিগকে পীড়িত করাই লুণ্ঠনের উদ্দেশ্য ছিল—বিদেশী পণ্য বর্জনের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। তথাপি যে পার্লামেন্টে দাঁড়াইয়া ভারত-সচিব লর্ড মর্লি বলিয়াছিলেন, বলপ্রয়োগে মুসলমানদিগকে বিদেশী পণ্য বর্জনে বাধ্য করাইবার চেষ্টায় পূর্ববঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের অবস্থা তিক্ত হইয়াছিল!—তাহাতেই বুঝা যায় নিম্নস্থ কর্মচারীরা অনেক সময় উপরওয়ালাদিগকে ভুল সংবাদ দিয়া বিভ্রান্ত করেন।"

পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা অধিকাংশই যে, হিন্দুদিগের বংশধর, তাহাতেই তথায় মুসলমানদিগের মধ্যেও হিন্দু সংস্কৃতির ব্যাপ্তির কারণ বুঝিতে পারা যায়। তাহার অন্য কারণও যে নাই, এমন নহে। তবে সে সকল প্রধান নহে।

হিন্দু মুসলমানে বিরোধের সৃষ্টি কাহা-দিগের চেষ্টায় কিরূপে হইয়াছে, তাহা স্যার হেনরী কটনের পূর্বোদ্ধৃত উক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়। স্যার হেনরী বঙ্গদেশে

চাকরীতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

ঢাকায় যে সকল দাঙ্গা হইয়াছে সে সকলের কারণ সহজেই বুঝিতে পারা যায়। আমরা কি মিস্টার কেসিকে ঢাকা হাঙ্গামা কমিটির রিপোর্ট মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করিতে পারি।

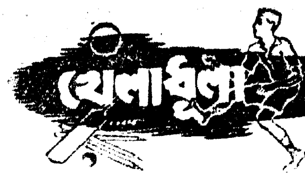
বাস্তবিক পূর্ববঙ্গের সমস্যা সমগ্র বাঙলার সমস্যারই অন্তর্ভুক্ত এবং 'পাকিস্থান' যদি ইংরেজ শাসকদিগের অবলম্বিত নীতির ফলে কায়েম না হয়, তবে তাহাই থাকিবে। যতদিন সেই অবাঞ্ছিত ব্যবস্থা প্রবর্তিত না হয়, ততদিন পূর্ববঙ্গের সমস্যা বাঙলার সমস্যার অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিবেচনা করিলেই অধিক ফলপ্রদ হইবার সম্ভাবনা।

পূর্ববঙ্গে—ঢাকার পুলিশ প্যারেডে মিঃ কেসি মুনাফাকারী ও সঞ্চয়কারীদিগকে সমাজের রক্তশোষক বলিয়া যে নিন্দা করিয়াছেন, সকলেই সে বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত। কিন্তু ঢাকায় পুলিশ প্যারেডের প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন। কারণ, ইহাতেই লর্ড লিটন বলিয়াছিলেন, এদেশে লোক পুলিশ বিদ্বেষ হেতু সময় সময় পুলিশের অনাচার সম্বন্ধে আপনাদিগের আত্মীয়াদিগের দ্বারা অনাচারের অভিযোগ উপস্থাপিত করাইতেও দ্বিধানুভব করে না! ঐরূপ অসতর্ক উক্তির পর তাঁহাকে বিশেষ বিব্রত হইতে হইয়াছিল।

মিঃ কেসীর উক্তি অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কিন্তু লোক যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, সরকারের পক্ষে কার্য পরিচালনাকালে যাহারা ঐ নিন্দনীয় কার্য করিয়াছে, তাহাদিগের সম্বন্ধে তিনি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তিনি নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট পাঠ করিয়াছেন এবং তিনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিতেছেন, নানাস্থানে সরকারী গুদাম হইতে এখনও পচা আটা—বোটানিক্যাল গার্ডেন্সে পচা চাউলের মত—বাহির হইতেছে। যে সময় লোক অনাহারে মরিতেছিল, সেই সময়ে যাহারা ঐভাবে মজুদ মাল পচাইয়াছে, তাহারা কি বহু নিবার্য মৃত্যুর জন্য দায়ী বলা যায় না? যে সকল সচিব বাঙলার নিরন্নদিগের জন্য খাদ্য-শস্যাদি ক্রয়েও এক কোটির অধিক টাকা সরকারের হিসাবে লাভ করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই, তিনি কি তাঁহাদিগকে সমাজের শত্রু বলিয়া পদচ্যুত করিয়াছিলেন? তাঁহারা যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবহেতু চাকরীর বণ্টন করিতে করিতে বিলম্ব ঘটাইয়া লোকের দুর্দশা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাহাও কমিশন বলিয়াছেন। অথচ ব্যবস্থা পরিষদের অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবে পদত্যাগে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত মিস্টার কেসী তাঁহাদিগকেই কার্যভার দিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কি এখনও সচিবের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট গৃহে বাস করিতেছেন?

কমিশন বলিয়াছেন—দেশবাসীর সহযোগই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সেই সহযোগ আকৃষ্ট করিবার কার্যে কি আমরা মিস্টার কেসীকে আগ্রহান্বিত দেখিতে পাইব?



আই এফ এ শীল্ড

আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতা শেষ হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের এই সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ইস্টবেঙ্গল দল বিজয়ীর সম্মানলাভ করিয়াছে। ফাইনাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগান দল নৈরাশ্যজনক ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া এক গোলে পরাজয় স্বীকার করে। দুইটি জনপ্রিয় দলের খেলা দেখিবার জন্য মাঠে অভূতপূর্ব দর্শক সমাগম হয়; কিন্তু খেলাটি উচ্চাঙ্গের না হওয়ায় সকলেই হতাশ হইয়াছেন। সকলেরই বড় আশা ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা দেখিবেন। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলার এই পরিণতি কেন হইল কেহই বুঝিতে পারিল না।

ইস্টবেঙ্গল দল এইবার লইয়া দুইবার শীল্ড বিজয়ীর সম্মান পাইল। ১৯৪৩ সালে সর্বপ্রথম এই গৌরবলাভে সমর্থ হয়। মাত্র এক বৎসর পরে তাহারা সে অর্জিত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইল, ইহা খুবই প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। তবে এখনও পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল যে মহমেডান স্পোর্টিং দলের রেকর্ড অতিক্রম করিতে পারে নাই ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৩৬ সালে প্রথম শীল্ড বিজয়ী হয়। ইহার পর ১৯৪১ সাল ও ১৯৪২ সালে পর পর দুই বৎসর শীল্ড প্রতিযোগিতার ফাইনালে সাফল্যলাভ করে। ভারতীয় দলের মধ্যে অপর কেহ দুইবার শীল্ড পায় নাই, সেই হিসাবে ইস্টবেঙ্গল দলের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

ইস্টবেঙ্গল দলের সাফল্যে ভারতীয় দলের গৌরব বৃদ্ধি পাইলেও বাঙালী খেলোয়াড়দের উল্লাস করিবার কোন কারণ নাই। ইহার সাফল্যলাভ সম্পূর্ণ বাঙালী খেলোয়াড়গণ দ্বারা সম্ভব হয় নাই। অনেক অবাঙালী খেলোয়াড় এই দলকে সাহায্য করিয়াছেন। এমনকি এই অবাঙালী খেলোয়াড়গণের জন্যই যে ইস্টবেঙ্গল দল শীল্ড বিজয়ী হইয়াছে ইহা বলিলে কোনরূপ অন্যায় বলা হইবে না। শীল্ড প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলার ফলাফল দেখিলেই ইহা বিশেষভাবে প্রতীয়মান হইবে। নিম্নে ইস্টবেঙ্গল দল কিভাবে শীল্ড বিজয়ী হইল তাহার তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

প্রথম খেলা

ইস্টবেঙ্গল (২) বরিশাল এফ সি (০)
(পাগসলে, আপ্পারাও)

দ্বিতীয় খেলা

ইস্টবেঙ্গল (২) হায়দরাবাদ পুলিশ (০)
(সুনীল ঘোষ ২)

তৃতীয় খেলা

ইস্টবেঙ্গল (৩) বগুড়া টাউন (১)
(আপ্পারাও ২, সুনীল ঘোষ ১) (আর চৌধুরী)

সেমি ফাইনাল

ইস্টবেঙ্গল (২) কালীঘাট (১)
(আপ্পারাও ও সুনীল ঘোষ) (বি দাসগুপ্ত)

ফাইনাল খেলা

ইস্টবেঙ্গল (১) মোহনবাগান (০)
(পাগসলে)

উল্লেখযোগ্য ঘটনা

এই বৎসরের আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইতেছে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান উভয় দলের খেলোয়াড়গণের খেলার পূর্বে "মুক্তি সপ্তাহ" উপলক্ষে সম্মান প্রদর্শন। ইতিপূর্বে কলিকাতার মাঠে কোনদিন কোন খেলার পূর্বে এইরূপভাবে জাতীয় দিবসে উভয় দলের খেলোয়াড়গণকে দুই মিনিট মৌন অবলম্বন করিতে দেখা যায় নাই। আই এফ এ শীল্ডের পরিচালকমণ্ডলীর অনেকেই ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন শোনা যায়; কিন্তু আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। কাহার প্রচেষ্টায় ইহা সম্ভব হইয়াছে জানি না, তবে যিনিই করিয়া থাকুন, তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা যে করিয়াছিলেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। খেলার মাঠ রাজনীতির স্থান নহে, ইহা মানিয়া লইলেও খেলোয়াড়গণ জাতির অংশবিশেষ, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন কি? তাহা যদি সত্য হয়, তবে ৯ই আগস্ট যেদিন সমস্ত জাতি মুক্তিকামী সহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছে সেইদিন খেলোয়াড়গণ কিরূপে নীরব থাকিতে পারে? জাতির অংশ হিসাবে তাহাদের যে কর্তব্য তাহাই তাহারা পালন করিয়াছে। যে আদর্শ খেলার মাঠে প্রতিষ্ঠিত হইল আমরা আশা করি এইরূপ প্রয়োজনীয় দিনে কোন খেলোয়াড়ই ইহার অতিক্রম করিবে না।

কলিকাতা ফুটবল লীগ

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ডিভিসনের এখনও সকল খেলা শেষ হয় নাই। খেলা স্থগিত হওয়ার দরুণ ভিড়িক লাগিয়াছে তাহাতে ইহা কবে শেষ হইবে বলা কঠিন। আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলীর যে সুনাম হইতে [illegible] আর নাই বলাই বাহুল্য। অনেকেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন "এইরূপ দায়িত্বজ্ঞানহীনদের দূর করিতে না পারিলে আর চলিতেছে না।" কেহ কেহ বলিতেছেন, "এই ছেলেখেলার অর্থ কি?" কেহ কেহ আবার বেশ একটু রসিকতা করিয়াই বলিতেছেন "যাহা হউক এইবারে আই এফ এর পরিচালকমণ্ডলী একটা নূতন রেকর্ড করিলেন। ইতিপূর্বে কখনও শীল্ড খেলার শেষে লীগ খেলা চলিতে দেখা যায় নাই—এইবারই দেখা গেল।" এই সকল উক্তি হইতে বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে, ক্রীড়ামোদিগণ রীতিমত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভবিষ্যতে এইরূপ প্রহসনের অবতারণা যাহাতে না হয় তাহার দিকে কর্তৃপক্ষগণ দৃষ্টি রাখিলে আমরা সন্তুষ্ট হইব।

লীগের সকল খেলা শেষ না হইলেও প্রথম ডিভিসন লীগ চ্যাম্পিয়ান নির্ধারিত হইয়াছে। ইস্টবেঙ্গল দল এই সৌভাগ্যলাভে সক্ষম হইয়াছে। মোহনবাগান দল এক পয়েণ্ট পশ্চাতে পড়িয়া রানার্স আপ হইয়াছে। ইস্টবেঙ্গল দল লীগের শেষ খেলায় ভবানীপুর দলকে দুই গোলে পরাজিত করিয়া এই সম্মানলাভ করিয়াছে। এই খেলাটিও দর্শনযোগ্য হয় নাই। ভবানীপুর দলের নিয়মিত অনেক খেলোয়াড় মাঠে সুস্থ দেহে উপস্থিত থাকিয়াও খেলায় যোগদান করেন নাই। কেন করিলেন না বোঝা গেল না। ফলে ইস্টবেঙ্গল দল সহজেই জয়লাভ করিয়া চ্যাম্পিয়ান হইতে পারিয়াছে। এইবার লইয়া ইস্টবেঙ্গল দল দুইবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হইল। ১৯৪২ সালে প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ান হইবার গৌরব অর্জন করে। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইতিপূর্বে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ছয়বার রানার্স আপ হইয়াছে এবং অতি অল্প পয়েণ্টের ব্যবধানে। নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হইলঃ—

সাল	চ্যাম্পিয়ান	পঃ	রাণার্স	পয়েণ্ট
১৯৩২	ডারহাম	২৭	ইস্টবেঙ্গল	২৬
১৯৩৩	ডারহাম	২৬	ইস্টবেঙ্গল	২৫
১৯৩৫	মহঃ স্পোর্টিং	৩০	ইস্টবেঙ্গল	২৯
১৯৩৭	মহঃ স্পোর্টিং	৩৪	ইস্টবেঙ্গল	২৮
১৯৪১	মহঃ স্পোর্টিং	৪৩	ইস্টবেঙ্গল	৪০
১৯৪৩	মোহনবাগান	৩৯	ইস্টবেঙ্গল	৩৬

ইস্টবেঙ্গলের কৃতিত্ব

ইস্টবেঙ্গল দল ১৯৪৫ সালে একই বৎসরে লীগ ও শীল্ড বিজয়ী হইয়া এই বৎসরের কলিকাতার শ্রেষ্ঠ দল বলিয়া পরিগণিত হইল। তবে ভারতীয় দল হিসাবে মহমেডান স্পোর্টিং দল ইতিপূর্বে ১৯৩৬ সাল ও ১৯৪১ সাল, দুই বৎসর এইভাবে লীগ ও শীল্ড বিজয়ী হইয়াছিল।



আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে "মুক্তি সপ্তাহ" উপলক্ষে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড়গণের শ্রদ্ধানিবেদনের দৃশ্য।

নিউ থিয়েটার্সের নূতন সমাজ-চিত্র নিবেদন

দুই-পুরুষ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত



ভূমিকায়ঃ

ছবি, অহীন্দ্র, নরেশ, জহর,
শৈলেন, তুলসী, দেবকুমার,
হরিমোহন

এবং

চন্দ্রা, সুনন্দা, লতিকা,
শুক্তিধারা, রেখা প্রভৃতি

পরিচালক ঃ সুবোধ মিত্র

সঙ্গীত ঃ পংকজ মল্লিক

চিত্রশিল্পী ঃ সুধীন মজুমদার

শব্দযন্ত্রী ঃ লোকেন বসু

একই আদর্শে অনুপ্রাণিত পিতা ও পুত্র—কিন্তু জীবনের চলার পথে পিতার আদর্শ বিচ্যুতিতে পিতা-পুত্রের বিচিত্র সংঘাত!

"দুই-পুরুষ" একদিকে যেমন পরম নাটকীয় সম্পদে পূর্ণ, অন্যদিকে তেমনি অপূর্ব রোমান্স, মধুময় সংগীত ও আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাত পরিপূর্ণ সবাক চিত্র!

শুভ-উদ্বোধন ঃ ৩০এ আগষ্ট

একযোগে

চিত্রা এবং রূপালী

উত্তর ও দক্ষিণ কলিকাতার দুইটি সুখ্যাত সিনেমায় চলিবে।



চলচ্চিত্র ক্ষেত্রেও অবশেষে পাকিস্থান এসে প্রবেশ করল। বম্বের একখানি গুজরাটী পত্রিকার কথা যদি বিশ্বাস করতে হয় তো ব্যাপার এই দাঁড়ায় যে, শালীমার পিকচার্সের ডব্লিউ জেড আহমেদ, প্রযোজক-পরিচালক মজহর খাঁ এবং প্রযোজক-পরিচালক মেহবুব ছাড়া বম্বের বাকি সব মুসলমান প্রযোজকরা এবার থেকে তাঁদের ছবিতে যতদূর সম্ভব মুসলমান শিল্পী ও কলাকুশলী নিযুক্ত করবেন, আর ছবি তুলবেন শুধু ইসলামের গৌরব করতেই। সম্প্রতি ফেমাস ফিল্মসের সিরাজ আলি হাকিমের সর্দারীতে বম্বের মুসলমান চিত্র-প্রযোজকরা এই রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন বলে শোনা গেল। এ ব্যাপারটার ওপরে প্রথমে আমরা মোটেই গুরুত্ব আরোপ করতে চাইনি, কিন্তু এই নিয়ে বম্বে অঞ্চলের পত্র-পত্রিকায় হৈচৈ আরম্ভ হয়ে যাওয়ায় এবং এর কোন প্রতিবাদ না দেখতে পাওয়ায় আমরা এ নিয়ে মন্তব্য করতে প্ররোচিত হয়েছি। বছরখানেক ধরেই চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে পাকিস্থানের মতলবী এক-দল মুসলমান প্রযোজকদের কথা শুনে আসছি, কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার মনে করি নি এই জন্যে যে, চলচ্চিত্র ক্ষেত্রের আবহাওয়া কোন রকম সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা কলুষিত হবার মত নয়। এখন সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেই আবহাওয়াকে সাম্প্রদায়িক বিষে ভরিয়ে তোলার চেষ্টা দেখে কিছু বলতেই হচ্ছে।

ভারতের চিত্রশিল্পের পত্তনকার হচ্ছে হিন্দু; হিন্দুদের দ্বারা পালিত ও পুষ্ট; চিত্রশিল্পে নিয়োজিত অর্থের তিন-চতুর্থাংশ হিন্দুর; চিত্রের নির্মাতা, কলাকুশলী ও শিল্পীর শতকরা আশীজন হিন্দু; আর দর্শকও শতকরা নব্বুভাগই হচ্ছে হিন্দু। মুসলমানরা যোগ দিয়েছে অনেক পরে, তাদের দানও অতি নগণ্য; তাদের মধ্যে গুণী কেউ নেই তা নয়, কিন্তু সামান্য কজন মাত্র। সে কথা যাক, কিন্তু চিত্র-জগতে এমন কি ঘটল যার জন্যে আজ পাকিস্থানী মনোবৃত্তি এমন সজাগ হয়ে উঠল! হিন্দু প্রাধান্য থাকলেও হিন্দুরা আজও তো মুসলমানদের কোন ক্ষতি করেছে বলে কখনও শোনা যায়নি। বরং মুসলমানদের এ জগতে আসন করে দিতে সহায়তাই করেছে, উপরন্তু মুসলমান নিজেদের ধর্মকে প্রচার করার যখনই চেষ্টা করেছে ছবির মধ্যে দিয়ে, সেসব ছবির দর্শক মুখ্যত হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও কেউ কোনদিনই আপত্তি করে নি। তা সত্ত্বেও সেই সব মুসলমানরাই যে আজ কেন এমন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠল, আমাদের তা বোধশক্তির বাইরে। মুসলমানরা আমাদের দেশেরই; এদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে তাদেরও দান আছে, কিন্তু তা এসেছে কালের গতিপথে অবশ্যম্ভাবী রূপ নিয়ে, জোর করে কেউ প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়নি। আজ মুসলমানদের এই প্রচেষ্টা বলা বাহুল্য, কোন পক্ষেরই এতটুকু সহানুভূতি পেতে পারে না। সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে এমনি ধারা ছবি যদি কেউ তুলতে যায়, দেশ তা কিছুতেই বরদাস্ত ক'রবে না। জীবনের অন্যান্য সব ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার বিষ আমাদের অনেকখানি বিপর্যস্ত ক'রে রেখেছে; প্রমোদ ক্ষেত্রেও তার আবির্ভাব যাতে না ঘটতে পারে সে প্রচেষ্টার অংকুরে বিনাশ সাধনে তৎপর হওয়া উচিত।

* * *

সিনেমা টিকিটের চোরাবাজার নিয়ে পত্রপত্রিকায় নতুন করে আলোচনা উঠেছে। আলোচনা তুলেছেন জনসাধারণই কেউ কেউ, যে জনসাধারণের আর সবাইয়েরই পৃষ্ঠপোষকতায় এই চোরাবাজার গজিয়েছে এবং পুষ্ট হচ্ছে। বহু বৎসর ধরে



ফেমাস ফিল্মসের 'ফুল' চিত্রে সিতারা

আমরা এই ব্যবসার দিকে [illegible] এসেছি এবং বন্ধ করে দেওয়ার জন্য শাসন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। শাসকদের আস্কারা পেয়ে আজ টিকিটের [illegible] যে কি পরিমাণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছে নতুন ছবি মুক্তির সময়ে [illegible] চিত্রগৃহের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই [illegible] উপলব্ধি করা যায়। পুলিশ সামনে দাঁড়িয়ে থাকতেও এদের [illegible] থাকে না; আপনার মনে [illegible] পুলিশও এদের অংশীদার [illegible] না হলে গুপ্ত মুনাফাখোরদের [illegible] টেনে বার ক'রে সাজা দেবার এত অভিযান চলেছে আর এমন প্রকাশ্যভাবে লোকগুলো মুনাফা লুটছে দেখেও কেউ কোন ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রছে না! Hoarding ও Profiteering-এর বিরুদ্ধে বিশেষ আইন যখন বর্তমানে বলবৎ রয়েছে তখন সিনেমা টিকিটের এইসব বে-আইনী বিক্রেতাদের তার খপ্পরে ফেলা হচ্ছে না কেন?



মেহবুব প্রডাকসন্সের 'হুমায়ুন' চিত্রে বীণা

২০শ সপ্তাহ! চিত্র ইতিহাসে অবশ্য দ্রষ্টব্য ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম



প্যারাডাইস * শ্রী
প্রত্যহঃ ২-৩০, ৫-৩০, ৮-১৫ — ৩, ৬, ৯
পূরবী
প্রত্যহঃ ৩, ৬ ও ৯

সর্বজন সমাদৃত আনন্দমঞ্চের চিত্র নিবেদন
পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে
সগৌরবে ১৫শ সপ্তাহ চলিতেছে
পৃথ্বিরাজ রূপায়িত
মহারথী কর্ণ
ভূমিকায়—দুর্গা খোটে, শাহু মোদক, লীলা, সুবর্ণলতা, চন্দ্রকান্ত
.........আসন সংগ্রহ করুন.........
ছায়া * ম্যাজেষ্টিক
প্রত্যহ—বেলা ৩টা, ৬টা ও রাত্রি ৯টায়
—রেডিয়াণ্ট রিলিজ—

জওহরলাল নেহরু
আত্মচরিত
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
—প্রকাশিত হইল—
মূল্য—৭॥০ টাকা
ভিঃ পিঃ-তে ৮৫০ (বিক্রয়কর সহ)
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস
৫নং চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা

---

৪৫ সপ্তাহ!
নিউ টকীজের **নন্দিতা**
মিনার — বিজলী — ছবিঘর
—এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ—

মিনার্ভা
—প্রত্যহ—
৩, ৬ ও ৯টায়
১৩শ সপ্তাহ জয়ন্ত দেশাই-এর
সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত
—শ্রেষ্ঠাংশে—
রেণুকা — ঈশ্বরলাল

—নিউ টকীজের প্রথম হিন্দী চিত্র—
পহ্‌চান্‌
পরিচালকঃ
প্রমথেশ বড়ুয়া
সঙ্গীত পরিচালনাঃ
কমল দাশগুপ্ত
—শ্রেষ্ঠাংশে—
বড়ুয়া — যমুনা — মায়া ব্যানার্জি
ইন্দু মুখার্জি — শৈলেন চৌধুরী
অঞ্জলি রায় — রবীন মজুমদার
শ্যাম লাহা — ফণি রায়
আংশিক স্বত্বের জন্য সর্বস্বত্ব সংরক্ষক
কপুরচাঁদ পি শেঠ,
৩৬নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
আবেদন করুন।

৭-ই সেপ্টেম্বর শুভারম্ভ



শৈলজানন্দ
রচিত ও পরিচালিত নিউ সেঞ্চুরীর
মানে-না-মানা
পরিবেশক—এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৮ম সপ্তাহ।
আনন্দমঞ্চের পরম উপভোগ্য বাণীচিত্র
পূর্ণিমা প্রোডাকসন্সের
রামায়ণী
শ্রেষ্ঠাংশে:—নার্গিস, চন্দ্রমোহন, রোজ, পাহাড়ী, আমীর কর্ণাটকী
পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে সগৌরবে চলিতেছে
প্রভাত
প্রত্যহ—বেলা ৩টা, ৬টা ও রাত্রি ৯টায়
—রেডিয়াণ্ট রিলিজ—

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ
রেজিঃ অফিসঃ সিলেট
কলিকাতা অফিঃ ৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট্
কার্যকরী মূলধন
এক কোটী টাকার উর্দ্ধে
জেনারেল ম্যানেজার—জে, এম, দাস

এরাও তো মুনাফাখোর এবং দেশের শত্রু! এরাই বা কেন ভারতরক্ষা আইনের কবল থেকে পার পেয়ে থাকবে?

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

আগামী কয়েক সপ্তাহ ছবির বাজার নতুন ছবির মুক্তিতে বেশ গরম হ'য়ে ওঠার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। প্রথমত বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ ক'রবে ৩০শে আগস্ট উত্তরা, পূরবী ও পূর্ণতে নিউ সেঞ্চুরীর 'মানে না মানা' যার জন্য লোকের আগ্রহ খুবই। তাঁর নিউ থিয়েটার্সের 'দুই পুরুষে'ও ঐ তারিখে মুক্তিলাভ করার কথা ছিল, বোধহয় তা না হ'য়ে হবে ৭ই সেপ্টেম্বর। ২৪শে সেপ্টেম্বর হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ ক'রবে প্রভাত ও ম্যাজেস্টিকে হিন্দু পিকচার্সের প্রণয়চিত্র 'লায়লা-মজনু' অন্যান্য শহরে ছবিখানি খুবই নাম করেছে। ২৯শে তারিখের আর একখানি ছবি হ'চ্ছে মিনার্ভায় জনক পিকচার্সের 'নল দময়ন্তী'—যা ভুল ক'রে গত সপ্তাহে মুক্তিলাভ ক'রবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এরপর, ৩০শে আগস্টের ছবি হচ্ছে প্যারাডাইসে সাম্প্রদায়িক চিত্র-নির্মাণে অংশগ্রহণকারীদের সর্দার সিরাজ আলি হাকিমের প্রযোজনায় তোলা ফেমাস ফিল্মসের মুসলিম সামাজিক চিত্র 'ফুল'। এর মাঝে ৫ সপ্তাহে ম্যাজেস্টিকে পাঞ্জাবী ছবি 'মেহমান' মুক্তিলাভ ক'রবে এবং জ্যোতি সিনেমার সংস্কার সুসম্পন্ন হ'লেই নবীন পিকচার্সের 'জন্মতিথি' নিয়ে যে কোন দিন সেটার উদ্বোধন হবে।

বিবিধ

এ সপ্তাহের সবচেয়ে বড় সংবাদ হ'চ্ছে যে, ফিল্মের উপর থেকে লাইসেন্স প্রথা উঠে যাওয়ার সরকারী আভাস।

* * *

Ex-Gratia লাইসেন্স যারা পেয়েছে তারা যাতে কোন স্টুডিও না পায়, বম্বের স্টুডিওমালিকরা সেই মতলব ক'রেছেন। যার ফলে বম্বে থেকে অনেককেই কলকাতায় আসতে দেখা যাচ্ছে।

* * *

ধীরেন্দ্র দেশাই সস্ত্রীক (নলিনী জয়ন্ত ওরফে পঙ্কজ দেশাই) এখানকার এস ডি প্রডাকসন্সের সঙ্গে একখানি হিন্দী ছবি তোলার চুক্তি ক'রেছেন। মায়া ব্যানার্জি কলকাতায় এসেছেন বড়ুয়া পরিচালিত বস্তীর ছবি 'যাদের কেউ দেখে না'-তে অভিনয় করার জন্য; এছাড়া অন্যান্য কয়েকখানি বাঙলা ও হিন্দী ছবিতেও তিনি অভিনয় ক'রবেন। বেগম পারা ও কৌশল্যার সঙ্গে ইউনিটি ফিল্মস তিনখানি ক'রে ছবির চুক্তি ক'রেছেন। কলকাতার পথে বম্বের আরও অনেকেই পা বাড়িয়েছেন।

ইস্টার্ন টকীজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের পর শৈলজানন্দ নিউ সেঞ্চুরীর সঙ্গে ছবিপিছু ৩১ হাজার টাকার কড়ারে তিনখানি ছবি তুলে দেওয়ার চুক্তি ক'রেছেন। ইস্টার্ন টকীজে 'নতুন বৌ' নামে তিনি যে ছবিখানি তুলছিলেন তার পরিচালক হ'লেন সুরেন্দ্র সরকার।

* * *

এই সপ্তাহে এখানকার রক্সিতে 'কিসমৎ' ১০০তম সপ্তাহে পদার্পণ করলো। একই চিত্রগৃহে একাদিক্রমে এত দীর্ঘকাল চলার প্রথম রেকর্ড ক'রেছে গত সপ্তাহে বম্বের স্বর্গিতক টকীতে 'শকুন্তলা'। পৃথিবীতে আর কোন ছবি এত দীর্ঘকাল চলার সৌভাগ্যলাভ করেনি। এর আগেকার রেকর্ড হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরে 'গন উইথ দি উইণ্ড'এর (৮৩শ সপ্তাহ), এখানকার প্যারাডাইসে 'বন্ধন'-এর (৬৩শ সপ্তাহ), নিউইয়র্কে 'ফ্যান্টাসিয়ার' (৫৬শ সপ্তাহ), পুণাতে 'সন্ত তুকারাম' (৬৫শ সপ্তাহ), অমৃতসরে 'মঙতী' (৬৫শ সপ্তাহ) আর 'বসন্ত', 'উনকো পাহো' ও 'শহর থেকে দূরে' (৫০শ সপ্তাহ ক'রে)।

চিত্রব্যবসায়ীদের মধ্যে রবীন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডারে চাঁদা দিয়েছেন এপর্যন্তঃ নিউ থিয়েটার্স ৫০০০, রীতেন কোং ৫০০০, রাধা ফিল্ম ৪৪৪৪৷৹, ডি লুক্স ৪০০০, ইস্টার্ন টকীজ ৩৫০০, এম্পায়ার টকী ৩৫০০, এসোসিয়েটেড ডিস্ট্রিবিউটার্স ৩০০০, চিত্রভারতী ৩০০০, আর্ট ফিল্মস ২০০০, নিউ মহারাষ্ট্র পিকচার্স ২০০০, হরিভাই দাণ্ডে ২০০০, ও পণ্ডিত শিরালী কোং ৭০০। বড়দের অনেকেই কিন্তু বাকী পড়ে রয়েছেন; তারা সত্বর এগিয়ে না এলে জনগণের যে শ্রদ্ধা হারাবেন তাতে তাদের ব্যবসার ক্ষতি হ'তে পারে। আশা করি, এই চাঁদা তোলার উদ্যোক্তা ছোটোই নিত্র কাউকে বাদ থাকতে দেবেন না।

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(৪১)

মাধুরী জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কোথায় চললে বাবা?

সঞ্জীববাবু যেন অন্যমনস্ক ভাবেই বললেন—একটা আলো চাই, নইলে অন্ধকারে পথ চিনতে পারবো না। একটা বাতি ঠিক করে দে তো মাধুরী। শীগ্‌গির কর।

মাধুরী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো—হঠাৎ এসময়ে তুমি বাইরে বের হবে কেন? কি এমন কাজ আছে?

সঞ্জীববাবু অস্বস্তির মধ্যে যেন ছট্‌ফট্‌ করছিলেন। এক অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ হবে এই মুহূর্তে, তার ওপর পথ চেনেন না, সঙ্গে কেউ নেই। সঞ্জীববাবুর মুখের চেহারা, আচরণ ও ভাষা সবই এলোমেলো হয়ে উঠছিল। জীবনের সর্বস্ব বাজি রেখে একটা শুধু হার-জিতের জেদের আনন্দে জুয়া খেলতে নেমেছিলেন, আজ বুঝতে পেরেছেন—হার অবধারিত। তাই আজ হঠাৎ নিঃস্বতার শঙ্কায় আকুল হয়ে উঠেছেন। নতুন করে চাল দেবার মত কোন সঞ্চয় সম্পদ আর দুঃসাহস নেই। সব ফুরিয়ে যাবার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। তিনি আজ শুধু শেষ অধ্যায়ের প্রান্তসীমায় গিয়ে একবার দাঁড়াবেন। তিনি আজও বুঝতে নিতান্তই অক্ষম, সেখানে গিয়ে কি হবে? কি আশায় চলেছেন? কি লাভ আছে? তবু থাকতে পারছেন না, একবার সারা জীবনের বিরাট ক্ষতির হিসাবটা শুধু খতিয়ে বুঝে আসবার জন্য খাতক হয়ে মহাজনের কাছে চলেছেন।

মাধুরী ভেবে পাচ্ছিল না, কি করা উচিত? সঞ্জীববাবুর এই হঠাৎ উন্মনা হবার কোন কারণ চোখে পড়ছিল না। তবু সন্দেহ হচ্ছিল। মাধুরী তার আভাষ কিছুদিন আগেই পেয়েছে। কিন্তু সেই সন্দেহটাই কি আজ সব কুণ্ঠা লজ্জা অভিমান প্রতিহিংসা ও বহু বছরের নীরবতার ব্যবধান ঠেলে ফেলে দিয়ে সত্য হতে চলেছে?

সঞ্জীববাবু বললেন—তোকেও সঙ্গে নিয়ে যেতাম, কিন্তু থাক্, অতটা ভাল দেখায় না। এতটা নামতে পারবো না।

মাধুরী চমকে উঠলো—তুমি কি সারদা জেঠীমার বাড়ি চললে?

সঞ্জীববাবু—হ্যাঁ, একটা জরুরী কাজের কথা মনে পড়ে গেছে, মনে না পড়লেই ভাল ছিল। কিন্তু কি করবো, বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে, মন তো কারও অধীন নয়।

মাধুরী লজ্জা পায়। সমস্ত ঘটনাগুলির মালা ভেঙে গিয়ে একটা বিসদৃশতার রূপ প্রকট হয়ে উঠছে। মন কারও অধীন নয়—মাধুরীর কাছে ওটা কোন নতুন কথা নয়। এই সত্য কথাটার মর্ম মাধুরী তার নিজের জীবন দিয়েই বুঝেছে। এই একটা নির্লজ্জ সত্যের বিধান মাধুরীকে মাধুরীর কাছেই সব চেয়ে ছোট করে দিয়েছে। কিন্তু এসব সত্য তাদের সম্বন্ধেই খাটে, যারা জীবনের আলো-ছায়ার ধাঁধায় ভরা আসরে প্রথম প্রবেশ করলো। যারা ভুল করতে মাত্র আরম্ভ করলো। যারা ছায়ার নীচে দাঁড়িয়ে আলো দেখে মুগ্ধ হয়, আলোর নীচে দাঁড়িয়ে ছায়া দেখে মুগ্ধ হয়। যারা মুখ চিনে সাথী খুঁজতে গিয়ে ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। একমাত্র তারাই জানে, মন তো কারও অধীনে নয়। সারা জীবনে এই একটা লজ্জা তাদের সব আন্তরিকতার গর্বকে বিদ্রূপ করে। কিন্তু সঞ্জীববাবুর মত মানুষে আজ জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে এত উতলা হয়ে উঠবেন কেন? জীবনের সেই আঙিনা এঁরা কবে পেছনে ফেলে এসেছেন, তার তারিখও আজ হিসাব করে আবিষ্কার করতে হয়। তবু আজ তিনি কত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। অস্তাচলের ক্ষীয়মান আভার দিকে পথিক যদি দৌড়ে যায়, কি লাভ হবে? মুহূর্তে মুহূর্তে সেই আভা মিলিয়ে যাবে, হঠাৎ থমকে পড়তে হবে, আর পথ চলা যাবে না। সঞ্জীববাবু যেভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, মনে হয় কোথাও সূর্যোদয় হবে, সেই আশায় চঞ্চল হয়ে তিনি ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছেন।

মাধুরী বললো—আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

সঞ্জীববাবু আপত্তি করলেন—না না, সাবধান, তুই আর অপমানের ভেতর যাস না। আমি চলেছি হেস্তনেস্ত করতে। সারদা কোন্ অহংকারে আমাকে চিরকাল অপমান করলে, আমি একবার স্পষ্ট করে সেই কথাটা বুঝে আসবো।

মাধুরী—আমার আর কোন অপমানের ভয় নেই বাবা।

সঞ্জীববাবু—তোকে নিয়েই তো যত ঝঞ্ঝাট ভুগলাম। নইলে সারদার ছেলে আমাকে এত অপমান করতে পারে?

মাধুরী—আমি তোমায় বলেছি, কেশব ভট্‌চাযের কোন সাধ্যি নেই তোমায় আর অপমান করতে পারে। শুধু তাই নয়, তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, তোমাকে যে অপমান করেছে তার প্রতিশোধ নেবার যদি সুযোগ থাকে, তাও নেব।

সঞ্জীববাবু কিছুক্ষণের জন্য বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। মাধুরী বললো—তুমি যাচ্ছ, যাও। কিন্তু আর তুমি কাউকে সাধতে যেও না। তোমাকে ছোট হতে হবে না। যদি দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে আসতে পার, তবে যাও।

সঞ্জীববাবু একটু যেন সজীব হয়ে উঠলেন—শুনিয়ে দিয়ে আসতে পারি, খুব ভাল করেই পারি। কিন্তু তোর কোন ক্ষতি হবে না তো? যদি সারদা কেশবের সঙ্গে তোর বিয়ের কথায় রাজী না হয়?

ছিঃ ছিঃ! মাধুরীর মুখ থেকে সমস্ত প্রতিবাদের ভাষা শুধু দুটি ধিক্কারধ্বনি হয়ে ফুটে উঠলো। সঞ্জীববাবুকে আরও বিব্রত করে মাধুরী বলে ফেললো—যদি রাজী না হয় তবে জানবো আমি বেঁচে গেলাম। যদি রাজী হন, তবে জানবো আমাকে মরতে হবে।

সঞ্জীববাবু বিস্মিতভাবে বললেন—সে কি! সত্যিই কি তুই.....।

মাধুরী—আমি আজ নিজেকে চিনতে পেরেছি, তাই এত জোর করে বলতে পারছি।

সঞ্জীববাবু হতাশের স্বরে একেবারে দমে গিয়ে বললেন—তাহলে কি উপা[য়] হবে?

মাধুরী যেন সময় বুঝে জেরা কর[বার] জন্যই বললো—কিসের উপায় বাবা?

সঞ্জীববাবু—তাহলে তো আর সারদার [সঙ্গে] মানিয়ে রাখার কোন পথ নেই। কে[উ] সম্পর্ক রইল না, ওরা দুজনে চলে যা[বে] সারদা এ গ্রাম ছেড়ে চলে যা[বে] তারপর......।

সঞ্জীববাবু চুপ করে বসে রইলেন। ত[াঁর] সব চাঞ্চল্যের যেন কিছুক্ষণের জন্য সম[াপ্তি] লাভ হয়েছে।

মাধুরী আর প্রশ্ন করে না। আর প্র[শ্ন] করার প্রয়োজন নেই। সঞ্জীববাবুর দুঃ[খের] স্বরূপ আজ সব কঠিন আবরণ স[রিয়ে] স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। স্পষ্ট দেখা য[াচ্ছে] সারদা জেঠীমা গ্রাম থেকে চলে গে[লে]

সঞ্জীববাবুর আকাশ চিরকালের মত মেঘাবৃত হয়ে যাবে। আর সেখানে চন্দ্র সূর্যের অস্তিত্ব থাকবে না। এই চরম শূন্যোতার শাস্তিকে অনুনয় করে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যই আজ তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, আলো খুঁজছিলেন, যেতে চাইছিলেন। মাধুরী তাঁকে আবার নিস্তব্ধ করে দিয়েছে।

নিজের জীবনের যত কাহিনীর আরম্ভ ও পরিণামের ইতিহাসের দিকে একবার যেন পলকে তাকিয়ে নেয় মাধুরী। তার আরম্ভে ও শেষে কোন মিল নেই, কোন সূত্র নেই। পদে পদে হোঁচট খেয়েছে, সূত্র ছিন্ন হয়েছে, নতুন ডোরের বন্ধন গায়ে জড়িয়েছে মাধুরী। একটা শেষ না হতেই আর একটা ছলনা। মান্দার গাঁয়ের সিউলী-তলায় দাঁড়িয়ে সেই এক পুরাতন দিনের চোখের জলের প্রতিশ্রুতি আজ একেবারে শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে গেছে। ভালবাসতে গিয়ে নানা কাহিনী শুধু সৃষ্টি করেছে মাধুরী, কোন ইতিহাস সৃষ্টি হয়নি।

কিন্তু প্রৌঢ় সঞ্জীববাবু বেদনার ভারে যেন চূর্ণ হয়ে গেছেন। তিনি আজও তাঁর প্রথম যৌবন প্রভাতের আকাশটিকে ভুলতে পারেননি। মাস গেছে, বছর গেছে, আয়ু সীমিত হয়ে এসেছে, রক্ত বিরূপ হয়ে গেছে, তবুও তিনি সেই আকাশের দিকেই আজও তাকিয়ে আছেন। আবার সূর্য উঠবে বলে বিশ্বাস করেন। ভালবাসার দাবী এই মানুষটির জীবনকে ছাপিয়ে গেছে।

সঞ্জীববাবুর মূর্তিটির দিকে তাকিয়ে মাধুরী যেন তার মনের সকল যুক্তি বুদ্ধি মীমাংসা ও আবেগ দিয়ে বিরাট এক অনুরাগের মহিমার উদ্দেশে স্তোত্র রচনা করছিল। কিছুক্ষণ আগেই সঞ্জীববাবুকে সাবধান করে দিয়েছে মাধুরী। জীবন ভরা প্রবঞ্চনার বোঝা যেন এইবার তিনি বিনা দ্বিধায় দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেন। মাধুরীর হঠাৎ মনে হয় প্রবঞ্চনা নয়। সঞ্জীববাবুর সারা জীবন ভরে আছে, আশ্বাসে ও আশায়। কোন শূন্যতা সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি।

জীবনের আরম্ভে যেখানে মাধুরী নিজেকে ব্যর্থ করে দিয়েছে, সঞ্জীববাবু জীবনের অন্তিমে এসেও সেখানে সফল হয়ে আছেন। এই অনুরাগের মহত্ব যেন অদৃশ্য পরাগরেণুর মত মাধুরীর সত্তার ওপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মুগ্ধ করে। মাধুরীর মাথা শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে আসে।

সঞ্জীববাবু বোধ হয় উঠতেন না, কিন্তু মাধুরী এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়ালো। সহস্র শিকলের বন্ধন ছিঁড়ে দিয়ে এক বন্দিনী যেন হঠাৎ মুক্তি পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে—মাধুরীর চেহারা দেখে কতকটা সেই রকমের মনে হয়। কিন্তু সঞ্জীববাবু চুপ করে মাথা নীচু করে বসে আছেন, এক যাবজ্জীবন বন্দীর মূর্তি। মাধুরী যেন কিছু বলবার জন্যই এগিয়ে এসেছে। জীবনে কোন সাধ্য বস্তুকেও সফল করতে পারেনি মাধুরী। যা নিতান্ত সহজ ছিল তা'ও তার মনের ভুলে অসাধ্য হয়ে গেছে, কিন্তু আজ একটা নতুন শক্তির পুলক মাধুরীর চেতনায় যেন দীপালি জ্বালিয়ে দিয়েছে। এক সংকল্পের গর্বে বুক ভরে গেছে। সে আজ প্রথম অসাধ্য সাধন করবে।

মাধুরী ডাকলো—তুমি ওঠ, একবার ঘরে এস।

সঞ্জীববাবু নিঃশব্দে বসে রইলেন।

মাধুরী ক্ষমা প্রার্থনার সুরে অনুনয় করলো—আমার কথাগুলি তুমি গ্রাহ্য করো না বাবা, রাগের মাথায় যা বলেছি তার কোন অর্থ হয় না।

সঞ্জীববাবু মুখ তুলে তাকালেন—রাগের মাথায়?

মাধুরী—হ্যাঁ, রাগের মাথায় মানুষে আত্ম-হত্যা করে, আমিও তাই করতে চেয়েছিলাম।

সঞ্জীববাবু—কিন্তু কেশবকে কি ক'রে বোঝাব যে......

মাধুরী—কেশবদা অবুঝ নয়। তুমি বললেই সে বুঝবে।

সঞ্জীববাবু উঠে দাঁড়ালেন, একটু উৎসাহিতভাবে বললেন—আমারও তাই মনে হচ্ছে মাধুরী।

সঞ্জীববাবু এগিয়ে গেলেন। মাধুরী একটা আলো এনে সঞ্জীববাবুর হাতে ধরিয়ে দিলেন। চিরজীবনের অন্ধকারের বাধা ঠেলে সঞ্জীববাবু যেন শেষে পথ ধরে চললেন।

অনেকক্ষণ পরে বারান্দার ওপরে একটা আলো দেখে চমকে উঠলো মাধুরী। সঞ্জীববাবু কি করে এলেন?

মাধুরী উঁকি দিয়ে দেখলো, বারান্দার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন অজয়দা। আলোটার মতই নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবকে হঠাৎ না বুঝতে পেরেই ভয় পেল মাধুরী। অজয়দা কেন? কি তাঁর কাজ? এতদিন পরে আজই-বা এলেন কেন? তাঁর তো আসবার কথা নয়।

সব চেয়ে ভয় হচ্ছিল সেই কথা ভেবেই—যদি আজ অজয়দার মনের সেই মুখচোরা আবেদন হঠাৎ মুখ খুলে ফেলে। কি উত্তর দেবে মাধুরী? আজ আর কোন উত্তর দেবার, কোন ছলনা দিয়েও সান্ত্বনা দেবার উপায় নেই। নাটকের শেষ অঙ্ক ঠিক হয়ে গেছে। আর কোথাও রদবদল হবে না। আর কোথাও কোনক্রমে, দুঃখের জায়গায় হাসি, আর হাসির জায়গায় অশ্রু দিয়ে নতুন করে সাজানো যাবে না। মনের ভুলে নানা পথে ঘুরে ফিরে জীবনের পরিণাম সেই গাঁয়ের শিউলি তলায় এসে থামতে চলেছে। জোর করে পথহারা হতে চেয়েছিল সে, জোর করেই যেন দৈবী নিয়মে তাকে আবার সেই প্রথম পথের মোড়েই এসে পৌঁছে দিয়েছে। সঞ্জীববাবু বলে গেছেন, সারদা জেঠীমা তাঁর কথা উপেক্ষা করতে পারবেন না। আর কেশব? কি সাধ্য আছে তার, মাধুরীর দাবীকে অগ্রাহ্য করে? বাসন্তীর মিষ্টি-মুখের উপদেশ আর কাজলপরা চোখের চাউনী যত মধুর হয়েই উঠুক না কেন, মাধুরী পেছন থেকে যদি ডাক দেয়, কেশব ভট্‌চায এক পা অগ্রসর হতে পারবে না। কিন্তু অজয়দা আজ কি মনে করে?

মাধুরী বাইরে এসে দাঁড়ালো। অজয় বললো—তোমার বাবা বাড়িতে নেই নাকি মাধুরী?

মাধুরী—একটু বাইরে গেছেন।

অজয়—তাহ'লে তোমার কাছেই বলে যাই।

মাধুরী—বলুন।

অজয়—বাসন্তীর বিয়ের দিনটা ঠিক হয়ে গেছে। তোমরা যেও কিন্তু। আর রাগ করে থাকা উচিত নয়।

মাধুরী—দিন ঠিক হয়ে গেছে?

অজয়—হ্যাঁ।

মাধুরী—পাত্র ঠিক হয়ে গেছে?

অজয়—সে তো কবেই ঠিক হয়ে আছে।

মাধুরী—নামটা বলুন না অজয়দা, এত ভয় পাচ্ছেন কেন?

অজয় হেসে ফেললো—ভয় পাব কেন? নামটা বললে তুমি চিনতে পারবে কি?

মাধুরী বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এত গর্ব করে বুঝতে গিয়ে হঠাৎ যেন একেবারে বুদ্ধি হারিয়ে গেছে।

অজয় বললো—পাত্রের বাড়ি মাত্র এখান থেকে চার ক্রোশ পথ, গেরস্থ ঘরের ছেলে। বংশ ভাল। স্কুলে পড়েছে। পৈতৃক জোত আছে। খায় দায় থাকে। এর চেয়ে বেশি আর কোন পরিচয় নেই।

মাধুরী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে এসে বারান্দার ওপর রাখলো। বার বার অকারণে অনুরোধ করলো—আপনি একটু বসুন অজয়দা। কি সব কথা বলছেন, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। একি কখনো সত্যি হতে পারে? ছি-ছি, এ কখ্খনো হতে পারে না। কি এমন দোষ করেছে বাসন্তী?

মাধুরীর কথাগুলি যেন হঠাৎ বেদনার জ্বালায় এক এক করে ফুটে উঠছিল। একেবারে হতভম্ব ও অপ্রস্তুত হয়ে গেছে মাধুরী। আর গর্ব করার, অনুগ্রহ করার, প্রতিশোধ নেবার, প্রতিশ্রুতি রাখবার কোন আনন্দ রইল না। বাসন্তী নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে সবাইকে চিরকালের মত হালকা করে দিতে চলেছে। কিন্তু মাধুরীর হঠাৎ সন্দেহ হয়, হালকা হওয়া যাবে না। চিরজীবনের মত এক নতুন শাস্তির ভার মাথার ওপরে চেপে বসবে।

(আগামীবারে সমাপ্য)

দেশী সংবাদ

৮ই আগস্ট—গতকল্য অপরাহ্ন ৫—৪৫ মিনিটের সময় মুঙ্গের জেলার পিপরা গ্রামের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

৯ই আগস্ট—বাঙলা সরকার শ্রীযুত সুভাষ-চন্দ্র বসুর এলগিন রোডস্থ বাসভবন নীলাম বিক্রয়ের জন্য ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু ও তাঁহার তিন ভ্রাতা এই বাড়ির মালিক।

ব্রহ্মপুত্রে প্রবল বন্যার ফলে সিরাজগঞ্জ আংশিকভাবে জলমগ্ন হইয়াছে। আগরতলায় এবং নেপালেও প্রবল বন্যা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

১০ই আগস্ট—গত পরশ্ব শেষ রাত্রিতে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধানবাদস্থিত রেলওয়ের খাদ্যশস্যের দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার টাকা।

ত্রিপুরা জেলায় বরকামতাগ্রামে এক জনসভায় ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ বৃষ্টির অভাব এবং তজ্জনিত চাউলের সম্ভাবিত অপ্রাচুর্য আশঙ্কা করিয়া বর্তমান বৎসরে বাঙলা হইতে গভর্ন-মেণ্টের পরিকল্পিত চাউল রপ্তানি সম্পর্কে গভর্নমেণ্টকে এবং জনসাধারণকে সতর্ক করেন এবং বলেন যে, দেশ যদি দৃঢ়সঙ্কল্প না হয়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে আর একটি বড় রকমের দুর্ভিক্ষ বাঙলাকে বিপর্যস্ত করিবে।

গতকল্য মুক্তি সপ্তাহের প্রথম দিবসে ঢাকায় ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠি চালিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

১১ই আগস্ট—শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী একটি বিবৃতিতে বলেন, দুষ্কর্মের পরিণাম স্বরূপ হইলেও জাপানের পতনে এশিয়ার অধিকাংশ দেশ নিজেদের আংশিক বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করিবে; ভারতের, এমন কি চীনেরও অনেকে ইহা উপলব্ধি করিবে।

মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসীর সংবাদে সেবাগ্রাম আশ্রমে নৈরাশ্যের ছায়াপাত হইয়াছে। প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী আরও এক সপ্তাহকাল ধরিয়া প্রতিদিন নৈশ প্রার্থনার সময় পর্যন্ত মৌনব্রত অবলম্বন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসী সম্পর্কে গান্ধীজী অদ্য একটি বিবৃতি দিয়াছেন।

১২ই আগস্ট—থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট ডাঃ জি এস আরুণ্ডেল অদ্য পর-লোকগমন করিয়াছেন।

বর্ধমানের সংবাদে জানা যায়, গত ১৯৪৩ সাল হইতে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের ১৫ হাজার মণ আটা ক্লিয়ারিং এজেণ্টগণের গুদামে পড়িয়া ছিল। সম্প্রতি তাহা মানুষের ব্যবহারের অনুপযুক্ত হওয়ায়, জমির সার হিসাবে বিতরিত হইতেছে।

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব আইনসচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার কে সি এস আই রবিবার বেলা ১১টা ৩০ মিনিটের সময় কলিকাতায় তাঁহার এলগিন রোডস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৯ বৎসর হইয়াছিল।

১৪ই আগস্ট—হরিজনকর্মীদের নিকট বক্তৃতা প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী শীঘ্রই আর একবার অনশন ব্রত অবলম্বনের আভাস দেন। অবশ্য কবে তিনি উহা আরম্ভ করিবেন তাহা প্রকাশ করেন নাই।

জানা গিয়াছে যে, ভারতের বস্ত্রাভাব মিটাইবার উদ্দেশ্যে ভারত গভর্নমেণ্ট বৃটেন ও আমেরিকা হইতে কিছু বস্ত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক, সুপরিচিত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীযুত গোপাল ভৌমিকের পত্নী শ্রীমতী অরুণা ভৌমিক গত মঙ্গলবার ইডেন হাসপাতালে পরলোক-গমন করিয়াছেন। গত রবিবার তিনি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ২০ বৎসর হইয়াছিল।

বিদেশী সংবাদ

৮ই আগস্ট—মস্কো রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে, আগামীকল্য হইতে সোভিয়েট ইউনিয়ন জাপানের সহিত যুদ্ধরত হইবে।

আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে জাপানের হিরোসিমা বন্দরের সমস্ত জনমানব ও অন্যান্য জীবজন্ত দগ্ধীভূত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

৯ই আগস্ট—লালফৌজ সোভিয়েট মাঞ্চুরিয়া সীমান্তের ১ হাজার মাইল জুড়িয়া আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে।

বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে প্রসিদ্ধ জাপানী বন্দর নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

১০ই আগস্ট—মিকাডোর সর্বময় কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার সর্তে জাপান আত্মসমর্পণ করিতে সম্মত আছে বলিয়া সুইস ও সুইডিস গভর্ন-মেণ্টের মারফতে জাপান মিত্রপক্ষের নিকট নোট প্রেরণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

১১ই আগস্ট—সরকারীভাবে জানানো মার্কিন কর্তৃপক্ষের হস্তগত হইয়াছে।

জাপানের পরাজয় ও জাপানীদের 'বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া' পরিকল্পনার ব্যর্থতা সম্পর্কে মন্তব্য করিতে গিয়া মার্কিন সেনেটর এলবার্ট টমাস বলেন—সমগ্র এশিয়ায় যতদিন ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রাধান্য থাকিবে, ততদিন সেখানে হিংসা ও অসন্তোষ বিরাজ করিবে, ইহা আশঙ্কা করা যায়। চীন হইতে শুরু করিয়া ভারতবর্ষ, ইরান, তুরস্ক ও আরব জুড়িয়া সমগ্র এশিয়া মহাদেশে বিরোধের স্ফুলিঙ্গ রহিয়া গিয়াছে। আজ অথবা কাল ইহা দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিবেই।

১২ই আগস্ট—চুংকিং রেডিও কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে যে, টোকিও রেডিও ঘোষণা করিয়াছে, সমস্ত জাপ সামরিক তৎপরতা বন্ধ করা হইয়াছে।

জাপানে দ্বিতীয়বার একটি আণবিক বোমা-বর্ষণের ফলে পশ্চিম কিউসুর নাগাসাকি বন্দরের সমগ্র শিল্পপ্রধান অঞ্চল প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়াছে এবং দুই লক্ষাধিক লোকের জীবনান্ত হইয়াছে।

১৪ই আগস্ট—ওয়াশিংটন হইতে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান এবং লণ্ডন হইতে প্রধান মন্ত্রী এটলী মিত্রপক্ষের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন।

১৫ই আগস্ট—ফরাসী নিউজ এজেন্সী ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্শাল পেতাঁর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ৮ই ভাদ্র, ১৩৫২ সাল। Saturday 25th August, 1945. [৪২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙলায় স্বৈর শাসন

ভারতের সবগুলি প্রদেশের শাসন ব্যবস্থার কথা আলোচনা করিলে একথা স্বতঃই মনে উদিত হয়, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বাঙলার জন্য জবরদস্ত শাসন-নীতি প্রয়োগের প্রয়োজনই বোধ করেন। নতুবা বাঙলার জনমত উপেক্ষা করিয়া বাঙলায় ৯৩ ধারা বলে গভর্নরের স্বৈর শাসনই বহাল রাখা হইবে কেন? গত মার্চ মাসের শেষভাগে নাজিম মন্ত্রিমণ্ডলীর পতন ঘটে। সেই সময় পরাজিত, ধিক্কৃত নাজিম মন্ত্রিমণ্ডলের অনুরাগী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কতিপয় লোক বিরোধী দলের প্রতিনিধিগণকে এই বলিয়া শাসাইয়া সদম্ভ আস্ফালন সহকারে বলিয়াছিলেন যে, নাজিম মন্ত্রিসভার পরাজয় ঘটাইলে স্যার নাজিমুদ্দিনকে বাদ দিয়া কোন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে দেওয়া হইবে না এবং সেক্ষেত্রে বাঙলায় গভর্নরের ৯৩ ধারার স্বৈর শাসনই কায়েম করা হইবে। তাঁহারা তখন যে বলে এবং যাহার অথবা যাঁহাদের বলেই এই আস্ফালন করিয়া থাকুন না কেন, পাকেচক্রে ঘটনাপ্রবাহে তাঁহাদের সদম্ভ ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইল। নাজিম মন্ত্রিমণ্ডলের পরাজয় ঘটিবার পর বাঙলার লাট মিঃ কেসি বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দকে পৃথক পৃথক ভাবে আহ্বান করিয়া লইয়া বাঙলার শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁহারা সকলেই নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলেন এবং জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইলে তাহা স্থায়ী হইবে, একথাও তাঁহারা মিঃ কেসিকে জানান। নানা স্থানে অনুষ্ঠিত সভা সমিতিতে এবং নানা বিবৃতিতে বাঙলায় জনপ্রিয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠনের দাবী জানাইয়া দৃঢ়কণ্ঠে বাঙলার জনমত অভিব্যক্ত করা হয়। মিঃ কেসি বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিলে, বাঙলায় ব্যাপকভাবে একটা আশাশীলতার ভাব জাগ্রত হয় এবং ধিক্কৃত, দুর্নীতিপরায়ণ শাসন ব্যবস্থার পতনের পর বাঙলার জনসাধারণ এই সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া উঠে যে, বাঙলায় জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে, অন্ন-বস্ত্র, রোগ-মহামারী, শাসনতান্ত্রিক নানা অনাচার ও অব্যবস্থা ইত্যাদি নানা দুরূহ সমস্যার সমাধান ও নিরসন হইবে। জনপ্রিয় নেতৃগণ এইবার সুযোগ পাইয়া বাঙলার দুর্গত জনগণের দুঃখ-দুর্ভোগ বিমোচনে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু যাঁহারা জনপ্রিয় তাঁহারাই যে শাসনতন্ত্রের নিয়ামকদের আস্থা ও অনুরাগভাজন হইবেন, এমন না-ও হইতে পারে, বরং তাহা না হওয়াই স্বাভাবিক ও সম্ভব, সরকারী আচরণ দেখিয়া এই কথাই মনে জাগিতেছে। নতুবা বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যাঁহার দল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং যাঁহার পক্ষে অন্যান্য দলের সমর্থন পাওয়াও সুনিশ্চিত, তাঁহাকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে আহ্বান করা হইল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে, এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, তাঁহাকে গভর্নমেণ্টের মনঃপূত হয় নাই। সম্প্রতি পার্লামেণ্টে মিঃ কেসির এই কার্যক্রম সমর্থন করিয়া ভারত সচিব যে যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন তাহার মূলে কোন ভিত্তিই নাই। বাঙলায় স্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে কোন অন্তরায়ই ছিল না; কিন্তু সিভিলিয়ানী প্রভুত্ব ক্ষুন্ন করিয়া তাহা করা হইবে না। জনমতকে এইরূপ পদদলিত ও গণতন্ত্রের এইরূপ অবমাননা করা পরাধীন দেশে, বিশেষভাবে এই বাঙলাদেশেই সম্ভব। পেশোয়ারের লীগ মন্ত্রি-দলের দুর্নীতি ও অত্যাচারের আর অধিক প্রশ্রয় দেওয়া তথাকার গভর্নরের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই এবং শেষ পর্যন্ত বন্দী কংগ্রেসী দলের সদস্যগণকে মুক্তিদান করিয়া তথায় কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে দিতে হইয়াছে। এই সেদিন পেশোয়ারে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। শীঘ্রই নূতন করিয়া সাধারণ নির্বাচন হইবে বলিয়া সেখানে মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে কোনরূপ আপত্তি বা বাধা উপস্থিত করা হয় নাই। পাঞ্জাব, আসামেও মন্ত্রিসভার ভাঙ্গাগড়া, অদলবদল চলিতেছে। কেবল বাঙলার বেলায়ই এই বিশেষ অনভিপ্রেত ব্যবস্থার কারণ কি? বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যায় ৯৩ ধারার স্বৈর শাসন চলিতেছে। কিন্তু এই সমস্ত প্রদেশের ব্যাপার বাঙলা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, ঐ সমস্ত প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন; ফলে অচল অবস্থার উদ্ভব হয় এবং ৯৩ ধারার শাসন প্রবর্তিত হয়। নূতন সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রিসভা গঠনের প্রশ্ন এই সমস্ত প্রদেশ সম্পর্কে উঠিতে পারে না। কিন্তু বাঙলায় গত মার্চ মাসের শেষভাগ পর্যন্তও নাজিম মন্ত্রিসভার শাসন চলিতেছিল। বিরোধী দলের বাজেট সম্পর্কে অনাস্থা সূচক বিরোধিতায় উক্ত মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটে। পেশোয়ারে যেরূপ লীগ মন্ত্রিসভার পতনের পর কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে বাঙলায় সেইরূপ নাজিম মন্ত্রিমণ্ডলের পতনের পর বিরোধী দলের যিনি সর্বাপেক্ষা শক্তিমান তাঁহাকেই মন্ত্রিমণ্ডল গঠনে আহ্বান করা উচিত ছিল। বাঙলার জনমতও চাহিয়াছিল তাহাই। কিন্তু মিঃ কেসি এই জনমতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষাপূর্বক নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ৯৩ ধারার মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি বর্তমানে তাঁহার পরামর্শদাতারূপে পাঁচজন সিভিলিয়ানকে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই পাঁচজনই ঝুনো ও ইউরোপীয় সিভিলিয়ান এবং বিগত দুর্ভিক্ষের সময় শাসন বিভাগের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ইঁহারা বাঙলার ভাগ্যাকাশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বে-সরকারী পরামর্শদাতা

দূরে থাকুক, সিভিলিয়ানগণের মধ্যে যাঁহারা ভারতীয়, মিঃ কেসি তাঁহাদের কাহাকেও পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ করেন। নাই। এদিক দিয়া তিনি মর্লি-মিণ্টো শাসন-ব্যবস্থাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। মর্লি-মিণ্টো শাসন ব্যবস্থার আমলে গভর্নরের শাসন পরিষদে দুই একজন ভারতীয় ছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার আমলে খাঁটি ইউরোপীয়গণ-পরিচালিত সিভিলিয়ানতন্ত্রের সাহায্যে ৯৩ ধারার স্বৈর শাসন কায়েম করিবার ব্যবস্থা করিলেন। দেশের মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে উপদেশ দিবার জন্য নিযুক্ত হইলেন সাগরপারের উপদেষ্টার দল, যাঁহাদের সহিত এদেশের নাড়ীর সংযোগ নাই, এদেশের দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অজ্ঞ হওয়া এবং সহানুভূতিসম্পন্ন না হওয়াই যাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। মিঃ কেসি এদেশের শাসনব্যাপারে ক্রমাগত যে নীতির পরিচয় প্রদান করিতেছেন তাহাতে ক্রমশঃই অসন্তোষের সৃষ্টি হইতেছে এবং আমরা তাঁহার নিন্দা করিবার ভাষা পাইতেছি না। এদেশের জনমতকে পদদলিত করিয়া স্বৈর শাসন চালানোর ব্যাপারকে দেশবাসী ক্ষমতাদর্পিত অত্যাচার বলিয়াই মনে করিবে।

নীতির পরিবর্তন

অস্তি ও চিমুর মামলায় ৭ জন যুবক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ইহারা এবং জৌনপুর মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত পাঁচজন ও কুলশেখর পত্তনমের মামলা সম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দুইজন যুবকের প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া ইহাদিগকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। বিগত আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে এই সব স্বদেশপ্রাণ যুবকেরা দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ সময় দেশের অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। সরকার পক্ষ তাঁহাদের চিত্তের সুস্থতা হারাইয়া যে কঠোর দমন এবং পীড়ন নীতি অবলম্বনের দ্বারা উত্তেজনাকর প্রতিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাতে ভাবপ্রবণ যুবকদের অনেকের পক্ষে ধীর চিত্তে কাজ করা স্বাভাবিক হয় নাই। নিরীহের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের নির্মম নীতির ফল কোন দেশেই শুভ হইতে পারে না; বিক্ষুব্ধ মানবাত্মা বিক্ষোভে বিপর্যয়কর পন্থা অবলম্বনে প্রণোদিত হয়। এই সব মামলার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্বের এই দিকের উপর লক্ষ্য রাখিয়া অপরাধের বিচার করা কর্তব্য। এই সব যুবকেরা সাময়িক উত্তেজনায় পড়িয়া যে কাজ করিয়াছিল, আইনের দিক হইতে তাহা দণ্ডনীয় হইতে পারে; কিন্তু ইহাদের প্রকৃতি অপরাধপ্রবণ নয়; পক্ষান্তরে স্বদেশপ্রেম এবং মানবতার তাড়নাই ইহাদের মনকে সাময়িকভাবে উগ্রতায় চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। এই সব স্বদেশ প্রেমিক তরুণদের জীবন রক্ষা হওয়াতে দেশের সকলেই আনন্দিত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের দণ্ডাদেশ মকুব করা হইবে এবং মহেন্দ্র চৌধুরীকে ফাঁসী দিয়া আমলাতন্ত্র সুলভ যে নির্বুদ্ধিতা ও অপরিণাম দর্শিতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমন ভুল করা হইবে না। ভারতের সর্বত্র ইহাদের জীবন রক্ষা করিবার জন্য আন্দোলন চলিতেছিল; মহাত্মাজী এবং কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবুল কালাম আজাদ উভয়েই ইহাদের প্রাণদণ্ড রহিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন; সে চেষ্টা সফল হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। ইহাদের প্রাণদণ্ড মকুব করাতে ভারতে রাজনীতিক আবহাওয়া অনেকটা আপোষ মীমাংসার পক্ষে অনুকূলে হইবে, ইহা আমরা স্বীকার করি। ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ সে কথা বলিয়াছেন। তিনি আশা করিয়াছেন যে, এতদ্দ্বারা ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির পরিবর্তন সূচিত হইতেছে। আমরা কিন্তু এখনও ততটা আশা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শ্রমিক গভর্নমেণ্ট কিছুদিন ব্রিটিশনীতির নিয়ামক হইয়াছেন, তাঁহারা পার্লামেণ্টে নিজেদের শক্তি দৃঢ় করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু ভারত সম্পর্কে কার্যত তাঁহাদের নীতির বিশেষ কিছুই পরিবর্তন সাধিত হইতেছে না। নূতন ভারতসচিব মিঃ পেথিক লরেন্সের উদ্যোগে ভারতের সমস্ত রাজনীতিক বন্দী মুক্তিলাভ করিবেন, এ বিষয়ে আমরা অনেক গবেষণা শুনিয়াছি, কিন্তু ভারতের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণ এখনও অনেকেই বিনা বিচারে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। দেশের রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও বাঙলার বীর সন্তানগণ অনেকে হিংসাত্মক অপরাধের তালিকাভুক্ত হইয়া দণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিলাভ করিলেন না। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত দেশপ্রেমিক যুবকদের কথা বাঙ্গালী ভুলিতে পারে না। ইহাদিগকে মুক্তি দান করিবার পক্ষে সরকারের বর্তমানে কোন অন্তরায় আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার পর বাঙলার জনবরেণ্য নেতা শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে বন্দী করা হয়। শরৎচন্দ্রের কি অপরাধ আছে আমরা জানি না; আমরা সরকার পক্ষের উপস্থাপিত যুক্তি মানি না; কিন্তু জাপানের আত্মসমর্পণের পর সরকারের নিজেদের যুক্তিও এখন আর টিকে না। বিনা বিচারে বন্দীভূত শরৎচন্দ্রকে মুক্তিদান করিতে এখন তাঁহারা ন্যায়ত বাধ্য বলিয়াই আমরা মনে করি। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডে যুদ্ধের অবস্থা জনিত জরুরী আইনসমূহ প্রত্যাহৃত হয়; কিন্তু ভারতে জনগণের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকার পিষ্ট করিয়া এখনও ভারত সরকারের শাসকগণ জরুরী বিধানসমূহের বলে স্বৈরাচার পরিচালনা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে বাঙলা সরকার ভারতের অন্য সকল প্রদেশের উপর টেক্কা দিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে একান্ত উপযাচকভাবেই সম্প্রতি জানাইয়াছেন যে, ভারতরক্ষা আইন বাঙলাদেশে বলবৎ রাখা হইবে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর হইতে নিষেধ বিধি এখনও প্রত্যাহৃত হয় নাই; মেদিনীপুরের এবং অন্য কয়েকটি স্থানের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর হইতে সম্প্রতি এই সব নিষেধ-বিধি প্রত্যাহৃত হইয়াছে। রাজরোষে নিপীড়িত মেদিনীপুরের বড় ভাগ্য বলিতে হইবে, কিন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি এখনও সরকারের নিষেধবিধি হইতে মুক্তিলাভ করে নাই। সুতরাং নীতির পরিবর্তন কোথায়? দেখিতেছি, ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য লর্ড ওয়াভেলকে পুনরায় বিলাত যাইবার জন্য শ্রমিক গভর্নমেণ্ট আমন্ত্রণ করিয়াছেন; কিন্তু শ্রমিক গভর্নমেণ্টের পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন ব্রিটিশের নব পরিকল্পিত পররাষ্ট্র নীতির যে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে সংকীর্ণ সাম্রাজ্যবাদ সুলভ মনোবৃত্তিই পরিস্ফুট হইয়াছে; এরূপ অবস্থায় আমরা বড়লাটের এই বিলাত যাত্রায় বেশি কিছু আশা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শ্রমিক দল ভারতের রাজনীতিকক্ষেত্রে যদি সত্য তাঁহাদের অনুকূলে আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে চাহেন, তবে ভারতের জনগণের রাজনীতিক স্বাধীনতা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, ভারতবাসীরা দয়া-দাক্ষিণ্যের মুষ্টিভিক্ষার প্রত্যাশী নয়। সে ভিক্ষার দৈন্য তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে এবং তেমন ভিক্ষা বৃত্তিকে তাহারা এখন অন্তরের সঙ্গে ঘৃণাই করিয়া থাকে।

জেতা ও বিজিতে বৈষম্য

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু গত ১২ জুলাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা করিয়া লাহোরে একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। মিঃ পেরি ম্যাক্‌কুইন একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ইহাতে ব্যথিত হইয়াছেন। তিনি 'হিন্দু' পত্রে পণ্ডিত নেহেরুর উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, একটা জাতির উপর পণ্ডিতজীর দোষারোপ করা উচিত হয় নাই। পণ্ডিত জওহরলাল প্রত্যুত্তরে তাঁহার বক্তৃতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, তিনি জাতি হিসাবে কোন কথা বলেন নাই, ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি

নিন্দা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—জার্মানীর নাৎসীরা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং বর্বর; কিন্তু সন্ধান করিলে ভারতবর্ষেও অনেক ইংরেজের কাজে নাৎসীদের তুলনা মিলিবে। একটু বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে, পণ্ডিতজী এই উক্তিতে শাসন-নীতিরই আলোচনা করিয়াছেন। পণ্ডিতজী সে কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "১৯৪২ সাল এবং তৎপরবর্তীকালে শাসন বিভাগীয় কর্মচারীদের যে অত্যাচার ভারতের সর্বত্র চলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টই সেজন্য দায়ী। এই সব হীন আচরণে সম্ভবতঃ ব্রিটিশের অপেক্ষা নিম্নতন বিভাগের ভারতীয় কর্মচারীরাই অধিক সংখ্যায় সংশ্লিষ্ট ছিল। মিঃ ম্যাককুইনের এ সম্বন্ধে যদি কোন সন্দেহ থাকে, তবে আমি তাঁহাকে আমার প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি স্থান, বিহার এবং ভারতের অন্যান্য বহু স্থানে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে আমন্ত্রণ করিতেছি। নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণকে প্রতিহত করা প্রত্যেক গভর্নমেণ্টই তাঁহার প্রাথমিক কর্তব্যস্বরূপ মনে করেন, আমি ইহা বুঝি; কিন্তু ভদ্রতা এবং মানবতার মাত্রার মধ্যে তেমন কাজ সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এইসব অত্যাচারের জন্য জাতি হিসাবে ইংরেজ যে দায়ী, এমন কথা আমরা বলিতে চাহি না; কিন্তু তাঁহারা যখন জাতিগত মর্যাদার মোহে ভারতবাসীর উপর এইসব অত্যাচার চোখ বুজিয়া এড়াইতে চাহেন, তখন তাঁহারা বিজেতার শ্রেষ্ঠত্বমূলক বৈষম্য দৃষ্টির সংস্কারে সঙ্কীর্ণ চিত্তেরই পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, এ সত্যও আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ না করিবে, ততদিন ব্রিটিশ জাতি এই সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া ভারতবাসীদিগকে মানুষের মর্যাদা দান করিতে পারিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। গত কয়েক বৎসর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিরীহ জনগণের উপর যে অত্যাচার এবং নির্যাতন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, বলা বাহুল্য ইংরেজ নিজের দেশে কিছুতেই তাহা বরদাস্ত করিতে পারিত না; শাসন বিভাগীয় তেমন অনাচারের বিরুদ্ধে তাহাদের মনুষ্যত্ব বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত; কিন্তু ভারতের জন্য ব্রিটিশ জাতির মনে মানবোচিত সে বেদনা জাগে নাই এবং ব্রিটিশ জনসমাজে সে সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন প্রতিক্রিয়ার পরিচয় আমরা পাই নাই। এরূপ অবস্থায় দেশের অসংখ্য নরনারীর বাস্তব ব্যথা, আমরা ইংলণ্ডের দুই একজন সহানুভূতিশীল ব্যক্তির মুখের কথায় কোন ক্ষেত্রে বিস্মৃত হইতে পারি না; পরাধীন ভারত জাতীয়তার প্রেরণায় বিজেতৃ জাতির এই মনোভাবের আজ যদি প্রতিবাদ করে, তবে তাহাও অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং সেজন্য ব্রিটিশের শাসন-নীতিই দায়ী।

পরলোকে সরলা দেবীচৌধুরাণী

গত শনিবার, ১৮ই আগস্ট সরলা দেবীচৌধুরাণী তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। ১৮৭২ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী, স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী ছিলেন। তিনি ১৭ বৎসর



বয়সে বেথুন কলেজ হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার মাতা স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য-প্রতিভার তিনি উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর সাহিত্যসাধনার পরিবেশও তাঁহার মনে সাহিত্য-রচনার প্রেরণা জোগায়। তিনি বহু বৎসর যাবৎ কৃতিত্বের সহিত "ভারতী" পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রথম জীবন হইতেই তাঁহার মনে স্বদেশপ্রেমের স্ফুরণ হয়। তিনিই প্রথম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারীর পদে বৃতা হন। জাতীয়তা ও স্বদেশী প্রচারে তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের কথা চিরকাল দেশবাসীর মনে জাগরূক থাকিবে। ১৯১৯ সালে তিনি মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে আসেন এবং প্রত্যক্ষভাবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহার আত্মনিয়োগে দেশে অপূর্ব প্রাণশক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি পাঞ্জাবের ডায়ারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্ভীকতা ও স্বদেশহিতৈষণার পরিচয় প্রদান করেন। বাঙালী জাতির মনে যাহাতে বীরত্বের প্রেরণা জাগে, তজ্জন্য তিনি "বীরাষ্টমী ব্রত" প্রবর্তিত করেন। তাঁহার রচিত "অতীত গৌরবকাহিনী মম বাণী গাহ আজি 'হিন্দুস্থান'," "বন্দি তোমায় ভারত-জননী • বিদ্যামুকুটধারিণী"—ইত্যাদি সঙ্গীত একসময়ে কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইয়া অপূর্ব স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনাময়ী প্রেরণা জোগাইত। তাঁহার মৃত্যুতে একজন প্রবীণা লেখিকা ও সম্পাদিকা এবং মহীয়সী তেজস্বিনী দেশসেবিকার তিরোভাব ঘটিল। আমরা তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত দীপক দত্তচৌধুরী বার-এট-ল ও অন্যান্য পরিবার-পরিজনকে তাঁহাদের এই শোকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙলার বিপদ

বিগত ১৯৪৩ সালে বাঙলায় যে মন্বন্তর ও মহামারী দেখা দিয়াছিল এবং যাহার ফলে পল্লী বাঙলার সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার সূচনা করিয়াছিল প্রবল বন্যা ও ঝঞ্ঝাবাত। এই প্রাকৃতিক দুর্দৈবের সহিত খাদ্য বণ্টনে সরকারী অযোগ্যতার মণিকাঞ্চন সংযোগ হওয়ায় বাঙলা এক সর্বনাশা আবর্তের মুখে প্রবেশ করিয়াছিল। বর্তমান ১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসেও উত্তর ও পূর্ববঙ্গে প্রবল বন্যার ফলে আর একটি ভয়াবহ আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বাঙলার জনসাধারণ উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এবার বর্ষা ঋতুতে নদীতে কম জল ছিল। বর্ষা ও বৃষ্টির জলের অভাবে আঁউশ ধানের ফসল বাঙলার প্রায় সর্বত্র একরূপ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; আমন ধানের চারাগুলিও জলাভাবে শুষ্কপ্রায় হইয়া ফসল সম্বন্ধে নৈরাশ্যের কথাই জ্ঞাপন করিতেছিল। দীর্ঘকাল যাবৎ অনাবৃষ্টির পর প্রবল বর্ষণের ফলে ব্রহ্মপুত্র নদে জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। সেই জলপ্রবাহ দ্রুত গতিতে ব্রহ্মপুত্রের নিম্নদেশে ও যমুনা করতোয়া প্রভৃতি নদীতে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়া মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায়, ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জে, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে ও বগুড়ার পূর্বাঞ্চলে প্রবল বন্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

এ সম্বন্ধে বাঙলার গভর্নমেণ্ট কিরূপ কি ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই। কাল বিলম্ব না করিয়া সাহায্য দান ও গবাদি পশু অনত্র অপসারণের ব্যবস্থা না করিলে খাদ্যাভাবে, মহামারীতে বহু প্রাণহানির সম্ভাবনা। আমরা দুর্গত ব্যক্তিদিগের সেবা কার্য অবিলম্বে আরম্ভ করিবার জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইতেছি। কেবল সরকারী করুণার মুখ চাহিয়া থাকিলে তাহাতে আশু কোন উপকার সাধিত না হওয়ারই সম্ভাবনা।



কুটীর — শিল্পী—দয়ানন্দ



শূকর — শিল্পী—এল, টি, কে

অসিত ও চিমুরের অভিযুক্ত—পাটনা হাই-কোর্টের বিচারে সন্দেহহেতু স্ত্রীকে নির্মম-ভাবে হত্যাচেষ্টায় আহত অবস্থায় ট্রেন হইতে জলে ফেলিয়া দিবার অপরাধে অপরাধী—ভূতপূর্ব সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুখেন্দুমোহন সিংহের যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে পরিণত হইলেও মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসী বন্ধ হয় নাই। তাহাতে মনে হইয়াছিল বটে, অসিত ও চিমুরের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের দণ্ড বহাল থাকিবে, কিন্তু বড়লাট ঐ ৭ জনের প্রাণদণ্ডের স্থানে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ডাদেশ দিয়াছেন। ১৬ই আগস্ট এই সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। মহেন্দ্র চৌধুরীর ফাঁসী সম্বন্ধে বিহার সরকার যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে, ১১ই মে মুঙ্গের জেলার রতন গ্রামে যে ডাকাতি হইয়াছিল, মহেন্দ্র চৌধুরী তাহাতে জড়িত ছিলেন। দায়রা জজ ও হাইকোর্ট যে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে মহেন্দ্র চৌধুরী ঐ ডাকাতিতে অন্যতম নেতা ছিলেন। গত ২০শে মার্চ হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড বহাল করেন এবং ১১ই জুন প্রিভি কাউন্সিলে আপীল দায়ের করিবার আবেদন অগ্রাহ্য হয়। গত ১৩ই জুলাই পর্যন্ত প্রাদেশিক সরকারের নিকট কেহ মহেন্দ্র চৌধুরীর জন্য কোনরূপ আবেদন করেন নাই। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হয় ও যে আন্দোলন হয়, তাহাতেই প্রথম সরকার জানিতে পারেন, কংগ্রেস অথবা কংগ্রেস সমালোচনী দল মহেন্দ্র চৌধুরীর সম্বন্ধে অবহিত হইয়াছিলেন। অসিত ও চিমুরের দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের দণ্ডহ্রাস লোকমতের সম্বন্ধে সরকারের অবহিত হওয়ার দ্যোতক বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতেছেন।

বাঙলায় চাউল—বাঙলা হইতে যে চাউল রপ্তানি হইতেছে, তাহার প্রতিবাদে আন্দোলন চলিতেছে। সেই সম্পর্কে বড়লাটের শাসন পরিষদের খাদ্যসদস্য স্যার জ্বালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বোম্বাই নগরে বলিয়াছেন বাঙলায় আবার দুর্ভিক্ষ হইবে না ভারত সরকার তাহা হইতে দিবেন না। তবে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, এবার বাঙলায়, বিহারে ও উড়িষ্যায় বর্ষার বর্ষণ ভাল হয় নাই। ভারত সরকার ইচ্ছা করিয়া বাঙলা হইতে চাউল লইতেছেন না—বাঙলা সরকারের সনির্বন্ধ অনুরোধেই তাহা লইতেছেন। কারণ ভারত সরকার না লইলে বাঙলায় অনেক মজুদ চাউল পচিয়া যাইবে। ১৬ই আগস্ট বোম্বাই শহরে স্যার জ্বওলাপ্রসাদ এই কথা বলিয়াছেন। আর ঐ দিন বাঙলা সরকার বিবৃতি প্রচার করিয়া জানাইয়াছেন, বাঙলা সরকার সাড়ে ১৬ হাজার টন চাউল রপ্তানি করিতেছেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে সাড়ে ৮ হাজার টন আনীত আর সব বাঙলার বাহির হইতে আনীত, আশু ধান্যের চাউল, ভাঙ্গা,

দেশের কথা

(২৯শে শ্রাবণ—৪ঠা ভাদ্র)

বন্যা — বাঙলায় চাউল—মুক্তি-সপ্তাহ—সরলা দেবীচৌধুরাণী—লর্ড ওয়াভেলকে বিলাতে আহ্বান

পরিষ্কার করিয়া চালান—ইত্যাদি; বাঙলায় সেসব চলিবে না। সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে—ভয় নাই, আসাম হইতে লক্ষ টন ও কুচবিহার হইতে ৪ হাজার টন চাউল আসিতেছে। কেবল কি তাহাই? বাঙলায় এবার সুবর্ষণ না হওয়ায় বাঙলা সরকার সৈনিকদিগের জন্য আরও ১৯ হাজার টন চাউল এবং সিংহলের জন্য আরও ৫৫ হাজার টন ভাঙ্গা চাউল দিতে বিরত হইয়াছেন। বাঙলা সরকার যে চাউল রপ্তানি করিতেছেন, সে বাধ্য হইয়া—বাঙলার আবহাওয়ার দোষে সরকারের বিশেষজ্ঞদিগের রক্ষিত গুদামেও সঞ্চিত চাউল নষ্ট হয়। কিন্তু ১৯শে আগস্ট, কলিকাতায় যে প্রতিবাদসভা হইয়াছে, তাহাতে দেখান হইয়াছে, এদেশের কৃষকরা ২০ বৎসর খাদ্যশস্য অবিকৃত রাখিতে পারে। তবে তাহারা বিদেশী বিশেষজ্ঞ নহে।

১৭ই আগস্ট বাঙলা সরকার ঘোষণা করিয়াছেন, কলিকাতায় ও উপকণ্ঠে যে চাউল সরকারী ব্যবস্থায় ১৬ টাকা ৪ আনা মণ দরে বিক্রীত হইয়া আসিয়াছে, অতঃপর তাহা ১৫ টাকা মণ দরে বিক্রীত হইবে, অর্থাৎ সের ৬ আনা হইবে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই মূল্যহ্রাসে সরকার মণপ্রতি প্রায় ৫ আনা এক পয়সা লোকসান দিবেন। তবে তাহাতে ক্রেতারা উপকৃত হইবে।

তথাপি সরকারের চাউল সংগ্রহ ও মূল্য-নিয়ন্ত্রণ বর্জন করা হইবে না এবং "রেশনিং" এখনও কিছুদিন চলিবে। মফঃস্বল সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই।

মুক্তি-সপ্তাহ—সর্বত্র মুক্তি-সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এদিকে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্ত জানাইয়াছেন—বাঙলা সরকার বঙ্গদেশে কোন কোন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যে আইনী ঘোষণ প্রত্যাহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও কার্যকরী সমিতির সম্বন্ধে সে ঘোষণা পূর্ববৎ রহিয়াছে। বাঙলা সম্বন্ধে ব্যবস্থা অন্য অনেক প্রদেশের ব্যবস্থার তুলনায় ভিন্নরূপ।

বাঙলায় গভর্নরের শাসন—গত ১৭ই আগস্ট বাঙলার গভর্নর সংবাদ প্রচার করিয়াছেন, ১৮ই আগস্ট হইতে মিস্টার স্টিভেন্স, মিস্টার উইলিয়ামস, মিস্টার ফকাস, মিস্টার মার্টিন ও মিস্টার ওয়াকার ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের এই ৫ জন ইউরোপীয় চাকরীয়া গভর্নরের পরামর্শদাতার কাজ করিতে থাকিবেন। বলা হইয়াছে, যদিও যে সাড়ে ৪ মাসকাল ভারতশাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে গভর্নর সচিবসঙ্ঘ গঠন না করিয়া আপনি বাঙলা সরকারের সব কাজ চালাইয়াছেন, সেই সময়ে তাঁহার পরামর্শদাতার কাজ একজন প্রবীণ চাকরীয়া করিয়াছে, তথাপি এতদিন পরামর্শদাতৃগণের নাম ঘোষণা করা হয় নাই। এতদিনে তাহা করা হইল। ভবিষ্যতে যেরূপ রাজনীতিক ব্যবস্থাই কেন হউক না, পরামর্শদাতাদিগের নাম ঘোষণায় আর বিলম্ব করা শোভন নহে। তাহা নাকি জনগণের দিক হইতেও প্রয়োজন!

কোন প্রদেশে ৯৩ ধারা প্রবর্তিত করিলে প্রবর্তনের ৬ মাস শেষ হইলেই তাহা পার্লামেণ্টে জানাইয়া তাহার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন। সাড়ে ৪ মাস ঐরূপ শাসন বাঙলায় চলিয়াছে। আমেরিকার "এসোসিয়েটেড প্রেস" বিলাত হইতে সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন (১৮ই আগস্ট), প্রধানমন্ত্রী মিস্টার এট্‌লী পার্লামেণ্টে গত ১৬ই আগস্ট জানাইয়াছেন, ভারত সরকারের নির্দেশে বাঙলার গভর্নর যে তথায় ভারতশাসন আইনের ৯৩ ধারা প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহা বহাল রাখিবার প্রস্তাব হইয়াছে। নাজিমউদ্দীনের সচিবসঙ্ঘের পতন হইলে বিলাতে চার্চিলের সরকার বাঙলায় ভারতশাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে গভর্নরের শাসন কায়েম করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। "রয়টার" সংবাদ প্রচার করিয়াছেন—প্রস্তাবটি একান্তই নিয়মানুগ। কারণ, শীঘ্রই পার্লামেণ্টের অধিবেশন মাসাধিক কালের জন্য স্থগিত হইবে। যখন পার্লামেণ্টের অধিবেশন চলিবে না, সেই সময়ের মধ্যে যদি ৬ মাসকাল অতীত হইয়া যায়, তবে আইন অনুসারে সচিবসঙ্ঘ গঠন না করিলে উপায় থাকিবে না। সেই জন্য পূর্ব হইতেই ৯৩ ধারার শাসন চালিত রাখিবার জন্য অনুমতি গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবের সঙ্গে নাকি ভারতে—বাঙলায় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচনের সম্বন্ধ বিদ্যমান, অর্থাৎ শীঘ্রই নূতন নির্বাচন হইবে এবং সেজন্য ভোটার তালিকা রচনা প্রভৃতির কাজ রহিয়াছে। তবে সে কাজ যে সচিবসঙ্ঘ থাকিতে হইতে পারে না, সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা হয় নাই।

বিদেশে ভারতীয় দার্শনিক

মাসাধিককাল পূর্বে লণ্ডন হইতে "রয়টার" সংবাদ দিয়াছিল, নরওয়ের সংবাদে প্রকাশ, যে ভারতীয় দার্শনিক দীর্ঘ ২৭ বৎসরকাল নরওয়ের পূর্বাঞ্চলে অষ্টারডান পর্বতে কুটীরে সন্ন্যাসী জীবনযাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে সূর্যোদয়কালে তাঁহাকে

সমাধিস্থ করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে গান রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে সমাধিস্থ করার সময় তাহা ইংরেজীতে ও নরওয়ের ভাষায় পঠিত হয়। জানা গিয়াছে, ইনি বাঙালী এবং ইঁহার পূর্বাশ্রমের নাম—সুরেন্দ্রনাথ বড়াল। সন্ন্যাসী হইয়া ইনি স্বামী আনন্দ আচার্য নামে অভিহিত হন। ইঁহার পূর্ববাস হুগলী জিলায়। ১৮৮১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ইনি ১৯০৮ খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অল্পদিন বর্ধমান রাজ-কলেজে অধ্যাপকের কাজ করিয়া শিবনারায়ণ স্বামীর শিষ্য হন এবং ১৯১২ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে গমন করেন। তিনি য়ুরোপে হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে কয়টি বক্তৃতা করেন ও ১৯১৫ খৃস্টাব্দে নরওয়ে দেশে গমন করিয়া নির্জনে সাধনার সংকল্প করিয়া অস্টারডান পর্বতে কুটীর নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। তথা হইতে তিনি কয়খানি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং সেগুলি সুধী-সমাজে সমাদর লাভ করে। তিনি বিদেশী ভাষাসমূহের মধ্যে ইংরেজী ব্যতীত নরওয়ে-জিয়ান, সুইডিশ ও জার্মান ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন এবং এ কয় ভাষায়ও বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তাঁহার অধিকাংশ পুস্তক ইংরেজীতে এবং কয়খানি নরওয়ের ভাষায় রচিত হয়। ইংরেজী ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় রচিত তাঁহার গ্রন্থসমূহ ইংরেজীতে অনূদিত হইয়াছে। তাঁহার শেষ জীবন আধ্যাত্মিক কার্যে ব্যয়িত হইয়াছিল এবং সে সম্বন্ধে তাঁহার রচনা ব্যতীত আর কিছুতেই বিশেষ সন্ধানলাভের উপায় নাই।

বেগম আজাদের স্মৃতিরক্ষা—গত ১৪ই আগস্ট গুলমার্গ হইতে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁহার পত্নীর স্মৃতি রক্ষার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়া সংগৃহীত অর্থ "কমলা নেহরু মেমোরিয়াল" হাসপাতালে প্রদান করিতে নির্দেশজ্ঞাপন করিয়াছেন। তিনি যখন বিনাবিচারে কারারুদ্ধ সেই সময় তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হয় এবং তিনি পত্নীর মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, কাহারও স্মৃতিরক্ষা করিতে হইলে কয়টি বিষয় বিবেচনা করিয়া কাজ করা কর্তব্য। যাঁহারা দেশের জন্য কোন বিশেষ কাজ করবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন বা কোন ব্যক্তিগত কাজের জন্য দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন—তাঁহাদিগেরই স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা সংগত। সে হিসাবে বেগম আজাদের স্মৃতিরক্ষার সার্থকতা নাই। যদিও বেগম সাহেবার মত পত্নী না পাইলে মৌলানা সাহেবের পক্ষে তিনি যে কাজ করিয়াছেন তাহা করা দুঃসাধ্য হইত, তথাপি তাহা ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেইজন্য তিনি বেগম সাহেবার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বাঙলায় বন্যা—বাঙলায় বন্যার প্রকোপ এখনও প্রশমিত হয় নাই। মুন্সীগঞ্জ, মুক্তাগাছা, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে অবস্থা শংকাজনক—অনেক স্থানে জল নদীর কূল ছাপাইয়া গ্রামে ও শহরে প্রবেশ করিয়াছে। সমগ্র টাংগাইল (জিলা ময়মনসিংহ) মহকুমা প্লাবিত হইয়াছে। মানিকগঞ্জ (ঢাকা জিলা) হইতে গত ১৮ই আগস্ট যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, কোন কোন স্থানে গৃহ ও গ্রাম নদীর জলে ভাসিয়া গিয়াছে। শস্যের অবস্থা শংকাজনক।

মৃত্যু সংবাদ—গত ১৮ই আগস্ট (১লা ভাদ্র) কলিকাতায় শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল। সরলা দেবী বিদুষী জননী শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবীর ও কংগ্রেসের প্রথম পরিচালকদিগের অন্যতম জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের কন্যা ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সাহিত্য চর্চায় ও দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মহিলাদিগকে বীরাষ্টমী ব্রত গ্রহণ করাইবার জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণীয়। তিনি ১৯০৫ খৃস্টাব্দে পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীর সহিত পরিণীতা হন। পাঞ্জাবে যখন ওডায়ারী শাসনে দারুণ অনাচার অনুষ্ঠিত হয়, তখন তিনি পাঞ্জাবে ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি বাঙলায় ফিরিয়া আসেন।

গত ১৯শে আগস্ট (২রা ভাদ্র) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রবীণ নেতা, পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় ৯০ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীহট্টে পঞ্চগ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়া কিছুদিন ঢাকায় শিক্ষালাভ করিয়া কলিকাতায় আসেন। প্রাচীর ও প্রতীচীর দর্শন শাস্ত্র তিনি মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করিয়া আয়ত্ত করেন। তিনি উপনিষদ গীতা বেদান্ত প্রভৃতি সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিয়া যশ অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' 'ব্রহ্মসূত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তিনি দীর্ঘকাল পণ্ডিত সমাজে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন।

গত ১৭ই আগস্ট কলিকাতার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ বাঙলার পাট ব্যবসায়ীদের মধ্যে অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পরিবারগণ ২৪ পরগণা ধান্যকুড়িয়া গ্রামে নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক।

সংবাদ-নিয়ন্ত্রণ—গত ২০শে আগস্ট ভারত সরকার জানাইয়াছেন, জাপান সম্মিলিত পক্ষের সন্ধির সর্ত স্বীকার না করা পর্যন্ত এদেশে সংবাদ-নিয়ন্ত্রণ পূর্ববৎ চলিতে থাকিবে। তাহার পর পরিবর্তনের বিষয় বিবেচিত হইবে।

উপাধি বর্জন—লর্ড ওয়াভেলের যে প্রস্তাব সিমলায় আলোচিত হইয়াছিল, তাহাতে ভারত সরকারে হিন্দুর ও মুসলমানের সংখ্যা যেভাবে নির্ধারিত হইয়াছে, তাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে গণতান্ত্রিক নীতির মর্যাদা রক্ষিত হয় নাই বলিয়া হিন্দু মহাসভা তাহার প্রতিবাদে কর্মাধ্যক্ষদিগকে বৃটিশ সরকার প্রদত্ত উপাধি ত্যাগ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ডক্টর স্যার গোকুলচাঁদ নারাং মহাসভার অন্যতম কর্মকর্তা। গত ১৮ই আগস্ট দিল্লীতে হিন্দু মহাসভার কার্যনির্বাহক সমিতির অধিবেশনে তিনি জানাইয়াছেন, তিনি উপাধি ত্যাগ করিবেন, স্থির করিয়াছেন। তাহার পরে সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, যুক্তপ্রদেশের রাজা মহেশ্বর দয়াল শেঠ ও দিল্লীর রায়বাহাদুর হরিশচন্দ্র উপাধি ত্যাগের সংকল্প জ্ঞাপন করিয়াছেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায় অখণ্ড ভারতের সমর্থনে পণ্ডিত শ্রীযুত জওহরলাল নেহেরুর মত উদ্ধৃত করেন। পণ্ডিতজী শ্রীনগরে (কাশ্মীর) শিখদিগের এক সভায় ১৬ই আগস্ট মত প্রকাশ করিয়াছিলেন—কংগ্রেস ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করিবার বিরোধী; কারণ, কংগ্রেসের ধ্রুব বিশ্বাস, ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব নষ্ট হইলে দেশের সকল সম্প্রদায়েরই ইষ্ট ক্ষুণ্ণ হইবে এবং মুসলমানরাও সেই অনিষ্ট হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন না। কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষের ঐক্যনাশের চেষ্টায় সে কার্যে উদ্যোগীদিগকে আলোচনার দ্বারা নিরত করিতে চেষ্টা করিবেন।

আবার প্রায়োপবেশন—গান্ধীজী যে পুনরায় প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, সে কথা কিছুদিন হইতে শুনা যাইতেছিল। গত ২০শে আগস্ট মাদ্রাজ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, যতদিন অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ রূপে দূর না হয়, ততদিন তিনি প্রায়োপবেশনের পর প্রায়োপবেশনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। তবে তাহার জন্য প্রথমে আবশ্যক আয়োজন প্রয়োজন।

লর্ড ওয়াভেলকে বিলাতে আহ্বান—

বৃটিশ সরকার বড়লাট লর্ড ওয়াভেলকে আলোচনার জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র লণ্ডনে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং বড়লাট ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। রয়টার জানাইতেছে, লর্ড সভায় ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স যখন ঘোষণা করেন (২১শে আগষ্ট) যে, ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল পরামর্শের জন্য আবার বিলাতে আসিতেছেন, তখন সভাগৃহে হর্ষধ্বনি হয়।

আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(৬)

কয়েকদিন পরে একদিন মধ্যাহ্নে শক্তি বারান্দায় মাদুর পাতিয়া ইংরাজি নভেল কতকগুলো বই লইয়া পড়িতেছিল। সকাল হইতে বৃষ্টি নামিয়াছে। কিছু পূর্বে অল্পক্ষণের জন্য একবার ছাড়িয়াছিল, সেই সুযোগে গিরিবালা কোন প্রতিবেশিনী বান্ধবীর পীড়িত পুত্রকে দেখিতে গিয়াছে, তাহার পরই চাপিয়া জল আসিয়াছে, হয়ত সেজন্য আসিতে কিছু বিলম্ব হইবে। জ্যেঠাইমার ঘর ভিতর হইতে অর্গল দেওয়া। গত রাত্রি হইতে হাঁটুতে বাতের বেদনা বাড়িয়া তাহার অসুখভাব হইয়াছে,—জল-বৃষ্টির ভয়ে সে শয্যাগ্রহণ করিয়াছে।

ইতিহাসোক্ত কোনও নারীর অপরিসীম সাহসের কাহিনী পাঠ করিয়া শক্তির সমস্ত দেহ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে চড়বড় শব্দে চাহিয়া দেখিল উঠান দিয়া তাহার দিকে একটি ছাতা অগ্রসর হইতেছে। বৃষ্টির ছাট হইতে দেহের উর্দ্ধাংশকে বাঁচাইবার জন্য সম্মুখে ছাতা ধরায় ছত্রাধিকারীর মাথা হইতে কোমর পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু যেটুকু দেখা যাইতেছিল তাহাতেই শক্তি বুঝিল নবগোপাল। একবার মনে করিল তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু শত্রুর সম্মুখে ভীতি প্রকাশ করিলে শত্রুর সাহস বাড়িয়া যাইতে পারে, এই ভয়ে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বইয়ের পাতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল।

সটাং আসিয়া নবগোপাল বারান্দায় উঠিয়া পড়িল, তাহার পর খোলা ছাতাটা একদিকে স্থাপন করিয়া ভঙ্গিমার সহিত বলিল, "কি দুর্যুগ রে বাবা! দেবতা যেন ভেঙে পড়েছে।" তাহার পর মাথার উপর হাত বুলাইয়া দেখিয়া বলিল, "ঈশ্! ছাতাটায় ছেঁদা ছিল, সমস্ত মাথাটা একেবারে ভিজে গিয়েছে। দাও ত, দাও ত গো শক্তি, ঐ গামছাখানা দাও ত, মাথাটা মুছে ফেলি।"

দড়ির আলনায় যে গামছাটা শুকাইতেছিল সেটা শক্তির নিজেরই। নিজের ব্যবহারের গামছাখানা নবগোপালের ব্যবহারে দিতে তাহার মন ঘৃণায় ও বিরক্তিতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? ভিজা মাথায় কোন ব্যক্তি গামছা ভিক্ষা করিলে তাহাকে প্রত্যাখান করা কঠিন,—তা সে বিবাহের পক্ষে যত অপাত্রই হোক না কেন।

শক্তির হাত হইতে গামছা লইয়া নবগোপাল প্রথমে মাথা মুছিল, তাহার পর হাত এবং পা ভাল করিয়া মুছিয়া গামছাটা শক্তির দিকে আগাইয়া ধরিয়া বলিল, "নাও দড়িতে ভাল করে মেলে দাও।"

নবগোপালের ব্যবহৃত গামছা হাতে লইতে শক্তির ঘৃণা করিতেছিল; কোনরূপে তাহার একটা প্রান্ত ধরিয়া সে সেটাকে আলনায় ঝুলাইয়া দিল। নবগোপালের প্রতি তাহার এই ঘৃণা নবগোপাল দেখিতে কদাকার, সাজসজ্জায় অপরিচ্ছন্ন অথবা অশিক্ষিত অমার্জিত ব্যক্তি বলিয়াই ঠিক নয়; মনের মধ্যে নবগোপালের প্রতি তাহার যে একটা অপরিমেয় বৈরাগ্য সৃষ্টিলাভ করিয়াছিল, এ তাহারই একটা প্রকাশ। নবগোপাল তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের অভিশাপরূপে দেখা দিয়াছে, নবগোপাল তাহার বর্তমান জীবনের সঙ্কট হইয়া উঠিয়াছে,—সুতরাং নবগোপালের প্রতি তাহার ঘৃণা ও বিদ্বেষের অন্ত ছিল না।

বইগুলো গুছাইতে গুছাইতে শক্তি বলিল, "জ্যেঠাইমা বোধ হয় এখনো ঘুমোননি। আপনি যান না, দোর ঠেলুন—খুলে দেবেন অথবা আমি ডেকে দেবো?"

শক্তির সম্মুখে উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়া নিম্নকণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "জোরে কথা কোয়োনা—জেগে থাকলে শুনতে পাবে।" তাহার পর নিঃশব্দে একমুখ হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার জ্যেঠাইমার জন্যে ত' আমার ঘুম হচ্ছে না! এই দুর্যুগে কার জন্যে আমি এসেছি জান?—তোমার জন্যে।"

কঠিন স্বরে শক্তি বলিল, "আমার জন্যে কেন এসেছেন?"

নবগোপাল বলিল, "কেন এসেছি দেখলেই বুঝতে পারবে—দেখাচ্ছি। কিন্তু আগে বল ত' গিরিমাসী কোথায়? তিনিও ঘুমিয়েছেন নাকি?"

শক্তি বলিল, "না, তিনি ঘুমোননি।"

"তবে? ঘরে রয়েছেন?"

সত্য কথাটা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা শক্তির ছিল না, কিন্তু মিথ্যা কথা বলিবার অভ্যাসও তাহার নাই। বলিল, "তিনি বেরিয়েছেন—এখুনি আসবেন।"

"যখন আসবেন তখন আসবেন, এখন ত' তোমাকে জিনিসটা দেখাই। দুর্যুগ হলে কি হয়, বেরিয়েছিলাম মাহিন্দির জন্যে দেখছি।" বলিয়া নবগোপাল একটা কাপড়ের পুঁটলি খুলিতে আরম্ভ করিল।

ক্রোধে এবং বিরক্তিতে শক্তির মাথার মধ্যে রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিল। যে নির্লজ্জ ভঙ্গিতে তাহার জ্যেঠাইমা বন্ধ করিল না এবং তাহার মা বন্ধ করিতে পারিল না, সে স্বয়ং আজ তাহার বর্বরতাকে উদ্যত হইয়া অন্তরের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "ও আপনি খুলবেন না, আমি আপনার জিনিস দেখতে চাইনে।"

সবিস্ময়ে শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নবগোপাল বলিল, "কেন? কেন দেখতে চাওনা?"

সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া শক্তি বলিল, "ও-সব বই আমি পড়িনে। আপনার সে দুখানা বইও আমি পড়িনি, আজ ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।"

হৃদয়ের সূক্ষ্মতির আবেগ-প্রণোদিত উপহারগুলোর সেই অমূল্য বই দুখানি শক্তি পড়ে নাই শুনিয়া নবগোপাল তীব্র আঘাত পাইল। ক্ষুব্ধকণ্ঠে উচ্চস্বরে বলিল, "পড়নি! পড়লে দেখতে বই দুখানা ভাল। অমর সাহিত্যিকের এক বন্ধুকে দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়েছিলাম।" তাহার পর অর্ধোন্মোচিত পুঁটলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এ বইখানা কিন্তু খুব ভাল, পড়ে দেখো।"

বই না দেখিয়াই বইটি ভাল না সে বিষয়ে শক্তি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বলিল, "না, ও বই-ও ভাল নয়।"

শক্তির কথায় কিঞ্চিৎ উৎসাহ ফিরিয়া পাইয়া নবগোপাল বলিল, "কি বই বল দেখি?"

নাম করিয়া নিন্দা করিলে নবগোপালকে নিরস্ত করা সহজ হইবে মনে করিয়া শক্তি বলিল, "আমি জানি, নিয়ে এসেছেন।"

নিমেষের মধ্যে নবগোপালের মুখ হইতে উদ্বেগের কালিমা অপসৃত হইল, উল্লসিত কণ্ঠে বলিল, "জানোই না! বঙ্কিম মেয়ে কমলকুমারী।"

আরক্তমুখে শক্তি বলিল, "তা সে যে কুমারীই হোক, ও আমি কিছুতেই নেব

না।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা নবগোপালবাবু, কোন্ অধিকারে আপনি এমন করে আমাকে উপহার দিতে আসেন বলুন দেখি?"

অদূর ভবিষ্যতে যে ব্যক্তি স্বামীপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহাকে নাম ধরিয়া এবং নামের সহিত 'বাবু' সংযুক্ত করিয়া ডাকিতে শুনিয়া নবগোপাল আহত হইল। কিন্তু সে বিষয়ে উপস্থিত কোন প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, "কোন্ অধিকারে কি বলছ গো? এই শেরাবোন মাসে আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, আর বলছ—কোন্ অধিকারে?"

চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া শক্তি বলিল, "আমার সঙ্গে আপনার বিয়ে হবে? না—কিছুমাত্র তার সম্ভাবনা নেই জানবেন!"

নবগোপালের মুখে নিশ্চিন্ততার হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "তুমি জাননা বলে বলছ নেই; আছে,—খুব আছে। তোমাদের গাঁয়ের অজয় চাটুজ্যে আমার বাবাকে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের জন্যে লিখেছিল। বাবা আর মা পনেরো আনা রাজি হয়েছে;—আমি ত' আঠারো আনা। আসছে শুক্রবারে বাবা তোমাকে দেখতে আসবে, আর সেই দিনই আমাদের বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে যাবে। তবে বলছ অধিকার নেই?"

কঠোর স্বরে শক্তি বলিল, "আপনার বাবাকে আসতে মানা ক'রে দেবেন। আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না!"

নবগোপালের মুখে পুনরায় উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিল; বলিল, "আমার বাপ-মাকে যখন রাজি করিয়েছি তখন আর বাধা কি?"

"তবু বাধা আছে।"

"কি বাধা?"

রূপ এবং গুণের হিসাবে শক্তি নবগোপালকে নিজের পক্ষে অপাত্র বলিয়া মনে করে. সে কথা স্পষ্ট করিয়া মুখের উপর বলিতে সে ঈষৎ সঙ্কোচ বোধ করিল। কিভাবে নবগোপালের প্রশ্নের উত্তর দিলে অসৌজন্য নিতান্ত নিষ্ঠুর হইবে না, সহসা তাহা ভাবিয়া না পাইয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

মৌন লজ্জার লক্ষণ মনে করিয়া নবগোপাল বলিল, "বলতে লজ্জা করছে?"

উত্তরে 'না' অথবা 'হ্যাঁ'—কোনটা বলিলে পরবর্তী কথোপকথনে সুবিধা হইবে ঠিক বুঝিতে না পারিয়া শক্তি বইগুলো লইয়া নীরবে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

নবগোপালের মনে সংশয় বাড়িয়া উঠিল। 'কলির মেয়ে কমলকুমারী'তে সে পড়িয়াছে, লেখাপড়া-জানা মেয়েরা অনেক সময়ে নিজেদের বিবাহ নিজেরা ঠিক করে। বলিল, "তুমি কোথাও তোমার বিয়ে ঠিক করেছ না-কি?"

নবগোপালের প্রশ্নের মধ্যে আত্মরক্ষার একটা দিক দেখিতে পাইয়া মৃদুস্বরে শক্তি বলিল, "করেছি।"

"করেছ? কোথায় করেছ?"

"কলকাতায়।"

ব্যস্ত হইয়া নবগোপাল বলিল, "আহা হা, তা বলছিনে। কার সঙ্গে করেছ, তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া শক্তি বলিল, "তাঁকে আপনি চিনবেন না।"

"পাশ-করা পাত্তোর?"

"পাশ করা।"

"ক-টা পাশ?"

"চারটে।"

"বাবা!"

ক্ষণকাল নীরবে কি চিন্তা করিয়া নবগোপাল বলিল, "পাত্তোর দেখ্‌তে কেমন? ভাল?"

"ভাল।"

"বড়মানুষ?"

"জমিদার।"

"কথা পাকাপাকি হ'য়ে গেছে?"

"একরকম পাকাপাকিই।"

"সত্যি বলছ? আচ্ছা, গা ছু'য়ে দিব্যি কর।" বলিয়া শক্তির হাতের দিকে নবগোপাল নিজের হাত বাড়াইয়া দিল।

হাত সরাইয়া লইয়া শক্তি বলিল, "আমি দিব্যি করিনে।"

প্রতিযোগিতায় জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া নবগোপালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। যে দিকটা সে পরীক্ষা করিতে যায় সেই দিকটাই অপরাজেয়! বিদ্যার দিকটা যেন একেবারে অথই সাগর! একটা পাশের গভীরতা যাহাকে ডুবাইয়া মারে, চারটা পাশ ত' তাহার পক্ষে বিভীষিকা! তাহার পর, অর্থের দিকটাই কি সামান্য? যে জমি-জমার গৌরবে তাহারা পাঁচ জনের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়া বেড়ায়, এক-একটা জমিদারী তেমন কত-শত জমিজমা গিলিয়া খায় তাহার ধারণাই সে করিতে পারে না। তাহার পিতা মাসে মাসে তিন কম তিন কুড়ি টাকা 'পেনসোন' পাইয়াও যে জমিদার-বাড়িকে সসম্ভ্রমে 'বাবুদের বাড়ি' বলিয়া উল্লেখ করে, সেই জমিদারি কি সহজ কথা!

নবগোপালের নীরব নিস্তেজ ভাব দেখিয়া মনে মনে সান্ত্বনা পাইয়া শক্তি বলিল, "সব কথা শুনলেন ত', এখন বলুন দেখি, আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'তে পারে?"

তালুর সহিত জিহ্বার যোগে অননুমোদনসূচক এক প্রকার শব্দ বাহির করিয়া নবগোপাল বলিল, "রামচন্দোর! তাই কখনো হয়! বিয়ের কথা পাকাপাকি হওয়া এক রকম ত' বিয়ে হওয়াই;—কি বল?"

মৃদুস্বরে শক্তি বলিল, "তাই ত।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বিষণ্নস্বরে নবগোপাল বলিল, "মনটা কিন্তু খারাপ হ'য়ে গেল শক্তিরাণী! সব যেন কেমন উদাস উদাস লাগচে।"

নবগোপালের অন্তরের বেদনার পরিচয় পাইয়া শক্তি মনে মনে একটু ব্যথিত হইয়া বলিল, "এর জন্যে আর দুঃখ কি? আপনার কত ভাল বউ হবে।"

অপ্রত্যয়ের মৃদু হাসি হাসিয়া নবগোপাল বলিল, "দূর! তাই কখনো হয়! বললে হয়ত' পেত্যয় যাবে না শক্তি, তোমার মতো সোন্দোর মেয়ে, সাতক্ষীরে ত' সাতক্ষীরে, সমস্ত খুলনে জেলায় আর একটা আছে কি না সন্দেহ। তবে হ্যাঁ, ছিল বটে একটা মেয়ে রাওলপিণ্ডিতে—কিন্তু তোমার মতন কি না,—আচ্ছা একবার চেয়ে দেখ ত' আমার দিকে।"

সমবেদনায় এবং কৃতজ্ঞতায় শক্তির মন দ্রবীভূত হইয়াছিল, নবগোপালের অনুরোধ পালন করিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল।

শক্তির মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "রামচন্দোর! তোমার চোখ দুটোর বাহার কি চমৎকার! তার চোখ দুটো একটু কুতকুতে।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তবে একটা কথা তোমাকে বলি, কাউকে যেন বোলো না। তোমার সঙ্গে বিয়ের কথায় লোভ হ'ত, ভয়ও করত। বেশী লেখাপড়া জানা সুন্দরী মেয়েরা সোয়ামীকে তুচ্ছোতাচ্ছিল্যো করে। কলির মেয়ে কমলকুমারী তাই করত। বইখানা তুমি প'ড়ে দেখলে না, ভাল বই, অনেক শিক্ষে হোত।"

সন্ধির দৈত অবস্থাকে উপস্থিত কোনো প্রকারে ক্ষুণ্ণ করিতে শক্তির ইচ্ছা হইল না; বলিল, "আচ্ছা দিন, প'ড়ে দেখব।"

সোৎসাহে বইখানা পুটলির ভিতর হইতে বাহির করিয়া নবগোপাল একটা পাতা খুলিয়া শক্তির সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "এই ছবিখানা দেখ। কমলকুমারীর সোয়ামী কমলকুমারীর জুতোয় ফিতে বেঁধে দিচ্ছে। কমলকুমারী মেয়ে স্কুলে পড়াতে যাবে। আচ্ছা, বিয়ে হ'লে তুমি বোধ হয় এ রকম আচারোণ করতে না,—না?"

মাথা নাড়িয়া শক্তি জানাইল কমলকুমারীর মতো অবৈধ আচরণ সে করিবে না।

নবগোপাল বলিল, "তা আমি জানি। তুমি ইংরিজি পড়েছ, কিন্তু লোক ত' খারাপ নও। ভাল লোক।"

নবগোপালের দিকে একবার সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া শক্তি বলিল, "আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে নবগোপাল দাদা।" তাহার পর অনুরোধের কথাটা উপস্থিত বন্ধ রাখিয়া বলিল

"এবার থেকে আমি আপনাকে নবগোপাল দাদা ব'লে ডাকব। কেমন?"

একটু ক্ষুব্ধভাবে নবগোপাল বলিল, "সে গুড়ে যখন বালি, তখন কি আর করবে, দাদা ব'লেই ডেকো। কিন্তু দেখ, বাবু ব'লে ডেকোনো। একটু আগে যখন বাবু ব'লে ডেকেছিলে, বেজায় খারাপ লেগেছিল। তুমি কি ব্যাটাছেলে যে, আমাকে বাবু ব'লে ডাকবে?"

এ যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে কোনো প্রকার তর্ক না তুলিয়া শক্তি বলিল, "দেখুন, আপনার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ, আমার যে বিয়ের কথা পাকা-পাকি হ'য়ে গিয়েছে, তা কাউকে বলবেন না।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবগোপাল বলিল, "সর্বনাশ! সে কথা কখনো বলে? তোমার ঐ যে ভবতারা জেঠি—মনে কোরোনা খুব সুবিধের লোক। ভয়ানক দজ্জাল মেয়েমানুষ! জানতে পারলে তোমাদের কিছু না জানিয়ে ভেতরে ভেতরে সব ঠিক ক'রে একদিন জোর ক'রে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিইয়ে দেবে। আমি যে সব জানি—অজয় চাটুজ্যের সঙ্গে ওর ষড়। হঠাৎ একদিন দেখবে, সকালবেলা তোমার গায়ে হলুদ হ'য়ে গেল, সন্ধ্যেবেলায় বিয়ে। এই নিবান্ধব ভুঁয়ে তোমরা দুজনে কি করবে বল?"

নবগোপালের কথা শুনিয়া শক্তি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। বলিল, "এখন ও আর সে রকম কিছু করতে পারবে না?"

সদর্পে নবগোপাল বলিল, "ক্ষেপেছ? আমি রাজি না হ'লে ওর সাধ্যি বিয়ে দেয়! আমি কি অজয় চাটুজ্যের খাতক, না প্রজা?" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

"কিন্তু অন্য পাত্রের সঙ্গে যদি চেষ্টা করে?"

"আমাকে জানিয়ো, এমন ভাংচি দিয়ে দেবো যে, বিয়ে করা ত দূরের কথা এ তল্লাটে কেউ তোমাকে ছোঁবেও না। তোমার কোনো ভয় নেই, আমি মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যাব।"

বর্ষা বাদলের দিন,—পথে সন্ধ্যা হইয়া গেলে অন্ধকারে পথ চলিতে কষ্ট হইবে বলিয়া নবগোপাল উঠিতে চাহিল।

শক্তি বলিল, "কখন বেরিয়েছেন, একটু জল খেয়ে যান নবগোপাল দাদা।"

নবগোপাল আপত্তি করিল, কিন্তু শক্তি কিছুতেই শুনিল না। বারান্দায় আসন পাতিয়া জল দিয়া খাবার আনিতে গেল।

নবগোপাল বলিল, "আবার ঠাঁই করছ কেন, হাতেই একটু কিছু দাও না?"

শক্তি সে কথা শুনিল না, একটা কাঁসার রেকাবে চারখানা পরোটা এবং গোটা-কয়েক নারকেল নাড়ু আনিয়া আসনের সম্মুখে স্থাপন করিল।

আসনে বসিয়া নবগোপাল আহার করিতেছে, এবং শক্তি নিকটে বসিয়া একখানা পাখা লইয়া মাছি তাড়াইতেছে, এমন সময়ে অঙ্গনে প্রবেশ করিল গিরিবালা। ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া একটু দাঁড়াইল। তাহার পর শক্তির আকৃতি ও আচরণ হইতে এ কথা বুঝিল যে, ব্যাপারটার মধ্যে বিস্ময়ের কারণ যত বেশিই থাকুক না কেন, চিন্তার কারণ নাই। নিকটে আসিয়া সুরের সহিত সুর মিলাইয়া বলিল, "এই যে নবগোপাল। কতক্ষণ এসেছ বাবা?"

নবগোপাল হাসিয়া বলিল, "তা অনেকক্ষণ। এই দেখ মাসিমা, শক্তি কিছুতেই ছাড়লে না,—এত খাবার খাইয়ে দিলে।"

স্মিতমুখে গিরিবালা বলিল, "সে ত' ভালই করেছে। তুমি ঘরের ছেলে, একটু খাবার খাবে না?"

শক্তি বলিল, "জ্যেঠাইমার শরীর খারাপ শুনে তাঁকে ঘুম থেকে না তুলেই নবগোপাল দাদা বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। এ অবস্থায় ওঁকে কিছু না খাইয়ে ছেড়ে দিতে কি পারি?"

গিরিবালা বলিল, "তাই কখনো হয়। আচ্ছা তোমরা বোসো, কাপড়টা বদলে আমি আসছি।"

গিরিবালা প্রস্থান করিলে নবগোপাল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সব কথা গিরিমাসিমাকে বলবে না কি শক্তি?"

শক্তি বলিল, "অত কথা বলতে গেলে আপনার দেরি হ'য়ে যাবে। পরে আমি সুবিধে মতো সব বলব অখন।"

নারিকেল-নাড়ু খাইতে খাইতে নবগোপাল বলিল, "এমন সুন্দর নারকেল-নাড়ু করেছ, কিন্তু খেতে তেমন মিষ্টি লাগছে না।"

সকৌতূহলে শক্তি বলিল, "কেন?"

নবগোপাল বলিল, "মনটা কেমন উদাস উদাস লাগছে! আজ যদি এমন না হ'য়ে অন্য রকম হ'ত তা হ'লে কত মিষ্টি লাগত এই নারকেল-নাড়ু, বল দিখিনি?"

শক্তি দেখিল নবগোপালের দুই চক্ষু চকচক করিতেছে। ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে নবগোপালও দেখিতে শক্তির চক্ষু দুটিও চকচকে হইয়া উঠিয়াছে। পরাজিত আত্মসমর্পিত শত্রুর প্রতি মানুষের এমনিই ত সমবেদনা হয়। এ ক্ষেত্রে আবার শত্রু হইয়াছে মিত্র।

গিরিবালা আসিলে নবগোপাল আহার শেষ করিয়া অল্পক্ষণ কথাবার্তার পর প্রস্থান করিল।

ঔৎসুক্য সহকারে গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল, "নবগোপলকে খাবার খাওয়াচ্ছিস, দাদা ব'লে ডাকচিস। ব্যাপার কিরে শক্তি?"

শক্তি হাসিয়া বলিল, "সে অনেক কথা মা, পরে সব তোমাকে বলব।"

"ও বইখানা কি বই।"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "কালির মেয়ে কমলকুমারী।"

"কে দিয়েছে? নবো?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এবার থেকে আর নবো নয় মা। তুমি বলবে নবগোপাল, আর আমি বলব নবগোপাল দাদা।" বলিয়া শক্তি হাসিতে লাগিল।

গিরিবালা বলিল, "কি জানি বাবু, তোদের কাণ্ডকারখানা কিছুই বুঝতে পারিনে। আমি চললুম একটু শুতে, শরীরটা তেমন ভাল বোধ হচ্ছে না।"

"কেন মা, জ্বর আসছে নাকি?"

"না, জ্বর নয়,—মাথাটা একটু ঘুরচে।"

"যেখেনে-সেখেনে কষ্ট ক'রে শুয়োনা। চল, আমি তোমার বিছানা ক'রে দিইগে।" বলিয়া শক্তি তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

৭

সন্ধ্যার পর গিরিবালার কম্প দিয়া জ্বর আসিল, এবং মাঝে মাঝে বুকের সেই পুরাতন অসুখটা দেখা দিতে লাগিল। সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও তাহার নিদ্রা হইল না। শক্তিও যন্ত্রণা কাতর জননীর শিয়রে বসিয়া নিরবচ্ছিন্ন জাগিয়া রাত্রি কাটাইল। প্রত্যুষের দিকে, সম্ভবত যন্ত্রণার উপশম হইয়া গিরিবালা একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

পাড়ার এক কৃষক রমণীর গৃহে উপস্থিত হইয়া শক্তি ডাকিল, "হরির মা, ও হরির মা, বাড়ি আছ?"

গৃহাভ্যন্তর হইতে উত্তর আসিল, "আছি। কে? শক্তিদিদিমণি না কি?"

শক্তি বলিল, "হ্যাঁ। একবার বেরিয়ে এস, বড় দরকার।"

দ্বার খুলিয়া হরির মা বাহিরে আসিয়া শক্তির অনিদ্রা-মলিন উৎকণ্ঠিত মূর্তি দেখিয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল, "কি দিদি-মণি? ছোট মা ভাল আছেন ত?"

মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "না, মার বড় অসুখ। তুমি এখনি একবার কবরেজ মশাইকে ডেকে দিতে পারবে হরির মা?"

হরির মা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তা আর পারব না দিদিমণি? এক্ষণি দিচ্ছি। আমরা তোমাদের দাস-দাসী, তোমাদের আশ্রয়ে আছি,—যা হুকুম করবে তাই করব। কিন্তু কি অসুখ দিদিমণি? জ্বর?"

"জ্বর ত বটেই, তার ওপর বুকের অসুখ।"

"আচ্ছা, এখনি আমি ডেকে আনছি।"

বলিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হরির মা বলিল, "হ্যাঁ দিদিমণি, কাল রাতে একেবারে ঘুমোওনি বুঝি?"

শক্তি কিছু বলিল না, শুধু তাহার ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাস্যরেখা স্ফুরিত হইল।

হরির মা বলিল, "দেখ দেখি, অমন চাঁদপানা মুখে একেবারে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে! আমাকে কেন ডাকলে না দিদিমণি। আমি ছোটমার সেবা করতাম।"

শক্তি বলিল, "তুমি সারাদিন খেটেখুটে আবার রাত্রি জাগবে কেমন করে হরির মা?"

দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হরির মা বলিল, "ওমা, শোন একবার দিদিমণির কথা! দিনে খাটি বলে দরকার পড়লে তোমাদের সেবায় রাত্তির জাগব না? তোমার মা ত দেবতা-মানুষ দিদিমণি, পুণ্যি থাকলে সেবা করতে পাব। আজ যদি দরকার হয় নিশ্চয় ডেকো।"

শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতির প্রাণখোলা কথায় কৃতজ্ঞতায় শক্তির দুই চক্ষু ভিজিয়া আসিয়াছিল। জননীর সম্বন্ধে কোনো প্রশংসা শুনিলে তাহার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে। "আচ্ছা, দরকার হলে তোমাকে ডাকব হরির মা।" বলিয়া সে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

কবিরাজ যখন আসিল তখন গিরিবালার নিদ্রা ভাঙিয়াছে। কবিরাজ আসিয়াছে শুনিয়া গিরিবালা অসন্তুষ্ট হইল। অপ্রসন্ন নেত্রে শক্তির প্রতি চাহিয়া বলিল, "এই রকম করে অনর্থক টাকাগুলো নষ্ট করলে সংসার কেমন করে চলবে বল দেখি?"

গিরিবালার শয্যা গুছাইয়া দিতে দিতে মুখ না তুলিয়াই শক্তি বলিল, "অনর্থক কেন মা? এমন করে তুমি অসুখে পড়ে থাকলেই না সংসার কেমন করে চলবে বল?"

বিরক্তিভরে গিরিবালা গজগজ করিতে লাগিল।

ক্ষণকাল পরে শক্তির সহিত কবিরাজ প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ হস্ত শক্তির দিকে প্রসারিত করিয়া বলিল, "আমার ভিজিটটে মা লক্ষ্মী?"

কবিরাজের অর্থগৃধ্নুতা এবং চক্ষুলজ্জাহীনতা দেখিয়া শক্তি বিরক্তি বোধ করিল। কিন্তু মুখে কিছু না বলিয়া আলমারি খুলিয়া কৌটা হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া কবিরাজের হস্তে দিল। টাকাটা লইয়া চক্ষুর্ঘূর্ণিত করিয়া কবিরাজ উভয় দিক পরীক্ষা করিল, নখ দিয়া রেখাঙ্কিত দিকটার রেখাগুলো অনুভব করিয়া দেখিল, তাহার পর মেজের উপর টাকাটা ফেলিয়া শব্দ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া ট্যাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, "তোমাদের মতন ঘরে ভিজিট পরে নিলেও কোনো ক্ষতি নেই মা, —কিন্তু সেই যে পীতম্বর সার বাড়িতে বড়

ঠকানটা ঠ'কে শপথ করেছি, তারপর থেকে ভিজিট আদায় না করে নাড়ি ছুঁইনে। নাড়ি দেখতে দেখতে পীতাম্বর সার শাশুড়ী দুবার খাবি খেয়ে চোখ বুজলো।—ব্যস, আর ভিজিট দেবে না! বলে কি না, দানই যখন হল না তখন দক্ষিণে আবার কি! মরা গরু কি দুধ দেয়? শোনো একবার কথা! মরল ত শাশুড়ী, তবে পীতম্বর সা দুধ দেবে না কেন? খাবার নিয়ে যেতে যেতে চিলে ছোঁ মারলে ময়রা পয়সা ছেড়ে দেয় না-কি? সেই দিন সেইখেনে দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, এর পর থেকে আগে কড়ি তারপর নাড়ি।" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কবিরাজের কাহিনী এবং কৈফিয়ৎ শুনিয়া শক্তির মনের মধ্যে বিরক্তি বাড়িয়াই গেল। নীরবে গম্ভীর মুখে সে মাতার শয্যাপার্শ্বে কবিরাজের বসিবার জন্য একটা কাঠের টুল স্থাপন করিল।

টুলের উপর বসিয়া গিরিবালার নাড়িতে হাত দিয়া কবিরাজের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল মনোযোগ সহকারে নাড়ি পরীক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কদিন জ্বর হয়েছে?"

শক্তি বলিল, "কাল সন্ধ্যে থেকে।"

"এক রাত্রেই নাড়ির অবস্থা এ রকম?" বলিয়া রোগ সম্বন্ধে কতকগুলো প্রশ্ন করিয়া বাহিরে আসিয়া কবিরাজ শক্তিকে বলিল, "তোমার মার ব্যামি কঠিন। প্রাণের আশঙ্কা আছে।"

শুনিয়া সন্তাপে শক্তির হাত-পা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। বাঁ হাত দিয়া দেওয়াল ধরিয়া কম্পিত দেহকে খাড়া রাখিয়া ভীতি পাংশু মুখে সে কবিরাজের মুখের দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তাহার পর বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আপনি ভাল করে চিকিৎসা করুন কবিরাজ মশায়,—যা খরচ লাগে আমরা দেবো। মাকে ভাল করে দিতেই হবে।" শক্তির দুই চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া একরাশ অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

কবিরাজ বলিল, "চেষ্টা ত' প্রাণপণে করব,—তারপর তোমার মার অদৃষ্ট আর কবিরাজের হাতযশ।"

শুনিয়া উপরে বিধাতাপুরুষের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। গিরিবালার আরোগ্যলাভ ব্যাপারে তাঁহার মহিমার এতটুকু অংশ নাই!

প্রস্থানোদ্যত হইয়া কবিরাজ বলিল, "উপস্থিত ওষুধে সাড়ে তিন টাকা পড়বে। সর্ব দামী ওষুধ। দামটা একটু শীগগির পাঠিয়ে দিয়ো মা-লক্ষ্মী, ওষুধ তৈরি করতে সময় লাগবে।"

কবিরাজের কথা হইতে শক্তি বুঝিল, যতক্ষণ কবিরাজের হাতে ওষুধের দাম না পেঁৗছাইতেছে ততক্ষণ ওষুধ তৈরি করা আরম্ভ হইবে না। সে বলিল, "ওষুধের দামটা তুমি আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি কবিরাজ মশায়, আপনি গিয়েই ওষুধ করতে আরম্ভ করে দিন। একটু পরে আমি কাউকে ওষুধ আনতে পাঠিয়ে দেবো।"

কয়েক পদ ফিরিয়া আসিয়া কবিরাজ বলিল, "আচ্ছা, তাই ভাল। আধঘণ্টাটাক পরে লোক পাঠিয়ো।"

শক্তি চারটা টাকা আনিয়া কবিরাজের হাতে দিয়া বলিল, "আপনার কাছে আট আনা পয়সা হবে কি?"

কবিরাজ হাসিয়া বলিল, "তোমাদের বাড়িই ত' প্রথম এসেছি মা, পয়সা সঙ্গে নেই। আচ্ছা, ওষুধের অনুপান তোমরা সংগ্রহ করবে, না আমিই পাঠিয়ে দোব? একটু গোলমেলে অনুপান আছে কিন্তু।"

অনুপান সংগ্রহ করিতে গেলে ওষুধ খাওয়াইতে বিলম্ব হইয়া যাইবে; তা ছাড়া সব অনুপান ঠিক মতো জোগাড় করিতে পারিবে কি-না, এই সব মনে করিয়া শক্তি বলিল, "অনুপান আপনিই পাঠিয়ে দেবেন।"

কবিরাজ বলিল, "তা হলে ঠিকই হয়েছে —ও আট আনা অনুপানের চার্জে কাটান যাবে। কি বল?"

সুবিধা পাইলেই কবিরাজ ভিজিট, চার্জ প্রভৃতি সযত্নে সংগ্রহ করা কয়েকটি ইংরাজি কথা ব্যবহার করে। সে মনে করে এই কথাগুলি ব্যবহার করিলে অশিক্ষিত গ্রামবাসীর মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক করা যায়।

শক্তি দেখিল অনুপানের ছল করিয়া যে আট আনা পয়সা কবিরাজ গলাধঃকরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা রক্ষা করা আর কোনো প্রকারেই সম্ভব হইবে না। বলিল, "আচ্ছা, তাই করবেন।"

টাকাগুলো পুনর্বার পরীক্ষা করিয়া লইয়া "দুর্গা শ্রীহরি" বলিয়া টাঁকে গুঁজিতে গুঁজিতে প্রসন্ন চিত্তে কবিরাজ প্রস্থান করিল।

ঘরের ভিতর শক্তি প্রবেশ করিতেই গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিল, "কবিরাজ কি বললে রে শক্তি? বললে, অসুখ শক্ত, আমি বাঁচব না—না?"

যথাসম্ভব নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া শক্তি বলিল, "তা কেন মা? ভাল করে চিকিৎসা হলে তুমি শীঘ্রই ভাল হয়ে উঠবে। উনি ভাল ওষুধ দেবেন বলেছেন।"

শক্তি যে প্রশ্নের যথোচিত উত্তর এড়াইয়া গেল তাহা উপলব্ধি করিয়া গিরিবালা বুঝিল তাহার অসুখ কঠিন। ভবিষ্যতের কঠোর দুশ্চিন্তায় তাহার মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না; কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া সহসা অতর্কিতে দুই চক্ষুর পাশ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

দেখিতে পাইয়া শক্তি তাড়াতাড়ি বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছাইয়া দিয়া আর্তকণ্ঠে কহিল, "মা, তুমি কাঁদছ?"

কন্যার মস্তকে সস্নেহে হাত রাখিয়া গিরিবালা বলিল, "কাঁদছিনে, ভাবছি। নিজের জন্যে ভাবছিনে শক্তি, তোর জন্যেই ভাবছি। মরণ ত' আছেই একদিন, সে জন্যে ভাবিনে। আমি না থাকলে তোর কি দুরবস্থা হবে সে ভাবনায় আমার বেঁচেও সুখ নেই।"

দুই বাহু দিয়া জননীকে জড়াইয়া ধরিয়া মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে শক্তি বলিল, "না মা, তুমি ও-সব কথা বোলো না। ও-সব কথা তুমি ভেবোও না মা। তুমি দেখো, আমি নিশ্চয় তোমাকে ভাল করে তুলব। তা যদি না পারি তা হলে—"

তাহা হইলে কি হইবে তাহা ভাবিতে এবং বলিতে না পারিয়া শক্তি নিঃশব্দে গিরিবালাকে আরও একটু দৃঢ়ভাবে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু গিরিবালা সেই কথা ভাবিয়াই বলিল, "হ্যাঁ রে শক্তি, অশোককে যে চিঠি দিয়েছিলি সে আজ ক'দিন হল?"

একটু ভাবিয়া শক্তি বলিল, "দিন দশ বারো হবে।"

সে চিঠি ঠিক গেছল ত? সে একটা তার উত্তর পর্যন্ত দেবে না, এ কি সম্ভব? ডাক বাক্সয় কে চিঠি ফেলেছিল?"

শক্তি বলিল, "তা ত' বলতে পারিনে মা, মোক্ষদাকে দিয়েছিলাম, সে কাকে দিয়েছিল তা জানিনে।"

মনে মনে একটু কি ভাবিয়া গিরিবালা বলিল, "অশোককে আর একখানা চিঠি দে শক্তি। যদি পারে ত' একবার যেন এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করে।"

শক্তি বলিল, "আর দু-চার দিন দেখে তারপর দিলেই হবে মা। এ পাড়াগাঁ থেকে চিঠি যেতে আসতেই ত' পাঁচ সাত দিন লাগে। তারপর চিঠি পেয়েই অশোকদাদা যে উত্তর দেবেন তারই বা কি ঠিক আছে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া গিরিবালা বলিল, "আচ্ছা, তাই না-হয় দু-চার দিন পরেই দিস।" মনে মনে বলিল, কিন্তু বেশী বিলম্ব সইবে কি-না তা বলতে পারিনে।

এ চিঠি অবশ্য সেই চিঠি যাহা ভবতারার হাতে পড়িয়া যথাস্থানে পেঁৗছাইতে পারে নাই।

শক্তি বলিল, "মা, চুপ করে শুয়ে থাক, উঠো না। হরির মাকে ওষুধ আনতে পাঠিয়েই আমি আসছি।" বলিয়া সে প্রস্থান করিল।　　　　(ক্রমশ)

ক্ষুধা

অমর সান্যাল

মফস্বলের ছোট শহর, রাজধানী থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। শহরবাসীরা তাদের মৌলিকতাটুকু ছেঁটে ফেলে প্রাণপণে চেষ্টা করছে দূরে রাজধানীর পঙ্কিল আবর্তে স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিতে। আধুনিক সভ্যতা তার সমস্ত কদাচার নিয়ে শহরের বুকে আসন গেড়ে বসল। বৃদ্ধেরা যুগধর্মের দোহাই দিয়ে হাল ছেড়ে দিলেন, তরুণেরা তারুণ্যের জয়ঘোষণায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। শহরের পথেঘাটেও দেখা দিল হঠাৎ পরিবর্তনের আভাস। তরুণের দল অকারণে হল্লা করে পথ চলে, বাক্যস্রোতের তোড়ে ইন্দ্রের ঐরাবতও বোধহয় ভেসে যেতে পারে। তরুণীরা স্বাস্থ্যহীন লাবণ্য প্রসাধনের প্রলেপে যথাসাধ্য রূপায়িত করে ছোটে সিনেমার দিকে—সাড়ে ছয়টার শো মিস্ না হয়।

সন্ধ্যা না হতেই শহরের বড় রাস্তায় আলো জ্বলে ওঠে। উন্মত্ত জনস্রোতে কুৎসিত একটা সরীসৃপের মত পথ বেয়ে গড়িয়ে চলে। সেদিন কিন্তু এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল। মোড়ের মাথায় এসে জনপ্রবাহ যেন থমকে যাচ্ছিল। কারণ খুব সাধারণ। মোড় ঘুরলেই যে বড় বাড়ীটা পথিকের দৃষ্টি সর্বাগ্রে আকর্ষণ করত তার ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে আজ দশ বছর পরে। ঘুমন্ত পুরী যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে। জানালায় জানালায় দামী বিলাতি নেটের পর্দা, অর্গ্যানের মিষ্টি সুর আর ক্রোটন ও পামগাছের কম্পিত ছায়াবীথি পথচারীদের চোখে স্বপ্নঘোর এনে দিল।

বাড়ীটা চেনে সবাই। মালিক শহরের বড় উকিল পরিতোষ চাটুয্যে। পরিতোষ বাবু ঘরছাড়া হয়েছেন অনেকদিন। স্ত্রীবিয়োগের পর ভদ্রলোক বৈরাগ্যসাধনে মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই পুনরাগমন করেননি এত সমারোহ নিয়ে। কিন্তু নবাগতের পরিচয় জানতে না পারলে জনতার সুখশয্যা কণ্টকাস্তীর্ণ হয়ে উঠবে—সরীসৃপটা যেন সেখানেই আটকে গেল। যুবকের দল অনিমেষে তাকিয়ে রইল দোতলার বারান্দার দিকে নিদ্রিত পুরীর রাজকন্যার দর্শন আশায়। বৃদ্ধেরা ছড়ি ঘুরিয়ে চঞ্চল চরণে পাদচারণা করতে লাগলেন ও পরিতোষ বাবুর যাবতীয় সদগুণের ব্যাখ্যা করে আসর গরম রাখলেন।

বাহিরের অবস্থা এই, ভিতরের অবস্থা আর এক রকম। পরিতোষ বাবু সত্যিই দশ বৎসরের নির্বাসন থেকে ফিরেছেন—সঙ্গে নববধূ উর্মিলা। মনে মনে বিচার করে দেখছেন পরিতোষ বাবু,—উর্মিলাকে তিনি ঠিক ভালবেসে বিয়ে করেননি, নেহাৎ তার গরীব মাতাপিতাকে দায়মুক্ত করবার জন্য, ইত্যাদি। বিয়ের পরে এক বৎসর শ্বশুর বাড়ীতে কাটিয়ে তিনি ফিরেছেন নিজের বাড়ীতে। এই সময়টুকুর মধ্যেই উর্মিলা তাঁকে মুগ্ধ করে ফেলেছে। বীণার ছিন্ন তার আবার জোড়া লেগেছে, পুরাতন সুর পরিতোষ বাবু ফিরে পেয়েছেন। সেদিন দুপুরবেলা বাড়ী পৌঁছবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীহীন বাড়ীখানা উর্মিলার যত্নে শ্রীমণ্ডিত হয়ে পরিতোষবাবুকে তাক লাগিয়ে দিল। তিনি পুলকিত চিত্তে ভবিষ্যতের সুমধুর চিন্তায় মসগুল হয়ে রইলেন। অর্গ্যানে একটা গৎ বাজিয়ে উর্মিলা এসে বসলেন মেঝেতে ঠিক পরিতোষবাবুর পায়ের কাছে।

পরিতোষবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—ওকি! ওখানে কেন! এত চেয়ার থাকতে—

—তা হোক, এই আমার সবচেয়ে বড় আশ্রয়; উর্মিলা পরিতোষবাবুর দুই পা কোলের উপর তুলে নিলেন।

পরিতোষবাবু বাধা দিলেন না; ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা চোখ বুজে উপভোগ করতে লাগলেন। প্রথম যৌবনের সঙ্গিনীর কথা মনে পড়ল; স্নেহে মমতায় এত মধুর সে ছিলনা। রমলা ছিল যৌবনের নর্ম সহচরী; উর্মিলা জীবনের সায়াহ্নসঙ্গিনী। চোখ না খুলেই পরিতোষ বললেন,—নাঃ, তুমি দেখছি অসাধ্যসাধন করতে পার। এত বড় বাড়ীখানা এরি মধ্যে ঝেড়ে মুছে।

উর্মিলা হেসে বললেন—বারান্দায় দেখবে এস; তোমার গিন্নীর গুণপনা দেখতে ভিড় জমে গেছে বাড়ীর সামনে।

পরিতোষ বিস্মিত হলেন; বাড়ীর ইজ্জৎ হঠাৎ বেড়ে গেল কেন? চুপি চুপি দাঁড়ালেন তিনি বারান্দায়। জনারণ্যের মধ্যে পরিচিত মুখ দেখা যাচ্ছে—উমেশ দত্ত, যদু মুখুজ্জে। তিনি আশ্বস্ত হলেন। হঠাৎ কার স্পর্শ গায়ে লাগতেই তিনি চমকে উঠলেন,—উর্মিলা দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে। তিনি ছিলেন আলোর আড়ালে; কিন্তু উর্মিলার ঘোমটাখসা মুখ আলোর ছটায় ঝলমল করছে। জনতার চোখের কোণে ফুটে উঠেছে লোভ ও বিস্ময়। ঈষৎ ক্রোধ-মিশ্রিত স্বর পরিতোষের মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে এল,—তুমি এখানে কেন?

পরিতোষবাবুর প্রত্যাবর্তন সারা শহরের চিত্তকে উদ্বেল করে তুলল। চল্লিশ বৎসরে তিনি আবার বিয়ে করেছেন,—স্ত্রী অপূর্ব রূপসী। পরিতোষ দুদিনেই জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। কোর্টের দিকে আবার তিনি যাতায়াত আরম্ভ করলেন, মক্কেল সংগ্রহের ভার নিল শহরের যুবকেরা অযাচিতভাবে। দশ বৎসর পরে পরিতোষ আবার উপার্জনের নেশায় মত্ত হয়ে উঠলেন।

সারাদিন সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকেন উর্মিলা। সকাল থেকে ঘরে ঘরে ঝাড়া-মোছার কাজ চলে, এরি মধ্যে রান্নার কাজটাও তিনি চালিয়ে নেন। খাওয়াশেষে পরিতোষের তৃপ্তির উদ্গারে উর্মিলার বুক বিভোর হয়ে যায়। তারপর আরম্ভ হয় দেবসেবা। পাষাণ দেবতার বেদীমূলে পূর্ণ এক ঘণ্টা সাষ্টাঙ্গে নত হয়ে থাকেন উর্মিলা,—প্রার্থনা করেন স্বামীর অটুট স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ আয়ু। পাড়ার মেয়েদের আগমনে অলস মধ্যাহ্ন সজীব হয়ে উঠে। সকলে উর্মিলার গৃহিণীপনার শতমুখে প্রশংসা করেন।

যদু মুখুজ্জের স্ত্রী একদিন মুখ ফুটে বলেই ফেললেন,—খাসা হয়েছে পরিতোষের এপক্ষের বৌ। প্রথম বৌটা দেমাকে কথাই বলত না আমাদের সঙ্গে।

সমবেত মহিলামণ্ডলী তাঁকে সমর্থন করলেন একবাক্যে। ভারতীয় নারীর আদর্শ বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করেছে পরিতোষের স্ত্রীর মধ্যে। তাঁদের প্রশংসার আতিশয্যে উর্মিলা লজ্জিত হলেন, বললেন—এতো আমার কর্তব্য খুড়িমা, প্রশংসার দাবী এর জন্য আমি একটুও করতে পারি না।

এই সবিনয় প্রত্যুত্তর আবার সকলকে প্রশংসায় মুখর করে তুলল।

বৈকালের ছায়া নেমে আসে ধীরে ধীরে। শহরের সান্ধ্য উন্মাদনার আভাসে মধ্যাহ্নের জড়তা চাপা পড়ে যায়। যদু মুখুজ্জের মেয়েরা এসেছে সিনেমা যাওয়ার পথে। তারা ধরে বসল উর্মিলাকে,—চল না বৌদি।

মুখ টিপে হাসলেন উর্মিলা,—তোমাদের দাদা পছন্দ করেন না এসব। সিনেমাযাত্রীরা চলে গেল অবজ্ঞার হাসি হেসে।

আঃ, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন উর্মিলা। দোতলার বারান্দায় প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে

বললেন,—হে ঈশ্বর, এইসব বন্ধুদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর। গোঁসাইপুরে আসার পর থেকেই মধ্যাহ্নভক্তের দল জীবন বিড়ম্বিত করে তুলেছে। তাঁর অবসরটুকু একটা বিভীষিকায় পর্যবসিত হয়েছে।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজার সংগে উর্মিলা সচেতন হয়ে উঠলেন। পরিতোষবাবু ফিরবেন আধ ঘণ্টা পরেই। উর্মিলা সাজগোজ করে দাঁড়ালেন আয়নার সামনে। হ্যাঁ, রূপসী বটে। রূপজ্যোতিবলয়িত এক তরুণীমূর্তির ছায়া পড়েছে আয়নার বুকে। উর্মিলা বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন। পাশে কার ললিত প্রতিচ্ছায়া দেখা দিয়েছে? এক সুন্দর সুবেশ তরুণ যুবক? চোখ মেলে চাইলেন উর্মিলা। পরিতোষবাবু ফিরে এসেছেন, তাঁরই পাশে দাঁড়িয়ে বিগত যৌবন এক প্রৌঢ়।

উর্মিলা শিউরে' উঠে সামলে নিলেন। পরিতোষ বললেন,—ওকি, চমকে উঠলে কেন?

না, কিছু নয়; বস, তোমার জুতো খুলে দিই।

পরিতোষ বললেন—বাইরে বসছি আমি। হরেন সরকার এসেছে দলবল নিয়ে বেজায় ধরেছে আমাকে, পূজো কমিটির সেক্রেটারী হতে হবে।

পরিতোষ বেরিয়ে যেতেই উর্মিলার সকল শৈথিল্য এক নিমেষে অন্তর্হিত হল। কোন এক অদৃশ্য সুরের গোপন আঘাতে তাঁর দেহে রক্তপ্রবাহ সমুদ্রের ঢেউ-এর মত চঞ্চল হয়ে উঠল। চাকরের হাতে ট্রে বোঝাই করে চা ইত্যাদি সযত্নে সাজিয়ে দিয়ে তিনি দাঁড়ালেন বাইরের ঘরের পর্দার আড়ালে কান পেতে।

পাউডার ও সেন্টের মৃদু গন্ধ উর্মিলার নাকে লাগছে। তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন অসহায় জড়ের মত। কে যেন মন্ত্রবলে তাঁর সকল শক্তি হরণ করেছে। অজ্ঞাতসারে পর্দার আবরণ একটু একটু খুলে ফেললেন তিনি। প্রদীপ্ত যৌবন যেন প্রৌঢ় পরিতোষকে ব্যঙ্গ করছে।

ঘরের সকলের দৃষ্টি ও চেতনা নিমেষের মধ্যে সেদিকে ফিরে গেল। যুবকদের এতদিনের সাধনা সিদ্ধ হল। বিস্ময়ে হতবাক পরিতোষ দেখলেন উর্মিলাকে সেই প্রথম দিনের মত,—ঘোমটাখসা মুখ, আলোকধারায় ঝলমল করছে।

উর্মিলার যুক্তিজালে পরিতোষের ক্রোধবহ্নি আটকা পড়ে গেল। কিন্তু নির্জীব আগ্নেয়গিরির মতই তাঁর অন্তরের বহ্নি লোকচক্ষুর অন্তরালে জ্বলতে লাগল। প্রথম জীবনের সঙ্গিণীর হারাণো স্মৃতি যখন এসে চুপি চুপি তাঁর মনে নির্দিষ্ট একটা স্থান অধিকার করে বসল, আর সেই সংগে তুলনায় উর্মিলা বোধ অনেকখানি খাটো হয়ে বার বছর পরে রমলার মৃত্যুমলিন মুখ পরিতোষের চোখে অশ্রুর বন্যা এনে দিল। এদিকে উর্মিলার সেবার চাপে তিনি উঠলেন হাঁপিয়ে!

সংসার চলতে লাগল প্রায় আগের মতই। পরিবর্তনের মধ্যে শুধু উর্মিলার স্বামী-সেবায় মাত্রাধিক্য দেখা ছিল, আর বাইরের জগৎ পরিতোষকে অন্দরের মোহ থেকে ছিনিয়ে নিল। উর্মিলার পরিবর্তনই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল বেশী। এযেন এক সুকঠোর তপশ্চর্যা, নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে সাধনাসিদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া!

যদু মুখুজ্জের স্ত্রী মন্তব্য প্রকাশ করলেন উর্মিলার সামনেই,—পরিতোষের ভাগ্যের জোর আছে, নইলে বুড়ো বয়সে এমন বৌ জোটে!

তাঁর বড় মেয়ে বলল,—বৌদির স্বভাবও হয়েছে বুড়োর মত, বায়স্কোপ পর্যন্ত দেখেন না।

উর্মিলার মুখে মৃদু হাসি, বললেন,—এত বড় সার্টিফিকেট আমাকে দেবেন না খুড়িমা। তবে এইটুকু বলতে পারি, আনন্দ পাওয়া যায় ত্যাগের মধ্যে, ভোগে নয়।

কুড়ি বছরের তরুণীর মুখে এই কথা যেন খুড়িমাকে মর্মান্তিক ঠাট্টা করে বসল। কোনমতে বিরক্তি চেপে তিনি বললেন, তোমার মত মনের জোর কজনের আছে উর্মিলা! তবে কচি বয়সে একটু আধটু—

খুড়িমা হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

উর্মিলা জানতেন তাঁর এই উষ্মার কারণ। যদুবাবুর বড় মেয়ে পাড়াগাঁয়ে স্বামীর ঘর করতে গেলেন না শুধু এই বায়স্কোপ, ইলেকট্রিক আলো, জলের কল আর পীচ-মোড়া রাস্তার মোহে।

অভ্যাগতের দল সেদিন প্রস্থান করলেন একটু সকাল সকাল। বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুরের রোদ, উর্মিলা নিঃশব্দে দাঁড়ালেন দোতলার বারান্দায় রেলিঙ ঘেঁসে। জনহীন রাজপথ, শ্রান্ত অজগরের মত নিঃসাড়ে পড়ে আছে। একটু পরে এর সত্তা চঞ্চল হয়ে উঠবে প্রমত্ত নরনারীর পদধ্বনিতে। শহরের ঝিমিয়েপড়া মধ্যাহ্নজীবন কৃত্রিমতার জৌলুষে আবার রঙীন হয়ে উঠবে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই কথাই ভাবছিলেন উর্মিলা। মনে বেশ একটু গর্ব অনুভব করছিলেন তিনি, এসব চপল আনন্দের নেশা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারেনি। পরিতোষের জীবনপ্রবাহে তাঁর অস্তিত্ব নিঃশেষে তরঙ্গায়িত হয়েছে, তাঁর মানবসত্তা আজ বিচরণ করছে সকল প্রলোভনের ঊর্ধ্বে। উর্মিলার শৈশবশিক্ষা বিফল হয়নি।

পুলিশ লাইনের পেটা ঘড়ির শব্দ উর্মিলাকে সজাগ করে তুলল। ছটা,—উর্মিলা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এত দেরী পরিতোষের হয় না কোনদিন। উর্মিলার ব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ হল রাজপথের দিকে। তন্দ্রাভঙ্গ অজগরটা হেলেদুলে চলেছে আবার। ক্ষুধার ইন্ধন সংগ্রহ করতে। পথের ওধারে চায়ের দোকান থেকে ক্ষুধিত দৃষ্টির সার্চলাইট একযোগে পড়েছে উর্মিলার মুখের উপর। মেয়েরা বিলাতি ঢঙে পথ চলেছে আত্মীয়-অনাত্মীয় যুবকদের সংগে। কোনদিকে লক্ষ্য রাখবার অবসর নেই উর্মিলার। তাঁর এই আকর্ষণীয় শক্তির মহিমা তিনি শুধু নীরবে উপভোগ করছেন, তাঁর দৃষ্টি প্রসারিত রয়েছে দূর পথপ্রান্তে, যেখানে দেখা দেবে পরিতোষের গৃহগামী মূর্তি।

হরেন সরকাররা আসবে একটু পরে, পরিতোষ না এলে তাদের অভ্যর্থনা করবে কে? উর্মিলা নিজের বেশভূষার দিকে একবার তাকিয়ে শিউরে উঠলেন। ছিঃ ছিঃ, এই কাপড়ে লোকের সামনে বেরোন যায়? ঘরে ঢুকে উর্মিলা কেশ ও বেশবিন্যাসে রত হলেন। ঘড়ির দিকে তাকালেন একবার, সাড়ে ছটা বাজে। হরেনরা আসে ঠিক সাড়ে ছটায়। কিন্তু—কিন্তু পরিতোষের আজ হল কি? ওরা এসে হয়ত ফিরে যাবে। তাই যদি নিজে থেকে ওদের অভ্যর্থনা করি! উর্মিলার বক্ষের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হল, তিনি স্বপ্নাবিষ্টের মত আয়নার সামনে দাঁড়ালেন।

আয়নার বুকে ও'কার ছায়া? কোন এক রূপসীর বিশ্ববিজয়িণী মূর্তি! এরূপের সংগে পরিতোষ ত পরিচিত নয়! উর্মিলা বুঝে উঠতে পারলেন না আজ তিনি এই মোহিনী সজ্জায় সজ্জিত হয়েছেন কেন।

সিঁড়িতে একসংগে অনেক পায়ের শব্দ হচ্ছে। উর্মিলা সন্ত্রস্ত হয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন। হুড়মুড় করে এসে পড়ল একদল মেয়ে। —এই যে বৌদি, বায়স্কোপে যাচ্ছেন নাকি? মেয়েরা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

উর্মিলার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, নেমন্তন্ন আছে এক জায়গায়, তোমাদের দাদার আসার অপেক্ষায় আছি। তা, তোমরা এই অসময়ে?

একটি মেয়ে বলল,—আপনার সুখ্যাতি শুনে এলাম বৌদি আলাপ করতে। আজ চললাম তবে।

উর্মিলার মুখ রাঙা হয়ে উঠল। মেয়েরা চলে যেতেই তিনি সযত্নবিন্যস্ত কেশপাশ শিথিল করে দিলেন; দীপ্তিময় বসন ও আভরণ ধুলায় লুণ্ঠিত হল; দীনবেশে উর্মিলা আবার স্থান নিলেন রেলিঙের গায়ে।

সাতটা বাজল। উর্মিলা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকালেন চারদিকে। পরিতোষ গাড়িচাপা পড়েননিত? সংগে টাকা থাকে রোজই,—টাকার লোভে নরহত্যা ত বিরল নয়! পরিতোষের মৃত্যুর একাধিক সম্ভাবনা উর্মিলার মনে নির্লজ্জভাবে ভিড় করতে

লাগল। অসহ্য বিস্ময়ে মনকে শাসন করতে চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু তাঁর রক্তচক্ষুকে মন যেন সহাস্যে বিদ্রূপ করে উঠল। তিনি সভয়ে দেবতার নাম উচ্চারণ করলেন, কিন্তু তাঁর নিজের কানেই আজ বেসুরো ঠেকল ঈশ্বরের নাম।

আবার পায়ের শব্দ সিঁড়িতে। ভীতনেত্রে ঊর্মিলা তাকালেন। এবার দেখা দিল ভৃত্য দামু।

দামু ডাকল,—মা!

ঊর্মিলার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি অনুসরণ করে সে বলল,—বাবুর বড় অসুখ মা, হরেনবাবু এসেছেন খবর নিয়ে। বাবুকে—

দামুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঊর্মিলা প্রায় ছুটে নীচে নেমে গেলেন।

বাইরের ঘরে উদ্বিগ্নমুখে হরেন সরকার চেয়ারে উপবিষ্ট। পায়ের শব্দে চোখ ফেরালেন তিনি। ঊর্মিলা। সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করলেন হরেন,—পরিতোষদা অফিসে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাঁকে তখনি হাসপাতালে পাঠান হয়। জ্ঞান হয়নি এখনও। ডাক্তার বলছেন, মানসিক অবসাদ ও চিন্তার ফলে এরকম হয়েছে।

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন ঊর্মিলা। তারপর বললেন,—আপনি বসুন একটু, আমি যাব। তাঁর আচরণে একটুও জড়তা নেই, কণ্ঠস্বরও সুস্পষ্ট।

নিজের ঘরে এসে অভিভূতের মত বসে রইলেন ঊর্মিলা। তাঁর ইচ্ছা ও কর্মশক্তি যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হয়েছে। খোলা জানালা দিয়ে খাটের উপর লুটিয়ে পড়েছে এক ঝলক চাঁদের আলো, স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসছে শহরের নৈশ জীবনের অস্পষ্ট ইঙ্গিত। উঠে দাঁড়ালেন ঊর্মিলা। হরেন সরকার অপেক্ষা করছে! সুন্দর সুবেশ যুবক, প্রতি অঙ্গে তার কামনার ইসারা মূর্ত হয়ে উঠেছে। পরিত্যক্ত বেশবাস ঊর্মিলার বরদেহ আবার লোভনীয় লালিত্যে পূর্ণ করে তুলল, কেশপাশ ধরা দিল নূতন ছন্দোবন্ধনে। ঊর্মিলার বুক কাঁপছে দুরুদুরু, অভিসাররজনী এসেছে তাঁর জীবনে।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

বাঁচবার জন্য খাওয়া

ডাঃ কালীপদ বসু ডি-এস্‌সি (ঢাকা), পিএইচ, ডি (মিউনিক)

শরীরের সুস্থতা, রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা এমন কি শরীরের দৈর্ঘ, অঙ্গসৌষ্ঠব এবং পরমায়ু অনেক পরিমাণে খাদ্যের উপর নির্ভর করে। একথা পুষ্টি বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয়েছে। কা'রো কা'রো মতে শরীরের স্বাস্থ্যসম্পদ ও দৈর্ঘবিস্তার জাতিগত ও বংশগত সম্পত্তি কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, শরীরের উপর খাদ্যের যতটা প্রভাব, জাতি ও বংশের প্রভাব তার তুলনায় খুবই সামান্য। ইংলণ্ড অধিবাসী ও অস্ট্রেলিয়া অধিবাসী ইংরেজের শরীরের দৈর্ঘের ও স্বাস্থ্যের প্রভেদ বেশ স্পষ্ট এবং এই প্রভেদের মূলে খাদ্যের তারতম্য। বাঙলাদেশেও এক বংশের লোকই যাঁহারা দুই চারি পুরুষ স্বচ্ছল অবস্থায় ঘৃতদুগ্ধে পুষ্ট হয়েছেন, তাঁহাদের সুঠাম দেহের দৈর্ঘবিস্তার ঐ বংশের দরিদ্র অর্ধভুক্ত লোকের চেয়ে বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর। স্বাস্থ্য ও খাদ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ম্যাক্‌কারিসন সাহেবের বিখ্যাত পরীক্ষায় সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে। একই মায়ের গর্ভজাত সমান ওজনের কতকগুলি ইঁদুর শাবককে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ খাদ্য কয়েক সপ্তাহ ধরে খাইয়ে ম্যাক্‌কারিসন দেখতে পান যে পাঞ্জাবী খাদ্যে ইঁদুরের ওজন বৃদ্ধি হয়েছে সব চাইতে বেশী এবং বাঙালী ও মাদ্রাজ খাদ্যভোজী ইঁদুরের ওজন বৃদ্ধি হয়েছে সব চাইতে কম। পাঞ্জাবী ও বাঙালীর স্বাস্থ্যের প্রভেদ অনেকটা তাহাদের খাদ্যের তারতম্যের জন্য।

উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে শরীর দুর্বল হয়, রোগ নিবারণ করিবার শক্তি কমে যায় এবং রোগের পর শরীর সুস্থ হতেও অনেক সময় লাগে। যে দেশে সাধারণ খাদ্য যত ভাল সে দেশে শিশুর মৃত্যু ও প্রসূতি মৃত্যুর হার তত কম ও সে দেশের অধিবাসী তত দীর্ঘায়ু হয়। ১৯৪১ সালে ভারতবর্ষে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ১৫৮ থেকে ২৫০ এবং সে বৎসর ইংলণ্ডে শিশুমৃত্যুর হার ছিল মাত্র হাজারে ৫৯। এদেশে সন্তান হওয়ার সময়েও বহু জননী মারা যান প্রতি হাজারে ১৬—২৪, ইংলণ্ডে এ অবস্থায় মৃত্যুর হার অনেক কম। এ অবস্থার জন্য এ দেশের যথেষ্ট পরিমাণে যথোপযুক্ত খাদ্যের অভাবই দায়ী। খাদ্যে কোন কোন উপাদানের অভাব ঘটিলে শরীরে বিভিন্ন ব্যাধি দেখা দেয়, যেমন বেরিবেরি, রিকেট স্কার্ভি, রাতকাণা ও অন্যান্য চক্ষুরোগ, রক্তশূন্যতা, গলগণ্ড ইত্যাদি। আমাদের দেশে এসব রোগের অভাব নেই। উপযুক্ত খাদ্যের অভাব জনিত শরীরের দুর্বলতা ও রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতা হ্রাসের জন্যই যক্ষ্মা রোগের এত বিস্তার হচ্ছে।

পরন্তু খাদ্যের উন্নতি হইলে লোকের স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয় শরীরের দৈর্ঘ ও শক্তি বাড়ে, শিশ ও প্রসূতি-মৃত্যুর হার কমে যায় এবং লোকের আয়ু বেড়ে যায়। কিছুদিন পূর্বেও ইংলণ্ডে শিশুদের মধ্যে রিকেট নামক হাড়ের পীড়ার খুবই প্রাদুর্ভাব ছিল, কড্‌লিভার তেল খাওয়ার প্রচলন করে এই রোগ ঐ দেশ থেকে এক রকম বিতাড়িত হয়েছে। ১৯১৮ সনে ইংলণ্ডে শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ৯৭, খাদ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার ফলে ১৯৪১ সনে ইংলণ্ডে শিশুমৃত্যুর হার ৫৯ এ নেমেছে। বর্তমান মহাযুদ্ধের মধ্যেও ইংলণ্ডে লোকের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত উন্নত হয়েছে, সে দেশে মৃত্যুর হার ক্রমশ কমছে এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগ করার সময় ছাত্রের দৈর্ঘ পূর্বের চেয়ে গড়পড়তা ২—৩ ইঞ্চি বৃদ্ধি পেয়েছে। ইংলণ্ডে এ অবস্থা সম্ভব হয়েছে সবাইকে উপযুক্ত পরিমাণে সুষম খাদ্য সরবরাহ দ্বারা। সে দেশে বিদ্যালয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থাও হয়েছে। সবার জন্য উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা হ'লে এ দেশ থেকেও অনেক ব্যাধি বিতাড়িত হবে এবং দেশের লোকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শরীরের শক্তিবৃদ্ধি হ'বে, সন্দেহ নেই।

শরীর সুস্থ ও সবল রাখ্‌বার জন্য বিভিন্ন বয়সে ও অবস্থায় লোকের খাদ্যে কোন্ কোন্ উপাদান এবং সে সব কি কি পরিমাণে থাকা দরকার তা বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এও জানা গিয়েছে যে, এ দেশের লোকের পক্ষেও ঐ সমস্ত উপাদান ইউরোপ ও আমেরিকার অধিবাসীর সমপরিমাণে দরকার।

প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত যে প্রসূতি; দুগ্ধপোষ্য শিশুর জননী, শিশু এবং বালকের খাদ্যের দিকেই খুব বেশী দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন কারণ ভবিষ্যৎ জাতির স্বাস্থ্য অনেকটা এদের উপরই নির্ভর করে। প্রসূতির আহার যথেষ্ট ও যথোপযুক্ত না হলে গর্ভস্থ শিশুর শরীর সম্যক্ গঠিত হতে পারে না। শিশুর ও বালকের শরীর গঠনে খাদ্যের কোন উপাদানের অভাবজনিত যে দোষ একবার হয় ভবিষ্যৎ জীবনে যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য খেলেও সে দোষের সংশোধন তার হয় না।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির খাদ্যে কি কি উপাদান কি কি পরিমাণে থাকা দরকার সে সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যেতে পারে। খাদ্যের কাজ হচ্ছে শরীরের তাপ রক্ষা ও কার্যকরী শক্তি দেওয়া এবং শরীরের গঠন ও ক্ষয়-পূরণ করা। তাপ ও কার্যকরী শক্তি আসে প্রধানত শর্করা জাতীয় খাদ্যে যথা চাউল, গম প্রভৃতি থেকে ও তৈল ঘি জাতীয় জিনিস থেকে। যাঁরা পরিশ্রমের কাজ করেন না তাদের দৈনিক ২৫00—৩000 calorie তাপ দরকার—এই তাপ সাধারণত আসা উচিত ৫00 গ্রাম বা ৪৫ তোলা শর্করাজাতীয় খাদ্য ও ১00 গ্রাম বা ৯ তোলা তৈল ঘি জাতীয় পদার্থ থেকে—এই ৯ তোলার মধ্যে যতটা ঘি হয় ততই ভাল। যাঁরা অধিক পরিশ্রম করেন তাঁদের পরিশ্রমের অনুপাতে ৩৫00 হইতে ৪000 calorie প্রয়োজন এবং সে উপরন্তু তাপ আসবে অধিক পরিমাণে শর্করাজাতীয় ও তেল জাতীয় খাদ্য থেকে? শরীরের মাংসপেশী গঠন ও ক্ষয়পূরণ হয় প্রোটিন দ্বারা। প্রত্যহ ৭0—১00 গ্রাম বা ৬ হইতে ৯ তোলা প্রোটীন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দরকার। এই প্রোটীনের অর্ধেক কি অন্তত এক-তৃতীয়াংশ জান্তব প্রোটীন অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ থেকে পাওয়া দরকার। উদ্ভিজ্জ প্রোটীন অপেক্ষা জান্তব প্রোটীন শরীর গঠনে বেশী কাজে লাগে। হাড় কালসিয়াম ও ফস্‌ফরাসে গঠিত। দৈনিক ১ গ্রাম কালসিয়াম ও ১ গ্রাম ফস্‌ফরাস পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির চাই। রক্ত গঠনের জন্য লোহা চাই ২0—৩0 মিলিগ্রাম। ইহা ছাড়া ম্যাগনিসিয়াম, সোডিয়াম, পটেসিয়াম, ক্লোরিন গন্ধক এবং খুব সহজ পরিমাণে আইওডিন, ম্যানগানিক, তামা, কোবল্ট ও দস্তা প্রভৃতি ধাতু চাই। ভিটামিনগুলোর মধ্যে প্রত্যহ ৩000—৪000 মাত্রা ভিটামিন 'এ' ১—২ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি, ২—৩ মিলিগ্রাম রিবোফ্লাবিন, ১৫—২0 মিলিগ্রাম নিকোটিনিক অ্যাসিড, ৫0 মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' ও ৪00—৮00 মাত্র ভিটামিন 'ডি'র প্রয়োজন। ভিটামিন ও লবণজাতীয়

জিনিসগুলো সাধারণত দুগ্ধ, ডিম, ফল, শাকসব্জী, মাছ, ডাল প্রভৃতি থেকে পাওয়া যায়। উপরোক্ত বিভিন্ন উপাদান উল্লিখিত মাত্রায় প্রত্যহ খেলে শরীর সুস্থ, নীরোগ কার্যক্ষম হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কোন কোন খাদ্যে কি কি উপাদান আছে তা জানা থাকলে সহজেই উপরোক্ত পরিমাণ উপাদানযুক্ত একটি দৈনিক খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করা যেতে পারে। এখন এরূপ একটি খাদ্য-তালিকার উল্লেখ করা যাচ্ছে। চাল বা আটা প্রত্যহ ১ পাউন্ড বা আধ সের; ডাল—৩ আউন্স বা ১½ ছটাক; সবুজ পাতাযুক্ত টাট্‌কা শাকসব্জী—৪ আউন্স বা ২ ছটাক, মূল জাতীয় তরকারি যেমন আলু, গাজর ইত্যাদি—৩ আউন্স বা দেড় ছটাক অন্যান্য তরকারী—৩ আউন্স বা দেড় ছটাক; ফল—৩ আউন্স বা ১½ ছটাক; দুধ—১০ আউন্স বা ৫ ছটাক; চিনি, গুড়—২ আউন্স বা ১ ছটাক; তেল, ঘি—২ আউন্স বা এক ছটাক; মাছ, মাংস—৩ আউন্স বা ১½ ছটাক; ডিম প্রত্যহ একটি।

খাবার সময় প্রথমত শাকসব্জী, ফল, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম ও ডাল তালিকানুযায়ী খেয়ে, ক্ষুধামত ভাত বা আটা খাওয়া উচিৎ। অবশ্য এই তালিকার কিছু অদল বদল চলে—যেমন যাঁরা মাছ মাংস খান না তাঁরা দুধ বেশী করে খাবেন কিন্তু এ বিষয়ে খাদ্য তত্ত্ববিদের পরামর্শ গ্রহণ করা দরকার।

আজকালকার দেশের এই দুর্দিনে উপরের খাদ্যতালিকা দেখে কেউ কেউ হয়ত একটু ব্যঙ্গের হাসি হাস্‌তে পারেন, কিন্তু যাহা সত্য বিজ্ঞান তা বল্‌বেই। দুধ, মাছ, মাংস, ফল, তরকারি সব বাদ দিয়ে কোন মতে বাঁচতে চাইলেও প্রথমত ভাত বা আটার পরিমাণ বাড়াতে হবে; কিন্তু এতে কিছুদিন কোনমতে শরীর ধারণ সম্ভব হলেও, শীঘ্রই শরীরে নানা ব্যাধি প্রবেশ করবে, শরীর একেবারে অকর্মণ্য হয়ে পড়বে এবং আয়ুও কমে যাবে। দেশের সবাইকে উল্লিখিত হারে খাদ্য সরবরাহ করতে পারলে লোকের স্বাস্থ্য যে কিরূপ উন্নত হোত, দেশের শ্রী যে কিরূপ ফিরে যেত, তা ভাবতেও আনন্দ পাওয়া যায়। খাদ্যের প্রয়োজনানুসারেই দেশের কৃষিনীতি চালিত হওয়া দরকার। দেশে দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, ফল ও তরকারির উৎপাদন প্রয়োজনের অনুপাতে খুবই কম, সুস্থ, সবল জাতি গঠন করতে হলে এসব জিনিসের উৎপাদন প্রায় ৩।৪ গুণ বাড়ানো দরকার। অবশ্য, ইহা কিছু সময় সাপেক্ষ, কিন্তু এটা এতই প্রয়োজনীয় যে কালবিলম্ব না করে খুব শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এই কাজ আরম্ভ করা উচিত। কৃত্রিম সার প্রয়োগে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়ে কতকাংশ জমি শাকসব্জী ও গরু-ভেড়ার খাদ্যের ঘাস জন্মাবার জন্য ব্যবহৃত হোতে পারে।

অধিকাংশ ভাইটামিন রাসায়নিক উপায়ে কারখানায়ও তৈরি করা যায়—দেশে এই শিল্পেরও প্রচলন দরকার। আজকাল আমেরিকায় সমুদয় ভাইটামিনযুক্ত বড়ীর খুব প্রচলন হয়েছে—এসব বড়িতে কিছুটা ক্যালসিয়াম দেওয়াও আমাদের দেশের অবস্থায় খুবই উপযোগী হবে; কারণ, আমাদের খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ভাইটামিনগুলির অভাবই সব চাইতে বেশি।

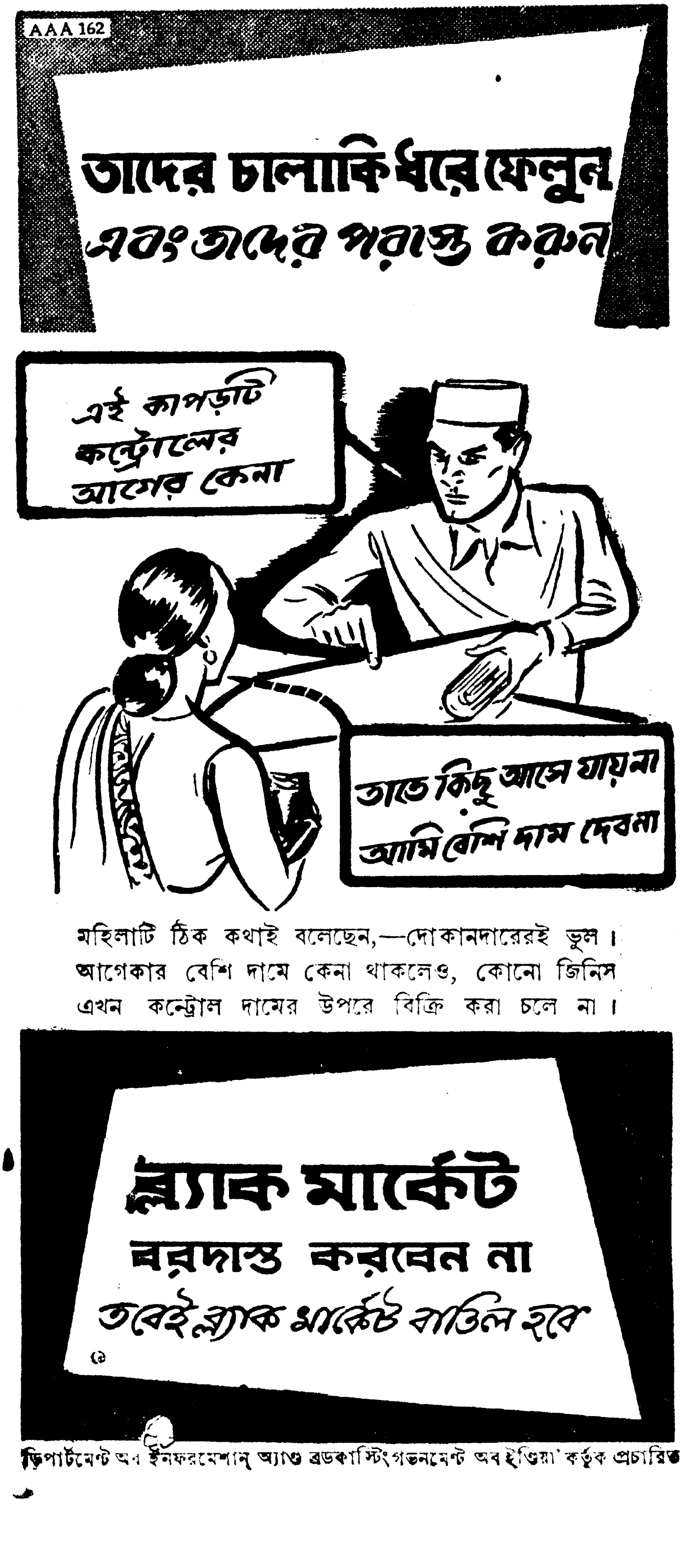
হাঙ্গর মাছের লিভারের তেলে কড-লিভার তেলের চাইতেও অনেক বেশি ভাইটামিন 'এ' ও যথেষ্ট ভাইটামিন 'ডি' আছে। এদেশে সম্প্রতি আরব্ধ এই শিল্পটির যাতে শ্রীবৃদ্ধি হয়, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া খুবই দরকার। ঈস্ট ([illegible]) উৎপাদন করাও খুব সহজ, এতে ভাইটামিন 'বি'র বিভিন্ন উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে। কোন একটি বিশেষ খাদ্যদ্রব্যের অভাব হলে তা অপর জিনিস দ্বারা পূরণ করা যায়। কোন খাদ্যের লৌহ ও ফস্‌ফরাস্‌ শরীর সম্যকরূপে গ্রহণ করতে পারে না। কাজেই, সমস্ত বিষয় যথাযথ বিবেচনা করে খাদ্যনীতি গঠনের সময় বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন।

আসন্নপ্রসবা নারী ও শিশুর জননীর আহারে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, লৌহ ও অন্যান্য ধাতু এবং ভাইটামিনের প্রয়োজন, তাহাদের দৈনিক দুধের বরাদ্দ এক সের হওয়া বাঞ্ছনীয়। আট মাস বয়স পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধই শিশুর সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্য। আমেরিকার বিশ হাজার শিশুর ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, যেসব শিশু মায়ের দুধ পায় না, তাদের মধ্যে মৃত্যুর হার মাতৃস্তন্যপায়ী শিশুদের অপেক্ষা প্রায় ৫৬ গুণ অধিক। পাঁচ ছয় মাস বয়স হলে শিশুকে কিছু

কমলালেবুর রস, ডিমের কুসুম, তরকারির ঝোল এবং একটু কডলিভার তেল দেওয়া কর্তব্য। পাঁচ ছয় মাস বয়সে শিশুর শরীরের সঞ্চিত লৌহ নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং তখন লৌহ পাবার পক্ষে তার পক্ষে ডিমের কুসুম ও তরকারির ঝোল উত্তম খাদ্য। কমলালেবুর রস থেকে সে পাবে ভাইটামিন 'সি' ও কডলিভার তেল থেকে পাবে ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি'। এক বৎসর হতে ১৪ বৎসর বয়স্ক শিশুদের পক্ষে দৈনিক এক সের দুধ খাওয়া সঙ্গত। দেশে সকলের জন্য যথেষ্ট দুধ না থাকলে প্রসূতি, শিশু ও বালকের প্রয়োজনই সবার আগে মেটানো দরকার। স্কুলে প্রত্যেক বালককে কিছু খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত এবং সেটা দুধ হলেই ভাল হয়। উপযুক্ত আহার পেলে বালকেরা বেশি লম্বা হয়—কয়েক পুরুষ ধরে বাঙালী ছেলেকে উপযুক্ত আহার দিতে পারলে বাঙালীর শরীরের দৈর্ঘ্য ও ওজন পাঞ্জাবীর সমকক্ষ হওয়া খুবই সম্ভব। শৈশব ও বাল্যকালই শরীরের বৃদ্ধির সময়, কাজেই এ সময় অপেক্ষাকৃত অধিক প্রোটিন, ক্যাল-সিয়াম ও ভাইটামিনের প্রয়োজন।

দেশের উৎপন্ন বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, সবাইকে উপযুক্ত পরিমাণে সুষম খাদ্য দেওয়ার মত খাদ্য আমাদের দেশে উৎপন্ন হয় না। বর্তমানে দেশে উৎপন্ন দুধের পরিমাণ গড়পড়তা মাথাপিছু পাঁচ আউন্সেরও কিছু কম। যত শীঘ্র পারা যায় দুধের পরিমাণ অন্তত তিনগুণ বাড়ানো দরকার। ডাল, তরকারি, ফল, মাছ ও ডিম যা উৎপন্ন হয়, তা প্রয়োজনের চাইতে অনেক কম। দেশের বিভিন্ন স্থানে লোকেরা সাধারণত প্রত্যহ কি খায়, তাহা অনুসন্ধান করেও এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়েছে যে, আমাদের দেশের সাধারণত খাদ্যে দুধ জান্তব প্রোটিন, তেল-ঘি জাতীয় জিনিস, ডাল, তরকারি, ফল, মাছ, ডিম ও মাংসের পরিমাণ প্রয়োজনের চাইতে অনেক কম। খাদ্যে কোন কোন উপাদানের অভাবজনিত বিভিন্ন রোগ বা প্রচ্ছন্ন রোগও দেশময় ছড়িয়ে আছে। এ অবস্থার আশু প্রতিকার নিতান্তই দরকার।

অবশ্য আর্থিক অবস্থার উন্নতি হলে সঙ্গে সঙ্গে আহারেরও উন্নতি হয় এবং দেশের আর্থিক অবস্থা ভাল করা খুবই দরকার; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিতত্ত্বের সাধারণ তথ্যগুলিও সবার মধ্যে প্রচার হওয়া আবশ্যক। পুষ্টি বিজ্ঞানের সাধারণ জিনিসগুলো জানা থাকলে অল্প খরচেই নিজের রোজগারের সীমার মধ্যে খাদ্যের যথেষ্ট উন্নতি করা যায়, আবার এই জ্ঞানের অভাবে ধনী ব্যক্তিও কি খেতে হবে, তা ঠিক করে উঠতে পারেন না।



কিশোর আলেখ্য প্রদর্শনী

বিমল রায়

কলিকাতায় গত ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে কিশোর আলেখ্য সম্মেলনের যে চিত্র প্রদর্শনী হইয়া গেল, সে সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলিব। এই প্রদর্শনী যাহাদের হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের উৎসাহের কথা এবং এই রকম প্রদর্শনী যে কলিকাতায় প্রতি বৎসর হইয়া থাকে সে কথা পত্রিকায় প্রকাশ করার বিশেষ কিছু সার্থকতা আছে মনে করা চলে না। কারণ পূর্বেকার প্রদর্শনী সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার পর আশানুরূপ সহযোগিতা পাওয়া যায় নাই।

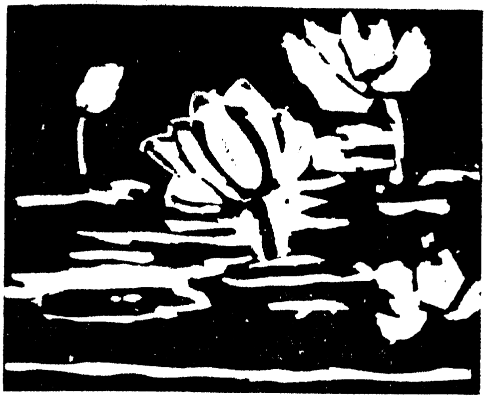
এক সময়ে যাহারা কিশোর, উত্তর কালে তাহারাই হইয়া দাঁড়ান দেশের এক একদিকে এক এক বিষয়ের ভারবাহী কর্মী। অবশ্য কৈশোরের কল্পনা সকলেরই কিছু সম্পূর্ণ সফল হয় না। বর্তমান সমাজ সেজন্য দায়ী। আমরা সকলেই দেশভক্ত, কিন্তু একথা আমরা ভুলিয়া যাই যে, দেশ একটি জিওগ্রাফী নয়—দেশ মানুষে তৈয়ারী। সেইজন্য মানুষকে ঠিক মত তৈয়ারী না করিলে দেশের ভবিষ্যৎ যে কি তাহা ঠিক বুঝা যায় না। রিফাইণ্ড টেস্ট ও রিফাইণ্ড কালচার চিটেগুড় মাখানো চট চটে বুলি আওড়াইলেই পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে মহামানবেরা চিরদিন শিশুকে ফুলের মতন ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন। বয়সের স্তরে শিশুকে কৈশোরে পদার্পণ করিলেই এবং কিশোরকে ক্রমশ বার্ধক্যে পৌঁছাইলেই তাহার কোমল মন জীবনী শক্তির অভাবে যাহাতে জীর্ণ না হইতে পারে তাহার জন্য একান্ত সদিচ্ছা দেশবাসীর দেখানো উচিত। যাহাকে তৈয়ারী করিতে হয় তাহাকে শক্তি দিয়া গড়িতে হয়। যাহারা একান্তই আপনার তাহাদের কিসে শান্তি আসিবে মন তাহাই চায়। অর্থ উপার্জনের জন্য উপযুক্ত যোগ্য পাত্র করিয়া তোলাই ভবিষ্যতের কাম্য নহে। তাহাতে আইন এবং শৃঙ্খলা ঠিক থাকিতে পারে। মানুষ আর মানুষ থাকে না। সে যে অবস্থাতেই তাহার নিজের কর্তব্যের মধ্যে চলিয়াছে তাহার পশ্চাতে আছে অনুভূতি। সেই অনুভূতিকে রুচি সঙ্গত করিয়া তুলিতে পারে একমাত্র নিঃস্বার্থ স্বাধীন চিন্তা। মনের কোঠায় অসীম জায়গা; সেখানে সকলকে লইয়া উৎসব করিলেও পুলিশে বাধা দিবে না। দারিদ্র্য এবং নৈরাশ্য পূর্ণ বহির্জগতকে দেখিয়া মানুষ হতাশ হইয়া পড়ে—মন সংকীর্ণ হইয়া যায়। শিক্ষা এবং সুচিন্তাকে তখন সম্বল করিতে হয়। সেই জন্য দেশের একমাত্র সম্বল যে কিশোরের দল, তাহাদের শান্তিতে শৃঙ্খলা আসুক এই শিল্প চর্চার ভিতর দিয়া; আজ অভিভাবকগণ অবহিত হইলে দেশের মঙ্গল।

সুন্দর স্বভাবতঃই সকলের প্রিয়। সুন্দর আনে শান্তি। ফলে যাহার আনন্দ হয় সে-ই ফুলকে সুন্দর দেখে। সুন্দরের আবাস ফুলে আর মন শান্তির আবাস। এই দুইয়ের মিলনেই আনন্দোপলব্ধি। এই আনন্দই জীবনী শক্তির মর্মের কথা, কারণ তাহা অকৃত্রিম; তাহা চিরস্থায়ী। একটা জাতির অন্তর হইতে যখন এই সুন্দরের অনুভূতি বিলুপ্ত হইতে চলে তখনই জাতির সর্বনাশ! ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিবে।

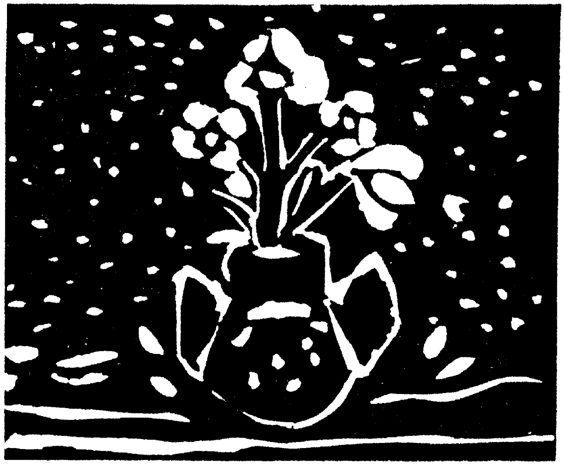
আমাদের মনে এই শিল্পানুভূতি সমস্ত কার্যে একটা অনুপাত জ্ঞান এনে দেয়। মনের স্বাস্থ্য ও কাজের সঙ্গতির পক্ষে এ অপরিহার্য। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে শিল্পের প্রয়োজন কিছু অল্প নয়। কর্মের মধ্যে তাহা একটা সামঞ্জস্য আনিয়া দেয়। যাহাতে কর্মের ভার লঘু হইয়া পড়ে, তাহাতে কর্মে আনন্দ আসে। অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্মের মধ্যে শিল্পের দান পরোক্ষ, কিন্তু কর্মের বৃত্তের বাহিরে যে অবকাশ তাহার সামঞ্জস্য বড় একটা কম নয়। মিলের শ্রমিক যন্ত্র ও কর্মের নিষ্পেষণে নিপীড়িত। তার শিল্পানুভূতি বাড়িতে পারে নাই তাই সে ছুটি পাইলে তাড়ি খাইয়া রসোপলব্ধি করিতে চায়। আবার বিপুল ধন সম্পত্তির অধীশ্বরের অফুরন্ত অবকাশ। এই কর্মহীন অবকাশ যাপনের মত তাহার শিল্পানুভূতি ও আনন্দ লাভের সঙ্গতি নাই। তাই সে এমন



"ফকীর" গৌরী ভট্টাচার্য (১৫ বৎসর)



ভোরবেলা (লিনোকাট) কল্যাণী চক্রবর্তী (১২ বৎসর)



সন্ধ্যারাণী (লিনোকাট) কল্যাণী চক্রবর্তী (১২ বৎসর)



নদী ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায় (১৪ বৎসর)

সমস্ত কার্যে দিন যাপন করে যা বস্তুতঃই নোংরা। এই অবকাশ যাপনের জন্য শিল্পের দান ডাইরেক্ট আর কিছুতেই এমন পাওয়া যাইবে না। নোংরাভাবে অবকাশ যাপন না করিয়া যাহাতে সুন্দরভাবে তাহা করা হয় তাহার জন্য জাতিকে শিল্পানুরাগী করিয়া তুলিতে হইবে। জর্জ বার্ণার্ড শ'ও অল্প কয়েকদিন আগে এই কথাটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন।

কিশোর কি চায়? তাহারা চায় ঘুড়ি উড়াইতে, মার্বেল খেলিতে, গাছের গোড়ায় ফুল ও ফল কুড়াইতে, এ রাস্তায় ও রাস্তায় চলাফেরা, এ পুকুরের ধারে ও খালের ধারে ঘুরিয়া বেড়ানো। এ গাছের ফুল ও গাছের ফল সব দেখিয়া চাখিয়া যেন আশ মেটে না, শেষে গল্প,—অপূর্ব গল্প,—ভোজের শেষে আবার গল্প। পুকুরে ঢিল ফেলিয়া জলে ঢেউ তৈয়ারী করে, কাগজের নৌকা ভাসায়, দেখে কেমন দোলে, কেমন ডোবে—সারাদিনের শেষে ভাই বোনদের সাথে গল্প করে নিজেদের ভাষায় ছোট ছোট কথায়। যে শোনে; সে মনে মনে ছবি দেখে, যে বলে, সে তার মনের ছবির রূপ বর্ণনা করে; দুজনেই শিল্পী। আকাশের খুব উঁচুতে পাখীরা উড়িতেছে খেয়ালে, আনন্দে ডিগবাজী খাইতে খাইতে উড়িতেছে। যে কিশোর দেখিতেছে তাহার মন পাখীর ডানায় করিয়া দূরে আরও দূরে একেবারে আকাশের সহিত মিশিয়া যাইতে চায়। ঘুড়ি সুতো ও লাটাই কেনে; উড়াইয়া দেয় আকাশে, ঠিক যেন পাখীর মত! কিন্তু সখ মেটে না। মন যে এত আনন্দ পাইল কথায় যেন ঠিক প্রকাশ হইল না, ছবি না আঁকিলে স্বস্তি নাই। রবীন্দ্র প্রতিভা এই মানব মনেরই সম্পূর্ণভাবে ও সমগ্র-



নৌকা — বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (৯ বৎসর)

ভাবে প্রকাশ! কবিতা গল্প ও গানে মিটিল না—শেষ বয়সে ছবি আঁকিতে হইল কিছুতেই যেন মনের কথা বলা হইতেছিল না।

প্রদর্শনীতে দেখা গেল ননী চোর ছবি এঁকেছে দীপালি দত্ত, বয়স ৮ বৎসর। গল্প শুনিয়া ননী চুরির বন্দোবস্তটা বেশ ধারণা করিয়া লইয়াছে। একজনকে দরজায় পাহারা রাখিয়া একজনের কাঁধে উঠিয়া ভাঁড় হইতে ননী চুরি করিতেছে। একটা গোপন অভিসন্ধির কথা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বয়স নয় বৎসর—আঁকিয়াছে গাছ কুঁড়ে ঘর ও আকাশ (লিনোকাট)। গাছ মাটি হইতে উঠিয়াছে, ঘর মাটির উপর উঠানো হইয়াছে ও আকাশ ঘর ও গাছ ছাড়িয়া অনেক দূরে—সবটুকুই চমৎকার। আর একখানা (লিনোকাট) নদীর বুকে নৌকা কালো নৌকা শাদা জলে যেন ছপ্ ছপ্ করিয়া চলিতেছে। নৌকাকে ভাসিতে দেখা যাইতেছে। মনে হইতেছে না সে ডাঙায় চলিয়াছে—ছবিতে যাহা প্রায়ই সকলের অসুবিধা হইয়া পড়ে—জলকে উঁচু নীচু করিয়া ফেলে নাই। কনডিশন এবং এটমোসফিয়ার ঠিক হইয়াছে। অমিত সরকার নয় বৎসর; পল্লীবধূ—নদীর ঘাট—বাড়ির বাহিরে জল আনিতে ঘোমটা টানিয়া লজ্জা রাখিয়াছে। বয়স অনুযায়ী হইলে ভাল হইত। মনোরঞ্জন ঠাকুর—বয়স ১৬ শিব ও উমা—ছবি খুব ভাল হইয়াছে বলিয়া নিন্দা করিব। খুব সাধারণ সাবজেক্ট হইলে বয়সোপযোগী হইত। ১৫।১৬ বৎসর বয়সে যতখানি সুন্দর ছবি করিয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে, ভবিষ্যতে অনেককেই পিছাইয়া দিবে।

অভিভাবক স্কুল কর্তৃপক্ষ সকলেই যদি উদাসীন থাকেন—তবে ছেলেদের এই সদিচ্ছা কেবল আলেখ্য সম্মেলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে—জাতীয় জীবনে তাহা আর কতটুকু দিতে পারিবে। এ বৎসরে যে অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা ভাল ছবি পাওয়া গিয়াছে সবাই স্বীকার করিবে—কিন্তু প্রচুর এবং আরও ভাল ছবি আসিবার সুবিধা যদি না করা যায়, তবে তাহা অত্যন্ত দুঃখের কথা হইবে। নজর রাখিতে হইবে যে, ছেলেমেয়েরা যেন ছোট ছোট জিনিষ সহজ করিয়া আঁকে—যেন কিশোরের ছবিতে কিশোর ভাব থাকে।

জুনের শেষ সপ্তাহে পুনরায় কিশোরদের একটি চিত্র প্রতিযোগিতা হইয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহ ও শ্রীযুক্ত ধীরেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রতিযোগীদের বিচার শেষ হয়। (ক) বিভাগ—১ম গৌরী ভট্টাচার্য (মেদিনীপুর), ২য় সমরজিৎ ঘোষ (পাটনা), ৩য় উমারাণী ক্ষেত্রী (বর্ধমান)। (খ) বিভাগ ১ম মঞ্জুশ্রী সেন (কলিকাতা), ২য় নন্দ সিংহ (কলিকাতা), (গ) বিভাগ ১ম দীপ্ত মজুমদার (শ্রীরামপুর), ২য় প্রসাদকিশোর ভট্টাচার্য (দিনাজপুর)।

শেষ

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

কোনমতে জোড়াতালি দেওয়া
অস্তিত্বের বিচ্ছিন্ন পর্দায়
বসে বসে জীবনের ছায়াবাজি দেখা,—
বসে বসে শোনা শুধু শ্লথ হৃদ্‌পিণ্ডের ধুক্ ধুক্ :
ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি চাপা দেওয়া আগুনের মত
অসহায় কালো ধোঁয়া ছাড়ে,
মৃত প্রাণ পাক্ খায় শিরায় শিরায়,
চাবুকের কশাঘাত ক্ষয়িষ্ণু ফুসফুসে।
বসে বসে জীবনের ছায়াবাজি দেখা,
বসে বসে শোনা শুধু শ্লথ হৃদ্‌পিণ্ডের ধুক্ ধুক্।

একঘেয়ে গরুর চাকার
বিরক্ত কুটিল স্বর চেতনারে বাঁধে দৃঢ় বলে—
মলিন ধূলির তলে হাবুডুবু খায় দুটি চোখ।

সরল মৃত্যুর পথে তাই জাগে বিরক্তির ঝড়—
অস্তিত্বের বিচ্ছিন্ন পর্দায়
আগুন লেগেছে আজ, চাপা দেওয়া দৃষ্টির আগুন
অজগর সম ফুঁসে ওঠে :
শেষ আজ বসে বসে জীবনের ছায়াবাজি দেখা,
শেষ আজ বসে শোনা শ্লথ হৃদ্‌পিণ্ডের ধুক্ ধুক্।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গত ৩রা জুলাই বাঙলার গবর্ণর তাঁহার বেতার বক্তৃতায় বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানির যে সিদ্ধান্ত জানাইয়াছিলেন, তাহাতে বাঙালীর আপত্তির কারণ ছিল ও আছে। তিনি প্রথমে বলিয়াছিলেন,—

বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্বেই সরকারের সঞ্চিত সব ধান্য ও চাউলই যাহাতে আবহাওয়ায় নষ্ট হইতে না পারে, সেইরূপ ভাবে নির্মিত গুদামে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরেই তিনি বলেন,—"এখন তাড়াতাড়ি পুরাতন মাল সরাইয়া নূতন মাল গুদামজাত করার সমস্যাই আমাদিগের প্রথম সমস্যা। আবশ্যক গুদামে রাখিলেও বাঙলার আবহাওয়ার জন্য চাউল সর্বসময়ে—বিশেষ বর্ষাকালে বিকৃত হইয়া যায়।"

একই বক্তৃতায় এই দুইটি উক্তিতে সামঞ্জস্য সাধন কষ্টসাধ্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা দুইটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি—

(১) মিস্টার কেসী যদি ইচ্ছা করেন, আমরা তাঁহাকে কলিকাতাতেই বর্ষাকালে শস্য মজুদ রাখিবার পক্ষে অসুবিধাজনক গুদাম দেখাইতে প্রস্তুত আছি। সে সকল গুদামে মজুদ শস্য অতি অল্প দিনে বিকৃত হওয়া অনিবার্য। যাহারা তাঁহাকে বলিয়াছে, মৌরসুমের পূর্বেই সরকারের সঞ্চিত শস্য উপযুক্ত গুদামে রক্ষিত হইয়াছে, তাহারা যে প্রকৃত কথা বলিয়াছে, এমন নাও হইতে পারে।

(২) বাঙলার আবহাওয়া যেমনই কেন হউক না, এদেশের লোক বহুদিনের অভিজ্ঞতায় যে ভাবে শস্য মজুদ রাখিবার প্রথা আবিষ্কার করিয়াছে, তাহাতে ২০ বৎসরেও শস্য বিকৃত হয় না—এক বর্ষা তো পরের কথা। তিনি যদি হিউম প্রণীত কৃষি বিষয়ক সংস্কার পুস্তক পাঠ করেন, তবে দেখিতে পাইবেন, দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় হিউম লিখিয়াছিলেন, এদেশের লোক তাহা করিতে পারে—

"They are great adepts in storing grain, and will turn it out of rough earthen pots, after twenty years, absolutely uninjured."

মিঃ কেসীর এদেশের অভিজ্ঞতা অতি অল্প। সেইজন্য আমরা তাঁহাকে বলিতেছি, তিনি যদি মোটা মোটা মাহিয়ানার বিদেশী বা এদেশী 'বিশেষজ্ঞ' না রাখিয়া এদেশের লোকের লব্ধ অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতেন, তবে ব্যয়ও অল্প হইত, শস্যও অধিক দিন সঞ্চিত রাখা সম্ভব হইত।

ঐ বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—গুদামের ব্যবস্থা যত ভালই কেন হউক না—সঞ্চিত শস্য অবিকৃত রাখা যাইবে কি না সন্দেহ এবং সেই সন্দেহহেতু বাঙলা সরকার ভারত সরকারকে প্রায় লক্ষ টন চাউল দিতেছেন। সেই চাউল অসুবিধাগ্রস্ত (অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত) প্রদেশসমূহকে দেওয়া হইবে এবং বিলাতী সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সিংহলকেও দেওয়া হইবে। বাঙলা ঈশপের উপকথার যে কুকুর ঘোড়ার দানা খাইবার পাত্রে শুইয়া থাকিত তাহার মত কাজ করিতে পারে না।

যখন মিঃ কেসী ঐ কথা বলিয়াছিলেন, তখন আমরা বলিয়াছিলাম, বাঙলা সরকারের যদি পরকে দিবার মত চাউল থাকে, তবে ঘরে তাহা সুলভ করিতে আপত্তি কি? অন্য কোন প্রদেশ যে দুর্ভিক্ষগ্রস্ত হইতে পারে, এমন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। বিশেষ সিংহল, ভারতবর্ষের অংশ নহে। বাঙলায় সরকারের নির্দিষ্ট চাউলের মূল্য "দুর্ভিক্ষকালীন" মূল্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙলার লোক যে সেরূপ মূল্যে চাউল কিনিয়া পূর্ণাহার সম্ভোগ করিতে পারে না, তাহা আমরা দৃঢ়তা সহকারে বলিতে পারি। কাজেই বাঙলার লোকের ঐ রপ্তানিতে আপত্তি অবশ্যম্ভাবী।

যে চাউল রপ্তানি করা হইবে, তাহা যে বিকৃত হইয়াছে, এমন কথা মিঃ কেসী তখন বলেন নাই। আর তিনি আশা করিয়াছিলেন, অনাবৃষ্টিতে বা অতিবৃষ্টিতে শস্যহানি হইবে না। কিন্তু অনাবৃষ্টিতে যেমন পশ্চিমবঙ্গে শস্যহানি হইয়াছে—এমন কি সরকারও সেচের জন্য পাম্প ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, তেমনই আবার কোন কোন অঞ্চলে নদীর বন্যায় শস্যহানির সংবাদও পাওয়া যাইতেছে—কোন কোন স্থানে বন্যাহেতু শস্যহানিতে লোককে সাহায্য প্রদানও প্রয়োজন হইয়াছে। ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবও স্বীকার করিয়াছেন, বাঙলায়, বিহারে ও উড়িষ্যায় বর্ষণ বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই। কেবল তাহাই নহে, তিনি যে বলিয়াছেন, এখনও খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ চলিবে, তাহাতে মনে করিতে হয়, সরকার দুর্ভিক্ষের আবির্ভাবভীতিমুক্ত হইতে পারিতেছেন না, নহে ত তাঁহারা খাদ্যশস্যেরও ব্যবসা করিয়া লাভবান হইতে চাহিতেছেন। বাঙলায় যে দুর্ভিক্ষে লোক নিঃস্ব হইবার পরে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইলেও চাউলের মূল্য পূর্ববৎ হ্রাস করা হইল না, তাহাতে শেষোক্ত সন্দেহই প্রবল হয়।

স্যার জওলাপ্রসাদও বলিয়াছেন, গুদামের ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য হইলেও সরকার সে ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, একথা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য বলা যায় না। আর যদি উপযুক্তরূপে গুদাম প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে—যে কাজ এদেশের অজ্ঞ কৃষকরাও সুসাধ্য মনে করে, বিজ্ঞানসহায় বিশেষজ্ঞরা তাহা অসাধ্য মনে করিতেছেন কেন? অর্থাৎ কেন বলা হইতেছে, যত চেষ্টাই কেন করা হউক না, বাঙলার আবহাওয়ায় বর্ষাকালে মজুদ শস্য বিকৃত হইবেই, তাহা বিকৃতি হইতে রক্ষা করিবার উপায়ও কি সরকারের বিশেষজ্ঞরা "অনেক চিন্তার পর" স্থির করিতে পারিলেন না? তাহাও কি আমাদিগের দুর্ভাগ্যের ফল?

যেদিন বোম্বাই সহরে বড়লাটের শাসন পরিষদের খাদ্য সদস্য স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব মার্কিণের কোন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন,—বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি সম্বন্ধে যে আলোচনা হইতেছে, তাহা ভ্রান্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই দিনই বাঙলা সরকার এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

সেই বিবৃতির আলোচনা করিবার পূর্বে আমরা একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি—বাঙলার গবর্ণর বলিয়াছেন, অভাবগ্রস্ত প্রদেশসমূহকে এমন কি সিংহলকেও চাউল না দিলে বাঙলার পক্ষে তাহা অশোভন হইবে; কিন্তু স্যার জওলাপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"আমরা প্রয়োজন হেতু বাঙলা হইতে চাউল লইতেছি না; চাউল পচিয়া যাইবে এই আশঙ্কায় বাঙলা সরকার বাঙলা হইতে চাউল লইবার জন্য আমাদিগের নিকট প্রার্থনা করায় সেই সরকারকে সাহায্য করিবার জন্যই চাউল লইতেছি।"

অর্থাৎ গরজ বড় বালাই বটে, কিন্তু গরজ ভারত সরকারের নহে—বাঙলা সরকারের।

কেবল তাহাই নহে—ভারত সরকারের "কমার্শাল ইনটেলিজেন্স অ্যান্ড ষ্ট্যাটিস্টিকস" বিভাগ হিসাব দিয়াছেন—

(১) এবার গত বৎসরের তুলনায় অল্প জমিতে চাষ হইয়াছে;

(২) ১৯৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে ধান্যের ফলন ৩ কোটি ৬ লক্ষ ৬৪ হাজার টন হইয়াছিল—১৯৪৪-৪৫ খৃষ্টাব্দের ফলন ২ কোটি ৭১ লক্ষ ২২ হাজার টন অর্থাৎ ৩৫ লক্ষ টন অল্প। যে ভাবে এদেশে শস্যের হিসাব রাখা হয়, গ্রেগরী কমিটি তাহার ত্রুটি

দেখাইয়াছেন। কাজেই যে হিসাবে নির্ভর করিয়া বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি করা হইতেছে, তাহা নির্ভরযোগ্য কি না, তাহা কে বলিবে?

বাঙলা সরকারের বিবৃতিতে হিসাব দেওয়া হইয়াছে—

সৈন্যদিগের জন্য	১৫ হাজার টন
সিংহলের জন্য	২৩ "
মহীশূরের জন্য	১৫ "
কোচিনের জন্য	১৪ "
বিহারের জন্য	৯ হাজার ৫ শত টন
যুক্তপ্রদেশের জন্য	২০ "

মোট ৯৬ হাজার ৫ শত টন চাউল রপ্তানী হইতেছে। ইহার মধ্যে আবার ৩০ হাজার টনের পরিবর্তে ৩০ হাজার টন পাওয়া যাইবে—এক ছটাকও কম হইবে না।

কেবল কি তাহাই? আসাম হইতে বাঙলায় লক্ষ টন চাউল আমদানীর ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ১৬ই আগস্টের কথা। ৪ঠা জুলাই কিন্তু বেতার বক্তৃতায় আমরা শুনিয়াছিলাম, আসাম হইতে প্রায় ৪০ হাজার টন চাউল বাঙলা পাইবে। এক মাসের কিছু অধিক সময়ের মধ্যে সেই ৪০ হাজার লক্ষে পরিণত হইয়াছে। কিরূপে ইহা হইল, তাহা আমরা জানি না। অবশ্য কথায় বলে—"হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না।"

আবার বলা হইয়াছে, যে প্রায় লক্ষ টন চাউল বাঙলা হইতে রপ্তানী হইল বা হইবে, তাহার মধ্যে সাড়ে ৮ হাজার টন বাদ দিলে অবশিষ্ট—

(১) ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রাপ্ত বাঙলার বাহিরের চাউল;

(২) আশু ধান্যের চাউল;

(৩) মোটা আমন ধান্যের চাউল;

(৪) ভাঙ্গা চাউল;

(৫) "সংস্কৃত" চাউল—

ইহার ক্রেতার অভাব এবং ইহা আর রাখিলে বিকৃত হইয়া যাইবে।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় ধান্যের ফলন যেরূপ হইয়াছিল, সেরূপ যে সচরাচর হয় না, তাহা বড়লাট হইতে অনেকেই বলিয়াছেন। তথাপি সে বৎসর বাঙলার বাহির হইতে কি জন্য চাউল আনা হইয়াছিল? আর যদি প্রয়োজনেই তাহা আমদানী করা হইয়া থাকে, তবে তাহা ব্যবহৃত না হইবার কারণ কি? আশু ধান্যের চাউল কি ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে—অন্ন কষ্টের সময়—আমন ধান্য সংগৃহীত হইবার পূর্বে ব্যবহৃত হয় নাই? সরকারের নিয়ন্ত্রিত মূল্যের আধিক্যই কি তাহার ও মোটা আমনের অবিক্রীত থাকিয়া বিকৃত হইবার সম্ভাবনার কারণ?

তাহার পরে "সংস্কৃত" (re-conditioned) চাউলের কথা। ইহাকে বিকৃত বলা যায় কি না? যদি ইহা একবার ছাতাধরার জন্য বা এইরূপ কোন কারণে বিকৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা "শোধন" করিলেও কি তাহার পুষ্টিকরত্ব অর্থাৎ তাহাতে খাদ্য-মূল্য অক্ষুণ্ণ থাকে? যদি না থাকে, তবে তাহাতে লোকের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবে ত? তাহার পূর্ণ মূল্য পাওয়া যাইবে কি? তাহা "সংস্কৃত" জানিয়াও কি অন্যান্য প্রদেশ তাহা গ্রহণ করিবে? না—তাহা ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া ফিরাইয়া আনিয়া শেষে সারের জন্য ব্যবহার করিবার সম্ভাবনা থাকিতেও পারে?

গত দুর্ভিক্ষের জের এখনও মিটে নাই, তাহা আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছি। বহুলোক সর্বস্বান্ত হইয়াছে—এখনও কলিকাতার হাসপাতালে প্রতিদিন দুর্গত পীড়িতদিগের মৃত্যু হইতেছে। এই অবস্থায়—সুলভ মূল্যে দিলেও কি বাঙলায় ভাঙ্গা চাউল বিক্রীত হইত না? যাহারা ফেনও পায় নাই—বাজরা খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহারা কি ভাঙ্গা চাউল সস্তায় পাইলে সাগ্রহে লইত না?

স্বাভাবিক অবস্থায়ও যে এদেশের বহুলোক বৎসরে বহুদিন দুই বেলা পূর্ণাহার পায় না, তাহা সরকারী রিপোর্টেই প্রকাশ। সে দেশে কি—দুর্ভিক্ষের পরে—লোক সাধারণ মূল্যের ৪ গুণ মূল্য দিয়া চাউল কিনিয়া পূর্ণাহারের উপায় করিতে পারে? তাহারা তাহা করিতে পারে না। চাউলের নিয়ন্ত্রিত মূল্য এত অধিক হইয়াছে যে, মুষ্টি ভিক্ষা বন্ধ হইয়াছে। দেবতার ভোগের ও শ্রাদ্ধাদির জন্য চাউল পাওয়াও কিরূপ সময়সাধ্য, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

সেজন্য বাঙলার লোকের প্রথম প্রশ্ন—যদি বাংলা সরকার এত খাদ্যশস্য মজুদ করিয়া থাকেন যে, তাহা বাঙলার আবহাওয়ায় নষ্ট হইবেই, তবে কি তাহার মূল্য হ্রাস করিয়া বাঙলার লোককে দুই বেলা পূর্ণাহার করিতে দেওয়াই সরকারের কর্তব্য নহে? আজ বাঙলায় চাউলের যে মূল্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা দুর্ভিক্ষকালীন মূল্য সাধারণ সময়ের মূল্য নহে। যতদিন মূল্য সেইরূপ থাকিবে, ততদিন স্যার জ্বালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবকে—"বাঙলায় আর দুর্ভিক্ষ হইবে না" বলিতে শুনিলে বাঙলার লোক হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না। তাহারা কি দুর্ভিক্ষ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে? ১৫৲ টাকা মণ চাউল কি দুর্ভিক্ষের সময়ের মূল্য ব্যতীত আর কিছু বলা যায়?

যদি এই কথাই সত্য হয় যে, অবাধে অর্থ ব্যয় করিয়া গুদাম প্রস্তুত করিলেও বাঙলায় মজুদ চাউল অবিকৃত রাখা সরকারের বিশেষজ্ঞদিগের পক্ষে সম্ভব নহে, তবে কি এই কথাই বলিতে হয় না—সরকার এখন ইষ্টক, সিমেন্ট ও চুণ, বালুতে দরিদ্র প্রজার প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া গুদাম ভরা বন্ধ রাখিয়া তাঁহাদিগের কর্মচারীদিগকে—"ইজ্জতের" কথা ভুলিয়া বাঙলার কৃষকের নিকট শস্য রক্ষার ব্যবস্থা শিখিতে প্রেরণ করুন।

বাঙলা সরকারের বিবৃতিতে নৈতিক কথার উত্থাপন করা হইয়াছে। রাজনীতিতে নৈতিক বিচার বিবেচনা প্রায়ই আদর পায় না। ইলবার্ট বিলের আলোচনাকালে বড়লাটের ব্যবস্থা পরিষদে একজন ইংরেজ (খৃষ্টান) বাইবেলের উক্তির বিরুদ্ধ উক্তি করিয়াছিলেন; গত মহাযুদ্ধের সময় জার্মাণীর সম্রাট চুক্তিপত্র "ছেঁড়া কাগজ" বলিতে দ্বিধানুভব করেন নাই! লর্ড লিটন ও লর্ড কার্জন এদেশে বড়লাটরূপে রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন বাঙলা সরকার বলিতেছেন, নৈতিক হিসাবেও বাঙলার চাউল রপ্তানী কর্তব্য, তখন কি জিজ্ঞাসা করা যায় না—বাঙলার লোকের সম্বন্ধে কর্তব্য কি নৈতিক হিসাবে যথাযথ বিবেচিত হইয়াছে? তাহাদিগের পক্ষে কি ১৬ টাকা ৪ আনা মণ চাউল ১৫ টাকার কমে পাওয়া নৈতিক হিসাবে নিষিদ্ধ?

স্যার জ্বালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন, —বাঙলা সরকারই যাচিয়া ভারত সরকারকে চাউল দিতেছেন। তবে কি বাঙলা সরকার এতদিনে বুঝিয়াছেন, তাঁহারা যে ধান্য ও চাউল মজুদ করিয়াছেন, তাহা প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং তাহা আর রাখিলে বিকৃত হইবেই—হয়ত বা বিকৃতি আরম্ভ হইয়াছে।'

বাঙলার লোক দেখিতেছে, এতদিনে বাঙলার গবর্ণর "পরামর্শদাতা" ৫ জনের নাম ঘোষণা করিলেন। তবে কি বাঙলায় গবর্ণরী শাসন আবার ৬ বা ১২ মাস চলিবে—স্থির হইয়াছে। যদি তাহা হয়, তবে লোকমতের মর্যাদা কিরূপ বিবেচনা করা হইতেছে?

অনুবাদসাহিত্য

যান্ত্রিক সভ্যতার পরিণতি

দি আল্‌ফা অব দি প্লাউ

[Alpha of the plough প্রণীত Leaves in the wind থেকে Odin Grown Old লেখাটির অনুবাদ।]

কাল রাত্রে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। দিনের বেলার চিন্তাগুলোকেই দেখলাম স্বপ্নে।

ভবিষ্যতের জন্য আমাদের একটা প্রবল আগ্রহ আছে। অনেকে অনেক কিছুই অনুমান করেছেন, কিন্তু কোনটাই কাজে লাগে নি। বর্তমানের এই কালো মুখোসটাকে সরিয়ে নিয়ে যদি ভবিষ্যৎকে দেখতে পেতাম? দশ বছর, বিশ বছর, পঞ্চাশ বছর পরের পৃথিবীকে যদি দেখতে পেতাম? এখনকার এই রক্তকলুষিত ইয়োরোপ তখন কি অদ্ভুত মূর্তি ধরবে, জানতে ইচ্ছে করে। চারদিকের এই দুর্দিনের পরিণতি আমরা ভাবতে পারি না। মহাকাল গোপনে গোপনে অনেক কিছুই লিখে যাচ্ছে। সে যা লিখছে তার একটা কথাও বোঝবার শক্তি আমাদের নেই, সে যা লিখবে তার একটা কথাও আগে থেকে বলবার ক্ষমতা আমাদের নেই।

আপনারা হয়ত বলবেন, "এরকম সব উদ্ভট কথা ভাবলে আর অজগুবি স্বপ্ন দেখবে না?"

যখন জেগে উঠলাম, (ঘুমের মধ্যে অবশ্য) মনে হলো আমি যেন একটা অদ্ভুত সৃষ্টির বহু শতাব্দী আগেকার একটা প্রতিমূর্তি। আমি অনেক বছর আগে জন্মেছিলাম, কিন্তু এখনো বেঁচে আছি।

এই বিরাট পৃথিবীতে আমি এখন একা। চারদিক ফাঁকা, কোন প্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। চলতে শুরু করলাম। অনেক নদী, পাহাড়, মাঠ পার হোয়ে এগিয়ে চললাম। বড় বড় শহরের ধ্বংসস্তূপে এসে পৌঁছলাম। এক এক জায়গায় দেখলাম মস্ত বড় বড় বাঁধ, বোধহয় কোনকালে রেল লাইন ছিল এর ওপরে। ভাঙা ভাঙা মস্ত মস্ত সব খিলান, ব্রিজ ছিল বোধহয় এককালে। সমুদ্রের ধারে জাহাজ মেরামতের জায়গা, চারদিকে বিরাট বিরাট জাহাজের কঙ্কাল ছড়ানো রয়েছে। তাদের গায়ে শেওলা পুরু হোয়ে জমে রয়েছে।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত পৃথিবীকে আবার ভাল করে দেখে নিলাম। পৃথিবীটা একটা মানচিত্রের মত আমার চোখের সামনে ধরা রয়েছে। ওই রেখা ধরে চলতে শুরু করলাম। কি রকম সব বদলে গেছে সব। একটা শক্তি চারদিক একেবারে ভেঙে, চুরে, গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিয়ে গেছে। কোথাও কোন শব্দ নেই, ভীষণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে সর্বত্র। এই ভয়ানক নিস্তব্ধতা আর সহ্য করতে না পেরে, থেকে থেকে চেঁচিয়ে উঠলাম। চীৎকার মিলিয়ে গেল, অতবড় নিস্তব্ধতাকে ভেঙে ফেলবার সাধ্য তার নেই। এখানে সময়ের কোন প্রয়োজনই নেই। আমি এখানে অল্প ক'য় ঘণ্টা বা কয়েক দিন আগে আসিনি, অনেক শতাব্দী, অনেক যুগ আগেই আমি এই পৃথিবীতে এসেছি।

পাহাড় আর মরুভূমিগুলো দেখে সেই বহু আগেকার পৃথিবীকে মনে পড়ে যাচ্ছে। ফিনস্টারার হোর্ন-এর বরফে ঢাকা চূড়োয় উঠলাম। ভোরের গোলাপী আলো, দক্ষিণ আল্পস্‌-এর উপর এসে পড়েছে। পায়ের শাদা বরফগুলো চিক্‌চিক্‌ করছে। আস্তে আস্তে সে সব পার হোয়ে পিরামিড্‌ আর স্ফিংক্স-এর দেশে এসে পৌঁছলাম।

স্ফিংক্স-এর পায়ের কাছেই যে লোকটাকে দেখতে পেলাম, সে বোধহয় ওখানে অগণিত বছর ধরে ঠায় বসে আছে। তার দাঁতগুলো সব ঝরে পড়েছে; চোখ দুটো ঘোলাটে, নিষ্প্রভ। শরীরটা কুঁকড়ে কি রকম যেন হোয়ে গেছে। একটা তলোয়ারকে সে জড়িয়ে ধরে আদর করছে; আর থেকে থেকে আবেশে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে আমায় ভুরু কুঁচকে দেখে নিল। পরিচয় জিজ্ঞেস করাতে সে বলল, "আমি ওডিন—হিঃ হিঃ। এই সারা পৃথিবীটা আমার—আমার, আর আমার এই তলোয়ারের—আমরাই পৃথিবীর মালিক আমরা, আর এই স্ফিংক্স—আমাদেরই দখলে রয়েছে পৃথিবীর সমস্তটা—হিঃ! হি!" —আবার সে তলোয়ারখানাকে আদর করতে লাগল। জিজ্ঞেস করলাম,—"আর সকলে কোথায়? তাদের কি হোল?"

"চলে গেছে—হিঃ! হিঃ! সব চলে গেছে—হাজার হাজার বছর লেগেছে মানুষকে তাড়াতে—শেষ পর্যন্ত দিয়েছি ভাগিয়ে। মানুষ সভ্য না হোলে অবশ্য পারতাম না। অনেক শতাব্দী ধরে তারা বর্শা, বল্লম, তীর, ধনুক নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করেছে, কিন্তু শেষ হোয়ে যায় নি। তারপর সে (মানুষ) তৈরী করল বারুদ, কিছুই তেমন লাভ হোল না। কিন্তু যখন সভ্যতার অনেকগুলো সিঁড়িই সে পেরিয়ে গেল, বিজ্ঞানে অনেক দূর এগিয়ে গেল, তখন থেকেই আমার জয়যাত্রা হোল শুরু। সে উড়তে শুরু করল আকাশে, ভাসতে লাগল জলের তলায়। পাহাড়ের মাথায় মাথায় ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। ধরে আনল আকাশ থেকে বিদ্যুৎকে। লোহার পাহাড় ভেঙে তৈরী করল বড় বড় সব জাহাজ। মাটির তল থেকে ছিঁড়ে আনল কয়লা, লাগাল তাকে তার কাজে। সারাক্ষণ সে বলে চলল, 'কি সুন্দর পৃথিবীই না তৈরী করছি'—হিঃ! হিঃ! হিঃ!—'কি সুন্দর সব যন্ত্র—এই যন্ত্রই এনে দেবে পৃথিবীতে শান্তি'—হিঃ! হিঃ! হিঃ! হিঃ! 'কারণ ছাড়া কিছুই মানব না। এটা বিশ্বভ্রাতৃত্বের যুগ—সারা পৃথিবীতে আনব শান্তি'—হিঃ! হিঃ! হিঃ! 'অনেক বছর ধরে খুঁজেছি ভগবানকে, এতদিনে পেলাম তাঁকে। তাঁকে নিজের করে নিয়েছি; নিজের বুদ্ধি দিয়ে। অনেকদিন ধরে খুঁজে খুঁজে হাঁপিয়ে পড়েছিলাম। শেষে এতদিন পরে তাঁকে পেলাম এই ল্যাবরেটরিতে। পৃথিবীতে যত রকম শক্তি আছে সব এক কোরে তাঁকে তৈরী করেছি। আমাদের যন্ত্র-ভগবান বিরাট, মহান্‌। সম্মান, আশীর্বাদ, গৌরব শক্তি—সব কিছুরই চাইতে এই শক্তিই বড়। শক্তি! শক্তি!! শক্তি!!

তার সেই জরাজীর্ণ গলা, তারস্বরে চীৎকার করে উঠল, "আর খালি সে—হিঃ! হিঃ!—সে খালি আমার জন্যই যন্ত্র তৈরী করে চলল—আমার জন্য, এই ওডিনের জন্য, আমার ভৃত্যদের জন্য। বড় বড় স্বেচ্ছাচারী, অত্যাচারী, রাজা, ডিক্টেটর—সবাই আমার ভৃত্য, মানুষের শত্রু। আমি কেবল হেসে বললাম—হিঃ হিঃ! মানুষের যন্ত্রই তার ধ্বংসের প্রধান বাহন হোল, ক্রমশ সে যন্ত্রের দাস হোয়ে পড়ল। যন্ত্রের ভীষণ, বিরাট চাকার তলে পড়ে সে মাছির মত পিষে গেল। কিন্তু সে তবু বলল, 'বিশ্বের এই বিরাট আর শ্রেষ্ঠ শক্তি আমার ভৃত্য বন্ধু। কি কল্যাণকর জিনিসই না আমরা তৈরী করেছি।' কিন্তু এ সবই আমার—হিঃ! হিঃ!—সবই আমার। যন্ত্র তৈরী শেষ হোয়ে গেলে, আমি ব্যাপারটা আমার ভৃত্যদের হাতে তুলে দিলাম। আর সেই

মঙগলময় যন্ত্রই হোয়ে উঠল তখন ধ্বংসকারী দৈত্য। প্রথমে এক অত্যাচারী চেষ্টা করল, পারল না; তারপর আর একজন চেষ্টা করল, কিন্তু সেও বিফল হোল। প্রথমে এক শ্বেতাংগ জাতি পেল এই যন্ত্র, তারপর আর এক জাতি তার কাছ থেকে আবার এক পীতাভ জাতি ছিনিয়ে নিল এই যন্ত্রকে। এই করতে করতেই সব গেল ধ্বংস হোয়ে—হিঃ! হিঃ! মানুষ শেষ হোয়ে গেল। আমার এই প্রত্যেক জয়ের পরে পরেই যন্ত্র সভ্যতা আরও ভীষণ হোয়ে উঠতে লাগল। তার এই ভীষণ ক্ষিদে মিটাতে গিয়ে পৃথিবীর যা কিছু ভাল, সব ফুরিয়ে গেল। সমস্ত মানুষ আস্তে আস্তে তার পেটে চলে গেল। হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ, জাতির পর জাতি সে ধ্বংস করল। যন্ত্র মানুষকে খুন করল, বিষ খাওয়ালো, পুড়িয়ে দিল, উপোস করিয়ে রাখল। পৃথিবী শ্মশান হোয়ে গেল। এতদিনের চেষ্টার পর পৃথিবীকে আমি দখলে আনলাম, আমি আর আমার এই তলোয়ার। এটাও এখন আমাদেরই সম্পত্তি—আমাদের আর এই স্ফিংক্স-এর।"

উত্তেজনার চোটে সে ভীষণ চীৎকার করে কথা বলছিল। আস্তে আস্তে তার গলা নেমে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু এ সবের মানে কি? পৃথিবী জিতে কি করবে তুমি?"

"মানে?—মানে আমি জানি না। সে কথা জিজ্ঞেস করতেই ত এই স্ফিংক্স-এর কাছে এসেছি। কত শতাব্দী ধরে বসে রয়েছি, উত্তরের প্রতীক্ষায়, কিন্তু সে কিছু বলছে না—তার অদ্ভুত শান্ত চোখ দুটো কেবল মরুভূমির দিকে তাকিয়ে আছে। সে যেন সবই জানে, অথচ কিছুতেই বলবে না। মাঝে মাঝে মনে হয় সে যেন বলতে যাচ্ছে—দেখ—দেখ—ওই যে ঠোঁট দুটো নড়ছে না?" বুড়ো ভীষণ চেঁচিয়ে উঠল। তার শীর্ণ হাত দুটোর মধ্যে তলোয়ারটা কেঁপে উঠল। তার ঘোলাটে চোখ দুটো, পাগলের মত তাকিয়ে রইল স্ফিংক্স-এর দিকে।

আমিও তাকালাম—হ্যাঁ, সত্যিই তার ঠোঁট দুটো নড়ছে। এক্ষুণি খুলে যাবে। মানুষ কি অদ্ভুত প্রাণী, সে নিজেই নিজের ভগবান তৈরী কোরে আবার তারই হাতে মার খেল,—একটা মস্ত বড় হেঁয়ালি। এই হেঁয়ালির উত্তর আজ আমি শুনতে পাব। ক্রমশ স্ফিংক্স-এর ঠোঁট দুটো খুলে গেল। তার গলা দিয়ে একটা ঘড় ঘড় শব্দ বেরোতে লাগল।

কিছুতেই কথা বেরোচ্ছে না। এমন সময় হঠাৎ একটা জোর ঝোড়ো হাওয়া এসে মরুভূমির ধুলো উড়িয়ে আমায় অন্ধ করে দিল। চারিদিক গরম হোয়ে উঠল। ঝড়টা যেন আকাশের গা থেকে সূর্যের অস্তিত্ব মুছে দিল, পৃথিবীটা ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে রইল। স্ফিংক্সটা ঝড়ের চোটে কোথায় উড়ে গেল; বুড়ো ওডিনও শূন্যে মিলিয়ে গেল। কেবল আমি একা এই বিরাট শূন্যের মধ্যে বসে রইলাম।

অনুবাদক—শ্রীশুভময় ঘোষ

পট্স্ড্যামের পরামর্শ সভার অধিবেশন

পটস্ড্যামের প্রধান সম্মেলনের সব খবরই খবরের কাগজে পড়েছেন, কিন্তু জানতে চান কি পটস্ড্যাম পরামর্শ সভার পরিবেশটি কেমন হয়েছিল পটস্ড্যামের প্রবেশপথে ঢুকবার আগে বার্লিনের রাস্তায় তোরণ দুয়ারে তিন প্রধান, ট্রুম্যান, স্টালিন, চার্চিলের বড় বড় ছবি প্রথমেই নজরে পড়ে। তারপরেই পটস্ড্যামের কানন-বনে ঘেরা প্রমোদ-ভবনের এলাকাটি কম নয়, কয়েক মাইল লম্বা চওড়া। পটস্ড্যামের অধিবেশনের কয়েকদিন এই সমস্ত এলাকাটাই

কাহিনী খবর



বার্লিনের রাস্তায় তিনপ্রধানের ছবি

একেবারে সোরগোলে মুখরিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কলকোলাহল ও উৎসব মুখরিত এলাকার বেশ কয়েক মাইল দূরে একটি নির্জন দুর্গে তিন প্রধানের পরামর্শ সভা বসেছিল। দুর্গ প্রাঙ্গনে রুশেরা তারকার আকারে লাল ফুলের গাছ বসিয়ে সবুজ জমির পটভূমিকায় একটা প্রকাণ্ড লাল তারা তৈরী করেছিল। দুর্গের ভেতরের মস্ত এক কালো রং করা ঘরের মেঝেটা গোলাপী গালিচায় ঢেকে তার ওপর পেতে দেওয়া হয়েছিল—বেগুনী আর কমলা লেবু রং-এর এক রাগ—তার ওপরে রাখা হয়েছিল বার ফুট গোল এক টেবিল—তার চার ধারে পনর-খানি চেয়ার। আশে পাশে সেক্রেটারী আর স্টেনোগ্রাফারদের ডেস্ক—এই ঘর থেকেই বেরিয়ে এক প্রকাণ্ড ঘর তার চারপাশেই সব পরামর্শ-কারীদের আস্তানা। আর ঠিক তার পাশেই হয়েছিল তাদের ভোজনশালার ব্যবস্থা। ভোজন-শালার টেবিলে ৩১ জনের বসে খাওয়ার যায়গা—এই ঘরের চন্দ্রাতপে প্ল্যাস্টারের তৈরী প্রাচীন কালের এক নৌকায় খোদিত ছবি—সাদা মেঘের নীচে পাল তুলে যেন ভেসে চলেছে। এই সুন্দর ছবিটার সাদা মেঘের ওপরও রাশিয়ানরা একটা লাল তারা এমন করে এঁকে দিয়েছিল—যেন মনে হচ্ছিল লাল তারার আলো ঐ নৌকার পালে প্রতিফলিত হয়ে সেটাকেও লাল করে তুলতে চাইছে।

পটস্ড্যামের পরামর্শ সভার পরিবেশটা এমন যেন ছিল লালে লাল—পৃথিবীর চোখে লাল রং—অশান্তি ও হত্যার প্রতীকই ছিল। পটস্ড্যামে পরামর্শ বৈঠকে তাই হয়ে উঠলো অশান্তির প্রতীক।

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বিমান

এ পর্যন্ত যত বিমানপোত তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বিরাট আকার নিয়ে যেটি আকাশে উড়বে, সেটি সম্প্রতি আমেরিকায় তৈরি হচ্ছে। এটি তৈরি করতে খরচ পড়বে-দু' কোটি ডলার। এর পরিকল্পনা করেছেন, বিমানবিশারদ 'হাওয়ার্ড হিউজেস্'। বিমানটি কত বড় হবে জানেন?—ডানার মাপ ৩২০ ফুট আর বিমান-দেহটা হবে ২২০ ফুট লম্বা। এতে করে ৭৫০জন সুসজ্জিত যোদ্ধাকে একসঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে। ১৭৫ মাইল বেগে ৩৫০০ মাইল যেতে পারবে—কোথাও না থেমেই। বিমানটিকে চলবার শক্তি যোগাবে ৮টি মোটর যার মোট শক্তির মাপ হচ্ছে ২৪০০০ অশ্বশক্তির সমান। আগামী জানুয়ারী মাসে এই বিমানটি ক্যালিফোর্নিয়ার কালভার সিটি থেকে উড়বে এই আশা করা যাচ্ছে। বিমানটির নাম-করণ হয়েছে—'দি হিউজেস্ হারকিউলিস্'।



দি হিউজেস হারকিউলিসের লম্বা ডানা তৈরী হচ্ছে

কার চেষ্টায় শ্রমিকদলের জয় ঘটেছে?

খবরের কাগজে পড়েছেন বৃটেনের শ্রমিক দলের জয়ের কথা। কিন্তু এ অপ্রত্যাশিত জয়ের পেছনে যে মানুষটির অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম রয়েছে, তাঁর কথা বড় একটা জানেন না। তিনি হচ্ছেন 'হারবার্ট মরিসন' শ্রমিক দলের নির্বাচনী প্রচার সমিতির সভাপতি। ছোট্ট একটা টেরচা অফিস ঘরে তাঁর প্রচার দপ্তর। দুটি ভাঙাচোরা ডেস্ক, কয়েকখানা চেয়ার, দুটো টেলিফোন। ঘরের দুদিকে দুসারি সাধারণ কাঠের তাকে থাক দেওয়া ফাইল, দলিল, বই আর রাশি রাশি ইস্তাহার পোস্টারের কাগজ-পত্তর। এই দপ্তর দেখলে আপনার মনেই হবে না যে, বৃটেনের এতবড় একটা শক্তিশালী দলের এইটাই কেন্দ্রস্থল। কোথাও এতটুকু জাঁকজমক ও আড়ম্বরের চিহ্ন নেই। নির্বাচনের সময়ে হারবার্টকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে, দিন-রাত লোকের পর লোক এসেছে তাঁর দপ্তরে আর তাঁকে সমস্তক্ষণ বকে বকে বোঝাতে হয়েছে, তাঁদের দলের উদ্দেশ্য, কর্মপন্থা, লক্ষ্যের কথা। শুধু তাই নয়, তাঁকে লিখতে হয়েছে অসংখ্য বিজ্ঞাপন, পুস্তিকা ইত্যাদি, দিতে হয়েছে একাধিক বক্তৃতা। হারবার্ট মরিসন বলে-



মরিসন

ছেন যে, ঐ দলের সকলের একযোগে সুসংবদ্ধ-ভাবে কাজ করার ফলেই শ্রমিক দলের জয় সম্ভবপর হয়েছে। এতে তাঁর কোনও কৃতিত্ব নেই! তিনি "Let us face the future" বলে পুস্তকটি রচনা করে শ্রমিক দলের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে সুন্দর করে বোঝাতে পেরেছিলেন যে, এ কৃতিত্বে কেউ আর সন্দেহ প্রকাশ করতে পারছেন না।

সকলের মুখে মুখে আণবিক বোমার কথাই শুনিতেছি। কাগজে কাগজে এই বোমার কথাই কেবল পড়িতেছি। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণ এই বোমা সম্বন্ধে বিবৃতি দিতেছেন। কিন্তু তবু আমরা ইহার বিধ্বংস শক্তির পরিমাপ করিতে পারিতেছিলাম না। বোধ হয় আমাদের বোধ-সৌকর্যের জন্যই সহজ ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, একটি গলফ্ বলের আকারের বোমা কলিকাতার মাঝখানে ফেলিলে (সংবাদদাতা ভয় দেখান নাই তো!) সমস্ত শহর মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইবে এবং এমন কি কলিকাতায় এই বিস্ফোরণের ফলে দমদম ব্যারাকপুরের ঘর-বাড়ীর দরজা-জানালা সব ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। অন্য একটি খবরে বলা হইয়াছে যে, হিরোশিমায় আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত একব্যক্তি নাকি অন্ধ হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি, ইত্যাদি---

* * * *

প্রসঙ্গত মনে পড়িয়া গেল আমাদের স্বনামখ্যাত আমেরী সাহেবের নাকি একটি নূতন কাজ জুটিয়া গিয়াছে। তিনি "Sunday Chronicle"এ আণবিক বোমা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতেছেন। যোগ্য ব্যক্তির উপরই প্রবন্ধ লেখার ভার পড়িয়াছে। আমেরী সাহেব আণবিক বোমার আবিষ্কর্তা না হইলেও প্রায়



সমগুণসম্পন্ন বিবৃতি বোমা ছাড়িয়া তিনি বহুদিন ভারতকে নাস্তানাবুদ করিয়াছেন। আর কতক দিন ভারত অফিসে থাকিলে তিনি ভারতকে বিনা প্রতিবাদে আত্ম-সমর্পণ মানিয়া নিতে রাজী করাইতে পারিতেন।

* * *

এইবারে বোধ হয় খানিকটা বুঝিলাম এবং বুঝিয়া আণবিক বোমার সঙ্গে অন্য একটি বোমার তুলনা করিতে লাগিলাম।

ট্রামে-বাসে

ঠিক গলফ্ বলের মত নয়, কিন্তু তার চাইতে বড় একটি বোমা ৯ই আগস্ট তারিখে কলিকাতার মাঝখানে পড়ায় সমস্ত না হউক অন্তত বেশীর ভাগ কলিকাতাই বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই বোমাটি আবিষ্কার করিয়াছেন পাগ্সলি এবং বোমা তৈরির উদ্যোক্তা ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এই বোমা পতনের ফলে ছয় মাইল কেন, ষাট মাইল দূরে অবস্থিত মানুষও নাকি অনেকে অন্ধ হইয়া গিয়াছে---অবশ্যই চোখের জলে। আণবিক বোমার চেয়ে এই ফুটবলিক বোমার ধ্বংসলীলার কথাই আমরা এই কয়দিন আলোচনা করিয়াছি। কেননা, হিরোশিমার চেয়ে কলিকাতার ময়দানের সীমাটি আমাদের অনেক কাছে।

* * *

আমরা আরও শুনিয়াছি, আণবিক বোমাকে শুধু ধ্বংস নয় সৃষ্টির কাজেও নাকি ব্যবহার করা যায়। আমাদের এই ফুটবলিক বোমাও সৃষ্টি ক্ষমতা হইতে একেবারে বঞ্চিত নয়। এই বোমা পতনের পর নাকি পুঁইডাঁটা আর কুঁচো চিংড়ির গড়ে মালা কেহ কেহ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু আবিষ্কর্তা জানেন না যে অন্যান্য প্রদেশ বোমা তৈরির ফরমুলো শিখিলে একদিন কাঁচা লঙ্কার মালা বা ইলিশের তোড়া বাজারে ছাড়িয়াও তারা প্রচুর লাভবান হইতে পারেন এবং তা যদি হয়, তাহা হইলে পুঁইমালার কি গতি হইবে তা একবার ভাবিয়া দেখুন। দেখিতেছি আণবিক আর ফুটবলিক কোন বোমারই ভবিষ্যৎ ফলাফল মানবের পক্ষে কল্যাণকর নয়!

* * * * *

পূজার সময় বাঙালীদের চাহিদা মিটাইবার জন্য নাকি দিল্লী হইতে বাঙলায় শীঘ্রই কাপড় আসিতেছে। সংবাদটা পাঠ করিয়া খুব আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না। দিল্লীর লাড্ডু আর কাপড় দুই-ই আমাদের পক্ষে প্রায় সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাপড় আসিয়াছে তবু পাইলাম না বলিয়া পস্তানোর চাইতে কাপড় আসিল না বলিয়া পস্তানোকেই আমরা শ্রেয় মনে করি।

* * *

বাঙলার লাট সাহেব তাঁর একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, যুদ্ধোত্তর যুগে মানুষকে আর কাজ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না, কাজই মানুষকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। বক্তৃতাটি শুনিবার পর হইতে আমরা বাজাও ঢাক,



টান নাক বলিয়া আনন্দে ধেই নৃত্য করিতেছি। "বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয়ের" পদগুলি তবে সত্যি সত্যি আর আমাদের হাত ছাড়া হইবে না!

* * *

ট্রাম-বাসের ভীড় কমাইবার জন্য ট্রাফিক পুলিশকে নাকি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ অতঃপর যানবাহনের দরজার ডাণ্ডা ধরিয়া বাদুড় ঝোলা হইয়াও যে



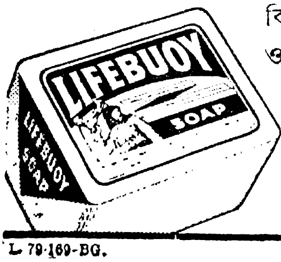
দশ মিনিট আগে বাড়ী আসিব তার আর কোন সম্ভাবনাই রহিল না। যাহা হউক ট্রামের সংখ্যা না বাড়াইয়া এবং বাসগুলি যথাস্থানে ফেরত না দিয়া শুধু ঝুলন্ত যাত্রীদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখিবার হুকুম জারী করিয়া জনসাধারণের যাতায়াতের পথ সুগম করিবার ব্যবস্থা করাতে আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলাম।



..এবং সে লাইফবয় মাখার অভ্যাসটি শিখেছে!



খুকী আজ মাকে সাহায্য করছে, এবং পদে পদে সেই সব শিক্ষা লাভ করছে যা তার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয়। মাও অবশ্য তার উপকার করেছেন; যেমন তিনি তাকে প্রত্যহ লাইফবয় মাখতে শিখিয়েছেন, যা তাকে ধূলোময়লার বিপদ থেকে রক্ষা করে। এই বিপদ প্রত্যেক পরিবারের স্বাস্থ্য ও সুখের যম।



লাইফবয় যে শুধু একটি ভাল সাবান তা নয়, এর ব্যবহার একটি ভাল অভ্যাস

L 79-169-BG. LEVER BROTHERS (INDIA) LIMITED

পাইওরিয়া নাশে

ওরিয়েণ্ট
টুথ পাউডার

দাঁতের মর্য্যাদা

দাঁত থাকিতেই দেওয়া ভালো। অনাদৃত, অপরিচ্ছন্ন দন্তপাঁতি যে কত অনর্থের মূল তাহা আপনার নিকটতম ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।



'ওরিয়েণ্ট'যোগে নিত্য দন্তসেবা করিলে দাঁত এবং মাড়ি নীরোগ ও সবল থাকে, মুখের দুর্গন্ধ দূর হইয়া নিঃশ্বাস সুরভিত হয়।

—*—

স্ট্যাণ্ডার্ড
ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা

অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক
আনন্দবাজার পত্রিকা

যেখানে নিয়মিত ডাক পেঁছে না সেখানে অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকাই একমাত্র সম্বল। দেশ বিদেশের খবর জানিতে আজই বাংলাভাষার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র অর্ধ-সাপ্তাহিক আনন্দবাজারের গ্রাহক হউন।

মূল্য সডাক

বাৎসরিক—১২৲ টাকা
ষাণ্মাসিক— ৬।০ ,,
ত্রৈমাসিক— ৩।০ ,,

১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

লেখু-ভেকুঁ

অ · কৃ · ৰ

* উর্বশীর বিলাপ *

কাল রাত্রে ভয়ানক গরম পড়িয়াছিল। অনেকেই ঘুমাইতে পারেন নাই। আমিও পারি নাই।

অন্যান্য অনেকে কি করিয়াছেন জানি না। আমি উর্বশীর বিলাপ শুনিয়াছি—অনন্তযৌবনা উর্বশীর বিলাপ।

* * *

স্বর্গে মহারাজা ইন্দ্রের সভায় নাচের আসর প্রস্তুত হইয়া উর্বশীর জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে; কিন্তু কোথায় উর্বশী?

দেবেন্দ্র দেবগণের সহিত সোমরস নামক স্বর্গীয় মদ্য পান করিতে করিতে পরস্পরের পেয়ালায় পেয়ালা ঠেকাইয়া ঠুনঠুন ধ্বনি করিতেছেন। নাচের লগ্ন বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু উর্বশী আসিতেছে না।

দেবেন্দ্র আকুল। দেবগণ ব্যাকুল। সবাই চিন্তাকুল হইয়া চিন্তার অকূলে ভাসমান।

ইন্দ্রসভার সংগীতিয়াদল সংগীত-যন্ত্রে সুর বাঁধিয়া তৈয়ারী হইয়া আছে। দুরূহ লয়ের মারপ্যাচ ইহাদের কাছে জলের মত সহজ। নৃত্যপটিয়সী উর্বশী লয়-সম্রাজ্ঞী, তাহার নৃত্যের সহিত সংগত করিতে করিতেই ইহারা লয়ে এমন পাকা হইয়াছে। সংগতের জন্য তাহাদের হাত সুড় সুড় করিতেছে। কিন্তু হায়, উর্বশী আসিতেছে না!

সভা-বীণকার ম্লানমুখে বসিয়া বীণার তন্ত্রীতে মৃদু টিনকার তুলিতেছে। উর্বশীর নৃত্য-ছন্দে স্বর্গের ভূমি হইতে আপনি যে সুর জাগিয়া উঠে তাহারি সংগে সুর মিলাইয়া বীণকার এমন পাকা সুরন্দাজ হইয়াছে। উর্বশীর নৃত্যের সংগে সংগে বীণকারের হাতের আঙুল বীণার তন্ত্রীতে যেন কিসের যাদুমন্ত্রে সুরের মায়াজাল ঘনাইয়া তোলে, বীণকার নিজেই তাহা বুঝিতে পারে না। তাহার বীণাবাদন শুনিয়া সভাস্থ শ্রোতারা যত মুগ্ধ হয়, সে নিজে মুগ্ধ হয় তার চেয়ে অনেক বেশী। যে তাহার নৃত্যের যাদুতে তাহাকে সামান্য বীণকার হইতে অসামান্য বীণ-যাদুকরে পরিণত করিল, আজ কোথায় রহিল সেই উর্বশী?

দূরে পাপিয়ার গান শোনা যাইতেছে পারিজাত-কুঞ্জের আড়াল হইতে। সে গান শুনিতে শুনিতে দেবেন্দ্র ভাবিতেছেন, কি আশ্চর্য! এমন বেয়াড়া রকম দেরী তো উর্বশী কোনোদিন করে না! আজ তাহার হইল কি? জনৈকা পরিচারিকাকে কহিলেন দেখ তো উর্বশী এসময়ে কোথায় রহিল। পরিচারিকা উর্বশীর অনুসন্ধানে গেল এবং যে স্থানে অনুসন্ধান করিলে উর্বশীকে পাওয়া যাইত সে স্থানটি বাদে অন্য সমস্ত স্থানে তন্নতন্ন পূর্বক অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

মেনকা, ঘৃতাচী ও রম্ভা দেবেন্দ্রের নিকটেই আসীনা ছিল। তাহারা কহিল প্রভু, আমরা তো আছি। আজিকার নাচের আসরটা আমরাই না হয়.................কিন্তু দেবেন্দ্রের মন তখন উর্বশীর কল্পনায় বিভোর। তিনি মেনকা, ঘৃতাচী ও রম্ভার দিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইলেন না। তাহাদের কথা তিনি শুনিলেন না কিনা, অথবা শুনিয়াও না শোনার ভান করিলেন কিনা বোঝা গেল না। মনের দুঃখে তিন সুন্দরী তিন দিকে চলিয়া গেল।

* * *

আমি দেখিলাম (এবং শুনিলাম) স্বর্গের শেষ প্রান্তে নন্দন বনের এক নিরালা অংশে একটি পত্রপুষ্পবহুল পারিজাত তরুর আড়ালে একাকিনী বসিয়া উর্বশী মৃদু অথচ করুণ কণ্ঠে বিলাপ করিতেছে।

দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যাহার কটাক্ষমাত্রে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল হইয়া উঠে, পুরুষের চিত্ত হারাইয়া যায় এবং বক্ষোমাঝে রক্তধারা নৃত্য করিতে থাকে, সেই না-মাতা, না-বধূ, না-কন্যা সুন্দরী রূপসী নন্দনবাসিনী উর্বশীর এই বিলাপ কেন?

লক্ষ্য করিলাম স্বর্গের নন্দন-কানন হইতে উর্বশী মর্ত্যের পানে তাকাইয়া আছে। তাহার দৃষ্টিপথ অনুসরণ করিয়া মর্ত্যের যে স্থানে আসিয়া আমার দৃষ্টি পৌঁছাইল সেটি একটি উদ্যান মধ্যবর্তী শিল্প-মন্দির—বিদেশী ভাষায় (বিদেশী ভাষায় বলিলেই এদেশের লোক বেশী সহজে বুঝিবে) স্টুডিয়ো। সেই মন্দির মধ্যে সৌন্দর্যের পূজারী জনৈক তরুণ ভাস্কর দুই হাতে দুইটি অস্ত্রের সাহায্যে একটি প্রাণহীন প্রস্তরখণ্ডে প্রাণসঞ্চার করিয়াছে। প্রস্তরখণ্ড পরিণত হইয়াছে একটি অপরূপ নারী-মূর্তিতে—কে বলিবে উহা প্রস্তরমূর্তি? মনে হইল সে যেন উর্বশীরই প্রতিমূর্তি। ধন্য ভাস্কর!

কিন্তু দেখিলাম তাহার শিল্প-প্রেরণার উৎস নন্দনবাসিনী উর্বশী নহে, মর্ত্যেরই অনেকা মানবী। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে তাহারই প্রস্তরমূর্তি দেখিয়া সে মুগ্ধ আনন্দের হাসি হাসিতেছে। তাহার দিকে তাকাইয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। দেখিলে মানবী বলিয়া বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস হয় না রূপ ও যৌবনের অমন অপরূপ সমন্বয় কোনো একটি মানবীর দেহে সম্ভব হইতে পারে। তাহারি পানে তাকাইয়া স্বর্গের নন্দন-বনে উর্বশী বিলাপ করিতেছে।

* * *

শিল্পী জানে মানবীর দেহে এই রূপ, এই যৌবন ক্ষণিকের অতিথি মাত্র, ইহারা চিরদিন থাকিতে আসে নাই। দেহ ইহাদিগকে প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিতে চাহে, আর্তকণ্ঠে বলে "যেতে নাহি দিব।" কিন্তু তবুও যাইতে দিতেই হয়। রূপ ও যৌবনের কুসুমদল মহাকালের পথের ধূলায় ঝরিয়া যায়।

শিল্পী তাই ঐ রক্ত মাংসে গড়া নারী-দেহের যৌবন-রূপ পাথরে খোদাই করা নারীদেহে ধরিয়া রাখিয়া মহাকালকে জব্দ করিতে চাহিতেছে। যখন এই মানবীর রূপ ও যৌবন নিঃশেষে ফুরাইয়া যাইবে, তখনও তাহার এই প্রস্তর প্রতিমূর্তির রূপ ও যৌবন আজ যেমন আছে তেমনই থাকিবে। হয়তো এই কথাই ভাবিয়া সুন্দরীর বক্ষ মথিত করিয়া একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। হয় তো সে ভাবিল, হায়, এই রূপ এই যৌবন যদি অক্ষয় হইত!

* * *

নন্দন-বনে অক্ষয় যৌবনা উর্বশীর দিকে তাকাইলাম। তাহারও বক্ষ মথিত করিয়া বাহির হইয়া আসিল একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস। তাহার বিলাপে কোন ভাষা ছিল না, কিন্তু তাহা যেন আমার কানে বাণী-মুখর হইয়া উঠিল। আমার চোখের সম্মুখে যেন চলচ্চিত্রের মত উর্বশীর মনের চিত্র দেখিতে লাগিলাম।

উর্বশী ভাবিতেছে "হায়! আমি ঐ প্রাণহীনা প্রস্তরমূর্তির সহিত তুলনীয়া। ঐ ক্ষয়িষ্ণু যৌবনা নারী অক্ষয় যৌবনা আমা হইতে ভাগ্যবতী। উহার যৌবনের শেষ বিদায় প্রতি মুহূর্তে নিকটতর হইতেছে বলিয়াই উহার যৌবন অমন মধুর, উহার রূপের কুসুম শুকাইয়া ঝরিয়া যাইবে বলিয়াই তো উহার মূল্য। হায়, যে কুসুম কখনো ঝরিবে না, তাহার মূল্য কি? যাহা কোনোদিন হারাইবে না, কি তাহার মর্যাদা? যাহার সহিত বিচ্ছেদের কোন সম্ভাবনা নাই তাহার সহিত মিলনের আনন্দ কোথায়? আমি যেখানেই যাই, আমার অক্ষয় রূপ এবং অক্ষয় যৌবন সেখানেই আমার সাথে সাথে ফেরে। ইহাদের হাত হইতে আমার এড়াইয়া পলাইবার উপায় নাই। হায়, কেন আমি ঐ ক্ষয়িষ্ণু যৌবনা মানবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলাম না! হে বিধাতা, তোমার দেওয়া এই অভিশাপ আর আমার সহ্য হইতেছে না। আমার মিনতি রাখো। ফিরাইয়া লও, ফিরাইয়া লও আমার এই অনন্ত যৌবন।"

মর্ত্যের উর্বশীর ক্ষয়িষ্ণু যৌবনের বেদনা এবং স্বর্গের উর্বশীর অক্ষয় যৌবনের বেদনার আর্তনাদ অনন্ত বাতাসে মিলাইয়া গেল। তাহার পরেই সম্ভবত আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

কোনও মর্ত্যবাসিনী উর্বশীর দেখা মিলিবার সম্ভাবনা কম। যদি কখনো মেলে, তাহার পানে তাকাইয়া আমার মনে হইবে নন্দন-বাসিনী উর্বশী তাহারই পানে তাকাইয়া নিজের অনন্ত যৌবন বেদনায় ব্যথিতা হইয়া হতাশ হৃদয়ে বিলাপ করিতেছে।

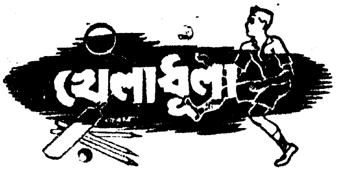
ফুটবল—

ফুটবল মরশুম এখনও শেষ হয় নাই। বহু ছোটখাটো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইতেছে। কিন্তু এই সকল প্রতিযোগিতা সাধারণ ক্রীড়ামোদীদের উৎসাহিত করে না। কারণ আই এফ এ শীল্ড ও কলিকাতা ফুটবল লীগ তাহাদের একমাত্র আকর্ষণ। এই দুইটি প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে যদি এই সকল ক্রীড়ামোদিগণকে প্রশ্ন করা হয়, অমনি উত্তর পাওয়া যাইবে "অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এইবার বিশেষ উত্তেজনা ভোগ করিতে হইয়াছে।" খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড কিরূপ হইল অথবা কোন দল উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিল এই সকল দিকে তাহাদের দৃষ্টি মোটেই থাকে না। এইজন্য যদি বলা হয় যে, খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এই বৎসর খুবই নিম্নস্তরের হইয়াছে, তাহা হইলে সাধারণ ক্রীড়ামোদী সকলেরই বিরাগভাজন হইতে হইবে। কিন্তু না বলিয়া পারা যাইতেছে না। প্রতি বৎসর যেভাবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিম্ন হইতে নিম্নতর হইতেছে তাহাতে ইহার শেষ পরিণাম কি দাঁড়াইবে আমাদের কল্পনা করাই অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে। এই বৎসর কি ভারতীয়, কি বৈদেশিক কোন দলেরই খেলা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ পাওয়া যায় নাই। অনেকদিন এই দুই প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলা দেখিতে দেখিতে মনে হইয়াছে—দশ বৎসর পূর্বে তৃতীয় চতুর্থ ডিভিসনেও এত নিম্নস্তরের খেলা দেখিতে হয় নাই। কোন দলের কোন একটি বিভাগের খেলায় কোন নিয়ম অনুসরণ করা হইতেছে বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

মরশুমের পূর্বে শোনা গেল বিশিষ্ট দলসমূহ বৈদেশিক ফুটবল শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন—ইহাই যদি তাহার ফলস্বরূপ হইয়া থাকে, আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি খেলোয়াড়গণ আন্তরিকতার সহিত সেই সকল শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ইহা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। আজ যে বাঙলার মাঠে অ-বাঙালী খেলোয়াড়গণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাহার একমাত্র কারণ বাঙালী খেলোয়াড়গণের আন্তরিকতার অভাব। এই মনোভাব যতদিন বর্তমান থাকিবে, ততদিন বাঙলার মাঠে বাঙালী খেলোয়াড়গণ দ্বারা উন্নততর ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শিত হইবে না। অ-বাঙালী খেলোয়াড়গণ সেই সুযোগে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া লইবেন। ইহা বাঙলার পক্ষে অগৌরবের বিষয়। বাঙালী খেলোয়াড়গণ কি কোনদিনই ইহা উপলব্ধি করিবেন না?

সন্তরণ—

নব গঠিত বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন দীর্ঘ একমাস আলাপ আলোচনার পর ওয়াটারপোলো লীগ প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছেন। প্রাদেশিক চ্যাম্পিয়ানসিপ সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হইবে



ইহাও বিজ্ঞপ্তি করিয়াছেন। ইহাদের নব প্রচেষ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে বিভিন্ন জেলার জন্য একটি পৃথক প্রতিযোগিতার আয়োজন। বাঙলার বিভিন্ন জেলা হইতে যাহাতে সাঁতারু আসে সেইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই ইহাদের এই ব্যবস্থা। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের উচিত এখন হইতেই বিভিন্ন জেলায় কয়েকজন করিয়া শিক্ষিত সাঁতারু প্রেরণ করা এবং এই সকল সাঁতারু দ্বারা বিভিন্ন জেলায় প্রদর্শনী সন্তরণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা। বাঙলা জলের দেশ। খুব কম জেলাই দেখিতে পাওয়া যাইবে যেখানে অধিকাংশ লোকে সাঁতার কাটিতে পারে না। তবে তাহারা যে প্রথায় সাঁতার কাটে তাহা দ্বারা কলিকাতার সাঁতারুদের পরাজিত করা অসম্ভব। যাহাতে বিভিন্ন জেলায় সাঁতারুরা কলিকাতার সাঁতারুদের সহিত সমানে পাল্লা দিতে পারে তাহার জন্যই প্রয়োজন তাহাদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সন্তরণ কৌশল শিখিবার সুযোগদান করা। এইভাবে যদি ব্যবস্থা হয় আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি, দুই এক বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন জেলা হইতে বহু কৃতী সাঁতারু পাওয়া যাইবে। ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতার জন্য যেরূপভাবে বর্তমানে দলের অভাব অনুভব করিতে হইতেছে, তাহাও আর থাকিবে না।

মুষ্টিযুদ্ধ—

বাঙলার মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালনা লইয়া এতদিন দুইটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল। সম্প্রতি নাকি ইহার অবসান হইয়াছে। উভয় পরিচালকমণ্ডলী একযোগে কার্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহারা উভয়ের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ক্লাব ও প্রতিষ্ঠানকে লইয়া এক সাধারণ সভার আয়োজন করিতেছেন এবং এই সাধারণ সভায় যে পরিচালকমণ্ডলী গঠিত হইবে তাহাই বাঙলার একমাত্র পরিচালকমণ্ডলী হইবে। ইহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হইবে কি? সেই সাধারণ সভা যাহাতে নির্বিঘ্নে হয় তাহার জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। আরও আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইব যদি এই নব গঠিত পরিচালকমণ্ডলী অভিজ্ঞ মুষ্টিযোদ্ধা অথবা মুষ্টিযুদ্ধ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, এইরূপ সকল লোকদের লইয়া গঠিত হয়। কারণ বর্তমানে উভয় প্রতিষ্ঠানেই এইরূপ সকল ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা মুষ্টিযুদ্ধ সম্বন্ধে কোন কিছুই জানেন না। ইহা খুবই লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই।

বাঙলা দেশে মুষ্টিযুদ্ধ কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য বাঙালী উৎসাহী ব্যায়ামবীরদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। অনেক বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধা এত উচ্চস্তরের কৌশলের অধিকারী হইয়াছেন যে, বৈদেশিক যে কোন মুষ্টিযোদ্ধার সহিত সমানে লড়িতে পারেন। ব্যক্তিগতভাবে তো বটেই, দলগতভাবেও লড়িতে প্রস্তুত। ইহার পরিচালকমণ্ডলী সেইরূপ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত না হইলে ভবিষ্যৎ পরিণাম খুব ভাল হইতে পারে না। আমরা আশা করি, যাঁহারা এই পরিচালকমণ্ডলী গঠন করিবেন, তাঁহারা যেন এই সকল বিষয় স্মরণ রাখিয়া কার্য করেন।

কুস্তি

অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘের নব নির্বাচিত কার্যকরী সমিতির সভ্যগণের তালিকা দেখিয়া আমরা একটু আশ্চর্য হইলাম। গত বৎসরে যাঁহারা পরিচালকমণ্ডলীতে ছিলেন, তাঁহারাই সকলে আছেন, নূতন কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি ইহাতে নাই। অথচ কিছুদিন পূর্বে আমরা এক সংবাদ পাইয়াছিলাম যে, অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘই একমাত্র বাঙলার কুস্তি পরিচালকমণ্ডলী বলিয়া পরিগণিত হইলেন—সেই সংবাদ কি ভিত্তিহীন? যদি সেই সংবাদ ভিত্তিহীন না হয়, তবে যে সকল প্রতিষ্ঠান বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সহিত এতদিন সংযুক্ত ছিলেন তাঁহারা এই অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘে স্থান পাইলেন না কেন? ইহা হইতে আমাদের বুঝিতে হইবে কি যে, বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সহিত বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘের যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল, তাহা এখনও বর্তমান আছে? যদি ইহাই সত্য হয় তবে বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘের উচিত তাহা ভালভাবে প্রকাশ করিয়া দেওয়া। ইহা সকলেই স্বীকার করে যে, বাঙলাদেশে বর্তমানে কুস্তির যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে, তাহা বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। বাঙলার বিভিন্ন জেলায় যে সকল কুস্তি সঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে, অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘই তাহা গঠন করিয়াছে। সুতরাং বাঙলার কুস্তি পরিচালনার সম্পূর্ণ অধিকারী যে তাহারাই হইবে ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাঁহারা বাদ সাধিতেছেন তাঁহাদের রূপটা প্রকাশ হওয়া উচিত। পাতিয়ালায় কি শ্রেণীর মল্লবীর বাঙলার প্রতিনিধি হিসাবে গিয়াছিল তাহাও প্রকাশিত হওয়া উচিত। এই অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া অর্থে প্রতিকারের পথ রোধ করা; ইহা কি কুস্তি সঙ্ঘের পরিচালকগণ উপলব্ধি করেন না?

সাইক্লোন

শ্রীশচীন্দ্র লাল রায়

শিখিধ্বজ বোস জানলার সম্মুখে দাঁড়িয়ে 'ডিপ্‌ব্রিদিং' অভ্যাস কর্‌ছিলেন। নিশ্বাস টেনে নিতে বুকটা কিছু স্ফীত হয়ে উঠছিল, পেটের খোলটা একটু ভেতরে ঢুকছিল—তারপরে দম বন্ধ করে এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত গুণছিলেন এবং শেষে ধীরে ধীরে নিশ্বাস ছাড়ছিলেন। বার দশেক এই প্রক্রিয়া করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জানলার ভিতর দিয়ে দূরে তাকিয়ে রইলেন। না—ঠিক সুবিধে হচ্ছে না। ধীরে ধীরে নিশ্বাস টানতে বুকটা যত স্ফীত হয়ে ওঠার কথা তা যে হচ্ছে না—তা তিনি বুঝছিলেন। দম বন্ধ করে রাখবার চেষ্টা করতেই বুকটা কেমন ধড়ফড় করে ওঠে, ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলাও ঠিক হয়ে ওঠে না যেন, সবটা নিশ্বাসই একবারে বেরিয়ে পড়তে চায়। ডিপ্‌ব্রিদিং অর্থাৎ প্রাণায়ামের পূরক, কুম্ভক, রেচকের ক্রিয়াগুলি যে ঠিক মত হচ্ছে না, তা তিনি বুঝলেও আমল দিলেন না। ভাববার চেষ্টা করলেন হবে সব ঠিক হয়ে যাবে। শরীরকে মজবুত আর দীর্ঘকাল স্থায়ী করতে হলে মুনি ঋষিদের পন্থা তাঁকে গ্রহণ করতেই হবে।

ব্যায়াম তিনি বয়স থাকতে করে উঠতে পারেন নি। তাঁর বয়স আটচল্লিশ উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এই বয়সে নতুন করে ব্যায়াম অভ্যাস করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হতে পারে কি না সেটা তিনি বিবেচনা করে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি ইনস্পিরেশন পেলেন একখানা আমেরিকান হেলথ্‌ ম্যাগাজিন থেকে হেলদিয়র এ্যাট ফিফ্‌টি থ্রি দ্যান এ্যাট টোয়েনটি বাই ডিপব্রিদিং একসারসাইজ। সেই থেকে তিনি আরম্ভ করেছেন। উপকার কিছু তিনি নিশ্চয়ই পাচ্ছেন—না পেলে তাঁর চলবে না—যুবজনোচিত স্বাস্থ্য এবং ক্ষিপ্রতা তাঁকে নিশ্চয়ই অর্জন করতে হবে।

তিনি জানলা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে রইলেন। বিগত জীবনের কথাগুলি তাঁর মনের ওপর ভেসে উঠতে লাগলো। যদিচ তিনি মনে করেন সেগুলো তিনি ভুলে যাবেন—কিন্তু তা পেরে ওঠেন না। অতীতের ইতিহাস খুব সুখকর বলে বোধ হয় না তাঁর। অতীত জীবনের ভুলই তাঁকে এনে ফেলেছে বর্তমানের পরিস্থিতিতে। কিন্তু বর্তমানকে তাঁর সুখকর করে তুলতে হবে—আনতে হবে জীবনে গতি, ছন্দ, গান -যা তাঁর বয়স থাকতে ঘটে ওঠেনি।

তিনি বুঝতে পারেন জীবনের পথে চলতে তিনি পিছিয়ে পড়েছেন কতখানি। মনে হয় তাঁকে পিছিয়ে ফেলে আর সবাই গিয়েছে এগিয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বরাবর তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল এগিয়ে যাবেন সবাইকে ফেলে। আবেগ তাঁর যথেষ্ট ছিল হয়তো—কিন্তু যাকে বলে ড্যাস ধাক্কা দিয়ে নিজের পথ করে নেওয়া তা তাঁর কোনও দিন ছিল না। এজন্য তাঁর আফশোষ হয় এখন। দিন দিন করে জীবনের অনেকগুলি বছর তিনি কাটিয়েছেন—এইবার বাকি দিনগুলোর সদ্ব্যবহার করতে হবে। হ্যাঁ এখন জীবনে তিনি ঝড়ই চান।

শিখিধ্বজ বোস কয়েকদিন হলো পশ্চিমে বেড়াতে এসেছেন। উদ্দেশ্যটা এই যে, পশ্চিমের জল-হাওয়ায় শারীরিক স্বাস্থ্য অর্জন করা, আর সম্ভব হলে মনকেও তাজা করে নেওয়া। কর্মস্থলের একঘেয়েমি তাঁকে রীতিমত বুড়ো করে দিচ্ছিল। এ বিষয়ে তিনি একটু গবেষণাও করেছেন। তাঁর মত চাকুরীজীবী যাঁরা—যাঁদের মাস মাইনের ওপর নির্ভর করতে হয়—তাঁরা মাসের দশ দিন গেলেই দু'হাতে ঠেলে নিতে চান অবশিষ্ট দিনগুলো পরের মাসে মাইনে পাবার আশায়। কিন্তু তাঁরা জানেন না সময়কে দুই হাতে ঠেলে ফেলবার চেষ্টা মানেই নিজেকে বুড়ো করা। সময়কে অবশ্য আটকে রাখা যায় না কিন্তু তাকে নানা ভাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। তাকে দু'হাতের ধাক্কায় সরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা মানেই আত্মহত্যা। তাঁর ইচ্ছে আছে এবিষয়ে একটা থিসিস লেখবার একটু সময় পেলেই তিনি এবিষয়ে হাত দেবেন।

এই কয়দিনেই তিনি বেশ একটু ফল পেয়েছেন মনেও একটু আমেজ এসেছে। ডিপব্রিদিংএর পর তিনি একটু ঝিমিয়ে পড়েন অবশ্য, বুকটা কেমন খালি খালি বোধ হয়—কিন্তু ওটা সাময়িক। অভ্যাস হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনি বুঝতে পেরেছেন মনের গহন কোণে ঝড়ের আবেগ দেখা দিয়েছে এই পশ্চিমে পা দিয়েই। কে ভেবেছিল এই এত দীর্ঘকাল পরে আবার সুমিতার দেখা পাবেন। অপ্রত্যাশিতই বটে। এখানে আসবার পরদিনই তিনি শালবনের ধারে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ চমকে ওঠেন সুমিতাকে দেখে। মনে হয় যেন চেনা মুখ—কিন্তু অনেক দিনের কথা, দুই যুগেরও ওপর হয়ে গিয়েছে। তা ছাড়া ওর বিধবার বেশ কেমন ধাঁধাঁ লাগছিল। কিন্তু সুমিতা তাকে ঠিকই চিনেছিল। এগিয়ে এসে হেসে বল্লে—আপনি শিখিধ্বজবাবু না? তিনি আড়ষ্ট হয়ে বল্লেন—হ্যাঁ। আপনি সুমিতা?

সুমিতা বললো—হ্যাঁ, চিনতে পেরেছেন তাহলে!

না চিনবার কথা কিছু নয়। কিন্তু শিখিধ্বজবাবু কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। এ বিমর্ষতা সুমিতার পক্ষে দেখা হওয়ার জন্য নয়—বরং এই ভেবে যে সুমিতাকে দেখবার পর তাকেই প্রথম সম্বোধন করা উচিত ছিল তাঁর। বুঝলেন যে তাঁর ভীরুতা সেই ব্যাক গ্রাউণ্ডে থাকবার ইচ্ছাটা তিনি এখনও ত্যাগ করে উঠতে পারেননি।

শিখিধ্বজবাবু একটা ঢোক গিলে বল্লেন—আপনি এখানে?

সুমিতা হেসে বল্লো—'আপনি' বলা মানে কি আমাকে অপমান করা নয়—শিখিধ্বজ—আচ্ছা 'বাবু' বলবো না সেই আগেকার মত 'দাদা'ই বলবো আপনাকে?

শিখিধ্বজবাবু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লেন—'দাদা'ই বলো। কিন্তু কত দীর্ঘদিন পর দেখা বলতো!

—উপায় কি বলুন!...সুমিতা এই বয়সেও সেই আগেকার মত মিষ্টি হাসবার চেষ্টা করলো যেন। শিখিধ্বজ নির্বোধ নন—সুতরাং সুমিতার বলার ইঙ্গিত তিনি বুঝলেন। তখনকার নির্বোধ ভীরু শিখিধ্বজ যদি একটুখানি ফরওয়ার্ড হতেন, তা হলে উপায় ছিল বৈকি! কিন্তু থাকগে এসব কথা। অতীতের চিন্তাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়!

তিনি শুনলেন, এখানে সুমিতাদের বাড়ী তাঁরই হোটেলের কাছে। তার স্বামী পশ্চিমেই থাকতেন ঠিক করে বাড়ী তৈরি করেছিলেন এখানে। বছর তিনেক আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তার একমাত্র পুত্র সমরের যুদ্ধে গিয়েছে—সে এখন ইটালীতে।

জানলায় দাঁড়িয়ে সুমিতাদের বাড়ী দেখা যায়। বাড়ীর সামনেই ছোট একটা ফুলের বাগান। ফুলগাছের সারি সুন্দর করে সাজানো। সুমিতার স্বামীর রুচি ছিল বলতে হবে—অন্ততঃ বাড়ীটা দেখে তাই মনে হয়। তা ছাড়া সুমিতাও বাড়ীখানি ছবির মত করে রেখেছে। এইখান থেকেই ওদের বাগানের গোলাপের কেয়ারিতে গোলাপ ফুটে আছে দেখা যাচ্ছে। বেশ বড় একটা লাল গোলাপ—রক্তের মত লাল। ঐ দিকে তাকিয়ে অনেক দিন আগের একটা কথা তাঁর মনে পড়লো।

সুমিতার বয়স তখন আর কতই হবে—পনরোর বেশী নয়। তাঁরা দুজনে বেড়াচ্ছিলেন সুমিতাদের সুন্দর, সুসজ্জিত

পুষ্পিত বাগানে। সুমিতার বাবার সখ ছিল। শুধু সখ নয়—রুচিও ছিল তাঁর পরিচ্ছন্ন, নির্মল। তিনি সেকালেও গোঁড়ামির ধার ধারতেন না। মেয়েকে তিনি শিক্ষিতা করে তুলবেন এই তাঁর ইচ্ছা ছিল। তিনি বলতেন—পুরুষকে হতে হবে বলিষ্ঠ দেহে ও মনে, আর নারীকে হতে হবে পরিচ্ছন্ন ভিতরে ও বাইরে। ফুলের মত কোমল নয় কিন্তু ফুলের মত পবিত্র, সুন্দর।

সুমিতা সেদিন বলেছিল—ঐ গোলাপ ফুলটা তুলে দেবে শিখিদা—ঐ যে কাউণ্ট অব মণ্টেক্রিস্টো। কি সুন্দর হয়েছে ঐ ফুলটা দেখেছো!......বিচিত্র অনুরোধ ছিল বৈকি। ফুলটি সে নিজেই তুলে নিতে পারতো কিন্তু কেন তাঁকে এই অনুরোধ। শিখিধ্বজবাবু ভুল করলেন—অবশ্য সে খেয়াল তখন তাঁর ছিল না। তিনি বল্লেন—ফুল তো বেশ আছে ওখানে। তুলে আর নষ্ট করা কেন।

—ওঃ তাই নাকি। এই বলে নিজেই ফুলটাকে তুলে নিজের এলো খোঁপায় গুঁজে দিয়ে হাসতে হাসতে সুমিতা বল্লে—এখানে মানাচ্ছেনা বুঝি?......শিখিধ্বজ একটু হেসেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁর মনে পড়ে সেই দিনই সুমিতা তাঁকে বলেছিল—তোমার নাম শিখিধ্বজ কে রেখেছেন বলতো? টিকিধ্বজ রাখলে কি সুন্দর হতো বল দেখি? তাহলে কেমন টিকিদা বলে ডাকতে পারতুম।—এই বলেই মুখে কাপড় দিয়ে হাসি সামলাতে সামলাতে সে ছুটে পালিয়েছিল।

থাক্ ও সব পুরোনো কথা! শিখিধ্বজবাবু অতীতকে বিসর্জন দিতে চান। কিন্তু মনও এমন বেয়াড়া হয়েছে যে, ঘুরে ফিরে ব্যর্থ অতীতের দিকে চেয়েই রস সংগ্রহ করতে চায়। বিশেষ করে সুমিতার সাথে দেখা হবার পর থেকে অতীতের নেশা যেন আরও পেয়ে বসেছে তাঁকে।

হ্যাঁ—তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে বৈকি! সুজিৎ রায়ের সাথে সুমিতার বিয়ে না হয়ে যদি তাঁর সাথেই হোতো? ক্ষতিটা এমন কি হোতো সুমিতার! অন্ততঃ এতদিন তার মাথার সিঁদুর বজায় থাকতো নিশ্চয়। সুমিতার জীবনে সুজিৎ রায়ের আবির্ভাব ঘটেছিল সহসা—ঠিক ঝড়ের মত আবির্ভাব তার। কি করে যে সে পথ করে নিলো ভাবতে তাঁর অবাক লাগে। সুজিৎ রায় গত মহাযুদ্ধে বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দিয়েছিল। সে নাকি ফ্রান্সে সক্রিয় যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেছিল। সত্যি কি ধাপ্পা কে জানে! কিন্তু সুমিতা তার এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী যেন হাঁ করে গিলতো। তার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল যখন তার সুজিৎ দাদা তাকে 'মিতা' বলে মিষ্টিসুরে ডাকতে আরম্ভ করেছে।

শিখিধ্বজবাবু জানতেন—সুমিতার বাবার লক্ষ্য তাঁর দিকে বিলক্ষণ ছিল। সুজিৎ রায়ের উপস্থিতিতে তাঁর মন দোলায়মান হ'লো। শিখিধ্বজবাবুর মনে আছে অনার্সে বি এ পাশ করে যেদিন তিনি সুমিতার বাবাকে প্রণাম করলেন—তিনি তাঁর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—দেহ মনে বলিষ্ঠ হও। শিখিধ্বজবাবু পরে বুঝেছিলেন অবশ্য একথার অর্থ—যখন সুমিত্রার সাথে সুজিৎ রায়ের বিয়ে হয়ে গেল।

শিখিধ্বজবাবু দেখলেন—আকাশে মেঘ জমেছে বেশ। একটু একটু হাওয়াও দিচ্ছে। জানালার কাছ থেকে এসে তিনি চেয়ারে বসলেন, টেবিলের ওপরে খবরের কাগজ ছিল অভ্যাস মত সেটাকে তুলে তিনি অলসভাবে পড়তে লাগলেন। হঠাৎ একটা সংবাদের দিকে, তাঁর দৃষ্টি পড়লো তিনি উৎসুকভরে সেই সংবাদটা পড়লেন, তারপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। আকাশে মেঘের ঘনঘটা যেন আরও একটু বেড়েছে, টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে। তা হলে হয়তো সত্যই সাইক্লোন হবে। আবহাওয়া অফিসের খবর হয়তো মিথ্যে হবে না। বঙ্গোপসাগরে নাকি প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা সুরু হয়েছে—এর জের দক্ষিণ বঙ্গ, উড়িষ্যা আর বেহারের কিয়দংশের উপর দিয়ে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। ঝড়ের বেগ কিছু গুরুতর হবে বলেই আশঙ্কা হয়।

প্রৌঢ় শিখিধ্বজবাবুর মনটা নেচে উঠলো যেমন নাচন তাঁর যৌবনকালেও কোনও দিন নাচেনি। হ্যাঁ, তিনি তো এই-ই চান। সাইক্লোন কেন যদি প্রলয়ের ঝড়ই আসে তাহলে তার চেয়ে আর সুখী হয় কে? তিনি ঝড়ের তালে ছুটবেন প্রকৃতির সেই সংহার মূর্তি উপেক্ষা করে। হয়তো এই ঝড়ে বাড়িঘর উড়ে যাবে, নিরাশ্রয় নরনারীর মরণ আর্তনাদে চারিদিক ধ্বনিত হয়ে উঠবে। একটি গাছও মাথা তুলে থাকবে না—এমনি পরিবেশের মধ্যে তিনি মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলবেন দৃঢ়পদক্ষেপে একা! হঠাৎ তাঁর সুমিতার কথা মনে হলো। আহা বেচারী হয়তো জানে না—কি সর্বনাশ তার সামনে। স্বামী তাকে ছেড়ে গিয়েছে পরপারে—একমাত্র ছেলে—সেও আছে সাগর পারে যুদ্ধক্ষেত্রে—এতদিন বেঁচে আছে কিনা ঈশ্বরই জানেন। হয়তো আজই তাকে গৃহহীন, নিরাশ্রয় হতে হবে—তার স্বামীর রচা নীড়টিও ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। শিখিধ্বজবাবু ভাবলেন সময় থাকতে সুমিতাকে সাবধান করা ভাল। আর ঝড় শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওর কাছেই থাকবেন তিনি। একলা মেয়েমানুষ—তাঁকে দেখে তবু কতকটা ভরসা পাবে। আর যদি সত্যিই তেমন হয় তাহলে শিখিধ্বজবাবু যুঝবেন এই ঝড়ের সঙ্গে

তিনি এগিয়ে যাবেন দুর্যোগের মধ্যে—সুমিতার হাত ধরে ওকে রক্ষা তিনি করবেনই।

তিনি উঠে পড়লেন। বাইরে, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ বেড়েছে যেন একটু, টিপ টিপ করে বৃষ্টিও পড়ছে। শিখিধ্বজবাবু আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। সুমিতা তাঁকে দেখে উচ্ছ্বসিত সম্বর্ধনা করে বল্লো—আমিই তোমার কাছে যাচ্ছিলাম শিখিদা। তোমাকে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করবো বলে। আজ আমার একটা বিশেষ দিন কিনা।

শিখিধ্বজবাবু মনে মনে হাসলেন—হ্যাঁ বিশেষ দিনই বটে! আহা বেচারী তাহলে কিছুই জানে না যে, রুদ্রদেব প্রলয় নাচন সুরু করে দিয়েছেন। হায় অসহায়া নারী! মনে করেছো স্বামীর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা তোমার এই গৃহটি তোমাকে নিরাপদে রাখবে। আবহাওয়া অফিস, কি নিদারুণ সংবাদ ঘোষণা করছে তা তুমি কি জান!

সুমিতা বল্লে—হ্যাঁ, সত্যিই আজ আমার পক্ষে স্মরণীয় দিন শিখিদা। এই দিনই উনি জেলে গিয়েছিলেন কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে। সেদিন ওঁর মুখের হাসি দেখতে যদি তুমি। বৎসরে দুটি দিন আমার কাছে স্মরণীয়—তাই এই দুটি দিন আমি পালন করি—একটি দেশের কাজে উনি নিজেকে উৎসর্গ করে যেদিন কারাবরণ করলেন আর যেদিন আমার সুবীর জন্মগ্রহণ করলো। আজকের দিনটা আরও মনোরম হয়েছে আমার কাছে এইজন্য যে, আজ সুবীরের চিঠি পেয়েছি। তোমাকে পড়ে শোনাব চিঠিখানি। তাছাড়া তোমার সাথেই যে এতদিন পর দেখা হবে এই বা কে ভেবেছিল। এমনি দিনে তোমাকে কাছে পাব দুটো মনের কথা বলতে পারবো এ কি আমার কম সৌভাগ্যের কথা। এতে আমার আনন্দ হবে না!

শিখিধ্বজ ভাবলেন—আহা বেচারী, এই আনন্দের অনুভূতি আর কতক্ষণ বজায় থাকবে তোমার! মনে হচ্ছে বাইরে বাতাস মেতে উঠেছে প্রবলভাবে ঝড়ের দাপটে দরজা জানালার শার্সিগুলি কাঁপছে। তিনি বল্লেন—আজকের দিনটা দুর্যোগ মাথায় করে এসেছে। বাইরে কেমন ঝড় আরম্ভ হয়েছে দেখেছো!

সুমিতা বললো—ও কিছু নয়—ও এখুনি থেমে যাবে। ওর জন্য তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। যদি ভয় করে আমি তোমাকে তোমার বোর্ডিংএ পেঁৗছে দিয়ে আসবো।......সে হেসে উঠলো।—সুবীরের চিঠি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি। ও ঠিক ওর বাপের মত হয়েছে। দেখ তো শিখিদা ফুলের মালাটা কেমন মানিয়েছে। লাল টকটকে গোলাপ ওঁর বড় প্রিয় ছিল কিনা।

শিখিধ্বজবাবু দেখলেন—ছোট্ট টেবিলের ওপর সুজিত রায়ের ফটো তাতে গোলাপের

মালা দেওয়া হয়েছে—টকটকে লাল গোলাপগুলি। সম্মুখে ধূপদানি তা থেকে সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া উঠছে।

শিখিধ্বজবাবু কোনওক্রমে মুখে একটু হাসি টেনে বল্লেন—বেশ হয়েছে। মনে মনে ভাবলেন—এখনও এর ছেলেমানুষি গেল না—নিজের ভাবেই বিভোর হয়ে আছে। এদিকে যে প্রকৃতি সংহারমূর্তি ধারণ করছে সে খেয়াল ওর নাই।

সুমিতা ওর ছেলের চিঠিখানা বের করে পড়তে সুরু করলো।.........'মা-মণি, আমরা রোমে এসে পৌঁছেছি। ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে রোম নগরী রক্ষা পেয়েছে। রোম সেই অতি পুরাতন রোম—জুলিয়াস সীজারের রোম—নীরোর রোম। পুরাতন তার নতুনের এমন অদ্ভুত মিলন আর কোথায়ও চোখে পড়েনি আমার। ধ্বংসস্তূপের ওপর কতবার নতুন করে গড়ে উঠেছে এই নগরী—নবযৌবনে ভূষিতা হয়ে। মানুষের চরম অত্যাচার—প্রকৃতির চরম নির্দয়তা সহ্য করেছে—আবার জেগে উঠেছে হাসিমুখে। মা—এমন ভাল লাগছে এই জায়গাটা আমার। চারিদিকের যুদ্ধের বিভীষিকা যেন ভুলে গেছি।.......

আজ তোমার কথা এমন করে মনে পড়ছে কেন মা? তোমাকে আমি একদিনও ভুলিনি—তবে আজকের মত এত বেশী করে কোনও দিনই মনে পড়েনি যেন। বাবা নাই—আমি চলে এসেছি এতদূরে—তুমি কেমন করে দিন কাটাচ্ছ তাই ভাবি। আমার জন্য একটুও ভেবোনা তুমি। তোমার আশীর্বাদ অক্ষয় কবচের মত ঘিরে রয়েছে আমাকে—শত্রুর গোলা আমাকে স্পর্শ করবে না।

শুনেছ বোধ হয় ভারতীয় সৈন্য ইটালীর যুদ্ধে কেমন সুনাম করেছে। স্বাধীন ভারতের অধিবাসী হয়ে যদি আমরা যুদ্ধ করতুম তাহলে আরও কত মনের জোর হতো আমাদের। জানি না ভগবান আমাদের সে সাধ পূর্ণ করবেন কবে!

মৃত্যুর মহাযজ্ঞ দেখছি চারিদিকে। মৃত্যুভয় চলে গিয়েছে আমার। হাসিমুখে প্রাণদেবার কথা শুনেছি—এ যেন তারই উৎসব চলেছে। আমি এ যুদ্ধে কেন এসেছি জান? পরাধীন ভারতের সন্তান আমি কি দরকার ছিল এ যুদ্ধে যোগ দেবার? আমি চাই মৃত্যুকে জয় করতে। আমরা ভারতবাসীরা মৃত্যুর ভয়ে মরে আছি—তাই আমাদের ভাগ্যে পরাধীনতার অপমান লিখেছেন ভগবান। এই দুর্নাম মোচন করতে হবে আমাদের। মৃত্যুকে ভয় করার মত দুর্বলতা মানুষের আর কিছু নাই। দেশের জন্য মরতে পারার যে কি সার্থকতা তা এদের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে—অবার আমরা মানুষ হবো। অমৃতের পুত্র আমরা—মৃত্যুভয় আমাদের করলে চলবে কেন? মনের আবেগে অনেক কথা লিখে ফেল্লুম। তোমার ছেলে হয়ে তোমার উপদেশ কি করে ভুলবো যে আত্মার মৃত্যু নাই।.....

কবে দেশে ফিরবো জানিনা। কিন্তু যখন ফিরবো দেশের কাজে প্রাণ দেবার সংকল্প করেই ফিরবো। আশীর্বাদ করো যদি মরতে হয় তোমাদের যোগ্য সন্তান হয়েই যেন মরি।............

চিঠি পড়তে পড়তে সুমিতার চোখে জল এলো—সে সজল চোখে বললো—শুনলে তো আমার পাগল ছেলের কথা। সত্যি ওর ভয়-ডর নেই—ও দুর্দান্ত, বেপরোয়া ঠিক ওর বাপের মত।

সুমিতার উচ্ছ্বাস দেখে শিখিধ্বজ বাবু দমে গেলেন, তার ছেলে ঠিক যে তার বাপের মত হয়েছে একথা বারংবার শুনে তিনি বিরক্ত হলেন, সাইক্লোনের সম্ভাবনায় তাঁর মনে যে শিহরণ জেগেছিল তাও অনেকটা কমে গেল।

তিনি ম্লান মুখে বল্লেন—দুর্যোগটা ভীষণই হবে বলে মনে হচ্ছে—বাইরে কেমন বাতাসের আর্তনাদ শুনছো তো। তা ছাড়া খবরের কাগজে দেখলুম—আবহাওয়া অফিসের সংবাদ।

সুমিতা উচ্চৈঃস্বরে হেসে বল্লো—তোমার আগেকার মত ভয় এখনও আছে দেখছি শিখিদা। ভারী নার্ভাস তুমি, এখানেত সাইক্লোন টাইক্লোন কোনও কালে হতে দেখিনে বাপু। একটা ছোটখাটো ঝড়ই হতে দেখলুম না—তার আবার সাইক্লোন! ও এক্ষুনি থেমে যাবে দেখো।

সুমিতার কথায় শিখিধ্বজ বাবুর মনে হলো সে যেন তাঁর গায়ে চাবুক মারছে। তিনি ভীরু? তিনি নার্ভাস? তাঁর সংকল্পের কথা তো আর ও জানে না—তাই সে এমন অপমান তাঁকে করতে পারলো। তাঁর মনে হলো আজ তিনি যেমন অপমানিত হলেন, ওর সুজিত রায়ের সঙ্গে বিয়ের কথা শুনেও তিনি এমন অপমান বোধ করেননি। তিনি মুখ গম্ভীর করে রইলেন।

ঘণ্টা দুয়েক পরে শিখিধ্বজবাবু যখন সুমিতার স্বামী ও পুত্রের গুণ বর্ণনা শুনে, তাদের নানারকমের ফটো দেখে, চা জল খাবার খেয়ে, কয়েকটি গোলাপ ফুল হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরোলেন তখন দেখলেন ঝড়বৃষ্টির কোনও আভাস নাই—মেঘ কেটে গিয়ে শুক্লপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ দেখা দিয়েছে। প্রকৃতির এমনি ধারা ছলনা দেখে তাঁর ক্রোধ হলো, না আনন্দ হলো তাঁর মুখ দেখে ঠিক বোঝা গেল না।

হোটেলে ফিরে এসে তিনি দেখলেন—টেবিলের উপর একখানা খামের চিঠি। লেখা দেখেই বুঝলেন চিঠিখানি কার। এ কয়দিন যে সব কথা ভুলে গিয়ে তারুণ্যের সাধনা সুরু করেছিলেন—সে সব স্বপ্ন তাঁর ভেঙে গেল। তিনি চিঠি না খুলেই যেন দেখতে পেয়েছেন ওর ভেতরে কি লেখা আছে। সংসার চক্রের বিভীষিকা তাঁকে চতুর্গুণ ভয় দেখাতে সুরু করলো এবার। তাঁর মনে হলো এইবার সত্যিকার সাইক্লোন আরম্ভ হয়েছে। ছুটি ফুরোতে আর বিশেষ বাকি নাই—পুজোর সময় এক মাসের মাইনে বোনাস্ পেয়ে সখ করে পশ্চিমে বেড়াতে এসে সব টাকাগুলি তিনি খরচ করে ফেললেন ফিরে গিয়ে আবার সেই অতলস্পর্শী অভাবের মধ্যে হাবুডুবু খেতে হবে—সেই নাই, নাই, নাই—সংসার করার অসংখ্য ঝকমারি অফিসে বড়বাবুর ধমকানি আর বাড়িতে স্ত্রীর হা-হুতাশ। তিনি ভাবলেন ছত্রিশ টাকা মণের চাল খেয়ে জীবন ধারণ করবার পাগলামিতে স্ত্রীর যে গয়নাগাটি বাঁধা পড়েছে তা উদ্ধারের সম্ভাবনা আর নাই। তাঁর তারুণ্যের স্বপ্নে বোনাসের টাকাটি উবে গেল—এই দিয়ে ওটা উদ্ধারের হয়তো সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সে এখন আকাশ কুসুম। তা ছাড়া স্ত্রীর মনের সাধ দুই একখানা ভাল কাপড়, দুই একটা চলন সই ফার্ণিচার বিশেষ করে একটা ড্রেসিং টেবিল—যা আজকাল প্রায় সকলের বাড়িতেই আছে—এমন কিছু অন্যায় সাধ নয় তার। স্বামী হয়ে এটুকুও তিনি পূরণ করতে পারলেন না। যুদ্ধের দোহাই দিয়ে তিনি পাঁচ বছর রেখেছেন—কিন্তু স্ত্রী এইবার ধরে ফেলেছে—সব ফাঁকি—না দেবার ফন্দী—সে ছাড়া এই যুদ্ধের বাজারে আর সকলে বেশ সুখে আছে—শুধু তাঁর হাতে পড়েছে বলে। কিন্তু শুধু তার দুঃখ হলেও কথা ছিল না—ছেলেমেয়েদের ছেঁড়া কাপড়, স্কুলের মাইনে তিন মাস বাকি, একটু ভাল খেতে পারে না—তা ছাড়া মেয়েও বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠলো। তিনি আর ভাবতে পারলেন না—বিছানায় শুয়ে তিনি সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। একথা তাঁর খেয়াল হলো না যে এভাবে নিশ্বাস ছাড়া ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজের কোনও বিধিতেই নাই।



পৃথিবীতে আজ এতো ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে, মানুষের জীবনে এত দিকে এত পরিবর্তন আসছে কিন্তু আমাদের চিত্র-নির্মাতারা আশ্চর্যের বিষয় তার দ্বারা এতটুকুও প্রভাবান্বিত হয়েছে বলে মনে করা যায় না। যুগের হাওয়ায় নতুন সুর যে বইছে তার কোন রেশই ছবির মধ্যে দিয়ে জনগণের কাণে পৌঁছে দেবার জন্যে কাউকেই সচেষ্ট দেখা যাচ্ছে না। বরং প্রগতির সঙ্গে তাল ফেলে চলায় এরা যে একেবারেই অক্ষম সেই প্রমাণই এদের কাজ-কর্মের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যাচ্ছে। সহজে এবং বিদ্যের জারিজুরি ধরা না দিয়ে লোককে ভাঁওতা দেবার একটা ফন্দী এরা আবিষ্কার করেছে, সেটা হচ্ছে পৌরাণিক, ধর্মমূলক, ঐতিহাসিক ও রূপক ছবি তোলা নিয়ে। এরা এই ধরণের ছবিগুলির পিছনে অজস্র অর্থ ব্যয়ে খুব যা দাঁড়ায় সেই খরচে অন্তত দু'খানা যুগোপযোগী শিক্ষণীয় সামাজিক ছবি এবং সেই সঙ্গে একটা আনকোরা নতুন চিত্রগৃহই তৈরি করে ফেলা যায়। ফল হচ্ছেও সেই রকম। ছবি তোলা হচ্ছে হুহু করে, মূলধন যা কিছু তার পিছনেই লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে এদিকে ছবি যে দেখানো কোথায় হবে, সেদিকে কারুরই খেয়াল থাকছে না। আর দামী দামী ছবিও মাসের পর মাস পড়ে থেকে বিরাট পরিমাণ টাকাকে নিশ্চল করে ফেলে রাখছে। লোকে ভুলে যাচ্ছে যে চিত্রশিল্প মানে শুধু ছবি তোলাই নয়—ছবি দেখাবার এবং কাঁচা-মালের উৎপাদনও তার মধ্যে পড়ে। বর্তমান চিত্র-শিল্প কর্ণধারদের মনে এ ধারণা কোনদিন আসবে কি?



'নল দময়ন্তী' চিত্রে শোভনা সমর্থ।

জমকালো খাড়া করে লোককে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টায় আছেন। অনেকে পয়সার দিক থেকে সাফল্যও লাভ করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের বর্তমান আবহাওয়ায় এদের মূল্য কি? কোন জন-প্রাণীর কোন কাজেই এসব ছবি আসে তো নাই-ই উপরন্তু প্রাচীনতার দিকেই লোকের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিয়ে প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করছে। একমাত্র বাঙলাদেশই যা এখনও এ পথের অনুসরণ করেনি, নয়তো বম্বে, মাদ্রাজ কি পাঞ্জাবের ষ্টুডিওগুলি তাদের যেসব আগামী ছবির তালিকা বিজ্ঞাপিত করেছে তার মধ্যে রূপক আর ধর্মমূলক ও পৌরাণিক ছবি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এর মধ্যে আবার কেউ কেউ বিদেশের জন্যে ইংরিজী সংস্করণও তোলার ব্যবস্থা করছেন: বিদেশে সেসব ছবি দেখানো হলে প্রকৃত ভারত সম্পর্কে কি ভুল ধারণাই না প্রচার করবে। তার ওপর ঐসব ছবির খরচও সাংঘাতিক রকম; কোন কোন খানির খরচের পরিমাণ

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এ সপ্তাহের একমাত্র নতুন ছবি হচ্ছে গণেশ টকীতে ওয়াদিয়া মুভিটোনের ধর্ম-মূলক ছবি 'কৃষ্ণভক্ত বোধনা।'

* * *

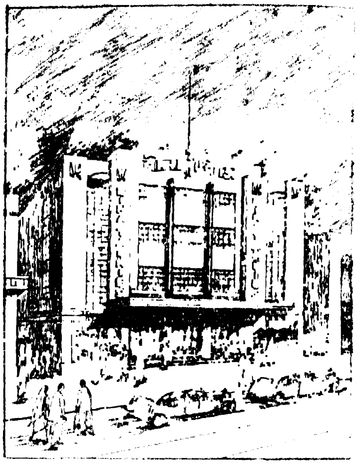
আগামী আকর্ষণের মধ্যে ২৭শে ও ২৮শে তারিখে রঙমহলে আর্টিষ্ট এসো-সিয়েশনের জলসা উল্লেখযোগ্য। কলকাতার জনপ্রিয় অধিকাংশ শিল্পীই এতে যোগদান করবেন। এই সপ্তাহে নিখিলবঙ্গ সঙ্গীত সঙ্ঘের অধিবেশনও একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ। ভারতের বহু স্বনামধন্য শিল্পী আসছেন এই অধি-বেশনে যোগদান করতে।

* * *

নিউ থিয়েটার্সের 'দুই পুরুষ' ৩০শে আগষ্ট চিত্রা ও রূপালীতে মুক্তিলাভ করবে; ঐ তারিখের অন্যান্য আকর্ষণ হচ্ছে ঠনঠনেতে সানরাইজ পিকচার্সের 'ঘর' ছবিখানি নিয়ে নব-নির্মিত বাণী টকীজের উদ্বোধন; প্রভাত-ম্যাজেষ্টিকে 'লয়লা মজনুর' উদ্বোধন; দীপক, ছায়া ও পার্ক শো হাউসে 'মমতাজ মহলে'র মুক্তি। আর আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভ করবে প্যারাডাইসে 'ফুল' এবং রূপবাণীতে 'মানে-না-মানা'। এর মাঝে ২৯শে আগষ্ট 'ভর্তৃহরি' নিয়ে সুসংস্কৃত 'জ্যোতি'



অলিম্পিয়ার পিকচার্সের 'গোলামী' চিত্রে রেণুকা দেবী, রাজকুমারী ও [illegible]।





সিনেমার উদ্বোধনও উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ।

বিবিধ

বম্বের গুজরাটি একখানি চিত্র পত্রিকার খবরে শোনা গেল যে, দেবীকারাণী বম্বে টকীজ ছেড়ে দিয়েছেন এবং কোন এক রাশিয়ানকে বিবাহ করার উদ্যোগী হয়েছেন। বম্বে টকীজের ডিরেক্টর বোর্ডে ফেমস ফিল্মসের সিরাজ আলি হাকিমকে গ্রহণ করার খবরও একটা রয়েছে।

* * *

পরিচালক ও প্রযোজক অমিয় চক্রবর্তীও দেবীকারাণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন এমন একটা খবরও শোনা যায়। তবে অমিয় চক্রবর্তী যাকে বিবাহ করছেন তিনি ভারতেরই মেয়ে, দাক্ষিণাত্যের হলেও কলকাতায় থেকে প্রায় বাঙালীই তিনি। নৃত্যশিল্পী হিসেবে তার নামও আছে এবং কিছুদিন আগে কলকাতায় বাজার তিনি মাত্ করেছিলেন—এদের বিবাহ সেপ্টেম্বরের গোড়াতেই হবার সম্ভাবনা।

* * *

এই সপ্তাহে বম্বেতে নিউ থিয়েটার্সের যুগান্তকারী অবদান 'উদয়ের পথে'র হিন্দী সংস্করণ 'হামরাহী' মুক্তিলাভ করছে। ছবিখানি বাঙলার চেয়েও উন্নততর হয়েছে বলে শোনা যায়। এই উপলক্ষে প্রধান অভিনেত্রী বিনতা বসু এবং সঙ্গীত পরিচালক রাই বড়াল বম্বে ভ্রমণে যাবেন বলে একটা বে-সরকারী খবর পাওয়া গেল।

'স্বপ্ন' আর তকরার'এর পরিচালক হেমেন গুপ্তের ইচ্ছা বাঙলার দুর্ভিক্ষ নিয়ে একখানি ছবি তোলার। লাইসেন্সের জন্যে তিনি আবেদন করেন, তবে সে প্রথা যখন উঠে যাচ্ছে তখন ডিসেম্বরে স্বাভাবিক বাজার না আসা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। সরকারী ও বে-সরকারী যে কেলেঙ্কারী এই দুর্ভিক্ষের জন্যে দায়ী তা যদি ছবিতে না ফুটিয়ে তোলা যায়, তাহলে আমাদের মনে হয় এদিকে হাত না দিলেই ভাল। আশা করি, হেমেনবাবু এই দিকটাই ফুটিয়ে তোলারই চেষ্টা করবেন তাঁর কাহিনীর মধ্যে দিয়ে।

* * *

এসোসিয়েটেড পিকচার্সের ছবি 'আমীরি'-তে উপদেষ্টা হিসেবে হলিউডের মেলভিন ডগলাস ছাড়া কলাকৌশলাদিতে সহযোগিতা করবেন ইংলণ্ডের ডেনহাম ও পাইনউড স্টুডিওতে ছ'বছর বিখ্যাত প্রযোজক আলেকজাণ্ডার কর্ডার ছবিতে অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত দীগম্বর চ্যাটার্জি।

* * *

ভারতীয় চিত্র জগতের প্রতিনিধি হিসেবে বিলেত ও আমেরিকায় ভ্রমণরতদের অন্যতম লাহোরের শোরে পিকচার্সের কর্ণধার রূপ শোরে তাঁর পরবর্তী ছবি 'ওমর খৈয়াম'-এর ইংরিজী সংস্করণে অভিনয় করার জন্য হলিউডের কয়েকজন অভিনয় শিল্পী ও কলাকুশলীকে চুক্তিবদ্ধ ক'রেছেন।

* * *

এক স্ত্রী বর্তমান থাকতেও নলিনী জয়ন্তকে দ্বিতীয় পত্নীরূপে বিবাহকারী প্রযোজক পরিচালক বীরেন্দ্র দেশাই পরের ছবির নাম রেখেছেন 'সতীন'।

* * *

বৈদেশিকী

[পৃথিবী ব্যাপী অস্ত্র-যুদ্ধের অবসান হয়েছে। প্রধানত যুদ্ধের কথা আলোচনা করার জন্যই 'সমর-প্রসংগ' বিভাগ নির্দিষ্ট ছিল। এখন যুদ্ধের স্থলে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সমস্যাই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেবে। সেই সব কথা আলোচনার জন্য এই বিভাগের নাম পরিবর্তন করে 'বৈদেশিকী' করা হল]

জাপানের আত্মসমর্পণের পর সাময়িক-ভাবে অন্তত পৃথিবীতে অস্ত্র যুদ্ধের নিবৃত্তি হবে, এ আশা আমরা করেছিলাম। কিন্তু গত কিছুদিন ধরেই চীন সম্বন্ধে যে সব সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, তাতে সে আশা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

চীন সম্পর্কে সর্বশেষ যে সংবাদ এসেছে তা থেকে বোঝা যায় চীন গৃহযুদ্ধের আত্মঘাতী পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। লণ্ডন থেকে প্রেরিত রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ, গৃহযুদ্ধ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। সংবাদটির মর্ম এইরূপ—পিকিং থেকে ২৫০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তাইয়ুয়ান শহর দখল করতে গিয়ে চীনা কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের সৈন্যদের সংগে কম্যুনিস্টদের সংঘর্ষ হয়েছে। কম্যুনিস্টরা একটি বিমান ক্ষেত্র দখল করেছিল, কিন্তু কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের সৈন্যেরা তাদের বিতাড়িত করেছে। তাইয়ুয়ান হল চীনের শান্সি প্রদেশের রাজধানী। এ শহরটি এতদিন জাপানীরা অধিকার করেছিল।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ এই সম্পর্কে আছে। তাতে বলা হয়েছে যে, জাপান শত্রুতা বন্ধ করা সত্ত্বেও সোভিয়েট বিমানগুলো দুদিন ধরে 'কালগান শহরে বোমা বর্ষণ করছে। কালগান আক্রমণ করার জন্য **সোভিয়েট, মংগোলিয়ান ও চীনা কম্যুনিস্ট সৈন্যেরা একত্রিত হয়েছে।** চীনা কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের সৈন্যেরা ঐ অঞ্চলে এসে পৌঁছাবার আগেই তারা কালগান দখল করবার মতলব করেছে বলে মনে হয়। কালগান হল চীনের হোপে প্রদেশে অবস্থিত। পিকিং থেকে উত্তর-পশ্চিমে ১০০ মাইল দূরে এই শহরের অবস্থান।

এই সংবাদ দুটো থেকে মোটামুটি যা বোঝা যাচ্ছে তা এই—জাপানের অধিকৃত স্থানগুলো কে আগে দখল করবে, তা নিয়ে চীনা কম্যুনিস্ট ও জাতীয় গভর্নমেণ্টের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা চলেছে। পরের সংবাদটি থেকে এও বোঝা যাচ্ছে যে, সোভিয়েট বাহিনী চীনা কম্যুনিস্টদের এ কাজে অল্পবিস্তর সাহায্য করছে।

সংবাদ দুটো যদি সত্য হয় তাহলে নানা কারণেই শুধু দুঃখিত নয়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবারই কারণ আছে।

বর্তমান পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রায় দু বছর (১৯৩৭, আগস্ট) আগে চীন জাপানের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। আট বৎসরব্যাপী ভীষণ সংগ্রামে চীনের সামাজিক ও অর্থনীতিক জীবন বিপর্যস্তপ্রায়। সম্প্রতি যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায়, যুদ্ধকালে চীনে ১ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের জীবনান্ত হয়েছে। তন্মধ্যে যুদ্ধ করতে গিয়ে চীনা সৈন্য মরেছে ৩০ লক্ষ, আর অনাহারে ও অন্যান্য-ভাবে বেসামরিক লোক মরেছে এক কোটি ৫০ লক্ষ। এ ছাড়া ৬ কোটি লোক নাকি গৃহহীন হয়েছে। এই বিপর্যয়ের পরে যদি আবার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয় তাহলে জাতিকে পুনরায় গড়ে তোলবার মত শক্তি আর তাদের অবশিষ্ট থাকবে কিনা সে সম্বন্ধে স্বতই সন্দেহ জাগে।

সোভিয়েট বাহিনী চীনা কম্যুনিস্টদের সংগে মিলিত হয়েছে এ সংবাদ কতদূর নির্ভরযোগ্য বলা মুস্কিল। তবে এ সংবাদ সত্য হলে শুধু বিস্মিত ও দুঃখিত নয়, আতঙ্কিত হওয়ার কথা। পৃথিবীর বৃহত্তম ত্রিশক্তির অন্যতম সোভিয়েট রুশিয়া। গত কয় বৎসর ধরে এই ত্রিশক্তি বিবৃতি, ভাষণ, আর সংবাদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার কত আশ্বাস যে মানুষকে দিয়েছেন তার সীমাসংখ্যা নেই। আজ চীন যখন আত্মঘাতনে রত তখন এই আশাই আমরা স্বভাবতঃ করবো যে, সোভিয়েট রুশিয়ার প্রভাব প্রতিপত্তি চীনের জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার—তাকে গড়ে তোলবার কাজে প্রযুক্ত হবে। শুধু রুশিয়া কেন, যে ত্রিশক্তি আজ পৃথিবীর অভিভাবকত্বের দাবী করে বিনামূল্যে সর্বত্র শান্তি সমাচার বিতরণ করছেন, চীনের অন্তর্বিপ্লবের আগুন প্রশমিত করা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে সে দায়িত্ব প্রধানত তাদেরই গ্রহণ করতে হবে। যুদ্ধের পূর্বে চীন আন্তর্জাতিক শোষণের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল। চীনের ব্যাপারে পৃথিবীর শক্তিমান রাষ্ট্রসমূহের অপার ঔদাসীন্যে কারো মনে যদি এ আশংকা জাগে যে, চীনের আত্মকলহ ও বিশৃংখলার সুযোগে তার অভিভাবক সেজে বসাই ত্রিশক্তির এরূপ মনোভাবের কারণ তা হলে তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় বলে মনে হয় না।

সব চেয়ে বেশী বিস্মিত হতে হয় চীনের উল্লিখিত দুপক্ষের কথা ভেবে। গত ছয় বৎসরব্যাপী সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধের যে নারকীয় বীভৎসতা অনুষ্ঠিত হয়েছে, এবং অস্ত্রবলের ব্যর্থতা যেভাবে প্রমাণিত হয়েছে তারপরও চীন পরস্পরকে হনন করা ছাড়া নিজের বিরোধ মীমাংসার অন্য কোন পথ **ভাবতে পারছে না, রক্তের কাদায় লুটোপুটি** না করে পারস্পরিক মিলনের কোন সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না, এতে মানুষের বর্তমান সভ্যতা কোন দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত কিনা সেই প্রশ্নই পুনঃ পুনঃ মনে জাগে।

ইতিপূর্বে সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক কম্যুনিস্ট নেতা মাও সে তুঙকে চুংকিংয়ে আসবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় দল ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে আপোষে কোন মীমাংসায় আসা সম্ভব কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা করা। কিন্তু মাও সে তুঙ সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ২১শে আগস্ট তারিখে প্রেরিত এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার এক সংবাদ থেকে জানা গেছে যে, গত ২০শে আগস্ট চিয়াং কাইশেক মাও সে তুঙের নিকট পুনরায় এক তার করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন যে, গভর্নমেণ্ট ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে যে বিরোধের কারণগুলো আছে তা শান্তি-পূর্ণভাবে মীমাংসা করার জন্য চুংকিংয়ে আসতে মাও সে তুঙ যে অস্বীকৃত হয়েছেন, তা যেন তিনি পুনর্বিবেচনা করে দেখেন। কারণ গভর্নমেণ্টের সৈন্যদের সংগে কম্যুনিস্টদের সংঘর্ষ হয়েছে বলে জানা গেছে।

আপোষে বিরোধ মীমাংসার এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করার কারণ কি তা আমরা জানি না। অতীতের তিক্ততাই হয়তো তার কারণ। কিংবা সোভিয়েট রুশিয়ার সমর্থনের আশ্বাস পেয়ে বা সম্ভাবনার কথা ভেবে চীনের কম্যুনিস্টরা নিজেদের এত শক্তিশালী মনে করছেন যে, কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের সংগে কোন আপোষ মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করছেন না। তারা হয়তো ভাবছেন তাদের দাবী অস্ত্রবলেই তারা পূরণ করে নিতে সমর্থ। কাজেই আপোষ মীমাংসা নিরর্থক। কিন্তু কারণ যাই হোক, নির্বিরোধ-মীমাংসা সম্ভব হলে সংগ্রামের পথে যাওয়া যে কোন পক্ষেরই উচিত নয়—একথা আমরা দৃঢ়তার সংগেই বলব। কাজেই এক পক্ষ থেকে আপোষ মীমাংসার পথ অনুসন্ধানের আহ্বান আসা সত্ত্বেও অপর পক্ষের এই অনমনীয় মনো-ভাবের আমরা সমর্থন বা প্রশংসা কিছুই করতে পারছি না। কারণ আমাদের বিশ্বাস গত ৮ বৎসরের বিপর্যয়ের পরে চীন যদি নূতন করে আত্মকলহে প্রবৃত্ত হয় তাহলে চীনকে তা মহতী বিনষ্টির পথেই নিয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে আমরা উপরে ত্রিশক্তির দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছি। চীনের এ আত্মকলহ প্রশমনে ত্রিশক্তির হস্তক্ষেপ করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কিন্তু তাতে যে বিপদের আশংকা আছে সে

(শেষাংশ ১৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



(৪২)

অজয় বললো—আমি এবার যাই।

মাধুরী বলে—যাবেন না। আমাকে একটা পথ বলে দিতে হবে। আপনি কোন দিন আমাকে একটাও উপদেশ দেননি। আজ আমার কতকগুলি কথার উত্তর দিতে হবে।

অজয়—স্পষ্ট কোন উত্তর দিতে বোধ হয় পারবো না।

মাধুরী—পারতে হবে অজয়দা। আপনি স্পষ্ট করে একবার বলুন যে......।

অজয়—কি?

মাধুরী কিছুক্ষণের জন্য নিজেরই নির্লজ্জতায় আশ্চর্য হয়ে চুপ করে রইল।

মাধুরী শান্তভাবে বললো—বাসন্তী কিছু বলছে না অজয়দা?

অজয়—না। কি-ই বা বলবার আছে?

মাধুরী—আপনিও কি তাই মনে করেন, ওর পক্ষে বলবার আর কিছু নেই।

অজয়—আমি কিছু জানি না।

মাধুরী—কিন্তু আমি জানি।

অজয়—ভাল কথা।

মাধুরী—আপনি যেন রাগ করে রয়েছেন অজয়দা!

অজয় হেসে ফেললো—তুমি এত দুঃখ করছো কেন মাধুরী? আমার রাগ করার কিছু নেই। কার ওপর রাগ করবো? বাসন্তীও কারও ওপর রাগ করে নেই। এইভাবেই ওকে চলে যেতে হবে, সে কথা বাসন্তী খুব ভাল করেই জানতো, বিশ্বাস করতো। এর জন্য সে প্রস্তুত হয়ে আছে।

মাধুরী—কিন্তু আমি জানি, এভাবে চলে যেতে বাসন্তী নিশ্চয় চায় না।

বাসন্তী—ও সব কথা যাক মাধুরী। তোমরা যেও। সঞ্জীববাবুকে যেতে বলো।

মাধুরী—আপনি সব জিনিস এক মুহূর্তে চুকিয়ে দিতে চান অজয়দা। আমার প্রশ্নগুলিকেও জবাব না দিয়ে সরে পড়তে চাইছেন।

অজয়—তুমি বৃথা কেন এ সব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছো!

মাধুরী—আমি যদি না করি তবে কে করবে? সব গণ্ডগোলের মূলে তো আমিই।

অজয়—না, তা ঠিক নয়। এ সব ব্যাপারের কোন মূল নেই। সংসারের নিয়মই এই রকম। বিনা কারণে......।

মাধুরী—চুপ করে গেলেন কেন অজয়দা?

অজয়—আমি এ সব বুঝতে পারি না, তাই চুপ করে যাওয়াই ভাল। বাসন্তীর জন্য আমার দুঃখ হয় ঠিকই, কিন্তু কিছু করবার পথ নেই।

মাধুরী—খুব ভাল পথ ছিল। আপনিই ইচ্ছা করলেই বাসন্তীকে এভাবে বিদেয় না দিয়েও পারতেন। আপনার হাতে সে ক্ষমতা ছিল।

অজয়—কি রকম?

মাধুরী—কেশবদার সঙ্গে বাসন্তীর বিয়ে দিতে পারতেন। আপনি কেশবদার প্রাণের বন্ধু, আপনার অনুরোধ সে অগ্রাহ্য করতো না।

অজয়—একটা কথা ভুল করে ফেললে মাধুরী।

মাধুরী—ভুল?

অজয়—হ্যাঁ, প্রথম কথা হলো, প্রাণের বন্ধুকে অনুরোধ করবার কোন অর্থ হয় না। অনুরোধ করার আগেই প্রাণের বন্ধুদের সেটুকু বুঝে দেখা উচিত। আর একটা ভুল হয়েছে, প্রাণের বন্ধু কেশব আমার অনুরোধে যদি রাজীই হয়, তাতে কি আসে যায়? বাসন্তী রাজী হবে কি না, সে খবর আমি জানি না।

মাধুরী—বাসন্তী রাজী হবে না? আমি সব বুঝতে পারি অজয়দা। কিছু অজানা নেই।

অজয় একটু বিরক্ত হয়ে বললো—না, বাসন্তী রাজী হতে পারে না। অত কুটবুদ্ধি তার নেই। সেও মানুষ চিনতে পারে। বাসন্তী কি জানে না যে তোমার সঙ্গে কেশবের......।

মাধুরী—সবাই জানে, সবাই জানে। তুমিও জান অজয়দা। কিন্তু তার পর তো কেউ চুপ করে বসে নেই। কেউ আর তার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মালা জপছে না। কেউ নয়। কেশবদাও না, বাসন্তীও না, আমিও না......।

অজয় চকিতে একবার মাধুরীর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

মাধুরী যেন সংসারের সব নিয়ম নিষ্ঠার আর প্রতিশ্রুতির পর্বগুলিকে একটু ঠাট্টা করে বললো—সবাই যে চুপ করে বসে নেই, সে খবরও তো জান অজয়দা।

অজয়—জানি।

মাধুরী—তবে, শুধু আমাকেই দোষী করার জন্য এত চেষ্টা কেন?

অজয়—একটা কথা যদি বলি, তুমি কিছু মনে করবে না মাধুরী?

মাধুরী—কিছুই মনে করবো না।

অজয়—সব দোষের আরম্ভে কিন্তু তুমিই আছ।

মাধুরী—আমি একটা কথা বলি অজয়দা?

অজয়—বল।

মাধুরী—সব দোষের শেষে কিন্তু তুমিই এসে দাঁড়িয়েছ।

অজয় চমকে উঠলো। মাধুরীর মুখের দিকে তাকালো। অজয় চেষ্টা করছিল—এই অতি চালাক ফ্যাসনেবল্ বাচাল মেয়েটার মুখের ছবিটা একবার দেখে রাখা উচিত। কিন্তু তার বদলে, অজয় শুধু বিস্মিত দৃষ্টির গভীরতা নিয়ে দেখলো—মাধুরীর ধূর্ত চেহারাটা যেন দুঃসহ বেদনার জ্বালায় করুণ হয়ে রয়েছে। ও চেহারার মধ্যে আর কোন খরবুদ্ধির প্রগল্ভতা নেই, চোখের দৃষ্টিতে সেই ফ্যাশানেবল্ লীলাময়ীর চটুলতা নেই। একটা ব্যর্থতার দীন প্রতিমূর্তি। এক নিরীহ বোকা মেয়ে, খেলা করতে করতে পথ ভুলে গেছে। তারপর থেকে শুধু ছটফট করেছে আর পথ খুঁজে বেড়িয়েছে। আজ সন্ধানের সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে।

অজয় বললো—যা কখনো আশা করিনি, তুমি অকারণে সেই সব কথা বলে আজ আমায় উত্তাক্ত করছো শুধু।

মাধুরী—কি আশা করনি অজয়দা, আজ তোমাকেই বলতে হবে।

অজয়—তুমি এত চালাক, তা জানতাম না।

মাধুরী—আজও চালাকী দেখতে পাচ্ছ অজয়দা। আমার জীবনের সব অপমান-

গুলি বেহায়ার মত তোমাদের সামনে ছড়িয়ে দিচ্ছি, তবু তোমরা আমাকে আজও চালাক বলবে? কি চালাকীর দেখলে অজয়দা?

অজয়—তুমি কিছু মনে করো না মাধুরী। আমার মনটা ভাল নেই। কথাগুলি তাই কঠোর হয়ে উঠছে।

মাধুরী—মোটেই কঠোর নয়, খুব বেশী চালাকী আছে তোমার কথার মধ্যে।

অজয়—সব অভিযোগ আজ আমার বিরুদ্ধেই বুঝি ঘুরিয়ে দেবে?

মাধুরী—অভিযোগ বৈকি! তুমি নিশ্চয় আজ আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছ। বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসনি।

অজয় হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। মাধুরীর অভিযোগটা একেবারে রূঢ়ভাবে স্পষ্ট, ভাষার মধ্যেও কোন সঙ্কোচের আবরণ নেই, চোখের দৃষ্টিতেও কোন কুণ্ঠা লজ্জা ও সঙ্কোচ নেই।

মাধুরী যেন সুযোগ বুঝে জেরা করার জন্যই আরও নির্লজ্জের মত প্রশ্ন করলো —মিথ্যে কথা বলো না অজয়দা, তুমি যা বলবে আমি তাই বিশ্বাস করবো। তাই সাবধান হয়ে বলবে, যদি আমার অমঙ্গল না চাও। বুকে হাত দিয়ে সত্যি কথাটা বলবে।

অজয়ের মনের ভেতর মূঢ়তা ও ভীরুতার একটা মিলিত ষড়যন্ত্র যেন মুহূর্তের মধ্যে তার চেহারাটা অপরাধীর মত কুণ্ঠিত করে তুললো।

বহুক্ষণ ধরে একটা একটানা স্তব্ধতার মধ্যে দু'জনে যেন সব প্রশ্নের খেই হারিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাধুরীর পক্ষে আজ আর দুর্ভাবনার কিছু নেই। খেই তার হারিয়ে গেছে অনেকদিন। তাই আজ তার দুঃসাহসেরও সীমা নেই। আজ যেন মাধুরীর ব্রত সাঙ্গ করার দিন। শুধু প্রশ্ন করে যাবার পালা। শুধু উত্তর শুনে যাবার পালা, মাধুরীর মনে, মন একটা গর্ব ছড়িয়ে পড়ছিল। শুধু বাসন্তীই কি পালিয়ে যেতে শিখেছে, আর কেউ পারে না? সকল মোহ অবহেলার পেছনে রেখে দিয়ে একটা অনিশ্চিতের স্রোতে স্থির বিশ্বাস নিয়ে ভেসে পড়তে শুধু বাসন্তী নয়, মাধুরীও জানে। মুক্তি লাভের কৌশল শুধু গেঁয়ো মেয়ের পাকা বুদ্ধিতেই খেলে না, শহুরে মেয়েও কি করতে পারে, তারই উদাহরণ আজ সফল করে দেখিয়ে দেবে মাধুরী। জীবনে মালা গাঁথার নিয়মে যখন ভুল হয়েই গেছে, তখন শুধু গ্রন্থিগুলি নিয়ে বসে থেকে আর লাভ কি? এক এক করে এই গিঁট খুলে ফেলতে হবে। মুক্ত হতে হবে।

অজয় বললো—আজ একথা জিজ্ঞেসা করছো কেন? আমি কি আজ প্রথম তোমায় দেখতে এলাম? এর আগে কি আর কখনো আসিনি?

মাধুরী যেন একটা পাল্টা আঘাত পেয়ে পিছিয়ে গেল। এই উত্তর কল্পনা করতে পারেনি মাধুরী। কোন মিথ্যা নেই অজয়দার কথায়। যা কোন দিন মনে পড়েনি, আজ যেন একটা আলেয়ার সিরিজ ছবির মত এক এক করে চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে। এসেছেন, অজয়দা আরও কতবার এসেছেন। মীরগঞ্জে যতবার গেছেন, মাধুরীর সঙ্গে দেখা করে গেছেন। যতবার ফিরে এসেছেন—যে বার্তা নিয়ে এসেছেন—সবার আগে মাধুরীকে বলে গেছেন। দু' বছর আগে, তিন বছর আগে, পাঁচ বছর আগে, আট বছর আগে—মান্দার গাঁয়ের কোলে সন্ধ্যা সকাল, মেলা-খেলা, পূজো-উৎসব, সকল আনন্দের মেলামেশার ঘটার মধ্যে অজয়দা এসেছেন। কেশবের প্রাণের বন্ধু অজয়দা, কেশবকে কখনো একা রাখতে পারেন নি। দিঘীর এপারে কেশবকে পৌঁছে দিয়ে নিঃশব্দে ওপারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে অজয়দা। দূর দিনের স্বপ্নের মধ্যে কেশব ও মাধুরী এপারে খেলা করছে, অজয় ওপার থেকে শুধু দু'চোখ মেলে দেখেছে। কিন্তু কী আশ্চর্য, কেশবদাকে এত বড় করে দেখতে গিয়ে অজয়কে আজ এতদিনের মধ্যেও ভাল করে দেখাই হয়নি। অজয়দার মুখচোরা অস্তিত্ব নেপথ্যে লুকিয়েছিল, কোনদিন তাকে পথে আহ্বান করার কথা মনে পড়েনি মাধুরীর। কিন্তু সে যে নিতান্ত সত্য, নিছক বাস্তব। আড়ালে আড়ালে নিজেকে কত বার উৎসর্গ করে রেখেছিল অজয়দা, কাউকে সে সব জানতে দেয়নি। তাঁর প্রাণের বন্ধুও জানতে পারেনি।

মাধুরী বললো আমার কাছে যতটা বুদ্ধি আশা কর, তা যদি আমার না থাকে, তবে সেটা কি আমার অপরাধ?

অজয়—বুদ্ধি নয় মাধুরী, মন বলে একটা জিনিষ মানুষের থাকে বলে শুনতে পাওয়া যায়। বুঝতে হলে বড় বেশী বুদ্ধির দরকার হয় না, মন থাকলেই হয়।

মাধুরী—মনেরও ভুল হয়।

অজয়—নিশ্চয়। কিন্তু সেটা অনেক দেরীতে বুঝতে পারলে, এই যা দুঃখ। অনেকদিন আগেই মনের ভুলটা বুঝে ফেলা উচিত ছিল। ভুল হয়েছে সেইদিনই যেদিন শুধু সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে, পাশের কাউকে দেখতে পেতে না।

মাধুরী—মাপ করবেন অজয়দা, যে ভুল হয়ে গেছে, তা ভুল হয়েই থাকুক। আজ নতুন করে যেন কোন ভুল না হয়।

অজয়—তুমি আমাকে আর কোন প্রশ্ন করো না, তাহ'লেই ভুল হবে।

মাধুরী—না, তা হবে না।

অজয়ের গলার স্বর যেন ভয়ানক একটা তীব্রতা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য একেবারে মৃদু হয়ে গেল। অসংযত নিঃশ্বাসের আলোড়নে হৃৎপিণ্ডটা যেন ক্ষুব্ধ হয়ে ফিস্ ফিস্ করে এক গোপন দুরাকাঙ্ক্ষাকে মুক্ত করে দিল—তুমি বিশ্বাস করতে পার মাধুরী, কেশবের চেয়ে আমি তোমায় ঢের বেশী ভালবাসি। কতখানি ভালবাসি তার পরিমাপ করো না। পরিমাপ করতে পারবে না। তুমি তার মূল্য জান না, তোমার বুদ্ধিতে তার হদিস্ মিলবে না। তুমি আমার কেউ নয়, তোমার কাছে কিছুই চাই না, কোন দাবী নেই—তবু তোমাকেই আমি...।

দু'চোখ বন্ধ করে শান্ত শ্রদ্ধাপ্লুত ভাবে মাধুরী যেন একটা স্তোত্রপাঠ শুনছিল। কথা বললো মাধুরী। আর প্রশ্ন নয়—শান্তিধারার মত পরম তৃপ্ত এক আগ্রহের আবেদন যেন ধীরে ধীরে ঝরে পড়ছিল—বলে যাও অজয়দা, থেমে যেও না, যা খুশি বলে যাও। আজ শুধু তোমার কথাই শুনবার জন্য আমি তৈরি হয়েছি। এই কথা শোনবার জন্যেই আমি মীরগঞ্জ ছেড়ে এই গাঁয়ে ফিরে এসেছি অজয়দা, তুমি বিশ্বাস কর।

অজয়—আর তো বলবার কিছু নেই মাধুরী। সব বলা শেষ হয়ে গেল।

মাধুরী—কিন্তু সব তো শেষ হলো না। তুমি আজ একথা বিশ্বাস করতে পার, তোমার কাছে যে-খবর পেলাম, সেই আমার জীবনের সব চেয়ে বড় খবর।

অজয়—অন্যায় করছো মাধুরী, কেশব কোন ভুল করেনি।

মাধুরী—না, সে ভুল করেনি, আমিও তাকে ভুল বুঝিনি, সে ঠিকই আছে। তাকে কোন দিন ছোট করবো না। তাকে যেভাবে জেনেছিলাম, আজও সে আমার কাছে তাই আছে। কিন্তু যে উপায়ের আজ আবিষ্কার করলাম, সে আমার কাছে একেবারে নতুন ঐশ্বর্য। সব চেয়ে বড়।

অজয়—তুমি অকপটে একথা বলছো?

মাধুরী—বলছি বৈকি। আজ যে আমার কোন ভয় নেই। তুমি কোন প্রতিজ্ঞা করনি, আমি কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে তোমাকে আপন করার লোভ দেখাইনি, তবু তুমি কী শক্ত মানুষ অজয়দা, চুপ করে এই তৃষ্ণা জীবনে পুষে নিয়ে আসছো, তবু চুপ করে থাকতে পার।

মাধুরী আবার হঠাৎ চুপ করে গেল। শেষ উত্তর দেবার জন্য যেন মনের সব শক্তিগুলিকে সংহত করে নিল।—না চাইতে তুমি আমায় সব চেয়ে বড় সম্মান দিয়ে ফেলেছ অজয়দা, এই একটি ভুল করেছ। কিন্তু এই সম্মান গ্রহণ করবার মত যোগ্যতা আমার নেই।

অজয়—যোগ্যতার প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। আমি বিশ্বাস করি, আমার উপহার মেনে নেবার উপায় তোমার নেই। নেওয়া উচিত নয়। আমি চলি। বাসন্তীর কথা মনে রেখ, যেও কিন্তু।

অজয় চলে গেল।

সঞ্জীববাবু অন্ধকারে আলো হাতে নিয়ে বের হয়েছিলেন। ফিরে এলেন আলো হাতে নিয়ে। ডাক দিলেন—মাধুরী।

মাধুরীর চোখে তন্দ্রা জড়িয়েছিল। চমকে উঠে উত্তর দিল—এই যে বাবা।

সঞ্জীববাবু—ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি?

মাধুরী—হ্যাঁ।

সঞ্জীববাবু—তবে উঠ্‌লি কেন? ঘুমো, ঘুমো। একটু শান্ত হয়ে ঘুমো। জীবনে শান্তিটাই সব চেয়ে বড় জিনিস।

তবে কি শান্তির আস্বাদ পেয়েছেন সঞ্জীববাবু? মাধুরী যেন পরীক্ষকের মত সঞ্জীববাবুর মূর্তি থেকে বিচ্ছুরিত উৎফুল্লতার রহস্য-গুলিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। যাত্রী ফিরে এসেছে কৃতার্থ হয়ে, যাত্রা সফল হয়েছে নিশ্চয়। এক সুখী কৃতার্থ প্রসন্ন মূর্তি। এ পর্যন্ত জীবনে বহু সফলতার গর্ব লাভ করেছেন সঞ্জীববাবু, বহু মামলায় জয়লাভ করেছেন, বহু মানুষের আশীর্বাদ তোষামোদ এবং ধন্যবাদ পেয়েছেন। কিন্তু কোনদিন তাঁর মুখে এত বড় তৃপ্তির স্বাক্ষর ফুটে ওঠেনি। জীবনে যা প্রাপ্য ছিল, আজ তিনি তাই পেয়ে গেছেন। আজ আর তাঁর কোন ভ্রান্তি নেই, বিকার নেই, বিক্ষোভ নেই। চোখের সম্মুখেই সকল সংশয় ও প্রশ্নের উত্তরটা স্পষ্ট হয়ে রয়েছে, মাধুরীর বুঝতে কোন ভুল হচ্ছিল না।

সঞ্জীববাবুকে যেন আজ সব চেয়ে নতুন করে বুঝতে পারছিল মাধুরী। এত আন্তরিকভাবে মমতার দৃষ্টি দিয়ে সঞ্জীববাবুকে কোন দিন সে দেখেনি, দেখবার কারণও হয়নি। মাধুরীর কাছে সঞ্জীববাবু আজ হঠাৎ একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। মাধুরীর চোখের দৃষ্টিটা সেই রকম আবেশে মুগ্ধ হয়েছিল—এক মমতাময়ী মাতা যেন দুরন্ত ছেলের শান্ত রূপের দিকে তাকিয়ে মনে মনে খুসী হয়ে উঠছে।

সঞ্জীববাবু বললেন—সারদার সঙ্গে দেখা হলো। বড় রোগা হয়ে গেছে—আহা! কিন্তু সারদার মনটা আজও একটুও বদলায়নি। আমাকে দেখে প্রথমে তো কিছুই বলতে পারলো না। তারপর কেঁদে ফেললো। এ রকম করুণ কান্না আমি জীবনে শুনিনি। কী ভয়ানক ভুল! কী কঠিন প্রায়শ্চিত্ত!

মাধুরী যেন ছাত্রীর মত দাঁড়িয়ে পাঠ নিচ্ছিল। সঞ্জীববাবুও শুধু পাঠ শুনিয়ে দেবার আবেগেই এক রহস্যমুক্ত জীবনের ইতিবৃত্তকে আক্ষেপে আহ্লাদে ও আগ্রহে মিশিয়ে নিয়ে বধির সংশয়ের কানে আজ তাঁর জয়গৌরবের বার্তা ঘোষণা করছিলেন।

মাধুরী একটু কৌতুহলী হয়েই প্রশ্ন করলো—সারদা জেঠীমা আমার কথা কিছু জিজ্ঞেস করলেন?

সঞ্জীববাবু—তোর কথা? না, তোর কথা কিছু জিজ্ঞেসা করেনি।

মাধুরী—তুমি আমার কথা কিছু বলেছ?

সঞ্জীববাবু—আমি? না, আমি কেন বলতে যাব? কি-ই বা এমন বলার আছে? তুই যে ভাল আছিস্, সে সব কুশল সংবাদ সারদা জানেই, জিজ্ঞেসা না করলে কি আসে যায়?

মাধুরী কেশবদার বিষয় কিছু শুনতে পেলে?

সঞ্জীববাবু—না, কেশব বাড়ী ছিল না।

মাধুরী সারদা জেঠীমা কিছু বলেননি।

সঞ্জীববাবু—না।

মাধুরী—কিছুই না।

সঞ্জীববাবু—কি-ই বা এমন বলার আছে? আমি তো জানিই, কেশব ভাল আছে। জিজ্ঞেস করেই বা কি হবে?

মাধুরী—বাসন্তীর কথা কিছু শুনতে পেলে?

সঞ্জীববাবু—বাসন্তী কে?

মাধুরী—অজয়দার বোন বাসন্তী।

সঞ্জীববাবু—তার সঙ্গে সারদার সম্পর্ক কি?

মাধুরী—সেই কথাই জিজ্ঞেস কর-ছিলাম। সারদা জেঠীমা কি বাসন্তীর সম্বন্ধে কোন কথা বললেন?

সঞ্জীববাবু—না।

মাধুরী—অজয়দা এসেছিলেন।

সঞ্জীববাবু—কেন?

মাধুরী—বাসন্তীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। তাই......।

সঞ্জীববাবু—টাকা ধার চায় বোধ হয়। আর ধার কেন? এমনিই দিয়ে দেব। বড় ভাল ছেলে অজয়। বড় গরীব।

মাধুরী—তোমাকে বিয়েতে নেমন্তন্ন করে গেছে অজয়দা।

সঞ্জীববাবু বেশ, নিশ্চয় যাব। তুইও যাস্। গ্রামের সবারই সঙ্গে মেলামেশা থাকা ভাল। এর মধ্যে বেশ একটা আনন্দ আছে। এ আনন্দ পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। সত্যি কথা বলতে কি, মীরগঞ্জ শহরেও এই জিনিস পাবি না। শুধু দেশের মাটীতে পাওয়া যায়, আর কোথাও নয়, আর কোথাও নয়।

মাধুরী—সারদা জেঠীমারা কি গাঁ ছেড়ে চলে যাবেন বলে একেবারে ঠিক করে ফেলেছেন?

সঞ্জীববাবু—না, ওসব বাজে কথা। কোথাও যাবে না ওরা। সারদা সে রকম মানুষ নয়। এই গ্রাম ছেড়ে সারদা কি অন্য কোথাও যেতে পারে?

আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পেল না মাধুরী। সবপ্রশ্নের উত্তর জানা হয়ে গেছে মীমাংসাও হয়ে গেছে।

মেটে কুটীরের দাওয়ার ওপর একটা আসন টেনে নিয়ে সঞ্জীববাবু বসে রইলেন। আলোটাকে সামনে রাখলেন। জীবনের পরম প্রাপ্যকে পেয়ে গেছেন সঞ্জীববাবু, তিনি যেন চিরকালের মত এইখানে বসলেন। তাঁর সম্মুখে আলো জ্বলছে।

মাধুরী অন্য ঘরে চলে গেল।

সকাল থেকে সানাই বাজছিল অজয়ের বাড়ীতে। ছোট মান্দার গাঁয়ের বুকে আকস্মিক একটা সুরের দোলা লাগলো। মান্দার গাঁয়ের সবাই জানে খবর—বাসন্তীর বিয়ে। বরযাত্রীরাও এসে গেছে। মান্দার গাঁয়ের ছায়ায় ঢাকা কোলের একটি কোণে একটু চঞ্চলতা জেগে উঠেছে। বাগানের পথে লোকের আনাগোনা আজ একটু বেশী। অনেকেই আসছেন, আপনজনের মত সহৃদয় কথাবার্তা বলে যাচ্ছেন। গুরুস্থানীয়েরা এসে অনেক উপদেশ দিয়ে গেলেন। ভালয় ভালয় ব্যাপারটা চুকে যাক্—কোন ভয় নেই—ঘাবড়াবার দরকার নেই। সকাল থেকে সবাকার সান্ত্বনা বাক্যে অজয়ের মনমরা ভাব দূর হয়ে যাচ্ছিল। সন্ধ্যে হতে হতেই দুঃসাহসী হয়ে উঠলো অজয়।

যে যতই উপদেশ দিক, অজয় জানে আজ বাসন্তীর আত্মহত্যার দিন। সানাইয়ের শব্দে সেই লুপ্তির লগ্নকে ঘোষণা করছে। এই বিসর্জনকে বাধা দেবার মত কোন শক্তি নেই অজয়ের। বাসন্তীও বোধ হয় অজয়ের চেয়ে বেশী করে এই সত্যকে উপলব্ধি করেছে। তাই অজয় যদিও বিষণ্ণ, কিন্তু বাসন্তী এক-বারে ধীর ও স্থির, অনিশ্চিতকে নিশ্চিত ভাবে বরণ করে নেবার জন্য সে আজ প্রস্তুত।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত অজয় এক দুঃসহ অভিমানে পুড়ছিল। বাসন্তীকে সান্ত্বনা দিতে এ গাঁয়ের একটিও মানুষ এখনো আসেনি। আর কেউ আসুক না আসুক, অন্তত একজনের আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেও আসেনি। না আসার কি কারণ থাকতে পারে? তার কাছে কি আজও সব কথা না জানা আছে? কেশব স্বয়ং সবই বুঝতে পেরেছে, কেশবের মা সব কথা শুনেছেন, শুনে কোন

আপত্তি করেননি। বরং উৎসাহিত হয়েছিলেন। সারদা নিজে থেকে অজয়কে ডেকে আড়ালে আড়ালে অনুরোধ করেছেন—'বাসন্তীকে আমার ঘরে আনতে চাই অজয়।' কিন্তু কই, সেই আহ্বানের সাড়া আজ হঠাৎ লুকিয়ে পড়েছে। কেশবের মা যা ভেবে যা-ই বলে থাকুক না কেন, কেশব এ কী কান্ড করলো? সে তো সব শুনেছে। তার কি কোন কর্তব্য নেই। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে আসছে, কেশব একবার উঁকি দিয়ে দেখলো না।

কেশব না হয় তার বুদ্ধি সুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছে, উচিত অনুচিত বুঝতে পারে না। পুরাতন নতুনে তফাৎ দেখতে পারে না। যেখানে প্রত্যাখ্যান আছে, সেইখানেই নির্লজ্জ একগুঁয়ের মত জীবনের সব আগ্রহ সঁপে দিয়ে বসে আছে। মাধুরীর স্বপ্ন নিয়েই বিভোর হয়ে আছে কেশব কিন্তু আজ বুঝবার মত সে ক্ষমতাও তার নেই যে, সেই স্বপ্ন লুট হয়ে অন্য জগতে চলে গেছে। সেখান থেকে মাধুরীকে ফিরিয়ে আনবার সাধ্য নেই কেশবের। মাধুরীকে কেউ ধরতে পারবে না। মাধুরী এক অদ্ভুত মেয়ে। যার কাছে যেমন খুসী এক একটি স্বপ্ন সৃষ্টি করেছে। যে ধরতে গেছে, তখুনি তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে।

কিন্তু মাধুরীও একবার এল না। বাসন্তীর সঙ্গে শেষবারের মত একটিবার দেখা করে যেতে আর বাধা কি? তারও তো কর্তব্য রয়েছে। নিজের জীবনের কোন পথ পেল না মাধুরী, কিন্তু পরের পথ ভুল করে দিয়ে আর লাভ কি? আসুক, আসুক, মাধুরী অন্তত একবার এসে বাসন্তীর বিসর্জনের দুঃখে একটু হাসি ছড়িয়ে যাক। নইলে বাসন্তী সবার কাছ থেকে হাসিমুখে বিদেয় নিয়ে চলে যাবে। সবার জীবনে বাসন্তীর শেষ হাসি অভিশাপের কাঁটা হয়ে চিরকাল ফুটে থাকবে। কেউ আজ এই সামান্য কাঁটা তুললো না।

ভাবনা ছেড়ে দিয়ে অজয় সত্যই দুঃসাহসী হয়ে উঠলো। কেউ না আসুক, কারও আসবার প্রয়োজন নেই। বাসন্তী চলে যাক, কারও কাছে সে কৃতজ্ঞ নয়, কারও কাছে তিলমাত্র উপকার ও অনুকম্পার বন্ধনে বাঁধা নয়। চিরদিনের গর্ব নিয়ে বাসন্তী আজ রাত্রে মান্দার গাঁয়ের হৃদয়হীনতার বেড়া লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে চলে যাক।

বরযাত্রীদের সঙ্গে এখনো একবারও দেখা করেনি অজয়। প্রতিবেশী ও কুটুম্বেরা সকল আয়োজন তদারক করছে। পাত্রটীকেও একবার ভাল করে দেখেনি অজয়। দেখবার দরকারও নেই। শোনা যাচ্ছে, পাত্রটি অতি গোবেচারা মানুষ, মাথায় টাক আছে, বয়সও নেহাৎ কম নয়, দোকানদারী আরম্ভ করেছে, জমিদারী সেরেস্তার কাজও কিছু কিছু জানে। যাঁরা খবর আনছেন, তাঁরা সবাই অজয়কে আশ্বস্ত করছেন ও উৎসাহ দিচ্ছেন—পাত্রটী বেশ হয়েছে, বেশ পাকা পোক্ত কাজের মানুষ।

অজয় ডাকলো—বাসন্তী।

বাসন্তী সামনে এসে দাঁড়াতেই, অজয় উৎসাহের সঙ্গে বললো—কিছু ভাবিস না বাসন্তী।

বাসন্তী হেসে ফেললো। অজয় বুঝতে পারলো—এই বুঝি বাসন্তীর অভিশাপের হাসি মাত্র আরম্ভ হলো।

অজয়—এইবার তৈরী হয়ে নে। খুড়িমাকে ডেকে দিচ্ছি। সময় হয়ে এসেছে। কিছু ভাবিস না।

বাসন্তী—আমি তো কিছুই ভাবছি না।

নিঃশব্দে ঘরের ভেতর ঢুকলো মাধুরী। অজয় কিছুক্ষণ অপ্রস্তুতের মত দাঁড়িয়ে রইল। মাধুরীর যেন স্থানকাল পাত্র জ্ঞান ছিল না। অজয় যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, সে কথাও একেবারে ভুলে গেছে মাধুরী।

বাসন্তীর হাত ধরে মাধুরী বললো—বাসু, রাগ করো না। মাপ ক'রো।

বাসন্তী হেসে ফেললো।

মাধুরী একটু সচকিত হয়ে বললো—আপনি একটু অন্য ঘরে যান অজয়দা, বাসুর সঙ্গে ঝগড়াটা ভাল করে সেরে নিই।

চলে যাচ্ছিল অজয়। আঙিনার দিকে কলরব জেগে উঠছে। লোকজন আসছে। আলো জ্বলে উঠছে একে একে। একে একে নিমন্ত্রিতেরা আসছে। সুর বদল করে রাতের সানাই দীর্ঘ রাগিনীর আলাপে মেতে উঠছে।

সংসারের ভিড়টা হঠাৎ যেন হিসাব-নিকাশ করার জন্য একটা লগ্নে বিচিত্র-রূপে দেখা দিয়েছে। বরযাত্রীরা এসে গেছে। পুরোহিত এসেছেন। আর ভাবনা করার ফুরসৎ নেই। ঘটনাগুলি নিজের নিয়মে গড়ে উঠছে, বদ্‌লে যাচ্ছে, ফুরিয়ে যাচ্ছে।

আবার ব্যস্তভাবে ঘরের দিকে ফিরে এল অজয়। সঙ্গে কেশব।

সবার আগে কথা বললো কেশব—আমি কেন এসেছি বুঝতে পারছি না। তাই আমাকে মাপ করতে হবে।

মাটির দিকে মাথা হেঁট করে তাকিয়েছিল বাসন্তী। কেশবের কথা শেষ হলে কেউ কোন প্রত্যুত্তর দিল না। শুধু দেখা গেল, বাসন্তী হাসছে।

আর সময় নেই। খুড়িমা এসেছেন। সকলকে তাড়া দিচ্ছেন। বাইরের আসর থেকে বারবার অজয়ের ডাক আসছে। লগ্ন এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ এক প্রবল ব্যস্ততা, হাঁকডাক আহ্বানের এক মুখর আলোড়ন। তারই মধ্যে, সভার আসরে বরমশাই এসে বসলেন।

সঞ্জীববাবু আর সারদা দেবী এক সঙ্গে দেখা দিলেন। দুটি প্রসন্ন মূর্তি এক সঙ্গে চারদিকে ঘুরে ফিরে বারান্দার এক কোণে বসলেন।

শাঁখ বাজবার আগে এই উৎসব রাত্রির রূপটা কিছুক্ষণের মত যেন জায়গায় জায়গায় নানাভাবে ভাগ হয়ে রইল।

বারান্দার এক কোণে সঞ্জীববাবু ও সারদা দেবী গল্প করছিলেন। ওঁদের দুজনের আচরণে আজ আর কোন ব্যস্ততা নেই।

অজয়, মাধুরী, বাসন্তী ও কেশব—ঘরের ভিতর ওরা কিছুক্ষণের জন্য নির্বাক মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল। ওদের ভাষা ফুরিয়ে গেছে, পথ হারিয়ে যাচ্ছে। আজ আর ওদের কিছু বলবার নেই। কোন দিকে এগিয়ে যাবার পথ নেই।

শুধু উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল পরিতোষ। পরিতোষ এসেছে, সে খবরও এখনও কেউ জানে না। পরিতোষ এসেই নিজের উপযুক্ত কাজে লেগে গেছে। বরের সঙ্গে কনেবাড়ির কোন মানুষ এ পর্যন্ত একটা কথাও বলেনি। সে যেন আজকের উৎসবের মধ্যে সব চেয়ে বেশি অবান্তর হয়ে গেছে। বিনা কারণে, বিনা দোষে।

সব কাজ ছেড়ে দিয়ে পরিতোষ শুধু বরের সঙ্গে গল্প করছিল ও হাসছিল।

সমাপ্ত

ভ্রম-সংশোধন

৪০ সংখ্যা দেশ পত্রিকার ৪৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত মর্মশাসন শীর্ষক কবিতার শেষ তিনটি লাইন এইরূপ হইবে—

"আজি মধু ফাগুনে
মর্ম-শাসনে নাম
লিখে রাখো আগুনে।"

পুস্তক পরিচয়

স্ত্রী রোগের জল চিকিৎসা—শ্রীকুলরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীরথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১১৪।২ বি ও সি হাজরা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা। ডবল ক্রাউন—২০২ পৃষ্ঠা।

গ্রন্থকার জলচিকিৎসায় একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, ইহার উপর সুলেখক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানাতে জলচিকিৎসার সাহায্যে কিরূপভাবে স্ত্রীরোগসমূহের প্রতীকার করা সম্ভব হইতে পারে, সে সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করা হইয়াছে।

কিন্তু শুধু চিকিৎসার দিক হইতেই যে পুস্তকখানি প্রয়োজনীয় এমন নহে, স্ত্রীরোগসমূহের উৎপত্তির কারণ এবং সাধারণভাবে সেগুলির প্রতিষেধক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা থাকায় গ্রন্থখানি গৃহস্থ সাধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়তা লাভ করিয়াছে। গ্রন্থকার বহু বিশেষজ্ঞের মতের দ্বারা তাহার সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করিয়াছেন, স্বাস্থ্য বিধান সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সকলকে আকৃষ্ট করিবে। গ্রন্থকারের নির্দেশিত চিকিৎসা পদ্ধতি সহজ এবং সরল। পৃথিবীর বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ জল, মাটি, উত্তাপ, আলো ও পথ্য প্রভৃতির সাহায্যে বিনাঅস্ত্রে, বিনা ঔষধে এবং বিনা খরচে ঘরে বসিয়া স্ত্রীরোগসমূহের চিকিৎসার যেসব ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছেন, গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থখানাতে তাহারই প্রয়োগ পদ্ধতি বুঝাইয়া দিয়াছেন। কয়েকখানি চিত্রের সাহায্যে প্রতিপাদ্য বিষয় পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

বৈদেশিক

(১২৬ পৃষ্ঠার পর)

সম্বন্ধেও আমরা অনবহিত নই। বিরোধ মীমাংসার অজুহাতে পরস্পরের প্রভাব প্রতিষ্ঠার মতলব যদি সেই হস্তক্ষেপের পিছনে থাকে তাহলে দুঃখের সঙ্গে হলেও একথাই আমরা বলবো, বিরোধের পথেই হোক, আর মীমাংসার পথেই হোক চীন নিজেই তার সমস্যার সমাধান করুক। চীনের সর্বনাশের উপর অপরের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি গড়ে উঠুক এ অবস্থার পুনরভিনয় আমরা আর কিছুতেই দেখতে চাইনে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য। গত ১৫ই আগস্টের এক সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন গবর্ণমেন্টের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তি-পত্রের সর্তগুলো কি এ পর্যন্তও তা প্রকাশিত হয়নি। সর্ত যাই হোক এবং যে মূল্যেই এই বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা ক্রীত হয়ে থাকুক আমাদের বিশ্বাস এই বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার মূল্যস্বরূপ চীন রুশিয়াকে নিজের ক্ষতি করেও চীনে প্রচুর সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছে। চুক্তিটা যখন বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার তখন কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করলে সে চুক্তি ক্ষুণ্ণ করা হয় না কি?

সংবাদের অপ্রতুলতা ও সংবাদ নিয়ন্ত্রণের কঠোরতার জন্য চীনের ব্যাপার বরাবরই রহস্যপূর্ণ রয়ে গেছে। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক প্রচার কার্যের কারসাজি সেই রহস্যকে আরও জটিল করে তুলেছে। সমস্যা যাই হোক, চীন রক্তকলঙ্কিত আত্মহত্যার পথ গ্রহণ না করে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের বিরোধের মীমাংসা করুক এই কামনাই আমরা আন্তরিকভাবে করবো। কারণ প্রাচ্যের অভ্যুত্থান যে শক্তিশালী সুসংহত চীনের উপর বহুলাংশেই নির্ভর করে তা বলা বাহুল্য মাত্র।

—বিষ্ণু গুপ্ত

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৫ই আগস্ট—বাগনান (হাওড়া) থানার চন্দ্রভাগ গ্রামের এক চাষী তাহার স্ত্রী ও জননীকে লজ্জা নিবারণ উপযোগী একখণ্ড বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিতে অসমর্থ হইয়া উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

১৬ই আগস্ট—বড়লাট অস্তি চিমুরের মামলার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ৭জন বন্দীর দণ্ডাদেশ মকুব করিয়া দিয়া, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের নির্দেশ দিয়াছেন।

রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নির্দেশানুযায়ী মুক্তি সপ্তাহে শক্করের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ছাত্র হেমু কালানীর মাতাকে দুই পংক্তি কবিতা খচিত একটি রৌপ্যপদক উপহার দেওয়া হইয়াছে। ১৯৪২ সালের আগস্ট হাঙ্গামার সময় মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য তাহার ফাঁসি হয়।

১৭ই আগস্ট—গত বুধবার রাত্রে প্রবল বারিপাত হওয়ায় সিমলাতে একখানি বাড়ি ধ্বসিয়া যাওয়ার ফলে ১১জন নিহত ও ২জন আহত হইয়াছে। গত রাত্রিতে বোম্বাইয়ের ফ্রিয়ার রোডের একখানি পুরাতন গৃহের পশ্চাদ্ভাগ ধ্বসিয়া যাওয়ার দরুণ তিন ব্যক্তি মারা গিয়াছে।

স্বর্গীয় সংগীতাচার্য দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী শ্রীযুক্তা কমলা দেবী গত ১৬ই আগস্ট পরলোক গমন করিয়াছেন।

ঝাঁসির এক সংবাদে প্রকাশ, ছয়জন সামরিক সিপাহী দুইজন কৃষক যুবককে ক্ষেতে কাজ করার সময় হত্যা করিয়াছে।

১৮ই আগস্ট—অদ্য আরার দায়রা জজ মিঃ আয়ার আই সি এস স্থানীয় সাব জেলে পাঞ্জাব মেল লাইনচ্যুতির মামলার রায় দিয়াছেন। তিনি চারি ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে ও তিনজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ যে, মহাত্মা গান্ধী বর্তমানে শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে মৌনব্রত অবলম্বন করিতেছেন। আরও প্রকাশ, গান্ধীজী এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাঁহার অনশনব্রত অবলম্বনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

গতকল্য রাত্রিতে ডিব্রুগড়ে শান্তিপাড়ার একটি বাড়িতে জনৈক স্ত্রীলোক, তাহার কন্যা ও দৌহিত্রী নিদ্রিত থাকাকালে কতিপয় দুর্বৃত্ত বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া ধারালো অস্ত্র দ্বারা তাহাদিগকে হত্যা করিয়া মূল্যবান জিনিষপত্র লইয়া সরিয়া পড়ে।

দিনাজপুরে, জ্বরে আক্রান্ত জনৈক রোগিণী অধিক মাত্রায় মেপাক্রিন খাওয়ার ফলে অর্ধোন্মাদ হইয়া গিয়াছে।

শনিবার অপরাহ্নে শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল।

শিয়ালকোট জেলা হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে প্রকাশ, রমজান মাসে রোজা না করায় একজন মুসলমান তাহার ৪জন স্বধর্মাবলম্বীকে হত্যা করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আততায়ী ৪জন মুসলমানকে রমজান মাসে অন্যান্য লোকের সাক্ষাতে ধূমপান করিতে দেখিয়া তাহার ধর্মভাবে এতই আঘাত লাগে যে, সে একখানা কুঠারের আঘাতে ৪জনকে হত্যা করে। হত্যা করিবার পর সে স্নান করিয়া নিহত ব্যক্তিদের আত্মার মঙ্গলকামনায় প্রার্থনা করে।

রবিবার রাত্রি ১১টার সময় পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ তাহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে ৯০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

১৯শে আগস্ট—বোম্বাই-এর নিকটে বাদুরলী গ্রামে বৈদেশিক ডাকবাহী একখানি বিমান ভাঙ্গিয়া পড়ে। আরোহীবৃন্দ সকলেই মারা গিয়াছে।

ডিব্রুগড়ে একটি স্ত্রীলোক তাহার শিশুপুত্রকে রক্ষা করিতে গিয়া নিজে ট্রেনের তলায় চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে।

২০শে আগস্ট—রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বলিয়াছেন, মহাযুদ্ধের অবসান ঘটিয়াছে, কাজেই ভারতে স্বাধীনতা সমস্যার চূড়ান্ত ও স্থায়ী সমাধান এখনই করিতে হইবে। এই সমাধানের একমাত্র অর্থই হইল স্বাধীন ও মুক্ত ভারতবর্ষের জন্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন দেশের সহিত সহযোগিতার নীতিসম্পন্ন এক গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট গঠন।

সিরাজগঞ্জে প্রবল বন্যায় অধিবাসীরা অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টে পতিত হইয়াছে। প্লাবনজনিত সর্ববিধ অসুবিধা ছাড়াও শৃগাল ও বন্য শূকরের আক্রমণে অনেকেরই নিহত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

২১শে আগস্ট—এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার বড়লাটকে আলোচনার জন্য যথাসম্ভব শীঘ্র লণ্ডনে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। বড়লাট ঐ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই আগস্ট—জাপানের সমর সচিব কোরেচিকা আনামি গত রাত্রে তাঁহার সরকারী বাসভবনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। জাপানের আত্মসমর্পণের পর এই প্রথম আত্মহত্যার খবর পাওয়া গেল।

জাপ সম্রাট হিরোহিতো অদ্য বেতারে সরাসরি জাপ জাতির উদ্দেশে এক বক্তৃতায় বলেন "পটসডাম চরমপত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। জাতির উদ্দেশে সম্রাটের সরাসরি বক্তৃতা জাপানের ইতিহাসে এই প্রথম।

পার্লামেণ্টের উদ্বোধন উপলক্ষে অদ্য বৃটিশ সম্রাট তাঁহার বক্তৃতায় ভারতের সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় জনসাধারণের নিকট পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আবার গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিবেন।

যুদ্ধের অবসান সম্পর্কে বার্ণার্ড শ এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন : "প্রথম আণবিক বোমা পতনের সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধের অবসান ঘটে। ইহার পর আর একটি নিক্ষেপ করিবার অধিকার আমাদের আছে কিনা, তাহা অত্যন্ত সন্দেহের বিষয়।"

১৬ই আগস্ট—জাপ নিউজ এজেন্সী অদ্য ঘোষণা করে যে, জাপ সম্রাট সমস্ত জাপ বাহিনীকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

সুজুকি মন্ত্রিসভার বিলোপ ঘটিয়াছে। হিগাশিকুনী প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

যুদ্ধে জয়লাভ উপলক্ষে ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য বিলাতের আবে গীর্জায় এক প্রার্থনার ব্যবস্থা হয়। সেণ্ট আলবান্সের ডিন রেভাঃ সি পি থিকনেস উহা বাতিল করিয়া দিয়া বলেন, আমি শক্তির অপপ্রয়োগের ফলে যে জয়লাভ হইয়াছে তাহার জন্য ভগবানকে বিবেকসম্মত উপায়ে ধন্যবাদ দিতে পারি না।

১৭ই আগস্ট—চলতি বৎসরের মধ্যে বৃটিশ বাহিনী হইতে খুব কম হইলেও প্রায় দশ লক্ষ লোক ছাড়াইয়া দেওয়া হইবে বলিয়া প্রথম আনুমানিক হিসাব ধরা হইয়াছে। ইহার মধ্যে অন্ততঃ ১ লক্ষ নারী হইবে।

জেনারেল দ্য গল মার্শাল পেতাঁর প্রাণদণ্ডাদেশ মকুব করিয়াছেন। তাঁহাকে এখন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

১৮ই আগস্ট—জনৈক অস্ট্রেলিয়ার জনৈক মার্কিন নৌ-সৈনিককে ছুরিকাঘাত করিলে লণ্ডনে ওয়েস্ট এণ্ডের মধ্যস্থলে অস্ট্রেলিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মার্কিন সৈন্যদের এক সশস্ত্র দ্বন্দ্ব হয়। লণ্ডন বাসীরা তখন জাপানের পরাজয়ে আনন্দ করিতেছিল।

বেলফাস্টের সংবাদে জানা যায়, টাইরনের কারিকমোরে এক জনতা গতকল্য প্রকাশ্যে ইটালিয়ান [illegible] পোড়াইয়া ফেলে। সশস্ত্র পুলিশ জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

১৯শে আগস্ট—জাপ সম্রাটের ১৬জন আত্মসমর্পণকারী প্রতিনিধি জেনারেল ম্যাকআর্থারের সহিত জাপানের আত্মসমর্পণের প্রারম্ভিক আলোচনা চালাইবার জন্য আজ সন্ধ্যায় এক বিরাটকায় মার্কিন বিমানযোগে ম্যানিলায় উপনীত হন।

প্রকাশ যে, ২০ হইতে ৩০ হাজার চীনা কম্যুনিস্ট টিয়েনসিন টাকুর উপকূল বন্দর আক্রমণের জন্য সমবেত হইতেছে।

২০শে আগস্ট—ম্যানিলায় আগত জাপ দূতগণ জাপানে প্রত্যাবর্তনের জন্য ম্যানিলা ত্যাগ করিয়াছেন।

আণবিক বোমা সম্পর্কে এক বিবৃতিতে জর্জ বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন, আমরা মনুষ্য সমাজ লইয়া ছেলেখেলা করিতেছি। এই বিস্ফোরণশীল অস্ত্র পরিণামে দুনিয়া ধ্বংস করিতে পারে।

২১শে আগস্ট—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, অদ্য হইতে ঋণ ইজারা সংক্রান্ত সমস্ত ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

আত্মসমর্পণকারী জাপ প্রতিনিধি দলকে লইয়া যে দুইখানা বিমান ম্যানিলা হইতে যাত্রা করিয়াছিল, তন্মধ্যে একখানা বিমান প্রত্যাবর্তনকালে এক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হওয়ায় একজন যাত্রী আহত হইয়াছেন।

ব্রহ্মদেশে জাপ সৈন্যেরা আত্মসমর্পণ আদেশ মানিয়া লইবার আগ্রহ না দেখাইয়া বরং যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ । শনিবার, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৫২ সাল। Saturday, 1st September, 1945. । ৪৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রমিকদল ও ভারত

লর্ড ওয়াভেল শ্রমিক গভর্নমেণ্ট কর্তৃক আহূত হইয়া লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন এবং সংবাদে দেখা যাইতেছে, তিনি তথায় গিয়া ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের সঙ্গে আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন। এই আলোচনার ফল কি হইবে, সে সম্বন্ধে এখন কোন কথা বলা চলে না; কারণ শ্রমিক দলের ভারত সম্পর্কিত নীতি সম্পূর্ণই রহস্যাবৃত রহিয়াছে। ইংলণ্ডেশ্বরের অভিভাষণের ভিতর আমরা ইঁহাদের মনোভাবের আশাপ্রদ কোন পরিচয় পাই নাই। সেক্ষেত্রে তাঁহারা সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদী সংরক্ষণশীল দলের সমর্থিত নীতিরই অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়াছেন এবং ভারতের সম্পর্কে স্বাধীনতার কথা এড়াইয়া স্বায়ত্তশাসনের মামুলী কথাই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। এদিকে শ্রমিক দল ব্রিটিশ শাসন নীতির নিয়ামক হইবার পরও ভারতের ব্যাপারে নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে না। ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিলাতে যুদ্ধের অবস্থাজনিত বিশেষ ব্যবস্থাগুলি প্রত্যাহার করা হয়; কিন্তু ভারতে এখনও সেগুলি বলবৎ রহিয়াছে; সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বক্তৃতার স্বাধীনতা এখানে এখনও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তিদানের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিতেছেন, এমন কথা আমরা অনেকদিন হইতেই শুনিতেছি; কিন্তু ব্যাপকভাবে রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিবার কোন লক্ষণই এ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না। ইহার উপর এই শ্রমিক গভর্নমেণ্টের আমলে বাঙলা দেশের জনমতকে পদদলিত করিয়া ৯৩ ধারার স্বৈরশাসন নেহাৎ জবরদস্তির সঙ্গেই চালানো হইতেছে এবং যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয় আগামী এপ্রিল মাসে নূতন সাধারণ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত বাঙলায় মন্ত্রিসভা গঠন করা হইবে না। গভর্নর এই ধারণা লইয়াই কাজ করিতেছেন। এই ধরণের অপেক্ষাকৃত ছোটখাট ব্যাপারেই শ্রমিক দল যদি সংরক্ষণশীল দলেরই ধারা ধরিয়া চলেন, তবে ভারতের স্বাধীনতার বৃহত্তর প্রশ্নে তাঁহারা যে উদারতার দৃষ্টি অবলম্বন করিবেন, আমরা এমন কোন সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু শ্রমিক দলের এমন মতিগতির জন্য আমরা বিস্মিত হই নাই। ব্রিটিশ শ্রমিক দলের উপর আমরা আমাদের জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য আস্থা পোষণ করি না। আমরা জানি, স্বাধীনতা ভিক্ষার দানস্বরূপে পাওয়া যায় না এবং এক্ষেত্রেও নিজেদের শক্তিকে সংহত করিয়াই আমাদিগকে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে।

দমন নীতির ফল

পশুবলের দ্বারা প্রাণশক্তিকে পিষ্ট করা সম্ভব হয় না; পক্ষান্তরে পশুত্বের সর্ববিধ স্পর্ধাকে দগ্ধ করিয়া প্রাণশক্তি প্রতিকূলতার আঘাতে প্রখরতররূপেই প্রজ্বলিত হইয়া উঠে,—জগতের ইতিহাসে এই সত্য আত্মদাতা বীরগণের শোনিতের অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। দীর্ঘদিনের পরাধীন ভারত আজ প্রাণবলে জাগ্রত হইয়াছে; সুতরাং এখানেও সে সত্যের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি পাঞ্জাবের কংগ্রেস কর্মীদের এক সভায় এই কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, গত কয়েক বৎসর ভারতব্যাপী যে দমন নীতি চলিয়াছিল, তাহাতে জাতীয় আন্দোলনের শক্তি ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরং তাহা সমধিক দৃঢ়তাই লাভ করিয়াছে। এই কয়েক বৎসরে বহু প্রাণবান্ দেশসেবকের সাধনা স্বাধীনতার আদর্শকে জাতির দৃষ্টিপথে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। সাধনার এই ধারার মধ্যে আন্তরিকতার আবেগে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়; এই বৈচিত্র্যের ছন্দ সম্বন্ধে শাসনতান্ত্রিক বৈয়াকরণগণ যে ব্যাখ্যাই প্রচার করুন না কেন, মোটামুটি আদর্শের মহত্ত্বই এতদ্দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। জাতির মনোমূলে আদর্শের এই জ্বলন্ত প্রেরণাই জাতির ভবিষ্যৎ সংগঠনে সত্যকার সাহায্য করিয়া থাকে। পণ্ডিতজী এই সত্যকে উপলব্ধি করিয়াই তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, আগামী দুই বৎসর কংগ্রেস আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করিবে। আমরাও এই আশাই করিতেছি, প্রকৃতপক্ষে বিদেশী রাজনীতিকেরা ভারতের ৪০ কোটি নরনারীর ভাগ্য নির্ধারণ করিয়া দিবেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁহারা নিঃস্বার্থ প্রেমের পথে পরিচালিত হইবেন, কোন মূর্খই আধুনিক বৈদেশিক রাজনীতির মূলীভূত দ্বন্দ্ব সংঘাতের গতি দেখিয়া এমন ধারণা অন্তরে পোষ করিতে পারে না। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে; কিন্তু বিজিগীষা এবং সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির তাড়না জগতে সমানভাবেই রহিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই তাহা সন্দেহ ও সংশয়ের আলোড়নে নূতন সংঘর্ষের প্রতিবেশ সৃষ্টির সূচনা করিতেছে; এরূপ অবস্থায় আন্তর্জাতিক সদিচ্ছা বা অপরের উদারতার মোহ পরিত্যাগ করিয়া বলিষ্ঠ জাতীয়তার পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। অস্পষ্ট মতবাদের কুজ্ঝটিকা যেন এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে।

বাঙলায় কংগ্রেস

গত ২৩শে আগস্ট কলিকাতা গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত এক ঘোষণার স্বারা বাঙলা সরকার বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছেন। গত ১৯৪২ সালে ১৯০৮ সালের ভারতীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৬(১) ধারা অনুসারে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল এই প্রতিষ্ঠান বাতিল থাকার পর, ইহার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইল। সমগ্র ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে এই তিন বৎসর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটজনক কাল। এই তিন বৎসরে ভারতের উপর দিয়া নির্মম পীড়ন-নীতির ঝটিকাবর্ত বহিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে যে বিরাট স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, এতৎসম্পর্কে শাসক-দের অবলম্বিত নীতির ফলে দেশবাসীর অশেষ দুঃখ-বরণ, নির্যাতন ও আত্মদানের মর্মান্তিক স্মৃতি কখনও ভুলিবার নয়। এতদ্ভিন্ন নানা দুর্নীতি এবং তৎসূত্রে শাসকবর্গের অব্যবস্থা ও অযোগ্যতা, বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করিয়া বাঙলায় মন্বন্তর, রোগ-মহামারী, অশেষবিধ নিষ্করুণ লাঞ্ছনা দেশের সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। এই কয় বৎসর যাবৎ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহ নিষিদ্ধ ছিল এবং কংগ্রেসের সাধারণ কর্মী হইতে আরম্ভ করিয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পর্যন্ত প্রায় সকলেই কারারুদ্ধ ছিলেন এবং বর্তমানেও অনেকের কারামুক্তি ঘটে নাই। এই তিন বৎসর কংগ্রেস-সেবকগণ মুক্ত থাকিলে দেশে এতটা দুর্নীতির অবাধ প্রসার হইতে পারিত না, এবং তাঁহারা দুর্গত জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাহাদের দুঃখ-দুর্ভোগ লাঘব করিতে পারিতেন। কিন্তু এ দেশ পরাধীন; কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠান সিদ্ধ ও অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হওয়া এবং কংগ্রেস-সেবকগণের মুক্ত থাকা বা কারারুদ্ধ হওয়া আইনের মারপ্যাঁচ ও কর্তৃপক্ষের তুষ্টি ও রুষ্টির উপর নির্ভর করে। ঘটনাচক্রের পরিবর্তনে দীর্ঘ তিন বৎসর পরে কংগ্রেস কমিটিসমূহের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইয়াছে, ইহাতে কংগ্রেসের উপর বহু গুরুদায়িত্ব ভার হঠাৎ আসিয়া আপতিত হইবে। আমরা বিশেষ করিয়া বাঙলার কংগ্রেস-সম্পর্কেই বলিতেছি। প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে বাঙলার জিলা কংগ্রেস কমিটি সমূহ খোলা, তাহার নথিপত্র প্রস্তুত করা এবং যে সমস্ত জেলা কংগ্রেস কমিটির নথিপত্র পুলিশ-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হস্তগত হইয়াছে, তাহার উদ্ধার-সাধন ইত্যাদি কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে। অতঃপর অবিলম্বেই বাঙলার প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটি সমূহকে সংগঠন-কার্যে মনোনিবেশ করিতে হইবে। দলাদলি, দলগত প্রাধান্য, নেতৃত্বের মোহ ইত্যাদি নানা সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য বাঙলার কংগ্রেস কুখ্যাত হইয়া আছে। এই দলগত বিভেদ-বৈষম্যের কলঙ্ক-কাহিনীর কথা বিস্মৃত হইয়া কংগ্রেসকর্মীদিগকে দল-উপদল-নির্বিশেষে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করিতে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যাঁহারা এখন আছেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি। দেশের স্বাধীনতা-লাভের জন্য তাঁহারা যে শাসক-শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন, দল-গত অনৈক্য, ভেদবুদ্ধি ও বাদ-বিসংবাদের ফলে তাহাদিগকেই পরোক্ষভাবে সাহায্য করা হয়; এবং দেশের স্বাধীনতা-লাভের সাধনায় হীনবল হইয়া পড়ে, ইহা বোধ করি তাঁহারা এতদিনে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। নানাবিধ মতবাদের কুজ্ঝটিকায় দিগ্ভ্রান্ত না হইয়া দেশের স্বাধীনতাকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই ব্যক্তি-গত বা দলগত ভেদ-বৈষম্য বা প্রাধান্যের প্রশ্ন পরিহার করিয়া ঐক্যবদ্ধ-ভাবে কংগ্রেসের সেবায় আত্মনিয়োগপূর্বক স্বাধীনতা-লাভের সংগ্রামকে শক্তিশালী করিয়া তোলা উচিত। তাহার পর সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে যদি বাঙলার কংগ্রেস ঐকামতের ভিত্তিতে সংগঠিত হইতে না পারে, তবে প্রতিক্রিয়া-শীল দলগুলির পক্ষে শক্তি সঞ্চয় করা সহজসাধ্য হইবে এবং বাঙলায় কংগ্রেসের প্রভাব ও প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইবে। নির্বাচনে জয়লাভ করিয়া বাঙলায় কংগ্রেসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং দুর্নীতি ও অনাচারের অবসান ঘটাইতে হইবে। বাঙলার বিভিন্ন জাতীয় দলগুলি যদি ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে, তবেই তাহা সম্ভব। বাঙলায় যাঁহারা তরুণ এবং যাঁহারা প্রবীণ কংগ্রেস-নেতা, আমরা তাঁহাদের সকলকেই এ সম্বন্ধে অবিলম্বে অবহিত হইতে অনুরোধ করিতেছি। সর্ববিধ দলাদলির সমাধি-ক্ষেত্রের উপর নবমহিমায় ও অমিত শক্তিতে বাঙলার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হোক, আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

কুচবিহারে সামরিক প্রতাপ

এদেশের পুলিশ ও সামরিক বিভাগ যে নিরঙ্কুশ ও অমিত শক্তির অধিকারী এবং তাহাদের যে-কোন অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া যাইতে হইবে, ইহা সমঝাইয়া দিতেই তাহারা সব সময় যেন ব্যগ্র। দেশীয় রাজ্যগুলিও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রশ্রিত এই নীতি অনুসরণে পরাঙ্মুখ হয় না। "আনন্দবাজার পত্রিকার" আলিপুর দুয়ারস্থ নিজস্ব সংবাদদাতার প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, কুচবিহার রাজ্যের এক সাইকেলে আরোহণকারী দুইজন সামরিক ব্যক্তি ও সাইকেল-আরোহী জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে এই তিন ব্যক্তিরই পতন ঘটে। কিন্তু এই পতন সামরিক ব্যক্তিদ্বয়ের মিলিটারি মেজাজে ক্রোধের সঞ্চার করে এবং তাহারা ভদ্র-লোকটিকে প্রহার করে। সেই সময় হোস্টেল হইতে দুইজন ছাত্র বাহির হইয়া আসিয়া এই অভদ্র নির্যাতনের হাত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করে ও প্রহারকারী সামরিক ব্যক্তিদ্বয়ের সাইকেলটি পুলিশের নিকট জমা দেয়। ইহাতে কুচবিহার রাজ্যের সৈন্যদের মিলিটারি অহমিকায় আঘাত লাগে। সৈন্যবিভাগের দুইজন সামরিক অফিসার আসিয়া কলেজের অধ্যক্ষকে সৈন্যদের ব্যারাকে যাইতে বলে। কলেজের ক্লাস চলিতে থাকাকালে অধ্যক্ষ তথায় যাইতে অস্বীকৃত হ'ন। তাহার ফলে সৈন্যগণ ক্রোধান্ধ হইয়া দলবদ্ধভাবে জেনকিন্স স্কুল, কলেজ হোস্টেলে ও কলেজের ক্লাসগুলিতে প্রবেশ করিয়া অধ্যক্ষ, অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী নির্বিশেষে সকলকেই ব্যাটনের দ্বারা প্রহার করিতে থাকে। কলেজ হোস্টেলের উপর হইতে কয়েকজন ছাত্রকে নীচে ফেলিয়া দেওয়া হয়। ছাত্রীগণ অধ্যাপকগণের কমনরুমে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, সৈন্যগণ তথায়ও প্রবেশ করে। অধ্যাপকগণ তাহাদিগকে প্রহার করিতে নিষেধ করিলে সৈন্যগণ সে কথায় কর্ণপাত করে না এবং সকলকেই নির্বিচারে প্রহার করে। এই প্রহারের ফলে ৯২ জন ছাত্রছাত্রী আহত হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীর অবস্থা উদ্বেগজনক বলিয়া প্রকাশ। "আনন্দবাজার পত্রিকার" নিজস্ব সংবাদদাতা কলেজ হোস্টেলের প্রত্যেকটি কক্ষ পরিদর্শন করিয়া ঐ সমস্ত কক্ষের চেয়ার, টেবিল, খাট, আয়না, সেলফ, ট্রাঙ্ক ও দরজা-জানালা ভগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছেন। তিনি কক্ষের দেওয়ালের গায়ে রক্তের চিহ্নও দেখিতে পাইয়াছেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদ সংক্ষিপ্ত হইলেও "আনন্দ-বাজার পত্রিকার" নিজস্ব সংবাদদাতার এই সংবাদ অনেকাংশে সমর্থিত হইয়াছে। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় কলেজের অধ্যক্ষ পূর্বাহ্নে সংবাদ দিলেও পুলিশ কর্তৃপক্ষ যথাসময়ে কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন, কিংবা সৈন্যদের এই উচ্ছৃঙ্খল আচরণে হস্তক্ষেপ করে নাই। স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষের এই আচরণ বিস্ময়কর ও রহস্যজনক। দুইজন সামরিক ব্যক্তি ও দুইজন ছাত্রের মধ্যে যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া সৈন্য-গণের এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, বিশেষ করিয়া ছাত্রীগণের উপর এইরূপ প্রহারের

নিন্দা করিবার ভাষা নাই। এই ঘটনায় কুচবিহার যে আধুনিক সভ্য মানব- সমাজের অন্তর্গত সে সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিতেছে। এই সমস্ত বর্বর, নরপশুগণের বিরুদ্ধে কুচবিহার রাজ্যের কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বর্বর উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদিগকে যাহাতে আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, আমরা এ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে অবহিত হইতে বলিতেছি। নতুবা এই ঘৃণ্য, অবমাননাকর ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে রোষ-বহ্নি, প্রজ্বলিত হইবে, তাহা কুচবিহারের মত ক্ষুদ্র রাজ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না, তাহা সমগ্র দেশে দাবানলের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। এই কথা এবং রাজ্যের সুনামের কথা স্মরণ করিয়াও কুচবিহারের কর্তৃপক্ষ আশা করি অবহিত হইবেন, আমরা এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া রাখিতেছি।

বাঙলায় বন্যা ও ধান্যের অবস্থা

এ বৎসরের ধান্যের অবস্থা সম্পর্কে বাঙলা সরকারের এক ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সার মর্ম হইতেছে এই যে, স্বাভাবিক অবস্থায় বাঙলায় যে পরিমাণ আউস ধান্যের ফলন হয়, এবার তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ এবং যে পরিমাণ আমন ধান্যের ফলন হইয়া থাকে, তাহার ৮০ ভাগ হইবে। তাঁহাদের এই অনুমানের ভিত্তি হইতেছে এই যে, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় ভাল আউস ধান্য হইয়াছে এবং বন্যার পূর্বেই সে সমস্ত ধান্য কাটা হইয়াছে; দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে দেরিতে আবাদ হইলেও যদি ভালরূপ বৃষ্টি হইতে থাকে (বিশেষ করিয়া অক্টোবর মাসে), তবে বাঙলা সরকারের রাজস্ব বিভাগের মতে উপরিউক্ত পরিমাণ আমন ধান্যের ফলন আশা করা যায়। ঢাকার মাণিকগঞ্জ মহকুমা ও ময়মনসিংহ জেলা বন্যাপ্লাবিত হইয়াছে। যদি বন্যার পূর্বে এই দুই জেলার সমস্ত আউস ধান কাটা হইয়া গিয়াও থাকে, তথাপি সেই সমস্ত কাটা, অথবা মাড়াই-করা ধান বন্যার কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে কিনা, তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে আমন ধান্য সম্পর্কে বাঙলা সরকার যে আশা পোষণ করিতেছেন, তাহা অনেকাংশে 'যদি'র উপর নির্ভর করিয়া। যদি সুবৃষ্টি হয়, তবে ফসল ভাল হইবে, এইরূপভাবে অনিশ্চিত সিদ্ধান্তে অতিরিক্ত আশাবাদী না হইয়া, উপস্থিত যাহা প্রকৃত অবস্থা, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই খাদ্যব্যবস্থা সম্পর্কে বাঙলা সরকারের অবহিত হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখ তাকাইয়া থাকিলে দেশের খাদ্যের অবস্থা এরূপে শোচনীয় পরিণতিতে গিয়া পৌঁছিতে পারে, যখন তাহার কোনরূপ প্রতিকার-উপায় থাকিবে না। বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি করা সম্পর্কে বাঙলা সরকার দেশবাসীকে ক্রমাগত এই ভরসাই দিয়া আসিতেছেন, ভাবনা নাই, বাঙলায় দ্বিতীয় মন্বন্তর ঘটিতে দিব না। ১৯৪৩ সালেও বাঙলার খাদ্যশস্যের অবস্থা সম্পর্কে এইরূপে আশাবাদী হইয়া বাঙলা সরকার জনসাধারণকে বহু আশা ভরসা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে বাঙলায় দুর্ভিক্ষ নিবারিত হয় নাই। কাজেই এই জাতীয় আশা ভরসায় দেশবাসী বিশেষ আস্থা স্থাপন ও ভরসা লাভ করিতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি স্থানের বাজারে ইতিমধ্যেই চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। আরামবাগের একটি সংবাদে প্রকাশ, তথায় যে পরিমাণ ধান্য উৎপাদিত হইয়া থাকে, এবার তাহার শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদিত হওয়ার আশা নাই। বীরভূমের একটি সংবাদে প্রকাশ, তথায় এ পর্যন্ত অর্ধেক পরিমাণ জমিতে ধান্যের আবাদ করা সম্ভবপর হইয়াছে। আশ্বিন মাসে সুবৃষ্টি না হইলে এই অর্ধেক পরিমাণ ধান্যও রক্ষা পাওয়া অসম্ভব হইবে। বগুড়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। আউসের কথা বাদ দিলেও এই সমস্ত জেলায় যে আমন ধান আদৌ হইবে, সে সম্বন্ধে আশা কম। বন্যার জল তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতেছে না। তাহার ফলে যে সমস্ত ধানের গাছ এখনও দাঁড়াইয়া আছে, তাহা একটু জোরে বাতাস বহিলেই উপড়াইয়া যাওয়া এবং যে সমস্ত ধান গাছের পাতায় বন্যার জলের মাটি থিতাইয়া পড়িয়াছে, তাহা পচিয়া যাওয়া স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। বন্যা-প্লাবিত অঞ্চলসমূহে এ পর্যন্ত গবাদি পশুর কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হয় নাই বলিয়াও সরকারী ইস্তাহারে মন্তব্য করা হইয়াছে। কিন্তু সরকারী বিভাগ হইতে এবিষয় অবগত নহেন যে, বন্যার জল সরিয়া গেলে, সেই সমস্ত বন্যাপ্লাবিত স্থানের ঘাস খাওয়ার ফলেই গবাদি পশুর উদরপীড়া ও মড়ক দেখা দেয়। গবাদি পশুর মড়ক এখন না দেখা দিলেও তাহা ভবিষ্যতের গর্ভে অপেক্ষা করিতেছে। যাহা সত্য ও সম্ভাব্য কেবল তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা কর্তৃপক্ষকে বলি। জনসাধারণকে অযথা ভরসায় আশান্বিত করিয়া কোন লাভ নাই। বাঙলার বিপদ আসন্ন, সরকার এখন হইতেই অবহিত হউন।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

যুদ্ধের অবসানে মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হইবে, জনসাধারণ ইহাই আশা করিয়াছিল। কিন্তু সরকারী কন্ট্রোল ব্যবস্থার কর্ণধারস্থানীয় ব্যক্তিগণের মুখ-নিঃসৃত বাণী হইতে সে সম্পর্কে আপাতত হতাশ হইতে হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী শ্রীযুক্ত দেশাই যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়, মূল্য-নিয়ন্ত্রণ অথবা কন্ট্রোল ব্যবস্থা আরও দুই বৎসর চলিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য-সচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবের উক্তি হইতে জানা যায়—"খাদ্যদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণ অবিলম্বে শিথিল হইবার আশা নাই।" কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য ও শ্রমসচিব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—"কলমের এক খোঁচায় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে।" ইঁহাদের এই সমস্ত উক্তির যাথার্থ্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিলাম। প্রয়োজনানুরূপ খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যতদিন পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া না যায়, ততদিন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা চালু রাখিবার সার্থকতা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু খাদ্য, বস্ত্র, মানুষের নিত্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কে গভর্নমেণ্টের প্রচেষ্টা কোথায়? যে অপ্রতুল অবস্থার জন্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে হইয়াছে, তাহার উন্নতি সাধন না করিলে নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে যে উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব হইবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। গভর্নমেণ্টের কর্তব্য একটা সুস্পষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। অন্যথায় কেবল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলে তাহা বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে না। যুদ্ধের অবসানে অন্যান্য রাষ্ট্রে খাদ্য ও পরিধেয় সম্পর্কে যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাহা সমাধানে তাহারা উদ্যোগী হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মধ্যে চাকুরি ছাঁটাই ব্যতীত অন্য কোনরূপ গঠনমূলক কার্যে সরকারকে উদ্যোগী হইতে দেখা যাইতেছে না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

সুভাষচন্দ্র



সুভাষচন্দ্রের আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদে সমগ্র ভারত শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। জাপান আত্মসমর্পণ করিবার পর সুভাষচন্দ্রের জীবনের ভবিষ্যৎ কোন্ পথে আবর্তিত হইবে, এ সম্বন্ধে আমরা নানা রকম আলোচনা গবেষণা শুনিতে পাইতেছিলাম। কেহ কেহ এই কথা বলিতেছিলেন যে, তিনি ব্রিটিশের কাছে আত্মসমর্পণ না করিয়া রাশিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন; সংবাদ বিশেষজ্ঞগণের মধ্যে কেহ কেহ এমন কথাও বলিতেছিলেন যে, তাঁহাকে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের হাতে পড়িতেই হইবে এবং শেষটা তিনি ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট সমর্পিত হইবেন। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু এইসব আলোচনা গবেষণার অবসান ঘটাইয়াছে।

সুভাষচন্দ্র ভারতের সুসন্তান; তাঁহার সমগ্র জীবন স্বদেশপ্রেমের হোমানলে উদ্দীপ্ত। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছিলেন। স্বদেশের পরাধীনতার তীব্র বেদনাই সুভাষচন্দ্রের সমগ্র কর্মপ্রেরণাকে প্রণোদিত করিয়াছিল। আদর্শের সাধনায় তাঁহার অন্তরের এই অগ্নিময় তাড়নার জ্বালার দিক হইতেই আমরা শুধু তাঁহাকে বিচার করিতে পারি; স্বদেশের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি পরবর্তী জীবনের কয়েক বৎসরে যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন' তৎসম্বন্ধে বিচারের প্রশ্ন উঠে; কিন্তু পথের সেই খুঁটিনাটি বিচারকে পরাধীন জাতির মনস্তাত্ত্বিকতা প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না সেক্ষেত্রে মুখ্য লক্ষ্যই আমাদের মনে বড় হইয়া উঠে, ইহাই স্বাভাবিক। এ সত্যকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুভাষচন্দ্র দেশকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং সে ভালবাসার কোন তুলনা নাই, দেব দুর্লভ সে দৃপ্ত প্রেম। সে প্রেম, আত্মোৎসর্গের প্রবল অনলে পরিশুদ্ধ প্রেম, তাহাতে কোন খাদ ছিল না। দেশপ্রেমিক এই কর্মসন্ন্যাসীকে আসমুদ্র সমগ্র ভারত অন্তর দিয়া ভালবাসিয়াছিল। দুই দুই বার তাঁহাকে ভারতের রাষ্ট্রপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার প্রতি পরাধীন জাতির সর্বোচ্চসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র প্রচণ্ড প্রাণবল সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন; আদর্শ সাধনার পথে তিনি কোন প্রতিকূলতাকে গ্রাহ্য করেন নাই। সংকটময় জীবনযাত্রাকে অকুতোভয়ে বরণ করিয়া লইয়া অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তিনি দুর্নিবার গতিতে অগ্রসর হইয়াছেন। জীবনের সকল প্রিয় বস্তু তুচ্ছ করিবার আদর্শের এই যে সাধনা ইহাই স্থায়ী হয়। সফলতা এবং বিফলতার প্রশ্ন এক্ষেত্রে পরোক্ষ। আদর্শের বেদীমূলে নিজকে উৎসর্গ করাতেই এখানে সার্থকতা, মৃত্যুকে বরণ করিয়া জীবনের প্রতিষ্ঠাই এখানে সত্য। সুভাষচন্দ্র দেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার বিচারও অনেকটা আপেক্ষিক এবং প্রতিবেশ-প্রভাব বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর তাহার বিচার নির্ভর করে, কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁহার যে বেদনা, তাহা সার্বভৌম মানবধর্মের দিক হইতে ইতিহাসে চিরন্তন শ্রদ্ধা লাভ করিবে এবং দেশবাসীর অন্তরে সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিকে নিত্যকাল উদ্দীপ্ত রাখিবে।

সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি সুভাষচন্দ্রের আন্তরিকতার কথাই আজ আমাদের মনে জাগিতেছে; পথের কথা আজ এখানে তুলিব না; তুলিলেও ইতিহাসের বৃহত্তর পটভূমিকায় তাহা টিকিবে না। পণ্ডিত জওহরলাল সম্প্রতি সুভাষচন্দ্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, তাহাই জাতির অন্তরের কথা। তিনি বলেন—কয়েক বৎসর পূর্বে কংগ্রেস ও সুভাষচন্দ্রের মধ্যে মতভেদ ঘটিলেও কেহই তাঁহার বিরাট দেশপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অন্তরে চিরকাল উজ্জ্বল অনল-শিখারূপে বিদ্যমান ছিল। তিনি বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন'। এই চিন্তা করিয়া কিঞ্চিৎ স্বস্তিবোধ করিতেছি। সুভাষচন্দ্র ছিলেন বীর। তিনি বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন; তাহা ঠিকই হইয়াছে। পরাধীন আমরা, আমাদের শোকদুঃখের অন্ত নাই। সুভাষচন্দ্রের দুরন্ত জীবনের প্রাণধর্মের প্রাণার্ঘ্য আমাদিগকে অবীর্য হইতে উদ্ধার করুক।

সুভাষচন্দ্র

গত ২৩শে আগষ্ট (বৃহস্পতিবার) 'রয়টার' লণ্ডন হইতে সংবাদ দেন—"জাপানী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান অদ্য সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করিয়াছেন।" সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়, গত ১৬ই আগষ্ট সুভাষচন্দ্র বিমানে সিঙ্গাপুর হইতে টোকিও যাত্রা করেন এবং ১৮ই তারিখে তাইহোকু বিমানক্ষেত্রে তিনি যে বিমানে আরোহী ছিলেন, তাহা দুর্ঘটনায় ভগ্ন হয়। তাঁহাকে হাসপাতালে চিকিৎসা করা হয়—নিশীথে তাঁহার জীবনান্ত ঘটে। সঙ্গী লেফটেন্যাণ্ট জেনারেল সুনামাশা সিদী ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং কর্ণেল হবিবর রহমান ও ৪ জন জাপানী আহত হন।

সংবাদ প্রকাশিত হইলে মিঃ ফজলুল হক আক্ষেপ করিয়া বলেন, "কি জীবনের কি পরিণতি—অক্লান্ত উৎসাহে কি বিপুল সম্ভাবনা সমাহিত।" শ্রীযুত কিরণশঙ্কর রায় বলেন,—"সুভাষচন্দ্র এখন ইতিহাসের বিষয় হইলেন। কিন্তু তবুও তাঁহার মৃত্যু সংবাদে ভারতবর্ষে প্রতি গৃহে শোক ও অন্ধকার ব্যাপ্ত হইবে।"

সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সাংবাদিকদের বলিয়াছেন (এবটাবাদ, ২৩শে আগষ্ট)

"আমি একজন পুরাতন বীর সহকর্মীর শোচনীয় মৃত্যুতে স্তম্ভিত হইয়াছি। তাঁহার স্বদেশপ্রেমাপেক্ষা অধিক স্বদেশপ্রেম আর কাহারও নাই।"

তিনি বলিয়াছেন,—আত্মত্যাগী নেতার মৃত্যুতে তিনি যেমন শোকানুভব করিয়াছেন, সুভাষচন্দ্র অতর্কিত ভাবে বীরের মত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন বলিয়া তিনি তেমনই গৌরব অনুভব করিয়াছেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ দুঃখ প্রকাশ করিয়া এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

ভারতের সর্বত্র শোক প্রকাশিত হইয়াছে।

নির্বাচন

দিল্লী হইতে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, লর্ড ওয়াভেলের বিলাত যাত্রার পূর্বে বড়লাটের শাসন পরিষদের জরুরী অধিবেশনের পরে (২১শে আগষ্ট) প্রকাশ করা হইয়াছে, যথাসম্ভব শীঘ্র কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচন হইবে। আগামী ১লা অক্টোবর কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদের আয়ুষ্কাল শেষ হইবে এবং যাহাতে নব-নির্বাচিত সদস্যগণ ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের বাজেট বিচার জন্য সমবেত হইতে পারেন, সেইরূপ ব্যবস্থা করা হইবে। রাষ্ট্রীয় পরিষদের নির্বাচক তালিকা এখনও প্রস্তুত হয় নাই। সেইজন্য তাহার আয়ুষ্কাল

দেশের কথা

(৫ই ভাদ্র—১১ই ভাদ্র)

সুভাষচন্দ্র—নির্বাচন—বস্ত্রসমস্যা—কুচবিহারে সৈনিকদের অনাচার

আগামী ১লা মে পর্যন্ত বর্ধিত করা হইবে। প্রাদেশিক নির্বাচনের সময় পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে কেন্দ্রী পরিষদের ও ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহের সদস্য নির্বাচন হইয়াছিল।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কাশ্মীর হইতে বড়লাটকে তার করিয়াছেন—কংগ্রেসকে যথারীতি কাজ করিবার—নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্বেই নির্বাচনের ব্যবস্থা করা অন্যায় হইবে। এখনও কংগ্রেস নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান, বহু লোক এখনও বন্দী, সম্পত্তি ও অর্থ বাজেয়াপ্ত অর্ডিন্যান্সের ও ভারতরক্ষা নিয়মের বলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এখনও সঙ্কুচিত। এইরূপ অবস্থায় নির্বাচন অসঙ্গত।

আচার্য কৃপালনী গত ২৩শে আগষ্ট বোম্বাই নগরে বলিয়াছেন, স্বাভাবিক অবস্থা ও ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচন কখনই সমর্থিত হইতে পারে না।

দিল্লীতে জনরব, নূতন নির্বাচনের পূর্বে বড়লাটের শাসন পরিষদের কোন কোন সদস্য পদত্যাগ করিবেন। সেই সম্পর্কে স্যার সুলতান আমেদের ও স্যার জ্বালাপ্রসাদ শ্রীবাস্তবের নামোল্লেখ হইতেছে। স্যার ফিরোজ খাঁ নুন নাকি মুসলিম লীগের ছাড়ে পাঞ্জাবে প্রধান সচিব হইবার চেষ্টায়—নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন।

আগামী শীতকালেই প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ সমূহের সদস্য নির্বাচনের সম্ভাবনা।

'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রের পুনঃ প্রকাশ

১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট লক্ষ্ণৌ শহর হইতে প্রকাশিত 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রের ছাপাখানা ও গৃহ সরকার অধিকার করেন—পত্র প্রকাশ বন্ধ হয়। এতদিন সরকার সে পত্র পুনরায় প্রকাশের অনুমতি দেন নাই। এতদিনে তাঁহারা সে অনুমতি দিয়াছেন—তাহার জন্য কাগজও বরাদ্দ করা হইয়াছে। গত ২২শে আগষ্ট ঐ পত্রের কর্মাধ্যক্ষ জানাইয়াছেন, নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে 'হেরাল্ড' পুনঃ প্রকাশের সম্ভাবনা। ২৯শে আগস্ট দিল্লীতে ডিরেক্টর সঙ্ঘের অধিবেশন হইবে এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সে অধিবেশনে নেতৃত্ব করিবেন।

করভার পূর্ববৎ

দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, যুদ্ধ শেষ হইলেও ভারত সরকার করের মাত্রা অবিলম্বে হ্রাস করিবেন না। অর্থাৎ যুদ্ধের সময় কর-ভার যেরূপ ছিল, এখনও তেমনই থাকিবে।

"গ্লোব সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের হিসাবে প্রকাশ, ভারতবর্ষে যুদ্ধে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা—২৫ লক্ষ আর যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা—৮০ লক্ষ। ইহাদিগের সংখ্যা হ্রাসে জটিল সমস্যার উদ্ভব ঘটিবে।

ভারতে ইংরেজের চাকুরি

স্যার হেনরী ক্রেক ৪৪ বৎসর ভারতে সিভিল সার্ভিসে চাকুরি করিয়া পাঞ্জাবের গভর্নর হইয়া বিদায় লইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—ভারতের শাসন-ব্যবস্থায় বৎসর কয়েকের মধ্যেই যে পরিবর্তন হইবে, তাহাতে ভারতে ইংরেজ যুবকদিগের চাকুরির পথ রুদ্ধ হইবে। ভবিষ্যতে ইংরেজরা অল্পকালের জন্য কোন কোন কাজে বিশেষজ্ঞরূপে ভারতে যাইবে—কিন্তু সমগ্র জীবন ভারতে তাহারা আর চাকুরি করিবার সুযোগ পাইবে না।

ভারতে শিল্প প্রতিষ্ঠার সুবিধা

দিল্লীতে ভারত সরকারের পরিকল্পনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার আর্দেশির দালাল গত ২২শে আগষ্ট সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন,—প্রাথমিক যে সকল শিল্পের উপর অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত সে সকল সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সুবিধাজনক যে সকল বিধিনিষেধ বিদ্যমান সে সকল শিথিল হইতে পারে কি না প্রভৃতি বিষয় বুঝিবার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। বিলাতে কোন কোন শিল্পকর্তা ভারতবর্ষকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেও কোন ব্যবসায়ী সত্বর ভারত-শাসন আইনে তাঁহাদিগের সুবিধাজনক বিধিনিষেধ শিথিল করিতে প্রস্তুত নহেন।

ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা শিল্পের সুবিধার জন্য ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গিয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আয়োজন করিতেছেন। ইঁহাদিগের সম্বন্ধেই গান্ধীজি বলিয়াছিলেন, ইঁহারা হয়ত দেশের অনিষ্টকর—কিন্তু আপনাদিগের ইষ্টসাধক ব্যবস্থা করিয়া আসিবেন। বিলাতে ইঁহাদিগের পক্ষ হইতে মিঃ টাটা বলিয়াছেন, ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় তাঁহারা—যাহাতে লজ্জানুভব করা যায় এমন কোন কাজ করেন নাই।

কংগ্রেসের সংবাদ

গত ২১শে সেপ্টেম্বর মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জানাইয়াছেন, যদি নিখিল

ভারত কংগ্রেস কমিটি সম্বন্ধে নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ঘোষণা প্রত্যাহৃত হয়, তবে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্য ভাগে বোম্বাই নগরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইবে।

গত ২২শে আগষ্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বিহার কংগ্রেস কার্যকরী সমিতি প্রভৃতি বিহারের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। বিহারের কেন্দ্রী সাহায্যদান ভান্ডার সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে।

বোম্বাই প্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশেও নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। বোম্বাই সরকার নাকি তাঁহাদিগের দ্বারা অধিকৃত কংগ্রেসের সকল সম্পত্তি প্রত্যর্পণের আয়োজনও করিতেছেন।

উড়িষ্যার সরকার গত ২৩শে আগষ্ট কংগ্রেস নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা প্রত্যাহার করিয়াছেন।

বাঙলা সরকারও ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারা ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা বাতিল করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি সম্বন্ধে তাহার পূর্ববর্তী ব্যবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু বাঙলায় এখনও প্রায় ৫ শত কর্মীকে নির্বিঘাতার অজুহাতে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। কংগ্রেসের কার্য ৩৬ মাস পরে পুনরায় পূর্ণোদ্যমে পরিচালন যে তাঁহাদিগের মুক্তিলাভের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিবে, তাহা বলা বাহুল্য। এখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কার্যক্রম রচনা করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

বস্ত্র সমস্যা

বাঙলা বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগ জানাইয়াছেন, আগামী ১লা অক্টোবর হইতে কলিকাতা অঞ্চলে বস্ত্র সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ বণ্টন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবে। সরকার আশ্বাস দিয়াছেন, তাঁহারা ঈদের সময় মুসলমানদিগের ও দুর্গাপূজার সময় হিন্দুদিগের বস্ত্রের প্রয়োজন অবগত আছেন। কিন্তু সরকার অবগত থাকিলেই লোকের অভাব দূর হয় না। যে বস্ত্র আছে, তাহা তো পূর্বেই বণ্টন করা চলিত—কিন্তু কেবল ছাড় প্রদানের জন্য সময় প্রয়োজন বলিয়া সেপ্টেম্বর ছাড়াইয়া বণ্টন আরম্ভ ১লা অক্টোবরে নির্ধারিত হইল। আশা করা যায়, ইহা বাঙলায় অভিনয়ের "শেষ রজনী" হইবে না। কিন্তু কলিকাতা অঞ্চল সমগ্র বাঙলা নহে। বাঙলার পল্লী-গ্রামের সংবাদ—লোক চট পরিতেছে, এক এক পরিবারে মাত্র একখানি বস্ত্র আছে, ইত্যাদি।

বন্যা

বন্যার জল কোন কোন স্থানে সরিতেছে, কিন্তু অনেক স্থান এখনও জলমগ্ন। সিরাজগঞ্জ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে —কয়দিন খাদ্যাভাবে ক্ষুধিত শৃগালের দল দরিয়াপুর গ্রামে একজন পীড়িত বৃদ্ধের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া খাইয়াছে। প্রভাতে লোক দেখিতে পায়, বৃদ্ধের মস্তকের খুলীর একাংশ মাত্র রহিয়াছে—সমগ্র দেহ শৃগাল কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে। নিম্ন ভূমি প্লাবিত হওয়ায় উচ্চস্থানের সন্ধানে বন্য-শূকর নদী পার হইয়া শহরের সান্নিধ্যে আসিয়াছে এবং ২০শে আগষ্ট বনাশূকরের আক্রমণে কয়জন নরনারীর আহত হইবার সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। সাহাজাদপুরের বাজার জলমগ্ন—লাহিড়ীমোহনপুরে রেল লাইনের উপর বাজার বসিতেছে।"

"পিপলস রিলিফ কমিটি"

"পিপলস্ রিলিফ কমিটি"—খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধের জন্য আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—বাঙলায় গত দুর্ভিক্ষের ফলে এখনও ১২ লক্ষ দুর্গত রহিয়াছে। তাহার পর এই বন্যায় আমন ধান্যের যে ক্ষতি হইল, তাহাতে সমগ্র বাঙলা বিপন্ন হইবে। বঙ্গীয় কৃষাণ সভার পক্ষ হইতেও আবেদন প্রচারিত হইয়াছে।

বন্যাপীড়িত অঞ্চলে লোককে রক্ষা করিবার জন্য কর্মীর স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাধির বিস্তার হইবে। নোয়াখালী জিলার ৭ হাজার বর্গ মাইল স্থান জলমগ্ন। বগুড়ায় কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সাহায্যদান আরম্ভ হইয়াছে।

চাউলের অবস্থা

কালনার সংবাদ (১৯শে আগষ্ট)—৬দিন হইতে বাজারে চাউল নাই। মহকুমার ২টি থানায় বৃষ্টির অভাবে আশু ধান্যের অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। লোকের কষ্টের অবধি নাই। প্রথম স্থানীয় কর্মচারীরা বলিতেছেন, সরকারের যে চাউল আছে, তাহাতে বাজার ভরিয়া দেওয়া যায়।

২০শে আগষ্টের সংবাদ, টাঙ্গাইল মহকুমার নানা গ্রামে চাউল দুষ্প্রাপ্য।

সন্দ্বীপে আমন চাউলের দাম ১৮ টাকা হইতে ২০ টাকা মণ দাঁড়াইয়াছে।

বহরমপুরেও চাউলের মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে।

একদিকে বাঙলা সরকার বলিতেছেন, চাউলের অভাব থাকা ত পরের কথা, তাঁহাদিগের এত চাউল মজুদ আছে যে, সব ব্যবহৃত হইতে পারে না—তাই, বর্ষায় নষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা অনেক চাউল বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছেন; আর একদিকে চাউলের মূল্য যুদ্ধপূর্ব হওয়া ত পরের কথা—হ্রাস পাইতেছে না, স্থানে স্থানে বাড়িয়াই চলিয়াছে।

বাঙলা সরকার এক বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন—বাঙলায় আশু ধান্যের ফলন সাধারণভাবে যেমন হয় তাহার শতকরা ৭৫ ভাগ হইবে—আর যদি এখনও বর্ষা হয়, তবে আমন ধান্যের ফলন সাধারণ ফলনের শতকরা ৮০ ভাগ হইবে। এই হিসাবের ভিত্তি কি?

কুচবিহারে সৈনিকদের অনাচার

কুচবিহার হইতে ২১শে আগষ্ট ছাত্র, ছাত্রী ও শিক্ষকদিগের প্রতি সৈনিকদিগের অনাচারের যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহাতে সমগ্র প্রদেশে বিক্ষোভ অনিবার্য। কুচবিহার রাজ্যের সেনাদিগের প্রায় একশত সৈনিক ভিক্টোরিয়া কলেজে প্রবেশ করিয়া বহু ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষককে নির্মমভাবে প্রহারে জর্জরিত করিয়াছে। কলেজের সম্মুখে ২ জন সৈনিকের সাইকেলের সহিত একজন বৃদ্ধ যাত্রীর সাইকেলের সঙ্ঘর্ষ হয় এবং সৈনিকরা বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নির্মমভাবে প্রহার করায় কয়জন ছাত্র বাহির হইয়া আসিয়া প্রতিবাদ করে। তাহারই প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহারা আসিয়া অধ্যাপককেও প্রহার করে, ২০ জন ছাত্রী আসিতেছে দেখিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে ও প্রহারে জর্জরিত করে। সৈনিকরা কলেজের ছাত্রাবাস আক্রমণ করে ও তথায় রক্তপাত করে। ২১ জন লোক সৈনিকদিগের আক্রমণে আহত হইয়াছে—১৭ জনের আঘাত অত্যন্ত অধিক। ২ জন আহত ছাত্রের অবস্থা শঙ্কাজনক। প্রকাশ, ২ জন ছাত্রকে দ্বিতল হইতে নিম্নে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কলেজের কতকগুলি মূল্যবান যন্ত্রপাতি সৈনিকরা নষ্ট করিয়াছে। "এসোসিয়েটেড প্রেসের" সংবাদ, প্রায় ৪৫ জন ছাত্র হাসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছে—তাহাদিগের মধ্যে ২ জন ছাত্রী আছে।

প্রতিবাদে কলিকাতার ছাত্রগণ ২৭শে আগষ্ট হরতাল অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এ বিষয়ে উপযুক্ত অনুসন্ধানের দাবীও করা হইয়াছে।—এ বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারকেও জানান হইয়াছে।

আসন্ন নির্বাচন—গত ২৬শে আগষ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লাহোরে এক বক্তৃতা করেন। তাহাতে বোধ হয়, ২ লক্ষ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় পণ্ডিতজী ব্যবস্থা পরিষদসমূহের আসন্ন সদস্য নির্বাচনের উল্লেখ করিয়া বলেন—

তিনি সাধারণত এইসব নির্বাচনে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন না। কিন্তু কোন কোন সময়ে তাহার গুরুত্ব দেখা যায়। আগামী নির্বাচনের ফল ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা নির্ধারণের কারণ হইতে পারে। কাজেই কংগ্রেসকে পূর্ণোদ্যমে নির্বাচনের কার্যে প্রবৃত্ত হইতে এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের বা দলের বিরোধিতা করিতে হইবে।

আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৮

শুক্রবারে রামগোপাল চাটুজ্যে আসিয়া শক্তিকে দেখিয়া বিবাহের কথা পাকা করিবার কথা ছিল, বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহরে নবগোপাল আসিয়া উপস্থিত হইল। নবগোপালকে দেখিয়া ভবতারা বলিল, "কি রে নবো, তুই আজ এলি, চাটুজ্যে মশাই কাল আসছেন ত?"

নবগোপাল মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আসবেন না। তোমার চাটুজ্যে মশায় পেছিয়েছেন।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভবতারা বলিল, "পেছিয়েছেন? কেন, পেছোবার এতে কি আছে তাঁর?"

নবগোপাল মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "কি যে বল মাসিমা, ওই খিরিষ্টান্ মেয়ে নিয়ে আমাদের মধ্যে গেরস্তো মানুষের ঘর করা কি চলে?"

নবগোপালের কথায় ভবতারা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল, "খিরিষ্টান্ কি রকম? বামুনের মেয়ে, আচার-নিয়ম মেনে চলে, আমার দেওরঝি সে হ'ল খিরিষ্টান্?"

নবগোপালের বেশ মনে আছে কতদিন শক্তি ও তাহার মাতার আচরণকে ভবতারা 'খিরিষ্টানি চাল' বলিয়া তীব্র নিন্দা করিয়াছে। সে আশা করিয়াছিল শক্তির বিষয়ে সেই আপত্তি তুলিলে ভবতারা হয়ত বিশেষ কিছু প্রতিবাদের পথ খুঁজিয়া পাইবে না,—কিন্তু এখন ভবতারাকে একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলিতে শুনিয়া সে বুঝিল যে, ইহা স্বার্থের সেই শ্রেণীর বাণী যাহা, প্রয়োজন হইলে, উত্তরকে দক্ষিণ বলিতেও দ্বিধা বোধ করে না। ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে সে বলিল, "খিরিষ্টান্ বলছি বলে কি সত্যিই খিরিষ্টান্? তা নয়। তবে ও মেয়ে আমাদের বাড়ি গিয়ে যখন ইংরিজিতে গ্যাড্ ম্যাড্ করবে তখন আমার কথা ছেড়েই দাও, তোমার চাটুজ্যে মশায়ই ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না-কি? এক সঙ্গে ঘর করছি, তোমার চাটুজ্যে মশায়ের বিদ্যে জানতে আমার ত' বাকি নেই। ঠিক দিয়ে আর সই মেরে চাকরি ক'রে এসেছেন, ইংরিজিতে একখানা চিঠি এলে চক্ষু চড়কগাছ হয়।"

অন্য সময় হইলে পিতৃ-শ্রদ্ধার এমন চমৎকার নমুনা দেখিয়া ভবতারা নিশ্চয়ই পুলকিত হইত, কিন্তু এখন তাহার মানসিক অবস্থা তিক্ত হইয়া রহিয়াছে; বিরক্তি ভরে বলিল, "বাজে বকিসনে নবো! ও আমাদের বাড়িতে ইংরিজিতে কত গ্যাট্‌ম্যাট্ করে শুনি? যখন বই পড়ে তখনো ঘাড়টি গুঁজে মনে-মনে পড়ে,—ইংরিজি পড়ছে, না বাঙলা পড়ছে তা বোঝাই যায় না, তা বলে কি-না গ্যাট্‌ম্যাট করবে।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নবগোপাল বলিল, "তুমি জানো না মাসিমা, দুষ্টু ঘোড়া আস্তাবলে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু গাড়িতে জুতলেই লাথ ছোঁড়ে। ও তোমার ভয়ে এখানে চুপ করে আছে, আমাদের বাড়ি গিয়ে ভিন্ন মূর্ত্তি ধরবে।"

ঠিক সময় মতো গিরিবালার কঠিন অসুখ হইয়া শক্তির বিবাহ-চক্রান্তে একটা অসুবিধা উপস্থিত হওয়ায় ভবতারার মনটা এমনই বিগড়াইয়া ছিল, তাহার উপর নবগোপালদের অনিচ্ছা ও আপত্তির কথা শুনিয়া সে আর মনের স্থৈর্য্য রাখিতে পারিল না; অপ্রসন্ন মুখের মধ্যে একটা কঠিন ভাব আনিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "কেউ কারো কিছু ক'রে দিতে পারে না রে নবো, সবই অদেষ্টে করে। নইলে তোর পক্ষে ত' রাজকন্যে আর অর্দ্ধেক রাজত্বই হচ্ছিল, তোদের হঠাৎ এমন দুর্মতিই বা হবে কেন? স্বয়ং মহাদেবই পারেন নি, মোহরের থলির কাছাকাছি এসে সখ ক'রে কানা হয়ে এড়িয়ে চলে গেল,—তা আমি ত' কোন ছার!"

কাহিনীটা নবগোপালের জানা ছিল না, তাই আংশিক উল্লেখে ঠিক মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিল না। বলিল, "কানা-খোঁড়ার কথা জানিনে মাসিমা, কিন্তু ও যা বলেছ লাক কথার এক কথা! অদেষ্টে না থাকলে কিছুতেই হবার যো নেই।"

নবগোপালের সহিত কোন বিষয়েই মতের ঐক্য বরদাস্ত করিবার মতো তখন ভবতারার মনের অবস্থা নহে,—ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "অদেষ্টে আবার কি! আমি চতুর্দ্দিক আট-ঘাট বেঁধে সমস্ত ঠিক করলাম, তোরা ইচ্ছে ক'রে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলবি তার অদেষ্টো!"

নবগোপালের একবার ইচ্ছা হইল বলে, লক্ষ্মী যদি স্বয়ম্বরা হইয়া পূর্ব্বাহ্নেই আপনার নারায়ণ আপনি নির্ব্বাচিত করিয়া রাখেন ত' তাহার পক্ষে অদৃষ্ট শুধু নয়, দুরদৃষ্ট। কিন্তু শক্তির নিকট তাহার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়া সে কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। যে দুঃখ তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো এখনো তাহার মনের মধ্যে বিঁধিয়া আছে তাহাকে এমন অবলীলার সহিত অস্বীকার করিবার অভিনয়ের দুঃখে তাহার মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

ভবতারা গজর গজর করিয়া বলিতে লাগিল, "হ'ল না ভালই হয়েছে। ওর মা ত' শুস্‌ছে—মরণ-বাঁচন যা হয় একটা কিছু হয়ে যাক, তারপর রূপে-গুণে অমন মেয়ের আবার ভাবনা! কত পাশকরা ছেলে লুপে নিয়ে যেতে চাইবে। মার হাতে টাকাটাই কি কম?—এক-একটা গয়না ভারি কত—"

গিরিবালার গহনার ওজনের পরিমাণের বিষয়ে নবগোপালের মনে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য ছিল না। জমিদারিই যখন দখলে আসিল না তখন জমিদারির অন্তর্গত জমি-জমার সংবাদ জানিয়া লাভ কি? ভবতারাকে গিরিবালার গহনার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ দিতে না দিয়া ব্যগ্রভাবে বলিল, "গিরিমাসির মরণ-বাঁচন কি বলছ মাসিমা? অসুখ না-কি তাঁর?"

"রাত কাটে ত' দিন কাটে না এম্‌নি অবস্থা, তা বলে কি-না অসুখ না-কি তার!"

"কি অসুখ হয়েছে?"

"সে তুই ইচ্ছে হয় কবরেজকে জিজ্ঞেস করিস, আমি অত বিত্তান্ত জানিনে। আমি শুধু জানি, সে মরতে বসেছে।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবগোপাল বলিল, "দেখ দেখি মাসিমা, এই বিপদের বাড়িতে বাবাকে তুমি আনাচ্ছিলে বিয়ের কথা পাকা করবার জন্যে! কি বিচ্ছিরি দেখতে হ'ত বল ত?"

ভবতারা বলিল, "সে আমার দেওরঝি, আমি বুঝতুম। মেয়ের বিয়ের আবার বিপদ-অবিপদ! মা মারা যাবার এক মাসের মধ্যে তেরোটা মাসিক আর সপিণ্ডীকরণ ক'রে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে,—আর এ ত' এখনো নড়চে চড়চে।"

আর কোন কথা না বলিয়া নবগোপাল উঠিয়া পড়িল। তাহার অশিক্ষিত অমার্জিত মনের কোনখানে এমন একটা বিরোধ দেখা দিয়াছিল যাহাতে ভবতারার সহিত আর কথোপকথন চালাইতে ইচ্ছা হইল না।

গিরিবালার কক্ষে উপস্থিত হইয়া নবগোপাল যাহা দেখিল, তাহাতে বুঝিল সত্যই মরণ-বাঁচনের সমস্যা। দুইটা বালিসের উপর মাথা রাখিয়া গিরিবালা অর্ধশায়িত অবস্থায় চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে; দেহ শীর্ণ; চক্ষু বসিয়া গিয়াছে; চোখের কোলে ঘন কালির ছাপ; প্রত্যেকটি নিঃশ্বাস চেষ্টার দ্বারা পরিশ্রম করিয়া লইতেছে এবং ফেলিতেছে, তাহার সংখ্যা শুধু বক্ষের উত্থান পতন দেখিয়াই গোণা যায় না, পিছন ফিরিয়া থাকিলেও এক-একটি পৃথক ভাবে শোনা যায়; সমস্ত মুখমণ্ডলে পরিপূর্ণ অবসাদের এমন একটা মলিন বিবর্ণতা যে দেখিলেই আশঙ্কা হয় জীবন-সূর্য বুঝি অস্তাচলেরই দিকে দ্রুত চলিয়া পড়িতেছে। ত্রস্ত উদ্বিগ্নমুখে মাথার শিয়রে বসিয়া শক্তি ধীরে ধীরে হাওয়া করিতেছিল।

শয্যার নিকট গিয়া নবগোপাল বলিল, "এই সেদিন দেখে গেলাম ভাল আছেন, এরই মধ্যে এত অসুখ?"

শক্তি বলিল, "আপনি যেদিন এসেছিলেন সেই দিন থেকেই অসুখ। আজ পাঁচ দিন।"

গিরিবালা চোখ বুজিয়া ছিল, কথার শব্দে চাহিয়া দেখিল। নিশ্বাসটা একটু সামলাইয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "নবগোপাল এসেছ?"

তাড়াতাড়ি আরও নিকটে গিয়া নবগোপাল শক্তির হাত হইতে পাখা টানিয়া লইয়া হাওয়া করিতে করিতে বলিল, "কথা কোয়োনা মাসিমা, তোমার কষ্ট হবে।"

গিরিবালার মুখে ক্ষীণ হাসি দেখা দিল; কিন্তু সে হাসি দেখিলে মনে আশার সঞ্চার হয় না, সে হাসির মধ্যে অস্তগামী সূর্যের আভা। নাড়িয়া চাড়িয়া একটু পাশ ফিরিয়া শ্রান্তকণ্ঠে গিরিবালা বলিল "কষ্টের পালা শেষ হ'য়ে এসেছে বাবা, এবার কষ্টের অবসানই হবে। কিন্তু দুঃখ রয়ে গেল, যাবার আগে অশোকের সঙ্গে একবার দেখা হ'ল না। হ'লে বোধ হয় মেয়েটার একটা গতি করে যেতে পারতাম।"

শক্তির দিকে চাহিয়া নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "অশোক কে?" তাহার পর সহসা কি মনে পড়িয়া এবং কি মনে করিয়া কণ্ঠস্বর ঈষৎ চাপিয়া লইয়া বলিল, "সেই পাশকরা পাত্তোর না-কি?"

গিরিবালার সম্মুখে সহসা নবগোপালের এই প্রশ্নে এবং সে প্রশ্নের সমাধান অভিপ্রায়ে তাহার পরবর্তী মন্তব্যে শক্তির মুখ লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

উত্তর দিয়া নিরস্ত না করিলে পাছে নবগোপাল প্রশ্নের পুনরুক্তি করিয়া বসে এই আশঙ্কায় মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে জানাইল, হ্যাঁ সেই বটে।

ইঙ্গিতের মর্ম উপলব্ধি করিয়া বিস্ময়ে নবগোপালের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। পূর্ববৎ চাপা গলায় কিন্তু কিছু উত্তেজিত স্বরে বলিল, "তবে যে সেদিন বললে, বিয়ের কথা পাকাপাকি হ'য়ে আছে?"

যে উদ্দেশ্যে কণ্ঠস্বর চাপা করা তাহা শুধু এবারই ব্যর্থ হয় নাই, পূর্ববারও হইয়াছিল; অর্থাৎ গিরিবালা নবগোপালের সমস্ত কথাই শুনিতে পাইয়াছিল, অধিকন্তু এ কথাও বুঝিয়াছিল যে, নবগোপালের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে পূর্বদিন শক্তি তাহাকে নিশ্চয়ই জানাইয়া থাকিবে যে, অশোকের সহিত তাহার বিবাহের কথা পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে। বিপন্না কন্যাকে তাহার বিমূঢ় অবস্থা হইতে উদ্ধারের জন্য সে বলিল, "বিয়ের কথা পাকাপাকিই হ'য়ে আছে বাবা, তবে আর একবার ভাল করে মোকাবিলা করে নিতে পারলে নিশ্চিন্ত হতাম।"

গিরিবালার কথা শুনিয়া নবগোপালের মুখমণ্ডল নিরুদ্বেগ হইয়া গেল; বলিল, "আর মোকাবিলা কেন মাসিমা, এই আষাঢ় মাসেই পাঁচসাত দিনের মধ্যে একেবারে বিয়ে দিয়ে দাও।" তাহার পর কণ্ঠস্বর পুনরায় চাপিয়া লইয়া শক্তির দিকে চাহিয়া বলিল, "মাসীমার এত অসুখ হ'লে কি হয়? কান খুব! সমস্ত কথা শুনতে পেয়েছে।"

বলা বাহুল্য এ কথাও গিরিবালার শ্রুতি-শক্তিকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইল না। কিন্তু এ বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া নবগোপালের প্রকাশ্য কথাটুকুর উত্তরে বলিল, "এত শীগ্‌গির বিয়ে হ'য়ে উঠবে না বাবা, অশোকের বাপ বেঁচে আছেন, তিনি তাঁর সুবিধে মতো দিন স্থির করবেন।"

"তবে পাত্তোরের ঠিকানা দাও, আমি তাকে ধরে নিয়ে আসি।"

গিরিবালা বলিল, "অত কষ্ট ক'রে তোমার কাজ নেই নবগোপাল, সে আমাদের চিঠি পেলেই আসবে। তুমি যদি আমাদের চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলে দাও তা হ'লে খুব উপকার হয়। এর আগে একখানা চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু সে বোধ হয় ডাকে পড়তে পারেনি বলেই উত্তর আসে নি।"

তিনি শিবানীপুর হইতে ক্রোশখানেক দূরে একটা গ্রামে সপ্তাহে তিন দিন হাট বসে—সেখানে চিঠির বাক্স আছে।

উৎসাহ ভরে নবগোপাল বলিল, "কই, চিঠি দাও। ডাকবাক্সে নয়, আমি একেবারে খলসেখালীর ডাকঘরে ছেড়ে দেবো।"

"সে যে অনেকখানি পথ বাবা।"

"হোক না অনেকখানি পথ, তোমার বোনপোর পায়েও চাকা লাগানো আছে।" বলিয়া নবগোপাল হাসিতে লাগিল। তাহার পর সহসা হাসি বন্ধ করিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া চাপা গলায় বলিল, "আজ ভবতারা মাসিকে জানিয়ে দিলাম যে, তোমার সঙ্গে বিয়েতে আমাদের মত নেই। ওরে বাবা, চটে একেবারে লাল! বলে, তোদের অদৃষ্টে নেই তাই অমন লক্ষ্মী পিরিতিমে হাতে পেয়ে পায়ে ঠেলি।" তাহার পর ক্রম-বর্ধমান কণ্ঠস্বরে বলিতে লাগিল, "গিরি-মাসিকে সব কথা বলব শক্তি? অ্যাঁ, বল না, বলব?"

অভিনয়ের সরলতায় এবং কৌতুকাবহতায় গিরিবালা এবং শক্তি উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। গিরিবালা বলিল, "বলবার দরকার নেই নবগোপাল, আমি সমস্ত বুঝতে পেরেছি। তুমি অতি সৎ ছেলে, আশীর্বাদ করি তুমি সব রকমে সুখী হও।" তাহার পর শক্তিকে বলিল, "শক্তি, ঠিকানা লিখে চিঠিখানা নবগোপালকে এনে দে।"

নবগোপাল বলিল, "পাত্তোরের কি নাম বললে? অশোক?"

"হ্যাঁ, অশোকনাথ বাঁড়ুজ্যে।"

"থাকে কোথায়?"

"কলকাতায়।"

মনে মনে কি হিসাব করিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া নবগোপাল বলিল, "তা হ'লে লিখে দাও রোববার সন্ধ্যে বেলা যেন সাতক্ষীরেয় এসে পৌঁছোয়। আমি সাতক্ষীরেতে হাজির থেকে তাকে শিবানীপুরে পৌঁছে দিয়ে দূরে থেকে স'রে পড়ব।"

গিরিবালার চক্ষু কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "এ তুমি পারবে নবগোপাল?"

কতকটা দর্পের সহিত নবগোপাল বলিল, "খু-উ-ব।"

গিরিবালা বলিল, "তবে তাই লিখে দে শক্তি, তা হ'লে তার আসতে কোনো অসুবিধে হবে না।" তারপর নিম্নকণ্ঠে কতকটা আপনার মনে মনে বলিল, "রবিবার?—তা হোক, সে পর্যন্ত কোনো রকমে টেঁকে থাকতেই হবে।"

নবগোপাল বলিল, "তুমি চিঠি লিখে ঠিক ক'রে রাখ শক্তি, আমি ভবতারা মাসির সঙ্গে কথা কয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।" বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নবগোপাল প্রস্থান করিলে গিরিবালা বলিল, "কয়লার মধ্যে হীরে লুকিয়ে থাকে শুনেছি,—নবগোপালের মধ্যেও তাই দেখতে পাচ্ছি শক্তি।"

শক্তি বলিল, "সে হয়ত আমিও দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তুমি অনেক কথা কয়েছ মা, —হাঁপাচ্ছো। আর কথা কয়োনা, স্থির হয়ে শুয়ে থাক।" বলিয়া অশোককে লেখা চিঠিখানা বাহির করিয়া প্রয়োজনীয় কথাটুকু লিখিতে বসিল।

(৯)

কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে একটি পরিচ্ছন্ন গৃহ ভাড়া করিয়া অশোক আইন অধ্যয়ন করে। তাহার পিতা যাদবচন্দ্র

ন্দ্যাপাধ্যায় বাজিতপুর পরগণার চার নার মালিক। মামলামোকর্দমা এবং ত্তরাধিকার অস্ত্রের আঘাতে অপর বারো না অংশ খণ্ড খণ্ড হই প্রায় লয় ইয়াছে। দৈবক্রমে যাদবচন্দ্রে চার আনা শ উপর্যুপরি কয় পুরুষ অবিভক্ত চলিয়া সায় বাৎসরিক তহশিল এখনো বাইশ জার টাকার নীচে নামে নাই। অশোক-ও পিতার একমাত্র পুত্র; সুতরাং বর্তী পুরুষেও চার আনা অংশের চার না থাকিবারই সম্ভাবনা আছে। সম্ভাবনা জন্য বলিলাম যে, ভাগবাটরাই সম্পত্তির মাত্র শত্রু নহে।

যৌবনকালে যাদবচন্দ্রের পত্নী বিয়োগ । তখন অশোকের বয়স মাত্র চার বৎসর ং দুই কন্যার বয়স সাত এবং দুই। রীর মৃত্যুর পর যাদবচন্দ্রের দূরে সম্পর্কীয় ত্মীয় এবং শুভানুধ্যায়ীরা পুনরায় হ করিয়া লক্ষ্মীহীন গৃহে লক্ষ্মী তষ্ঠা করিবার জন্য যাদবচন্দ্রকে কিছুদিন রোধ অনুরোধ করিয়াছিল। যাদবচন্দ্র ন্তু সে সদুপদেশের প্রতি কিঞ্চিদপি দ্ধা না দেখাইয়া একান্ত আগ্রহের সহিত হীন পুত্রকন্যাদের লালন-পালন ও ক্ষাদানের প্রতি মনোনিবেশ করে। অগত্যা ভভাষী গম্ভীর-প্রকৃতি যাদবচন্দ্রকে রোধ উপরোধের দ্বারা বারম্বার উত্যক্ত রতে সাহস না পাইয়া শুভানুধ্যায়ীর দল ন ছাড়িয়া দেয়। সে আজ প্রায় বিশ রের কথা।

গ্রামের হাই স্কুল হইতে অশোক প্রবেশিকা শ করিলে যাদবচন্দ্র তাহাকে লইয়া লকাতায় বাড়ি ভাড়া করিয়া তিন বৎসর য় বাস করে। মহলে সেটলমেন্টের জ আরম্ভ হইয়াছিল। একজন অবিশ্বাসী লোর যোগসাজসে সাড়ে সাত পাই অংশের স্বত্বাধিকারী কিছু কিছু সুবিধা রয়া লইতেছিল সংবাদ পাইয়া যাদবচন্দ্র শাকের তত্ত্বাবধানের ভার একজন প্রবীণ মস্তার উপর দিয়া ব্যস্ত হইয়া দেশে রিয়া যায়। তখন অশোক প্রেসিডেন্সী লেজে বি এ পড়িতেছে। তাহার পর, রও তিন বৎসর উক্ত গোমস্তার তত্ত্বাবধানে লকাতায় থাকিয়া অঙ্কশাস্ত্রে এম এ পাশ রয়া সে কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া শ গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। যাদব-দ্রের ইচ্ছা ছিল অশোক আইন পরীক্ষা শ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী সায় আরম্ভ করে। অশোকের কিন্তু সে ক একেবারেই প্রবৃত্তি ছিল না; পরন্তু কশাস্ত্রের প্রতি এমনই প্রবল আসক্তি ছিল সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী এম এ পাশ রবার পর তাহার নিকট চিরবিদায় না য়া সে সর্বদা কলিকাতা এবং লণ্ডন তে অঙ্ক শাস্ত্রের বিষয়ে নূতন নূতন ঠন কঠিন পুস্তক আনাইয়া তন্মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া থাকিত। গণিত শাস্ত্রের পরাবিদ্যার প্রতি পুত্রের এই অত্যুগ্র আকর্ষণ দেখিয়া যাদবচন্দ্র সন্তুষ্ট হইল না; সে বুঝিল, যে বিষয়-সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য শুভঙ্করীর সাধারণ বিদ্যাই শুভকর, তাহার পক্ষে ইহা মশা মারিতে কামান দাগার মতো শুধু নিষ্প্রয়োজনই হইবে না, ক্ষতিজনকও হইতে পারে। সুতরাং ইহা হইতে পুত্রের মনকে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে সে অশোকের নিকট দুইটি প্রস্তাব উত্থাপিত করিল,—প্রথম বিষয়-সম্পত্তি বুঝিয়া-সুঝিয়া লওয়া এবং দ্বিতীয়, বিবাহ করা। কারণ দেখাইল,—প্রধানত যে দুইটি বিষয়ের উপর মানুষের সুখদুঃখ নির্ভর করে. পিতার পরিণত বয়সের বুদ্ধি-বিবেচনার সহায়তায় সেই ঐশ্বর্যলক্ষ্মীকে আয়ত্ত করিতে এবং গৃহলক্ষ্মীকে লাভ করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে, যেহেতু মানুষের অনিশ্চিত আয়ু পঞ্চাশের কাছাকাছি হইতে একদিকে বিশেষভাবে নিশ্চিত হইয়াই আসে।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটির বিষয়-বস্তুর মধ্যে এমন একটু জটিলতার সংযোগ ছিল যে, কেবলমাত্র পিতার পরিণত বয়সের বুদ্ধি-বিবেচনাই তাহার সমস্যা মোচন করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং দ্বিতীয় প্রস্তাব হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য পিতার প্রথম প্রস্তাবটিকে উপেক্ষা করা অশোক সমীচীন মনে করিল না; ঐকান্তিক মনোযোগের সহিত সে বিষয়-সম্পত্তি দেখিতে লাগিল। অতি অল্পকালের মধ্যেই জমা-ওয়াশীল, রেকর্ড, খতিয়ান, সেহা প্রভৃতির মর্ম সে বুঝিয়া লইল; সুযোগমত নায়েব ও গোমস্তাকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত মহল পরি-দর্শন করিয়া আসিল। খাস জমীর উৎপন্ন ফসল, মজুদমাল ও বিক্রয়বাটা মোকাবিলা করিল এবং বিচারের সহিত বদান্যতা যুক্ত করিয়া প্রজাদের জমিজমা সংক্রান্ত অভি-যোগ-অনুযোগ-উপরোধ-অনুরোধের নিষ্পত্তি আরম্ভ করিল।

যাদবচন্দ্র দেখিল, পুত্রের গণিতশাস্ত্রের পরাবিদ্যা একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। অশিথিল নিয়মাবলীর সাধনায় সুনির্ণীত বুদ্ধি বিষয়-বুদ্ধিকে ব্যাহত না করিয়া নিপুণই করিয়াছে। তখন সে তাহার প্রথম প্রস্তাবটির বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া স্পষ্টতর-ভাবে পুনর্বার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি উত্থাপিত করিল। একদিন অশোককে একান্তে ডাকাইয়া বলিল, "মনে করছি মাঘ মাসে তোমার বিয়ে দোব। নিরঞ্জনপুরের জমিদার ভুবনমোহন চক্রবর্তী তোমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে উৎসুক। মেয়েটি পরমা সুন্দরী,—দেখে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি সেখানে কথা দিয়েছি।"

শুনিয়া অশোক বিপদ গণিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, "মনে করছিলাম ওকালতিটা প'ড়ে ফেলি।"

যাদবচন্দ্র বলিল, "বেশ ত, বিয়ে ক'রেও ত' ওকালতি পড়তে পার।"

উত্তরে কিছু না বলিয়া অশোক নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

আরও দুই-একটা কথা বলিয়াও যাদবচন্দ্র অশোকের নিকট হইতে কোন উত্তর পাইল না। এই সুনিবিড় মৌনকে কিন্তু সম্মতির লক্ষণ বলিয়া তাহার মনে হইল না; বলিল, "আচ্ছা, এখন যাও, পরে ভেবে দেখা যাবে।"

একজন মধ্যস্থের মারফৎ কয়েকদিন পরে পিতাপুত্রের মধ্যে যে কথাবার্তা হইল, তাহার ফলে যাদবচন্দ্র কলিকাতায় একজন কর্মচারী পাঠাইয়া সিমলা অঞ্চলে একটি বাসা স্থির করিল; তৎপরে একটি শুভদিন দেখিয়া আইন পড়িবার জন্য অশোককে তথায় পাঠাইয়া দিল। এবার সঙ্গে গেল সংসারের একজন পাচক ব্রাহ্মণ এবং পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য বিনোদ। বিবাহ বিষয়ে পুত্রের আপত্তিতে মনে মনে ঈষৎ ক্ষুব্ধ হইলেও ওকালতি পড়া হইবে বলিয়া যাদবচন্দ্র মোটের উপর সন্তুষ্টই হইয়াছিল, বিশেষত ভুবন চক্রবর্তী বলিয়া পাঠানোয় যে অশোকনাথের আইন পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে তাহার কোন আপত্তি হইবে না।

প্রথমবারকার কলিকাতা যাপনের সময়ে অশোকের বাসা ছিল শক্তিদের বাড়ির ঠিক পাশেই। উভয় গৃহের গৃহস্বামীর মধ্যে কোন পরিচয়ই ছিল না। হঠাৎ একদিন দুই বাড়ির চাকরদের মধ্যে সামান্য একটা কারণে বচসা হইতে হইতে মারামারি এবং রক্তপাত হইয়া যায়। ব্যাপারটার এইখানেই সমাপ্ত না হইয়া অশোকের তত্ত্বাবধায়ক যদু গোমস্তার কল্যাণে এক নম্বর ফৌজ-দারীতে গিয়া উপনীত হয়। সে-সব কথার বিস্তারিত উল্লেখের কোনও প্রয়োজন নাই. কিন্তু এই বিরোধের সূত্র অবলম্বন করিয়াই অচিরে দুইটি গৃহ সুনিবিড় সৌহার্দ্যে আবদ্ধ হয় এবং সেই সৌহার্দ্য যে একদিন নিবিড়তর আত্মীয়তায় পরিণত হইবে, এইরূপ একটা অকথিত কথা উভয় পক্ষেরই মনে মনে ক্রমশ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। তাই বৎসর দুই পরে হরিপদর মৃত্যুর পর কলিকাতা ত্যাগ করিবার সময়ে অশোকের হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিরিবালা যখন বলিয়াছিল, "বাবা অশোক, অভাগিনী শক্তিকে ভুলো না,—তোমার পায়ে স্থান দিয়ো। নইলে সে মরে যাবে।" তখন অশোক তৎকালীন উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া প্রতিশ্রুতিই দিয়াছিল।

সে ঘটনার পর চার বৎসর অতীত হইয়াছে।

প্রথমে উভয়পক্ষের মধ্যে নিয়মিত চিঠি-পত্র চলিত; কিন্তু কালক্ষয়ের সহিত, প্রধানত অশোকের দিক হইতে উৎসাহের ক্ষয়শীলতার জন্য, তাহা অনেক কমিয়া আসিয়াছে এবং অশোকের মনের মধ্যে তাহার প্রতিশ্রুতি ক্রমশ বেগ হারাইয়া হারাইয়া উপস্থিত এইরূপ একটা ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছে,—শক্তিকে বিবাহ করিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিব, কিন্তু যদি তাহা কোনরূপে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে একান্তই যদি কখনো করি, তাহার বিবাহের পূর্বে কখনই নিজে বিবাহ করিব না। সারবস্তুতে-দরিদ্র অনুর্বর ভূমিতে একটি লতা রোপণ করিলে যে অবস্থা লতার হয়, সহৃদয় কিন্তু দুর্বল প্রকৃতি অশোকের মনের মধ্যে তাহার প্রতি-শ্রুতির অনেকটা সেই অবস্থা।

যাদবচন্দ্র যখন ভুবন চক্রবর্তীর কন্যার সহিত তাহার বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিল, তখন শক্তিদের কথা খুলিয়া বলিতে একবার অশোকের ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সাহসে কুলায় নাই। প্রধানত এই ভয়ই হইয়াছিল যে, সে কথা তখন তুলিলে হয়ত' চিরকালেরই জন্য তাহার সমাধিলাভ ঘটিবে। একটা সুযোগের প্রত্যাশায় সে অপেক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু সে সুযোগ যে কোন্ ঘটনার মধ্যে কোন্ মূর্তি ধরিয়া কবে উপস্থিত হইবে তাহার কোন ধারণাই তাহার ছিল না।

সেদিন শনিবার। বৈকালে অশোক মাঠে খেলা দেখিতে গিয়াছিল। মাঠ হইতে যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। হাত মুখ ধুইয়া টেবিলের সম্মুখে বসিয়া সে ডাকিল, "বিনোদ!"

অন্তরাল হইতে বিনোদ বলিল, "দাদা-বাবু?"

"চা দিয়ে যা।"

অশোক আসিবামাত্র বিনোদ চায়ের জল চড়াইয়া দিয়াছিল, অনতিবিলম্বে চা ও খাবার লইয়া সে উপস্থিত হইল। টেবিলের উপর পেয়ালা ডিশগুলা স্থাপন করিয়া একটা বইয়ের তলা হইতে একখানা খাম বাহির করিয়া অশোকের হাতে দিয়া বলিল, "একটা চিঠি আছে দাদাবাবু।"

হাতের লেখা দেখিয়াই অশোক বুঝিল শক্তির চিঠি। বলিল, "কখন্ এল?"

বিনোদ বলিল, "আপনি বেরিয়ে যাবার আধ ঘণ্টাটাক পরে। কোথাকার চিঠি দাদাবাবু? বাড়ির?"

"না, বাড়ির নয়।"

চলিয়া যাইতে যাইতে বিনোদ নিজ মনেই বলিতে লাগিল, "বাড়ির চিঠি ত' সবে কাল এসেছে, এর মধ্যে আবার আসবে কেন? আমার জিজ্ঞেস করাই ভুল।"

চিঠি খুলিয়া পড়িয়া দেখিয়া অশোকের মন প্রথমটা দুঃখে এবং সমবেদনায় বিচলিত হইয়া উঠিল; তাহার পরই কিন্তু দ্রুত-গতিতে একটা বিরক্তি আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতে লাগিল। এ কি উৎপীড়ন! এ কি অত্যাচার! এই জল-বৃষ্টি কাদার মধ্য দিয়া মনুষ্যের অগম্য সেই স্থানে যাইতে হইবে? এত বড় দায়িত্ব সে কোথায় লইয়াছিল যে, এত কঠিন কর্তব্য তাহাকে করিতেই হইবে। সহসা মনে পড়িয়া গেল সে দিনের কথা যেদিন শক্তিকে বিবাহ করিবে বলিয়া সে গিরিবালাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। কিন্তু সে কি একান্তই নিজের ইচ্ছায়? অমন করিয়া হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া যে-কথা আদায় করা যায় তাহার মূল্য কতটুকু? কান্নাকাটির পরিবর্তে ছোরাছুরি দেখাইয়াও ত' ও-কথা আদায় করা যাইতে পারিত। তবে?—

আর একবার পাঠ করিয়া অশোক চিঠি-খানা টেবিলের উপর স্থাপন করিল। চিঠি পড়িলে কিন্তু যাইতে ইচ্ছা করে। সামান্য কথা, সরল ভাষা,—কিন্তু কি যে তাহার আকর্ষণ!

দুই হাতে দুই কপাল টিপিয়া ধরিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অশোক চিঠিখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

পেয়ালার মধ্যে চা ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইতে লাগিল।

১০

রবিবারের সন্ধ্যা। বাস হইতে অবতরণ করিয়া অশোক নবগোপালের প্রত্যাশায়

ইতস্তত নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময় নিকষ-কৃষ্ণ একটি যুবক (বলা বাহুল্য নবগোপাল) তাহার সম্মুখীন হইয়া পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া অস্পষ্ট আলোকে চোখের অতি নিকটে ধরিয়া প্রশ্ন করিল, "অশোক বাড়ুজ্যে ত'?"

মাথা নাড়িয়া স্বীকৃতিসূচক কণ্ঠে অশোক বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, অশোক বাড়ুজ্যে।"

সেইভাবেই কাগজের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া নবগোপাল জিজ্ঞাসা করিল, "বাপের নাম?"

প্রশ্নকারীর ভঙ্গিমা দেখিয়া অশোকের মুখে মৃদু হাস্য স্ফুরিত হইল; বলিল, "শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

কাগজখানা পকেটের ভিতর রাখিয়া অশোকের প্রতি নিশ্চিন্ততার প্রসন্ন দৃষ্টি ফেলিয়া নবগোপাল বলিল, "ঠিক ধরেছি। অথচ তোমার আগে আর কাউকে শুধোইনি, পয়লা নম্বর তোমাকেই শুধিয়েছি। আচ্ছা, কি ক'রে ধরলাম বল দেখি?"

নবগোপালের এই অতিঘনিষ্ঠতাশোভন অসঙ্কোচ কথোপকথনের ভঙ্গী দেখিয়া এবং অবলীলার সহিত তুমি সম্বোধন শুনিয়া অশোক ঈষৎ বিস্মিত হইল। কিন্তু সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করিয়া বলিল, "বোধ হয় অনুমানে।"

সমস্যা সমাধানে অশোকের অপটুত্ব দেখিয়া নবগোপালের মনে পুলকের সঞ্চার হইল। মৃদুস্মিত মুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "অনুমানে নয়,—আন্দাজে।"

শুনিয়া অশোক হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "বুঝতে পারিনি নবগোপাল বাবু, আমি ভেবেছিলাম অনুমানে।"

অশোকের কথা লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে নবগোপালের চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। বলিল, "এই সেরেছে! বলে নবগোপাল বাবু! তুমিও আমাকে চিনেছ না কি তা হ'লে?"

অশোক বলিল, "চিনেছি। কিন্তু আমি চিনেছি আন্দাজে নয়, অনুমানে।"

"তা হবে।" বলিয়া নবগোপাল ফস্ করিয়া এক ঝলক আলগা হাসি হাসিয়া লইল। সকলের অদৃষ্ট ত' সত্যসত্যই এক না হইতেও পারে।

ক্ষণকাল হইতে আকাশের অবস্থা ভীতি-প্রদ হইয়াছিল। এখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ঊর্ধ্বে চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালিত করিয়া অপ্রসন্ন কণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "নাঃ, আজ দেখচি অদিষ্টে ভোগান্তি আছে।" তাহার পর অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এখন কি করবে অশোক বাবু, বল? এই বিষ্টি-বাদলায় দুয্যুগে এখনি শিবানীপুর যাবে; না, আজকের রাতটা সাতক্ষীরেয় কাটিয়ে শেষ রাত্রে রওনা দেবে?"

আকাশের মলিন অবস্থা দেখিয়া এবং আসন্ন রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকারের বিভীষিকা কল্পনা করিয়া অশোকের মন তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। একবার ভাবিল শিবানীপুরে গিয়া আর কাজ নাই, সাতক্ষীরা হইতেই কলিকাতায় ফিরিয়া যায়। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের বাস ছিল না; তদ্ভিন্ন এতখানি পথ আসিয়া সামান্যর জন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইলে ব্যাপারটা দেখিতে শুনিতে কিছু লজ্জাজনক হইবে ভাবিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক বলিল, "না, এখানে আর বিলম্ব ক'রে কাজ নেই, আজই শিবানীপুর যাওয়া যাক।"

নবগোপাল বলিল, "তা চল, কিন্তু একটু কষ্ট হবে ভায়া। আগেভাগেই কিন্তু সে কথা তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।"

"কেন, কতক্ষণ সময় লাগবে যেতে?"

"তা ধর, তিন কোশ পাকা শড়কে গরুর গাড়িতে যেতে কোন্-না দুঘণ্টা পোনে দুঘণ্টা লাগবে; তারপর এক কোশ কাঁচা রাস্তা এই জলকাদায় পা টিপে টিপে যেতেও ঘণ্টা দেড়েকের কম লাগবে না। তাহ'লেই শিবানীপুর পৌঁছতে রাত্রি সাড়ে বারোটা একটা হ'ল না?"

মনে মনে দ্রুতবেগে হিসাব করিয়া লইয়া অশোক দেখিল কোনো মতেই তাহা হইল না, নবগোপালের ফর্দমতো সাড়ে বারটা একটার ঘণ্টা দুয়েক পূর্বেই পৌঁছানো যায়। কিন্তু সে কথা লইয়া তর্ক করিয়া কোনো লাভ নাই, যেহেতু যথার্থ গুরুতর আপত্তি অন্য দিকে দেখা দিয়াছে। বলিল, "কাঁচা রাস্তায় গরুর গাড়ি যাবে না?"

অশোকের কথা শুনিয়া নবগোপাল পুনরায় হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "যাবে না কেন, গরুর পিঠে গাড়ি চড়ালে যাবে। এ কি তোমার কলকাতার বিডন ইস্টিরিট রে ভাই, যে পা ফেললাম কি দুমদাম ক'রে চ'লে গেলাম? এমন ভীষোণ কাদা যে, জুতো হাতে ক'রে পা টেনে তুলে তুলে চলতে হয়।"

কাঁচা রাস্তার বিবরণ শুনিয়া অশোকের পিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। রাগ প্রকাশটা ঠিক কোন্ দিক দিয়া করিবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া মুখ বিকৃত করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "এই যে বললেন পা টিপে টিপে চল্‌তে হয়?"

নবগোপাল বলিল, "তা ত' নিশ্চয়ই হয়। যেখানে পেছোল সেখানে পা টিপে টিপে যেতে হয়, আর যেখানে কাদা সেখানে পা টেনে তুলে তুলে চলতে হয়। কিন্তু তাই কি আমি চেষ্টা করতে কসুর করেছি রে দাদা! তুমি জমিদারের ছেলে, চারটে পাশ দিয়েছ, দুদিন পরে বোনাই হ'তে চলেছ, তোমাকে কি সাধ ক'রে কাদার ওপর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে পারি! পাল্কীর জন্যে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু দু-দুটো পাল্কীর একটাও পেলাম না। এই তল্লাটের মধ্যে একেবারে তিন চারটে বিয়ে লেগেছে, দুটো পাল্কীই কন্‌ট্র্যাক্টো হ'য়ে গেছে।"

চিন্তিত মুখে অশোক বলিল, "তা হ'লে হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "না, তা নেই। কিন্তু আমি বলি কি অশোকবাবু, এই বর্ষা-বাদলে আজ শিবানীপুরে গিয়ে কাজ নেই। শুধু ত' কাদা আর পেছলই নয়, আরও ভয় আছে।"

"আবার কি ভয় আছে?"

"কি নেই বল? সাপ আছে, বেঙ আছে, —কুকুর আছে, শেয়াল আছে। ন' মাসে ছ' মাসে ঠেঙ্গাড়েও যে থাকে না এমন নয়। তা ছাড়া, আর যা আছে তা এই রেতের মুখে—"

নবগোপালকে বাধা দিয়া অশোক বলিল, "থাক্, থাক্, আর আপনাকে বেশি ফিরিস্তি দিতে হবে না, যা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। এখন দয়া ক'রে রাতটা বাসে শুয়ে কাটানোর ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন?"

সবিস্ময়ে নবগোপাল বলিল, "বাসে শুয়ে কি হবে?"

"কাল সকালে আমি কলকাতায় ফিরে যাব।"

অশোকের কথা শুনিয়া নবগোপাল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "শহরের লোক, পাড়া-গাঁ দেখে একেবারে চক্ষু চড়ক-গাছ! কিছু ভয় নেই রে ভাই, কাল সকালে দিনের আলো দেখে খুব ভরসা পাবে। এখন রাতটা কোথায় কাটাবে বল? মদনের দোকানে, না তালুই মশায়ের বাড়ি?"

তালুই মশায়ের গৃহে যথোচিত আদর-আপ্যায়নের বিষয়ে নবগোপালের মন বোধ হয় সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ছিল না; বলিল, "তালুই মশাই বললাম বলে কিন্তু আমার আপন তালুই মশাই মনে করো না,—দূর সম্পর্কের।"

দূর-সম্পর্কের ত' দূরের কথা, আপন তালুই মহাশয়ের গৃহ হইলেও অশোক লুব্ধ হইত না। বলিল, "মদনের দোকানে চা পাওয়া যাবে?"

উচ্ছ্বাসের সহিত নবগোপাল বলিল, "শুধু চা নয়, যা চাইব তা-ই পাবে। বলনা কেন, আজ রেতে পাঁটার মাংস দিয়ে পোলোয়া খাব, মদনা তাই খাইয়ে দেবে। তবে হ্যাঁ, পয়সার খেলা, পয়সা খরচ করা চাই। ফেলো কড়ি, মাখ তেল।"

ক্ষুৎ-পিপাসায় এবং সুদীর্ঘ পথ বাস্ আরোহণের ক্লান্তিতে অশোকের দেহ অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল; বলিল, "মাংস পোলাওয়ের কথা পরে হবে, আপাতত এক পেয়ালা চা পেলে বেঁচে যাই। মদনের দোকানেই চলুন।"

অদূরে গরুর গাড়ির চালক এই কথার মীমাংসার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল। অশোকের কথা শুনিয়া আগাইয়া আসিয়া নবগোপালকে বলিল, "তা হ'লে মাল ক'টা চক্কোত্তির দোকানেই পেঁছে দিই বাবু?"

নবগোপাল বলিল, "তাই দে। কিন্তু কাল একেবারে ভোরের মুখে রওনা দোবো পাঁচু। শেষ রাত্রে তুই আমাদের তুলে দিবি।"

"তা দোবো।" বলিয়া অশোকের সুটকেস, বেডিং ও ফল এবং সন্দেশের একটা ঝোড়া মাথায় তুলিয়া লইয়া টিফিন কেরিয়ার এবং জলের ফ্ল্যাস্কটা হাতে ঝুলাইয়া পাঁচু মদনের দোকানের দিকে অগ্রসর হইল।

বৃষ্টিটা মধ্যে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, আবার ফোঁটা ফোঁটা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। অশোকের সহিত ছাতা ছিল না, একটা মূল্যবান রেনকোট কাঁধে ঝোলানো ছিল, সেইটা পরিয়া লইল। নবগোপাল তাড়াতাড়ি নিজের ছাতা খুলিয়া অশোকের মাথার উপর ধরিল।

হাত দিয়া ছাতাটা সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া অশোক বলিল, "আমার দরকার নেই নবগোপালবাবু, আপনি নিজে ভাল ক'রে মাথায় দিন।"

নবগোপাল সে কথা না শুনিয়া বলিল, "নাই-বা থাকল দরকার; দু'দিন বাদেই ত' বোনাই হবে, আগেভাগেই না-হয় একটু খাতির করলাম।"

'বোনাই হবে' কথাটা ইতিপূর্বে আর একবার অশোকের কানে গিয়াছিল, কিন্তু তখন সে বিষয়ে তেমন মনোযোগ দেয় নাই। পুনর্বার নবগোপালকে সেই কথা বলিতে শুনিয়া সে বিস্মিত এবং বিরক্ত দুই-ই হইল; বলিল, "বোনাই হবে বোনাই হবে, কি তখন থেকে বলছেন নবগোপালবাবু? কার বোনাই কে হবে?"

অশোকের কথা শুনিয়া নবগোপাল এক মুহূর্ত নির্বাক হইয়া রহিল, তাহার পর স্মিতমুখে অশোকের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টি-পাত করিয়া তাহার দেহে একটা ছোটখাট কনুয়ের গুঁতো মারিয়া বলিল, "ন্যাকা! যেন কিছুই বুঝতে পারছেন না!"

রসিকতার এই গ্রাম্য ভঙ্গিমায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া অশোক বলিল, "না, নিশ্চয় বুঝতে পারছিনে!"

অশোকের কণ্ঠস্বরের রূক্ষতায় নবগোপাল প্রথমে একটু ভড়কাইয়া গেল, তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে করিয়া সংশয়ে এবং উৎকণ্ঠায় তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "বুঝতে পারছ না কি রকম? তবে কি তোমার সঙ্গে শক্তির বিয়ের কথা পাকা হ'য়ে নেই?"

"আমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে আছে, এ আপনাকে কে বললে?"

"কেন, সে নিজে আমাকে বলেছে।"

"সে নিজে আপনাকে বলেছে? সে আপনাকে এ সব কথা বলে কেন?"

এবার নবগোপাল সত্যসত্যই বিরক্ত হইল। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আরে, তুমি ত ভারি ফেসাদ করলে দেখছি! একথা সে আমাকে বললে ব'লেই ত' সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলাম। নইলে ত' এই শ্রাবন মাসের তেসরা তারিখে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে যেত।"

নবগোপালের কৈফিয়ৎ শুনিয়া অশোক সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার সঙ্গে শক্তির বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল?"

ভ্রূকুঞ্চিত চক্ষে অশোকের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া দর্পোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "তবে?"

"আর, আমার সঙ্গে শক্তির বিয়ের কথা শুনে আপনি সেই সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলেন?"

"তবে?"

তাহার পর হঠাৎ কণ্ঠস্বরের বেগ অনেকটা ঢিলা করিয়া দিয়া নবগোপাল বলিল, "ভেঙ্গে না দিয়ে কি করি বল? সে তোমাকে মনে মনে সোয়ামী ব'লে ঠিক ক'রে রেখেছে, আর আমি তাকে জোর ক'রে বিয়ে করলে ধর্ম্মে সইবে কি? তুমিই বল না কেন অশোকবাবু, ধর্ম্মে সইবে?"

অদূরে গাড়োয়ান দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, বিলম্ব দেখিয়া বলিল, "আমি এগিয়ে গিয়ে চক্কোত্তির দোকানে মালগুলো থুইনা কেন বাবু?"

"চল আমরাও যাচ্ছি।" বলিয়া অশোক অগ্রসর হইল।

নবগোপালের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য শক্তিকে কতকটা কৌশলই অবলম্বন করিতে হইয়াছিল বুঝিতে পারিয়া অশোকের মন হইতে বিরক্তি অনেকটা অপসৃত হইয়া গিয়াছিল। পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ এক সময়ে সে বলিল, "আপনি কিন্তু বেশ ভাল লোক নবগোপালবাবু।"

শুনিয়া নবগোপাল পরম আপ্যায়িত হইয়া বলিল, "এরই মধ্যে কি ক'রে বুঝলে?"

অশোক বলিল, "তা বুঝেছি। দু-চারটে কথাবার্তা হ'লেই লোক ভাল কি মন্দ বোঝা যায়। সত্যিই আপনি ভাল লোক।"

মৃদুস্বরে নবগোপাল বলিল, "শক্তিও তাই বলে।"

অশোক বলিল, "ঠিক-ই বলে।"

(ক্রমশ)

ব্যবসা বাণিজ্য

টাকার ভবিষ্যৎ

শ্রীঅনিলকুমার বসু

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। পৃথিবীর অগণিত নরনারী এতদিনের যুদ্ধজনিত দুঃখভার হইতে মুক্তি পাইল। কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত ফেলিবার অবসর মানুষের নাই। সম্মুখেই তাহার যুদ্ধোত্তর বিবিধ জটিল-সমস্যা পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। এই সকল সমস্যা-সংকুল জটিলতার মাঝে মানুষকে আপনার ভবিষ্যৎ চলার পথ বাহির করিতে হইবে। কাজেই যুদ্ধোন্মাদনার স্বেদস্রুতি বন্ধ না হইতেই তাহাকে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী রচনা করিবার গুরুদায়িত্ব মাথায় বরণ করিয়া নিতে হইল। এই গুরুদায়িত্ব পালনের সফলতার উপরই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর নিরাপত্তা ও শান্তি নির্ভর করিতেছে। কিন্তু বিপদ হইল এই—বিভিন্ন জাতির সমস্যাগুলি এক নহে। কাজেই ঐ সকল সমস্যার সমাধান একপথগামী নহে। তবুও যতটা সম্ভব বিরোধ বর্জন করিয়া ভবিষ্যৎ শান্তির সূত্র ধরিয়া বিভিন্ন জাতিকে স্ব স্ব সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। বর্তমান আমাদের দেশের বিবিধ সমস্যার মধ্যে আমাদের দেশীয় রৌপ্য মুদ্রার (Rupee) ভবিষ্যৎ অন্যতম। এই সমস্যা সমাধানের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা অনেকখানি নির্ভর করে। আলোচ্যপ্রবন্ধে আমরা এই সমস্যারই অবতারণা করিব।

ইহা সর্ববাদিসম্মত যে আমাদের দেশ কি কৃষি, কি শিল্পে অন্যান্য সভ্যদেশের তুলনায় অনুন্নত। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ এত অপর্যাপ্ত পরিমাণ রহিয়াছে যে তাহার সন্ধান আমরা এখনও সঠিক পাই নাই, এবং পাইয়া থাকিলেও উহা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের কাজে লাগাইতে পারি নাই। কাজেই অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশের পুনর্গঠন না বলিয়া প্রথম গঠন বলিতে পারি। আমাদের দেশের যখন গঠনই হইল না তখন তাহার পুনর্গঠন কিরূপে সম্ভব? কাজেই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক গঠন করিতে হইলে প্রথমেই আমাদের প্রয়োজন নিজেদের মুদ্রার মানদণ্ডটি শক্ত করিয়া তৈরি করা। এই মানদণ্ডটিকে ভিত্তি করিয়াই আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ইমারত নির্মাণ করিতে হইবে। ভিত্তি কাঁচা থাকিলে আমাদের বহু যত্ন কৃত সৌধ মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইবে। কাজেই বিষয়টির গুরুত্ব সম্যক্ অবহিত হইয়াই আমাদিগকে কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা সকলেই জানি যে আমাদের রৌপ্যমুদ্রার (Rupee) আন্তর্জাতিক বিনিময় ক্ষেত্রে কোন বিভিন্ন সত্তা নাই। কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাক্, যেমন ষ্টার্লিং ডলারে, ডলার ফ্রাংকে, ষ্টার্লিং মার্কসে একটি নির্দিষ্ট বিনিময় হার নিরূপিত আছে, সেইরূপ রূপি-ডলার বা রূপি ফ্রাংকের কোন নির্দিষ্ট বিনিময় হার নাই। সেই স্থলে রূপি-ষ্টার্লিং-এর বিনিময় হার ১ শিলিং ৬ পেন্স হিসাবে নির্দিষ্ট আছে। অর্থাৎ অন্যান্য দেশের মুদ্রার সহিত আমাদের দেশের রৌপ্য মুদ্রার প্রত্যক্ষ কোন বিনিময় হার না থাকিয়া, ষ্টার্লিং-এর মারফৎ পরোক্ষভাবে আমাদের বিনিময় হার নিয়োজিত হইয়া আছে। ইহার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের টাকার কোন অস্তিত্বই নাই। ষ্টার্লিং-এর সহিত আমাদের টাকাকে গাঁথিয়া দিয়া অকূলে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এযেন হিন্দুনারীর বিবাহের মত "জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হইও তুমি," রূপির কোন ভিন্ন সত্তা না রাখিয়া, উহাকে ষ্টার্লিং-এর সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে" এই গোছের একটা সান্ত্বনা দেওয়া ও যুক্তি খাড়া করা। কিন্তু এই যুক্তি যে কত অযৌক্তিক এবং এই সান্ত্বনা যে কত অসার, তাহা একটু চিন্তা করিলেই ধরা পড়ে। কাজেই আমাদের রৌপ্যমুদ্রার ভবিষ্যৎ নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন রূপি-ষ্টার্লিং-এর বিবাহ বিচ্ছেদ এবং রূপির স্বাধীন সত্তা। তারপরই রিজার্ভ ব্যাংকের কর্তব্য হইবে আন্তর্জাতিক টাকার বাজারের অবস্থানুসারে এবং নিজেদের আভ্যন্তরিক প্রয়োজনের তাগিদ-অনুযায়ী রৌপ্য মুদ্রার বহির্মূল্য নিরূপণ করা।

এই স্থলে আমাদের পাওনা ষ্টার্লিং-এর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এই পর্যন্ত ইংলণ্ডের কাছে আমাদের আনুমানিক ১৩৫২.৮৮ কোটি টাকা পরিমিত ষ্টার্লিং পাওনা হইয়াছে। এই যুদ্ধের কল্যাণে ভারতবর্ষ এই প্রথম ইংলণ্ডের কাছে দেনাদার পর্যায় হইতে পাওনাদার পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু এই পাওনার পিছনে ভারতবর্ষকে অশেষ ক্লেশ, দুঃখ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। প্রতিটি জমান ষ্টার্লিং-এর জন্য ভারত নিজেকে পলে পলে বঞ্চিত করিয়াছে। এই মহান আত্মত্যাগের ভার টাকার অঙ্ক অপেক্ষাও গুরুতর। এই মজুত ষ্টার্লিং কিভাবে আমরা ফিরিয়া পাইতে পারি তাহা দ্বারাও টাকার ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ধারিত হইবে। বিগত মহাযুদ্ধের পর রূপি-পাউণ্ডের বিনিময় হার অস্বাভাবিক-রূপে বাড়াইয়া দিয়া আমাদের পাওনা টাকা কর্পূরের মত উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, আমাদের পাওনা টাকা এক কপর্দকও আমাদের হস্তে ফিরিয়া আসে নাই। এইবারও যাহাতে অনুরূপ কৃত্রিম উপায়ে রূপি-ষ্টার্লিং-এর বিনিময় হার বাড়াইয়া দিয়া আমাদের জমান ষ্টার্লিং নিঃশেষ করিয়া দেওয়া না হয় সেই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে। একথা সত্য যে ষ্টার্লিং-এর বিনিময়ে আমাদিগকে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, অর্থাৎ "capital goods" পর্যায়ভুক্ত যাবতীয় মালপত্র আমদানি করিতে হইবে। ব্রিটেনের পক্ষে একসঙ্গে এত কোটি ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব নহে। তাহাকে রপ্তানির পরিমাণ বাড়াইয়া আস্তে আস্তে উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। কাজেই ব্রিটেনকে উন্নততর উপায়ে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া কম মূল্যে যত সম্ভব রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে পারে সেই বিষয়ে মনোযোগী হইতে হইবে। এইভাবে নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বিনিময়ে পাওনা টাকার পরিশোধ ব্যাপারে ব্রিটেনকে সময় দিতে ভারত আপত্তি করিবে না। এই বিষয়ে ভারত ও ব্রিটেনের সহিত এমন একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়া অচিরেই বিধেয় যদ্দ্বারা আমরা নিশ্চিতরূপে শিল্পোন্নয়নের জন্য আমাদেরই প্রয়োজনানুগ যন্ত্রপাতি সুলভ মূল্যে ক্রয় করিতে পারি।

যুদ্ধজনিত ব্যয় মিটাইবার জন্য অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতির ফলে বাজার মূল্য অস্বাভাবিক বাড়িয়া গিয়া টাকার ক্রয়-ক্ষমতা (Purchasing power) অনেক কমিয়া গিয়াছে। এই হিসাবে ভিতর দিক দিয়া আমাদের রৌপ্যমুদ্রা দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কারণ যুদ্ধ লাগার পর হইতে ১৯৪৪ সালের শেষভাগ পর্যন্ত প্রচলিত নোটের পরিমাণ শতকরা ৪৬৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের নোটের পরিমাণ ১৭৯ কোটি টাকা হইতে ১৯৪৪ সালের শেষে ১০১০ কোটি টাকায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। সেই অনুসারে বাজার দর ১০০ হইতে ২৪৫.২ গিয়া ঠেকিয়াছে। এই দিক দিয়া আমাদের টাকা যে কতখানি অন্তঃসার-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্যক্ষেত্রে

অন্তরায় দেখা দেওয়ায় এবং নানাপ্রকার বাণিজ্য নিরোধক আইন কানুন জারি হওয়ায়, আমাদের রৌপ্যমুদ্রার আভ্যন্তরিক দুর্বলতা উহার বহির্মূল্যকে প্রভাবিত করিতে পারে নাই। বরঞ্চ আমাদের ষ্টার্লিং দেনাগুলি পরিশোধ হইয়া যাওয়ায় এবং উক্ত দেনার সুদ হইতে অব্যাহতি পাওয়ায়, আমাদের রৌপ্য মুদ্রা বাহ্যতঃ অনেক শক্তিশালী হইয়াছে। কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে স্বীকার্য যে, বর্তমান বাজার দরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি আমাদিগের অর্থনৈতিক অবস্থার মোটেই অনুকূল নহে। বরং যেখানে আমাদের বিদেশ হইতে "capital goods" অল্প মূল্যে ক্রয় করা প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে যদি বাজার দর বর্তমান উচ্চ অবস্থায় আসীন থাকে, তবে আমরা সুলভ মূল্যে উক্ত দ্রব্যসম্ভার পাইবার কোন আশাই করিতে পারি না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে উপস্থিত মুদ্রাস্ফীতিজনিত উচ্চমূল্য রাখার ও হ্রাসপ্রাপ্ত মুদ্রা বিনিময় হারের (depreciated exchange rate) আশু অবসান প্রয়োজন। কাজেই প্রথমেই স্থির করিতে হইবে বর্তমান মূল্যরেখা কমাইয়া কতখানি নামাইতে হইবে, যে মত অবস্থায় আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামো খাপ খাইয়া উঠিতে পারে। তবে এটা সত্য কথা যে, আমাদের মন্দা যুগের মূল্যরেখায় নামিয়া আসা সমীচীন হইবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণ মূল্যরেখা (General price level) স্থিরীকরণের উপর রৌপ্য মুদ্রার বিনিময় হার অনেকখানি নির্ভর করিবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে বর্তমান জটিলতার মধ্যে উক্ত মূল্যরেখা স্থির করা অত্যন্ত দুরূহ সমস্যা। যেমন যুদ্ধাবসান হেতু মূল্যরেখা নিম্নগামী হওয়া স্বাভাবিক, তেমনই যুদ্ধোত্তরকালের আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্যে পরিণত হইলে মূল্যরেখার নিম্নগতি রোধ হইতে পারে। দুইটি পরস্পর বিরোধী গতিচক্র মূল্যরেখা কোথায় আসিয়া ঠেকে তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। আমাদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনাগুলি কত তাড়াতাড়ি কার্যতঃ রূপ-গ্রহণ করিতে পারিবে, তাহা বিদেশ-প্রত্যাগত যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও মূল্যবস্তু নিচয়ের (capital goods) আমদানির হারের উপর নির্ভর করিবে। ব্রিটেন ও আমেরিকা স্ব স্ব আভ্যন্তরিক চাহিদা প্রথমে মিটাইয়া ও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলির প্রয়োজন জোগাইয়া উদ্বৃত্ত capital goods আমাদের দেশে প্রেরণ করিতে পারে। তারপরে আমরা ঐ সকল বস্তু কোন উপায়ে ক্রয় করিব তাহাও বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। স্পষ্টতঃ যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে এই মনে হয় যে আমাদের পাওনা মজুত ষ্টার্লিং কয়েক বৎসর ধরিয়া ভাগে ভাগে পরিশোধ করা হইবে। কাজেই আমাদের ভাগ্যে কতটুকু capital goods পড়িবে তাহা কিস্তি-নিরূপিত ষ্টার্লিং-এর পরিমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। কাজেই যদি উহাপেক্ষা অধিকতর capital goods পাইতে হয়, তবে আমাদিগকে সেই পরিমিত রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণও বাড়াইতে হইবে। এই রপ্তানি বাণিজ্য বাড়াইতে হইলেই—আমাদিগকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুলভ মূল্যে দ্রব্য সামগ্রী ছাড়িতে হইবে। ইহার উদ্দেশ্যই এই যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে আমাদের আসন অটল রাখিতে হইলে আমাদের সাধারণ মূল্যরেখা একটু নীচু রাখিতে হইবে। নতুবা অন্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশজাত পণ্যদ্রব্য বিকাইবে না। কাজেই বিদেশের যথা ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে হইলে আমাদের মূল্যরেখা কতটুকু স্থির রাখিতে হইবে তাহা উক্ত দুই দেশের সাধারণ মূল্যরেখার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হইবে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যথাক্রমে যুদ্ধ লাগিবার পর সাধারণ মূল্যরেখা শতকরা ৭২ ভাগ ও ৩৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার সহিত তুলনা করিয়া আমাদের সাধারণ মূল্যবৃদ্ধি যেখানে শতকরা ২৪১ ভাগ হইয়াছে, তাহা কতটুকু কমাইতে হইবে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ যুদ্ধান্তে একটা মন্দার ভাব সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হওয়া স্বাভাবিক। এই মনোভাব অংকুরে বিনাশ না করিলে সত্য মন্দাতেই সংক্রামিত হইতে পারে। যুদ্ধান্তে ঋণগ্রস্ত দেশগুলি সাধারণতঃ নিজেদের রপ্তানি বাহিরে পাঠাইবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র থাকিবে। এই সুযোগে ঐসব দেশের পণ্যদ্রব্য আমাদের মত অনুন্নত দেশগুলিতে প্রবেশ করিয়া আমাদের নূতন শিল্পগুলিকে অচিরে নষ্ট করিয়া দিতে পারে। এই মত অবস্থায় অপরিবর্তনীয় কোন স্থায়ী বিনিময় হার নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে মঙ্গলজনক নয়, যে সকল শিল্পদ্রব্য বা পণ্যদ্রব্য আমাদের দেশে উৎপাদন করা সম্ভবপর নয় এবং যে সকল দ্রব্য আমাদের শিল্পোন্নয়নের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় সেই সব দ্রব্যই যাহাতে আমাদের দেশে আসিতে পারে সেই দিকে সচেতন থাকা উচিত। যে সকল পণ্যদ্রব্য আমাদের দেশে উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে, সেই সব গুলিই বিদেশ হইতে চালান করিয়া স্বদেশে আনিলে নিরর্থক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করিয়া দেশীয় শিল্পগুলির নষ্ট হইবার পথ উন্মুক্ত হইবে মাত্র। কাজেই এই বিষয়ে আমাদের সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। কাজেই আমাদের এমন আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতে হইবে যাহা দ্বারা আমাদের মূল্যরেখা (price level) এমনভাবে নিরূপিত হয় যে আমাদের কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের পূর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয় এবং যাহাতে উদ্বৃত্ত দ্রব্য-নিচয় বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে অতি সহজে বিকিকিনি হইতে পারে। এই দিক লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের রৌপ্যমুদ্রার বিনিময় হার স্থির করিতে হইবে। ১৯৪৪ সালে জুলাই মাসে Britton Woods-এ যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা সম্মেলন আহূত হয় তাহাতে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে প্রধান প্রধান দেশের মুদ্রার হার স্বর্ণের তুলাদণ্ডে নিরূপিত হইলে এবং প্রত্যেক দেশই যত শীঘ্র সম্ভব উক্ত হার স্থির করিবে। প্রত্যেক দেশের আর্থিক প্রয়োজন মত উক্ত হার রদবদল করিবার স্বাধীনতা থাকিবে, অবশ্য তাহা পরস্পর আলাপ আলোচনা দ্বারা স্থির করিবে। এইরূপে নমনীয় বিনিময় হার দ্বারা প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব সমস্যা সমাধান সহজ। কিন্তু যে পর্যন্ত না অন্যান্য দেশ এই ব্যাপারে অগ্রণী হইতেছে সেই পর্যন্ত ভারতের পক্ষে কোন নির্দিষ্ট বিনিময় হার স্থির করা কষ্টকর। কাজেই আমাদিগকে একটু ধৈর্য ধরিয়া অপর দেশের কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়া এই ব্যাপারে অগ্রসর হইতে হইবে।

শ্রীশ্রীচন্দ্রাবলী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

পদাবলী সাহিত্যের আলোচনা আমাদের পক্ষে ক্রমেই বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে। আধুনিক অনেকেই, কয়েকজন পুরাতন খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং তথাকথিত ভক্তগণ এই পথে পদক্রম প্রচলিত করায় আমাদিগকে সাবধান হইতে হইয়াছে। প্রমাণ প্রয়োগসহকারে দেখাইয়া দিলেও ইঁহারা পদাবলীর সে সমস্ত মানিতে চাহেন না। নূতন পদকর্তার কথা, পদকর্তাদের জীবনের নূতন কথা, নূতন পদ কিংবা পদের ভুল পাঠের নূতন সঙ্গত পাঠ; পাঠের সঙ্গত ও সুষ্ঠু ব্যাখ্যা যেহেতু আমাদের হাত দিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই হেতু তৎসমস্ত অদেয়, অপেয় অগ্রাহ্য। তথাপি আমি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গেই মাঝে মাঝে এই প্রসঙ্গে যথাসাধ্য আলোচনা করি। অদ্যকার প্রয়াস সেই পুরাতনতম অভ্যাসেরই জের মাত্র।

বৈষ্ণব-পদাবলীতে মান একটি প্রধান বিষয়বস্তু। রসপর্যায়ের মধ্যে ইহার স্থান অতি উচ্চে। মধুর রসের দুইটি প্রবাহ, এক বিপ্রলম্ভ, দুই সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভের ও সম্ভোগের চারিটি করিয়া আটটি তরঙ্গ বা উচ্ছ্বাস। বিপ্রলম্ভের চারিটি তরঙ্গের নাম পূর্বরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্র্য, প্রবাস। নায়ক নায়িকার প্রথম দৃষ্টিসঞ্জাত অনুরাগে মিলনের পূর্ব পর্যন্ত যে অবস্থা, তাহারই নাম পূর্বরাগ। পূর্বরাগের পর মিলন। মিলনে ভালবাসা গাঢ় হইলে তবেই মানের উদ্রেক হয়। রতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে স্নেহ, স্নেহ হইতে প্রণয়, তাহার পর মান, অথবা স্নেহ হইতে মান তাহার পরে প্রণয়। স্নেহ হইতেই ভয় জন্মে, কৃতাপরাধ নায়ক নায়িকার কথা ভাবিয়া ভীত হন। প্রণয় না জন্মিলে ঈর্ষা আসে না। প্রণয়েই প্রিয়তমের নিকট অন্যের উৎকর্ষ অসহ্য হয়। প্রণয়ই বিশ্রম্ভতা আনে। আলঙ্কারিকগণ বলেন—

জনিত্বা প্রণয়ঃ স্নেহাৎ কুত্রচিৎ মানতাং ব্রজেৎ।
স্নেহান্মানঃ ক্বচিদ্ভূত্বা প্রণয়ত্বমথাশ্নুতে॥

স্নেহ হইতে প্রণয় উৎপন্ন হইয়া কোথাও মান উদ্রিক্ত করে। আবার স্নেহ হইতে মান সঞ্জাত হইয়া কোথাও প্রণয়ে পরিণত হয়। প্রেমের গতি সর্পের মতই কুটিল, সুতরাং সকল সময় মানের নিদান নির্ণয়ের উপায় বিঘ্নসঙ্কুল। পদাবলী সাহিত্যে চন্দ্রাবলীকে লইয়াই মানের পালা গাঁথা হইয়াছে। শ্রীরাধার প্রতিদ্বন্দ্বিনী নায়িকা চন্দ্রাবলী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহার সখীদের সমাদর করেন, তাঁহার কুঞ্জে গিয়া নিশি যাপন করিয়া আসেন, ইহাই শ্রীমতীর মানের কারণ। চন্দ্রাবলীর মান পদাবলী সাহিত্যে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন কবি বিল্বমঙ্গলে চন্দ্রাবলীর মানের উল্লেখ পাই।

রাধামোহন মন্দিরাদুপগতশ্চন্দ্রাবলীমূচিবান,
রাধে ক্ষেমমিহেতি তস্যবচনং শ্রুত্বাহচন্দ্রাবলী।
কংসক্ষেমময়ে বিমুগ্ধ হৃদয়ে কংসক্বদৃষ্টস্ত্বয়া,
রাধেক্বেতি বিলজ্জিতো নতমুখঃ স্মেরোহরি
পাতুবঃ॥

"রাধামোহন মন্দির হইতে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে আসিয়া চন্দ্রাবলীকে বলিলেন, রাধে তোমার কুশল ত? চন্দ্রাবলী প্রতিউত্তরে বলিলেন, কংস তোমারও তো মঙ্গল? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, বিমুগ্ধ হৃদয়ে এখানে কংস কোথায়? চন্দ্রাবলী উত্তর করিলেন, তুমিই বা এখানে রাধাকে কোথায় দেখিলে? এই বাক্যে লজ্জাবনত ঈষৎ হসিতবদন হরি তোমাদের রক্ষা করুন।" চন্দ্রাবলীর উল্লেখে এইরূপ আশীর্বচন বৈষ্ণব সাহিত্যে এই প্রথম।

উজ্জ্বল নীলমণির মধ্যে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কথিত চন্দ্রাবলীর মান ও শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সহজ উপায়েই তাঁহার মান ভঞ্জনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীকে বলিলেন, আজ আমি একটি ধেনু হারাইয়াছি, দূর হইতে তাহার গলঘণ্টের শব্দের ন্যায় শুনিতেছি। আমি তাহাকে লইয়া আসিতেছি, তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। কিয়ৎক্ষণ পরেই দূর হইতে রসনার (কটিনিবদ্ধ ক্ষুদ্র ঘণ্টার) শব্দ শুনিয়া উচ্চকিতা চন্দ্রাবলী কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া যমুনা পুলিনে গিয়া দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার সঙ্গে বিহার করিতেছেন। চন্দ্রাবলীর সখী পদ্মা সেই কথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিয়াছিলেন।

চন্দ্রাবলী দূর হইতে ললিতাকে দেখিয়া প্রিয় সখীকে বলিতেছেন—

সহচরি পরিগুম্ফ্য প্রাতরেবার্পিতাসীদ্
ব্রজপতি সুতকণ্ঠে যা ময়াৎ কণ্ঠয়াদ্য।
অপি হৃদি ললিতায়াস্তস্থুষী হন্তহন্মে
দহতি দহন দীপ্তিঃ পশ্য গুঞ্জাবলী সা॥

সখি দেখ, আজ প্রাতঃকালে এইমাত্র একান্ত উৎকণ্ঠায় যে গুঞ্জামালা আমি ব্রজেন্দ্রনন্দন কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলাম, (শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকালও সে মালা কণ্ঠে ধারণ করিলেন না) সেই মালা এখন ললিতার বক্ষে আসিয়া অগ্নিতুল্য জ্বালা বিস্তারে আমাকে দগ্ধ করিতেছে।

চন্দ্রাবলীর মান ভঞ্জনার্থে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

ধম্মিল্লো নবমালতী সব্যোচ শব্দপুটে
মল্লি সুন্দরি দক্ষিণেতু কতরৎ পুষ্পং তব ভ্রাজতে।
আঘ্রেয়ং পরিচেতু মিত্যুপহিতে ব্যজেন নাসাপুটে
গণ্ডোদ্যৎ পুলকা বিহস্য হরিণা চন্দ্রাবলী
চুম্বিতা॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "চন্দ্রাবলী, তোমার খোঁপায় মালতী এবং বাম কর্ণে যে মল্লীপুষ্প দেখিতেছি, ইহা আমার পরিচিত। কিন্তু দক্ষিণ কর্ণে যে পুষ্পটি শোভা পাইতেছে, সেটি চিনিতে পারিতেছি না। অতএব গন্ধ আঘ্রাণে উহাকে চিনিবার চেষ্টা করি। এই ছলবাক্যে চন্দ্রাবলীর কপোলে পুলক উদ্গত হইলে শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন।" বলা বাহুল্য এরূপ উদাহরণ অতি বিরল।

পদকর্তাগণ প্রশ্ন তুলিয়াছেন, সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন, "চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যদি গিয়াছিলেন শ্যাম" তাহার জন্য তুই কেন এই গুরুতর মান করিলি? কেন তুই সমর্থারতির গর্ব খর্ব করিলি সখি! ইহার উত্তর অতি গুরুতর, অতি জটিল। মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধার অভিমান, "আমি ভিন্ন রস স্বরূপের সেবার, আস্বাদনের, উপভোগের, অপরোক্ষানুভূতি লাভের অপর কাহারো সামর্থ্য নাই, সাধ্য নাই। রসস্বরূপে মাত্র আমারই অধিকার, আমি যাহাকে দান করিব, আমার ভাবে ভাবিত হইয়া সেই-ই মাত্র রসস্বরূপের যথার্থ আস্বাদ লাভে অধিকারী হইবে। আমি তো সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি। আমি কি এখনো তাঁহাকে পূর্ণানন্দ দান করিতে পারি নাই। কিসে তিনি সুখী হন, কই তাহাও তো আমাকে বলেন না, শিখাইয়া দেন না?"

মানের রহস্য হয়তো আরো গভীর। সেইজন্যই কবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাসের লেখনীমুখে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন।
বেদস্তুতি হৈতে তাহা হরে মোর মন॥

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে পরিহাস করিয়াছিলেন, পট্টমহিষী ভয়ে দুঃখে মূর্ছিতা হইয়া পড়েন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

মুখঞ্চ প্রেমসংরম্ভস্ফুরিতাধর মীক্ষিতুম্।
কটাক্ষেপারুণাপাঙ্গং সুন্দর ভ্রুকুটীতটে॥
অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
যন্নর্মৈরীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি॥

সুন্দরী, আমি তোমার প্রেম সংরম্ভ বদনে প্রণয় কোপে স্ফুরিত অধর, আবদ্ধ সুন্দর ভ্রূকুটি এবং আরক্ত নয়নের কটাক্ষ দেখিবার এবং রোষগর্ভ মধুর বচন শুনিবার

আশাতেই পরিহাস করিয়াছিলাম। ওগো ভীরু, ওগো ভামিনী, গৃহীগণ যে গৃহিণীগণের সঙ্গে হাস্যপরিহাসে দিন যাপন করেন, ইহাই তো তাহাদের পরম লাভ।

পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধার মানের উপাদান জোগাইবার জন্যই চন্দ্রাবলীর আবির্ভাব, তাঁহার অপর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাকে লইয়া কোন পদকর্তা বা পদরচয়িত্রী সৌন্দর্যের বা বিলাসের, অথবা কোন নিবিড় রসানুভূতির চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। একমাত্র পুরুষোত্তমদাসের পদে ইহার কথঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

পদাবলী সাহিত্যে কয়েকজন পুরুষোত্তম-দাসের নাম পাওয়া যায়। অদ্বৈত শাখাভুক্ত পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী ও পুরুষোত্তম পণ্ডিত। নিত্যানন্দ শাখা-ভুক্ত নবদ্বীপের পুরুষোত্তম পণ্ডিত এবং কুমারহট্ট নিবাসী সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তম কবিরাজ। চরিতামৃতে আছে—

সদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাঁহার তনয়।
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে॥

বৈষ্ণববন্দনা প্রণেতা দেবকীনন্দন ইঁহারই শিষ্য। দেবকীনন্দন ইঁহার কথায় বলিয়াছেন—

সপ্তম বৎসরে যাঁর কৃষ্ণ উনমাদ।
ভুবনমোহন নৃত্যে শকতি অগাধ॥

আমি ইঁহাকেই পদকর্তা বলিয়া অনুমান করি। স্বল্পসংখ্যক ইঁহার পদ, কিন্তু কয়েকটি পদেই একটু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

সে আজ অনেকদিনের কথা। আমার তখন বয়স অল্প। বীরভূম জেলার শ্রীপাট মঙ্গলডিহি গ্রামে শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ জীউর মন্দির প্রাঙ্গণে দক্ষিণখণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া রসিকদাসের কীর্তন শুনিয়াছিলাম,—মাথুর গান। রসিকদাস তখন সারা বাঙলার কীর্তনীয়াগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন। তাঁহার সম-সাময়িক বীরভূমের নন্দদাস, মনোহর চক্রবর্তী, অন্যান্য স্থানের বেণীদাস, হারাধন সূত্রধর প্রভৃতি সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন, একমাত্র রসিকই রাঢ়-দেশের—তথা বাঙলার সুনাম রক্ষা করিতেছেন।

গান আরম্ভ হইয়াছিল শ্রীমতীর দশমী দশা। গৌরচন্দ্রিকার পরই তিনি গান আরম্ভ করিলেন—

নিজ গৃহ তেজি চলল ধনি বিরহিণী,
দারুণ বিরহ হুতাশে।
কালিন্দি পৈঠী পরাণ পরিতেজব
এহি মরম অভিলাষে॥
হরি হরি কি কহব ও দুখ ওর।
ধাই সবসহচরি কাননে যাওল
ললিতা লেওল কোর।
ঐছন বচন বৃন্দা মুখে শুনাইতে
ভগবতি দ্রুত চলি গেলি।
আপন কুঞ্জ কুটির মাহা আনল
সবাই সখীগণ মেলি॥
সরসিজ সেজে শুওয়াল সহচরি
চৌদিশে রহু মুখ চাই।
অনুকুল প্রতিকূল সবাই রমনীগণ
শুনাইতে আওল ধাই॥
দশমিক পহিল দশা হেরি আকুল
রোয়ত অবনী লোটা।
আওব বচনে কোই পরবোধই
পুরুষোত্তম মুখ চাই॥

রসিকদাস সাধারণত বড়তালের গানই গাহিতেন। সমঝদার শ্রোতা পাইলে সম্পূর্ণ গানখানি বিশেষ যত্নসহকারেই গাহিতেন। পদের প্রতি পংক্তিতেই আখর দিতেন। পাণ্ডিত্য প্রকাশের বালাই ছিল না। কণ্ঠস্বর যেমন মধুর, তেমনই গম্ভীর। অমন আখরের পারিপাট্য আর কাহারও মুখে শুনি নাই। একটি গানেই অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। অনুকূল, প্রতিকূল সবহু' রমণীগণের কথায় তিনি ভূমিকা করিলেন চন্দ্রাবলী তখনো আসেন নাই। কোন সখি গিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ-সহকারে তাঁহাকে বলিল, শ্রীরাধার অন্তিম-দশা উপস্থিত, এইবার তুমি প্রতিদ্বন্দ্বিনী শূন্যা হইলে এইবার শ্রীকৃষ্ণ একা তোমারই হইবেন। এই কথা শুনিয়াই—

রাইক দশমি দশা নিজ সখি মুখে
শুনি চন্দ্রাবলী রোই।
নিজ তনু ঢারি ধূলি গড়ি যাওত
ভূতলে কুন্তল কোই॥

নিজ সখী মুখে শ্রীরাধার দশমী দশার কথা শুনিয়া চন্দ্রাবলী কাঁদিয়া আলুলায়িত কেশে মাটিতে লুটাইয়া ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—সখী, আমি কোন্ বরাকিণী, কোন্ তুচ্ছা নারী। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার জন্যই আমরা শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের অভাবনীয় সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম।

রাইক প্রেমে পুনহি নন্দ নন্দন
আওব করি দিল আশ।
সো সব মনোরথ বিহি কৈল আমত
এত দিনে ভেল নৈরাশ॥

ওগো বড় আশা ছিল, রাই প্রেমমুগ্ধ, শ্রীমতীর প্রেমপাশে বন্দী নন্দনন্দন আবার ব্রজে আসিবেন, আবার আমরা তাঁহার দেখা পাইব। কত মনোরথ,—ঈর্ষা ভুলিব, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলিব, এবার রাধা-কৃষ্ণের যুগল-সেবায় জীবন সমর্পণ করিব, দুই-জনকে মিলিত করিয়া নয়ন ভরিয়া দেখিব, তাঁহাদের রহস্যালাপ প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিব।

যেমন দোহার, তেমনই মৃদঙ্গবাদক, তেমনই সুপণ্ডিত ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দ। সম্মুখে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি, ভাবতন্ময় রসিক প্রেমার্দ্রকণ্ঠে গাহিয়া চলিয়াছেন। সেই সুর, তাল, লয়সমৃদ্ধ গানের কথা কি ভাষায় বুঝানো যায়? চন্দ্রাবলী—

এত কহি পুন পুন শিরে কর হানই
মুরছিত হরল গেয়ান।
পদ্মাবতী সখি কোর পর নেয়ল
ঝর ঝর লোরে নয়ান॥

কাঁদিতে কাঁদিতে সখি পদ্মা চন্দ্রাবলীকে কোলে তুলিয়া লইল।

বহুক্ষণে চেতন পাই মলিনমুখি
বৈঠল ছোড়ি নিঃশ্বাস।
রাইক নিয়ড়ে লেই চলু সহচরি
কহ পুরুষোত্তম দাস॥

শ্রোতৃগণের মানসনেত্রে এক অভিনব চিত্র রূপায়িত হইয়া উঠিল। গায়কের ভাবাভিব্যক্তি এক রসবিগ্রহে প্রাণ পরিগ্রহ করিল। গান চলিতে লাগিল।

যেখানে শুতিয়া ধনি রাই।
চন্দ্রাবলী তাঁহা যাই॥
রাইকে হেরি অগেয়ান।
নিঝরে ঝরয়ে দুনয়ান॥

কাঁদিতে কাঁদিতে ললিতাকে বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই আবার ব্রজে আসিবেন। এখন রাই যাহাতে বাঁচে, তাহারই উপায় বিধান কর। অনাথায় কৃষ্ণ-দর্শনের আশা দুরাশা।

কহয়ে ললিতা সঞে বাত।
পুনহি আওব ব্রজনাথ॥
অব যৈছে জীবয়ে রাই।
ঐছন রহে উপাই॥

কেহ যদি মথুরায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই সংবাদ দিতে পারে, শ্রীরাধার এই দুর্দশার কথা জানাইয়া দেয়, শুনিলেই শ্যাম বৃন্দাবনে আসিবেন।

কোই যদি কহে তহু ঠাম।
শুনাইতে আওব শ্যাম।
রাই ললাটে কর আপি।
পরীখায় দেহক তাপি।
তুহিণ শীতল হেরি গাত।
পদযুগে রাখল হাত॥

সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের বাসনা, একবার শ্রীরাধার পদযুগল স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মনের কোন্ কোণে অতি ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মত অভিমানের শেষ কণিকা জ্বালা বিস্তার করিতেছে। ললিতা-আদি বিপক্ষ-পক্ষীয়াগণ, পদ্মা আদি নিজ সখীজন সম্মুখে। তাই গাত্র তাপ পরীক্ষার ছলে প্রথমে ললাটে হাত রাখিলেন, তাহার পর বক্ষে। সর্বাঙ্গ হিমশীতল দেখিয়া সাধারণে যেমন পদদ্বয়ের উষ্ণতা পরীক্ষা করে, তেমনই চন্দ্রাবলী শ্রীরাধার পদযুগল স্পর্শ করিলেন, দুই হাতে পদ দুইটি চাপিয়া ধরিলেন; তাহার পর রাধার অশুভ আশঙ্কায় দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীরাধার পদযুগলের উপরেই মূর্ছিতা হইয়া পড়িলেন। রাধার তথা চন্দ্রাবলীর দুই যূথেশ্বরীর আজ সমদশা দেখিয়া, দুই-জনকে একই দুঃখে সমদুঃখিণী জানিয়া ব্রজরমণীগণও কাঁদিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তমের অনুরোধে ভগবতি পৌর্ণমাসী সকলকে প্রবোধ দিলেন।

এত দুখ সহই না পারি।
মুরছি পড়ল তনুপারি
পুরুষোত্তম অনুরোধে।
ভগবতি দেই পরবোধে॥

সেদিনের পর হইতে এ পদ কতবার পড়িয়াছি। চন্দ্রাবলীর এই চিত্র আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। পদাবলী প্রণেতৃগণের মধ্যে আর কেহই এই রসের পদ রচনা করেন নাই। সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত বিপিনদাস, গণেশদাস, ফটিক চৌধুরী, অবধূত বন্দ্যোপাধ্যায় কাহারো মুখে এ গানও শুনি নাই। রসিকদাসের মুখে এ গান না শুনিলে পদের আখর, ইহার ব্যাখ্যা না শুনিলে পরবর্তীকালে হয়তো এমনভাবে এ পদ কয়টির অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতাম না। আস্বাদনের আনন্দ উপভোগে আসিত না। সেদিন রসিক গৌরচন্দ্রিকাসহ পাঁচটি মাত্র গান গাহিয়াছিলেন। তাহাতেই অধিক রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল। শ্রীবিগ্রহযুগলও ততক্ষণ জাগিয়াছিলেন। নিম্নের গানটি গাহিয়া রসিক গানের প্রায় বিরাম দিলেন। মিলনাত্মক যে সংক্ষিপ্ত পদটি গাহিয়া তিনি পালা সমাপ্ত করিয়াছিলেন, আজি আর তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না। লক্ষ্য করিবার বিষয় পদগুলিতে পদকল্পতরু মধ্যে কোন রাগের উল্লেখ নাই। রসিক নিজের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে কোন মনোমত রাগ-তালে পদ কয়টি গাহিয়াছিলেন, তাহা সেদিনও জানি নাই, আজিও জানি না। কারণ পরে এ বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করি নাই। রসিকের মিলন-গানের পূর্ববর্তী পদ—

হরি হরি কি ভেল গোকুল মাহ।
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গম
বিরহ দহনে দাহি যাহ॥
তরুকুল আকুল সঘনে ঝরয়ে জল
তেজল কুসুম বিকাশ॥
গলয়ে শৈলবর পৈঠে ধরণি পর
স্থল জল কমল হুতাশ॥
শুকপিকু পাখি শাখি 'পর রোয়ই
রোয়ই কাননে হরিণী।
জম্বুকি সহ অহি রহি রহি রোয়ই
লোরহি পঙ্কল ধরণী॥
রাই বিরহে বিরহি ব্রজমণ্ডল
দাবদহন সমতুল।
ইহ পুরুষোত্তম কৈছনে জীয়ব
টুটল প্রেমক মূল॥

বিজ্ঞানের কথা

অণুবীক্ষণের ইতিকথা

অমরজ্যোতি সেন

আজকাল আমরা যখন রেডিও সেটের পাশে বসে বিভিন্ন দেশের গান বাজনা শুনি অথবা কোনো আধুনিক সিনেমা হাউসে বসে সিনেমা দেখি এবং আমাদের প্রিয় চিত্র নট-নটীদের কণ্ঠস্বর শুনি তখন আমাদের একবারও মনে হয় না কখন ও কতদিন আগে কত সামান্য জিনিসেই না এ সমস্তের উৎপত্তি, যে সবের আরম্ভ এখন নেহাৎই ছেলে খেলা বলে মনে হয়। মাইক্রোস্কোপেরও আরম্ভ এই রকমভাবেই হয়েছিল এবং মাইক্রোস্কোপ কে আবিষ্কার করেছিলেন সে সংবাদটাও আমরা অনেকেই রাখি না. অথচ মাইক্রোস্কোপের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়ি না। মাইক্রোস্কোপের ভিতর দিয়ে আরও দেখান যে, যে সমস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি শক্তি দুর্বল হয়েছে তাদের জন্য এই সমস্ত স্বচ্ছ কাঁচ দ্বারা এমন যন্ত্র তৈয়ারী করা যেতে পারে যে, এর সাহায্যে তারা ছোট লেখা বড় করে পড়তে পারবে। ১৫৯০ থেকে ১৬০৭ সালের ভিতরে কোনো একটি তারিখে প্রথম মাইক্রোস্কোপ তৈয়ারী হয়েছিল বলে বিশ্বাস এবং তার কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন এই তিনজন ব্যক্তির মধ্যে একজন, প্রথম হ্যান্স্ জ্যান সেন, তাঁর ছেলে জ্যাকারিয়াস অথবা হ্যান্স্ লিপ্যারসে। এদের তিনজনেরই বাড়ি হল্যাণ্ডের মিডলবার্গ নামে জায়গায় এবং এঁরা চশমা তৈয়ারী করতেন।

চোলাই করতে পারে হল্যাণ্ডে তারা খুব সম্মানিত। লিউয়েনহোকের বয়স যখন অল্প তখন তাঁর বাবা মারা যান। তাঁর মা তাঁকে লেখাপড়া শিখতে স্কুলে পাঠান যাতে সে লেখাপড়া শিখে সরকারী চাকুরে হ'তে পারে। ষোলো বৎসর বয়সে তিনি স্কুল ত্যাগ করেন এবং অ্যামস্টার্ডাম শহরে একটি মুদীর দোকানে শিক্ষানবিশী করতে আরম্ভ করেন। অবশ্য আমাদের দেশের এবং ওদেশের মুদীর দোকানে অনেক প্রভেদ আছে।

একুশ বৎসর বয়সে তিনি আবার ডেল্ফট শহরে ফিরে আসেন এবং নিজেই একটি মুদীখানার দোকান খোলেন। এই সময় তিনি প্রথমবার বিবাহ করেন।



ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে গৃহীত যক্ষ্মারোগের বীজাণু



টরণ্টো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ গৃহীত একপ্রকার বর্ণহীন গ্যাসের ছবি

আমরা যখন এক বিচিত্র জগৎ পর্যবেক্ষণ করি তখন কি আমরা এই যন্ত্রটির আবিষ্কর্তাকে একবারও স্মরণ করি? না তার কিছু খোঁজ খবর রাখি!

যাই হোক মাইক্রোস্কোপ ঠিক কবে আবিষ্কৃত হয়েছিল তা বলা শক্ত। স্বনামধন্য রোমের সম্রাট নিরোর সেনেকা নামে একজন শিক্ষক ছিলেন,—সময়টা তখন প্রথম শতক,—তিনি লক্ষ্য করেন যে যদি একটি ফাঁপা কাঁচের গোলোক জলে ভর্তি করা হয় এবং সেই জলপূর্ণ গোলকের বিপরীত দিকে কোনো লেখা ধরা যায় তাহলে গোলকের ভিতর দিয়ে দেখলে সেই লেখাগুলিকে বড় দেখায়। এরপর বারো শত বৎসর পরে ছোট জিনিসকে বড়ো দেখবার জন্য আমরা ম্যাগ্নিফাইং লেন্সের উল্লেখ পাই এবং এর ব্যবহার দেখিয়ে দেন রজার বেকন। তিনি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আধুনিক মাইক্রোস্কোপের ভিত্তি স্থাপন ও তখনকার যুগে তার পূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন এ্যান্টনী লিউয়েনহোক। তাঁর আবিষ্কার শুধুই যে আর এক জগতের সন্ধান দিয়েছে তা নয় জীবাণু তত্ত্বের আরম্ভও সেইদিন থেকেই হয়েছে।

অ্যান্টনী লিউয়েনহোক জন্মগ্রহণ করেন ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ হল্যাণ্ডের ডেল্ফট নামক রটারড্যামের কাছে একটি ছোট্ট শহরে। লিউয়েনহোক ছিলেন বনেদী বংশের ছেলে আর দেশে তাঁদের বেশ খাতির ছিল কারণ তাঁরা ভাল মদ চোলাই করতে পারতেন। যারা ভাল মদ

এরপর কুড়ি বৎসর তাঁর বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে আরও একবার বিবাহ করেছিলেন এটুকু জানা যায় আর জানা যায় যে, তিনি ডেল্ফট শহরের সিটি হলের রক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই সময়েই তিনি চশমার কাঁচ অথবা অন্যান্য মোটা কাঁচ ঘসে ঘসে তাই থেকে ভাল ম্যাগ্নিফাইং লেন্স তৈয়ারী করতে আরম্ভ করেন। কোথায় যেন তিনি শুনেছিলেন যে, মোটা কাঁচকে ভাল করে ঘসতে পারলে তাই দিয়ে ছোট

জিনিসকে বড়ো দেখা যায়। লিউয়েনহোক ঘসে ঘসে এই রকম অনেক ভাল ভাল পরকলা তৈয়ারী করেছিলেন এবং সেগুলিকে কখনও রূপো, তামা অথবা সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখতেন।

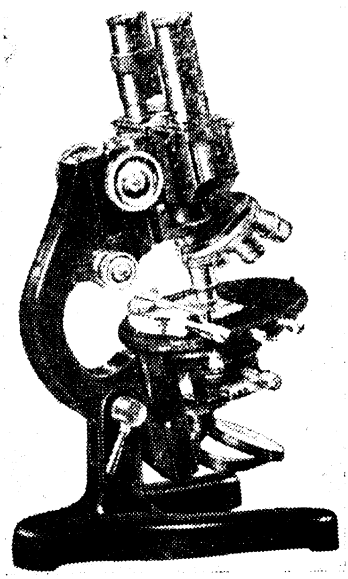
লিউয়েনহোক কিন্তু এই কাচ ঘসার দিকে যতটা মনোযোগ দিয়েছিলেন, লেখাপড়ার দিকে ততটা মনোযোগ দেননি। ওলন্দাজ ছাড়া আর কোনো ভাষা তিনি জানতেন না অথচ তখন ইউরোপের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই ভাষার নামে নাক সিঁটকোতেন, এটা নাকি ছিল দোকানদার আর জেলেদের ভাষা; তাঁরা কথা বলতেন ল্যাটিন ভাষায়। একটি বই যা লিউয়েনহোক পড়তেন সেখানি হ'ল ওলন্দাজ ভাষায় লেখা একখানি বাইবেল। লিউয়েনহোক লেখাপড়া জানলে কি হ'ত বলা যায় না, হয়ত 'কাচ-ঘসার' হীন কাজ করতেন না।

যাই হোক লিউয়েনহোক একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে লেন্স তৈয়ারী করতে লাগলেন এবং কয়েকখানি খুব ভাল লেন্স তৈয়ারী করে ফেললেন। এই রকম লেন্স তৈয়ারী করতে করতে একখানি কাচ আর একখানির সঙ্গে জুড়ে নানাভাবে অদল বদল করে ও পরীক্ষা করতে করতে তিনি সহসা এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেললেন যা হ'ল মাইক্রোস্কোপের জনক। তিনি এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রটি দিয়ে যা কিছু পান দেখতে আরম্ভ করেন, কখনও মাছির মাথা, কখনও উকুনের পা, কাঠের টুকরো আবার কখনও কসাইএর দোকান থেকে চেয়ে আনা একটা মাংসের সরু ছিবড়ে। তিনি দিনরাত্রি ভুলে গেলেন, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন এমন কি তাঁর ব্যবসা সব ভুলে তিনি তাঁর মাইক্রোস্কোপে লেগে রইলেন। কে জানে লিউয়েনহোক না জন্মালে পাস্তুর অথবা রবার্ট কখের জন্ম সম্ভব হ'ত কি না!

লিউয়েনহোকের এই সাধনায় সহানুভূতিসম্পন্ন কেউ ছিল না, কেবল ছিল তাঁর একমাত্র কন্যা ম্যারিয়া। ম্যারিয়া তার বাবার অত্যন্ত যত্ন করত এবং তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখত। লিউয়েনহোকও তাঁর মাইক্রোস্কোপে নতুন কিছু দেখলেই মেয়েকে ডেকে দেখাতেন, নইলে তাঁর তৃপ্তি হ'ত না।

আজকাল বৈজ্ঞানিক হওয়া সম্মানজনক কিন্তু লিউয়েনহোকের সময় জগৎ অন্য রকম ছিল, তাই সেই যুগে গ্যালিলিওকে জেলে পচতে হয়েছিল কারণ তিনি বলেছিলেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে; স্পেন দেশের বৈজ্ঞানিক মাইকেল সার্ভিতাসকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, কারণ মানুষের দেহের ভিতর কি আছে দেখবার জন্য মৃতদেহে অস্ত্রোপচার করেছিলেন! তখনকার বৈজ্ঞানিকদের অদৃষ্টে জুটত ঘৃণা বিদ্রূপ, উপেক্ষা। কিন্তু তাঁরাই পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের পথ সুগম করে গেছেন

এই সময়ে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ক্রমওয়েলের সময়ে ইংল্যাণ্ডে "অদৃশ্য কলেজ" নামে একটি বৈজ্ঞানিক সমিতি ছিল। সমিতিটিকে ক্রমওয়েলের ভয়ে অদৃশ্য হয়েই থাকতে হ'ত। রসায়ন শাস্ত্রের জনক রবার্ট বয়েল এবং আইজ্যাক নিউটন এই সমিতির সভ্য ছিলেন। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের চেষ্টায়



একটি আধুনিক মাইক্রোস্কোপ

এই সমিতি রয়েল সোসাইটি অফ ইংল্যাণ্ড নামে খ্যাত হয়। এখন ডেলফ্‌ট শহরে রেজিনার দা গ্রাফ নামে একজন বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তিনি স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করেন ও উক্ত সমিতির সভ্য ছিলেন। একমাত্র তিনি লিউয়েনহোকের মূল্য বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি লিউয়েনহোকের যন্ত্রে এক নূতন জগতের সন্ধান পেয়ে বিস্মিত হ'ন এবং সে তুলনায় তাঁর নিজের আবিষ্কার কত সামান্য উপলব্ধি করেন। তিনিই রয়েল সোসাইটিকে লিউয়েনহোকের বিষয় লেখেন। রয়েল সোসাইটি লিউয়েনহোককে তাঁর আবিষ্কারের বিষয় জানাবার জন্য অনুরোধ করেন। লিউয়েনহোক তাঁদের সে অনুরোধ রক্ষা করেন। তিনি তাঁদের যে পত্র লেখেন তার শিরোনামা ছিল "মিঃ লিউয়েনহোক কর্তৃক উদ্ভাবিত অনুবীক্ষণ যন্ত্রে মৌমাছির হুল ত্বক ইত্যাদির পর্যবেক্ষণের নমুনা।" লিউয়েনহোকের পত্রের ভাষা হয়ত খুব মার্জিত ছিল না, তিনি হয়ত অবান্তর অনেক কিছুই লিখেছিলেন, কিন্তু তাই রয়েল সোসাইটির সভ্যদের বিস্ময়াবিষ্ট করেছিল।

তখনও পর্যন্ত কিন্তু লিউয়েনহোক তাঁর মাইক্রোস্কোপ সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র যা দেখেছিলেন তা হচ্ছে পনীরে জাত একপ্রকার পোকা। বাস্তবিক পক্ষে লিউয়েনহোক এতদিন যা দেখেছিলেন তা অতিক্ষুদ্র হ'লেও খালি চোখে দেখা যেত, সেগুলিকে আরও বড়োভাবে তিনি তাঁর মাইক্রোস্কোপে দেখেছিলেন। আসল ইতিহাস আরম্ভ হ'ল সেইদিন যেদিন এক ফোঁটা পরিষ্কার বৃষ্টির জলে তিনি দেখলেন নানা রকম অতি ক্ষুদ্র পোকা সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছে। এ জগৎ এতদিন মানুষের কাছে শুধুই যে অদৃশ্য ছিল তা নয় অজ্ঞাতও ছিল। অ্যালেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন গ্রীক সৈন্যেরা হাতী দেখে আশ্চর্য হয়েছিল, কিন্তু এই হাতী ভারতীয়েরা বহুদিন থেকেই দেখে আসছে, নতুন কিছুই নয়; সীজার যখন বৃটেনে গেলেন তখন সেখানকার আদিম অধিবাসীরা গ্রীক সৈন্যদের 'ছানাবড়া' চোখ করে দেখেছিল, কিন্তু এই সব আদিম অধিবাসীরা পরস্পরকে যেমন দেখে আসছে, গ্রীক সৈন্যরাও সেই রকম পরস্পরকে আবাল্য দেখে আসছে। বিস্ময়ের কিছু নেই! প্রথম যেদিন বালবোয়া প্রশান্ত মহাসাগরকে গর্বিত দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তখন তাঁর মনের অবস্থা কি রকম হয়েছিল কে জানে! কিন্তু একজন মধ্য-আমেরিকাবাসীর কাছে প্রশান্ত মহাসাগরও যেমন বালবোয়ার কাছে ভূমধ্য সাগরও তাই! কিন্তু লিউয়েনহোক সেই সামান্য এক ফোঁটা জলে যা দেখলেন, যে বিচিত্র জগতের সন্ধান তিনি মানব জাতিকে দিলেন তার সন্ধান তাঁর আগে এর কেউ দেয়নি, আর সে জগৎ আর কেউ তাঁর আগে দেখেও নি।

আরও কিছুকাল পরীক্ষা চালিয়ে তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে লিউয়েনহোক লণ্ডনে রয়েল সোসাইটিতে এক দীর্ঘ পত্র প্রেরণ করলেন। তিনি অত্যন্ত সরল ভাষায় যা কিছু দেখেছিলেন সব লিখলেন কিছুই গোপন রাখলেন না। পরিষ্কার সুন্দর হস্তাক্ষরে তিনি লিখলেন কি এক বিচিত্র আর অজ্ঞাত জগতের সন্ধান তিনি পেয়েছেন, মাত্র এক বিন্দু জলে কত রকমের ক্ষুদ্রাণু ক্ষুদ্র প্রাণী ইতস্তত ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা শহরে যত লোক বাস করে, তত প্রাণী এক ফোঁটা জলে বাস করে। তাঁর সব কথা বোধ হয় সব সভ্যরা

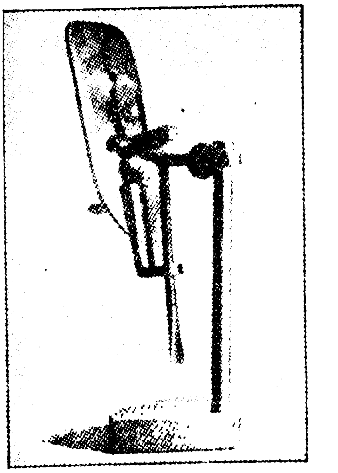
বিশ্বাস করেন নি; তাই তাঁর কাছে উত্তর-স্বরূপ একখানি পত্র এল। সভ্যরা জানতে চেয়েছেন লিউয়েনহোক কি করে তাঁর মাইক্রোস্কোপ তৈয়ারী করলেন আর তাঁর পর্যবেক্ষণ করবার পদ্ধতিটাই বা কি।

উত্তর পেয়ে লিউয়েনহোক কিন্তু খুশী হলেন না। তিনি আরও একখানি চিঠি লিখলেন। তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর এই আবিষ্কার তাঁর শহরের অনেক বিখ্যাত লোকে দেখেছেন, প্রমাণ স্বরূপে তিনি দুইজন সম্মানিত ব্যক্তির পত্র সমর্থন স্বরূপ সেই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু কি করে মাইক্রোস্কোপ নির্মাণ করেছেন সে কথা জানালেন না। অতএব রয়েল সোসাইটি লিউয়েনহোকের কাছে বিফলকাম হয়ে তার দুজন সভ্য রবার্ট হুক এবং নিমিয়া গ্রুকে একটি ভালো মাইক্রোস্কোপ তৈয়ারী করবার ফরমাস দিলেন। ১৬৭৭ সালে ১৫ই নভেম্বর তারিখে হুক একটি মাইক্রোস্কোপ তৈয়ারী করে আনলেন কেবলমাত্র লিউয়েনহোকের পত্রের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য। এইবার সত্য সত্যই রয়েল সোসাইটি লিউয়েনহোককে বিশ্বাস করলেন এবং তাঁদের ত্রুটি সংশোধন করতে সময় নষ্ট করলেন না। তাঁরা লিউয়েনহোককে রয়েল সোসাইটির সভ্য মনোনীত করলেন এবং রূপোর আধারে করে সনন্দপত্র পাঠিয়ে দিলেন। লিউয়েনহোক এইবার খুশী হলেন।

রয়েল সোসাইটি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ডক্টর মলিনো নামে একজন বৈজ্ঞানিককে লিউয়েনহোকের কাছে পাঠালেন, উদ্দেশ্য ছিল বোধ হয় একটি মাইক্রোস্কোপ সংগ্রহ করা, কিন্তু লিউয়েনহোক কিছুতেই একটি মাইক্রোস্কোপ দেবেন না, কোন মূল্যে বিক্রয় করবেন না।

এর পর লিউয়েনহোক যতদিন জীবিত ছিলেন তিনি তাঁর যন্ত্রের উন্নতি সাধনের চেষ্টাই করেছেন এবং নূতন নূতন পরীক্ষাও করেছেন। তিনি রয়েল সোসাইটিতে মোট তিন শত পঁচাত্তরখানি এবং ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমি সায়েন্সে সাতাশখানি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর মাইক্রোস্কোপে সূক্ষ্ম রক্তশিরা, রক্তকণিকা, পেশী-তন্তু, পুরুষের শুক্রাণু ইত্যাদি যা দেখেছিলেন, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সতরশ-তেইশ খৃষ্টাব্দে একানব্বই বৎসর বয়সে লিউয়েনহোক মারা যান। তিনি তাঁর মৃত্যুশয্যায় তাঁর বন্ধু হুগলিয়েটের কাছে অনুরোধ করে যান যে, তিনি রয়েল সোসাইটির নামে দুখানি পত্র লিখে রেখেছেন, হুগলিয়েট যেন পত্র দুখানি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করে রয়েল সোসাইটিকে পাঠিয়ে দেন। এই পত্রদ্বয়ে হয়ত মাইক্রোস্কোপ প্রস্তুত করবার বিবরণ দেওয়া ছিল। হুগলিয়েট তাঁর বন্ধুর শেষ অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

এতক্ষণ গেল মাইক্রোস্কোপের আবিষ্কার ও আবিষ্কারকের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এখন আমাদের কয়েক ধাপ পার হয়ে আধুনিক যুগে আসতে হবে। আধুনিক যুগে মাইক্রোস্কোপের অবশ্য খুবই উন্নতি হয়েছে সে খবর আমরা সকলেই কিছু কিছু রাখি। আমরা সাধারণতঃ দুই প্রকার মাইক্রোস্কোপের সংবাদ জানি, প্রথম হল সাধারণ মাইক্রোস্কোপ যার সাহায্যে কোন ক্ষুদ্র জিনিষকে দু-তিন হাজার গুণ পর্যন্ত বড় দেখায়, তারপর হ'ল আলট্রা-ভায়োলেট মাইক্রোস্কোপ। সাধারণ মাইক্রোস্কোপে



লিওয়েনহোকের ব্যবহৃত যন্ত্র—একে মাইক্রোগ্রাফীরজনক বলা যেতে পারে

আমরা সাধারণ আলোর সাহায্যে দেখতে পাই, কিন্তু আলট্রাভায়োলেট মাইক্রোস্কোপে আলট্রাভায়োলেট রশ্মির সাহায্যে দেখতে হয়, যার ফলে কোন জিনিস পাঁচ হাজার গুণ পর্যন্ত বড়ো দেখা যায়।

কিন্তু এই শেষ নয়। এমন মাইক্রোস্কোপ আবিকৃত হয়েছে যার সাহায্যে কোন ক্ষুদ্র জিনিসকে দশ হাজার এমন কি তিরিশ হাজার গুণ বড় দেখা যায়। এই মাইক্রোস্কোপের নাম হল ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ। এতদিন যে সমস্ত রোগের জীবাণু যেমন টাইফয়েড, হুপিং কফ, ইনফ্যাণ্টাইল প্যারালিসিস কোন মাইক্রোস্কোপে দেখা যেত না, সে সমস্তই এখন ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখা যাচ্ছে। এক কথায় সাধারণ মাইক্রোস্কোপে যদি যক্ষ্মার জীবাণু দেখা যায়, তাহলে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপে তার গোঁফ (যদি থাকে) দেখা যাবে। ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ কেবল জীবাণুতত্ত্ববিদ্‌দেরই সাহায্য করে না। নানা প্রকার শিল্পেও এর মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। যেমন সিমেণ্টের দানার গঠন এই মাইক্রোস্কোপে দেখে তার আরও উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে। যক্ষ্মা, সিফিলিস এবং ইরিসিপেলাস ইত্যাদি রোগের জীবাণু এই মাইক্রোস্কোপে দেখে এই সমস্ত জীবাণু সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য জানা গেছে। যে সমস্ত জীবাণু কোন মাইক্রোস্কোপে দেখা যেতনা, সেসব এখন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা যাচ্ছে।

পৃথিবীর দুইটি বিখ্যাত বৈদ্যুতিক কোম্পানী ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন; জার্মানির সিমেন্স (ঠিক উচ্চারণ বোধ হয় জীমেন্স) কোম্পানী এবং আমেরিকার আর সি এ অথবা রেডিও কর্পোরেশন অফ্ আমেরিকা। সিমেন্স কোম্পানীর আবিষ্কারের বিষয় আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারিনি, তবে আর সি এর বিষয় কিছু জানতে পারি। আর সি এ কোম্পানীর নাম আমরা জানি সিনেমা গৃহের শব্দযন্ত্র ব্যাপারে, রেডিও যন্ত্র ইত্যাদিতে। ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপের সম্ভাবনা অনুমান করে আর সি এ তিনজন বৈজ্ঞানিককে গবেষণায় নিযুক্ত করেন, তাঁদের নাম ডক্টর ভি কে জোরোকিন, ডক্টর ল্যাডিসলস ম্যারটন ব্রুসেলস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং টোরোণ্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের জেমস্ হিলিয়ার। এ ছাড়া আরও একজন সাহায্য করেছেন, আর্থার ডবলিউ ভ্যান্স। তাঁরা যে মাইক্রোস্কোপ তৈরী করেছেন এইখানে তার ছবি দেওয়া হল।

বহুদিন পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল পদার্থের চরম পরিণতি হল 'অ্যাটম' অথবা পরমাণু এবং অ্যাটম অবিভাজ্য। আমরা যদি খানিকটা জল নিয়ে ক্রমশ ভাগ করতে থাকি, তাহলে সেই জল এমন অবস্থায় আসবে, যাকে আর ভাগ করলে জল থাকবে না, এই হ'ল জলের অণু (molecule)। জলের অণুকে ভাগ করলে আমরা পাব দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটি অক্সিজেন পরমাণু। এখন আমরা জানতে পেরেছি যে, প্রত্যেক অ্যাটমের একটি নাভি আছে এবং নাভিকে বৃত্তাকারে আরও একটি ক্ষুদ্র কণিকা প্রদক্ষিণ করে যার নাম হল ইলেকট্রন এবং এই ইলেকট্রনগুলি নেগেটিভ তড়িৎযুক্ত। ইলেকট্রন ছাড়া পজিটিভ তড়িৎযুক্ত কণিকা আছে যার নাম হল প্রোটন এবং আরও কণিকা আছে যেমন পজিট্রন, নিউট্রন ইত্যাদি যাদের সঙ্গে বর্তমান প্রবন্ধের কোন সম্পর্ক নেই।

এখন ইলেকট্রনকে স্বতন্ত্রভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। প্রকাশ যে, ইলেকট্রন-বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে। ইলেকট্রনকে এখন থেকে নানা কাজে খাটিয়ে নেওয়া হবে যার ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের

কাজ অনেক সহজ ও সুগম হয়ে উঠবে। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপকে দেখে কিন্তু মোটেই মাইক্রোস্কোপ বলে মনে হয় না। এই যন্ত্রটি লম্বা একটি থামের মতো, উচ্চতা প্রায় সাড়ে ছয় ফুট আবার এই থামটি একটি ডেস্কের উপর বসান থাকে যে ডেস্কে কতকগুলি হাতল এবং ঘড়ীর মতো যন্ত্র আছে যাদের সাহায্যে মাইক্রোস্কোপটিকে চালান হয়। থামটির ভিতর একেবারে উপরে আছে একটি খুব সরু টাংস্টেন ধাতুর তারের সূক্ষ্ম কুণ্ডলী। যখন এই ট্যাংস্টেন কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালান হয়, তখন এই কুণ্ডলী থেকে ইলেকট্রন স্রোত প্রবাহিত হয় ও চুম্বক সাহায্যে তাদের গতিপথ বাঁকিয়ে ফোকাস করা হয়। সমস্ত থামটির ভিতর কিন্তু বায়ুশূন্যে রাখা হয় এবং কোন নিদর্শন দেখবার সময় যন্ত্রটিকে নাড়াচাড়া করলেও যাতে ভিতরে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করা আছে। থামটির ভিতর যত বেশী বায়ুশূন্য রাখা হবে এবং তড়িৎ-বিভব যত বেশী হবে ইলেকট্রন স্রোতের গতি এবং ঢেউএর দৈর্ঘ্য ততই ছোট হবে এবং এই মাইক্রোস্কোপের কার্যকারিতাও তত বেশী বাড়বে। ক্রমশ এমন দিন আসবে যেদিন এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুর গঠন দেখা যাবে।

পোকা

শ্রীসুশীল রায়

বড় বড় বিষয় নিয়ে বড় একটা ভাবিনে। অনেক বড় বড় লোক আছেন সে-সব বিষয় ভাববার জন্যে। আমি পোকা নিয়ে বিশেষ ভাবিত হয়ে পড়েছি। বড় বড় পোকা নিয়ে নয়, অতি নগণ্য আর ছোট পোকা নিয়ে।

গুঁদিগুঁদি সবুজ পোকা দেখেছেন? বিশেষ একটা পর্ব ছাড়া তারা কিন্তু বড় একটা লোকালয়ে আসে না। পোকা সম্প্রদায়ের মধ্যে এরা একটু সৌখীন জাতের। লোকালয় যখন অন্ধকার, তখন এরা লোকালয় থেকে সরে থাকে। উৎসবের আলোয় চারদিক যখন ঝলমল করে ওঠে, তখন এরা দলে দলে কাতারে কাতারে ক্ষুদে জঙ্গী বিমানের মত লোকালয় আক্রমণ করে। দেয়ালীর দিনেই এদের আক্রমণের মাত্রা ওঠে চরমে। সেদিন পৃথিবীর অমাবস্যা, কিন্তু এদের সেদিন যেন পৌর্ণমাসী পর্ব।

বুকের ওপর বই নিয়ে আলো জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। অগণ্য পোকার কলরবে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলো। আমি চিৎপাত হয়ে পড়ে আছি গালিভারের মত, আর অগণ্য লিলিপুট আমাকে ঘেরাও করেছে। আমার নাকে মুখে চোখে তারা নির্বিবাদে ট্রেসপাস করেছে। আইনভঙ্গের জন্যে একটুকু ভয় ডর নেই। চারদিক তাকিয়ে দেখলাম, একি, হঠাৎ এমন নিবিড় অরণ্য রচনা হয়ে গেছে কি করে? আমার ঘরের দেয়াল, ছাত আর মেঝে সবুজ আস্তরণে ঢাকা। বালবের চারদিকে অজস্র পাহারাদার পোকা পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এদের জন্মের ইতিহাস আমি জানিনে। কবে কখন এবং কেন এরা পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে, কোন্ বনের অখ্যাত লতায় পাতায় এদের ঘরবাড়ি বাঁধা তাও জানিনে। জনকলকোলাহল এড়িয়ে কত দূরে এরা থাকে? কেন এরা আসে লোকালয়ে? লোকালয় আক্রমণ করে কেন? বলতে পারিনে। আজ এরা পাখায় পাখায় বনের কণা কুড়িয়ে কুড়িয়ে আমার ঘরের মধ্যে ছিটিয়ে দিয়েছে অরণ্য। আমি যেন সত্যি সত্যি অরণ্য-গন্ধ পাচ্ছি বলে মনে হতে লাগলো। শুয়ে শুয়ে আমি নিশ্চলভাবে দেখতে লাগলাম এই পোকাদের পাগলামী। উন্মত্ত নেশায় এরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ঘরময়, বালবের কাচে ধাক্কা খেয়ে কেউ পড়ছে মেঝেতে ছিটকে, কেউ-বা দেয়ালে গিয়ে বসে দম নিচ্ছে।

আমার মাথার মধ্যেও পোকা ঢুকেছে, চুলের মধ্যে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। হাত দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, মাথায় পোকার টুপী পরিনি তো? মনে হচ্ছিলো, মাথার বাইরেটা ঘেরাও করেই খুসি হয়নি ওরা, আমার মাথার ভিতরেও যেন ওরা ঢুকে পড়ছে। আমার সমস্ত চিন্তা ও বুদ্ধি পোকায় ছাওয়া হয়ে গেছে। এদের বাদ দিয়ে আর আমি ভাবতে পারছিনে, আমার মস্তিষ্কের শিরায় শিরায় যেন পোকার স্রোত বয়ে চলেছে।

আমার চারদিকে অগণ্য পোকার জনতা। এদের হাত থেকে নিস্তার যেন আমার নেই। আমি অসহায়ের মত বসে বসে আমার এই চরম পরাভবের জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। সেই সঙ্গে আবার আনন্দও হচ্ছিলো খুব। এক চাপড়ে যে পোকাকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারি, তাদের হাতে এমন কাবু হয়ে পড়ায় ওদের জয়কে নিজের জয় ভেবে বেশ খুসি হয়ে উঠছিলাম। ঠিক বটে, এরই নাম একতা। আমার একত্বের ওপর ওদের একতার এই প্রভাব দেখে চমকেও উঠছিলাম অবশ্য। আমার গালিভারত্ব নিঃশেষে কোথায় উবে গেলো, এখন দেখছি এই লিলিপুটেরাই যেন আমার রকম সকম দেখে গালভরা হাসি হাসছে।

শব্দ করে আমিও একটু হাসতে গিয়েছিলাম হয়ত, হঠাৎ আমার গলা টিপে ধরলো ওদের মধ্যেরই একজন। গলার মধ্যে থেকে তাকে বার করার জন্যে হাসির বদলে কাশি এলো। একটু হাসবারও হুকুম নেই দেখছি। ভাঙাগলা মেরামত করে নতুন করে হাই তুলতে গিয়েছি; বুঝলাম, ওঁৎ পেতেই ছিলো ওরা, এই অসতর্কতার সুযোগে ওদের কয়েকজন আমার শরীরের অভ্যন্তরে ঢুকে গেলো। একে নাকি ইনফিলট্রেশন বলে। আশ্চর্য হয়ে ভাবছিলাম, প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই পোকা, আধুনিক রণকৌশল শিখে ফেলেছে কি করে! ক্ষুদে পোকার এই সম্মিলিত বাহিনী আমাকে ঘেরাও করেছে। আমার পালাবার পথ যেন আর নেই। নিরুপায় নিশ্চল হয়ে বসে আমি এদের আক্রমণের ধারা লক্ষ্য করছিলাম। কোনো একটা বিশেষ নিয়ম মেনে এরা আমাকে আক্রমণ করছে না। আমাকে একা পেয়ে এরা যেন অনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। যেদিক থেকে খুসি আর যেমন করে ইচ্ছে এরা আমার ওপর দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আমার শারীরিক ক্ষতি কিন্তু এতে একটুও হচ্ছিলো না, কিন্তু আমার মন জখম হয়ে যাচ্ছিলো। আমার মেজাজ নিয়ে এরা লোফালুফি খেলা খেলছে, মনে হতে লাগলো। পড়তে পড়তে আলো জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে যে মানসিক বিলাস আছে, এদের আক্রমণে তা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। মন তাই ভালো লাগছিলো না। মেজাজ তাই গরম হয়ে উঠছিলো। হাত নেড়ে নেড়ে, মাথা ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে এদের এই বে-আইনী আক্রমণের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছিলাম। কিন্তু, হায়, আমার সে নালিশ শুনবার মত লোক কই। আমি এখন পোকাক্রান্ত, পোকাই এখন আমার সুখ-দুঃখের মালিক। আমার নালিশ তো

এখন তাদের আদালতেই পেশ করতে হবে। যারা আমার সুখের নিদ্রা নষ্ট করেছে, আমার রাত্রের শান্তি ভঙ্গ করেছে, তাদের কাছেই তাদের নামেই নালিশ করতে হচ্ছে আমাকে। তাই ক্রমাগতই মাথা নাড়ছিলাম।

আমার মাথার এই অস্বাভাবিক আন্দোলন দেখে ওরা হয়ত ভেবেছিলো আমার মাথারই কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, তাই আমার মাথা ছেড়ে মাথার চারদিকের আকাশে তারা উড়ে বেড়াতে লাগলো। তারা মাথা খাটিয়ে হয়ত কিছুতেই বুঝতে পারলো না—আমার মাথা নড়ে কেন। তাই কেউ কেউ দেয়ালের কাছে ফিরে গেলো, কেউ চ'লে গেলো বাল্বের কাছে। কেউ হয়ত ভূপাতিত বিমানের মত ছিটকে পড়লো মেঝেয়। এত ছোট ওরা, এত ক্ষুদ্র ওরা—খালি চোখে ঠিক ঠাহর করা কঠিন। জীব-জগতে ওরা অণু পরমাণুর সামিল। কিন্তু ছোটো ব'লে ওদের উড়িয়ে দেওয়া তো যায় না—আমার মত এমন মস্ত একটি জীবকে জব্দ তো ক'রেছে ওরা।

ওদের এই আণবিক আক্রমণে আমি কাবু হয়ে গেছি। বাধা দেবার আর ইচ্ছে আমার নেই। আমি হয়রান। এই অণু পরমাণুর মত গুঁদিগুঁদি সবুজ পোকার কাছে আমি আত্মসমর্পণ ক'রে বসে রইলাম। আমার এই পরাজয়ের জন্যে আপনারা আমাকে ব্যঙ্গ করতে পারেন। কিন্তু ব্যঙ্গের পাত্র যে আমি নই, আপনাদের বোঝাব কী ক'রে।

জীবনে আমার অনেক দেয়ালী এসেছে, অনেক পোকা দেখেছি। কিন্তু এবারকার দেয়ালী আমার জীবনে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। একই সঙ্গে এত পোকার সমাগম জীবনে এই প্রথম দেখলাম। আকাশের তারা আর সাহারার বালু গণনা করা যায় না, কিন্তু এ পোকার সংখ্যা আকাশের তারার চেয়েও বেশী, হয়ত সাহারার বালুর চেয়ে কিছু কম। চোখের দৃষ্টির মধ্যে যেটুকু আকাশ পাই, সেটুকু আকাশের তারা অনেক দিন গুণেছি—হয়ত ভুলচুক একটু হ'য়েছে, —তবুও গুণেছি। কিন্তু আমি সাহারার বালু গণনা কখনো করিনি, আর পোকার সংখ্যা গণনা করার ব্যর্থ চেষ্টা করিনি।

চারিদিকে সবুজের মিছিল। এই সীমাহীন সবুজ সমুদ্রের মধ্যে আমি যেন একখণ্ড দ্বীপ। চিৎপাত হ'য়ে আবার শুয়ে পড়েছি। আমার শরীরের সৈকতে এই ঢেউ আছাড়া খেয়ে পড়ছে। ধাক্কা খেয়ে বার বার ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু সমুদ্রের ঢেউয়ের মত ধৈর্য পৃথিবীতে আর কার আছে, বলুন। কেউ আবার ফিরে আসছে, আবার ফিরে যাচ্ছে। তার যাতায়াতের বিরাম নেই। অসীম ধৈর্য এই পোকাদেরও।

বিশেষ ভাবিত হয়ে পড়েছি, পরমাণু তুল্য এই পোকাদের নিয়ে। অদ্ভুত এনার্জি এদের, অদ্ভুত গোঁ। বৈজ্ঞানিক মহলেও নাকি পরমাণুর শক্তি নিয়ে চিন্তাপ্রবাহ ব'য়ে চ'লেছে। আমার ভাবনা অবশ্য বৈজ্ঞানিক ধারায় নয়। আমার ভাবনাটা নিছক দুশ্চিন্তা। ভাবছিলাম, সভ্যজগতের মধ্যে বর্বর ও বন্য এই পোকাদের আমদানী করলো কে। এতটুকু ভদ্রতা এতটুকু শিষ্টাচার জানে না এরা। আমার মত এমন নিরস্ত্র ও নিরীহ একজন ভদ্রলোক একটু সুখের নিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়েছে দেখে এদের বুঝি তা সহ্য হ'লো না। এরা দলে দলে এসে তাকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগিয়ে দেওয়ার আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠ্‌লো।

রাত্রি ক্রমেই আরো গভীর হয়ে উঠ্‌তে লাগলো। বাইরের দেয়ালীর আলোর গতি ধীরে ধীরে সব নিভে গিয়েছে। পৃথিবীর অমাবস্যাকে এই আলোর সারি দুহাতে ঠেলে সরিয়ে রেখেছিলো এতক্ষণ। ক্লান্ত শিখা নিস্তেজ হ'য়ে যেতেই পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে পৃথিবীর অমাবস্যা। আমার চোখের পাতাও ক্লান্তিতে ভারি হ'য়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টি আর জাগিয়ে রাখতে পারছিলাম না। পোকাদের পাখাও বুঝি রণক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অগত্যা নির্ভয়ে শুয়ে পড়লাম।

জেগে দেখি, বাইরে ভোরের আলো চমকাচ্ছে। ছাতে দেয়ালে আর সবুজের চিহ্ন চোখে পড়লো না। তাহলে রাত্রের সমস্ত ঘটনা কি নিছক স্বপ্ন। উঠে ব'সলাম। ঘরের মেঝে সবুজ পোকায় ঢাকা। দেয়াল থেকে ছাত থেকে সব খসে খসে পড়ছে তাহলে। এক রাত্রির মহোৎসবের জন্যেই কি তারা তবে এসেছিলো। আমার সম্মুখে অগণিত পোকার মহাশ্মশান প'ড়ে।

ধীরে ধীরে মেঝেয় পা দিলাম। বেশ পুরু হয়ে পড়ে আছে তারা। মনে হলো, আমার পায়ের নীচে যেন ঘাসের গালিচা পাতা। সারা রাত্রির বিরক্তির পর প্রতিহিংসার আগুনে জ'লে উঠ্‌লাম। সেই মৃত পোকার কংকালের ওপর বীরদর্পে হেঁটে বেড়াতে লাগলাম। পায়ের নীচে মসৃণ মখমলী প্রলেপ অনুভব করছিলাম, তবে মনের ওপর সেই প্রলেপের অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হচ্ছিলো।

আমার এই প্রতিহিংসা বৃত্তিকে আপনারা অনুমোদন করবেন কিনা জানিনে।



ঘর-সংসার

শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সবে মাত্র ভোর হয়েছে। আকাশের পূর্বপ্রান্ত জবাফুলের মত টক্‌টকে লাল। অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি তাতে আবার পাহাড়ঘেরা এই দেশ। অসম্ভব শীত।

বিছানার ডান পাশের জানালা দিয়ে তাকালেই চোখে পড়ে প্রথমে হাত চারেক দূরে একসার আতা গাছ, তারপর একটা ছোটমত এবড়ো খেবড়ো মাঠের পরেই শুরু হয়েছে শালবন। যতদূরে চোখে পড়ে কেবল বন, আর বন। দূরে দিগন্তে মিশে গিয়েছে যেন।



অতসী তাকে দেখিয়েছিল...তার নিজের আঁকা ছবিগুলি

নিজের শোবার ঘরের এই জানালার পাশটি অতসীর অতিপ্রিয়। কি কৃষ্ণপক্ষ আর কি শুক্লপক্ষ, সমান অদ্ভুত রূপ নিয়ে ধরা দেয় তার চোখে—ঐ শালের বন।

জানালার পাশের আতা গাছের সার, আর অসমতল, পাথর ছড়ান ছোট্ট মাঠটি।

ঘরের দোর খুলে অতসী একবার তাকালো সকালের সিঁদুরের মত লাল আকাশ আর সামনের পাহাড়ের ধোঁয়াটে চূড়াটার দিকে। বাইরের হাওয়ায় ভীষণ শীত করছে অতসীর। অথচ ঘরের ভেতরে যেতেও মন চাইছে না তার।

শালের বন আর পাহাড়। কি যেন এক রহস্যের কুহক নিয়ে আকর্ষণ করে তার মনকে। আরণ্য প্রকৃতি, আর পাহাড়ে দেশের এই দূরপ্রসারী বন্ধুর পরিবেশ উদাস করে তোলে, আকুল করে তোলে তাকে।

একটা বকের সারি শ্বেত পদ্মের মালার মত উড়ে চলেছে পাহাড়ের পাশ দিয়ে। ওদের পাখার হাতছানিতে অতসীর মনে এসে পৌঁচেছে দূর দিগন্তের আহ্বান। রাত্রির স্তব্ধতার পর আহারের সন্ধানে চঞ্চল হয়ে উড়ে চলেছে ওরা। ওদের শুভ্র পাখায় পড়েছে শিশুসূর্যের আরক্তিম কিরণ।

আজ কাজের তাড়া অতসীর কম। বাড়িতে পুরুষদের কেউ উপস্থিত নেই যে তাদের জন্য তাড়াতাড়ি খাবার আর চা করতে হবে। যদিও চাকরটিও আজ দুদিন হল চলে গিয়েছে তবু অতসী ভয় পায় না। এই পাহাড়ী দেশে প্রতিটি কাজের জন্য পরের মুখের দিকে—তাকাতে হয়। তবু ছোটজা ঝরণাকে সাহস দেয় সে—ভয় কিরে? ভগবান হাত পা দিয়েছেন।

ঝরণা উত্তর দেয় না। বড়জা'র কথায় মনে মনে একটু সাহস হয়ত সে পায়।

অতসীর ঠাকুরপো অর্থাৎ অখিল ডাক্তার। অবশ্য সে এখান থেকে মাইল দশেক দূরের এক শহরে। সেখানেই সে তার ব্যবসায়ের কেন্দ্র করেছে। মাইল দশেক পথ সে সুবিধে পেলেই পাড়ি দিয়ে এসে এখানে কাটিয়ে যায় দু এক দিন। ওখানে সুবিধে নেই বলে ঝরণাকে সে নিয়ে যায় না নিজের কাছে।

খুব বসতি নেই এদেশে। বিস্তৃত মাঠের ভেতর ফাঁকা ফাঁকা দু একটা বাড়ী। আশে পাশে কয়েক ঘর সাঁওতাল নিয়ে এক একটি ছোট্ট পাড়া, তেঁতুল, আমলকী মহুয়া আর শালগাছে ঘেরা। দূরে পাহাড়ের গায়ে দেবদারুর বন।

চমৎকার দৃশ্য এখানকার। কিন্তু অভাব এখানে মানুষের। সঙ্গের অভাবে হাঁপিয়ে ওঠে প্রাণ। পুজো, বড়দিন, এমনিতেও প্রায় সব সময়েই স্বাস্থ্য-অন্বেষণকারীর ভীড় হয় এখানে। কিন্তু ওরা যেন যাযাবর পাখীর ঝাঁক। কোত্থেকে যেন আসে, আবার দুদিন বাদে কোথায় যেন চলে যায়। আলাপ-পরিচয় জমতে না জমতেই বিদায় নেয় তারা।

ঝরণা বলে—জান দিদি, আমরা যেন মরু-যাত্রী। অনল-বর্ষী আকাশের নীচে নরম বালির পথে চলেছি ত চলেছিই। মরূদ্যান দু একটা যাওবা পাই, চলার গতিতে আবার তা হারিয়ে ফেলি।

অতসী বলে—আমরা কি রকম যেন অদ্ভুত হয়ে গেছি, না ভাই? কেমন যেন



তার মুগ্ধ দৃষ্টি একবার বুলিয়ে নিয়েছিল—

অকাল-বার্ধক্য এসে গিয়েছে আমাদের মনে।

জীবনে বহু নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ হয়েছে ওদের দুজনের। আর এই দেশে যারা ভিড় জমায় দুদিনের জন্য, তাদের প্রত্যেককেই দুদণ্ড তাকিয়ে দেখবার মতো। শাড়ি-গহনায় দেহের অপূর্ব সৌন্দর্য ও সাজসজ্জায়, মার্জিত রুচি ও জ্ঞানের মর্যাদায়, ব্যবহারের চমৎকারিত্বে প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য ওদের মনে ছাপ রেখে যায়।

জানবার শেখবার শুনবার আগ্রহ ওদের দু'জনেরই খুব বেশী। কিন্তু আগ্রহ থাকলেই যে তা পূর্ণ হবে, জগতের নিয়ম তা বলে না।

অতসীর স্বামী অভয়। অভয়ের বিরাট মনের কোন্ কোণে অতসীর ঠাঁই, তা সে নিজেই বোঝে না!

অভয় নাম-করা চিত্রশিল্পী। প্রথম শ্রেণীর বাঙলা মাসিক পত্রগুলো খুললেই তার

আঁকা ছবি প্রথমেই চোখে পড়ে। বাড়ীতে থাকে সে খুব অল্পসময়। যেটুকুও বা থাকে সে সময়টুকু সে কাটায় তার ঘরের কোণে বসে ছবি আঁকবার সরঞ্জাম নিয়ে। সকাল বিকেল তার কাটে পাহাড় শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে, নয়ত বন ও নদীর ধারে বেড়িয়ে।

জ্যোৎস্নাস্নাত প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে অভয় যখন তন্ময় হয়ে যায়, তখন তার মনে পড়ে অতসীরই কথা। কাছাকাছি থাকলে, তাকে ডাকে। কিন্তু অতসী বসতে পারে না এক মুহূর্ত। বলে—রুটি ভাজছি, আলু ভাজা চাপিয়ে দিয়ে এসেছি, পুড়ে যাবে যে। নয়ত অন্য কোন কাজের কথা বলে। অভয় হাতের তুলি নামিয়ে রাখে। নয়ত কবিতার বই বন্ধ করে বলে, তোমার কিছু হবে না অতসী, আগের সে মন আর নেই তোমার।

সত্যিই তার সে মন আর নেই। নিজেই বোঝে অতসী তা। পাঁচ বছরের বিবাহিত জীবনের আগে সে কি ছিল এবং বিয়ের পরেও দুবছর তার কেমন কেটেছে, তাই সে ভাবে।

আজ সে-কথা ভাবতে বেদনায় তার বুক ভরে যায়।

সত্যিই সে কি ছিল! সে নিজেও আঁকত ছবি। তার নিজস্ব ছোট ঘরটির নীলাভ দেওয়ালে সাজান ছিল তার নিজের আঁকা ফ্রেমে-বাঁধা ছবির সার। প্রকৃতির কত অপূর্ব দৃশ্য তার নিপুণ তুলিকায় রূপায়িত হয়ে উঠত। পৃথিবীর রূপে রসে আনন্দঘন অনুভূতিতে ভরে উঠত তার মন। পৃথিবীকে তখন সে যে দৃষ্টি দিয়ে দেখত, সে দৃষ্টি যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। শিল্পীজীবনের সমাধি হয়েছে অতসীর। এক এক সময় বড় দুঃখ হয় তার।

কেমন করে তার পরিচয় হল অভয়ের সংগে, সে কথা অতসীর ভোলবার নয়। তার বন্ধু মধুমালতীর কি রকম দাদা হত অভয়। মধুমালতীদের বাড়ি এসেছিল অভয় তার নিমন্ত্রণ রাখতে। মধুমালতী অভয়কে লিখেছিল,—এখানকার দৃশ্য সুন্দর। সৌন্দর্যপিপাসু ভবঘুরে অভয় সেদিন পেয়েছিল আনন্দময় লোকের সন্ধান। সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা আর কিছু ছিল না অভয়ের। তার অন্য লক্ষ্য নেই জীবনে আজও। অতসী সেদিন নিমন্ত্রণ করেছিল মধুমালতীর সংগে অভয়কেও চা-এর পার্টিতে। অভয় সেদিন ওদের বাড়ি গেলে অতসী তাকে দেখিয়েছিল খুব সংকোচের সংগে তার নিজের আঁকা ছবি গুলি। অভয় সেদিন মুগ্ধ হয়ে দেখেছিল অতসীর আঁকা রঙে ও রেখায় সুন্দর সুন্দর ছবি। ছবিগুলি দেখার পর তার মুগ্ধ দৃষ্টি সে একবার বুলিয়ে নিয়েছিল অতসীর মুখের উপর দিয়েও। কিন্তু সে অতসী আজ আর নেই। কোথায় গেল অতসীর সেই শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী, আর কোথায় গেল সেই শিল্পসাধনার ঐকান্তিক একাগ্রতা?

অভয় অবাক হয়ে ভাবে, মানুষ এতও বদলায়? না অতসী বদলে গেল বড় তাড়াতাড়ি। অতসীর দিকে তাকিয়ে অভয় প্রায়ই ভাবে একথা। কেবল সংসারের কাজ আর কাজ। উদয়াস্ত সংসারের হাজারো রকমের কাজ নিয়েই অতসী ব্যস্ত। তার ছবি আঁকবার 'ইজেল' ধূলিময় হয়ে পড়ে রয়েছে ঘরের এক কোণে। কোথায় তুলি, কোথায় রং, কোনও খোঁজ রাখে না অতসী। মুখে মাঝে মাঝে অনুযোগ জানায় অভয়। নিজের ছবি আঁকার উৎসাহ দিয়ে প্রেরণা জাগাতে চায় সে অতসীর মনে। কিন্তু কেবল বিষণ্ণ হাসি হেসে সরে যায় সে।

অভয় আজও ভোলেনি অতসীর সেদিনকার সেই রূপ, সেই আলতো-করে বাঁধা একরাশ চুলের খোঁপা, সেই প্রতিভা-সমুজ্জ্বল, অথচ স্বপ্নালস চোখ দুটি, আর ছন্দোময় দেহের স্বচ্ছন্দ গতি। সে দিন নীল শাড়িতে বেশ মানিয়েছিল অতসীকে। প্রায় সময়েই অভয় সে কথা টেনে আনে। বলে,—তুমি আজকাল নীল শাড়ি পরতে ভালবাস না কেন, অতসী?

অতসী সে কথার কোন জবাব দেয় না, কেবল বলে,—যা হোক একটা কিছু পরলেই হল!

অভয়ের চোখ থেকে প্রকৃত শিল্পীর দৃষ্টি মুছে যায় নি সংসারের ঘানিতে পড়েও। সেই একান্ত আত্মভোলা শিল্প-সাধনায় মেতে আছে সে। কিন্তু অতসী? তার আগেকার দৃষ্টি ও মন আর নেই।

সে বোঝে সংসারের প্রতিটি কাজের সুবিধা অসুবিধা, যা আজ পাঁচ বছর চেষ্টা করেও অভয়কে বোঝাতে না পেরে অতসী হাল ছেড়ে দিয়েছে। কি করে, কবে যে অতসীর হাত থেকে তুলি খসে পড়ে গিয়েছে, সে কথা সে ভাল করে মনে করতেও পারে না। সংসারের কোথাও ঘটেনি এতটুকু বিশৃঙ্খলা, পৃথিবীর কোথাও না। কেবল নিজের ঘরের দেওয়ালে ঝোলান ধূলি-মলিন বিবর্ণ, নিজের আঁকা ছবিগুলোর দিকে তাকালে অতসীর মনে জাগে আগেকার কথা।

অতসীর মুখ তখন ছিল চঞ্চল ঝর্ণার অশ্রান্ত মধুর কলকল শব্দের মতো কথায় ও হাসিতে ভরপুর। আজ সে মুখে ফুটে উঠেছে গাম্ভীর্যের কঠিন রেখা, আর কথার ভংগীতে গৃহিণীসুলভ ভারিক্কি ভাব।

অভয় লক্ষ্য করে সব, কোথায় যেন একটা বাথা খচ খচ করে তার মনে। এতও বদলায় মানুষ? অতসীর এই পরিবর্তনের কারণ কি? ভেবে ভেবে কিছুই বুঝতে পারে না অভয়।

কাজের তাড়া নেই আজ। রান্না খাওয়া শেষ হতেই ঝরণা বল্ল—যাবে দিদি অমর-বাবুদের বাড়ি। অমরবাবুর নতুন বউকে দেখে আসি চল। কাজের তাড়া নেই।

অতসী বলল—যাবিতো চল।

সাজ-গোজে বেশি সময় অতিবাহিত হল না। নিতান্ত সাধারণ একখানা শাড়ি পরে, চুল বেঁধে, পাউডারের সামান্য একটু স্পর্শ মুখে বুলিয়ে নিয়ে দোরে তালা দিয়ে দুজনে পথে বেরুল।

অমরবাবুর বউদি সুজাতা ছুটে এলেন ওদের এগিয়ে অভ্যর্থনা করে নিতে! অনুযোগ করে সুজাতা বল্‌ল,—মনে পড়ল এতদিনে। উঃ কবে সেই একদিন এসে-ছিলেন!

অতসী বল্ল—সময় কোথায় ভাই? তা ছাড়া চাকর নেই। খেয়ে উঠে বাসন মাজতে মাজতেই বেলা চলে যায় একেবারে। তা ভাই, নতুন বউ কেমন মনমত হয়েছে তো? চলুন দেখি।

নতুন বউ বেশ সুন্দরী দেখতে। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য লাগল তার ব্যবহার অতসীদের কাছে। এই পনর দিন বিয়ের পরেই স্বামীর কথায় সে একেবারে মুখর হয়ে উঠেছে। এরই ভেতর নতুন সব শাড়ি গয়না আর জুতো-জামা, চুলের ফিতে কাঁটায় ঘর ভরে ফেলেছেন অমরবাবু। কাঁচের চুড়ি পরা ভাল বাসেন না অমরবাবু, সেদিন নাকি নতুন বউ-এর দু হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি জোর করে ভেঙে দিয়েছেন। আবার নাকি হাত কেটে গিয়েছিল ভাঙা চুড়ি লেগে। অমরবাবু আইডিন লাগিয়ে দিয়েছেন ব্যস্ত হয়ে।

নতুন বউ সুরূপা গল্প করছিল নিজেই। সুজাতাও সায় দিয়ে যাচ্ছিল কাজ করতে করতে।

ঝরণা সুজাতাকে বলল,—খুব ভাব হয়ে গিয়েছে আপনার ঠাকুরপোর সংগে এরই মধ্যে, না?

সুজাতা বলল—তা আর বলতে! দুজনের এমন ভাব, যা দেখলে মনে হয়, ওদের জন্ম জন্মান্তরের চেনা জানা। আর আজ সকালে যা দেখেছি, বলে দেব নাকি সুরূপা? বলব?—বলি?

সুরূপা হাসিতে তরল হয়ে উঠল। অপরূপ ভংগীতে ঘাড় দুলিয়ে, হাত জোড় করে সে বলল,—বলুন না, মিথ্যে কথা বলে কি লাভ হবে আপনার?

সুজাতা বলল,—জানেন, ভোর বেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি.....

সুরূপা দেহে একটা অপরূপ নৃত্যময় ভংগী এনে বল্ল—ওকি দিদি! তারপর

অনুচ্চ হাসির আবেগে উচ্ছল হয়ে উঠল সুরূপা।

সুজাতা থেমে গিয়ে একটু পরে বল্‌ল, --না ভাই দরকার নেই বলে।

চার জনের সম্মিলিত কলকণ্ঠের হাসিতে মুখরিত হয়ে উঠল ঘরখানি।

সন্ধ্যার একটু আগে সুজাতা বল্‌ল,--সুরূপা বেশ গাইতে পারে কিন্তু।

ঝরণারই গানের দিকে উৎসাহ বেশি। সে প্রায় লাফিয়ে উঠে বল্‌ল, বলুন না গাইতে অনেক সাধ্য সাধনার পর রাজি হল সুরূপা।

শুক্লা একাদশীর চাঁদ উঠল দিক্‌দিগন্ত প্লাবিত করে। ছোট্ট উঠোনটুকুও হেসে উঠল ধপধপে জ্যোৎস্নায়।

সুরূপার গান তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে দূরান্তরে।

ফেরবার পথে দুজনেই মৌন হয়ে গেল একেবারে। দুজনেই যেন কি ভাবতে লাগল গভীর ভাবে।

দুজনেই বাড়ি এসে যন্ত্র চালিতের মত হাতের কাজ করতে লাগল চুপ করে। তখন চাঁদের আলো আরোও নির্মল আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। বেশ শীত লাগচে অঘ্রাণের হিমেল রাতে।

ঝরণা বলল,--আর কোথাও যাব না দিদি বেড়াতে। এমন গান শুনলাম আজ যে মনটাই একেবারে ব্যথায় ভরে গেল।

অতসী বলল--সত্যি কি চমৎকার ভাই,--গাইল--"আর সময় নাহি রে।" রবীন্দ্রনাথের গান। কি করলাম এ জীবনে? কিছুনা। খালি খেলাম, আর আবোল তাবোল বকে মরলাম। জীবনে আর কিছু হল না।

অতসী জানে ঝরণার সব চাইতে দুঃখ ভাল করে গান শিখতে পারল না বলে। কিন্তু এদেশে বসে ভাল করে গান শেখবার কল্পনা করা এক অসম্ভব ব্যাপার। প্রত্যহ নিজেদের ব্যর্থতার কথা আলোচনা করে দুজনেই হাল ছেড়ে দিয়েছে একেবারে। সুরূপার গান শুনে ঝরণার মনে জেগেছে ব্যর্থতার তীব্র ব্যথা।

কলহাসিতে পাড়াটা মুখরিত করে কারা যেন যাচ্ছে বেড়াতে। জানালায় দাঁড়িয়ে অতসী আর ঝরণা দেখল ওদের পাশের বাড়ীর বোস মশায় স্ত্রীর হাত ধরে এই শীতের রাতে চাঁদের আলো উপভোগ করতে চলেছেন মাইলখানেক দূরের ছোট পাহাড়টায়।

অতসী বলল, দেখ ঝরণা--বাচ্চা দুটোকে চাকরের কাছে রেখে স্বামী স্ত্রী কেমন হাত ধরাধরি করে চলেছে বেড়াতে!

ঝরণা বলল,--আমাদের এঁদের দুজনের প্রাণে কি কোন সখ আহ্লাদ নেই দিদি? কেমন যেন এরা!

ক্লান্ত গলায় অতসী বল্‌ল--কোথায় আর সখ ওদের? একজন তো দৃশ্য দেখে বেড়াচ্ছেন দেশ বিদেশ ঘুরে। আর একজনত ব্যবসায় নিয়ে একেবারে ব্যস্ত। বউ নিয়ে আদিখ্যেতা করবার সময় কোথায় ওদের? আর সময় থাকলেও সে মন তুই ওদের কাছে আশা করতে পারিস না ঝরণা।

ঝরণা বল্‌ল--মাথা আমার একেবারে জ্বালিয়ে দিয়েচে দিদি সুরূপা গান গেয়ে। কিছু হল না দিদি, কিছু না। খালি সংসারের কাজ কর। কয়লা নেই, কাঠ নেই, তেল নেই, মশলা নেই। না পাওয়া যায় এখানে কিছু। একটা হারমোনিয়াম অবধি কিনতে পারলাম না। কিছু যদি পাওয়া যায়!

সত্যি কোন আনন্দ আয়োজন নেই এদেশে। না আছে বায়স্কোপ, না থিয়েটার। না শোনা যায় নিত্য নতুন কোন গান। জীবনে কোন চাঞ্চল্যের সাড়া পাওয়া যায় না এখানে। শুধু চব্বিশ ঘণ্টা মগ্ন থাক এখানে সংসার নিয়ে। ঘরে-বাইরে আর কিছু নেই।

আপন মনে গজ গজ করতে করতে ধপ করে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল ঝরণা। দু-একবার গুণ গুণ করে আপন মনেই সে গান ধরল নৈশ নিস্তব্ধতার বুকে একটা চিড় খাইয়ে।

হাতের আলোটা নামিয়ে রেখে অতসী ভাবল, ঝরণার খুব ব্যথা লেগেছে মনে আজ। আর লাগবেই বা না কেন? ওর কত বড় একটা প্রতিভা নষ্ট হয়ে গেল।

দোর-জানালাগুলো ভাল করে দেখে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল অতসী। এক-রাশ শুভ্র যুঁই ফুলের মত জ্যোৎস্না--এসে লুটিয়ে পড়ল বিছানায়।

দিন দশেক আগেকারের কথা মনে পড়ল অতসীর। ওরা বেড়াতে গিয়েছিল করবাবুদের বাড়ি। কি চমৎকার বাড়িটা করবাবুর। বাড়ি ঢুকতেই পুষ্পিত কুর্চির ঝোপটা--কি সুন্দর! টাটকা নিকোন সোঁদা সোঁদা গন্ধওয়ালা মাটীর বাড়িটা। চমৎকার, চার-দিক খোলা, আলো-হাওয়ায় ভরপুর, নিভৃত মাঠের মাঝখানে নিঃসঙ্গ বাড়িটি, একেবারে পাড়ার বাইরে। আর কি গুণবতী স্ত্রী করবাবুর। কি চমৎকার হাতের সূচী-শিল্প। দূর থেকে বক্সের ঢাকার নক্সাটা তুলি আর রঙ দিয়ে আঁকা মনে হয়েছিল অতসীর।

না, গুণী সবাই, গুণহীন যদি কেউ থাকে তো সে অতসীই একমাত্র এ পৃথিবীতে। শুধু রান্না আর রান্না। সেই রান্নাতেও নেই বিশেষত্ব। ভোর হলেই দেখ রান্নার চিন্তা। সপ্তাহে হাট দুদিন, তাও কিছু মেলে না। ভাতের থালার উপকরণ জোটাতেই দিন কাটে।

......কে বলবে পাঁচ বছর আগে ছবি আঁকত অতসী? কে বলবে সুগায়িকা বলে খ্যাতি ছিল ঝরণার? কোথায় কি কেমন করে ঘটে গেল, কে জানে! সমস্ত দেশটার ওপর অকস্মাৎ চটে উঠল অতসী। না--এমনি করে বাঁচা যায় না সর্বহারা হয়ে। কি আছে তার আঁকড়ে ধরবার মত এ-সংসারে? স্বামীর কথা একদম বাদ দিয়ে দিয়েছে অতসী। মাসের মধ্যে দশ দিনও যার সঙ্গ পায় না, তার কথা মনে পড়লেই কান্না আসে দুচোখ ভরে। আর যে দশ দিনও সে বাড়ি থাকবে, সে দশ দিন অতসীকে হাঁফিয়ে উঠতে হবে, তার সৃষ্টিছাড়া স্বভাবের জন্যে।

না--খাপ খায় না--প্রকৃত শিল্পীর সঙ্গে একটি অতসীর মতো মেয়ের। অভয়ের বিশ্বব্যাপী যে মন, তাকে ঘরের কোণে কেমন করে বেঁধে রাখবে অতসী?

ধ্যানমগ্ন স্বামীকে কতদিন অসময়ে শুনিয়েছে সে বাজারের হিসেব। ধোপার বেয়াদবী, আর কলুর অবাধ্যতা, তাই শুধু মনে পড়ে যায় অতসীর। সত্যি, প্রকৃত শিল্পীর মর্যাদা সে রাখতে পারেনি একটুও। কখনই তার উচিত হয়নি অভয়কে ওভাবে বিব্রত করা। কিন্তু তবু সে কি করবে? কি করবে সে এদেশে?

ঝি-চাকর পাওয়া যায় না পছন্দসই ভাল। দোকান বাজার বহু দূরে। তার উপর আবার বাসিন্দা বউরা পথে বেরুলে নিন্দে রটে। বায়ু-পরিবর্তনকারীদের কথা অবশ্য আলাদা। বারে বারে দোকানে পাঠাবার লোক নেই, অথচ পাঠাতেই হয়। আজ নেই কাঠ, কাল নেই কয়লা, পরশু নেই তেল, ধোপা দিল কাপড় হারিয়ে, গয়লা দিল না দুধ, এমনি আরও কত কি! অচেতন স্বামীর তদারক করতেও হিমসিম খায় অতসী।

বাইরের জগতের একটু একটু স্পর্শ এসে ভীষণ চাঞ্চল্য জাগিয়ে দিয়ে যায়। আজ সেলাই, কাল, গান, পরশু বই কিংবা মাসিক পত্রিকা পড়া। মনে কিসের যেন তাগিদ জাগে অতসীর। অথচ কোন পথ না পেয়ে হাঁপিয়ে ওঠে সে।

ঝরণার গান শেখা হল না। ওর এত সখ। ও গানে একেবারে পাগল বললেও হয়। আর তার নিজের কত ইচ্ছে ছিল ছবি আঁকবার। কোথায় যেন খেই হারিয়ে গেল তাদের!

এবার যেদিন অভয় যায়, সেদিনকার কথা মনে পড়ল অতসীর। অভয়ের পছন্দমত রুমাল দিতে পারেনি বলে ছুড়ে ফেলে চলে গেল অভয় রাগ করে, কথা না বলে। কাউকে সুখী করতে পারেনি অতসী, কাউকে না। নিজের মনেও সে আনন্দ জোগাতে পারেনি কোনভাবে।

আজ পাঁচ দিন হল অভয় গিয়েছে। এ পর্যন্ত একখানা চিঠি এল না তার। তার উপর রাগ করেই কি চিঠি লিখছে না সে? কান্নায় ভিজে গেল অতসীর চোখ দুটি।

সত্যি বুঝতে পারে না স্পষ্টভাবে অভয়কে। কি অদ্ভুত চরিত্র অভয়ের। ভালবাসে অভয় তাকে? — না হয়ত বাসে না। ভালবাসলে সেদিন অমনি করে ছুড়ে দিতে পারত রুমালখানি? থাকতে পারত এমনি রাগ করে পাঁচ দিন চিঠি না দিয়ে?

আচ্ছা, ভাবে না মানুষে অমনি করে চলে গিয়ে যদি চিঠি না দেয়? অতসীর ওপর মায়া-দয়া বলে কি কিছু নেই অভয়ের? কিচ্ছু না—কিচ্ছু না। যদি মায়াদয়া থাকে, তবে অতসীর সামান্য ত্রুটিতে মাঝে মাঝে এত চটে যায় কেন অভয়?

রাগে, দুঃখে অভিমানে চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরতে লাগল অতসীর। না, অভয়ের মতো মানুষ সে আর দেখেনি এ-জীবনে।

এ-জীবনে তার আর কি বন্ধন আছে? এক সন্তানের স্নেহ, তার আস্বাদও সে পায়নি এ পর্যন্ত। দেওর খুব কম সময় বাড়িতে থাকে। স্বামী তো সংসার কোন্ দিকে যাচ্ছে, তা তাকিয়ে দেখবার অবসরই পান না। অতসীর দিকে তো নয়ই। তবে কি করবে সে এ-জীবনে? মরুভূমি হয়ে গেছে তার জীবন।

ভাল লাগছে না কিছু। খানিকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে উঠে পড়ল অতসী। জল-পিপাসা পেয়েছে খুব। ক্ষিপ্রহস্তে আলো জ্বালাল সে। মৃদু একটা সুগন্ধ ভেসে আসছে নাকে। বালিশের পাশে অভয়েরি রাখা দুটি স্বর্ণ চাঁপা। এই ক'দিনেই শুকিয়ে গিয়ে আরও উগ্র হয়ে উঠেছে ফুল দুটির গন্ধ। এই ফুল অত্যন্ত প্রিয় অভয়ের। ফুল দুটি বালিশের তলায় গুঁজে রাখল অতসী।

জল খেয়ে এঘরে আসতেই দেওয়াল-আলমারিতে হঠাৎ চোখ পড়ল অতসীর। ছবির এ্যালবামগুলোতে ধুলো জমেছে খুব। তুলিগুলো অগোছাল। রঙের বাক্স খোলা। ঘরের চারপাশের দেওয়ালের ছবিগুলোতে ধুলো জমেছে পুরু হয়ে। অনেক দিন ঝাড়া হয়নি।

অতসী কোমরে জড়ান শাড়ির আঁচল খুলে ঝাড়তে লাগল এ্যালবামগুলো। কাল টুলের ওপর দাঁড়িয়ে দেওয়ালের ছবিগুলো ঝাড়তে হবে, সে মনে মনে ভাবল।

নাই বা চাইল তাকে কেউ। নাই চাইল অভয়। তবু সে বেঁচে থাকবে এ-সংসারে। অভয়ের ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে যাবে অতসী একেবারে। কেউ না জানুক তাকে সেবা-পরায়ণা, সুনিপুণা গৃহিনী বলে। কেউ তাকে ভাল না বাসুক। কিন্তু অভয়ের প্রতিটি মুহূর্ত সে ভরিয়ে দেবে সেবায় যত্নে। যা আজ বুঝবে না অভয়, একদিন হয়ত সে তা বুঝবে।

বিমল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল অতসীর মুখ। পরম যত্নে সে আঁচল দিয়ে ঝেড়ে মুছে পরিপাটি করে গুছিয়ে তুলে রাখতে লাগল ছবির এ্যালবাম, রঙ আর তুলিগুলি।

পার্থক্য

শ্রীসুর্মণি মিত্র

ছেলেবেলায় যখন ছিলুম একেবারে ছোটো,
মুখের কথা মুখে যখন সদাঃ ফোটো-ফোটো,
তখন যা-সব ভেবেছিলাম, তারই কিছু কিছু
আজও তারা তাড়া করে আমার পিছু পিছু।
বসে বসে ভাবতে থাকি মনে::
মনটা নিয়ে টানা-পোড়েন করি অকারণে।
মা'র গায়ে গা' এলিয়ে দিয়ে সেই যে গল্প-শোনা,—
তেপান্তরের মাঠের শেষে রাজকন্যের চুপচাপ দিন-গোনা
তারই সুতো টেনে টেনে
কিছু জেনে বা না জেনে
শিশু-কবির শিশু-মনে চলতো সুতো-বোনা
হঠাৎ কোথা হতে
পক্ষীরাজের পাখার শব্দ আপনি যেত শোনা।
মনের মধ্যে মেঘের মত এই বাসনা উঠত ফুলে ফুলে
পক্ষীরাজের ঘোড়ায় চেপে মেঘের রাজ্যে হঠাৎ দিতে পাড়ি
রঙের নেশায় ভুলে ভুলে।
ঘোড়ার ক্ষুরে উড়তো না তো ধুলো
কারুর সঙ্গে ধাক্কা আমার লাগত না এক-চুলও।
উড়ে যেতুম অমনি মেঘেয়-ওড়া
আস্তাবলে থাকতো যদি পক্ষীরাজের বাচ্চা দুটো ঘোড়া
পাখনা-ওলা সাঁচ্চা দুটো ঘোড়া।

এমনি কোরে শিশু-কবির বায়না হোতো মা'কে
মেঘেয়-ওড়া পক্ষী-ঘোড়া দিতেই হবে তাকে।
মা' বলতেন—"বেশ তো।"
মা' চাইতেন খোকার মনে আপাতত থাকুক খুশীর রেশ তো।

আজকে বসে আপন মনে ভাবি,—
মেঘের দেশে উড়ে-যাবার ইচ্ছেটুকু তেমনি করে দাবী
আমার মনের কোণে।
আজও কবি থেকে থেকে পক্ষীরাজের পাখার শব্দ শোনে।
তবে,
দুটো দিনের মনের স্বরূপ বদলে গেছে কবে
আমার অজান্তেই।
আজকে ভাবি এই,—
ঘুরতে যদি সাধ হয় মনে আকাশের এই অন্তবিহীন পথে,
কখন কবি সরে পড়ে এই পৃথিবী থেকে;
মেঘের রাজ্যে এঁকে-বেঁকে
কখন যে সে রাজকন্যের সোণার পালঙ্কটার পায়া ধরে
চেয়ে থাকে মুগ্ধ বিহ্বলতায়;
রাজকন্যের বুকের বসন কখন খসে পড়ে
মেঝের পরে লুটায়।
এমনি করে যখন খুশী মেঘের রাজ্যে বেশ তো যেতে পারি,
বেশ তো দেখি জোলোহাওয়ায় রাজকন্যের চুলের বোঝা ভারী।
আজও আমায় যেতে হবে কালো মেঘের দেশে;
চেয়ে-দেখার ইচ্ছেটুকু রাজকন্যার চিকণ-কালো কেশে;
সাত-সমুদ্র তেরো নদী পার
আজও খোয়া যায়নি কিছু তার,
যায়নি কো এক তিলও।
আজও সে-সাধ নবীন, যেমন ছেলেবেলায় ছিল।
অমিল শুধু আজ,
—সেই যে ইচ্ছে শিশু-কবির—থাকতো যদি বাচ্চা পক্ষীরাজ,
—সে ইচ্ছেটা হত।
পাতাবাহার গাছের ঝরা শুকনো পাতার মত।

সেণ্টিমেণ্ট

অনেক প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুশয্যায় বসিয়া আমার একটি হাসির গল্পের প্লটের বীজাণু মনে আসিয়াছিল। সঙ্গে নোট বুক ছিল না যে মূল আইডিয়াটা সংক্ষেপে টুকিয়া রাখিব। ক্রন্দনরত ও রতার দল একমাত্র নির্গম পথটি এমনভাবে আটকাইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন যে, নোট-বুকের অনুসন্ধানে বাহির হইবার সাধ হইলেও সাধ্য ছিল না। মনের গহন অরণ্যে ছোট জিনিস হারাইয়া বেপাত্তা হইবার সম্ভাবনাই বেশী. সুতরাং হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনাটা যথাসম্ভব কমাইবার উদ্দেশ্যে ছোট প্লটটি মনের মধ্যে নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া বড় করিতে লাগিলাম। করিতে করিতে হঠাৎ গল্পের একটা অসহ্য রকম হাস্যকর পরিস্থিতি মনে আসিয়া পড়ায় নিজের অজ্ঞাতসারেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া ফেলিলাম। বন্ধুর মৃত্যু-শয্যায় হাসিটা নিজের কাছেই এত অশোভন ঠেকিল যে তাড়াতাড়ি হাস্য-সংবরণ করিয়া চোখে রুমাল চাপা দিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলাম। উপস্থিত সকলেই হয়তো ভাবিলেন বেচারা আসন্নমৃত্যু প্রিয়বন্ধুর শোকে এমন বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে যে, কাঁদিতে গিয়া ভুলে হাসিয়া ফেলিয়াছে। আমার এই স্বীকারোক্তি শুনিয়া আমার সেণ্টিমেণ্টহীনতার কথা ভাবিয়া হয়তো কাহারও কাহারও সেণ্টিমেণ্টে ঘা লাগিয়াছে। কিন্তু হে পাঠক (অথবা পাঠিকা), ভাবিয়া দেখুন এরূপ বাজে সেণ্টিমেণ্টে আত্মহারা হইলে লোকসান বই লাভ নাই। যে বন্ধু মারা যাইবার সে যখন মারা যাইবেই, তখন তাহার জন্য সেণ্টি-মেণ্টাল হইয়া একটা পনর টাকা দামী গল্পের সম্ভাবনাকে মাঠে মারি কেন? আমার একটি বন্ধু (উপরোক্ত প্রিয়বন্ধু নহে) তুচ্ছ একটুখানি সেণ্টিমেণ্টের মর্যাদা বজায় রাখিতে গিয়া কি হারাইয়াছিল, তাহার নিজ মুখেই শুনুন।

আজ আমি হতুম ইনটারন্যাশনাল টিম্বার কোম্পানীর সর্বেসর্বা। কম সেকম পনর লাখ টাকার মালিক। শুধু একটু সেণ্টিমেণ্টের জন্যে সব হারালুম। বিশ্বাস হচ্ছে না? শোনো তাহলে কাহিনী।

ধ্রুপদী শিব চাটুয্যের নাম শুনেছ তো? শোনো নি? তাহলে এখন শুনে রাখো, অমন দরদী ধ্রুপদ গাইয়ে খুব কম জন্মায়। ওঁর গান শুনলে বুকের ভেতরটা একেবারে গম গম করে উঠতো। আমি ওঁর কাছে কিছুদিন তালিম নিয়েছিলাম, উনিও খুব খুশী হয়েছিলেন আমাকে তালিম দিয়ে। আমার গলাটা দরাজ বলেই বোধ হয়। তার ওপর আবার আমি ইংরাজীতে এম এ পাশ বলে আরও খুশী ছিলেন তিনি। বলতেন, "এম এ পাশদের ভেতর ভালো গাইয়ে পাওয়া শক্ত, ভালো গাইয়েদের ভেতর তেমনি এম এ পাশ পাওয়া শক্ত। তুমি দেখছি এম এ'ও বটে, ভালো গাইয়ে হতে পারবেও বটে। কি করো আজকাল?"

বললুম, "বেকারি।"

ধ্রুপদী শিববাবু বললেন, "Bakery? মানে পাউরুটির কারখানা?"

"আজ্ঞে না, ইংরাজী বেকারি না, বাঙলা বেকারি। অর্থাৎ বেকার-গিরি।"

শিববাবু মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, তাহলে ধ্রুপদ শেখা হবে না, হবে না। লাইফে ফিনান-শিয়াল সেটেলমেণ্ট না হলে, বুঝলে হে ছোক্‌রা? ভাত-কাপড়ের ভালো রকমের একটা

সেন্টুকে

অ·কৃ·ব

ব্যবস্থা পাকাপোক্ত না থাকলে অন্নচিন্তা চমৎকারা নিয়ে ক'দিন তুমি ধ্রুপদ সাধতে পারবে? ওদিকটা ঠিক করে নাও"

তখন বললুম তাঁকে সব কথা। সুপারিশের অভাবে অনেক চেষ্টা করেও ভালো একটা চাকরী জোটে নি। চাকরী একটা জুটেছিলো বটে, কিন্তু সেটা ভালো না বলে নিই নি। শিববাবু একটু-ক্ষণ চোখ বুজে তারপর চোখ খুলেই বললেন, "আহা হা, আর কটা দিন আগে তোমার সঙ্গে আলাপ হলে তোমায় এখানেই একটা ভালো কাজে বসিয়ে দিতে পারতুম। যাকে বলে মানুষ হয়ে যেতে। আহা হা হা হা!"

তার আহাকার শুনে স্পষ্টই বোঝা গেল একটা বিরাট সুযোগ আমার হাত ছাড়া হয়ে গেছে শুধু শিববাবুর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় একটু দেরীতে হওয়ার দরুণ।

বললুম, "এখন কি আর সম্ভব নয়?"

তিনি বললেন, "এখন পশুপতি যে এখানে নেই। হপ্তা তিনেকের জন্যে চেঞ্জে গেছে। কোথায় গেছে কিছু বলে যায় নি। একটু খামখেয়ালী কিনা! ফিরতে হয় তো মাস-খানেক দেরীও হতে পারে। পশুপতিকে চেনো তো? ইনটারন্যাশনাল টিম্বার কোম্পানীর মালিক, লাখ টাকাকে যে টাকা বলেই গেরাহ্য করে না।"

বললুম, "ইনটারন্যাশনাল টিম্বার কোম্পানীর নাম কেনা জানে? ও তো প্রায় বিশ্ববিখ্যাত বললেই হয়। পি পি সান্যেলের নামও তো একেবারে—

শিববাবু বললেন, "ঐ পি পি সান্যেলই হচ্ছে আমার ছেলেবেলার বন্ধু পশুপতি। আমার কথা ওর কাছে বেদবাক্য, ফেলতে পারে না। বিশেষ করে ওর বৌ আর একমাত্র ছেলে মরে যাওয়ার পর থেকে। ত্রিভুবনে এখন ওর আর কেউ নেই কিনা! এক বন্ধু আমি ছাড়া।" বলে তাঁর কথা পশুপতি কি রকম মান্য করে তারই একটি উদাহরণ দিলেন, "একবার কন্যাদায়ে পড়ে এক কন্যার বাপ এসে ধরে পড়লো আমাকে। অনুরোধ এড়াতে না পেরে দিলুম দু'ছত্র লিখে পশুকে, যেন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করবার চেষ্টা করে। চিঠি লিখলো ঐ ভদ্রলোকই, আমি শুধু একটা সই মেরে দিলুম। ঐ চিঠি দেখিয়ে ভদ্র-লোক পশুর কাছ থেকে একটি হাজার টাকা নিয়ে এসে আমায় দেখিয়ে পায়ের ধুলো জোর করেই নিয়ে গেল। পরদিন পশুকে বললুম, পশু, এ তুমি করেছো কি? একটা পুরো হাজারই দিয়ে দিলে? পশু বললে, ভাই, তোমার একটা সই-র দাম লাখ টাকা। আমি তো লোকটাকে নিরেনব্বুই হাজার টাকা ঠকিয়েছি।"

আমি বললুম, "আশ্চর্য তো!"

শিববাবু বললেন, "আর আমিই বা ধ্রুপদ চর্চা করছি কি করে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে? এই ফ্ল্যাট, এই ফার্নিচার, এমন রাজভোগ এ সবের খরচা চলছে কি করে? সব ঐ পশুপতি। ও ফিরে এলেই তোমায় বসিয়ে দেবো ওর অফিসে। ও এমন একজন ছেলে চায় যাকে ওর সমস্ত কারবারের ভার দিয়ে ও নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারে। মরতে অবশ্য এখনও কিছু দেরী হবে বলেই মনে হয়। কোম্পানীর ম্যানেজারের মতলব নিজেই কারবারটাকে হাত করা। কিন্তু আমি থাকতে তোমার কোনও ভাবনা নেই। তাছাড়া পশু চায় একজন শিক্ষিত যুবক। আসুক পশু-পতি ফিরে।"

এর দু'দিন পরেই শিববাবু পড়লেন অসুখে। দু'দিনেই যে অবস্থা হলো তাতে বোঝা গেল এযাত্রাই তার শেষ যাত্রা হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। তাঁর শেষ সেবা করতে লাগলুম আমি আর শিববাবুর পুরাতন ভৃত্য রামচরণ—সে ভৃত্যও বটে, সাগরেদও বটে। বুঝতে পারলুম ইনটার-ন্যাশন্যাল টিম্বার কোম্পানীর মালিক পশুপতি সান্যাল ফিরে আসবার আগেই শিববাবু ভগবানের কাছে ফিরে যাবেন। আমার আশা-ভরসা সব যাবে। কি করা যায়? ভাবলুম যিনি মরবার তিনি তো মরবেনই। অনর্থক আমার এমন একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হাতছাড়া হয় কেন? শিববাবু পরলোকে রওনা হয়ে যাবার আগেই পশুপতিবাবুকে উদ্দেশ করে লেখা একখানা চিঠি তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে রাখতে হবে।

শিববাবুর নাম ছাপা চিঠির কাগজ ছিল। তাতে ডান দিকে ছিল ঠিকানা, আর বাঁ ধারে ছিল "শ্রীশিবনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ধ্রুপদ সমুদ্র।" ঐ একখানা কাগজ নিয়ে তাতে লিখলুম শিব-বাবু যে স্টাইলে কথা কন, সেই স্টাইলেঃ

"ভাই পশু,

তুমি ফিরে আসবার আগেই হয় তো আমি চলে যাবো। যদি তাই যাই, তা হলে ইহ-জগতে আর দেখা হবে না, একথাভেবেই এ চিঠি-খানা লিখিয়ে রেখে যাচ্ছি। এ চিঠিখানা আমার বলা, কিন্তু আমার লেখা নয়; কেন না, আমার হাত থর থর কাঁপে, আর কাঁপা হাতের লেখা তোমার তো পড়তে কষ্ট হবে ভাই। বলতে আমার কণ্ঠ কাঁপছে, কিন্তু লিখতে কাঁপে না এমন একটি হাত আমার বলা কথা লিখে যাচ্ছে।

তুমি তো ভাই আমার এ জন্মের বন্ধু নও, অনেক জন্মের বন্ধু। তাই যাবার আগে মনের কথা খুলে বলে যাই। তুমি হাওয়া বদলাতে গেছ; যেখান থেকে গেছ সেখানে আবার ফিরে আসবে। আমি হাওয়া বদলাতে যাচ্ছি, কিন্তু যেখান থেকে যাচ্ছি সেখানে আবার ফিরবো কিনা জানি না।

আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা কিছুই ছিল না। স্ত্রীই ছিল না, তো পুত্র কন্যা আসবে কোত্থেকে? ছিল ধ্রুপদ, আর ছিল তানপুরো। তোমার স্ত্রী ছিল, পুত্র ছিল, স্ত্রীও গেল, পুত্রও গেল, রইলো শুধু ইনটারন্যাশন্যাল টিম্বার কোম্পানী। আমার ধ্রুপদ শুনিয়ে তোমায় দিতুম আমি প্রাণে আনন্দ, তোমার টিম্বারের টাকায় তুমি আমায় ভুলিয়ে রেখেছো অভাবের তাড়না। আমার ধ্রুপদ-সাধনা ভাই সম্ভব হয়েছে তোমার টিম্বার আমার পেছনে ছিলো বলে।

ভাই, আমার তানপুরো দিয়ে যাবো আমার একটি নতুন পাওয়া সাগরেদকে। নতুন হয়েও সে নতুন নয়—মনে হয় যেন বহুকালের সাগ-রেদ সে আমার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু পরীক্ষা পাশ করে সে বেরিয়ে এসেছে দস্তুর-মতো বিদ্বান। যাবার আগে তোমাকে ভাই শেষ

একটা অনুরোধ করে যাই। আমার এই এম এ পাশ সাগরেদটিকে তোমার সাগরেদ করে নাও তোমার টিম্বারের কারবারে। এমন বিশ্বস্ত কর্মী ভাই তুমি আর পাবে না। তুমি যেমন একটি শিক্ষিত উৎসাহী যুবক চাইছিলে, আমার এই সাগরেদ শ্রীমান......ঠিক তাই।"......ইত্যাদি।

চিঠির শেষের দিকে এমন করে শিববাবুর শেষ অনুরোধটি জানিয়ে দিলুম যেন নিতান্ত পাষাণ হৃদয় না হলে সে অনুরোধ পশুপতিবাবু রাখবেনই সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই না থাকে। "ভাই, এই আমার তোমার কাছে শেষ চিঠি। আশা করি আমার শেষ অনুরোধ রক্ষা করে তুমি আমার আত্মাকে শান্তি দেবে।" এভাবে চিঠিখানা শেষ করলুম।

চিঠি লেখা হলো। এখন দরকার হচ্ছে ধ্রুপদী শিব চাটুয্যেকে দিয়ে চিঠির তলায় একটু সই করিয়ে নেওয়া। ঐ একটুখানি সই-র ওপর নির্ভর করছে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ। শিব চাটুয্যের সই করা চিঠিখানা নিয়ে পি পি সানিয়েলের কাছে হাজির করতে পারলেই ইনটারন্যাশন্যাল টিম্বার কোম্পানী এসে গেল হাতের মুঠোয়।

শিব চাটুয্যে হু হু করে ছুটে চললেন মৃত্যুর দিকে; তার যেন আর তর সইছিলো না। বার বার মনে করি এইবারে চিঠিখানা সই করিয়ে রাখি, বার বার সেন্টিমেন্ট এসে বাধা দেয়। ভাবি তাই তো, ইনি মনে করবেন কি? ছি! ছি! ইনি মরতে চলেছেন, তাতে কোথায় আমি দুঃখ বোধ করবো, তা না তার মৃত্যুশয্যার পাশে পর্যন্ত তাকে দিয়ে আমি নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার তালে আছি! আমার কি একটা চক্ষুলজ্জাও নেই?

এখন অবশ্য ভাবছি চক্ষুলজ্জাটা না থাকলেই ভালো ছিলো। অন্তত চোখ বুজেও তো চিঠিখানা তাঁকে সই করবার জন্যে এগিয়ে দিতে পারতুম! দিলে সই তিনি নিশ্চয়ই করে দিতেন। হয়তো কিছু মনে করতেন, কিন্তু সেই মনে করাটা তো তার চোখ বোজার সংগে সংগেই শেষ হয়ে যেতো।

শেষ পর্যন্ত চিঠিখানা সই করানো হলো না। শিব চাটুয্যে চোখ বুজলেন চিরদিনের জন্য—ইনটারন্যাশন্যাল টিম্বার কোম্পানীর যে দরজা আমাকে দু বাহু বাড়িয়ে আহ্বান করে নিতে পারতো, সে দরজা আমার সামনে চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেল।

অনুবাদসাহিত্য

প্রিয়নাম

প্যাভেল বাজভ

অনেকদিন আগের ঘটনা। যে সব জায়গায় আজকাল সোণা পাওয়া যাচ্ছে, সে সব জায়গায় তখন প্রাচীনরা বাস করত।

সোণা...ক্রিসোলাইট...তামা। সারাটা জায়গাতেই ছিল এসবের ছড়াছড়ি। তখন তোমরা থাকলে হয়ত কুড়িয়ে নিতে পারতে; কিন্তু প্রাচীনদের কাছে কোনই মূল্য ছিল না এই সব জিনিসের। কি করবে তারা এইসব জিনিস দিয়ে বল? ক্রিসোলাইট দিয়ে না হোক, তবু তাদের ছেলেমেয়েরা খেলা করতে পারত; কিন্তু সোণা দিয়ে করবে কি তারা! হলুদ রঙের ছোট ছোট কণা আর বালি। আর তোমরাই বা কি করতে পারতে তখন সে সব দিয়ে বল? শুধু ছোট ছোট কণাই নয়—বেশ বড় বড় সোণার তালও অমন পথে পথে গড়াগড়ি যেতো—কিন্তু তাদের কুড়িয়ে নেবার কথা কেউ ভাবতেও পারে নি তখন। চলার পথে কারো সামনে কোন সোণার তাল পড়লে পা দিয়ে সেটা এক পাশে সরিয়ে রেখে চলে যেতো তারা। ব্যস্—এই ছিল তখন তাদের সম্বন্ধ সোণার সংগে!

তবে হ্যাঁ, একটা কাজে লাগত তাদের এই সব সোণার তাল। যখন শিকারে যেতো, তখন এইসব সোণার তাল কুড়িয়ে সংগে করে নিয়ে যেতো তারা। ঢিল ছোড়ার পক্ষে সেগুলো ছিল ভারী উপযোগী। বড় বড় জানোয়ার পর্যন্ত ঘায়েল করে ফেলত তারা এই সব সোণার তাল ছুড়ে।

এইজন্যই আজকাল আমরা অনেক সময় এমন সব জায়গায় সোণার তাল কুড়িয়ে পাই, যেখানে কোনমতেই সোণা থাকা উচিত নয়। প্রাচীনরা শিকার করতে গিয়ে এই সব সোণার তাল সেখানে ফেলে এসেছিল কোনদিন।

আর তামা? তামাটা বরং কাজে লাগত তাদের। কুড়ুল প্রভৃতি যন্ত্রপাতি আর গৃহস্থালীর বাসনকোশন তৈরী করত তারা তামা দিয়ে। গামিওসেভস্কি খনির গোড়াপত্তন করেছিল তারাই। অবশ্য আমাদের যেমন খাদ আছে, তেমন খাদ ছিল না তাদের। এখানে সেখানে খানিকটা খুঁড়ে তাদের কাজের উপযোগী তামা পেলেই খুশী হতো তারা—আর বেশী খুঁড়ত না।

পশু-শিকার আর পাখী আর মাছধরা এই ছিল তাদের উপজীবিকা। হাজার হাজার বোনো মৌমাছি দেখা যেত তখন যেখানে সেখানে। যত খুশী মধু তখন তুমি পেতে পারতে অতি সহজেই। কিন্তু শস্য? কোন শস্যের নাম পর্যন্তও জানত না তারা। আর গরু, ঘোড়া, ভেড়া প্রভৃতি পশু পালন সম্বন্ধেও তাদের কোন ধারণা ছিল না।

তারা না ছিল রুশীয় আর না ছিল তাতার। তারা যে কোন জাতীয় লোক ছিল আর কি যে ছিল তাদের ধর্ম আর রীতি-নীতি—কেউ জানে না। তারা বনে বাস করত। এক কথায়—তারা ছিল প্রাচীন এবং এই হলো তাদের পরিচয়।

কোন ঘরবাড়ি, স্নানের ঘর অথবা ভাণ্ডারঘর কিংবা ঐ ধরণের কোন কিছুই ছিল না তাদের। পর্বতে তারা বাস করত। ডুমনা পর্বতে মস্ত বড় একটা গুহা আছে। নদীর দিক থেকে সেই গুহাতে ঢুকবার পথ ছিল একটা। এখন আর সে পথ নেই,—আবর্জনা জমে জমে বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সত্তর ফিট ছিল তার উচ্চতা। তবে আজও পর্বতের গুহাটাই ছিল সবচেয়ে বড়। প্রকাণ্ড সেই গুহাটা সোজা পর্বতের নীচের দিকে চলে গিয়েছিল। এখনও তার প্রবেশ পথটা দেখতে পাওয়া যায়, তবে বন্ধ হয়ে গেছে অনেকটা। এই গুহাটা সম্বন্ধে একটা রহস্য আছে এবং সেই রহস্যের গল্পই আজ আমি বলতে যাচ্ছি তোমাদের।

এবং এইভাবে কারো কোন ক্ষতি না করে প্রাচীনরা শান্তিতে বসবাস করত এখানে। কিছুদিন পরে নতুন লোকের আনাগোনা সুরু হল। প্রথমেই এল তাতাররা—ঘোড়ায় চড়ে। এসেই আজও পর্বতের নীচু থেকে ডুমনা পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত দখল করে বসল তারা। জায়গাটা ছিল উত্তর-দক্ষিণে লম্বা আর তীরের মতো সোজা। আজ আর সে জায়গার চিহ্ন নেই; তবে অনেক বুড়োর মুখে শুনা যায় যে, তাদের পিতামহরা নাকি দেখেছে সে জায়গাটা। জায়গাটা বেশ বড়ই ছিল; আমাদের আজকালকার রাস্তার মত চওড়াও, আর কোন খানা-ডোবাও ছিল না তার মধ্যে।

তাতাররা এসেই সুরু করে দিল তাদের ব্যবসা। কিন্তু সোণা যেমন ছিল, তেমনিই রয়ে গেল সেখানে। কোন ঔৎসুক্যই দেখা গেল না তাদের সোণা সম্বন্ধে। হয়

তারা জানত না সোণা কি জিনিস, আর নয়ত তারা জানতে পারেনি যে, সেখানে সোণা আছে।

প্রাচীনরা প্রথমটায় ভয়ে গুহার মধ্যে লুকিয়ে রইল, কিন্তু যখন দেখল যে, কেহই কোন ক্ষতি করছে না তাদের—তখন তারা আবার বেরিয়ে এসে আগের মতই জীবন যাপন করতে লাগল। আবার সুরু হলো তাদের পাখী আর মাছধরা—তামার কুড়ল আর সোণার তাল দিয়ে পশু শিকার।

তারপর একদিন হাজার হাজার তাঁতার চললো উত্তর দিকে। সবারই হাতে তলোয়ার আর বর্শা। সবারই যুদ্ধের সাজ। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই কাতারে কাতারে তারা আবার ফিরে আসতে লাগল। দ্রুতপদে পালাতে লাগল তারা। এমার্ক আর তার কশাকরা সাইবেরিয়া থেকে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল। বাইরে থেকেও অনেক তাতার এসেছিল যুদ্ধ করবে বলে, কিন্তু কেউ এ'টে উঠতে পারল না কশাকদের সঙ্গে। আগ্নেয়াস্ত্র এর আগে আর কোনদিন দেখেনি তাতাররা; সুতরাং এমার্কের আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে তারা কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না।

এই কশাকরা ছিল স্বাধীন জাতি; কিন্তু সাইবেরিয়ায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের স্বাধীনতা গেল। তারা পণ্যের মত বিক্রীত হতে লাগল। বণিকরা তাদের কিনত জারের জন্য, আর জার তাদের ব্যবহার করতেন উপঢৌকন হিসাবে। বিনিময়ে তাদের প্রধান এমার্ককে জার তাঁর নিজের রূপোর পোষাক উপহার পাঠালেন। সেই পোষাক পেয়ে এমার্ক নিজেকে এমন গর্বিত মনে করতে লাগল যে, সে সেই পোষাকটা আর শরীর থেকে খোলেই নি কোনদিন। জারের সেই পোষাক পরেই শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু হলো।

এমার্ক মরার সঙ্গে সঙ্গেই তার লোকজনেরা বিপথে যেতে সুরু করল। আর যত সব ইতর লোক এসে ভীড় করতে লাগল কশাকদের দলে। চুরি, ডাকাতি, গলাকাটা কোন কিছুই বাদ দিল না তারা। নারীহরণ, শিশুহরণ এবং ঐ ধরণের যত কিছু অন্যায় তারা করে যেতে লাগল অবাধে। এক কথায় তখন সুরু হলো অরাজকতা এবং এমন অরাজকতা, যা আরো আগে কেউ দেখেনি কোনদিন।

এই দুর্বৃত্তদের একদল এসব জায়গায়ও এলো। সংখ্যায় তারা খুব বেশী ছিল না, আর এসেছিল তারা পায়ে হে'টে। কিন্তু তাদের দলপতি এসেই হয়ে গেলেন দস্যুপতি। এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তারা সোণা চিনে ফেলল। আর তখন সোণার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল তাদের নিজেদের মধ্যেই। কিন্তু দুদিন যেতেই বুঝতে পারল তারা যে, সেখানে এত সোণা আছে, যা তারা সবাই মিলেও বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। সুতরাং কি করবে তারা? নিকটে কোন বসতি আছে কিনা, যেখানে ঘোড়া পাওয়া যেতে পারে—সেই খোঁজে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল তারা। এই খোঁজ করতে বেরিয়েই প্রাচীনদের সঙ্গে তাদের দেখা।

এরা কারা? তারা বলল—কোন্ জাতীয় লোক এরা? আর কোন্ জারকেই বা এরা কর দেয়?

ধীরে ধীরে তারা প্রাচীনদের জায়গা দখল করতে সুরু করল। তখন আকারে ইঙ্গিতে প্রাচীনরা বুঝাতে চেষ্টা করল তাদের: আমরা তোমাদের কিছু চাই না, আর আমরা বাধাও দেব না তোমাদের কাজে; সুতরাং তোমাদের পথে চলে যাও তোমরা নির্বিঘ্নে। কিন্তু তারা প্রাচীনদের কথা ত শুনলই না এবং বন্দুক ছুড়ে ভয় দেখাল তাদের। ফলে প্রাচীনরা ভয়ে পর্বতে আশ্রয় নিলে আবার। তখন কশাকরা ভাবল, তারা জয়লাভ করেছে। কিন্তু সত্যি করে প্রাচীনরা পরাজিত হয়নি। তারা ভেবেছিল বন্দুকের গুলী হলো স্বর্গের আগুন, তাই প্রথমটায় ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিল তারা। কিন্তু সত্যি করে তারা ছিল অত্যন্ত বলবান। আজকালকার রুশিয়দের চেয়েও ঢের বেশী বলবান এবং অনেক সাহসী আর লম্বাও। যা হোক, নিজেদের গুহায় আশ্রয় নেওয়ার পরও যখন দেখল তারা যে, কশাকরা তাদের তাড়া করেছে, তখন তারা কশাকদের দিকে সোণার তাল ছুড়ে মারতে লাগল এবং কশাকদের প্রায় সবাইকে মেরে ফেলল। দু-তিনজন কশাক যা হোক কোনরকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। প্রাচীনরা কিন্তু তাদের পিছনে ধাওয়া করা প্রয়োজন মনে করল না। ওদের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে তারা, এইই যথেষ্ট। এখন ওরা যেখানে খুশী যাক, কেবল তাদের জায়গায় আর না এলেই হলো।

প্রাচীনরা দেখে বিস্মিত হয়ে গেল যে, যাদের তারা মেরেছে, তাদের সবারই সঙ্গে রয়েছে অনেকগুলো করে সোণার তাল। কেন যে তারা অত ভারী বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল, কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না তারা। শেষে অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত করল তারা যে, অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতেই হয়ত তারা ঐ তালগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে করে। যাক্, তারা মৃত কশাকদের বন্দুকগুলো খুব ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগল। একটা বন্দুক তখনও গুলীভরা অবস্থাতেই ছিল। একজন প্রাচীন সেই বন্দুকটা নাড়াচাড়া করার সময় হঠাৎ শব্দ করে গুলীটা বেরিয়ে গেল। গুলীর শব্দে ভয়ানক ভয় পেয়ে গেল সবাই। আর যে নাড়াচাড়া করছিল বন্দুকটা সে সামান্য আহত হলো। তবে মরলো না কেউ। তখন প্রাচীনরা বুঝতে পারল যে, বন্দুকের গুলী স্বর্গের আগুন নয়। সুতরাং তারা শিখতে চেষ্টা করতে লাগল কি করে বন্দুক ছুড়তে হয়। মৃত কশাকদের শরীর তল্লাস করে তারা পেল কিছু বারুদ আর সীসার টুকরা। কিন্তু সেগুলো দিয়ে কি হয় তারা বলতে পারল না কেউ।

ইতিমধ্যে যে তিনজন কশাক পালিয়ে গিয়েছিল তারা গিয়ে তাদের দলপতিকে জানাল সমস্ত ঘটনা। "কতকগুলো অদ্ভুত লোক"—তারা বলল—"আক্রমণ করে আমাদের দলের প্রায় সবাইকে মেরে ফেলেছে। আমরা তিনজন কেবল পালিয়ে এসে কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়েছি।"

দলপতি হয়ত তখন নেশার ঘোরে ছিল তাই বলল:—তাতে কি হয়েছে। তখন যুদ্ধের সময়। সাইবেরিয়া জয় করা নিয়ে মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে। আর হামেশাই লোকজন মরছে তখন। সুতরাং মৃত্যুর সংবাদে বিস্মিত না হওয়াই স্বাভাবিক।

কশাকরা কিন্তু তাদের দলপতিকে সোনা সম্বন্ধে বলল না কিছুই। তারা নিজেরাই বলাবলি করতে লাগল—"যা হবার হয়েছে। চল আমরা আবার সেখানে যাই।" কিন্তু তোমরা ত জান সোনা কি জিনিস। কোন রকমেই সোনা তুমি গোপন করে রাখতে পার না। যেমন করেই হোক সোনা বাইরে বেরুবেই। কেননা টাকা পেতে হলেই বিনিময়ে সোনা দিতে হবে। কশাকরা কেমন বেশ কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তারা বেছে বেছে বড় বড় সোনার তাল সংগ্রহ করে রেখেছে—এখন কি করে সেই সব তাল তারা লোকদের দেখাবে? দেখালেই অমনি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হবে: কোথায় পেল এরা এই সব সোনা?

যা হোক, শেষ পর্যন্ত একটা বুদ্ধি স্থির করল তারা। বড় বড় সোনার তালগুলোকে টুকরা টুকরা করে ভেঙ্গে সেই টুকরাগুলো তারা নিয়ে গেল বণিকদের কাছে এবং এই ব্যাপারটা তারা নিজেদের মধ্যেও গোপন করে রাখল পরস্পরের কাছ থেকে। এমনি করে সব বণিকদের কাছেই তারা উপস্থিত হয় একজনের পর একজন। বণিকরা ত খুব খুশী। সোনার বিনিময়ে টাকা দিয়ে তারা সব কিছু জেনে নিল।

কশাকরা ত সোনা দিয়ে টাকা পেল, কিন্তু টাকা দিয়ে করবে কি তারা? তখন খুব ভালো ভালো কাপড় চোপড়

কিনতে লাগল তারা আর সুরু করল মদ খেতে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাভিচার এসে ঢুকল তাদের মধ্যে। তখন প্রায় সব সময় শুঁড়িখানাতেই পড়ে থাকত তারা।

দুদিনেই অন্যান্য কশাকদের মনে সন্দেহ জাগতে সুরু করল। এরা টাকা পেল কোথায়? শুধু সন্দেহই জাগল না তারা জিজ্ঞাসাও করল। তোমরা জান যে, মাতালরা কথা গোপন রাখতে পারে না... সুতরাং সব সংবাদ পেয়ে গেল সবাই। তখন আর একদল একত্র হয়ে চলল সোনার খোঁজে। অবশ্য সব কশাকরাই ত আর এক রকম ছিল না। তাদের মধ্যে একজন ছিল সোলিকামস্কের অধিবাসী। আমি নাম জানি না তার। যা হোক সে কশাকদের দলে যোগ দিয়েছিল অধিকতর ভালো জীবন যাপন করবে বলে, কিন্তু যখন সে দেখল যে মদ খাওয়া আর চুরি করা ছাড়া কশাকদের আর অন্য কাজ নেই তখন আর ভালো লাগল না তার কশাকদের সঙ্গে। এবং যখন সেই সোলিকামস্কের লোকটি তাদের অভিপ্রায় জানতে পারল তখন সে বলল তাদের "তোমাদের লজ্জা করে না। আগে বণিকদের আর ধনিকদের তোমরা লুঠ করতে —আর এখন কি করছ তোমরা বলত? এখানকার লোকদের ঘর ভেঙে বণিকদের লাভের সুযোগ করে দিচ্ছ। তাই নয়?"

কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। উপদেশ শুনেই তারা তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সোলিকামস্কের সেই লোকটির উপর। কিন্তু সেই লোকটি ছিল অত্যন্ত সাহসী আর বীর। সুতরাং যুদ্ধ হলো এবং যুদ্ধে সে হারিয়ে দিল কশাকদের। তবে নিজে সে আহত হলো।

আহত অবস্থায় হামাগুড়ি দিয়ে কোন রকমে সে ঢুকল গিয়ে বনের মধ্যে। যাতে কশাকরা তাকে খুঁজে না পায়। কশাকরা ভয় পেতো বন দেখে। সুতরাং তারা নিশ্চয়ই তার খোঁজে বনে ঢুকবে না।

এদিকে কশাকরা ছুটাছুটি করতে লাগল তার খোঁজে, কিন্তু সে তখন বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সুতরাং কশাকরা আর তাকে খুঁজে পেল না।

এরপরে কি করব? ভাবলো লোকটি—যদি শিবিরে ফিরে যাই ওরা আমাকে গুলী করে মারবে আর নয়ত ফাঁসী দেবে। শেষে স্থির করল সে যে, যাদের সর্বনাশ করবার চেষ্টা করছে ওরা তাদের কাছে গিয়ে তাদের সতর্ক করে দেবে সে।

পথ জানা ছিল তার, কিন্তু প্রাচীনরা যেখানটায় থাকত সে জায়গাটা অনেক দূরে। তার সঙ্গে কোন খাদ্য ছিল না। তবু কোন রকমে কষ্ট করে এগুতে লাগল সে। শেষ পর্যন্ত যখন আজভ পর্বতের পাদদেশে নিয়ে সে পৌঁছল তখন আর তার শক্তি নেই চলবার। সুতরাং সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল সে।

প্রাচীনরা দেখল একটা রক্তাক্ত লোক সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে—হাতে একটা বন্দুক। প্রথম যারা দেখেছিল তাকে তারা মেয়ে। তোমরা জান যে মেয়েরা স্বভাবতই একটু কোমল হৃদয়। আর আহতদের সেবা করার প্রবৃত্তি তাদের সহজাত।

এই মেয়েদের মধ্যে একজন ছিল তরুণী। প্রবীণ কোন প্রাচীনেরই মেয়ে সে। যাক,—মেয়েটি যেমন ছিল সাহসী তেমনি ছিল সুন্দরী। ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এমনি তার রূপ। কয়লার মতো কালো চোখ, গোলাপের পাঁপড়ির মতো গাল, মাথার চুল লম্বিত গোড়ালি পর্যন্ত। এর চেয়ে বেশী সুন্দরী মেয়ের কথা কল্পনাও করতে পারবে না তুমি। এক কথায় তাকে বলা যেতে পারে নিখুঁত সুন্দরীই যে ছিল সে তা নয়। খুব ভালো নাচতেও পারত সে। আর সে যখন গান গাইত প্রকৃতি পর্যন্ত নিঃঝুম হয়ে শুনত তার গান। তবে একটু খুঁতও ছিল তার। সে ছিল অত্যন্ত লম্বা। সত্যি কথা বলতে গেলে সে যেন ছিল একটি দানবী। তখন তার বয়স আঠার বছর। ঠিক বিয়ের উপযুক্ত বয়স।

যাক, লোকটিকে দেখে ভারী পছন্দ হলো মেয়েটির। কেননা লোকটিও ছিল খুব সুপুরুষ—বড় বড় চোখ—মাথা ভরা কোঁকড়ান চুল। অন্যান্য মেয়েরা যখন লোকটিকে দেখে নানা রকম জল্পনা কল্পনায় ব্যস্ত তখন সেই তরুণী তাকে পাঁজা কোলে করে নিয়ে গেল গুহার মধ্যে। সেখানে নিয়ে গিয়ে সে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে লোকটির ক্ষতস্থান বেঁধে দিল—সেবা যত্ন করতে লাগল। তার বাবা আর মা কোন রকম বাধা দিল না তাকে। আর প্রতিবেশীরাও আপত্তি করল না কিছু বরং সাহায্যই করল তারা তাকে এটা ওটা এগিয়ে দিয়ে। নারীরা আহত লোকটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করল আর পুরুষরা ভাবতে লাগল: হয়ত এই লোকটি একদিন আমাদের বন্দুক ছোড়া শিখিয়ে দেবে।

সংজ্ঞা ফিরে আসতেই আহত লোকটি দেখল যে, সে কতকগুলি অপরিচিত আর অদ্ভুত লোকের মধ্যে রয়েছে। লোকগুলি অত্যন্ত দীর্ঘকায় আর তারা তাতার ভাষা বুঝতে পারে না। সে নিজে তাতার ভাষার দু একটা কথা জানত এবং এই সব অঞ্চলে এলে সেই কথার সাহায্যেই নিজেকে প্রকাশ করত সে। যা হোক, তাদের আকার ইঙ্গিত থেকেই সে তাদের ভাষার দু একটা কথা শিখতে সুরু করল।

তরুণী সব সময়ই লোকটির পাশে পাশে থাকে,—তাকে ছেড়ে যায় না কোথাও। সুতরাং স্বভাবতই লোকটিও মেয়েটির দিকে একটা আকর্ষণ অনুভব করতে লাগল।

কিন্তু লোকটির স্বাস্থ্য ফিরতে অত্যন্ত দেরী হতে লাগল। তার কারণ প্রাচীনরা তাকে রুটি দিতে পারছিল না। মেয়েটি মাছ, মাংস প্রভৃতি নানারকম খাদ্য এনে দিচ্ছিল লোকটিকে, কিন্তু কেন কিছুই ভাল লাগছিল না তার খেতে সে চাচ্ছিল এক টুকরা রুটি। এবং এক টুকরা রুটি দেওয়ার জন্যে সে মেয়েটির কাছে নানাভাবে কাকুতি মিনতি করতে লাগল। কিন্তু মেয়েটি জানতই না রুটি কি জিনিস। সুতরাং রুটি দেবে সে কোত্থেকে। রুটি দিতে না পারায় মেয়েটি অত্যন্ত বেদনা অনুভব করছিল মনে মনে এমন কি চোখের জল পর্যন্ত ফেলেছিল এর জন্য।

রুশীয়রা যে রুটি ছাড়া বাঁচতে পারে না একথা সবাই জানে। সুতরাং রুটি না পেলে তার স্বাস্থ্য ফিরবে কি করে? তবু যা হোক কিছুদিন পরে লোকটি একটু আধটু চলাফেরা করার সামর্থ্য ফিরে পেলো। ততদিনে সে প্রাচীনদের ভাষাও শিখে ফেলেছে একটু আধটু। মেয়েটি কিন্তু তার রুশীয় ভাষা শিখে ফেলেছিল দুদিনেই। কেননা মেয়েটি ত আর সাধারণ মেয়ে ছিল না। সে যেমন ছিল চতুরা তেমনি ছিল বুদ্ধিমতী। তা ছাড়া যাদুবিদ্যাতেও সে ছিল পারদর্শিনী।

ক্রমে সোলিকামস্কের লোকটি ভালো হয়ে উঠে সব জায়গাগুলো ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল। তখন সে শিখিয়েছিল প্রাচীনদের কি করে বন্দুক ছুড়তে হয়।

"এই হলুদে পাথরগুলো"—সে বলল—"আর এই সবুজ কাচগুলোই হলো তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। বণিকরা যদি একবার এর গন্ধ পায় তবে আর তোমাদের তারা শান্তিতে থাকতে দেবে না। আর এ সংবাদ জারের কানে গেলে ত তোমাদের রক্ষাই নাই। সুতরাং তোমরা এক কাজ কর"—সে বলে চললো—"এই পাথরগুলোকে, যাকে ওরা সোনার তাল বলে, তোমরা লুকিয়ে ফেলো কোথাও। আজভ পর্বতের মধ্যেও লুকিয়ে ফেলতে পার এগুলোকে। আর সব ক্রিসোলাইট-গুলোকেও সেখানে পুতে ফেল। আর সোনার কণা আর ছোট ছোট টুকরো-গুলোকে যে কোন জায়গায় মাটিতে পুতে দেও। আর এমন জায়গায় এগুলোকে পুতবে যেখানে ঘাস গজাবে দুদিন

বাদেই। আর যে পর্যন্ত না এই সব ব্যবস্থা করতে পার, সে পর্যন্ত কোন অপরিচিত লোককে আসতে দেবে না এখানে। যদি কেউ আসে অমনি তাকে মেরে ফেলবে।"

"তোমাদের অলক্ষ্যে যাতে কেউ না আসতে পারে"—সে বলতে লাগল—"তার জন্য ডুমনা আর আজভ পর্বতের উপর বিশ্বাসী পাহাড়া বসাও। তারা পথের উপর লক্ষ্য রাখবে আর দেখবে অপরিচিত কেউ আসছে কি না। কোন অপরিচিত লোককে আসতে দেখলেই আগুন জেবলে তারা সতর্ক করে দেবে সবাইকে। তোমরা তখন সবাই মিলে এক হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে গিয়ে সেই অপরিচিতের উপর। মনে রাখবে অপরিচিতরা তোমাদের কাছে বন্য জন্তুর চেয়েও ভয়ঙ্কর।"

তরুণী তার কথাগুলো সবাইকে বুঝিয়ে বলল। প্রাচীনরা বুঝল নবাগত তাদের সাহায্য করতে চায়। সুতরাং তার উপদেশ মত কাজ করতে লেগে গেল তারা। পাহারা বসান হলো পর্বতের উপরে। তারপর সোনা আর ক্রিসোলাইট গুলোকে বয়ে নিয়ে গেল তারা আজভ পর্বতে। সেখানে সোনাগুলোকে যখন স্তূপীকৃত করে সাজাল তারা তখন ভারী চমৎকার দেখাতে লাগল সেই সোনার স্তূপটা। তারপর ক্রিসোলাইটগুলোকেও তারা এক জায়গায় জড় করল কয়লার মত। আর সোনার কুচিগুলোকে পুতে ফেলল মাটিতে।

এই সময় কোন অপরিচিত লোককে তারা কাছে আসতে দিল না। পাহারা-ওয়ালা সতর্ক করে দিলেই তারা সবাই গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত অপরিচিতদের উপরে। তারপর তাদের মেরে কেটে তারা মাটিতে পুতে ফেলত। বন্দুককে তখন আর তারা ভয় করে না।

কিন্তু মাছির কাছে যেমন গুড় মানুষের কাছে তেমনি সোনা। যতই মার লোভ তাদের কমবে না। অনেকে মরল বটে, কিন্তু আবার নূতন দল আসতে লাগল। ফলে সোনা সম্বন্ধে নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ল চার-দিকে। আরও কোন রকমে পেয়ে গেল সংবাদ। ফলে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল গুরুতর। কামান নিয়ে এসে চারদিক থেকে গুলী চালাতে লাগল নূতনেরা। বন দেখেও তারা ভয় পেল না। কেননা তারা রাস্তা তৈরী করে ফেলল বনের মধ্য দিয়ে।

প্রাচীনরা দেখল, যে শক্তি তাদের আছে তা নিয়ে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব। সুতরাং আহত লোকটির কাছে যেয়ে উপস্থিত হল তারা বুদ্ধির জন্য। সে তখন ডুমনা পর্বতের উপরে ছিল। তরুণীই তাকে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে খোলা হাওয়া পাবে বলে। লোকটি তখনও অত্যন্ত দুর্বল। আজভ পর্বতটা ছিল একটা ঘন বনের মতো। সেখানে হাওয়া খুব লাগত না, কিন্তু ডুমনা পর্বতের উপর হাওয়া সব সময়ই হুহু করত। সুতরাং লোকটির স্বাস্থ্যের জন্যই তরুণী তাকে নিয়ে রেখেছিল সেখানে। দিনরাত তরুণীই তার দেখাশুনা সেবাযত্ন করত।

তিনদিন ধরে সভা করল তারা সেখানে। এবং এই জন্যই পর্বতটার নাম ডুমনা। এর আগে অন্য নাম ছিল পর্বতটার। যাক, অনেক আলোচনার পর স্থির হলো যে সে জায়গা ছেড়ে তারা এমন একটা জায়গায় যাবে যেখানে সোনা নেই, তবে পশু পাখী আর মাছ পাওয়া যায় প্রচুর। সোলিকামস্কের লোকটিই বলেছিল তাদের সেই জায়গাটার সন্ধানও। যাওয়াই যখন স্থির হয়ে গেল তখন প্রাচীনরা সেই লোকটিকেও সংগে নিতে চাইল কিন্তু লোকটি সম্মত হল না তাদের প্রস্তাবে

"—আমার মনে হচ্ছে আমার মৃত্যু এগিয়ে এসেছে"—সে বলল—"তা ছাড়া আমি এ জায়গা ছেড়ে যেতে পারি না।" কিন্তু কেন যে যেতে পারে না তা সে বলল না কাউকে।

তখন তরুণী বলল—"তাহলে আমিও এখানেই থাকব।" তাতে তার মা আর

বোনেরা চটে গেল তার উপর, তার বাবা শাসাল আর তার ভাইরা বলল! "এখানে কেন থাকবি বোন,—তোর ভবিষ্যৎ আছে ত!"

কিন্তু তরুণী অটল। "আমার ভাগ্যে যা আছে হবেই আমি আমার প্রিয়তমকে ছেড়ে যেতে পারি না।"

অনেক অনুরোধ উপরোধেও কোন ফল হলো না। পাহাড়ের মত অনড় সেই মেয়ে। সুতরাং তার বাবা, মা, বন্ধু-বান্ধব সবাই বিদায় নিল তার কাছ থেকে। "মেয়েটা ডুবল—" মনে মনে ভাবল তার বাবা।

আজভ পর্বতের উপর সেই দুজনকে রেখে সবাই চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে লোকজন ভেঙ্গে পড়ল সেখানে সোনার লোভে। আর সোনা নিয়ে শুরু হল পরস্পরের মধ্যে মারামারি—কাড়াকাড়ি।

আহত লোকটি ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছিল। শেষে একদিন সে বলল সেই তরুণীকে—"বিদায়, প্রিয়বান্ধবী বিদায়। নিয়তির ইচ্ছা নয় আমরা এক সঙ্গে থাকি পরস্পরকে ভালবাসি কিম্বা কোন সন্তান হয় আমাদের।

তার কথা শুনে তরুণীর দুচোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। কেননা হাজার হোক সে নারী। তবু সে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল লোকটিকেঃ—"ভয় পেওনা বন্ধু, যেমন করেই হোক তোমাকে ভালো করে তুলবই আমি।"

কিন্তু লোকটি বললঃ—"সে আর সম্ভব নয়। আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছি। রুটিও এখন আর আমাকে সুস্থ করে তুলতে পারবে না। আমি বুঝতে পারছি আমার সময় হয়ে এসেছে। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আমার মিলন হতে পারে না। তুমি এত দীর্ঘকায় যে আমি তোমার কাছে শিশুর মত। স্ত্রী স্বামীকে শিশুর মতো বয়ে নিয়ে বেড়াবে এ আমাদের সমাজের নিয়ম নয়। সুতরাং যে পর্যন্ত না আমাদের দেশে তোমার স্বামী হবার মত উপযুক্ত লোক জন্মায় সে পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হবে তোমাকে।"

মেয়েটি অভিমান করে বললঃ "এ কি বলছ তুমি? এমন কথা যে আমি ভাবতেও পারিনি কোনদিন......যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব......"

কিন্তু লোকটি বললঃ—"দুঃখ করোনা আমার কথা শুনে। কেননা যা হবে আমি তাই বলছি। তোমাকে এই সোনার দেশে দেখেই আমার ধারণা হয়েছে যে, এমন একটা সময় আসবে যখন আমাদের দেশে কোন বণিক কিম্বা জার থাকবে না এবং সেই সময় যখন আসবে তখন আমাদের দেশের লোকেরা হবে দীর্ঘকায় আর বলিষ্ঠ। আর সেই লোকদের একজন তখন আজভ পর্বতে এসে উচ্চৈস্বরে উচ্চারণ করবে তোমার প্রিয় নাম এবং সত্যি করে সেইদিন যখন আসবে তখন আমাকে কবর দিয়ে আনন্দে এগিয়ে যেও তার সঙ্গে মিলিত হতে। কেননা সেই হবে তোমার ভাগ্যনিয়ামক। আর সেদিনকার সেই লোকদের সব সোনা নিতে দিও অবশ্য যদি তারা প্রয়োজন অনুভব করে সোনার। আজ তবে বিদায় প্রিয় বান্ধবী।" এই বলেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করল। মনে হলো যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল সে। আর সেই মুহূর্তেই আজভ পর্বতের প্রবেশ পথ গেল বন্ধ হয়ে।

বাজে কথা সে বলে যায়নি। সে ছিল জ্ঞানী তাছাড়া হয়ত দৈবশক্তিও ছিল কিছু তার। সেলিকমস্কের অধিবাসীরা বনে থাকত যাদুকরদের সংস্পর্শে অহরহই আসতে হতো তাদের। সুতরাং যাদুবিদ্যায় তারা ছিল পারদর্শী।

সেই দিনের পর থেকে আজভ পর্বতের মধ্যে আর কেউ ঢুকতে পারেনি। গুহার সেই প্রবেশ পথ আজও দেখা যায়—কিন্তু মনে হয় যেন ধ্বসে পড়েছে। কেউ কাছে গেলেই পাহাড় ধ্বসে পড়ে ভয় দেখায়। সুতরাং পর্বতটা জনহীন হয়ে পড়ে আছে। আর এত গাছপালা জন্মেছে তার উপর যে কেউ না জানলে বুঝতেই পারবে না কি আছে লুকানো সেই সব গাছপালার নীচে।

কিন্তু পর্বতটার নীচে প্রকাণ্ড একটা গুহা আছে। দামী মর্মর পাথরে তৈরী তার মেঝে। সব কিছুই সাজান গুছান সেখানে। মাঝখানে একটা ফোয়ারা; যার জল অবিরতই উছলে পড়ছে চোখের জলের মত। আর সেই ফোয়ারাটার চারদিকে সোনা আর ক্রিসোলাইটের স্তূপ।

কি করে জানি না—কিন্তু গুহাটার মধ্যে সব সময়ই আলো ঝলমল করছে। একটা মৃতদেহ পড়ে আছে সেখানে আর তার পাশে বসে একটি সুন্দরী মেয়ে কাঁদছে অবিরত। মেয়েটি চিরযৌবনা। আঠার বছর বয়সে যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে তার রূপ।

অনেকে চেষ্টা করেছে পর্বতটার মধ্যে ঢুকতে কিন্তু পারেনি। টানেল কেটে, ডিনামাইট বসিয়েও সুবিধা করতে পারেনি কেউ। কেউ কেউ পর্বতের পাশে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত নাম ধরে চীৎকার করেছে। যদি হঠাৎ সেই প্রিয় নামটা উচ্চারিত হয় তবে পর্বতের প্রবেশ পথ খুলে যাবে হয়ত। কত কেউ কত নূতন নাম কল্পনা করেছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি।

একটা অদ্ভুত যাদুমন্ত্র যেন ঘিরে রেখেছে সেই গুহাটাকে। কিন্তু সময় না হলে আজভের মুখ খুলবে না কোনদিনই।

কেবল একবার একটু লক্ষণ দেখা গিয়েছিল পর্বতটা খোলার। এমেলিয়ান ইভানিচের সময় তখন। মজুররা মিলেছিল এসে ডুমনা পর্বতের উপর। আমাদের পিতামহদের বলতে শুনেছি যে, সেই দিন নাকি একটা গানের মত শব্দ ভেসে এসেছিল আজভ পর্বতের মধ্য থেকে। শব্দটা শুনে নাকি মনে হয়েছিল যেন কোন মা তার শিশুকে ঘুমপাড়ানি গান শুনাচ্ছেন।

তারপর থেকে কান্না ছাড়া আর গানের শব্দ কেউ শুনতে পায়নি কোনদিন। দাসরা যখন মুক্তি পেল তখন অনেকে এসেছিল পর্বত খোলার লক্ষণ দেখা যায় কি না দেখতে। কিন্তু কান্না ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায়নি তারা। আর সে কান্নাও নাকি ছিল আগের চেয়ে অনেক করুণ।

এবং এই ঠিক। কেননা অর্থের শক্তি মানুষকে ভূস্বামীর কড়া চাবুকের চেয়েও দ্রুত তাড়িয়ে নিয়ে যায়। সময় যতই এগিয়ে চলেছে সব কিছুই ততই বেশী খারাপ হতে চলেছে। কিন্তু আমাকে ডুমনা পর্বতের উপর পাহারা দিতে হয়। কেননা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মানুষকে খেতে পরতে হবে ত!

আজভ পর্বত খোলার দিন হয়ত আমি দেখতে পারব না। সেদিক দিয়ে তোমরা যুবকরা আমার চেয়ে অনেক সৌভাগ্যবান। কিন্তু আমি তোমাদের বলে যাচ্ছি : একদিন মানুষ সোনার শক্তি কেড়ে নেবে। আমার কথা লক্ষ্য করো : তারা শক্তি কেড়ে নেবে! সোলিকামস্কের লোকটি ঠিকই বলে গিয়েছে।

তোমাদের মধ্যে যারা সেদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকবে তারা আজভ পর্বতের ঐশ্বর্য দেখে যেতে পারবে, আর শিখে ফেলবে সেই প্রিয় নাম যে নামের শক্তিতে সেই ঐশ্বর্য আবার বেরিয়ে আসবে লোকচক্ষুর সামনে।

গল্পটা যত সহজ মনে হচ্ছে তত সহজ নয়, কিন্তু বুঝলে? এর মর্ম উদ্ঘাটন করতে হলে তোমাদের একটু ভাবতে হবে।

অনুবাদক—শ্রীপরেশনাথ সান্যাল

নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩্ ষাণ্মাসিক—৬৷৷

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ ঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে

১০০" ও তদূর্ধ্ব ... ৩্ প্রতি ইঞ্চি প্রতি বা

৫০"—৯৯" ... ৩৷৷০ " " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪্ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভা হইতে জানা যাইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিবেন। লেখা পাঠাইবা তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে যদি তাহা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে লেখা অমনোনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অমনোনীত লেখা ছয় মাসের পর নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে এ মাসের মধ্যেই নষ্ট করা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ"

১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

ট্রামে-বাসে

মিঃ ইডেন বৃটিশের নব-নিযুক্ত পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিনের সাম্প্রতিক বক্তৃতাটির সমূহ সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁর কার্যকালে বেভিনের সঙ্গে একদিনের জন্যও কোন মতভেদ হয় নাই। আজ বেভিনের বক্তৃতায় সেই পুরাতন মতবাদের মিল দেখিয়াই মিঃ ইডেন যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইয়াছেন। অতঃপর বৃটিশের পররাষ্ট্রীয় নৈতিক জীবন কোন রকম কলুষ-কালিমা লিপ্ত



হইবে না ভাবিয়া আমরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। দুষ্ট লোকেরা অবশ্য বেভিনের ব্ল্যাকপুলের বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিয়া চেঁচামেচি করিতেছে। কিন্তু সেসব গ্রাহ্য করা চলে না, কেননা—হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভুখে হাজার।

* * *

ভারতের সমস্যা সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভাবে ভারত সচিবের আহ্বানে অচিরেই আলাপ-আলোচনার জন্য ভারতের বড়লাট বিলাত গিয়াছেন। সুতরাং আমরা আশা করিতেছি অচিরেই তিনি প্রত্যাবর্তন করিবেন, অচিরেই দ্বিতীয় নেতৃ-সম্মেলন আহ্বান করিবেন। তারপর "In Conjugation with leaders of Indian opinion"এর নীতির উপর ভিত্তি করিয়া কার্য চালাইলে সম্মেলনের যে পরিসমাপ্তি হইবে, তাহা জানিবার জন্য জ্যোতিষীর কাছেও ছুটাছুটি করিতে হইবে না। এক-ই ঝিঙের তরকারী শুধু একটু ফালি ফালি করিয়া আবার একটু ডুমো ডুমো করিয়া কাটার বৈচিত্র্যে অপূর্ব মুখরোচক হইয়া উঠিবে।

* * *

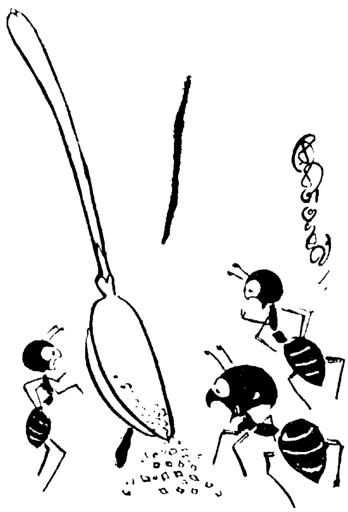
জাপ সম্রাটের শ্বেত অশ্ব চড়িয়া মিছিলে বাহির হইবার জন্য এডমিরাল হেলসিকে নাকি একটি জিন আর লাগাম উপহার পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এডমিরাল সাহেব হয়ত এখন হইতেই ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করিতেছেন। তবে শেষ পর্যন্ত কি হয় বলা যায় না। জাপানী ঘোড়া তো—হয়ত তার আগেই সে হারিকিরি করিয়া বসিবে। After all horse is a noble animal!

* * *

আচার্য কৃপালনি কারামুক্ত হইলে তাঁহাকে করাচী হইতে এলাহাবাদ আসিবার রেলভাড়া নাকি দেওয়া হয় নাই বলিয়া তিনি একটি বিবৃতি দিয়াছেন। একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, কৃপালনিজীকে বিনা টিকিটে ভ্রমণের অছিলায় আবার গ্রেপ্তার করিবার জন্যই নাকি সিন্ধু গবর্নমেণ্ট এ নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরা অবশ্য খবরটি বিশ্বাস করি নাই। যাহা হউক, মামলা করিবার নোটিশ দেওয়ার পর শুনিলাম, ভাড়াটা তাঁহাকে দিয়া দেওয়া হইয়াছে।

* * *

কলিকাতার এক সভায় মৌলানা আহমেদ আলি সাহেব আমাদিগকে একটি নূতন সংবাদ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে নাকি "লীগ-চিনি" এবং "লীগ-কাপড়" উৎপাদিত হইয়াছে। আমাদের মত অ-লীগীয় লোকদের ভাগ্যে এই নবাবিষ্কৃত দ্রব্যসম্ভার জুটিবে না বলিয়া দুঃখ করিলেও



আবিষ্কর্তার তারিফ না করিয়া পারিতেছি না। এ ব্যাপারেও হয়ত বাঙলা অগ্রগমনের দাবী করিতে পারে। লীগ-চিনি হয়ত অন্যপ্রদেশ এখনও চোখে দেখে নাই।

* * *

সার শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন যে, গবর্নমেণ্ট ইচ্ছা-সুখে বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি করিতে যাইতেছেন একথা সত্য নহে। উদ্বৃত্ত চাউল বাঙলার গুদামে যাহাতে আর না পচে তার জন্যই চাউল নিয়া যাওয়া হইবে। হক সাহেবের চাউলের সভা তাহা হইলে দেখিতেছি নেহাৎ না-হক হইয়াছে। চাউল যদি পেটে পচিবার সুযোগই না হইল—তবে গুদামে পচাইলেই নন্দের পিসির কি লাভ হইবে!

* * *

যুদ্ধের সময় শ্যামলালের গৃহিণী গবর্নমেণ্টের কাজ নিয়াছিলেন। এইবার অস্থায়ী বাবু এবং বাবুনীদের



শতকরা সত্তর ভাগেরই কাজ চলিয়া যাইবে শুনিয়া শ্যামের চোখে আর ঘুম নাই। শ্যাম বলে—"গিন্নী শ্যাম ছেড়ে কলম ধরেছিলেন। এখন দেখছি তার শ্যাম আর কলম দুই-ই গেল। কেরাণী-গিন্নিকে প্রতিপালন করা, আমার মতো নগণ্যের কর্ম নয়।" বিশু খুড়ো বলিলেন,—"তা ছাড়া হাঁড়ি ঠেলাটাও হয়ত তিনি ভুলে মেরে দিয়েছেন। এবার ঠেলা সামলাও। দুদিনের কেরাণী—ভাতকে তো অন্ন বলতে শিখেছিলে।" শ্যাম ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে।

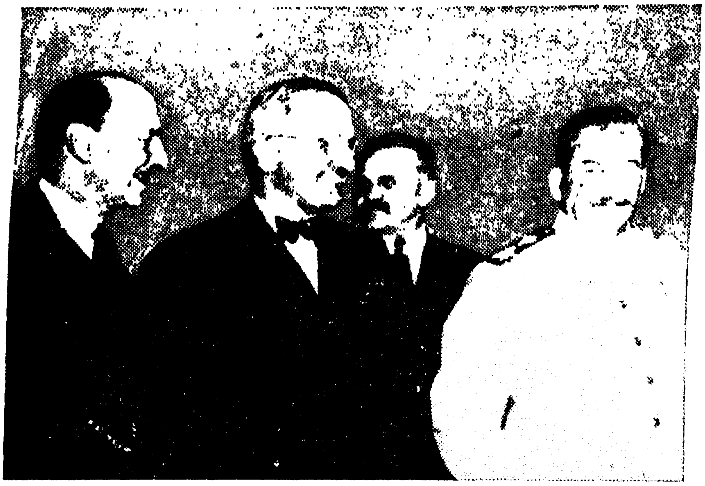
* * *

বিশু খুড়ো আবার বলেন—"তোমার স্ত্রীর তো শুধু চাকরিই যাবে। আরও কত আছে তাদের যে "জিপে চড়ে বেড়ানোই বন্ধ হয়ে গেল। জিপের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে গোটা প্রেমেরই হয়ে গেল জ্যান্ত কবর। যুদ্ধজয়ের বিজয়-উল্লাসের অন্তরালে কত কুমারী যে অশ্রু-অন্ধ নয়নে দিনযাপন করছেন সে খবর কি রাখ কিছু?" বলিলাম—"শুধু কুমারী কেন, কণ্ট্রাক্টারদের কথাটাই ভেবে দেখ না কেন? কুমারীদের তো তবু জিপের বদলে ফিটন মিলবে। কিন্তু এদের যে একেবারে সপ্ত ডিঙি ডুবল গো!"

কাহিনী খবর ভয়ঙ্করে

পট্‌স্‌ড্যামের যবনিকা পতন

পট্‌স্‌ড্যামে তিন প্রধানের মহাসম্মেলনের খবর সবাই পড়েছেন—কিন্তু তার যবনিকা-পতন-পর্বটার খবর পাননি তো? গত ১লা আগস্ট সন্ধ্যায় খানাপিনা শেষ করে সন্ধ্যা রাত্রেই ফ্রেডরিক উইল্‌হেল্‌মের "সিসিলিয়েনক" প্রাসাদে তৃতীয় সংস্করণের তিন প্রধান (অর্থাৎ ক্লিমেন্স এটলি, জোসেফ স্ট্যালিন আর হ্যারী ট্রুম্যান) এবং তাঁদের পারিষদবর্গ পরামর্শে বসলেন। পট্‌স্‌ড্যামের ঘড়িতে মধ্যরাত্রের ঘণ্টা বাজলো—কিন্তু ঐ প্রাসাদটিতে তখনও আলো জ্বলছে। কারণ, তখনও সভা চলছে প্রাসাদের



পট্‌সড্যামের হাসি-বিনিময়—— এটলি, ট্রুম্যান, মলোটভ ও স্ট্যালিন

মাঝখানের হলঘরে। টেবিলের চারপাশে যাঁরা পরামর্শে বসেছেন তাঁদের অনেকেই বেশ ক্লান্ত, ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে। ওদিকে প্রতিনিধি-বর্গের চাকর, খানসামা, বেয়ারা, সেক্রেটারী বেচারারা ঘরের চারধারের গোল বারান্দায় ভিড় করে কেউবা দাঁড়িয়ে আছে—উৎকণ্ঠা নিয়ে কেউবা হাই তুলছে। শেষকালে—রাত সাড়ে বারোটার সময়—অর্থাৎ ইংরেজী মতে ২রা আগস্টের ভোরে—যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি জিজ্ঞাসা করলেন—"আর কিছু কাজ আছে কি?" কেউ কোনও জবাব না দিয়ে যে যার চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও অভিনন্দন জানানো ও করমর্দন পর্ব কে কত চটপট সেরে বিছানায় গড়াতে পারেন তারই প্রতিযোগিতা শুরু হলো। তিন প্রধানের হলো হাসি-বিনিময়! তারপর ঐদিন সকালেই—প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান বিমানে চেপে 'প্লিমাউথ' যাত্রা করলেন—রাজা ষষ্ঠ জর্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে। এটলি সাহেব লণ্ডনে ফিরলেন নতুন মন্ত্রিসভাকে সম্পূর্ণ করতে—জোসেফ স্ট্যালিন ট্রেনে চেপে মস্কো রওয়ানা হলেন। ১৭ দিনে সতেরো রকম ঝামেলা ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে তিন প্রধান বিদায় নিলেন পট্‌স্‌ড্যাম থেকে। পট্‌স্‌ড্যামের নাটকের যবনিকা পতন হল। শোনা যাচ্ছে, ট্রুম্যান সাহেব ওয়াশিংটনে পরবর্তী আসরের বায়না জানিয়েছেন।

আণবিক বোমা! এটম্ বোমা!—ক'দিন ধরে একেবারে কাগজে খবর আর মগজে ভাবনা ভরে দিয়েছে না? আমেরিকায় যে এমন একটা ভয়ঙ্কর বস্তু তৈরী হচ্ছিল এ খবরটা এর আগে ঘুণাক্ষরেও টের পান নিতো? পাবেন কোথা থেকে? এই আণবিক বোমা তৈরীর ব্যাপারটা পুরোপুরি গোপন না রাখলে কি চলে? তাই "ম্যানহাট্টান পরিকল্পনা" নাম দিয়ে এই গোপন প্রচেষ্টা চলেছিল যুক্ত-রাষ্ট্রের তিনটি কারখানায়—একটি হচ্ছে 'নক্স-ভিলা'র ১৯ মাইল পশ্চিমে ওক্ রিজ বলে যায়গাটিতে—একটি হচ্ছে উত্তর-পশ্চিম ওয়াশিংটনের 'প্যাস্কো'তে। আর একটি 'সাণ্টা-ফে'র ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে "লস্ আলামস" বলে যায়গাটিতে। এ পরিকল্পনা কি এবং কি উদ্দেশ্যে তা কাউকে জানতে দেওয়া হয়নি—এমন কি এই ব্যাপারের হাজার হাজার লোকের মধ্যে—যারা কোনও না কোনও কাজে সাহায্য করেছে তারাও জানতে পারেনি—আসলে কি তৈরী হচ্ছে—জানতো শুধু "ম্যানহাট্টান পরিকল্পনা" এই কথাটি। এই পরিকল্পনা নাকি রুজভেল্ট-চার্চিল দু'জনে মিলেই করেছিলেন—যুক্তরাষ্ট্র শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ বলেই যুক্তরাষ্ট্রেই এই ব্যবস্থা হয়েছিল। এই আণবিক বোমা তৈরীর গবেষণায় সমস্ত জিনিষপত্তর যোগাড়যন্ত্রর যাতে সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় তার জন্য জরুরী ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। জলের মত টাকা পয়সা খরচ হয়েছে আণবিক বোমা তৈরীর ব্যাপারে, তবে সে খরচ নাকি সার্থক হয়েছে মিত্রপক্ষের তরফে। আণবিক বোমা আবিষ্কারের ব্যাপারে হ্যারী ট্রুম্যান বলেছেন—"আমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বিরাট বৈজ্ঞানিক জুয়া খেলায় ২ কোটি ডলার খরচ করেছি এবং আমরা জিতেছি।"—আণবিক বোমার ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক জুয়াই যদি হয়—তাহলে হারজিৎ দুই-ই আছে!

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই

এডলফ হিটলারের ভাই এলয় হিটলারকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি মুক্তি দিয়েছেন। ছয় সপ্তাহ ধরে তাকে আটকে রেখে জেরায় জেরায় জেরবার ক'রে—এখন জানিয়ে-ছেন যে, তাঁর দ্বারা বিপদ ঘটার সম্ভাবনা নেই। বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ হিটলার-ভ্রাতা সম্বন্ধে এক নীরস ঘোষণায় বলেছেন—"এখন এই ব্যাপারটা স্পষ্টই আমরা বুঝছি যে—সে (এলয়) সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ জীবনযাত্রা নির্বাহ করতো এবং ফ্যুরারের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভয় পোষণ ক'রে সোজা দূরে সরে থাকতো।" শেষটায় জার্মানদেরও "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" না ক'রে—মিত্রপক্ষ ছাড়ছে না।

চার্চিল গেলেন—এটলি এলেন

আসছে একটির পর একটি। চার্চিল ক্রমশই

ইংল্যাণ্ডের নির্বাচন পর্বে শ্রমিক দলের জয় হওয়াতে—অনেকেই বলছেন "চার্চিল গেলেন—এটলী এলেন।" কিন্তু কেউ হয়তো জানেন না—মন্ত্রী নির্বাচন পর্বে ঠিক এই ব্যাপারটা সত্যি সত্যি ঘটেছিল। যেদিন নির্বাচনের খবর ঘোষিত হবে সেদিন চার্চিল সাহেব সকাল ১০টার সময় প্রাতরাশ শেষ ক'রে—একটা নতুন চুরুট ধরিয়ে এসে ঢুকলেন মন্ত্রিসভার একটি ঘরে। এই ঘরেই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হচ্ছিল। মন্ত্রিসভার প্রাক্তন দুই সদস্যের হার ঘটেছে—শ্রমিক দলের জয়ের খবর গম্ভীর হয়ে উঠছিলেন—কিন্তু দমে যাননি। মধ্যাহ্ন ভোজ খাওয়ার আগে পর্যন্ত এই ঘরেই রইলেন। তারপর খাওয়ার সময় হতেই একলা গেলেন খাওয়ার ঘরে। চার্চিল-গৃহিণী সকাল থেকে উডফোর্ড কেন্দ্রেই ছিলেন—কারণ ঐ এলাকা থেকেই তাঁর স্বামী নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। চার্চিল সাহেব খাচ্ছেন



সাবধান!—প্যাস্কোর অ্যাটম বোমার কারখানা!

—এমন সময় চার্চিল-গৃহিণী এসে যোগ দিলেন এবং খবর দিলেন যে, চার্চিল জয়লাভ করেছেন। খাওয়া শেষ করে আবার সেই ঘরে ফিরলেন চার্চিল সাহেব। কিন্তু এর পরই রক্ষণশীল দলের চাঁইদের পরাজয়ের খবর আসতে লাগলো। চার্চিলের জামাতাবাবাজী—ডানক্যান স্যান্ডিজ হেরেছেন। চার্চিল-তনয় র‍্যান্ডলফ পরাজিত ও ভারত সচিব এমেরী কুপোকাৎ। চার্চিল দুপুরে না ঘুমিয়ে দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ আর পরাজয়ের পর পরাজয়ের খবর শুনেই বিকেল পর্যন্ত ঐ ঘরেই কাটালেন—এমন সময় বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে ডাক এল।—রাজা প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

চার্চিল সাহেব সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ একটিমাত্র গোয়েন্দা সঙ্গে নিয়ে পুলিশের সুরক্ষিত গাড়িতে চেপে রাজবাড়িতে যাত্রা করলেন। ৭-২৫ মিনিটে রাজার কাছে তিনি মন্ত্রিত্বের পদত্যাগপত্র পেশ করে বেরিয়ে এলেন। এর ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই দেখা গেল বাকিংহাম প্রাসাদের ফটক পার হয়ে ছোট একটি মোটর এসে ঢুকলো। দেখা গেল গাড়ি চালাচ্ছেন এটলি-গৃহিণী—পাশেই এটলি সাহেব। রাজবাড়িতে ঢুকলেন তাঁরা। তারপর রাজা ষষ্ঠ জর্জ যথারীতি এটলি সাহেবকে মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দিলেন। তিনি মহা খুশি হয়ে রাজার হস্ত চুম্বন করে স্বীকার করলেন প্রধান মন্ত্রীত্ব। এটলির মন্ত্রীত্বে সকলেই খুশি কিনা জানিনা—তবে এদেশের ধুরন্ধর রাজনীতিকদের মনে রাখা উচিত—"যে আসে লংকায় সেই হয় রাবণ।"

বৈদেশিকী

গত সপ্তাহে আমরা চীনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে চীনের গৃহযুদ্ধের আশঙ্কায় আতঙ্ক প্রকাশ করেছিলাম, কম্যুনিস্টদের আপোষবিরোধী মনোভাবের নিন্দা করেছিলাম এবং রয়টারের একটি সংবাদের যাথার্থ্যে সন্দেহ প্রকাশ করেও বলেছিলাম চীনের সঙ্গে মৈত্রী ও সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সোভিয়েট রুশিয়া যদি চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টদের সাহায্য করে থাকেন তা হলে মৈত্রী ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি ক্ষুণ্ণ করা হয় বলে আমাদের বিশ্বাস। তখন রুশচীন মৈত্রী ও সহযোগিতার সর্তগুলো প্রকাশিত হয়নি। সম্প্রতি ঐ চুক্তির সর্তগুলি প্রকাশিত হয়েছে। আমরা নিম্নে তার সংক্ষিপ্ত মর্ম দিলাম।

চুক্তিপত্রের প্রথম তিনটি ধারা জাপান সম্পর্কে। ঐ তিনটি ধারায় বলা হয়েছে, চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয় শেষ বিজয় লাভ না হওয়া পর্যন্ত সম্মিলিত রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে যুক্তভাবে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবেন এবং এই যুদ্ধে তাঁরা (রুশ ও চীন) পরস্পরকে সর্বপ্রকার সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য করবেন। পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া দু'পক্ষ বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন জাপ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন না। জাপ যুদ্ধের পরে তার পক্ষে যাতে আর আক্রমণ করা ও শান্তিভঙ্গ করা সম্ভব না হয় তার জন্য পক্ষদ্বয় যুক্তভাবে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। যদি পক্ষদ্বয়ের একজন আক্রান্ত হন তা হলে অপর পক্ষ অবিলম্বে তাকে সর্বপ্রকার সামরিক ও অন্যান্য সাহায্য করবেন। যতদিন পর্যন্ত পক্ষদ্বয়ের অনুরোধে সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের উপর জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধের দায়িত্ব অর্পণ না করা হয় ততদিনই এই শেষোক্ত সর্ত বলবৎ থাকবে।

অন্যান্য সর্তগুলোতে বলা হয়েছে যে, চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের কেউ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে কোন মৈত্রীচুক্তি বা সহযোগিতার চুক্তিতে যোগ দিবেন না, শান্তির সময়ে পরস্পরের অর্থনীতিক উন্নতি ও রক্ষা ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে সহযোগিতা করবেন এবং পরস্পরের রাষ্ট্রিক ও সার্বভৌমিক অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখবেন ও ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না। যুদ্ধোত্তরকালে উভয় দেশের দ্রুত পুনর্গঠনের জন্য ও পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য তাঁরা পরস্পরকে সর্বপ্রকার আর্থিক সাহায্য করবেন। এই চুক্তিপত্র চুক্তিবদ্ধ পক্ষদ্বয়ের ও সম্মিলিত রাষ্ট্র সংঘের সদস্যদের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা মেনে নেওয়া হয়েছে।

এই চুক্তিপত্র ৩০ বৎসর বলবৎ থাকবে। এক বৎসরের নোটিশ দিয়ে যেকোন পক্ষ চুক্তির অবসান ঘটাতে পারবেন।

জেনারেলিসিমো স্ট্যালিন ও রুশ পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ এবং চীনের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ টি ভি সুঙ ও চীনের পররাষ্ট্র সচিব ডাঃ ওয়াঙ শিহ-চিয়েহ-এর মধ্যে গত ৩০শে জুন থেকে যে আলোচনা আরম্ভ হয় তার ফলে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। গত ১৪ই আগষ্ট মস্কোতে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল। গত ২৪শে আগষ্ট সোভিয়েট রুশিয়া ও চীন এই চুক্তিপত্র অনুমোদন করেছেন। চুক্তিপত্র চীন ও রুশ দু ভাষাতেই লেখা হয়েছে। দুটিই প্রামাণ্য বলে গণ্য হবে।

এছাড়া আরও কয়েকটি চুক্তি হয়েছে। তার একটি হল চীন-চ্যাঙচুয়ান রেলপথ সম্পর্কে। এই চুক্তিও ৩০ বৎসরের জন্য সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তি অনুসারে চীনা পূর্ব ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথের ট্রাঙ্ক লাইনগুলো সংযুক্তভাবে চীন-চ্যাঙ-চুয়ান রেলপথ বলে পরিচিত হবে এবং ৩০ বৎসর পর্যন্ত এই রেলপথ চীনের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হলেও রুশ ও চীন গভর্নমেণ্ট কর্তৃক যুক্তভাবে পরিচালিত হবে। এই রেলপথ সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিক কাজেই ব্যবহৃত হবে। তবে কেবল এই জাপযুদ্ধকালে সোভিয়েট সৈন্য চলাচলে ঐ রেলপথ ব্যবহৃত হবে। ৩০ বৎসর পরে এই রেলপথ সম্পূর্ণরূপে চীনা সাধারণতন্ত্রের সম্পত্তি হবে, তজ্জন্য চীনকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

মাঞ্চুরিয়ার লিয়াওটুঙ উপদ্বীপে অবস্থিত পোর্ট আর্থার ও ডাইরেন বন্দর সম্বন্ধে যে চুক্তি হয়েছে, তাতে পোর্ট আর্থার বন্দর কেবল চীন ও রুশ গভর্নমেণ্টই যুক্তভাবে নৌঘাঁটিরূপে ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে কেবল তাঁদেরই যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজ থাকতে পারবে। এই ঘাঁটি রক্ষার ব্যবস্থা সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট করবেন এবং তজ্জন্য ঐ অঞ্চলে সৈন্য রাখতে পারবেন। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে যে, রুশিয়া পোর্ট আর্থার বন্দর চীনের নিকট থেকে ইজারা নিয়ে একে সুরক্ষিত করে এবং সাইবেরিয়ান রেলপথ ঐ পর্যন্ত বিস্তৃত করে। বিগত রুশ-জাপানের যুদ্ধের সময় জাপান ১১ মাস অবরোধের পর ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসে এই বন্দর অধিকার করে। তারপর থেকে এ বন্দর তাদের অধিকারেই ছিল। ডাইরেন বন্দরও জাপানীরা ইজারা নিয়ে দখল করেছিল।

ডাইরেন বন্দর সম্বন্ধে এই স্থির হয়েছে যে, সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের স্বার্থানুরোধে চীন গভর্নমেণ্ট ডাইরেন বন্দরে সব দেশকেই অবাধ বাণিজ্যাধিকার দিতে সম্মত হয়েছেন। ডাইরেনের শাসনভার থাকবে চীন গভর্নমেণ্টের হাতে। বাইরে থেকে সোভিয়েট রুশিয়ায় পাঠাবার জন্য যে পণ্যাদি চীন-চ্যাঙ-চুয়ান রেলপথ দিয়ে নীত হবে এবং ঐ রেলপথ দিয়ে ডাইরেন বন্দর থেকে রপ্তানির জন্য যে সব পণ্যাদি আসবে, তার জন্য সোভিয়েট রুশিয়াকে কোন শুল্ক দিতে হবে না। কিন্তু চীনে যে সব মাল প্রেরিত হবে, তার জন্য চীন গভর্নমেণ্টের বিধান অনুসারে বাণিজ্য শুল্ক দিতে হবে। এর পরিবর্তে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট চীনের পূর্বপ্রান্তীয় তিনটি প্রদেশকে চীনের অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নিয়েছেন। অবশ্য জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে সোভিয়েট সৈন্য ঐ তিনটি প্রদেশে প্রবেশ করতে পারবে এবং যুদ্ধসম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারে সোভিয়েট প্রধান সেনাপতির কর্তৃত্ব যুদ্ধাঞ্চলে থাকবে। এই চুক্তিও ৩০ বৎসরের জন্য সম্পাদিত হয়েছে।

এ ছাড়া, জেনারেলিসিমো স্ট্যালিন আশ্বাস দিয়াছেন যে, জাপানের আত্মসমর্পণের তিন মাসের মধ্যেই তিনি মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাবেন। চীনকে বহির্মঙ্গোলিয়ার স্বাধীনতা মেনে নিতে হবে। সিংকিয়াঙ সম্বন্ধে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব আশ্বাস দিয়েছেন যে, চীনের ঘরোয়া ব্যাপারে তাঁরা হস্তক্ষেপ করবেন না এবং সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কেবল চীন জাতীয় (কেন্দ্রীয়) গবর্ণমেণ্টকেই নৈতিক ও সামরিক সাহায্য করবেন।

এই সব চুক্তিতে ইয়েনানের কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ না থাকলেও সোভিয়েট-রুশিয়া শুধু চীন গবর্ণমেণ্টকেই সামরিক ও নৈতিক সাহায্য করতে সম্মত হওয়াতে কম্যুনিস্টদের যে কূটনীতিক পরাজয় হয়েছে একথা বোঝা যায়। চীনের কম্যুনিস্টদের মনোভাবের দ্রুত পরিবর্তনে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। মাও সে তুঙ কদিন আগেও চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে আপোষের আলোচনা চালাতে নারাজ ছিলেন। চুক্তির সর্ত প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি যেচে আপোষ আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। কাজেই সোভিয়েট-চীন চুক্তির ফলে চীনের গৃহ যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হবে বলে মনে হয়।

সোভিয়েট-চীন মৈত্রী চীনকে শক্তি সমৃদ্ধি ও শান্তির পথে অগ্রসর করে নিবে এই আশাই আমরা করবো। **বিষ্ণুগুপ্ত**

এই বছরের মধ্যে এক কলকাতাতেই খুব কম করে পাঁচটি নতুন চিত্রগৃহ উদ্বোধন হবার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং আর এক বছরের মধ্যে আরও প্রায় গোটা ছয়েকের পরিকল্পনা ঠিক হয়ে আছে। এখনই কলকাতা আর হাওড়া মিলিয়ে সিনেমার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ অর্থাৎ হিসেবে প্রতি প্রায় ষোল জন পিছু সপ্তাহে একটি আসন পড়ে; এর মধ্যে আবার বহু লোক সিনেমায় যায়ই না। তাদের কথা বাদ দিলে কলকাতায় বর্তমানে যে পরিমাণ সিনেমাগৃহ রয়েছে তা যথেষ্ট বলতে হবে তা সত্ত্বেও সেই কলকাতাতেই সিনেমা বাড়িয়ে যাওয়া উৎকট এবং বেহিসেবী প্রতিযোগিতার পথ করে দেওয়া ছাড়া আর কি হবে! অথচ সিনেমাগৃহের দরকার



এসোসিয়েটেড পিকচার্সের নির্মীয়মান হিন্দী কথাচিত্র "আমীরী"তে শ্রীমতী যমুনা। বড়ুয়ার পরিচালনাধীনে ছবিখানি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে গৃহীত হচ্ছে।

যেখানে, সেই মফঃস্বলে নতুন সিনেমা তৈরীর দিকে কারুর ঝোঁক দেখা যাচ্ছে না মোটেই। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সিনেমার সংখ্যা শ' তিনেকের বেশি নয় যার মধ্যে এক কলকাতাতেই তো পঞ্চাশটি; তারপর এই চার প্রদেশের বড় বড় সহরগুলি বাদ দিলে বিশাল এলাকা পড়ে থাকে যেখানকার লোকের কাছে সিনেমা দেখা তীর্থযাত্রার সামিল হয়ে দাঁড়ায়। এই অনধ্যুষিত এলাকার সর্বত্রই যে সিনেমা তৈরী হতে পারে বা হলে চলতে পারে তা হয়তো নয়, কিন্তু চলতে পারে এমন জায়গাও খুঁজলে বড় কম পাওয়া যাবে না। তা না করে এক জায়গাতেই সবাই গুঁতোগুঁতি করে প্রদর্শনক্ষেত্রকে সংকীর্ণ করে রাখার যে কি মানে হতে পারে আমরা বুঝতে পারি না।

*   *   *

গত সপ্তাহে ভারত প্রবাসী জগদ্বিখ্যাত রুষ শিল্পী নিকোলাস রোরিকের পুত্র



স্বাতিস্লাভ রোরিকের সঙ্গে শ্রীমতী দেবিকারাণীর বিবাহে ভারতীয় চিত্রজগত থেকে এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির অন্তর্ধান হয়ে গেল। কারণ দেবিকারাণী বিবাহের পর চলচ্চিত্রের সঙ্গে আর যোগ রাখবেন না, ঠিক করে ফেলেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। বম্বে টকীজে তার যে অংশ ছিল তা তিনি ইতিমধ্যেই বিক্রী করে দিয়েছেন এবং প্রধান সংচালিকার পদেও ইস্তফা দিয়েছেন। এর পরের কার্যক্রম সঠিক জানা না গেলেও শোনা যাচ্ছে, তিনি স্বামীর সহযোগিতায় পাঞ্জাবের কোথাও একটা আর্ট একাডেমী খুলবেন। মহিলা হয়েও ভারতীয় চিত্রজগতে যে আসন দেবিকারাণী করে নিয়েছিলেন, যে যোগ্যতা ও ব্যবসাবুদ্ধির পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন তা সমগ্র চিত্রজগতে খুব কমই দেখা গিয়েছে। তাই চিত্রজগত থেকে তার বিদায়-গ্রহণ সত্যিই ক্ষতির হবে।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এ সপ্তাহের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ চিত্রা ও রূপালিতে নিউ থিয়েটার্সের 'দুই পুরুষ'। তারাশংকরের এই রচনাটিকে প্রাণবন্ত করে ফুটিয়ে তোলার যা কিছু দরকার শক্তিমান অভিনয়শিল্পী ও কৃতী কলাকুশলী সেদিক থেকে কারুর বলবার কিছু নেই। ছবিখানি গত বছর ঠিক এই সময়েই মুক্তিলাভ করার কথা ছিল।

*   *   *

হিন্দী ছবির মধ্যে এ সপ্তাহে মুক্তিলাভ করছে সিটি, ছায়া ও পার্ক শো-তে খুরশীদ ও চন্দ্রমোহন অভিনীত রঞ্জিৎ ফিল্মসের 'মমতাজমহল' আর প্রভাত ও ম্যাজেস্টিকে স্বর্ণলতা ও নজীর অভিনীত হিন্দ পিকচার্সের 'লয়লা মজনু'।

বিবিধ

যুদ্ধোত্তরকালে চলচ্চিত্র ব্যবসাদারদের মধ্যে বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে যারা নামছেন তাদের মধ্যে নবগঠিত এ্যাসোসিয়েটেড পিকচার্সের কথা উল্লেখযোগ্য। গত সপ্তাহে এক মধ্যাহ্নভোজ সভায় এদের কর্মকর্তাদের মধ্যে মিঃ এস মজুমদার ও এন দত্ত স্থানীয় চলচ্চিত্র-সাংবাদিকদের কাছে নিজেদের ভবিষ্যত কর্মপন্থা, উদ্দেশ্য এবং বর্তমানে গৃহীত ছবি 'আমীরী' সম্পর্কে বক্তব্য জানান। জানা গেল যে এরা জাতির গঠনমূলক ছবি তোলাতেই আত্মনিয়োগ করবেন। কংগ্রেসী সরকার থাকার সময় মদ্যপান-বিরোধী একখানি ছবি তোলায় হাত দিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ কংগ্রেস শাসন ছেড়ে দেওয়ায় তা আর কার্যকরী করে তুলতে পারা যায়নি। বর্তমানে 'আমীরী'র মধ্যে দিয়ে সহরের বস্তীজীবনকে ফুটিয়ে তোলা এবং তার উন্নয়নের পথনির্দেশ দেওয়ার চেষ্টাই এরা করছেন। এদের চেষ্টা হচ্ছে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মূলধনে কলকাতায় তাদের উদ্দেশ্য ফলবতী করার জন্য একটা বিরাট ষ্টুডিও নির্মাণ করার। যন্ত্রপাতী আমদানী বিষয়ে সহায়তা করার জন্য মেলভিন ডগল্যাস ইতিমধ্যেই আমেরিকা যাত্রা করেছেন। যদিও



নিউ থিয়েটার্সের 'দুই পুরুষ' চিত্রে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী

এঁরা আশ্বাস দিয়েছেন যে এঁদের মূলধনের সঙ্গে বিদেশীর কোন অংশ থাকবে না।

*   *   *

লাইসেন্স প্রথা উঠে যাবার খবর পাওয়া গেলেও আই-এফ-আই'য়ের ছোট ছবিগুলি বন্ধ করে হবে সে বিষয়ে সরকারি কোন ঘোষণা এখনও শোনা যায় নি।

*   *   *

'শকুন্তলা' বম্বেতে শত সপ্তাহ চলে প্রযোজক-পরিচালক শান্তারামকে মোট সাড়ে সতের লক্ষ টাকা পাইয়ে দিয়েছে।

*   *   *

১১ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬টায় শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে বেঙ্গল ওয়াটার প্রুফ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে, রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে নব পরিকল্পনায় 'রীতিমত নাটক' অভিনয় ও সেই সঙ্গে নৃত্যগীতানুষ্ঠান হবে।

স্বাতিস্লাভ—দেবিকা

চিত্রকার রোরিকের নাম ভারতবর্ষে অজানা নয়। সোভিয়েট বিপ্লবের পূর্বেই

তিনি রুশদেশে খ্যাতি অর্জন করেন। শুধু চিত্রকার হিসাবে নয় 'বালের' 'ডেকর' অথবা রঙ্গমঞ্চ অলংকার নির্মাণে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়ে তৎকালীন রুশ কলাবিদ-মণ্ডলীর মধ্যে স্থায়ী আসন গ্রহণ করেন। 'বালের' যে কোনো ইতিহাসে রোরিকের নাম পাওয়া যায়।

পরবর্তীকালে তিনি আত্মার অন্তর্নিহিত রহস্য রঙ ও তুলির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করবার চেষ্টা করেন। রোরিকেরই দেশবাসিনী শ্রীমতী ব্লাডাটাস্কর মত তিনিও আত্মার রহস্যকে সর্বজন-বোধগম্য করতে গিয়ে অল্প বিস্তর নিন্দা ও প্রশংসা পান। সোভিয়েট বিপ্লবের পর তিনি কুলু উপত্যকায় স্থায়ী বসত বাড়ি নির্মাণ করেন ও হিমালয়ের বহু চিত্র অঙ্কন করে ভারতের অপূর্ব সৌন্দর্য বিশ্বের সম্মুখে উপস্থিত করেন।

তাঁর পুত্র স্বাতিস্লাভও চিত্রকর। তবে পিতার মত তিনি আত্মার রহস্য ও তাহার প্রতীক হিমালয়ের বিরাট গম্ভীর সৌন্দর্যকে তাঁর অঙ্কণের বিষয়বস্তু করেননি। মাটির পৃথিবীর খাঁটি মানুষ, মাঠের মেয়ে, ভিখারী আতুরকে তিনি উপেক্ষা করেননি। ভারতের ইতিহাস তিনি জানেন; সেই ইতিহাসে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ভারতবর্ষের প্রাচীন আশ্রম জীবন মনশ্চক্ষু দ্বারা দেখতে পেয়েছেন ও চিত্রপটে তাকে প্রাণ দিয়ে রসিকজনের প্রশংসোদান অর্জন করেছেন। আমাদের মনে হয় তাঁর কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা মনোজ্ঞরূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর আলেখ্যগুলিতে। মাদাম বগদানফের আলেখ্যগুলিতে তিনি অপূর্ব ব্যঞ্জনা সংযোগে রুশ চরিত্রের গভীর বিষাদ প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। বাঙলা দেশের অনেকেই বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক বগদানফকে চিনেন বলে উল্লেখ প্রয়োজন যে, ইনি তাঁর কোনো আত্মীয়া নন)।

স্বাতিস্লাভ পণ্ডিত ও কল্পনাপ্রবণ। পিতার চিত্রকলার বিষয়বস্তু তাঁর নিজস্ব সৃজনী শক্তিকে আচ্ছন্ন করতে সমর্থ হয় নি বটে; তবু তিনি ক্রমশ মৃন্ময় হতে চিন্ময়ের তীর্থযাত্রা আরম্ভ করেছেন। পথমধ্যে তিনি শ্রীমতী দেবিকারাণীর সঙ্গে উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

শ্রীমতীর পরিচয় বাঙালীকে আর কি দেব। তাঁর বিশেষ গুণ এই যে, হৃদয়ে তাঁর দরদ আছে। সেই দরদ যদি স্বাতিস্লাভকে অনুপ্রাণিত করতে পারে তবে আশা করতে পারি পর্দা জগতে বিপ্লব ঘটবে। স্বাতিস্লাভ রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ করলেন শ্রীমতী তাতে অভিনয় করলেন, গুণিগণ করতালি দিলেন, আমরা সেই আশা করছি; কারণ এ যাবৎ গুণিগণ বায়স্কোপের কোনো পটভূমিকে প্রশংসা করেন নি।



বাংলার কথা

শ্রী[illegible]

বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানির প্রতিবাদ হইতেছে। বাঙলা-সরকার এতদিনে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে—এবার বর্ষার জন্য ধান্যের ফলন কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে লোকের মনে উৎকণ্ঠার উদ্ভব হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে আগস্ট মাসের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত পর্যাপ্ত বর্ষণ না হওয়ায় সেই অঞ্চলে ধান্যের ফলন ভাল হয় নাই; কিন্তু প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে ফসল খুবই ভাল হইয়াছে—বিশেষ ঢাকার ও ময়মনসিংহের ত কথাই নাই। সব বিবেচনা করিলে মনে হয়—মোট আশুধান্য সাধারণত যেরূপ হয় তাহার সিকি কম হইবে।

ময়মনসিংহের কোন কোন অঞ্চলে বন্যায় যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা এই হিসাবে ধরা হইয়াছে কিনা, তাহা বিবৃতি পাঠ করিলে জানা যায় না। তবে বিবৃতিতে স্বীকৃত হইয়াছে—

টাঙ্গাইল, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ত্রিপুরা—এ সকল স্থানে বন্যা হইয়াছে। কিন্তু বন্যা আশুধান্য সংগৃহীত হইবার পরে হইয়াছে—অধিকাংশ স্থানে তাহা সংগৃহীত হইয়া গিয়াছে। অবশ্য ভাদ্র মাসের পূর্বেই কোথায় আশুধান্য পর্ব শেষ হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

তাহার পরে আমন ধান্যের কথা। আশুধান্য বাঙলায় যে ধান্য হয়, তাহার এক-পঞ্চমাংশ মাত্র। আমন ধান্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—যদি আবহাওয়া ভাল হয়, তবে ফসল শতকরা ৮০ ভাগ হইবে।

সরকারের স্বীকৃতি অনুসারে

(১) আশুধান্যের পরিমাণ এক-চতুর্থাংশ কম হইয়াছে।

(২) আমনের ভবিষ্যৎ বর্ষণ কিরূপ হয়, তাহার উপর নির্ভর করিবে। অর্থাৎ তাহা অনিশ্চিত।

প্রথম জিজ্ঞাস্য—

যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহা কতদূর নির্ভরযোগ্য।

যখনই সরকারের অসুবিধা ঘটে, তখনই আমরা দেখিতে পাই, বলা হয়—এদেশে ফসলের হিসাব রাখা ভাল নহে—তাহাতে নির্ভর করা যায় না। কারণ গ্রামের চৌকীদার—যে চৌকীদার অজ্ঞ বলিয়া তাহাকে মৃত্যু অনাহারে কিনা, তাহা জানিবার যোগ্যতাবর্জিত বলা হইয়াছে সেই চৌকীদার আসিয়া যাহা বলে তাহাতে নির্ভর করিয়া থানা হইতে হিসাব পাঠান হয় এবং সেই হিসাব ক্রমে দপ্তরখানায় যাইয়া আভিজাত্য লাভ করিয়া প্রকাশ পায়। সে দিনও দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন তাঁহাদিগের রিপোর্টে বলিয়াছেন—

"The defects in the relevant statistics are familiar."

অর্থাৎ যে হিসাব প্রয়োজন তাহার ত্রুটির বিষয় সকলেই অবগত আছেন। সে বিষয় বহু কমিশন ও কমিটি উল্লেখ করিয়াছেন।

কিন্তু বহু কমিশনের ও কমিটির ত্রুটির কথা বলার পরেও হিসাবের নির্ভুলতা সম্পাদনের ব্যবস্থা যে হয় নাই, সে জন্য সরকারই দায়ী—দেশের লোক নহে।

এইরূপ অবস্থায় বাঙলা সরকারের হিসাব যে নির্ভুল তাহা মনে করিবার কোন উপায় নাই।

যদি সেই হিসাব নির্ভরযোগ্য হয় তাহা হইলেও—

(১) আশু ধান্যের ফলন সিকি কম।

(২) আমন ধান্যের ফলন সুবর্ষণ হইলেও এক-পঞ্চমাংশ কম হইবে।

অর্থাৎ কিছুতেই অভাব হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় নাই। তাহার বিশেষ কারণ—লোকের যে চাউল প্রয়োজন তাহা বাঙলায় উৎপন্ন হয় না।

এই কমতির বিষয় বিবেচিত হইয়াছে কিনা?

আমরা পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, বাঙলায় যে এ বৎসরের শস্যহানিতেও বাঙলার লোকের চাউলের অভাব হইবে না, তাহা প্রতিপন্ন করা সরকারের পক্ষে প্রয়োজন।

এই সম্পর্কে ঈশপের উপকথার রাখাল বালকের কথা অনেকেরই মনে পড়িবে। সে তাহার পশুপাল চরাইবার সময় মধ্যে মধ্যে মিথ্যা চীৎকার করিত—"বাঘ আসিয়াছে! বাঘ আসিয়াছে!" তাহার কথা শুনিয়া লোক ছুটিয়া আসিত এবং আসিয়া দেখিত—বাঘ আসে নাই। তেমনই গত দুর্ভিক্ষের পূর্ব হইতেই বাঙলায় খাদ্যশস্যের অভাব সম্বন্ধে সরকার (কেবল সচিবরাই নহেন—ভারত সরকারের সদস্যরাও) যে সব কথা বলিয়াছেন, সে সবই যে প্রচার কার্যমাত্র তাহা আমরা দেখিয়াছি এবং দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনও বলিয়াছেন। কমিশন বলিয়াছেন—যখন সকলেই জানিয়াছে—চাউলের অভাব; তখনও সরকার বলিয়াছেন, অভাব নাই!—

"We consider that this propaganda of sufficiency was quite ill-advised."

দুর্ভিক্ষ দেখা দিবার পূর্বেই যিনি খাদ্য বিভাগে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন, তিনি বাঙলায় আসিয়া বলিয়াছিলেন—বাঙলা সরকার "অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন কর" ব্যবস্থায় যাহা করিয়াছেন, তাহার ফলে—ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানীতে বাঙলার কোন অভাবই হইবে না—এমন কি বাঙলায় এত ধান হইবে যে, বাঙলা অন্যান্য প্রদেশকে অনায়াসে (হয়ত বা অবাধে) সাহায্য করিতে পারিবে। তিনি পদত্যাগ করার পরেও—কেন তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করেন নাই। তার তাঁহার পরে যিনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি, যখন চাউলের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখনও বলিয়াছিলেন, ভয় নাই, মূল্য কমিতে আর বিলম্ব নাই। সে বিষয়ে তিনি বাঙলার সচিবদিগের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের মতে এ সব উক্তি মিথ্যা প্রচারকার্য ব্যতীত আর কিছুই নহে!

বাঙলার সচিবরা যেন—"অভাব নাই"—এই কথাকে কত উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারেন—সে বিষয়ে পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন! পরে তাঁহাদিগের পৃষ্ঠপোষক মিস্টার মহম্মদ আলি জিন্না বলিয়াছিলেন যখন ঐ সচিবরা চাকরী লইয়াছিলেন, তখনই ভাণ্ডার শূন্য। যদি তাহাই হয়, তবে তাঁহারা চাকরী লইয়া কেবল চাকরী রক্ষার জন্যই কি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন?

বাঙলার বর্তমান গভর্নর মিস্টার কেসী এ সকল বিষয় অবগত আছেন কিনা, তাহা আমরা জানি না এবং সেই জন্যই এ সকল কথা তাঁহাকে জানান আমরা প্রয়োজন মনে করি; প্রয়োজন আমাদিগের জন্যও বটে, তাঁহার জন্যও বটে। আমাদিগের প্রয়োজনের কারণ যদি আবার দুর্ভিক্ষ হয়, তবে আমরাই অনাহারে মরিব, আর তাঁহার প্রয়োজনের কারণ এখন যখন সচিবসংঘও নাই, তখন দায়িত্ব তিনি কাহারও সহিত বণ্টন করিয়া লইতেও পারিবেন না।

মিস্টার কেসী যে কতকগুলি ব্যাপারে যে সকল সংবাদ পাইয়াছেন, সে সকল সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য নহে, তাহা বলা প্রয়োজন। তিনি বলিয়াছেন বর্ষার পূর্বেই সরকার সঞ্চিত চাউল যাহাতে নষ্ট হইতে না পারে, এমনভাবে গোলাজাত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখাইয়া দিতে প্রস্তুত আছি, এখনও হাজার হাজার মণ খাদ্য যেসব গুদামে রাখা হইতেছে, সে সকলে শস্যে বিকৃতি—অবশ্যম্ভাবী।

আর তিনি যে বলিয়াছেন, বাঙলায় বর্ষাকালে শস্যের বিকৃতি অনিবার্য, তাহাও তিনি যাঁহাদিগের মত গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা হয় অজ্ঞ নহে ত সত্যের সম্বন্ধে বিশেষ অনুরাগী নহেন। কারণ, বাঙলার কৃষক ও মহাজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যায়, বহু বৎসর অবিকৃত অবস্থায় শস্য রক্ষার উপায় এদেশে বিদিত।

ইহার পরে, বন্যার কথা।

বাঙলার নানাস্থানে বন্যার সংবাদ পাওয়া

গিয়াছে। সে কথা সরকারের বিবৃতিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে শস্যহানি অনিবার্য—তবে শস্যহানি কিরূপ হইবে, তাহা এখন বলা যায় না।

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, বন্যার আরম্ভ হইতেই লোককে সাহায্যদানের ব্যবস্থা হইয়াছে—লোককে খয়রাতি দানের ও কৃষিঋণ প্রদানেরও জন্য জিলার হাকিমদিগের নিকট টাকাও দেওয়া হইয়াছে। আর স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারীরাও বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিতেছেন।

এ সবই সুসংবাদ, সন্দেহ নাই। কিন্তু একথা কি অস্বীকার করিবার উপায় আছে যে, বন্যা বা বাত্যার মত আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে সরকারের কর্মচারীরা যেমন সব কাজ করিতে পারেন না—তাঁহারা সংখ্যায় তত অধিক নহেন, তেমনই আবার সরকারের সাহায্যদানের ব্যবস্থায় যে বিলম্ব অনিবার্য, তাহাতে লোকের বিপদ বাড়িয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে অন্যান্য কথা বলিবার পূর্বে আমরা মিস্টার কেসীকে একটি অনুরোধ করিব—মেদিনীপুর বন্যায় ও বাত্যায় বিধ্বস্ত হইবার পর স্যার জন হার্বার্টের উদ্যোগে যে কেন্দ্রীয় সাহায্যদান ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার হিসাব নিকাশ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে তাহার কোন টাকা থাকিলে তাহা কি এই বন্যায় বিপন্নদিগকে সাহায্যদানার্থ ব্যয়িত হইবে?

মিস্টার কেসী এদেশে নবাগত বলিয়া আমরা তাঁহাকে পূর্ব পূর্ব দুর্যোগের বিষয় জানিতে বলিব। প্রথম দামোদরের বন্যা। সেই বন্যার সংবাদ পাইয়া বহু তরুণ বিপদের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সাহায্যদান কার্যে অগ্রসর হইয়াছিল—তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সেই কার্যে প্রাণও দিয়াছিল। সেই সময় কোন ইংরেজ পাদরী লিখিয়াছিলেন তাহাদিগের কাজ দেখিলে মনে হয়, বাঙলায় যেন নূতন জাতির আবির্ভাব হইয়াছে; এই সেবাতৎপর তরুণদিগের কাছে যিনি সাহায্য দিবেন, তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারেন—এক কপর্দকও অপব্যয়িত হইবে না। তখন লর্ড হার্ডিং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার। তিনি ছাত্রদিগের প্রশংসা অকুণ্ঠকণ্ঠে করিয়াছিলেন। আর একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিব—উত্তরবঙ্গ প্লাবনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে সুভাষ চন্দ্র বসু প্রমুখ তরুণগণের কৃত কার্য স্মরণীয়, সন্দেহ নাই।

সে সকল কাজই লোক সরকার-নিরপেক্ষ হইয়া করিয়াছিলেন। আজও দেশের সর্বপ্রধান প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসই সাহায্যদান কার্যে অগ্রণী হইয়াছেন। কংগ্রেস নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান এই আদেশ প্রত্যাহৃত হইতে না হইতে কংগ্রেসের জন্য এই কার্যের আহ্বান আসিয়াছে এবং কংগ্রেসের কর্মীরাও যে প্রস্তুত তাহা তাঁহাদিগের কার্যে প্রতিপন্ন হইতেছে।

মেদিনীপুরের দুর্বিপাকে বাঙলার 'আনন্দবাজার পত্রিকার' আহ্বানে যে অর্থ দেশের লোক দিয়াছিলেন তাহা অসাধারণ, বলিলেও অতিরঞ্জন করা হয় না।

দুর্ভিক্ষকালে লর্ড কার্জনও দেশের লোকের সহযোগ আহ্বান করিয়াছিলেন।

মিস্টার কেসী কি মনে করেন, তাঁহার সরকারের কর্মচারীরাই সাহায্য বিতরণের পক্ষে যেমন যথেষ্ট, সরকারের সাহায্যদান ব্যবস্থাও তেমনই যথেষ্ট? আমরা বলিব, তাহা নহে—কারণ সরকারী সাহায্যদান প্রথা যেমন যন্ত্রবদ্ধ তেমনই সরকারের লোকসংখ্যাও অল্প। এসব আকস্মিক বিপদ যুদ্ধের মত; যুদ্ধের সময় যে ব্যবস্থা প্রয়োজন, শান্তির সময় তাহা রক্ষা করা সম্ভব নহে।

আমরা মিস্টার কেসীকে বলিব—তিনি এই সাহায্যদান কার্যে দেশের লোকের—দেশের প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা আহ্বান করুন। আর তিনি যেন নির্দেশ দেন, কোথাও দেশের লোকের সাহায্যদান চেষ্টায় যেন বাধা হওয়া না হয়। আমাদিগের একথা বলিবার বিশেষ কারণ—মেদিনীপুরে সাহায্যদান সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ আমরা পাইয়াছি, সে সকল আমরা ভুলিতে পারি না। সরকারী সাহায্যদানেও সরকারের কর্মচারীরা কোন কোন স্থানে কিরূপ বাধা দিয়াছিলেন—তাহা তিনি তৎকালীন সচিব শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।

দেশী সংবাদ

২২শে আগস্ট—মারির এক সম্বর্ধনাসভায়-বক্তৃতা-প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, "ভারতীয় জাতীয় বাহিনী"র লোক-জনের অমূল্য জীবন বিনষ্ট হইলে ভারত-বৃটেন সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইবে।

২৩শে আগস্ট—অবিলম্বে ৯৩ ধারার শাসনের অবসান ঘটাইবার দাবী করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের ১২০ জন সদস্য ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন।

বাঙলা গভর্নমেণ্ট এক প্রেস নোটে বলেন—বাঙলা সরকার নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ১৯৪২ সালে ১৯০৮ সালের ১৬(১) ধারা অনুসারে উক্ত দুইটি প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছিল।

বোম্বাই সরকার প্রচারিত এক প্রেস নোটে প্রকাশ, ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে সাতরা জেলায় যে-সমস্ত গোলযোগ ঘটিয়াছিল, সে-সমস্ত গোলযোগের জের চলিতেছে এবং কয়েকটি নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠান একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গবর্ণমেণ্ট গঠনের ও বিভীষিকার রাজত্ব চালাইয়া এই গভর্ণমেণ্টের কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছে।

গত ২১শে আগস্ট তারিখে কুচবিহার রাজ্যের সৈন্যেরা স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজ ও কলেজ হোস্টেল আক্রমণ করিয়া কলেজের অধ্যাপক, ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে প্রহার করে। মোট ৯২ জন আহত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ১৭জনের আঘাত সাংঘাতিক। একজন ছাত্রী ও একজন ছাত্রের অবস্থা উদ্বেগ জনক।

২৪শে আগস্ট—বড়লাট লর্ড ওয়াভেল অদ্য লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন।

পুণা হইতে মিঃ এন ভি গ্যাডগিল এক বিবৃতিতে বলেন, বোম্বাই গভর্নমেণ্ট সাতারার অবস্থা সম্পর্কে যে ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন উহাতে ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত উক্তি করা হইয়াছে।

যুদ্ধাবসানের সঙ্গে বঙ্গীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত অস্থায়ী কর্মচারীদের ছাঁটাইএর ব্যাপারে বিভাগীয় কর্মকর্তাদের নিকট সার্কুলার পাঠান হইয়াছে।

ঢাকার বিভিন্ন সরকারী গুদামে মোট ৪৩,৪২৮ মণ খারাপ চাউল সম্প্রতি ২৸০ হইতে আরম্ভ করিয়া ৮৷০ দরে নীলামে বিক্রয় করা হইয়াছে।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আগামী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের জন্য ইতিপূর্বেই তৎপরতার সহিত আয়োজন আরম্ভ করিয়াছেন। ৩০ হাজার দর্শকের উপযোগী এক মণ্ডপ নির্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৪২ সালে এখানেই আগস্ট মাসে "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল।

২৫শে আগস্ট—লর্ড ওয়াভেল আলোচনার জন্য লণ্ডনে আহূত হওয়ায় তাঁহার স্থলে অস্থায়ী বড়লাট হিসাবে বোম্বাইয়ের গভর্নর স্যার জন কলভিল কাজ করিবেন।

২৬শে আগস্ট—গতকল্য লাহোরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, দ্রুত পরিবর্তনশীল অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সম্মুখে পাকিস্থান সম্পর্কে এত আলাপ আলোচনা শূন্যগর্ভ ও অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। ২৪শে আগস্ট সন্ধ্যায় রাওয়ালপিণ্ডিতে এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিতজী বলেন, কংগ্রেস আন্দোলন আগামী দুই বৎসর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইবে। গত তিন বৎসরে কংগ্রেস যথেষ্ট শক্তিলাভ করিয়াছে এবং অভূতপূর্ব নির্যাতন ভোগ সত্ত্বেও কংগ্রেস বিজয়-গৌরবে মণ্ডিত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

রবিবার প্রত্যূষে গোয়ালন্দ স্টেশনের নিকট ঘিউরবাজার স্টেশনে গোয়ালন্দ অভিমুখী ৭নং আপ ঢাকা এক্সপ্রেসের সহিত কলিকাতাগামী ডাউন চট্টগ্রাম স্পেশ্যালের এক সংঘর্ষ হয় এবং ১৮ জন যাত্রী আহত হয়।

ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কুড়ি সহস্রাধিক অফিসার ও সৈন্যের কর্মচ্যুতি হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া এ পির সংবাদদাতা জানাইয়াছেন। ভারতীয় সমর বিভাগ সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দিবার পরিকল্পনা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত শেষ করিতেছেন। সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত ইহা শেষ হইয়া যাইবে এবং অক্টোবর হইতেই সৈন্যদল হইতে লোক ছাঁটাই আরম্ভ হইবে।

২৭শে আগস্ট—একখানি সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, যে-সকল সাধারণ সৈন্য চাপে পড়িয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিল এবং ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইয়া শত্রুপক্ষ কর্তৃক সংগঠিত বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল, ভারত গভর্নমেণ্ট তাহাদের বিচার সম্পর্কে দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে নেতৃস্থানীয় ও অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা হীন কার্য করিবার অপরাধে অপরাধী, তাহাদিগকে বিচারের জন্য সামরিক আদালতে উপস্থিত করিবেন।

কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের উপর সৈন্যদের অত্যাচারের প্রতিবাদে কলিকাতা স্কুল কলেজসমূহে গত সোমবার ধর্মঘট হয়।

বিদেশী সংবাদ

২২শে আগস্ট—বিখ্যাত মার্কিন লেখিকা পার্ল বাক্ বৃটেনের শ্রমিকদলের ক্ষমতালাভের ফলে ভারতের সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যঙ্গ করিয়া বলেন,—ইংরাজ শ্রমিকরা কি নিজেদের মাখন ও রুটীর কথা ব্যতীত আর কোন কিছুর কথা ভাবিতে পারিবে? তাহাদের নিজেদের রুটীতে মাখন মাখাইবার পর ভারতের বুভুক্ষু নরনারীর জন্য আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে কি?

২৩শে আগস্ট—অদ্য জাপানী নিউজ এজেন্সী শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করিয়াছে। তিনি বিমান দুর্ঘটনায় আহত হইয়া এক জাপানী হাসপাতালে মারা গিয়াছেন, উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে।

টোকিও বেতারের এক ঘোষণা উদ্ধৃত করিয়া এসোসিয়েটেড প্রেস অব্ আমেরিকা বলেন যে, হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বর্ষণের ফলে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার জন নিহত, আহত কিংবা গৃহহীন হইয়াছে।

২৪শে আগস্ট—টোকিও বেতারে প্রকাশ, মিত্রপক্ষীয় বিমান বহরের আক্রমণে জাপানের মূল ভূভাগের লোকসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশ অর্থাৎ প্রায় ১ কোটী নরনারী হতাহত এবং গৃহহীন হইয়াছে।

২৫শে আগস্ট—টোকিও রেডিও হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে ঃ জাপানের মাটীতে কোন দিনই বিজয়ী শক্তির আবির্ভাব ঘটে নাই। টোকিওর রাজপথে বিজয়ী মার্কিন সেনাদের পদ শব্দ ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে চলিয়াছে, এই আশংকা করিয়া বহুসংখ্যক জাপানী রাজপ্রাসাদের সম্মুখে আত্মহত্যা (হারাকিরি) করিতেছে।

দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় জাপানীদের আত্মসমর্পণের চুক্তিপত্রে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষর করিবার উদ্দেশ্যে জাপ প্রতিনিধি দল রেঙ্গুনে পৌঁছিয়াছেন।

২৬শে আগস্ট—লর্ড ওয়াভেল অদ্য সন্ধ্যায় লণ্ডনে পৌঁছিয়াছেন। ভারত সচিব পেথিক লরেন্সের সহিত তাঁহার আলোচনা হয়।

টোকিওতে বোমাবর্ষণের ফলে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ গৃহ ধ্বংস হইয়াছে।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৩৫২ সাল। Saturday, 15th September, 1945 [৪৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

লর্ড ওয়াভেলের প্রত্যাবর্তন

লর্ড ওয়াভেল বিলাতে দ্বিতীয় দফা দৌত্য শেষ করিয়া কয়েক দিনের মধ্যেই ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন। কি উদ্দেশ্যে তিনি ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন, আমরা তাহা জানি না; তবে পরাধীন আমরা, আমাদিগকে স্বাধীনতা দানের আগ্রহে পড়িয়া তিনি যে আকস্মিক এই ইংলণ্ড যাত্রার কষ্ট স্বীকার করেন নাই, আমরা ইহা পূর্ব হইতেই বুঝিয়া লইয়াছি। শুনিতেছি, তিনি এখানে ফিরিয়া তাঁহার শাসন-পরিষদের জ্ঞানী ও গুণীগণের সঙ্গে প্রথমে পরামর্শ করিবেন এবং তারপর বেতারবার্তাযোগে বক্তৃতা দ্বারা আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন। কিন্তু তৎপূর্বেই অস্থায়ী বড়লাট স্যার জন কোলভাইলের বচন শুনিয়া আমরা পরম কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি। তিনি আমাদিগকে শুনাইয়া দিয়াছেন যে, ভারতরক্ষা আইনের বিধান অচিরে প্রত্যাহৃত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই এবং সেগুলি প্রত্যাহার করা হইলে দেশের শাসন-ব্যাপার সম্পর্কে নানা রকম অসুবিধার সৃষ্টি হইবে। অস্থায়ী বড়লাটের মুখে এমন বাণী শুনিয়া আমাদের মনে স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠে যে, এই অসুবিধা কাহাদের পক্ষে? দেশের লোকের পক্ষে নিশ্চয়ই নয়; কারণ বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার অজুহাতে দেশের লোকের জীবনে সকল দিক হইতে অসুবিধাই সৃষ্টি করা হইয়াছে। পরাধীন এই ভারতবর্ষে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সাধারণভাবেই প্রতিপদে ব্যাহত; ভারতরক্ষা আইন সে স্বাধীনতা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সুবিধার জন্যই এই আইন করা হইয়াছিল, দেশের লোকের সুবিধার জন্য নয়। প্রধানত বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করা এই আইনের উদ্দেশ্য নয়, দেশের লোকের স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টাকে পশুবলের সাহায্যে বিচূর্ণ করিবার উদ্দেশ্য এই আইনের মূলে রহিয়াছে। ভারতের ভূতপূর্ব স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার রিচার্ড ম্যাক্সওয়েল এই আইনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যান করিতে গিয়া এক সময় দম্ভভরে বলিয়াছিলেন, ভারত গভর্নমেণ্ট এক সঙ্গে দুই যুদ্ধ চালাইতেছেন। তাঁহারা একদিকে ফ্যাসিস্ট ও নাৎসীদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতেছেন; অপর দিকে ভারতের রাজনীতিক আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইতেছে। এখন ইউরোপ এবং এশিয়া উভয় যুদ্ধই শেষ হইয়াছে। নাৎসী প্রভাব ইউরোপে বিচূর্ণ হইয়াছে, এবং গর্বোদ্ধত জাপান ম্যাকআর্থারের কাছে পদানত। সুতরাং নাৎসী বা ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিবার জন্য ভারতরক্ষা বিধানের কোন প্রয়োজনীয়তা এখন আর নাই; তথাপি ভারতরক্ষা আইন প্রত্যাহৃত হইল না এবং অস্থায়ী বড়লাট বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, কয়েক বৎসরের মধ্যে এই বিধান প্রত্যাহৃত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার কারণ কি হইতে পারে স্যার রিচার্ড ম্যাক্সওয়েলের উক্তিতেই তাহা স্পষ্টভাবে পাওয়া যাইবে। বাহিরের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে বটে; কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস দলন করিবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ হইতে বিশ্বস্তভাবে এখনও সংগ্রাম চালাইতে হইবে; সেজন্যই ভারতরক্ষা আইন প্রত্যাহার করা যাইবে না; কারণ এক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থহানির ক্ষেত্রে অসুবিধার আশংকা রহিয়াছে। ভারতকে স্বাধীনতা দানের জন্য ব্রিটিশ শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলের অন্তরের দরদের পরিচয় ইহা হইতেই পাওয়া যাইতেছে। মিঃ চার্চিলের মুখে আমরা এই কথা শুনিয়াছিলাম যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এলাইয়া দিবার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী সেই একই মনোবৃত্তি লইয়া চলিতেছেন। হংকংয়ে ব্রিটিশ প্রভুত্ব কায়েম করাতে সেই সত্যই প্রতিপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে সেই সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। স্বাধীনতা লাভে জাগ্রত ভারতকেও ব্রিটিশের এই সাম্রাজ্য-স্বার্থের সঙ্গেই সংগ্রাম চালাইতে হইবে। সুতরাং ভারতের দেশসেবকদের অগ্নিপরীক্ষা এখনও শেষ হয় নাই; প্রবলতর আত্মোৎসর্গের দিন সম্মুখে রহিয়াছে। আমাদিগকে সাহস এবং শৌর্যের সঙ্গে সেজন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

ভারতে সাধারণ নির্বাচন

ভারতে সাধারণ নির্বাচন আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই এই নির্বাচনের অজুহাতে কোন কোন প্রদেশের আইনসভা ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ পার্লামেণ্টের ৫৩ জন সদস্য সম্প্রতি ভারতের আইনসভাসমূহের এই নির্বাচন সম্পর্কে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, 'ভারত ও বিশ্বের জনমতকে এই আশ্বাস আমাদের দিতে হইবে যে, স্বাধীনভাবেই এই নির্বাচন পরিচালিত হইবে এবং জনমতের পূর্ণতম অভিব্যক্তির সুযোগ প্রদান করা হইবে।' কিন্তু ব্রিটিশ শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতের জনমতের পূর্ণাভিব্যক্তির সুযোগ যে সত্যই দিতে প্রস্তুত আছেন, তাঁহাদের মতিগতি দেখিয়া আমাদের মনে সেরূপ বিশ্বাস হইতেছে না। জনমতের পূর্ণাভিব্যক্তির সুযোগ দিতে হইলে কংগ্রেসের দাবী অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া কর্তব্য; কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, বর্তমান ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তেমন ইচ্ছা আদৌ নাই। তাঁহারা নানা অজুহাতে ইহাতে অস্বীকৃত বলিয়াই শোনা যাইতেছে। ইহা ছাড়া স্বাধীনভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রদেশসমূহ হইতে ৯৩ ধারা প্রত্যাহার করা আবশ্যক এবং আইনসভাগুলি ভাঙিয়া দিবার পূর্বে প্রদেশসমূহে মন্ত্রিমণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার; কিন্তু সরকার

ইহা করিবেন না। তাঁহারা এই সঙ্কল্প লইয়া চলিতেছেন যে, কংগ্রেস-গরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে এবং যেখানে জাতীয়তাবাদী দলের মন্ত্রিমণ্ডলে প্রাধান্য লাভের সম্ভাবনা আছে, সে সব প্রদেশে ৯৩ ধারা বলবৎ রাখিতেই হইবে। জনমতকে পিষ্ট করিয়া প্রগতি-বিরোধী দল নির্বাচনের ফলে যাহাতে প্রাধান্য লাভ করে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের নির্বাচন-নিয়ন্ত্রণে এইরূপ কূট-কৌশল অবলম্বন করিয়াই চলিয়াছেন। এই অবস্থা দেখিয়া শ্রীযুত জয়াকর সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে এই প্রশ্ন করিয়াছেন যে, লর্ড ওয়াঁভেলই ভারত শাসন করিতেছেন না, মিঃ জিন্না ভারত শাসন পরিচালনার ভার পাইয়াছেন। কারণ, ৯৩ ধারার অবসান হইতেছে না, মিঃ জিন্নার আপত্তিতেই নাকি এই প্রশ্ন উঠিতেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, লর্ড ওয়াভেল কিংবা মিঃ জিন্না কেহই ভারতের নিয়ামক নহেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-স্বার্থের যন্ত্রস্বরূপেই ইঁহারা পরিচালিত হইতেছেন। লর্ড ওয়াভেলের দোষ কিছু আমরা দেখি না, তিনি তাঁহার জাতির স্বার্থের সেবা করিতেছেন; কিন্তু মিঃ জিন্না বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে দেশের স্বার্থ বিক্রয় করিবার দুষ্প্রবৃত্তি লইয়া চলিতেছেন। এই দুষ্প্রবৃত্তি দলন করিবার জন্য আজ ভারতের সমগ্র শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইবে। সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতি যাহাতে সর্বাংশে ব্যর্থ হয়, সেজন্য ভারতবর্ষে যাহাদিগকে আশ্রয়স্বরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা এই নীতির খেলা চালাইতেছে, তাহাদের স্পর্ধাও বিচূর্ণ করিতে হইবে। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ভারত হইতে সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করিবার জন্য দেশের স্বাধীনতাকামী সন্তানগণ সমিতির নির্দেশে সঙ্ঘবদ্ধ হউন।

বাঙলায় বস্ত্র সরবরাহ

বাঙলা দেশের বস্ত্রবণ্টনের ব্যবস্থা পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে বড়লাট সম্প্রতি এক নূতন আর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে বঙ্গীয় বস্ত্র সরবরাহ সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবে। বাঙলা সরকার 'বস্ত্র সিণ্ডিকেট' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ভারত সরকারের সঙ্গে তাঁহাদের পরামর্শের ফলে সে ব্যবস্থার পরিবর্তনসাধন করিয়া নূতন এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে; কিন্তু পূর্ব ব্যবস্থার অপেক্ষা এই ব্যবস্থায় দেশের সমস্যার সমাধানে বিশেষ সুবিধা কতটা হইবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ রহিয়াছে। প্রথমত বাঙলা দেশের জন্য ভারত সরকার হইতে বস্ত্রের যে বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট নয়; সম্প্রতি বাঙলার বরাদ্দের হার মাথাপিছু ১০ গজ হইতে ১২ গজ করা হইয়াছে; কিন্তু সমগ্র বাঙলার অভাব মিটাইবার পক্ষে ইহাও পর্যাপ্ত নয় বলিয়া আমরা মনে করি। এরূপ অবস্থায় বস্ত্র বণ্টনের ব্যবস্থা যতই সুপরিচালিত হউক না কেন, সরবরাহের অভাবে তাহাতে ত্রুটি থাকিয়াই যাইবে। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহতে দেখা যাইতেছে, বোম্বাইয়ের মিলসমূহের গুদামে এখনও যথেষ্ট কাপড় মজুত পড়িয়া আছে, তথাপি বাঙলার জন্য বস্ত্র সরবরাহে ভারত সরকারের এমন কার্পণ্যের কারণ কি, ইহা দস্তুরমত রহস্য বলিয়া মনে হইবে। কৃত্রিমভাবে এদেশে বস্ত্রের অভাব সৃষ্টি করিয়া ম্যানচেস্টারের ব্যবসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইতেছে, ইহাতে লোকের মনে এরূপ সন্দেহের সৃষ্টি হইবে, ইহা স্বাভাবিক। ইহা ছাড়া নবপ্রস্তাবিত এই সমিতির গঠনপদ্ধতি হইতে ইহাই বোঝা যাইতেছে যে, কলিকাতার প্রধান প্রধান বস্ত্র ব্যবসায়িগণই ইহাতে অংশ গ্রহণের সুবিধা লাভ করিবেন। মফঃস্বলের বস্ত্র ব্যবসায়ীদিগকে সে সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে। কলিকাতা বাঙলার রাজনীতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। কর্তৃপক্ষ বোধ হয়, ইহাই মনে করিয়াছেন যে, কলিকাতাবাসীদিগকে কিঞ্চিৎ দিয়া মফঃস্বলের অধিবাসীদিগকে বঞ্চিত রাখিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। কারণ, তাহারা তো আর আন্দোলন করিতে পারিবে না। কিন্তু তাঁহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণই ভুল। বাঙলা দেশের মফঃস্বলে বস্ত্রের অভাব নিদারুণ আকার ধারণ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় মফঃস্বলের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া শুধু কলিকাতাবাসীদিগকে তুষ্ট রাখিলেই দেশের জনমতের গতিকে তাঁহারা রুদ্ধ করিতে পারিবেন না। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, সুতরাং সমর বিভাগের প্রয়োজন এখন আর নাই, সেই সঙ্গে ভারত হইতে অন্য দেশের বস্ত্রের রপ্তানির দাতব্য বৃত্তি কর্তৃপক্ষের এখন সংযত করা উচিত। দেশের বস্ত্রের অভাব যাহাতে দেশের বস্ত্রের দ্বারাই মিটানো হয়, সেই দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি দান করা কর্তব্য। যুদ্ধ শেষ হইবার পর বস্ত্র নিয়ন্ত্রণে এই সব কড়াকাড়ি আমরা অনাবশ্যক বলিয়াই মনে করি; অধিকন্তু এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ-বিধির মূলীভূত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের মনে নানারূপ সন্দেহের কারণই সৃষ্টি হয়।

বাঙলা হইতে চাউল-রপ্তানি নিষিদ্ধ

সম্প্রতি নয়াদিল্লীর একটি সংবাদে প্রকাশ, বাঙলায় যে উদ্বৃত্ত মজুদ চাউল রহিয়াছে, তাহা রপ্তানি না করিতে ভারত-সরকার বাঙলা সরকারকে নির্দেশ দিয়াছেন। সংবাদে আরও বলা হইয়াছে, এক সময়ে বাঙলার উদ্বৃত্ত চাউল সিংহল, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য নানাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সরকারী অনুমানে শতকরা ২৫ ভাগ শস্যহানির ফলে চাউলের অভাবের আশঙ্কায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। এই সংবাদটি "আনন্দবাজার" পত্রিকার দিল্লী অফিস হইতে প্রেরিত। ভারত-সরকার, কিংবা বাঙলা সরকার,—এতদুভয়ের কেহই এ পর্যন্ত এই সংবাদের প্রতিবাদ করেন নাই। এই সরকারী মৌনাবস্থার দ্বারাই এই সংবাদের সত্যতা সমর্থিত হইতেছে। অথচ কিঞ্চিদধিক একমাস পূর্বে, গত ৩০শে জুলাই দিল্লীর একটি সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছিল, বাঙলায় প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল মজুদ রহিয়াছে, সুতরাং স্থির হইয়াছে, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে আশু ধান্য সংগৃহীত হইলে যুক্তপ্রদেশকে ২৫ হাজার টন, বিহারকে ১৫ হাজার টন এবং মাদ্রাজকে আরও কিছু পরিমাণ চাউল প্রদান করা হইবে। এই সমস্ত প্রদেশ ছাড়া ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন প্রভৃতি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের অন্যান্য নানাস্থানে চাউল প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভারতের এই সমস্ত স্থান ব্যতীত ভারতের বাহিরে সিংহলেও যে এক লক্ষ মণ চাউল প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা বাঙলার লাট মিঃ কেসির ৪ঠা জুলাই তারিখের বক্তৃতায়ই প্রকাশ। ভারতের নানাস্থানে ও ভারতের বাহিরে বাঙলা হইতে যে পরিমাণ চাউল রপ্তানির প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কি পরিমাণ চাউল প্রকৃতপক্ষে রপ্তানি হইয়াছে, কিংবা প্রস্তাবিত সম্পূর্ণ পরিমাণ চাউলই রপ্তানি ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে কিনা, তাহা এখনও জানা যায় নাই। বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানির প্রস্তাবে সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদ উত্থিত হয়। অবশ্য এই প্রতিবাদের চাপে পড়িয়াই যে ভারত-সরকার বাঙলা সরকারকে চাউল রপ্তানি বন্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে বন্যা, পশ্চিমবঙ্গে প্রথমে অনাবৃষ্টি ও পরে অতিবৃষ্টির জন্য যে ধান্য চাষের ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতে ধান্যের ফলন সম্বন্ধে আতঙ্কিত হইয়াই তাঁহারা এরূপ নির্দেশ দিয়াছেন, ইহা স্পষ্টতই বোঝা যাইতেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমরা বাঙলা সরকারের কথা উঠাইতেছি। তাঁহারা সেদিন পর্যন্তও বলিয়াছেন, বাঙলায় প্রচুর মজুত চাউল আছে, এবারের ধান্য চাষের অবস্থা আশাপ্রদ, বাঙলায় আর দুর্ভিক্ষ ঘটিতে দেওয়া হইবে না, বাঙলার গুদামে চাউলের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না বলিয়া বাঙলার বাহিরে চাউল

রপ্তানির প্রয়োজন হইয়াছে ইত্যাদি ধরণের বহু ভরসার কথা তাঁহারা আমাদিগকে শুনাইয়া আসিতেছিলেন। বাঙলায় মজুত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ও বাঙলার ফসলের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা এবং অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ খাদ্যশস্যের পরিস্থিতি বুঝিয়া চাউল রপ্তানি সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার কথা তাঁহাদেরই। অথচ তৎপরিবর্তে বাঙলা সরকারের উপরই বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি বন্ধ করিবার জন্য ভারত-সরকারের নির্দেশ আসিল! ইহা তাঁহাদের যোগ্যতা ও দূরদৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশংসার কথা নহে। ভারত-সরকারের এই নির্দেশ দানে বাঙলা সরকারের চাউল রপ্তানির সিদ্ধান্তে বাঙলার জনমত বাঙলার খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছে, তাহার যাথার্থ্য ও গুরুত্ব, পক্ষান্তরে বাঙলা সরকার উপযাচক হইয়া বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানির যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা যে একান্ত ভ্রান্ত ও অদূরদর্শী, তাহা প্রমাণিত হইল।

মিঃ কেসী ও উপদেষ্টার দল

একান্ত অলীক অনুমান ও ক্ষীণ আশার সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া মিঃ কেসি বাঙলার খাদ্য-সমস্যা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার গত ৫ঠা জুলাই তারিখের বেতার-বক্তৃতার নিম্নলিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতেই তাহা বোঝা যাইবে। তিনি বলিয়াছিলেন—

"১৯৪৫ সালের চাউলের পরিস্থিতি কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, সে সম্পর্কে আমরা সংগতভাবেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি বলিয়া আমার বিশ্বাস। পরিস্থিতির পরবর্তী বিশেষ বিবেচ্য বিষয় হইতেছে আউশ ফসল। এই সম্পর্কে আমার ধারণা ইহাই যে, আউশ ফসল খুব খারাপ না হয়, তবে আমাদের কোনই অসুবিধা হইবে না এবং যেরূপ শক্তি লইয়া আমরা বর্ষ আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেরূপে শক্তিশালীভাবে আমরা বৎসর শেষেও করিতে পারিব।"

"আউশ ফসল যদি খুব খারাপ না হয়", তাঁহার মনে এই সন্দেহের ভাব জাগ্রত হইতে না হইতেই তাহার নিরসন হইয়াছে। কারণ, আবহতত্ত্ববিদ্‌গণ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাহাতে আশু ধান্যের ফসল ভাল না হইয়া যায় কোথায়? অতঃপর তিনি বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছেনঃ

"আবহতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন যে, এ বৎসর স্বাভাবিক বর্ষা না হইয়া, অন্যরূপ হইবে বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই। ইহা হইতে এবং শস্যের অবস্থা সম্পর্কে যেসব রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি ইহাই মনে করি যে, আগামী আউশ ফসল বেশ ভাল হওয়ারই সম্ভাবনা রহিয়াছে।"

অবহতত্ত্ববিদ্‌গণের বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর আমরা কোনরূপ অবৈজ্ঞানিক মন্তব্য করিতে ইচ্ছা করি না। তাহার প্রয়োজনও নাই, কারণ কার্যক্ষেত্রে তাঁহাদের যান্ত্রিক তথ্যের প্রাকৃতিক সত্য যাচাই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মিঃ কেসি "আউসের ফসল খুব খারাপ" না হইলে "১৯৪৫ সালের বাকি কয়মাসে চাউলের পরিস্থিতি" সম্পর্কে "নিশ্চিন্ত থাকিতে" পারেন,—তাঁহার এই উক্তি সম্বন্ধে বর্তমানে মন্তব্য প্রকাশ করার সময় আসিয়াছে। এবার আউসের ফসল ধরিলাম খুব খারাপ হয় নাই এবং ১৯৪৫ সালের বাকি কয়মাসের জন্য না হয় নিশ্চিন্ত থাকা গেল। কিন্তু যেখানে কোটি কোটি অধিবাসীর খাদ্য-ব্যবস্থার কর্তৃত্ব তাঁহার নিজের হাতে, সেখানে তিনি ১৯৪৫ সালের বাকি কয়েক মাসের কথা ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলেন কিরূপে? ১৯৪৫ সালের আমন ধান্যের ফসলের ভাল-মন্দের উপর পরবর্তী বৎসরের খাদ্যাবস্থাও যে নির্ভর করে, তাহা না ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিলেন এবং চাউল রপ্তানির সিদ্ধান্ত করিলেন কিরূপে ভাবে? অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও বন্যার জন্য বাঙলার বর্তমান বৎসরের ধান্য চাষের অবস্থা যে কিরূপ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ৯৩ ধারার স্বৈরক্ষমতাবলে বাঙলার অন্নবস্ত্রের গুরু দায়িত্ব তিনি স্বীয় স্কন্ধে লইয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার দূরদৃষ্টি ১৯৪৫ সাল ছাড়াইয়া যে ১৯৪৬ সালে পৌঁছিতে পারিল না, ইহা ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছি। কিছুদিন পূর্বে তিনি পাঁচজন পরামর্শদাতা নিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ঝুনো বিলাতী সিভিলিয়ান। তাঁহাদের পরামর্শেও যে তিনি বাঙলার সংকটজনক খাদ্য-পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হ'ন নাই, পরন্তু তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ-দানের প্রয়োজন হইল, ইহা মনে করিয়া যুগপৎ কৌতুক ও বেদনা অনুভব করিতেছি। ইঁহারা কি জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ হইতে প্রদত্ত কেবল মোটা মাহিনা পকেটস্থ করিয়াই কর্তব্য শেষ করিতেছেন? গভর্নমেণ্ট জনমতানুসারে চালিত হইলে বাঙলার শাসন-ব্যাপারে এতটা অদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাইত না; কিন্তু মিঃ কেসি ৯৩ ধারা বজায় রাখিবেনই। তাঁহার এই জিদের ফলে বাঙলার শাসন ব্যাপারে যেসব সংকটের সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলি তাঁহার পক্ষে প্রশংসার কথা নহে, পরন্তু এগুলি তাঁহার শাসন-নীতির ব্যর্থতারই পরিচায়ক। মিঃ কেসি ছুটি ভোগ করিবার জন্য বিলাত চলিলেন। স্যার হেনরী টোয়াইনামের উপর অন্তত কয়েক মাসের জন্য বাঙলার শাসনভার পড়িল। আমরা আশা করি, বাঙলার শাসন-ব্যাপারে মিঃ কেসির ব্যর্থতা এবং অযোগ্যতা হইতে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করিবেন।

শরৎচন্দ্রের কারামুক্তির আদেশ

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের বিশ্বস্ত-সূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়ের মুক্তির আদেশ দিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুত শিশির বসু এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় শ্রীযুত দ্বিজেন বসু ও শ্রীযুত অরবিন্দ বসুরও মুক্তির আদেশ দেওয়া হইয়াছে



বলিয়া প্রকাশ। বাঙলার তথা সমগ্র ভারতের জনমত পুনঃ পুনঃ শরৎচন্দ্রের মুক্তির দাবী করিয়াছে। মন্বন্তর, দমননীতি, নানা দুর্নীতি ও অনৈক্যে বিপর্যস্ত বাঙলা তাঁহার মুক্তি প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। বাঙলার দুর্দিনের এই সন্ধিক্ষণে তিনি আবার জনগণের মধ্যে ফিরিয়া আসুন, দুর্গত বাঙলার জনগণ স্বাগত সম্ভাষণ লইয়া আজ তাঁহার জন্য প্রতীক্ষমান।

ছাত্রসমাজের প্রতি জওহরলাল

সম্প্রতি এলাহাবাদে স্টুডেন্টস্ কংগ্রেসের উদ্যোগে আনন্দভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় পণ্ডিত জওহরলাল ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা নানাকারণে প্রণিধানযোগ্য ও সময়োপযোগী। তিনি বলেন,—শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি করা। কিন্তু ভারতে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং এখানে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির নিজেদের বিকাশ-সাধনের কোন সুযোগ নাই। বর্তমানে ছাত্রসমাজের একাংশে দেশের বাস্তব সমস্যাকে তুচ্ছ করিয়া বিদেশী মতবাদের পশ্চাতে অন্ধভাবে ছুটিবার যে দুর্বুদ্ধি দেখা দিয়াছে, তৎসম্পর্কেই তিনি এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন পণ্ডিতজীর এই উক্তির প্রতি আমরা ছাত্রসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।



দেরাদুনের দৃশ্য (লিথোপ্রিন্ট)

শিল্পী: শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নন্দলালের দেয়াল ছবি

সত্যপীর

তুর্কী-নাচন নাচেন নন্দবাবু
চতুর্দিকে ছেলেরা সব কাবু।
তুলির গুঁত্তা ডাইনে মারেন, মারেন কভু বাঁয়ে
ঘাড় বাঁকিয়ে, গোঁফ পাকিয়ে, দাঁড়িয়ে এক পায়ে।
অষ্টপ্রহর চর্কীবাজী কীর্তি-মন্দিরে
ছেলেরা সব নন্দলালকে ঘিরে
মাছি যেমন পাকা আমের চতুর্দিকে ফিরে।

হচ্ছে 'নটীর পূজা'
রাণীর সঙ্গে হল নটীর পূজা নিয়ে যুঝা।
বরাঙ্গনা ভিক্ষু নটীর নৃত্যছন্দ ধূপ
তুলির আগুন পরশ পেয়ে নিল আবার সেই অপরূপ রূপ
—বহু যুগের পরে—
চৈত্যভবন ভরে।

গানের আসর পারা
—সন্ধ্যাকাশে ফুটে যেন তারার পরে তারা—
হেথায় সেতার কাঁপে ভীরু, হোথায় বীণার মীড়
আধাফোটা গুঞ্জরণের ভিড়
তার পিছনে মৃদু করুণ বাঁশী
গুমগুমিয়ে থেকে থেকে উঠছে ভেসে খোল-মৃদঙ্গের হাসি।

এ যেন সুন্দরী
প্রথমেতে নীলাম্বরী পরি,
সর্ব অঙ্গে জড়ায় যেন অলঙ্কারের জাল;—
তিলোত্তমা গড়েন নন্দলাল।

চিত্রপটে কিন্তু নটী ফেলে অলঙ্কার
শুনি যেন বলে চিত্রকার,—
"তথাগতের দয়ায় যেন তেমনি ঘুচে তোমা সবার সকল
অহঙ্কার।"

সাদামাটার রক্তবিহীন ঠোঁটে
লজ্জা সোহাগ ফোটে,
পাংশু দেয়াল হল যে লাল মিষ্টি মধুর হেসে
দেখবে নাকি এসে? *

* শ্রীযুত নন্দলাল বসুর বরদারাজ্যের 'কীর্তি-মন্দিরে' রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা'র ফ্রেস্কো ছবি আঁকিবার সময় লেখক কর্তৃক এক বন্ধুকে আসিয়া দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ পত্র।

শান্তিপর্ব

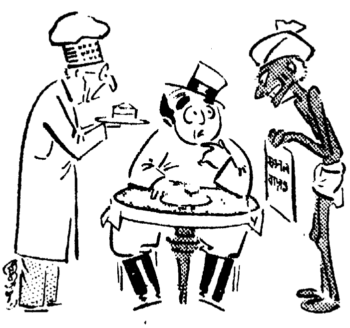
শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

যুদ্ধ-নাট্যে যবনিকা; শান্ত মৃত্যু প্রলয়-তিমিরে।
কবরে কঙ্কাল হাসে, চৌরঙ্গীতে সোডা-লেমনেড্
উন্দাম মদের ফেনা বৈদেশিক শিবিরে শিবিরে।
বুভুক্ষুর মাংস খেয়ে মোটা হ'ল কুমীরের পেট,
দু'হাতে লুটেছে টাকা নরপশু মহামন্বন্তরে
লোভের অসাড় কুষ্ঠে হৃদয়ের লুপ্ত অনুভূতি
ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে ছেয়ে গেল ভেকছত্র পল্লীতে নগরে,
অলস ভুঁড়ির ভারে কোমরে আঁটে না মিহি ধুতি।
অথচ বিবস্ত্রা নারী গ্রামে গ্রামে আত্মহত্যা করে
শ্মশানে শ্মশানে জ্বলে কৃষাণের কঙ্কালের চিতা
চৌর্যধর্মী কুম্ভীরেরা উল্লাসে উদ্দাম স্পর্ধাভরে
নারীপণ্যে পুণ্যবান পাঠ করে স্বধর্মের গীতা—
পাপ পঙ্কে কী নিঃশঙ্ক! নবোদিত সূর্যের আভায়
সত্যের উলঙ্গ মূর্তি চোখে আজ কী বীভৎস লাগে!
আসমুদ্র হিমাচলে যুদ্ধান্তের উৎসব কোথায়?
শুনেছি ধ্বংসের বুকে মুকুলিত রক্তজবা জাগে!

শুনেছি সহস্রশিখা বিপ্লবের বহ্নিপুষ্পবনে
অনুকূল ঝঞ্ঝাবেগে ব্যাপ্ত করে স্ফুলিঙ্গ-সৌরভ,
জাগায় বিপুল সাম্য সংঘবদ্ধ জনতার মনে
অজেয় যৌবন-শক্তি, স্বদেশের মুক্তির গৌরব।
কোথা সে উজ্জ্বল দিন বলিষ্ঠ প্রাণের জন্মভূমি
শৃঙ্খল মুক্তির পণে পদাতিক সন্তানের দল
সংগ্রামের শুভলগ্নে পশুহন্তা খরখড়্গ চুমি'
উদ্বেলিত গণ-গঙ্গা কতদূরে জীবন্ত চঞ্চল?
এখনো বিষণ্ণ রাত্রি অনশনে বিষণ্ণ স্বদেশ
কত দূরে? কত দূরে? প্রাণোজ্জ্বল সৃষ্টির সূচনা?
এখনো শীতল রক্তে ম্রিয়মাণ মুমূর্ষুর বেশ
এখনো ভিক্ষুক-বৃত্তি, কূটতর্ক, মিথ্যা আলোচনা।

দ্রুতপক্ষ যন্ত্র-শ্যেন্ ফিরে গেল বিমান ঘাঁটিতে
তৃপ্তিহীন অসমাপ্ত রণোল্লাস পারমাণবিক,
সভ্যতার বর্বরতা অন্তরীক্ষে সমুদ্রে মাটিতে
শান্ত হ'ল যুদ্ধ-নাট্যে: ক্ষুব্ধ তাই সাম্রাজ্যতান্ত্রিক।
ফ্যাসিস্ট মরেছে তা'র দুষ্টপ্রেত নানা ছদ্মবেশে
ভিন্ন গোত্রে, ভিন্ন নামে এখনো রয়েছে বিদ্যমান
প্রগতি-বিদ্বেষী ক্রূর সর্পদল স্বদেশে বিদেশে
সাম্রাজ্য বাণিজ্য লোভে সুযোগের খুঁজিছে সন্ধান।
দৃপ্ত তাই গণশক্তি শ্রমিকের নব অভ্যুদয়ে
ধনলুব্ধ বণিকেরা পরাজিত চঞ্চল বিহ্বল?
পশ্চিমে জাগ্রত প্রাণ পঞ্চবর্ষ বহু রক্তক্ষয়ে
প্রতিক্রিয়া-প্রতিরোধে সঙ্ঘবদ্ধ অচল অটল।
শুনেছি মাভৈঃ বাণী পাশ্চাত্যের নবীন সমাজে
রণক্লান্ত যোদ্ধাদল পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি চায়?
শান্তিবাদী প্রভুদের প্রচারের ভেরী-তুরী বাজে
যান্ত্রিক সভ্যতা জুড়ে। ভারতের সান্ত্বনা কোথায়?
কূটচালে কিস্তিমাৎ পরস্পর হিন্দু-মুসলমান
বৈপরীত্য না-ঘোচালে, না-মানিলে উভয়ের দাবী
প্রভুদের সাধ্য নেই সঙ্কটের করে অবসান
ততদিন হে স্বদেশ পঙ্কে ডুবে খাও শুধু খাবি!

ব্রিটেনে খাদ্য-সংকট নাকি অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে এবং অচিরেই এই সংকট আরও তীব্রতর হওয়ার আশঙ্কা আছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ফারপো এবং গ্র্যান্ডের প্রাচুর্যের মধ্যে যাঁদের প্রতিপালিত হইতে দেখি—তাঁদের খাদ্য-দুর্ভিক্ষের কথা ভাবিতে পারি না। যাহা



হউক, আমেরিকা বৃটেনকে খাওয়াইবার একটা সাময়িক ব্যবস্থা করিতেছেন জানিয়া আশ্বস্ত হওয়া গেল। আমরা বলি শুধু আমেরিকার উপর নির্ভর করিয়া না থাকিয়া ছাতের টবে টমাটো এবং পেঁয়াজ চাষের বিজ্ঞাপনগুলি এইবারে বৃটেনে ছাড়িলে হয়ত সমস্যার সমাধান হইয়া যাইতে পারে।

* * *

মার্কিন মুল্লুকে খাদ্য সংকট নাই। কিন্তু তাহার চাইতেও ভীষণ স্বামী-সংকট সেখানে প্রবল আকারে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ত্রিশ লক্ষের উপর মার্কিন কুমারীকে নাকি আজীবন কুমারী থাকিয়া যাইতে হইবে। এই সংবাদেও আমরা বেদনা বোধ করিতেছি। কিন্তু উপায় নাই। মার্কিন যদি কৌলীন্য-প্রথা রদ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে হয়ত কিছু পরিমাণ বরের সন্ধান দিতে পারিতাম এবং এমন আশ্বাসও দিতে পারিতাম যে, মার্কিন কুমারীরা ইচ্ছা করিলে তাঁহাদিগকে ঘরজামাই হিসাবে স্বদেশে আমদানী করিতে পারেন। কিন্তু তাহা হইবে কি? গোত্রের গোঁ যে এ'দের খুব বেশী।

* * *

সম্প্রতি ব্যারাকপুরের এক সভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবের মর্ম এই যে, বড়লাটের শাসন পরিষদ লাট সাহেবের মনোনীত সভ্যের পরিবর্তে ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের মনোনীত সভ্য দ্বারা গঠিত হইবে এবং বড়লাট অতঃপর সমস্ত ব্যাপারে তাঁদের নির্দেশ মানিতে বাধ্য থাকিবেন এবং কোন ক্ষেত্রেই নিজের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিবেন না। সংবাদটা পাঠ করিয়া প্রায় লাফাইয়া উঠিয়াছিলাম; কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলাম, এই প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন বৃটেনের তামাক ব্যবসায়ীরা। তামাকটা গাঁজা নয় সত্য, কিন্তু বৃটেনের তামাক তো।

ট্রামে-বাসে

সেটা অম্বুরী না হইলে আমেরি মার্কা হওয়াই সম্ভব।

* * *

জনৈক পত্র প্রেরক স্থানীয় একটি দৈনিকের সম্পাদককে জানাইয়াছেন যে, মেয়েদের মধ্যে যাঁহারা চাকুরী করেন, তাঁহারা সাধারণত কুমারী জীবনই যাপন করেন। ফলে সমাজের একটি পুরুষ যুগপৎ স্ত্রী এবং চাকুরী দুইটি পরমার্থ বস্তু হইতেই বঞ্চিত থাকেন। সুতরাং অতঃপর চাকুরীতে যেন শুধু পুরুষকেই বহাল করা হয় এই হইল তাঁর মত। "লেডীস সীট ছোড় দিজিয়ে" নির্দেশের জ্বালায় উত্যক্ত হইলেও আমরা পত্র প্রেরকের সংগে একমত হইতে পারিলাম না। দিনের পর দিন এতগুলি পুরুষ মানুষের সংগে যাঁরা এক



সংগে ট্রামে-বাসে যাতায়াত করেন এবং এক সংগে অফিস করেন, তাঁহাদিগকে যদি আমরা বিবাহে রাজী করাইতে না-ই পারি—তবে সেই পৌরষের কলংক স্খালনের জন্য চিরকুমার হইয়া থাকাই হইবে আমাদের একমাত্র কর্তব্য। পত্র লিখিয়া আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ না করাই হইবে বুদ্ধিমানের কাজ!

* * *

যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার নির্বাচিত খেলোয়াড়দের মধ্যে বেতারযোগে দাবা খেলার একটি প্রতিযোগিতা হইবে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। খেলার ফলাফল কি হইবে তাহা বলা শক্ত। তবে একথা বলা যায় যে, ক্রেমলিনপক্ষই বড়ের চালে কিস্তি মাৎ হইবেন না। কিস্তি দিতে হইলে আণবিক বোমার মত "বম" দিয়াই উঠসাই কিস্তি দিতে হইবে। গজ-বড়ে এখন অচল!

* * * *

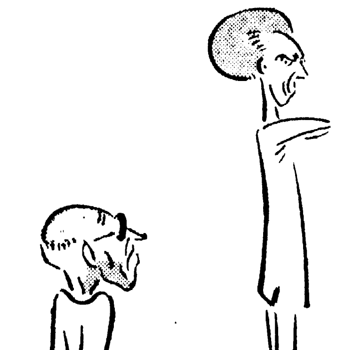
Defence of India Unit-এ যাঁরা এতদিন কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাঁদের দায়িত্ব হইতে অপসারণ করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। বিশেষ করিয়া তাঁহারা কি বস্ত্র বজায় রাখিবার অনুমতি পাইতে পারেন, সেই প্রশ্ন বিবেচনা করা হইতেছে। আমরা আশা করিতেছি, কর্তৃপক্ষ অন্তত তাঁহাদিগকে দিগম্বর করিয়া ছাড়িয়া দিবেন না।

* * *

শুনিলাম বম্বেতে নাকি পুলিশ একটি পকেটমারের স্কুল আবিষ্কার করিয়াছে। উন্নততর শিক্ষা অর্থাৎ চোরাবাজারের জন্য ব্ল্যাকমার্কেট কলেজ কোথাও স্থাপিত হইয়াছে কিনা জানা যায় নাই। না হইয়া থাকিলে কোন উৎসাহী কলিকাতায় একটি ব্ল্যাক মার্কেট কলেজ স্থাপন করিতে পারেন। এখানকার মাটি, জল বায়ু সমস্তই অনুরূপ কলেজের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

* * *

রাজাগোপালজী একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, জিন্না সাহেবের প্রতি তাঁর যা বিশ্বাস ছিল তা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। এতদিনে বোধ হয় তিনি বুঝিলেন—"জিন্না P-রীতি (পাকিস্থানী-রীতি) বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি



ক্ষণেকের চাঁদ।" রঙীন চশমা ব্যবহার না করিলে রাজাজী বহু আগেই এই আবিষ্কার করিতে পারিতেন।

* * *

পূর্ববংগে মেঘনা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের জলোচ্ছ্বাস এখনও চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। বিশুখুড়ো বলেন—"এটা একটু বেশী আদেখলেপনা হচ্ছে নাকি? লীগ আর শীল্ড খেলা তো বহুদিন হয়ে গেছে, আর কেন?

আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৪

ঘুম ভাঙিল পাঁচু গাড়োয়ানের ডাকা-ডাকির শব্দে।

শয্যা ত্যাগ করিয়া অশোক ও নবগোপাল যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল তখনো সূর্যোদয় হইতে বিলম্ব আছে। পূর্ব দিগন্তে অন্ধকার সবেমাত্র ভাঙিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং দুই একটা তরুশীর্ষে পাখীর কাকলি এবং ডানা-ঝাপটের শব্দ শুনা যাইতেছে। সন্ধ্যা এবং রাত্রিকালের মেঘাবরিত আকাশ কোনো এক সময়ে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল; সেই নির্মেঘ আকাশের স্নিগ্ধ প্রসন্নতার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চিন্তাভয়-বিমুক্ত অশোকের মনও প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

ভিতরের বারান্দার এক প্রান্তে একটা তোলা উনান জ্বালিয়া ভূতোর মা অশোকের উপদেশ অনুসারে লুচি তরকারী, অমলেট প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া করিয়া টিফিন কেরিয়ার ভরিতেছিল। অচেনা অজানা অসুখের বাড়িতে সঙ্গে টাটকা খাবার থাকিলে সুবিধা হইতে পারে মনে করিয়া অশোক এই ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহা ছাড়া, শক্তি আছে সেখানে, সুতরাং খাবার অসার্থক হইবে না, সে কথাও মনে মনে ছিল।

পাঁচু গাড়োয়ানের ডাকাডাকির ফলে অশোক ও নবগোপাল জাগিয়া উঠিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়াছে, তাহাদের কথোপকথনের শব্দ হইতে বুঝিতে পারিয়া ভূতোর মা উনান হইতে কড়াটা নামাইয়া রাখিল। তাহার পর অশোকদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "জল গাড়ু গামছা—বারান্দার ওদিকে সব রাখা আছে বাবা, তোমরা তৈরী হ'য়ে নিলেই চায়ের জল চড়িয়ে দোবো। খাবার আমার প্রায় তৈরী হ'য়ে এল।"

বাহিরের বারান্দায় গভীর মিষ্ট কণ্ঠে কেহও গান ধরিয়াছিল। সঙ্গীত বিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং অনুরাগী অশোক শাস্ত্রীয় রাগিণীর উপর গায়কের বিশুদ্ধ এবং সুষ্ঠু অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিল, "কে গান করচে ভূতোর মা?"

মুখ ঈষৎ বিকৃত করিয়া ভূতোর মা বলিল, "ভূতোর বাপ ছাড়া অমন ষাঁড়ের মতো গলা আর কার হ'তে পারে বলো?"

ভূতোর মার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া অশোক বলিল, "মদন এমন চমৎকার গাইতে পারে! আর তুমি বলছ ষাঁড়ের মতো গলা?"

"কি জানি বাবা, আমার ত' তাই মনে হয়। লোকে ওকে বলে ওস্তাদ; সাকরেদও কতকগুলো নেই যে তা নয়। কিন্তু তারার ভীষণ রূপের ঐ এক গান শুনে শুনে আমি ত' পাগল হ'য়ে যাবার মতো হয়েছি। দু'হাজার গান জানে,—কিন্তু আর কি কোনো গান গাইবে? আর, গাইবে ব'লে কি অল্পক্ষণ গাইবে? শেষ রাত্রে উঠে বাইরের চাতালে ব'সে পুরো একঘণ্টা ঐ এক গান গাইবে। এ নিত্যি!"

সকৌতূহলে অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "তারার ভীষণরূপে কি ব্যাপার তা তো বুঝতে পারলাম না ভূতোরমা?"

স্মিতমুখে ভূতোর মা বলিল, "একটু কান দিয়ে গানটা শুনলেই বুঝতে পারবে। তা ছাড়া, শনিবারে শনিবারে গানের বৈঠকে বাঁয়া তবলা আর তানপুরোর সঙ্গে ঐ গানটা নিয়ে ভূতোর বাপ যখন ঝাঁপাই ঝুড়তে থাকে তখন তার নিজের ভীষণ রূপ দেখে মা তারাও বোধ হয় ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে ওঠে!"

ভূতোর মার কথা শুনিয়া অশোকের মুখে কৌতুকের মৃদু হাসি দেখা দিল। বলিল, "শনিবারে শনিবারে গানের বৈঠক হয় তোমাদের এখানে?"

"ফি শনিবার সন্ধ্যে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। সাকরেদরা আসে, আশ-পাশের গ্রাম থেকে লোকজন আসে।"

"দোকান-পাট কি হয় তখন?"

"সিকেয় ওঠে। আমি আর ভুতো যতটা পারি চালাই।" তাহার পর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া ভূতোর মা বলিতে লাগিল, 'কিন্তু তাও বলি বাপু, ক্ষেমতাও আছে যথেষ্ট। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই, বৃষ্টি নেই বাদল নেই, ওর গান শুনতে লোকও ত' কম আসে না। গলাটা খুব দরাজ কি-না, —এ তল্লাটে অমন ত' আর-কারো দেখিনে।"

বলা বাহুল্য, মদন তখনো গাহিয়া চলিয়াছিল। অশোক বলিল, "শুধু দরাজই নয় ভূতোর মা, মিষ্টিও যথেষ্ট। মনে হচ্ছে মদনের গান তোমারও ভাল লাগে।"

মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদের কণ্ঠে ভূতোর মা বলিল, "আমার? রামচন্দ্র! আমার কথা বোলো না বাবা। সাত বছর বয়সে এ সংসারে ঢুকেছিলাম, আর আজ চল্লিশ বছর হ'তে চলল, জ্বালায় জ্বালায় হাড় ভাজা-ভাজা হ'য়ে গেছে, চামড়া তুলে দেখলে বোধ হয় কয়লাই দেখতে পাবে। আমার আবার গান-বাজনা! কিন্তু এ সব বাজে কথা এখন থাক, শিবানীপুরে যেতে হবে তোমাদের। পথ ত' চারটিখানি নয়, দেরি হ'য়ে গেলে গরমে কষ্ট হবে, তৈরী হ'য়ে নাও।" বলিয়া ভূতোর মা নিজের অসমাপ্ত কাজ শেষ করিতে প্রস্থান করিল।

সঙ্গীত-কলা সম্বন্ধে নিরীহ এবং উদাসীন নবগোপাল গান বাজনার প্রসঙ্গ উঠিতেই বোধকরি গাড়ু-গামছার দিকে আকৃষ্ট হইয়া প্রস্থান করিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া অশোক বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন মদন গাহিতেছিল, 'তুমি নিখিল বিশ্বমাতা, সমর কি সাজে সুত সঙ্গে!'

অশোককে দেখিয়া মদন চুপ করিল।

বিপরীত দিকের চাতালে উপবেশন করিয়া অশোক বলিল, "থামলে কেন মদন? পুরো গানটা আমাকে শোনাও। ভারী চমৎকার তোমার গলা।"

স্মিতমুখে মদন বলিল, "এখনি আপনাদের রওনা হ'তে হবে,—দেরী হ'য়ে যাবে বাবু।"

"না, দেরী হবে না। আর, এমন চমৎকার গান শোনার জন্যে একটু যদি দেরীই হয়, তা'তে কোনো ক্ষতি নেই।"

অশোকের আগ্রহে এবং প্রশংসায় মনে মনে খুশি হইয়া মদন গান ধরিল—

তুমি ভুবনমোহিনী তারা, কেন ভীষণ রূপ ধরি
মগন রণরঙ্গে।
তুমি নিখিলবিশ্বমাতা,
সমর কি সাজে সুত সঙ্গে।
সুজন দুর্জন কি মার সকাশে ভিন্ন?
তবে রোষ কর কি প্রসঙ্গে!
জ্ঞানহীন তব সুত রামপ্রসাদে,
চাও গো করুণা-অপাঙ্গে।

গান শেষ হইলে অশোক বলিল, "ভারী চমৎকার তুমি গান কর মদন। আর, তোমার এ গানটির রাগিণী আমার অতিশয় প্রিয় রাগিণী।"

মদন বলিল, "আজ্ঞে হাঁ বাবুমশায়, রাগিণীটি ভাল। এর নাম আশোয়ারী রাগিণী।"

অশোক বলিল, "হ্যাঁ, আশাবরী। কিন্তু মদন, তুমি নিত্য সকালে শুধু এই রাগিণীটিই গাও কেন? ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইলে ভুতোর মা বোধ হয় একটু খুসি হয়।"

সহাস্যমুখে মদন বলিল, "ভুতোর মার কথা আর বললেন না বাবুমশায়। রাগ-রাগিণীর বিষয়ে ও একেবারে পাথর। ওর কাছে আশোয়ারীই বা কি, আর কানাড়াই বা কি! ছেলেবেলায় আমাদের যেমন সব সায়েবের মুখ এক রকম মনে হ'ত, ওর তেমনি সব রাগিণীর সুর এক রকম মনে হয়।"

"কিন্তু সুর না বুঝুক, গানের কথা ত' ও বোঝে মদন,—তুমি শুধু এই তারার গানটাই বা রোজ সকালে কেন গাও?"

মদনের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল। এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "ঐ চরণ আশ্রয় ক'রেই যখন আছি বাবু-মশায়, তখন সকালে উঠে আর কাকে ডাকব বলুন?"

"তারা বুঝি তোমার ইষ্টদেবতা?"

মদন এ কথার কোনো উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

স্মিতমুখে অশোক বলিল, "তা হ'লে বুঝতে পারছি, মুখে যা-ই বলুক না কেন, ভুতোর মারও এ গান ভাল লাগে।"

মদন বলিল, "তা মিছে বলেননি বাবু-মশায়, ভারী চাপা মানুষ, সব সময়ে মুখ দিয়ে মনটা ঢাকবার চেষ্টা করে। কিন্তু একটু খেয়াল ক'রে দেখলে ধরা প'ড়েও যায়। এই শনিবারের কথাই ধরুন না কেন, শনিবারে শনিবারে আমার দোকানে একটু গানের জলসা হয়। সেদিন সকালে ঘুম ভাঙা থেকে আরম্ভ ক'রে রেতের বেলায় ঘুমোনো পর্যন্ত ঐ গানবাজনার জন্যে আমার নাকালের আর শেষ রাখবে না, —কিন্তু জলসার সময়ে একবারে অন্য লোক। তখন লোকজনকে পান দেবে, চা দেবে, বিড়ি সিগ্রেট দেবে, এমন কি কোনো-দিন বা ঘুঘনি ফুলুরি ক'রে খাইয়েও দেবে; কিন্তু আমি কিছু বলতে যাই দিখিনি, অমনি ফোঁস ক'রে উঠবে। একি ব্যাপার বলুন দেখি?"

অশোক বলিল, "সত্যি,—মুখে আর মনে অনেক তফাত।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—মনটা নিতান্ত মন্দ নয়, ভালই বলা যেতে পারে,—কিন্তু মুখটা একেবারে আঁস্তাকুড়।"

"আঁস্তাকুড় নয় মদন, কাঁটাবন হয় ত' বলতে পার। কিন্তু আর গল্প করলে সত্যিই দেরী হ'য়ে যাবে। তুমি এখানে ব'সে তোমার তারার গান গাইতে থাক, আমি শুনতে শুনতে যাবার জন্যে তৈরী হ'য়ে নিই।" বলিয়া অশোক প্রস্থান করিল।

১৫

জলযোগ এবং পান করিয়া অশোক ও নবগোপাল যখন রওনা হইতে উদ্যত হইল, তখন ঘন রক্তবর্ণে পূর্ব গগন রঞ্জিত করিয়া সূর্য উঠিতেছে। গরুর গাড়ীর ছইয়ের ভিতর পাঁচু অশোকের শয্যা খুলিয়া বিছাইয়া দিয়া অপর দ্রব্যসকল গাড়ীর এক পাশে সাজাইয়া লইয়াছিল।

মনিব্যাগ হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মদনের হাতে দিয়া অশোক বলিল, "কম হবে না ত মদন?"

কিছু দূরে দাঁড়াইয়া নবগোপাল অশোককে শিবানীপুর পেঁছাইয়া দেওয়া সম্বন্ধে নিম্নকণ্ঠে পাঁচুকে প্রয়োজনীয় উপ-দেশাদি দিতেছিল, অপাঙ্গে একবার তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মদন তাড়াতাড়ি নোটখানা ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেলিয়া প্রসন্ন মুখে বলিল, "কম কেন হবে বাবুমশায়, যথেষ্ট হয়েছে।"

মদনের কথা শুনিয়া কিন্তু ভুতোর মার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। তীক্ষ্ণনেত্রে মদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "যথেষ্ট হয়েছে কি রকম? সব টাকাটা তুমি রাখবে মনে করছ না-কি?"

মৃদু হাসিয়া মদন বলিল, "বাবুমশায় যখন দয়া ক'রে দিলেন তখন রাখতে হবে বই কি?"

তেমনি ভ্রূকুটি করিয়া ভুতোর মা বলিল, "বাবুমশায় দিলেই যে তোমার রাখতে হবে, এ কোন্ দিশি কথা শুনি? পাঁচ টাকা রেখে পাঁচ টাকা ফেরৎ দিলেও কালকের দু টাকা নিয়ে সাত টাকাতেও তোমার যথেষ্ট লাভ থাকে না কি? আচ্ছা, কাল রেতে দুটো লোকের আর গাড়োয়ানের খাওয়া, আর আজ সকালে পথের জন্যে কিছু খাবার ক'রে দেওয়া এর হিসেব কর ত' দেখি কত হয়?"

অশোক বলিল, "সে হিসেব ক'রে কিছু যদি বেশি হয় " সেটা তুমি ভুতোর ছেলের হাতে দিয়ো ভু ার মা। তা হলে ত' তার হিসেবে কোনো ল থাকবে না?" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

টাকা-কড়ির নিয়েই আলোচনা চলিতে-ছিল, দূর হইতে তাহা অনুমানে বুঝিয়া নিকটে আসিয়া নবগোপাল অশোককে জিজ্ঞাসা করিল, "মদনকে টাকা দিলে না-কি অশোকবাবু?

অশোক বলিল, "হ্যাঁ।"

"কত দিলে?"

একটা অপ্রীতিকর বাক্‌-বিতণ্ডা এড়াইবার অভিপ্রায়ে কি ভাবে কথাটা বলিবে তাহাই হয়ত অশোক চিন্তা করিতেছিল, তাহার মধ্যে ভুতোর মা বলিয়া বসিল, "দশ টাকা!"

"কালকের দু টাকা ছাড়া?"

"হ্যাঁ, সে ছাড়া।"

এবার কিন্তু নবগোপাল আশ্চর্যরূপ তিতিক্ষা দেখাইল। অশোকের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিয়া কেবলমাত্র একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "টাকা তোমাকে কামড়াচ্ছে দেখছি অশোকবাবু।"

উত্তর দিল ভুতোর মা; বলিল, "সত্যিই কামড়াচ্ছে! এ কিন্তু ভারি অন্যায় কথা ভুতোর বাপের!"

"বিধাতা দিয়েছেন বাবুমশায়কে, আর বাবুমশায় দিচ্ছেন গরিবগুরবোদের,—এর মধ্যে ভুতোর বাপের অন্যায় কোথায় পাচ্ছ ভুতোর মা?" বলিয়া মদন হাসিতে লাগিল।

অশোক বলিল, "এবার যখন আসব, তখন তুমি যেমন হিসেব দেবে সেই মতো আমি টাকা দেবো ভুতোর মা। এবারকার হিসেব আমার ইচ্ছে মতোই হ'তে দাও।"

ভুতোর মা বলিল, "ট্যাঁকে যখন ঢুকেছে তখন তোমার ইচ্ছে মতো হ'তে বাকি থাকবে না বাবা। কিন্তু আবার তুমি কবে আসবে তা কে জানে।"

অশোক বলিল, "উপস্থিত ত', হয় আজ সন্ধ্যেবেলা, নয় কাল দুপুরে আসছি। তা ছাড়া, এখন জানা শোনা হ'ল, কোনো-এক শনিবারে কলকাতা থেকে এসে ভাল ক'রে মদনের গান শুনতে হবে।"

ভুতোর মা বলিল, "এর জন্যে তোমার আর শনিবারে আসবার দরকার হবে না বাবা, এবার যেদিনই তুমি আসবে সেই-দিনই গানের ব্যবস্থা করব। শিবানীপুর যাওয়া-আসার পথে আমাদের কিন্তু ভুলো না।"

"নিশ্চয় ভুলব না।" বলিয়া অশোক গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল, এবং তাহার পশ্চাতে উঠিল নবগোপাল।

বাজারের রাস্তা খানিকটা অতিক্রম করিয়া পূর্বদিকে দৌলতপুরের সদর রাজপথ ধরিবার জন্য বাঁক ফিরিবার সময়ে অশোক দেখিল তখনো তাহাদের গরুর গাড়ির দিকে চাহিয়া মদন এবং ভুতোর মা দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমে উভয়কেই তাহার খারাপ লাগিয়াছিল, কিন্তু এই কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মনের সে বিমুখতা অপসৃত হইয়া দেখা দিয়াছে যেন একটা সুমিষ্ট আত্মীয়তার বোধ।

"নবগোপাল বাবু!"

একদিকে যথাসম্ভব কাত হইয়া নব-গোপাল একটু আরাম লাভ করিবার চেষ্টায় ছিল, অশোকের সম্বোধনে খাড়া হইয়া বসিয়া বলিল, "বল ভাই।"

"মদন আর ভুতোর মা ঠিক যেন দুটি ময়লা খনি। কিন্তু খনি দুটির মধ্যে দুটি রত্নের সন্ধান পেলাম। কি সে রত্ন বলুন দেখি?"

জীবনে বোধ হয় আর কখনো নবগোপাল এমন কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হয় নাই। দুটি জীবন্ত মানুষকে একান্তই যদি খনি

বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সেই অস্থিমাংসের খনির মধ্যে কোন্ বস্তু রত্ন হইতে পারে তাহা নির্ণয় করার জন্য যে বুদ্ধির প্রয়োজন, নবগোপালের মস্তিষ্কে বিধাতা-পুরুষ সে বুদ্ধির কৃপণতা করিয়াছেন। ক্ষণকাল অকারণ গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া সহাস্যমুখে সে বলিল, "বুঝতে পারছিনে ভায়া, তুমি বল শুনি।"

অশোক বলিল, "মদনের গান, আর ভুতোর মার মন। বলুন, ঠিক কি-না?"

শুনিয়া নবগোপালের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল; বলিল, "আশ্চর্য করলে ভায়া! তুমি খবরের কাগজে কবিতা লেখ না-কি?"

এই অবান্তর প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া অশোক বলিল, "কাল সন্ধ্যার সময়ে এমনি আর-একটি খনির সন্ধান পেয়েছিলাম। সে কিন্তু হীরের খনি। বলুন ত' কে সে খনি।"

আগেকার দৃষ্টান্ত হইতে নবগোপাল এই ধরণের সমস্যা সমাধান করিবার হদিস আয়ত্ত করিয়াছিল। গভীরভাবে এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বলিল, "বুঝেছি; কিন্তু বলতে ভয় হচ্ছে, পাছে তুমি ঠাট্টা কর।"

"না, ঠাট্টা করব না,—আপনি নির্ভয়ে বলুন।"

দুই গাল নিঃশব্দ হাস্যে প্লাবিত করিয়া নবগোপাল বলিল, "আমি।"

নবগোপালের এই স্বচ্ছ সরলতায় পুলকিত হইয়া অশোক হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "ঠিক বলেছেন,—আপনিই।"

"একেবারে হীরের খনি বলতে চাও?"

"একেবারে।"

"আর, ওরা?"

"ওরা বড় জোর চুনি কিংবা পান্না।"

প্রসন্ন হইয়া নবগোপাল অল্প একটু হাসিয়া পুনরায় কাত হইল, এবং মিনিট খানেকের মধ্যেই দেখা গেল নিবিড় স্বচ্ছন্দতায় হীরার খনি গভীরস্বরে গর্জন আরম্ভ করিয়াছে। অগত্যা অশোক ছইয়ের অবকাশ দিয়া পাঁচু গাড়োয়ানের মাথা বাঁচাইয়া পথের দুই পার্শ্বে অবস্থিত বর্ষাপ্রকৃতির শ্যামল শ্রী যতটুকু দেখা যায় তাহার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মাঝে মাঝে কানের কাছে গুঞ্জরিয়া উঠে মদন চক্রবর্তীর আশাবরী রাগিণী। সেই অলস মিষ্ট সুরের অননুভূতপূর্ব ব্যঞ্জনার মধ্যে কোন্ এক অনির্ণেয় প্রক্রিয়ায় জড়িত হইয়া দেখা দেয় তিলে শিবানীপুর গ্রাম, এ পর্যন্ত যাহা সম্পূর্ণভাবে তাহার নিকট অজ্ঞাত অপরিচিত। চক্রের প্রত্যেক আবর্তের সহিত সেই অচেনা অজানা শিবানীপুর সমীপবর্তী হইয়া আসিতেছে; অথচ সেখানে উপস্থিত হইয়া সে ঠিক কোন্ ভূমিকা গ্রহণ করিবে, আশা এবং আশ্বাসের অভয়বাণীর দ্বারা সেই দুঃখশঙ্কাক্লিষ্ট পরিবেশের কতখানি গ্লানি অপসৃত করিতে সমর্থ হইবে,—কিছুই এখনো সুস্পষ্ট নহে। শুধু মাঝে মাঝে চক্ষের সম্মুখে জাগিয়া উঠে একজনের রোগবিশীর্ণ মুখ, এবং আর একজনের ভয়বিহ্বল দৃষ্টি;—এবং তাহার সহিত আশাবরী সুরের সূক্ষ্ম বেদনা মিশ্রিত হইয়া একটা বিচিত্র রাসায়নিক ক্রিয়া চলিতে থাকে।

এইরূপ চিন্তাস্বপ্নে নিমগ্ন হইয়া মাইল চারেক পথ অতিক্রম করার পর অবশেষে অশোকেরও দুই চক্ষু প্রগাঢ় নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া আসিল। নবগোপালের অধিকারের বাহিরে যে সামান্য একটু স্থান বাকি ছিল তাহার মধ্যে সে কোনো প্রকারে শুইয়া পড়িল। (ক্রমশ)

ব্যবসা বানিজ্য

ঋণ ও ইজারা বনাম গ্রেট বৃটেন

শ্রীসুধীরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ঋণ ও ইজারা সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই সর্বপ্রথম মনে হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনার কথা। চক্রশক্তি দেশের পর দেশ এবং দ্বীপের পর দ্বীপ নিমেষ মধ্যে জয় করিয়া যেভাবে মিত্রশক্তিকে কোণঠাসা করিতেছিল তাহা বাস্তবিকই সে সময়ে সকলের চিন্তার ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলির উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এদিকে এরূপ সর্বনাশা যুদ্ধের জন্য মিত্রপক্ষ মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফলে চক্রশক্তি যখনই যে স্থান আক্রমণ করিয়াছে অবলীলাক্রমে যে স্থান দখল করিতে তাহাদের কোনই অসুবিধা হয় নাই। সে সময়ে আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট দেখিলেন যে একমাত্র তাহার রাষ্ট্র ব্যতীত মিত্রপক্ষের অন্যান্য সকল রাষ্ট্রেই প্রচুর পরিমাণে খাদ্য রসদ বা অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য জিনিসের ঘাটতি পড়িয়াছে এবং সে সমস্ত জিনিস সংগ্রহের জন্য উক্ত রাষ্ট্রসমূহের শক্তির একটা প্রধান অংশ নিয়োজিত রহিয়াছে। যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে মিত্ররাষ্ট্র যাহাতে তাহাদের যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়া গত ১৯৪১ সালের ১১ই মার্চ পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হইল নগদ মূল্য না লইয়া আমেরিকা অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহ করিবে এবং অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্রও তাহাদের সামর্থ্যানুযায়ী মাল বাকিতে আমেরিকাকে সরবরাহ করিবে।

যুদ্ধ বিরতির পরে এই নিয়মে সরবরাহ করা মালের মধ্যে যে সমস্ত মাল ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় থাকিবে তাহা সরবরাহকারী দেশ ফেরত লইবে ও অন্যান্য ব্যবহৃত মালের মূল্য সম্পর্কে যাহা করণীয় তাহা যুদ্ধোত্তরকালে চুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে। ইহাই হইল ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থার গোড়ার কথা। সে যাহাই হউক এই চুক্তি বলবৎ হওয়ার পর হইতে গত ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যে হিসাব হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় বৃটেনই সাহায্য পাইয়াছে সর্বাপেক্ষা বেশী। আলোচ্য সময়ের মধ্যে মার্কিন সরকার অন্যান্য রাষ্ট্রকে ৩৯০০ কোটি ডলার মূল্যের মাল সরবরাহ করিয়াছে এবং তৎপরিবর্তে নিয়াছেন মাত্র ৫৬০ কোটি ডলারের মাল। একমাত্র বৃটেনেই বার্ষিক প্রায় ৪০০ কোটি ডলারের মাল পাঠান হইয়াছে এবং মোট সাহায্যের মধ্যে হাজার করা ৪৩৩ ভাগ বৃটেনকে, ২৪৮ ভাগ রাশিয়াকে, ১৩৫ ভাগ ভূমধ্যসাগরীয় রণাঙ্গনে, ৬৭ ভাগ চীন-ভারত রণাঙ্গনে, ৪৪ ভাগ অস্ট্রেলিয়া—নিউজিল্যাণ্ড রণাঙ্গনে, ২৭ ভাগ ফ্রান্সে, ৮ ভাগ ল্যাটিন-আমেরিকায় ও ২৯ ভাগ অন্যান্য দেশে পাঠান হইয়াছে। ঐ সাহায্যের হাজার করা ৫১৩ ভাগ অস্ত্রশস্ত্র ও জাহাজ, ২৩৫ ভাগ শিল্প কারখানার যন্ত্রাদি ও শিল্প পণ্য, ১৪০ ভাগ কৃষিজাত দ্রব্য ও ১১২ ভাগ লোকজনের পারিশ্রমিক বাবদ ব্যয় করা হইয়াছে।

অস্ত্রশস্ত্র ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসের এই বিপুল সাহায্য আমেরিকা হইতে না পাইলে মিত্রশক্তির পক্ষে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া জয়লাভ করা যে কোনমতেই সম্ভবপর হইত না, সে কথা প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের নায়কই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। অপরদিকে এই ব্যবস্থায় আমেরিকাও যে উপকৃত না হইয়াছে তাহা নহে। স্বদেশে উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা তাহাদের যে মাল তৈয়ারী হইয়াছে তাহা নগদ মূল্যে বিক্রয় করিবার মত ক্রেতা তাহারা পাইত না—ফলে এই বিপুল অস্ত্রশস্ত্র ও লোকবল সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধে নিয়োজিত করিবার সুযোগও তাহাদের ছিল না; বরঞ্চ বাকীতে মাল বিক্রয় করিলেও যুদ্ধোত্তরকালে বাজার যে সময়ে মন্দা হইবে এবং অন্যান্য রাষ্ট্র যে সময়ে ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যস্ত থাকিবে সে সময়ে এই মালের মূল্য আদায় করিয়া আর্থিক দিক হইতে সকলের উপর প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে তাহাদের কোনই অসুবিধা হইবে না।

সে যাহাই হউক, ইতিপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থায় বৃটেনই উপকৃত হইয়াছে সবচেয়ে বেশী এবং অন্য কোন উপায় না থাকায় তাহারা ঐ ব্যবস্থায় উপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিল এবং আশা করিয়াছিল যে, যুদ্ধ বিরতির পরও অন্ততঃ পক্ষে ২।৩ মাসকাল পর্যন্ত

এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে এবং ইতিমধ্যে একটা আলাপ-আলোচনা করিয়া নূতন চুক্তি করিয়া লইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কর্তৃক হঠাৎ এই ব্যবস্থা বাতিলের সংবাদ বৃটেনের বুকে শেলের মতই বাজিয়াছে এবং তাহারা এখন চারিদিকেই অন্ধকার দেখিতেছে।

এখন বৃটেনের বড় বড় রাষ্ট্রনায়ক, অর্থনীতিবিদ প্রভৃতি সকলেরই মাথার টনক নড়িয়াছে এবং হঠাৎ এই ব্যবস্থা বন্ধ করিয়া দেওয়ার ফলে তাহারা নানারূপ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। বৃটিশের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ্যাটলী ও ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল এই সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—"আমরা অত্যন্ত গুরুতর সঙ্কট ও আশঙ্কাজনক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি।" এ সম্বন্ধে বিলাতের নিউজ ক্রনিকেল পত্রিকা যাহা লিখিয়াছে তাহার মর্মার্থ এই যে, বর্তমানে বৃটেনের যে সব একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করা দরকার তাহার মূল্য দেওয়া ত দূরের কথা এমন কি খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দিবার ক্ষমতা পর্যন্ত বৃটেনের নাই। এমতাবস্থায় ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা বন্ধ করার ফলে বৃটেনে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বৃটেনের আর্থিক অবস্থায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য মার্কিন অর্থনীতি দপ্তরের সহকারী সচিব মিঃ উইল কিছু দিন পূর্বে লণ্ডনে আসিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ ৩।৪ বৎসরের মধ্যে বৃটেন যাহাতে পরিশোধ করিতে পারে, সেজন্য ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করায় মিঃ এ্যাটলী জানাইয়াছেন যে, বৃটেনের বাকী ঋণ শোধ করিতে গেলে তাহাকে বাৎসরিক ১২০ কোটি ষ্টার্লিং হারে ঘাটতির সম্মুখীন হইতে হইবে এবং এই অঙ্ক বৃটেনের পক্ষে বিরাট বোঝা।

এদিকে ঋণ ও ইজারা ব্যবস্থা বাতিল করিয়া আমেরিকা অবশ্য নূতন আরেকটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছে তাহার মর্মার্থ এই যে, কোন মিত্ররাষ্ট্র যদি নগদ মূল্যে বা ব্যাঙ্কের মারফৎ কোন মাল ক্রয় করিতে চাহে তবে আমেরিকা তা[illegible] সরবরাহ করিতে প্রস্তুত আছে; মিত্র[illegible]ষ্ট্রসমূহের [illegible] সমস্ত অর্ডারী মাল আমেরিকার কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে তাহা আমেরিকা সরবরাহ করিবে এবং এই সমস্ত দ্রব্যের মূল্য ৩০ বৎসরের মধ্যে সমান কিস্তিতে আদায় করিবে। অবশ্য এই [illegible]জন্য তাহারা শতকরা ২-৩।৪ হারে [illegible]দ ও আদায় করিবে। ইহা ব্যতীতও মার্কিন সরকার [illegible]বা[illegible]

বৃটেনকে নগদ ডলারে ধার দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু উহা লইবার পূর্বে বৃটেনকে সাম্রাজ্যে বাণিজ্য সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা সংশোধন করিতে হইবে। এইরূপ জনরবও শোনা যায় যে, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য তাঁবেদার দেশের আটক তহবিল ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপারেও তাহারা বৃটেনকে চাপ দিতেছে।

কিন্তু এ সমস্ত প্রস্তাবের একটিও বৃটেনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই—অথচ এই সংকটজনক সমস্যার আশু সমাধান হওয়া একান্ত আবশ্যক। সেজন্য তাহারা ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যাণ্ডের ডিরেক্টর এবং বৃটেনের অন্যতম অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ লর্ড কীন্স, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতায় যাহাতে ইহার একটা মীমাংসা হয় সেজন্য চেষ্টিত আছে। আমরা ইহার ফল আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছি। তবে যতদূর মনে হয় শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকে বাণিজ্যিক ও আর্থিক স্বার্থ বজায় রাখার সুনিশ্চিত ব্যবস্থার সম্মতি না দিলে বৃটেন ও অন্যান্য দেশ তথা হইতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য পাইবে না।



রাখাল নিতাইকে একটা চড় মারিল। চড়ের কারণ অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই; হয়তো কারণ একটা ছিল। কিন্তু চড়টাই আসল।

নিতাই রোগা-পট্‌কা লোক, সে রাখালের চড় ফিরাইয়া দিতে পারিল না, ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। রাখাল দম্ভভরে বুক ঠুকিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে নিতাই প্রকাণ্ড এক লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া আসিল এবং রাখালকে আক্রমণ করিল। রিক্তহস্ত রাখাল লাঠির বেগ সহ্য করিতে পারিল না, দ্রুত পলায়ন করিয়া নিজের ঘরে ঢুকিল।



নিতাই প্রকাণ্ড এক লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া আসিল।



রাখাল নিতাইকে একটা চড় মারিল।

নিতাই এবার বুক ফুলাইয়া আস্ফালন করিল।

তারপর রাখাল বাহির হইল ইয়া লম্বা এক তলোয়ার লইয়া। দেখিয়াই নিতাই রণে ভংগ দিয়া নিজ কোটরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিল।

এইভাবে চলিতে লাগিল। প্রথম চড়ের প্রতিক্রিয়া চক্রবৃদ্ধির আকারে বাড়িয়া চলিল। রাখাল বন্দুক বাহির করে তো নিতাই কামান বাহির করে; তখন রাখাল বাধ্য হইয়া ট্যাঙ্ক আবিষ্কার করে। নিতাই অমনি বোমারু বিমান বাহির করিয়া তাহার জবাব দেয়। কিন্তু দুজনের মধ্যে বাহুবলের সাম্য কিছুতেই স্থির হয় না।

মাঝে মাঝে এক পক্কড় লড়াই হইয়া যায়—কখনও এপক্ষ হারে, কখনও ওপক্ষ। তারপর আবার গৃহে ফিরিয়া গিয়া নূতন অস্ত্র আবিষ্কারের মৎলব আঁটে। এইভাবে দুজনে দুজনের অনিষ্ট চিন্তা করিতে করিতে অনেক দিন কাটিয়া যায়।

ইতিমধ্যে দুইটা দল সৃষ্টি হইয়াছে; একদল নিতাইয়ের পক্ষে, একদল রাখালের পক্ষে। পক্ষপাতহীন দু'একজন লোক মাঝে মাঝে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে,—ঝগড়া মিটাইয়া ফেল, হিংসার দ্বারা হিংসার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কে তাহাদের কথা শোনে!

অবশেষে একদিন রাখাল আবিষ্কার করিল—আণবিক বোমা! সিংহনাদ করিয়া বলিল, নিতাইকে তো সাবাড় করিবই, দলকে দল একটি বোমায় পোড়াইয়া মারিব, বাতি দিতে কাহাকেও রাখিব না।



রাখাল আবিষ্কার করিল আণবিক বোমা

বোমার ক্রিয়া দেখিয়া সকলেই থরহরি। শত্রু মিত্র সকলেই শঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল—এবার তো আর কেহ বাঁচিবে না! যে সকল ধর্মপরায়ণ লোকের ধর্মজ্ঞান সুপ্ত ছিল, বিষবাষ্প হাউই বোমা পর্যন্ত যাঁহাদের বিবেককে জাগাইতে পারে নাই—তাঁহারা সত্রাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—না না, এটা উচিত হয় না, আণবিক বোমা ছুঁড়িলে ধর্মযুদ্ধ হয় না।

আশ্চর্য! ষণ্ডা রাখাল যখন দুর্বল নিতাইকে চড় মারিয়াছিল তখন ধর্মযুদ্ধের কথা কেহ তোলে নাই; বরং বীরভোগ্যা বসুন্ধরা বলিয়া বাহুবলের বাহবা দিয়াছিল। এখন তাহারাই বাহুবলের চরম পরিণতি দেখিয়া সবচেয়ে উগ্র কণ্ঠে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল। যুদ্ধের সম্পর্কে ধর্মের কথা কিছু নূতন নয়; কিন্তু যতদূর মনে পড়ে, ইন্দ্রজিৎ যখন মেঘে লুকাইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল তখনও বাল্মীকি মুনি তাহার দোষ ধরিতে পারেন নাই। সরলমতি বৃদ্ধ মুনি বোধহয় ভাবিয়াছিলেন যে, যুদ্ধটাই যখন ন্যায়সংগত



এই পৃথিবীটাকে সমুদ্রের জলে চটকাইয়া তাল পাকাইয়া সূর্যের আগুনে পোড়াইয়া ঝামা করিতে হইবে।

বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে তখন তাহার ভঙ্গীবিশেষে আপত্তি করা চলে না।

যাহোক, রাখালের তর্জন গর্জন শুনিয়া নিতাই ভয় পাইয়া গেল; গলায় কাপড় দিয়া সে রাখালের ক্ষমা ভিক্ষা করিল।

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। সকলেই আনন্দিত, রাখালের তো কথাই নাই। অপদস্থ এবং নিগৃহীত নিতাই ভাবিতেছে কতদিনে এমন অস্ত্র বাহির করিতে পারিবে যাহার দ্বারা সে এই পৃথিবীটাকে সমুদ্রের জলে চটকাইয়া তাল পাকাইয়া সূর্যের আগুনে পোড়াইয়া ঝামা করিতে [illegible]; এবং তারপর সেই ঝামা ভগবানের দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিবে।

কাশীর ইতিবৃত্ত

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, বিদ্যাবিনোদ

ভারতবর্ষের মধ্যে কাশী হিন্দুদিগের সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র; কোন সুদূর অতীতকাল হইতে যে এই স্থান তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। মহাভারতে লিখিত আছে যে, বারাণসীতে গিয়া বৃষভবাহন মহাদেবের অর্চনা ও কপিলহ্রদে স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। (উদ্যোগ পর্ব—৮৪ অধ্যায়)। শিবপুরাণের মতে "কর্মনাং কর্মনাৎ সা বৈ কাশীতি পরিকথ্যতে" অর্থাৎ এই স্থানে জীবগণ শুভাশুভ কর্মসমুদায় ক্ষয় করিয়া মুক্তি লাভে সমর্থ হয়। সেই জন্য ইহার নাম কাশী। কাশীর অন্য নাম বারাণসী তাহা সকলেই জানেন; এতদ্ব্যতীত শ্রুতি স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কাশীর বারাণসী, বরণসী, তীর্থরাজ্ঞী, তপস্থলী, কাশিকা, অবিমুক্ত, আনন্দবন, আনন্দকানন, রুদ্রাবাস, মহাশ্মশান, স্বর্গপুরী প্রভৃতি বহু নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

কাশীতে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বরণার নামে এক রাজা কাশীতে রাজত্ব করিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম বারাণসী হইয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণীয় ব্রহ্মখণ্ড নামক গ্রন্থেও কাশীপতি বরণারের বিবরণ আছে। বরণা ও অসি নামে কাশীর দুই প্রসিদ্ধ নদী আছে, উক্ত নদীদ্বয়ের নাম হইতেই বারাণসী নামের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বহু পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুর দক্ষিণ পাদ হইতে বরণা এবং বামপদ হইতে অসি নামক নদী বিনির্গত হইয়াছে, এইজন্য এই নদী দুইটি পুণ্যবর্ধিনী ও পাপনাশিনী, সেইজন্য ইহাদের সঙ্গমস্থলে কাশীতে সর্বপাপের ক্ষয় হয়। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে "অসেশ্চ বরুণায়াশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য কাশিকা।" এই সম্বন্ধে তীর্থমঙ্গলে বিজয়রাম সেন লিখিয়াছেন—

"কাশীর উত্তরভাগে বরণা নামে নদী।
গঙ্গাতে মিশাল নদী তীর্থ তদবধি॥
দক্ষিণভাগেতে আছেন নামে নদী অসি।
কাশীর বসতি জেন অর্ধচন্দ্র শশী॥"

বর্তমানে কাশী বলিলে ... বারাণসী বুঝায়, কিন্তু প্রাচীনকালে ... নগর বৃহদায়তন ছিল। খৃষ্টীয় ... অবধি এই নগর একটি বিস্তীর্ণ জন... বারাণসী ইহার প্রধান ... রাজধানী বলিয়া যে প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের গ্রন্থ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিউয়েন্ সিয়াং যখন বারাণসীস্থ বৌদ্ধ তীর্থ দর্শনে আগমন করেন, তখন বারাণসী রাজ্য চারি হাজার লি অর্থাৎ তিন শত তেত্রিশ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল এবং বারাণসী নগরী দেড়ক্রোশ দীর্ঘ ও অর্ধক্রোশ বিস্তৃত ছিল তিনি দেখিয়াছিলেন। বৌদ্ধদিগের আধিপত্যকালে শাক্যসিংহ এই বারাণসী



কাশীতে নাগপুর ঘাটের দৃশ্য। অদূরে ক্রস চিহ্নিত "বেণীমাধবের ধ্বজা"।

প্রদেশের অন্তর্গত ঋষিপত্তনে মৃগদার নামক স্থানে আসিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে, কাশ বংশীয় চব্বিশজন রাজা কাশীতে রাজত্ব করেন। বুদ্ধদেবের সময়ে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। অতঃপর বৌদ্ধ ধর্ম প্রবল হইয়া উঠিলে কাশী রাজ্য মগধরাজের অধীন হয় এবং মগধরাজগণের অধঃপতন কালে এই স্থান গুপ্তরাজগণের করায়ত্ত হয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বালাদিত্যের পুত্র প্রকটাদিত্য কাশীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তৎপরে কাশী কনোজ রাজের অধীনে আসে। দশম শতাব্দীতে পাল রাজগণ কনোজ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং কাশী রাজ্য গৌড়ের পাল বংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত হয়। গৌড়াধিপ রাজা মহিপাল কাশীর প্রথম পাল বংশীয় রাজা। মহিপালের পর তাহার পুত্র স্থিরপাল এবং তাহার পর তৎপুত্র বসন্ত পালের রাজত্বকালে বারাণসী বৌদ্ধ পালগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে কনোজরাজ জয়চন্দ্র পরাভূত হইলে সাহাবুদ্দীন ঘোরি বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেই সময় তিনি সহস্রাধিক হিন্দু মন্দির চূর্ণবিচূর্ণ করিয়াছিলেন।

সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে কাশী 'সরকার বনারস' নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বনারস সরকারের পরিমাণ ৩৬৮৬৯ বিঘা এবং আটটি মহাল এই সরকারের অধীনে ছিল। আকবরের সময় মির্জা চীন কলিজা বারাণসীর ফৌজদার ছিলেন এবং এই সময় কাশী এলাহাবাদ সুবার অধীন ছিল।

ঔরঙ্গজেবের সময় কাশীর সুনাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; তিনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন বলিয়া কাশীর সুনাম তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সর্বপ্রথম তিনি বারাণসীর নাম পরিবর্তন করিয়া "মুহম্মাদাবাদ" নামকরণ করেন। তাহার পরবর্তী মুসলমান গ্রন্থাদিতে ও অযোধ্যার নবাবদিগের সনন্দে সেই জন্য বারাণসী "মুহম্মাদাবাদ" নামেই চলিয়া আসিয়াছে। কাশীর মধ্যে বিশ্বনাথের মন্দির এবং বিন্দুমাধবের মন্দির জগৎ প্রসিদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। এই গগনচুম্বি মন্দিরদ্বয় বহু দূর হইতে তীর্থ যাত্রিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। বিশ্বনাথের মন্দিরের চতুষ্কোণে তারকেশ্বর, গণেশ, ভৈরব এবং মনকেশ্বরের মন্দির ছিল। বিশ্বনাথের মন্দির ও তৎসহ উক্ত তারকেশ্বর গণেশ প্রভৃতির মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া তিনি সেই স্থানে মন্দিরের মালমশলা দিয়া মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদের মধ্যেই তাহার কবর স্থান তাহার কু-কীর্তির অদ্যাপি সাক্ষ্য দান করিতেছে। ঔরঙ্গজেবের পূর্বে দ্বাদশ শতাব্দীতে সাহাবুদ্দীন ঘোরী বিশ্বনাথের মন্দির প্রথমে বিনষ্ট করিয়াছিলেন; পরবর্তীকালে দেশে শান্তি স্থাপিত হইলে মন্দির পুনর্গঠিত হয় এবং পুনরায় তাহা মুসলমানদের দ্বারা ধ্বংস হয়। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে নারায়ণ ভট্টের চেষ্টায় মন্দির পুনরায় নির্মাণ করা হয়; কিন্তু ২রা সেপ্টেম্বর ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে কুটবুদ্ধি ঔরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংস করিয়া তৎস্থলে মসজিদ নির্মাণ করিয়া কাশীকে বিশ্বনাথ শূন্য করেন। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাই কর্তৃক বর্তমান মন্দির মসজিদের পার্শ্বে নির্মিত

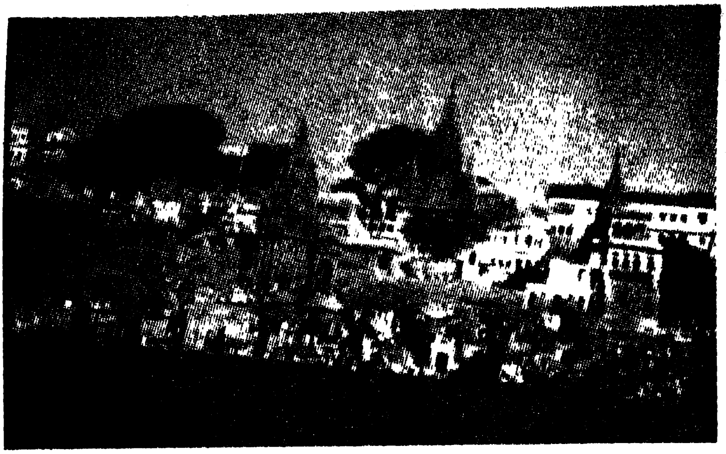
হয় এবং পরে লাহোরের রণজিৎ সিংহ মন্দিরের চূড়াগুলি সোনার পাত দিয়া মুড়িয়া দেন। তদবধি এই মন্দির সুবর্ণ মন্দির বলিয়া খ্যাত। সপ্তদশ শতাব্দীতে বারাণসী অযোধ্যা সুবেদারের অধীন হইলেও ইহা একটি স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া অভিহিত ছিল।

বর্তমান বিশ্বনাথের মন্দিরের চারিটি দরজা, পশ্চিম দ্বারের সম্মুখে নাটমন্দির এবং তাহার মধ্যস্থলে স্থাপিত শিব আছেন। এই শিব রাজা হরিশ্চন্দ্র স্থাপন করেন। নাটমন্দিরে এবং বহু স্থানে ভারতের বিভিন্ন রাজা বহু শিব স্থাপন করিয়াছেন অদ্যাপি তাহা দৃষ্ট হয়। ইহার উত্তরে জ্ঞানব্যাপী নামে কূপ আছে। এই কূপ সম্বন্ধে কিংবদন্তি এইরূপ যে যখন মুকুন্দ ব্রহ্মচারী কাশীধামে আসেন, সেই সময় বিশ্বনাথের পূজার জলের জন্য মুষ্ট্যাঘাতে তিনি এই কূপ খনন করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, ঔরংগজেব যখন বিশ্বনাথের মন্দির ভূমিসাৎ করেন, সেই সময় মন্দিরের পূজারী শিব-লিংগ উক্ত কূপে ফেলিয়া দেন।

কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরের পরেই বিন্দুমাধবের মন্দির ইতিহাস প্রসিদ্ধ এবং পঞ্চগংগা ঘাটের উপর এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, পঞ্চনদ তীর্থে স্নান করিয়া বিন্দুমাধবকে দর্শন করিলে মনুষ্য আর কখনও গর্ভবাস যন্ত্রণা ভোগ করে না। চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন সাং লিখিয়াছেন যে, মহাদেবের এক শত ফিট উচ্চ একটি মূর্তি উক্ত মন্দিরে আছে।

"Made of stone skilfully carved and of richly painted wood, containing a brazen statue of Mahadeva, a hundred feet high, grave and majestic filling the spectator with awe and seeming as it were indeed alive."

বিন্দুমাধবের এই সুবৃহৎ মন্দির চূর্ণ



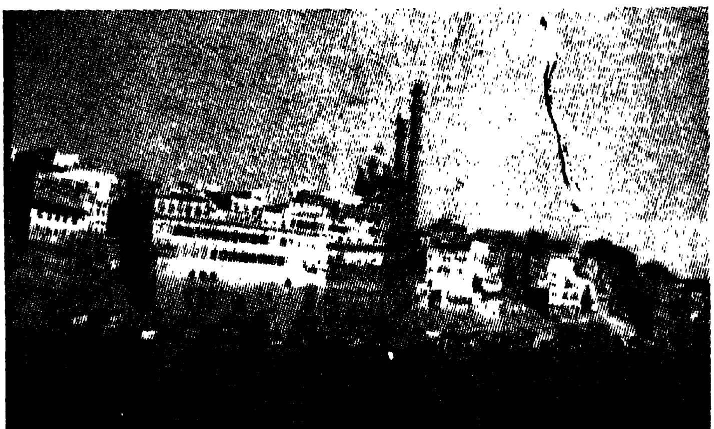
মণিকর্ণিকা তীর্থ

করিয়া ঔরংগজেব হিন্দু মন্দির ও হিন্দু ধর্মকে খর্ব করিবার জন্য অত্যুচ্চ মিনার শোভিত এক মসজিদ তৎস্থানে নির্মাণ করেন; বর্তমানে উহা 'বেণীমাধবের ধ্বজা' বলিয়া সাধারণে পরিচিত।

দিল্লীশ্বর মুহম্মদ শাহ হিন্দুদিগের সুপবিত্র মহাপুণ্যপ্রদ বারাণসী মুসলমানদের অধীনে না রাখিয়া হিন্দু রাজার অধীনে রাখিবার ইচ্ছা করেন এবং তদনুসারে ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে বারানসীর পঞ্চক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত গংগাপুর নামক গ্রামের জমিদার মনসারামকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করিয়া বারাণসীর শাসনভার অর্পণ করেন। মুসলমান শাসনকালে তিনিই বারাণসীর প্রথম হিন্দু রাজা। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করিলে তাহার পুত্র রাজা বলবন্ত সিংহ পিতৃসিংহাসনে আরোহন করেন। রাজা বলবন্ত সিংহের রাজত্বকালে বংগদেশ হইতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল (ভূ-কৈলাস) রামনগরে রাজদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। রামনগরের ঘাটে নৌকা লাগাইয়া কাশীরাজের নিকট নিজ আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, রাজা লোক মারফৎ তাঁহাকে নিজ প্রাসাদে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে তীর্থ-মংগলে "রামনগর রাজদর্শন" শীর্ষক প্রসংগে যাহা লিখিত আছে নিম্নে তাহা উল্লিখিত হইল।

"অপটু কারণ রাজা আসিতে না পারে।
মহাশয়ে খবর দিলা আসিবার তরে॥
এত শুনি মহাশয় সসজ্জ হইলা।
সেফাই খনক আদি পালকীতে উঠিলা॥
সভাষদ চলিলেন বিপ্র চারিজন।
শীঘ্রগতি উত্তরিলা যথা বলবন॥
প্রস্তর-নির্মাণ বাটী দেখিতে সুন্দর।
কতেক বৈঠকখানা অতি মনোহর॥
অপূর্ব আসনে রাজা রয়্যাছে বসিয়া।
মহাশয়ে স্তব করেন রাজা উঠিয়া॥
আইস আইস মহারাজা ধরম চরিত্র।
তোমার দর্শনে মোর শরীর পবিত্র॥
দিন শুভক্ষণ মোর সার্থক জীবনে।
ব্যাধি হৈতে মুক্ত মুক্তি হইনু এতদিনে॥
এ[illegible]রূপ কত স্তুতি করেন রাজনে।
এ[illegible] হইয়া সবে বসিলা আসনে॥"

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র আহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি সফদর-জংগকে উজীর পদ এবং অযোধ্যা প্রদেশ প্রদান করেন। এই সময়ে বারাণসী অযোধ্যার দেখিয়া সফদরজংগের বারাণসীর উপর অন্তর্ভুক্ত হয়। বারাণসীর বহুবিধ আয় [illegible]র পড়িল এবং তিনি ছলে বলে কৌশলে বারাণসীকে করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজা বলবন্ত সিংহ বারাণসীর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যথেষ্ট সাহসের [illegible] দেন। উজির সাহেব কিছু অযোধ্যা[illegible] একজন সামান্য জমিদার করি[illegible]রয়া রাজা বলবন্তকে র[illegible]র যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া



বিন্দুমাধবের মন্দিরকে ধ্বংস করিয়া ঔরংগজেব অত্যুচ্চ মিনার শোভিত মসজিদ নির্মাণ করেন।



বারাণসীর সংস্কৃত শিক্ষার প্রাচীনতম শিক্ষালয়— বর্তমানে ইহা কুইনস্ কলেজ নামে খ্যাত এবং ১৮৪৭ খৃঃ ৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই ভবন নির্মিত হয়।

বিফল হন এবং ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন। সফদরজঙ্গের মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র সুজাউদ্দৌলা সুবেদার হন এবং তিনিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রাজা বলবন্তের পদমর্যাদা খর্ব করিবার প্রয়াস পান। এই সময়ে রাজা বলবন্ত অযোধ্যার নবাবের করাল কবল হইতে রাজ্য ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য রামনগরে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন। এই সময় আলমগীর বাদশাহের পুত্র মুহম্মদ আলি বিদ্রোহী হইয়া অযোধ্যার নবাবের সহিত মিলিত হন। মীরজাফর এই সময় বাঙলার নবাব। মুহম্মদ আলি ও সুজাউদ্দৌলা মীর-জাফরকে পদচ্যুত করিয়া বাঙলার সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন। মীরজাফর ইহা শুনিয়া ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সৈন্যের সহযোগিতায় পাটনায় উপনীত হন। সেই বৎসর বঙ্গবিজয় এই স্থানেই পরিসমাপ্ত হয়।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দৌলা পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার উপক্রম করেন। এই সময় মীরজাফর কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বলবন্ত সিংহের বহু দিবস হইতেই উহাদের উপর রাগ ছিল, তিনি সেই জন্য মীরজাফরকে বহু সৈন্য দিয়া সাহায্য করেন। মীর-জাফরের স[illegible]ত বলবন্তের অতঃপর সন্ধি হয় যে, রা[illegible] বলবন্তের স্বাধীনতা রক্ষার জন[illegible] মী[illegible]ফরও তাহাকে সৈন্য দিয়া সাহায্য ক[illegible]ন। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর [illegible]ীশ্বর শাহ আলম ইস্ট ইন্ডিয়া [illegible]নীকে বারাণসী রাজ্য প্রদান করেন। [illegible]দ্দৌলার সহিত সন্ধি হইলে ইস্ট [illegible] কোম্পানী বারাণসী রাজ্য ১৭৬৬ [illegible] অযোধ্যার নবাবকে ছাড়িয়া দেন। এই সময় রাজা বলবন্ত সিংহ কোম্পানীর মিত্র রাজ বলিয়া পরিচিত হন। সুজাউদ্দৌলা রাজা বলবন্ত সিংহকে পুনরায় হৃতসর্বস্ব করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাহার পক্ষ হওয়ায় অযোধ্যার নবাবের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। রাজা বলবন্ত বিচক্ষণ ও সাহসী রাজা ছিলেন এবং হিন্দুদিগকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বাঙালী-দিগকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহার সময়ে বহু বাঙালী কাশীতে বসবাস করেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট তারিখে তিনি পরলোকগমন করেন।

রাজা বলবন্ত সিংহ পরলোকগমন করিলে তাঁহার এক ক্ষত্রিয়া রমণীর গর্ভজাত পুত্র চৈৎসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে অযোধ্যার নবাব রাজা চৈৎসিংহকে এক সনন্দ প্রদান করেন। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে তারিখে বারাণসী ইংরাজদের অধীনে যায় এবং ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল তারিখে রাজা চৈৎসিংহ ইংরাজদের নিকট হইতে পুনরায় এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। সেই সময় ইউরোপে ফরাসী বিপ্লব-চলিতেছিল; ইংরাজদিগের সনন্দানুসারে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থে গবর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস চৈৎসিংহের নিকট তাহার দেয় বার্ষিক কর ব্যতীত আরও ৫ লক্ষ টাকা অধিক চাহিয়া পাঠান। ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশানুসারে প্রথম বৎসরে তিনি ৫ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বৎসরে উক্ত বাড়তি টাকা দিবার সময় হইলে তিনি টাকা সংগ্রহ করিতে না পারায় হেস্টিংসের নিকট কিছুদিন সময় প্রার্থনা করেন। হেস্টিংস ইহাতে বিশেষ ক্রুদ্ধ হন এবং সময় দিবার পরিবর্তে, তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সসৈন্যে কাশী আসিয়া উপস্থিত হন। কাশীর শিবালা ঘাটের প্রাসাদে চৈৎসিংহ বাস করিতেন; হেস্টিংস তাহাকে ধরিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, কিন্তু চৈৎসিংহ প্রাসাদের জানলায় পাগড়ী দড়ির মত করিয়া, তাহার সাহায্যে কাশীর অপর পারে রামনগরে পলায়ন করেন বলিয়া হেস্টিংস তাহাকে ধরিতে পারেন নাই। রামনগর হইতে চৈৎসিংহ গোয়ালিয়রে পলায়ন করেন এবং তথায় ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

রাজা চৈৎসিংহ পলায়ন করিলে স্বর্গীয় রাজা বলবন্ত সিংহের একমাত্র কন্যা ওয়ারেন হেস্টিংসকে জানাইলেন যে, তাহার একমাত্র পুত্র মহীপনারায়ণ বর্তমানে রাজ্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী; হেস্টিংস সেই জন্য বলবন্ত সিংহের দৌহিত্র মহীপ-নারায়ণকে কাশীর রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৭৮১



কাশীর শিবালাঘাটে চৈৎসিংহের প্রাসাদ।



কাশীর এই ঘাটে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ হইয়াছিল বলিয়া ইহা দশাশ্বমেধ ঘাট নামে খ্যাত।

খৃষ্টাব্দে রাজা মহীপনারায়ণ ইংরাজদের নিকট হইতে জমিদারী সনন্দ প্রাপ্ত হন। মহীপনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র উদিতনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা উদিতনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদনারায়ণ রাজা হন। ইনি কবি ও শিল্পী ছিলেন বলিয়া ভারতের বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও চিত্র সংগ্রহ করিয়া পাঠাগারের ও চিত্রশালার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। ইহার অঙ্কিত বহু চিত্র অদ্যাপি রাজবাড়িতে রক্ষিত আছে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইনি গতাসু হইলে তাঁহার পুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি পরলোকগমন করিলে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে বিভূতি-নারায়ণ সিংহ রাজা হন, কিন্তু বর্তমানে তিনি নাবালক বলিয়া বারাণসী রাজ্যের পরিচালন ভার মন্ত্রণা সভার সদস্যদের উপর ন্যস্ত আছে। রাজবাড়ি কাশীর অপর পারে রামনগরে অবস্থিত এবং এই স্থান 'ব্যাস কাশী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামনগরের রাজবাড়ি এবং দুর্গ ও অতিথিদিগের সম্বর্ধনা করিবার জন্য 'রাম-বাগ' নামক বাগানবাড়ি দর্শন না করিলে কাশী ভ্রমণ যে পূর্ণতা লাভ করিবে না তাহা সুনিশ্চিত। কাশীধামে দেব-দেবী ও তীর্থ যে কত আছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যত দেবদেবী আছেন, কাশীতে তাহা সমস্তই আছে। তন্মধ্যে অন্নপূর্ণার মন্দির ও দুর্গা মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশীতে দুর্গা মন্দির ব্যতীত আর কোথাও পশুবলি হয় না। রাণী ভবানীর ব্যয়ে এই দুর্গা মন্দির নির্মাণ এবং তাহারই পার্শ্বে দুর্গা-কুণ্ডু নামক একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করা হয়।



অনুবাদসাহিত্য

বুট জুতো

এফ্ কুজনেট্‌সভ্

[অধুনা রাশিয়ায় শ্লেষাত্মক রচনার জন্যে এবং হাস্যরসিক বলে যাঁরা প্রখ্যাত এফ্ কুজনেটসভ্ তাঁদের অন্যতম। রচনার ভংগী এ'র সরল, ব্যঞ্জনা প্রাঞ্জল। হাসির সাপ্তাহিক 'ক্রোকোডাইলে' (কুমীর) এ'র রস-রচনা নিয়মিত রস পরিবেশন করে।]

যে জানালা হতে পোস্ট অফিসের কেয়ারের চিঠিগুলি বিলি করা হচ্ছিল, তার সম্মুখে অপেক্ষারত কিউ-এতে এসে যোগ দিল আইভ্যান আইভ্যানোভিচ ক্রুটিলকিন। কিউ একটু একটু করে চলছিল। এক সময় তাই দেখা গেল ক্রুটিলকিন জানালার সামনে এসে পড়েছে। জানালার গরাদ সরানো ফাঁক দিয়ে সে দেখলো চিঠি বিলি করছে একটি সুন্দরী তরুণী—মাথায় তার একরাশ হলুদ রঙের চুল।

যে কারখানায় সে কাজ করত, সেখানকার পাশখানা আইভ্যান পরিচয়-পত্র হিসাবে বাড়িয়ে দিলো তরুণীর দিকে। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে সেই পাশখানা প্রত্যর্পণ করলো, বললো, আপনার পরিচয়-পত্র কোথায়?

পরিচয়-পত্রের কথা ওঠামাত্র আইভ্যান যেন দমে গেল; আস্তে আস্তে বললো, পরিচয়-পত্র? ব্যাপার কি জানেন, আমি তো এখানে থাকি না। মে-দিবসের উৎসবে যোগ দিতে আমি কদিন হল এখানে এসেছি। আজ দেখতে এলাম বাড়ি থেকে কোন চিঠি যদি এসে থাকে।

—আপনার কাছে পরিচয়-পত্র আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ আছে বৈকি! —আইভ্যান উৎসাহিত হয়ে উঠলো।

—আছে? বেশ। আমাকে আপনার পরিচয়-পত্র দেখতে দিন কমরেড।

—সে কি করে হয়। পিছিয়ে গেল আইভ্যান।

—কেন হবে না? আশ্চর্য হয়ে জিগ্যেস করলো তরুণী।

জানালার গরাদে মাথাটা ঠেকিয়ে তরুণীর দিকে অবনমিত হয়ে ফিসফিস স্বরে অতি সন্তর্পণে আইভান বললো, আমার বুটের ভেতর সেটাকে লুকিয়ে রেখেছি।

—বুটের ভেতর রেখেছেন! বেশ করেছেন। আমি এবার কি করবো জানেন? পরিচয়-পত্র না পেলে আপনাকে কোন চিঠি দেব না। —হলুদ রঙের চুলগুলি দুলিয়ে মাথা নাড়লো তরুণী।

—সিটিজেন, আপনি আমার কারখানার পাশ দেখুন না। আমারই নাম আইভ্যান আইভ্যানোভিচ ক্রুটিলকিন। —মিনতি জানালো আইভ্যান।

—না, তা হয় না। পরিচয়-পত্র ছাড়া চিঠি দেওয়ার হুকুম নেই। দৃঢ়কণ্ঠে জানালো তরুণী।

—তাইতো? —বিষণ্ণ হয়ে পড়লো আইভ্যান, হতাশ হয়ে নিজে নিজেকেই যেন শোনালো, তাহলে আমাকে বুট জুতোটা খুলতে হয়......

তরুণী সে কথার কোন উত্তর দিল না। বাধ্য হয়ে লাইন ছেড়ে সরে আসতে হল আইভ্যানকে। প্রকাণ্ড হলের চারপাশে সে একবার চোখ বুলিয়ে গেল, না, কোথাও বসবার জায়গা খালি নেই।

গায়ের মোটা কোট আইভ্যান খুলে ফেললো। তারপর মেঝের ওপর সেটা বুলিয়ে মেঝের একটা জায়গা পরিষ্কার করে ফেললো। পোর্ট ফলিওটা পাশে রেখে সেই পরিষ্কার স্থানে সে বসে পড়লো।

বুটের ফিতে আলগা করে আইভ্যান বুট খুলতে আরম্ভ করে দিল। একটি দুটি করে তার আশেপাশে লোকের ভিড় জমে উঠলো। একটি দুটি করে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ হতে শুরু হল: ব্যাপার কি......আরে বুট খুলছে কেন......আরে বুঝতে পারছো না পায়ের শিরায় টান ধরেছে......ভদ্রলোক বুট খোলেন নি টানটা ছাড়িয়ে নিচ্ছেন......

—মাথা খারাপ নাকি—এক ভদ্রলোক সকলের ওপর গলা তুলে বললেন, দেখতে পাচ্ছেন না কড়া, পায়ের কড়ায় লাগছে—ভদ্রলোক সেখানে একটু তুলো দেবেন......

তার চাইতে গলার স্বরগ্রাম চড়িয়ে অপর এক[illegible]ন বললেন, না, [illegible], কড়া নয় জুতোর [illegible] কি ঢুকে গেছে......

জানালার গরাদে মাথা রেখে চুলগুলো মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে তরুণী আইভ্যানের কার্যকলাপ বেশ আগ্রহ সহকারে দেখছিল। বেশ বোঝা গেল—উপস্থিত ব্যাপারটা সে উপভোগ করছে।

আইভ্যান ততক্ষণে মেঝের ওপর বসে বুট টানাটানি চালিয়ে চলেছে—ঘামে তার মুখ গেছে ভর্তি [illegible] দুচারবার টানা-হ্যাঁচড়ার পর আইভ্যান বাঁ পা দিয়ে ডান পায়ের গোড়ালি চেপে ধরলো; তারপর চাপ দিয়ে জুতো খোলবার প্রচেষ্টা লাগালো। বুটটা নড়ে গেল। উৎসাহিত হয়ে আনন্দোজ্জ্বল মুখে আইভ্যান বেশী করে চাপ দিতে লাগলো। বুট ধীরে ধীরে খুলে আসতে লাগলো। আরও জোরে চাপ পড়লো—বুট প্রায় খুলে এসে, গোড়ালির কাছে আটকে গেল। তারপর একখানা প্রকাণ্ড পাথরের মত চেপে বসলো একেবারে অচল অনড় হয়ে।

একজন বললো, না বরাতটা খারাপই দেখছি। আর একজন ওই ধরণের কি যেন একটা বললো। তারপর আর একজন, তারপর আরও একজন। অবশেষে দেখা গেল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সংগে সমবেত জনতাই উপদেশ বর্ষণ করে চলেছে।

প্রশস্ত বারান্দাওয়ালা হ্যাটধারী একজন বললো, কি মুস্কিল, আঙুলের দিকে চাপ দিন মশাই, আঙুলে চাপ দিন।

—আঙুলে চাপ দিয়ে কি হবে? আমার গোড়ালিতে যে আটকে গেছে। প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো আইভ্যান।

জানালা হতে তরুণী মন্তব্য করলো: একটা বুট খুলতে এতো কেলেঙ্কারী!

গোড়ালির ওপর বুটটায় হাত বুলিয়ে আইভ্যান সমবেত জনতার দিকে চাইলো। তারপর হঠাৎ কাতরস্বরে বলে উঠলো, সিটিজেনস্, কমরেডস্, আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।

আইভ্যানের প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে এক ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। চোখে তার প্যাঁসনে, হাতে বেড়াবার সুদৃশ্য ছড়ি। ছড়িটা আইভ্যানের পরিত্যক্ত কোটের ওপর সংস্থাপিত করে বুটটা ধরে তিনি টানাটানি শুরু করলেন। বারকয়েক টানার পর অকস্মাৎ মুখ দিয়ে হুম্ আওয়াজ করে সজোরে তিনি একটা টান মারলেন। সংগে সংগে ঘটলো একটা দুর্ঘটনা। ভদ্রলোকের নাক থেকে ছিটকে প্যাঁসনে পড়ে গেল।

বাপস্! —ভদ্রলোক বুট ছেড়ে লাফিয়ে গিয়ে চশমা কুড়িয়ে নিয়ে দেখলেন সেটা ভেংগেছে কি না। যখন দেখলেন, সেটা অখণ্ড রয়েছে, তখন সেটাকে যথাস্থানে, অর্থাৎ নাকের ওপর বসিয়ে দিয়ে হাতের ছড়ি তুলে নিয়ে সমবেত জনতায় মিশে গেলেন—যেন তাঁর কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে।

এইবার অপর এক ব্যক্তি অগ্রসর হলেন আইভ্যানকে সাহায্য দিতে। প্রথম জনের চাইতে তিনি বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারলেন না। তবে তাঁর কৃতিত্ব হচ্ছে এই যে, কোন দুর্ঘটনা তিনি বাধালেন না।

প্রায় এক মিনিট ধরে আর কোন সাহায্য-কারীর দর্শন পাওয়া গেল না। সকলে কে সাহায্যকারী হবে বলে পরস্পরের মুখের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিনিক্ষেপ করছে এমন সময় বিরাটদেহী এক ব্যক্তি সম্মুখে এসে উপস্থিত হল।

—ব্যাপার কি? —সকলে মিলে অতি সত্বর বুঝিয়ে দিলে ঃ সাহায্যকারী চাই।

কোন কথা না বলে সেই জোয়ান এসে তার কোদালের মতোন হাতের থাবা আর লোহার মতোন শক্ত আঙুল দিয়ে আইভ্যানের বুট চেপে ধরলো। জনতা নিশ্বাস রোধ করে স্তব্ধ নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সকলের উপস্থিত ভাবনার ধারা এক ঃ এবার একটা কিছু হয়ে যাবে—হয় বুট খুলবে, আর না হয় আইভ্যানের পায়ের হাড় একটা ছেড়ে আসবে। আইভ্যান স্বয়ং ভীত হয়ে চক্ষু নিমীলিত করলো।

বুট ধরে টানলো সেই জোয়ান। সবিস্ময়ে সকলে দেখলো বুট খোলে নি, অথবা পায়ের কোন অস্থি স্থানচ্যুত হয় নি। তার পরিবর্তে জোয়ান আইভ্যানকে ঘসটে নিয়ে চলেছে মেঝের ওপর দিয়ে। একবার, দুবার, তিনবার জোয়ান বুট ধরে টানলো—একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল তিনবার।

জোয়ান ঘেমে উঠলো। তারপর চীৎকার করে আইভ্যানকে বললো, ওহে মাতব্বর একটা কিছু আঁকড়ে ধরো।

উপদেশানুযায়ী আইভ্যান একটা কাঠের বেঞ্চি আঁকড়ে ধরে। জোয়ান আবার বুট ধরে টানলো। মেঝের ওপর দিয়ে বিচিত্র শব্দ তুলে আইভ্যান-শুদ্ধ সেই বেঞ্চি ঘসটে চললো হড় হড় করে। একবার, দুবার, তিনবার, আবার সেই একই পালার অভিনয় সংঘটিত হল। ক্লান্ত হয়ে জোয়ান মেঝেতে বসে পড়লো। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললো, বেঞ্চি-টেঞ্চি ধরলে হবে না, আরও ভারী কিছু ধরার দরকার।

ভারী কি ধরা যায়। পোস্ট অফিসে তো তেমন কিছু নেই—এটা তো আর কারখানা নয়। মহা মুস্কিল, ভাবনায় সকলে আকুল। এমন সময় পাঁচজন লোক বেরিয়ে এসে আইভ্যানের হাত কোমর গলা ইত্যাদি চেপে ধরে জোয়ানকে বললো, এসো হে ওস্তাদ।

সমস্ত ক্লান্তি এক মুহূর্তে অপনোদিত হয়ে গেল—জোয়ান লাফিয়ে উঠলো, বললো হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে। সেই মুহূর্তে সে আইভ্যানের পা দু-হাতে ধরে বুট টানতে আরম্ভ করলো।

প্রচণ্ড সে টান—প্রকট টাগ-অব-ওয়ার। কিন্তু ফলাফল মুহূর্তে মধ্যে প্রকটিত হল ঃ বুট খোলে নি—জোয়ান একাই আইভ্যান এবং পাঁচজনের দলটিতে টেনে নিয়ে চলেছে।

পর পর দুবার এমন হয়ে যাবার পর জোয়ানের কপালে আবার ঘামের নদী বইতে লাগল। সে থামলো, হাতের থাবা দিয়ে সেই ঘাম মুছে বললো, সিটিজেনস্, আরও দুজন স্বেচ্ছাসেবকের প্রয়োজন।

প্রার্থিত দুজনের বদলে তিনজন এসে যোগ দিল। আবার টানাটানি শুরু হল। কচ্ কচ্ আওয়াজ তুলে বুট বোধ হয় খুলে আসবার বিরুদ্ধে নানা রকমের আপত্তি তুললো। তা তার সেই প্রতিবাদে কেউ কর্ণপাত করলো না। জোয়ান প্রচণ্ড শক্তিতে টানতে লাগলো। তারপর অকস্মাৎ বুটটা হাতে নিয়ে ছিট্‌কে পড়লো জনতার মাঝখানে। জনতা হৈ হৈ করে তাকে অভিবাদন জানিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো।

ষোলটা বাহু এবং ডান পায়ের বুটমুক্ত আইভ্যান লাফিয়ে গিয়ে জোয়ানের হাত থেকে বুটটা নিয়ে তার ভিতর হাত ঢুকিয়ে দিল। যখন সে হাত বের করলো, দেখা গেল হাত শূন্য। আবার হাত ঢুকিয়ে বিফল হবার পর সে বারকয়েক মেঝের ওপর জুতোটা ঠুকলো। ঠক্ ঠক্ করে আওয়াজ হল, কিন্তু কিছু পড়লো না।

—না এটা নয় দেখছি। —আইভ্যান বিড় বিড় করে উঠলো।

সাগ্রহে জোয়ান জিগ্যেস করলো, কি, কি নয়?

—তুমি উল্টো জুতোটা খুলে দিয়েছো। —মাথা নাড়লো আইভ্যান।

—তার মানে? —জোয়ান উচ্চকিত হয়ে উঠলো।

—মানে আর কি—এখন বাঁ-পায়ের জুতো খোলার ব্যবস্থা করো।

—বাঁ-পায়েরটাও খুলতে হবে? মাইরি! জোয়ান আর দাঁড়ালো না। নির্বিবাদে রণে ভঙ্গ দিয়ে সে প্রায় ছুটে পোস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

পুনর্বার মেঝের ওপর আইভ্যান বসে পড়লো। হতাশায় সে পঙ্গু—কি যে করবে ভেবে পাচ্ছে না। জানালার তরুণী কিন্তু এইবার তার সহায় হল। জনতাকে উদ্দেশ করে সে বললো, হা করে দাঁড়িয়ে আপনারা কি করছেন। ভদ্রলোককে সাহায্য করাটা কি আপনাদের কর্তব্য নয়?

তরুণীর মুখের দিকে সকলে চাইলো। তারপর জনতার মধ্য থেকে একজন বেরিয়ে এল আইভ্যানকে সাহায্য করতে। জোয়ানের বিপরীত এর চেহারা। মানুষটি একেবারে বেঁটে, হাতের আঙুলগুলো সরু সরু প্রায় কাঠির মতো। বেশ কসরৎ করে সার্টের হাতা সে গুটিয়ে নিয়ে আইভ্যানের বাঁ-পায়ের বুট ধরে টানলো। জনতা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দেখলো, সেই একটানেই বুট পায়ের আশ্রয় বিচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়েছে মেঝের ওপর। এবারের জুতো উন্মোচনকারী জনতার দিকে একটা কৃপামিশ্রিত দৃষ্টি হানলো, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে পোস্ট অফিসের দরোজা দিয়ে নেমে গেল রাস্তায়।

স্তম্ভিত জনতার চমক ভাঙলে একজন বললো, উঃ, কি গায়ের জোর! —কথাটা বলে আইভ্যানের দিকে চেয়ে সে বললো, আচ্ছা কর্তা, একটা কথা জানতে আমার বড়ো ইচ্ছে হচ্ছে। দেখ, ডান পায়ের জুতোটা খুলতে কি টানাটানি, হ্যাঁচড়া-হ্যাঁচড়ি। প্রাণান্তকর পরিশ্রম। আর বাঁ-পায়েরটা এক দুই তিন বলতে না বলতে খুলে এলো—যেন ম্যাজিক!

—ব্যাপার কি জানেন, ডান পায়েরটার সাইজ হচ্ছে উনচল্লিশ, আর বাঁ-পায়েরটা একচল্লিশ। —আইভ্যান সবিনয়ে জানালো।

—সেকি, কেমন করে তা হতে পারে?

—হয়েছে মশাই হয়েছে। কেনবার সময় আমি গোলমাল করে ফেলেছিলাম।

প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আইভ্যান উঠে দাঁড়ালো। বগলদাবায় পুরলো সেই বুট-জোড়া। হাতে তার পরিচয়-পত্র। খালি পায়ে সে গট্ গট্ করে গিয়ে দাঁড়ালো জনশূন্য জানালার সম্মুখে। বাড়িয়ে দিল পরিচয়-পত্রটা, বললো, আমার চিঠি দেওয়া হোক্।

তরুণী অভ্যস্ত হাতে পরিচয়-পত্রটা পরীক্ষা করে দেখলো, কোন গলদ নেই। তখন সে সমস্ত চিঠিগুলোর ঠিকানা পড়ে গেল। তারপর হলদে রঙের চুলের গোছা দুলিয়ে নির্লিপ্তকণ্ঠে বললো, আইভ্যান, আইভ্যানোভিচ কুটিলকিনের কোন চিঠি নেই।

অনুবাদক: সমীর ঘোষ

তিন সঙ্গী

শ্রীবিমল চন্দ্র সিংহ

(১)

'তিন সঙ্গী' রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ গল্পের সংগ্রহ। গল্পগুচ্ছের পর রবীন্দ্রনাথ অনেকদিন ছোট গল্প লেখেন নি। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, তাঁর কবিতায় উপন্যাসে নাটকে এই পরিবর্তন সুস্পষ্ট। গীতাঞ্জলি বলাকার যুগ পেরিয়ে দেখা দিল পূরবী-মহুয়ার যুগ, তারপরে দেখা গেল গদ্য কাব্যের যুগ, তাকে অতিক্রম করে কবি তাঁর কাব্য রচনার শেষ পর্যায়ে কবিতার এমন এক আশ্চর্য সংহত ভাস্বর রূপ আবিষ্কার করলেন যা সত্যিই অতুলনীয়। তেমনি গদ্যে দেখা দিল বিদ্যুৎগতি তীব্র তীক্ষ্ণ ঘন-সম্বন্ধ শ্লেষ চকিত ভাষা, উপন্যাসে আগেকার স্নিগ্ধ প্রবাহের বদলে দেখা গেল চড়া সুরের কাহিনী। এই যুগে ছোট গল্প দেখা যায়নি। ছোট গল্পে এই পরিবর্তন কিভাবে ধরা পড়ে তা দেখবার জন্য অনেকেই উৎসুক ছিলেন, শেষের কবিতা বা যোগাযোগে তার কিছু আভাস পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তার স্পষ্ট রূপ ধরা পড়ল 'তিন সঙ্গী'তে।

গল্পগুচ্ছ রবীন্দ্রসাহিত্যের এক অপূর্ব দিক, এ সম্বন্ধে সকল সমালোচকই একমত। গল্পগুচ্ছের রচনাকাল ১২৯৮ সাল হতে ১৩১০ সালের মধ্যে পরে আরও অনেকগুলি গল্প ১৩১৪ সাল হতে ১৩২৫ সালের মধ্যে লেখা। এই সময়ের মধ্যে গোরার মত মহৎ উপন্যাসও রচিত হয়েছিল। তা ছাড়া এই সময়টি তাঁর কবি জীবনেরও প্রধান পর্ব,—এ সময়ে 'সোনার তরী', 'চিত্রা', চৈতালি, কাহিনী, কল্পনা, কথা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য পর পর রচিত হয়েছে। এ যুগের গদ্য ও পদ্য রচনা আলোচনা করে কেউ কেউ বলেছেন যে, এ সময়েও তাঁর কাব্য রচনার ধারা ও গদ্য রচনার ধারায় বিরোধ আছে। কবিতায় যে বর্ণসমারোহ ও উচ্ছ্বাস দেখি গল্পে তার কোনও সন্ধানই নেই। এমন কি, দু চারটি গল্প ছাড়া অধিকাংশ গল্পই বাঙলা দেশের নিতান্ত ঘরোয়া কাহিনী নিয়ে রচিত। কবিতাগুলি এ সময় যেমন রঙে রসে, আনন্দ-বেদনার লীলায়, জীবন দেবতার স্পর্শে ভরপুর, কবি হৃদয়ের পাপড়িগুলি একে একে খুলছে নতুন আলোর স্পর্শে—গল্পগুলির মধ্যে ঠিক সে আবহাওয়া নেই। গল্পগুলি গীতধর্মী নয়। কবি নিজেই বলেছেন, "আমার অবাক লাগে তোমরা যখন বল যে আমার গল্পগুচ্ছ গীতধর্মী।.....আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনও ঘটেনি। যা কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতধর্মী বললে ভুল করবে। 'কঙ্কাল' কি 'ক্ষুধিত পাষাণকে' হয়তো খানিকটা বলতে পার, কারণ সেখানে কল্পনার প্রাধান্য, কিন্তু তা-ও পুরোপুরি নয়। তোমরা আমার ভাষার কথা বল, বল যে গদ্যেও আমি কবি। আমার ভাষা যদি কখনো আমার গল্পাংশকে অতিক্রম করে স্বতন্ত্র মূল্য পায়, সেজন্য আমাকে দোষ দিতে পার না। এর কারণ বাঙলা গদ্য আমার নিজেকেই গড়তে হয়েছে।......ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলি লিখেছি বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।" ছোট ছোট ঘটনা পল্লীজীবনের পটভূমিকায় অপরূপ রসে নিষিক্ত হয়ে সাধারণ বাঙালী জীবনের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। কবিতার মত বান-ডেকে আসা সমারোহ তাতে নেই। কিন্তু এ সময়ের কবিতাগুলিতে যতই সমারোহ থাক না কেন সেগুলিও যে শুধু কল্পনা-বিলাস সে কথাও কবি স্বীকার করেননি। 'চিত্রার' নবলিখিত সূচনায় তিনি বলেছেন, "লোকজীবনের ব্যবহারিক বাণীকে উপেক্ষা করে আমার কাব্যে আমি কেবল আনন্দ, মঙ্গল এবং উপনিষদিক মোহ বিস্তার করে তার বাস্তব সংসর্গের মূল্য লাঘব করেছি এমন অপবাদ কেউ কে ই আমাকে দিয়েছেন। আমার কাব্য সমগ্রভাবে আলোচনা ক ' দেখলে হয়তো তাঁরা দেখবেন আমার প্রতি অবিচার করেছেন।"

আসল কথা, এই সময়ে কবির মূল দৃষ্টিভঙ্গী না বুঝলে তাঁর এই সময়কার গদ্য পদ্য রচনার প্রকৃত কথাটি বোঝা যায় না, দুয়ের মধ্যে মিল কোথায় বা অমিল কোথায় তা-ও বোঝা যায় না। কবি জীবনের এটি একটি বৃহৎ পর্ব, দু চার কথায় তার মর্মোদ্ঘাটন সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বলা যায়, এই সময় রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব জগতের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ে আবদ্ধ হচ্ছিলেন, তার অনন্ত রহস্য, তার অসীম প্রাণরস, তার নিত্য নতুন বিস্ময় তাঁর মনে ক্ষণে ক্ষণে নতুন প্রেরণা জুগিয়েছে, নতুন নতুন দৃশ্যপট খুলে দিয়েছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হতে আরম্ভ করে নৈবেদ্য পর্যন্ত এই ধারাটিই ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে এসেছে। জীবনের সঙ্গে সেই নতুন এবং নিবিড় পরিচয়ের দিনে কবি নিজেকে একটি বৃহত্তর সত্তার সঙ্গে মিলিয়ে অনুভব করছিলেন, নিজেকে খণ্ড-ভাবে অনুভব না করে বৃহত্তর জগতের অংশ হিসেবে দেখছিলেন। তাই খণ্ড খণ্ড ছবি যেমন অংশচিত্র হিসেবে দেখা যাচ্ছিল তাদের পিছনে একটা বৃহৎ পটভূমি থাকায় অংশচিত্রেই অংশচিত্রগুলির শেষ হয়ে যায়নি, সেগুলির মধ্যে একটা বৃহৎ স্পন্দন ধরা পড়ছিল। 'ছিন্ন পত্রে'র একটি চিঠিতে কবি লিখছেন, "অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এমন একটা অনির্বচনীয়ভাবের আবেগ উপস্থিত হোলো, এক মুহূর্তের মধ্যেই আমার এই বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জগৎ আগাগোড়া এমন একটি মূর্তি পরিবর্তন করে দেখা দিলে, অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার এমন একটা সঙ্গীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে এসে বাজতে লাগল ......নিজের প্রবহমান জীবনকে যখন নিজের বাহিরে নিখিলের সঙ্গে যুক্ত করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই।" বৃহতের সঙ্গে এই যোগ হতে জীবন দেবতারও উদ্ভব। কবি বলেছেন, "আমার একটি যুগ্মসত্তা আমি অনুভব করেছিলুম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো, সে আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল......পরম দেবতার পূজা যুগ্মসত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ।" এই অখণ্ড দৃষ্টিভঙ্গীই এ যুগের প্রধান কথা। 'ছিন্নপত্রের' পাতায় পাতায় এর পরিচয় ছড়ানো আছে। সেইজন্য পৃথিবীর প্রেমকেও কবি ত্যাগ করেন নি, বরং ভূমানন্দের সঙ্গে তার একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছেন। 'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়' কবিতা প্রসঙ্গে কবি বলছেন, "পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি।" এই সুরটিই কবিতায় ও গদ্যে ফুটে উঠেছে। কবিতায় এর ব্যক্তিগত দিকটি রঙে রসে অনির্বচনীয়

হয়ে উঠেছে, গল্পে সেই আনন্দরসই ছোট ছোট ঘটনাকে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত করে তুলেছে। একধারে কবিতায় ভীড়-করে-আসা অলংকার ঝঙ্কার অন্য ধারে গল্পের স্নিগ্ধ প্রবাহ সেই জন্য বিরোধী মোটেই নয়, বরং তা একই জিনিসের দুটি দিক।

এই রকম একটি বৃহৎ দৃষ্টিভঙ্গী ও গভীর জীবনরস ছিল বলেই এ সময় কয়েকটি বৃহৎ ও মহৎ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল। এর চরম নিদর্শন 'গোরা'। এ রকম মহৎ সৃষ্টি রবীন্দ্রসাহিত্যেও আর হয়েছে কিনা সন্দেহ। এর পটভূমিকা ভরে আছে সমস্ত ভারতবর্ষের সুখ দুঃখের স্পন্দন, তার স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, পরাধীনতার নিপীড়ন; সেই সঙ্গে তার ফাঁকে ফাঁকে ভরে আছে সামাজিক সমস্যা হিন্দু সমাজের সংস্কারে বিশ্বাস ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার মুক্তির চেষ্টা—আবার তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ দুঃখ, হাসিকান্না, প্রেম-আনন্দ। বিনয়, গোরা, সুচরিতা টাইপ নয়, —অথচ তাদের মধ্যে ছোট বড় নানা সমস্যাও স্পন্দিত হতে থাকছে। মানুষ হিসেবে তারা জীবন্ত; গোরার মত চরিত্র ক'টা দেখতে পাওয়া যায়? তার বিরাট ব্যক্তিত্বের মধ্যে সমস্ত সমস্যা অত্যান্ত প্রবল এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, অথচ দরিদ্র গ্রামবাসীদের জীবনের দুঃখ তার প্রবলতম সংস্কারে পর্যন্ত আঘাত দেয়—যে বিশ্বাস বিনয় পানুবাবুরে টলানো সম্ভব হয় না, তাদের বাস্তব দুঃখে তা টলে। আবার সুচরিতার প্রতি তার আকর্ষণ, আনন্দময়ীর প্রতি তার শ্রদ্ধা, অথচ লছমিয়ার হাতে জল খেতে আপত্তি—ছোট বড়োর, বৃহৎ ও স্বল্পের নির্বিশেষ ও সবিশেষের এমন মিলন এবং এমন মিলনভূমি আর দেখা যায়নি

কিন্তু ক্রমশ রবীন্দ্রসাহিত্যে একেবারে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিল। ভাব, ভাষা, দৃষ্টিভঙ্গী শুধু গদ্য রচনায় নয়, পদ্য রচনাতেও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। কবিতায় দুই যুগের সীমারেখা 'গীতাঞ্জলি'। তারপর হতে কাব্যের নতুন পালার শুরু। তেমনি গোরার পর গদ্য রচনার ধারাও বদলে গেল। এই পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "ইতিমধ্যে ইউরোপে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়া গেল, কবি নোবেল পুরস্কার পাইলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হইল, মহাযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের নূতন সামাজিক চেতনা তিনি স্বচক্ষে দেখিলেন এবং তাহার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলেন।" নতুন গল্প ও নতুন ধরণের গল্প দেখা দিল। "কোথায় গেল সেই সুকুমার গীতি মাধুর্য, ভাব কল্পনার লীলা যাহা ছিল রবীন্দ্র ছোট গল্পের প্রাণ? এ যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ জর্জরিত জীবন সমস্যা, এ যে তীব্র কণ্টকিত আঘাত; এ যে চিন্তাবৃন্তের মূল ধরিয়া টান, সমাজ ব্যবস্থার মূল সম্বন্ধে শুধু প্রশ্ন মাত্র নয়, তাহাকে একেবারে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা!......'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণাল নারীত্বের যে মহিমা ঘোষণা করিল তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনি 'পলাতকার' 'মুক্তি' নামক কবিতায়।" এই পরিবর্তনের স্বরূপ সম্বন্ধে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "এখন তিনি বস্তু ও জীবনকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছেন আবেগ ও আবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সৃষ্টির সমগ্রতা হইতে বিচ্যুত করিয়া।......দেশে কালে আবদ্ধ সমসাময়িক মানুষ ও তাহার প্রেম, তাহার দুঃখ ও বেদনা, তাহার সুখ ও আনন্দ সমস্তই লেখকের দৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়িতে চাহিতেছে বস্তুর কতকটা সাম্প্রতিক বাস্তব রূপে।" কথাটি ধীরভাবে আলোচ্য। এ কথা সত্য, যে কবি এখন সে বৃহত্তর পটভূমিকা থেকে সরে আসছেন। কবিতায় এই যুগের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কবি নিজেকে পুনরাবিষ্কার করেছেন, নিজেকে পুনরনুভব করেছেন। গীতাঞ্জলির পর বলাকায় নতুন বন্ধন মুক্তির পরিচয় পাওয়া গেল, পলাতকায় দেখা গেল একালের সমাজের নির্মম প্রতিচ্ছবি। 'আবেগ ও আবেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া' দেখা খানিকটা সত্য হলেও সবটা সত্য নয়। সমাজে যে পরিবর্তন এসেছে তার আঘাত কবির মনে লাগায় তিনি সমাজকে খানিকটা বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু সে চেষ্টা এক এক সময়ে এক এক রূপ নিয়েছে। পূরবী মহুয়াতে নূতন যৌবনের পরিচয় দেখি, তার মধ্যে কবি বহুদিন পরে আবার লীলাসঙ্গিনী খুঁজতে বেরিয়েছেন। কিন্তু মানসী-কল্পনা-চিত্রার যুগের সঙ্গে এ যুগের গভীর পার্থক্য আছে। এ যুগে কবি যতই লীলাসঙ্গিনীর সন্ধানে বার হোন্ না কেন আগেকার যুগের মত একটা মৃদু মায়াময় আবহাওয়া ঠিক এখানে নেই--একটা প্রচণ্ড ধাক্কা কোথায়ও যেন লেগেছে। তাই বারে বারে ধ্বংস করবার, আঘাত করবার কথা এযুগের কবিতায় দেখি, বিদ্রোহের বাণী বারে বারে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। 'সুপ্তির তিমির বক্ষ দীর্ণ করে তেজস্বী তাপস দীপ্তির কৃপাণে।" কবির হৃদয়ে জ্বালা ধরেছে, "তেজের ভাণ্ডার হতে কী আমাতে দিয়েছ যে ভরে", তিনি জানেন যে, "বন্দী যৌবনের দিন, আবার শৃঙ্খলহীন, বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উগ্র কলোচ্ছ্বাসে।" কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত যে, এই বিদ্রোহ যতই প্রবল হয়ে উঠুক না কেন সে বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত আত্মবিধ্বংসী হয়নি, একটা আশ্রয় শেষ পর্যন্ত রয়েছে। ওদিকে যেমন কবি বলছেন, "ঘন অশ্রুবাষ্পে ভরা মেঘের দুর্যোগে খড়্গ হানি ফেলো ফেলো টুটি।" অপর দিকে তেমনই কবির বিশ্বাস আছে যে, সেই ভাঙন ভাঙনেই নিঃশেষ হয়ে যাবে না, ভাঙার মধ্য দিয়ে 'জ্যোতির কনক-পথখানি' ফুটে উঠবে। এই ভাঙাচোরাটা হয়তো প্রচণ্ড, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রচণ্ড সত্যও। কবি নিজেই বলেছেন,—

আমি যে সে-প্রচণ্ডেরে করেছি বিশ্বাস,
তরীর পালে সে যে রে রুদ্রের নিঃশ্বাস।
বলে সে বক্ষের কাছে, "আছে আছে,
পার আছে,
সন্দেহবন্ধন ছিঁড়ি লহ পরিচয়।"

গদ্য রচনায়, বিশেষ করে উপন্যাসে, বিদ্রোহটা দেখা দিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নতুন কোন বিশ্বাস গড়ে উঠল না। দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান বদল হল এইখানে। বৃহত্তর পটভূমিকা ক্রমশ ক্রমশ সরে গেল। সৃষ্টির সমগ্রতা থেকে বিচ্যুতি ঘটল। কিন্তু তার বদলে সৃষ্টি হল কি? ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় যে কথা বলেছেন, যে এসময়ে "দেশে কালে আবদ্ধ সমসাময়িক মানুষ ও তাহার প্রেম, তাহার দুঃখ ও বেদনা, তাহার সুখ ও আনন্দ সমস্তই লেখকের দৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়িতে চাহিতেছে বস্তুর কতকটা সাম্প্রতিক বাস্তব রূপে", সে কথা ঠিক সত্য নয়। প্রথমত, এ সময় রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তারা দেশে কালে আবদ্ধ সমসাময়িক মানুষ নয়—অধুনিককালের পালেস্তারা তাদের উপর এক এক সময় পড়েছে, হয়তো বা ওরকম চরিত্র বাস্তব-জীবনে দুচারটে খুঁজে পাওয়া গেলেও যেতে পারে, কিন্তু মোটের উপর সমসাময়িক সমাজের প্রতীক তারা নয়। দ্বিতীয়ত, তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে একটা রঙীন কুয়াশার ভাবমণ্ডলে, তার সঙ্গে বস্তুর সাম্প্রতিক বাস্তব রূপের চিহ্ন প্রকৃতই নেই।

যেমন, 'শেষের কবিতা'। সমসাময়িককালে অমিতের মত অদ্ভুত ঝলক লাগানো চরিত্র ক'টা খুঁজে পাওয়া যায়? পথে ঘাটে চলতে ফিরতে অমিতের সন্ধান মেলে কি? আর সিসি-লিসি-কেটির দলের কথা আমরা কল্পনায় যতটা গড়ে থাকি, বাস্তব জীবনে ঠিক ঐ রকম মেয়ের দলের সন্ধান খুব বেশী মেলে কি? এমন চরিত্র কোথায় বাস্তব-জীবনে পাব যারা তুচ্ছতম হতে গভীরতম কথা একই রকম চড়া সুরে বলে থাকে, যার মধ্যে কোন ওঠা পড়া নেই? এইসব সৃষ্টির মধ্যে সমসাময়িক মানুষের সন্ধান খুব বেশী মেলে না। তাদের সুখদুঃখও অনেক সময়ই সৌখিন কল্পনার মানুষ, সাম্প্রতিক বাস্তব রূপের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ খুবই কম। শেষের দিকে অমিত-লাবণ্য-কেটির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ও মানব হৃদয়ের গভীরতার একটু-আধটু ঝিলিক যাই দেখা যাক্ না

কেন, অধিকাংশ সময়ই এদের "প্রতিবিম্ব নিয়ে জীবন কাটে", এরা হচ্ছে 'জন-গণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।' এইরকম রোমাণ্টিকতা-মিশানো লম্বা-চওড়া অট্টহাসি হাসা রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম নয়, এতদিন পর্যন্ত তিনি এমন কোনও সৃষ্টি করেন নি যারা শুধু সৌখিন জলচর মাছের মতো ডাঙায় তুললেই মরে। তার উপর পড়েছে সাইকোলজিতে শান। সেইজন্য যেখানে সুখ দুঃখের একটু মানবিক স্পন্দনের আভাস আছে সেখানেও তা গভীর এবং সরল হতে পারেনি। কবিরই কথায়, "অনেক পড়ে অনেক ভেবে তোমাদের মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে; তোমরা ভিতরে ভিতরে যেসব ভাব গড়ে তুলছ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখ দুঃখ যথেষ্ট ছিল—সমস্যা কিছু কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলছ, কিছুই আর সহজ রাখলে না।" শেষের কবিতার সময় হতে ভাষার বদল সেইজন্য আকস্মিক নয়, তার পিছনে এই গভীর কারণ আছে। ভাষাও সরলতা ত্যাগ করে বক্রোক্তি-প্রধান হয়ে উঠেছে, শ্লেষে, বিদ্রূপে চকিত ইশারায় কল্পনার ঝলকে ভাষা ঝড়ের গতিতে পাঠককে উড়িয়ে নিয়ে যায়, যা স্পষ্টত বলে তার চেয়ে উহ্য রাখে অনেক বেশি। গল্পের কাঠামোর মধ্যেও এই মনোভঙ্গীর প্রকাশ আছে। অমিত, লাবণ্য, কেটির সামাজিক পরিবেশ, তাদের আত্মীয়-স্বজনের কথা যেটুকু আছে সে যেন নেহাৎ প্রাসঙ্গিক ও আকস্মিক; গল্পাংশের মধ্যে তাদের স্থান খুব বড় নয়। লাবণ্যের বাবার পরিচয় না দিলেও অমিত-লাবণ্যের প্রেম-কাহিনী বলতে বাধা হত না। অথচ গোরা-সুচরিতার ভালবাসা এরকম স্বয়ম্ভু এবং কৈশোরক কখনই হতে পারে না, এই প্রেম ফুটে ওঠার জন্য তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ও বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব অপরিহার্য। 'যোগাযোগ' এদিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতর; মহৎ উপন্যাসের বীজ তার মধ্যে আছে। এমন কি, কুমুর মত মেয়ে সংসারে দুর্লভ হলেও অলভ্য নয়, তার মনের দ্বন্দ্বটা আজ অনেকের মনেই আলোড়িত হচ্ছে। তবু সেখানেও সুর চড়া, সাইকোলজিতে শাণ পড়েছে যথেষ্ট, অনেক সময় এমন অনাবশ্যকভাবেই পড়েছে যে, "অন্তরের এতদিনের এত আয়োজন ব্যর্থ হল—একেবারে ঠন করে উঠল পাথরটা, ভরাডুবি এক মুহূর্তেই।" এইসব উপন্যাসে বৃহত্তর পটভূমিকা গেল সরে, বৃহত্তর কোনও সত্তার সন্ধান আর রইল না, তার বদলে যেসব পাত্র-পাত্রী দেখা দিল তারা অস্বাভাবিক এবং অসুস্থ, কি একটা জ্বালায় তারা দিনরাত ছটফট করছে।

এটা ঘটল কেন? এর পিছনে আমাদের সামাজিক পরিবর্তন আছে একথা সত্য। আমাদের সমাজে ভাঙন ধরেছে তাতে আমাদের সমাজ ঘুলিয়ে উঠছে, তার ফেনিল আবর্তে কত জিনিস হঠাৎ ভেসে উঠে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এসময় কিছু অত্যুক্তি বা বাড়াবাড়ি হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু সেই অত্যুক্তিটা রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগেনি। সেইজন্য তিনি তাঁর বইগুলিতে এমন কতকগুলি চরিত্র সৃষ্টি করলেন যারা সত্যিকারের অত্যুক্তিকেও অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছে, সময়ে সময়ে তারা শুধু অত্যুক্তিই হয়ে দাঁড়িয়েছে বাস্তবের সম্পর্ক শূন্য হয়ে। মুশকিল হচ্ছে এইখানেই। ব্যঙ্গ যদি বিশুদ্ধ ব্যঙ্গে পরিণত হয় তখন তার নৈতিবাদ সাংঘাতিক হয়ে ওঠে। গোরার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছিলেন, "সংশোধন! সংশোধন ঢের পরের কথা। সংশোধনের চেয়েও বড়ো কথা ভালোবাসা, শ্রদ্ধা।" এখানে ঠিক উলটো ব্যাপার ঘটেছে। অবশ্য সংশোধন করবার চেষ্টাও রবীন্দ্রনাথ করেন নি, যা করেছেন তা হচ্ছে লম্বা চওড়া অট্টহাসি। সংশোধনের চেষ্টা থাকলে বরং তা কিছুটা সৃষ্টিধর্মী হত। কিন্তু নব্য-সমাজকে ব্যঙ্গ করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৌলিক শ্রদ্ধা ভালোবাসা তো ত্যাগ করেছেনই, উপরন্তু ব্যঙ্গটার মাত্রা বাড়াবার

জন্য একটা আধা-কাল্পনিক প্রতিপক্ষ তৈরী করেছেনও লম্বা চওড়াভাবে, যার আভাস হয়তো সমাজে এখানে ওখানে একটু আধটু মেলে; কিন্তু যারা সত্যিকারের সমাজের ছবি নয়। ভাঙন তো সমাজে আসেই, কিন্তু এরকম ভাঙনের মধ্য দিয়েই সমাজের অগ্রগতিও তো হয়। সুতরাং ভাঙন দেখে ভয় পেলে এবং সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা হারালে মানবজীবনকেই অস্বীকার করা হয়। আর সেই ভাঙনে ঘুলিয়ে ভেসে ওঠা আবর্জনাকেই বড়ো করে ধরলেও ভাঙনের সত্য স্বরূপ চোখে পড়ে না। 'গোরা'তে আছে, 'ঈশ্বর এদের মানুষ করে সৃষ্টি করেছেন, এরা নানারকম করে ভাবে, নানারকম করে চলে, এদের বিশ্বাস এদের সংস্কার নানারকম—কিন্তু সমস্তেরই ভিত্তিতে একটি মনুষ্যত্ব আছে—যার প্রতি ঠিক সত্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে পর সমস্ত ক্ষুদ্রতা অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করে একটি আশ্চর্য মহৎ সত্তা চোখের উপর পড়ে।' সে যুগের সঙ্গে এ যুগের মূলে পার্থক্য হচ্ছে এইখানে। সেযুগেও তিনি ছোট বড় সংঘাত আলোচনা করেন নি তা নয়—গোরাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ; কিন্তু তার মধ্যে সর্বত্র অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত একটি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ধারা অব্যাহত চলে আসছিল। এযুগে সেই মনুষ্যত্বের ভিত্তি টলল। ক্ষুদ্রতা অসম্পূর্ণতার আবরণ ভেদ করে সেই আশ্চর্য মহৎ সত্তার উপর চোখ পড়ার বদলে তিনি ক্ষুদ্রতা অসম্পূর্ণতাগুলিকেই বড় করে তুলে তার উপর বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন। এ অনেকটা ছায়ার সঙ্গে লড়াই। কিন্তু এইরকম লড়ায়ের বিপদ হচ্ছে এই যে, তাতে ভোজবাজির চাতুরী যতই চমক লাগাক না কেন তার আনুষঙ্গিক ফল হয় যে, ছায়াটা অকারণে খুব অযথা বড় হয়ে ওঠে, ফাঁকিটাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত দেখা যায় অমিত-অভীক-সিসি-লিসিদের উপর কবি যতই কটাক্ষ করুন না কেন তাদের প্রতি তাঁর একটা গুপ্ত মায়াও আছে। 'শেষের কবিতা'র সময় হতে এই মনোভঙ্গী প্রবল হয়ে উঠেছে। ভাষা তার নিজের চাতুরীতেই আত্মহারা, চরিত্রগুলি স্বয়ম্ভূ এবং এক একটি অত্যুক্তি, সাম্প্রতিক সমাজের ছায়া যদি-বা তাদের মধ্যে কিছু থাকে সে ছায়া তৎক্ষণাৎ দেখান হচ্ছে এমন পরকলার মধ্য দিয়ে যাতে সে ছায়াকে বিকৃত করে দেখা ছাড়া উপায় নেই। তার উপর ভাববিলাস, বাষ্পালুতা ও কল্পনা মনোবিজ্ঞানের প্যাঁচে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যেখানে হয় আছে বুদবুদের রঙটুকু, না হয় ফেনিয়ে তোলা অকারণ কণ্ঠ। গভীরতা ও বিবর্তন প্রায় কোথায়ও নেই। চরিত্রগুলি অনেকটা টাইপ, যদিও সে টাইপ অনেকটা কাল্পনিক টাইপ, ঠিক হুবহু বাস্তবজীবনের টাইপ নয়। 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলি প্রধানত এই দিক্ থেকে বিচার্য। শেষের কবিতার যুগ হতে রবীন্দ্র রচনা যে পথে প্রবাহিত হল এখানেও তার বদল হয় নি। বরং আরও কতকগুলি নতুন জিনিস দেখা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই সময় যে কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে দেখা যায় তিনি একটা আশ্চর্য গভীর বিশ্বাসের সন্ধান পেয়েছেন। 'তিনসঙ্গী'তে কিন্তু সেই নতুন বিশ্বাসের কোনও সন্ধান পাই না, বরং পূর্বের অসুস্থ ছটফটানি এখানেও চলে এসেছে। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন, তিনসঙ্গী হচ্ছে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি, কিন্তু সেবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ডাঃ রায় লিখেছেন,—

> দৃষ্টিভঙ্গীর এই বিবর্তন সহসা হয় নাই; অকারণেও হয় নাই। সহসা যে হয় নাই তাহা কতকটা ধরা পড়ে "শেষের কবিতাতেই" কিন্তু দৃষ্টি তখনও রোমান্টিক ভাব কল্পনায়, সুরে ও আবেশে আচ্ছন্ন। প্রথম দিকে তাহা ধরা পড়িতে আরম্ভ করিল চিঠিপত্রে, নিবন্ধে, নানা বুদ্ধিমূলক আলোচনা প্রসঙ্গে। ধীরে ধীরে তাহা সঞ্চারিত হইল কাব্যে, বিশেষভাবে 'গদ্য' কবিতায়, দু'একটি সামাজিক ও প্রতীকী নাট্যে এবং অন্তত একটি বড় গল্প বা উপন্যাসে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়িল 'তিনসঙ্গী'র গল্প তিনটিতে।......যে নূতন জীবনধারা, যে নূতন ভাব ও চিন্তাজগৎ আমাদের প্রাচীন জীবনধারা, প্রাচীন ভাব ও চিন্তাজগতের তটে আসিয়া আঘাত করিতেছে রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সের ক্ষীয়মান শক্তির মধ্যেও তাহা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অনুভূতিকে তাহা স্পর্শ করিয়াছে এবং সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে।

ডাঃ রায়ের যুক্তির ধারাটি বোধ হয় এই: (ক) বর্তমান যুগ রবীন্দ্রনাথের মনে অনেককাল থেকেই নানারকম সমস্যা জাগাচ্ছে এবং দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, (খ) রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সেও এই কালকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, (গ) কিন্তু প্রথম দিকে দৃষ্টি রোমান্টিক ভাব কল্পনায় আচ্ছন্ন থাকায় তা ততটা সার্থক সাহিত্যসৃষ্টিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি, (ঘ) তিনসঙ্গীর মধ্যে রোমান্টিক ভাবকল্পনার বদলে অনেকটা বিজ্ঞানী দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দেওয়ায় এগুলি সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে রূপান্তরিত হতে পেরেছে। আবেশ কেটে যাবার ফলে বর্তমানের মোহহীন যুগের সঙ্গে একাত্ম হবার সুবিধা বেশী হয়েছে।

কিন্তু এই যুক্তিধারাটির সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া কঠিন। বস্তুত, 'তিনসঙ্গী' যে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি একথা স্বীকার করবার পথে অনেক বাধা আছে। এক একটি করে গল্পগুলি আলোচনা করলেই তা বোঝা যায়। (ক্রমশ)

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

বংশানুক্রম ও যমজ

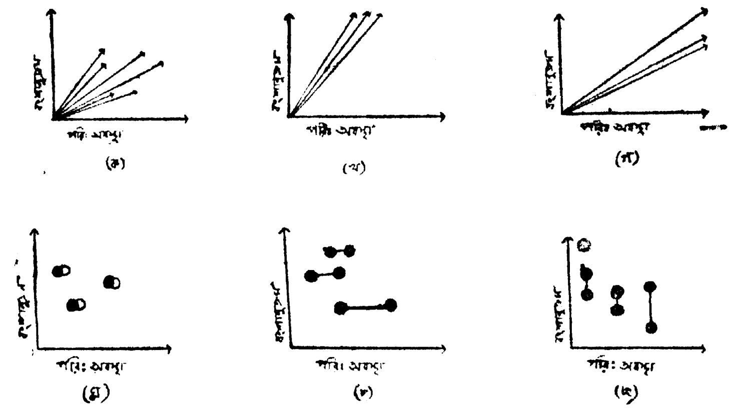
শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

কয়েক মাস পূর্বে মাজদিয়ার কুমারী সুজাতা বিশ্বাসের নিকট হইতে তাহার দুই যমজ ভাই সম্বন্ধে যে পত্র পাইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে একটি জটিল প্রশ্ন ছিল। এই প্রবন্ধে তাহারই উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। নিম্নে পত্রের সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

"আমার যমজ ভাই আছে। তারা Identical বলেই মনে হয়। চেহারায় তো সাদৃশ্য আছেই, এমন কি ওদের আচার ব্যবহার, বুদ্ধি, স্মৃতিশক্তি সবই এক রকম। আর একটি জিনিস আমাদের সবাইকে আশ্চর্য করে দেয়। ওরা যখন বছর দেড়েকের তখনই আমাদের মা মারা যান। আজ ওরা প্রায় ৭ বছরের হতে চল্ল—এখনও ওদের একজনের অসুখ করলে আরেক জনেরও হবে। না হয় এক মায়ের দুধ খেলে এক অসুখ হতে পারে, কিন্তু এখন হয় কেন?"

একজনের অসুখ করলে আরেক জনেরও হবে কেন" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে স্বতঃই বংশানুক্রমের কথায় আসিতে হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথাও বাদ দেওয়া যায় না, কারণ বহু অসুখে পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যেই হইয়া থাকে। Identical যমজেরা একটি ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয়। একটি ডিম্ব দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার জন্যই উহাদের অস্থি, মজ্জা, সত্ত্বা প্রভৃতি সবই একই প্রকারের হইয়া থাকে। একমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্য উভয়ের মধ্যে কোন প্রকার প্রভেদ আনিয়া দিতে পারে। এজন্য Identical যমজের মধ্যে যতটুকু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সবটুকুই পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যেই হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রকোপ মাতৃগর্ভে ডিম্বটি দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর হইতেই শুরু হয়। এই তারতম্যের ফলে আমরা বংশানুক্রম (heredity) ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার (environment) প্রভাব সংখ্যামূলকভাবে নির্ধারণ করিতে পারি। মাতৃগর্ভে উভয়ের অবস্থান, পুষ্টি, রক্ত চলাচল প্রভৃতি সব কিছুরই প্রভাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনধারণের জন্য বংশানুক্রম ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এই দুইটিরই প্রয়োজন—মাত্র একটি লইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না। এই পাতার চিত্রগুলি হইতে ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

(ক) চিত্রে দেখা যাইবে—সাধারণ মানুষের অবস্থা—বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন বংশানুক্রম ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে কিরূপভাবে লড়ালড়ি করিতেছে। (খ) চিত্রে দেখা যাইবে কিভাবে বিভিন্ন মানুষ সমানরূপের বংশানুক্রমিক প্রভাব লইয়া বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। (গ) চিত্রে দেখা যাইবে বিভিন্ন মানুষ সমরূপের পারি-



(ক) (খ) (গ)

(ঘ) (চ) (ছ)

পার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও বিভিন্ন বংশানুক্রমের ফলে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

যমজের বেলায় উপরিউক্ত চিত্রগুলি অন্যরূপ দেখাইতেছে। (ঘ) চিত্রে দেখা যাইবে যে, কয়েকটি Identical যমজ বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে বিস্তৃত এবং শেষোক্ত বিভিন্নতা থাকিলেও উভয়ে উভয়ের সহিত সুসন্নিবিষ্ট। একই ডিম্ব হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহাদের বংশানুক্রমের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার বৈগুণ্যে ইহাদের মধ্যে কোন প্রকার ব্যবধান আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে যেরূপ ধারণ করিবে তাহা (চ) চিত্রে দেখা যাইবে। (ছ) চিত্রের ব্যাপারটি non-Identical যমজের বেলায় প্রযোজ্য—দেখাইলে তুলনামূলকভাবে দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের বংশানুক্রম এক নহে, তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা উভয়েরই সমান। Identical যমজের মধ্যে একটি অসুস্থ হইলে অপরটি অসুস্থ কেন হয় তাহা বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে যে, রোগের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা কতটুকু দায়ী। ব্যাধি যদি বংশানুক্রমিক না হয়, তাহা হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রকোপই অধিক বলিতে হইবে, যেমন—কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড প্রভৃতি সাধারণত পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলেই হইয়া থাকে। তবে এই স্থলে আর একটি ব্যাপার আছে। আমরা সাধারণত এই সকল রোগকে "ছোঁয়াচে" বলিয়া থাকি। এই "ছোয়াচের" মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখি, কাহারো লাগে, আবার কাহারো একেবারে লাগে না (Immunityর প্রসঙ্গ এস্থলে উল্লেখযোগ্য)। এই "লাগা" বা "না লাগা" বংশানুক্রমিক হইতে দেখা যায়।

একটি উদাহরণ দিই—বসন্তকালে প্রায়ই "চোখ উঠিতে" দেখা যায়। আমি এরূপ লোক জানি যে সে একবার কাহারও "চোখ উঠা" চক্ষু দেখিলেই বা সেইরূপ ব্যক্তির সহিত কথাবার্তা কহিলেই তাহার নিজের চক্ষু হইতেই জল বাহির হইয়া যায় এবং কখনও কখনও তাহার নিজের চক্ষুও আক্রান্ত হইয়াছে। অথচ সেই চক্ষু রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে দিবারাত্র কতলোকেই না দেখিতেছে। এই যে একটি ভাব ইহাকে বলে hereditary predisposition (বংশানুক্রমিক পূর্বপ্রবণতা) এই ভাব Identical যমজে স্বভাবতই অধিক হইতেই দেখা যায়। দুই জনেরই একইভাবে ছোঁয়াচ লাগে এবং উভয়ের বংশানুক্রমিক পূর্বপ্রবণতা একই বলিয়া উভয়ে একই সময়ে অসুস্থ হয়। রোগভেদে ইহা অবশ্য বিচার্য। এই প্রবন্ধের উল্লিখিত যমজ দুইটির কোন বিশিষ্ট রোগ সম্বন্ধে জানা নাই নতুবা সেই রোগেরই আলোচনা করা যাইত।

এস্থলে বলা বাহুল্য যে, ব্যাধি বংশানুক্রমিক হইলে একক বংশানুক্রমের ফলে উভয়েই একই সময়ে আক্রান্ত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের সাধনা

বিবেকানন্দ সঙ্ঘের উদ্যোগে আহূত এই সভায় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলবার জন্যে আপনারা অনুরোধ করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে আমার যোগ্যতা নাই, একথা আমি আপনাদের পূর্বেই বলে রাখছি। আমাকে বলতে হলে আপনাকে ভুলে বলতে হয়, ভাবের ভাবে বলার বেগে বলতে হয়; আর সে বেগ, সব জায়গায় ঠিক সৌজন্যসম্মত মনে হবে না। এসব সভায় সেজন্য বলতে সংকোচ বোধ হয়। অন্তরের নিগূঢ় রস গ্রহণের বৃত্তির উন্মেষ না হলে এ তত্ত্বে প্রবেশ করা যায় না, আর প্রাণরাজ্যে অপরিম্লান সৌন্দর্য ও মাধুর্যের স্পর্শে, অন্য কথায় আত্মসংবেদনের অপরোক্ষ অনুভূতিতেই সে বৃত্তির উন্মেষ ঘটে থাকে। প্রথমে বিষয়ের এইভাবেই সূচনা করতে হয় যে, কৃষ্ণতত্ত্ব পরব্রহ্মতত্ত্ব এবং সে ব্রহ্ম আনন্দময়, রসময়। ব্রহ্মকে এইভাবে আনন্দময়, রসময়স্বরূপে ভাবনা করতে গেলেই লীলার কথা এসে পড়ে; কারণ লীলা ব্যতীত আনন্দের কোন দ্যোতনা নাই এবং রসের কোন চেতনা নাই। এইজন্যই বলতে হয়, তিনি এক হয়েও বহু হয়েছেন এবং বহুর ভিতরে সেই একেরই লীলা চলছে। কিন্তু ব্রহ্ম একই হউন, আর বহুই হউন; তাতে আমার কি আসে যায়? আমার তিনি কে? তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? এর উত্তরে বলতে হয়, তিনি আমার প্রাণ, তাঁকে পেলে আর কোন ভয় থাকে না। আমার জীবনের যত অভাব থেকে আমি মুক্ত হয়ে তাঁর মাধুর্যের প্রভাবে আমার স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হই। আমার যত কার্পণ্য এবং দৈন্য তাঁর কারুণ্যে এবং তারুণ্য-লাবণ্যে দূর হয়ে যায়। সাধকের কৃষ্ণ অদীন এমন তারুণ্য এবং লাবণ্যে চৈতন্যময় দেবতা। তিনি পরোক্ষ অনুমাণের বস্তু নহেন, কিংবা প্রমাণাপেক্ষ সিদ্ধান্তও নহেন, তাঁর চিদ্ঘন তনু সংস্পর্শে সাধকের জীবন স্বচ্ছল, উজ্জ্বল হয়, তাঁর চিদাকারের সঞ্চার-রসের আবেশে সাধকের সকল বিকার কেটে যায় এবং বিকারহীন সনাতন রস-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি সুখকে সত্য এবং নিত্য করে পান। আমার তরুণ বন্ধুগণ চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের অসুর নিধনের দিকটার উপর বেশী জোর দিয়েছেন; এ অস্বাভাবিক কিছু নয়। এ খুবই ভালো, বীর্য ও শৌর্যের সাধনা পরাধীন আমাদের জীবনে খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পচা-মরা ঘূণে ধরা জীবনে বলবীর্যের সাড়া জাগাতে হবে এবং শ্রীকৃষ্ণলীলার সাধনাঙ্গে এ জিনিষ রয়েছে; সে আদর্শে জীবন উদ্দীপ্ত করতে পারলে এ জাতি জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে, এ কে না চায়? কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব সাধনার দিক থেকে বিচার করলে এ বস্তু আংশিক; এ অনেকটা বাইরের ব্যাপার। কৃষ্ণলীলার এই দিকটা দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং অনেকটা লৌকিক; কিন্তু সাধকের কৃষ্ণ 'অপরিচ্ছিন্ন মূর্তি', দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে সে লীলা নিবদ্ধ নয়। সে লীলার রসে নিবিষ্ট হলে ভেদ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়, সমগ্র জগৎ আনন্দের ছন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠে। বাঙ্গলার সাধক শ্রীল জীবগোস্বামী মহারাজের ভাষায় 'মধুরিম ছান্দিত—বরতনু—সন্ধিত'। সে লীলার রস-সংবেদন মনে সর্বতোভাবে মাধুরীর ছন্দ জাগিয়ে তোলে, আর সেই ছন্দ সচ্চিদানন্দময় দেবতার বরতনুর সঙ্গে মনকে সান্ধিত করে দেয়। সে রসের অনুগতি-ছন্দে মনের কোন ব্যাপ্তিই থাকে না। গাছে লতায় পাতায় বায়ুর হিল্লোল বিভঙ্গে সাধক সেই দেবতার রসময় অঙ্গেরই সঙ্গ লাভ করেন, সে অঙ্গের অনঙ্গ প্রসঙ্গে তিনি প্রেমের তরঙ্গে ডুবে যান। তাঁর আর তখন খণ্ড জ্ঞান থাকে না, অখণ্ডৈক-রসামৃত-কলেবর-সুধায় তিনি একেবারে মত্ত হয়ে পড়েন। যমুনার কল্লোলদোলে কাল ডুবে যায় এবং কালিন্দীর অমৃত নিঃস্যন্দী শীকর সংস্পর্শে তিনি অনন্ত বসন্তময় অনাহত যৌবনে জাগ্রত হন। অবশ্য এ সবই খুব গভীর কথা; বিশেষ সাধন ভজন না করলে, একান্ত অনুশীলনের পথ না ধরলে জীবন্ত লীলার এ রাজ্যে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। দেখছি, তরুণ বন্ধুরা অনেকেই 'ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান সর্ব-অবতারী সর্বকারণ নিধান' কৃষ্ণের এই দিকটা অনুধাবন করে দেখতে চান না। তাঁরা কৃষ্ণকে মহাপুরুষ রূপেই দেখতে ভালবাসেন। আগেই বলেছি এও ভাল—যার যেই ভাব সেই সর্বোত্তম; কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা কথা বলবার আছে এই যে, এতে কৃষ্ণলীলার প্রভাব নিজের স্বভাবে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। প্রত্যক্ষতার পরম বল অন্তরে নির্বিচারে পাওয়া যায় না; অহঙ্কারের পথেই চলতে হয়, চিদাকারের সেবায় মন নির্বিকার হয় না। বীর্যের—আমরা বাইরের বিচারে যে নামই দেই না কেন, আপন বেদনময় মাধুর্যের প্রাখর্যে আমাদের বিচারগত অবীর্যকে দূর করতে পারে না। এ অবস্থায় পরের জন্য প্রাণ দেওয়া যায় না। আত্মজ্ঞানের প্রেরণাই জীবনে প্রাণের পরিপূর্তির ছন্দ জাগিয়ে তুলে সকল ভীতি কাটায়। প্রাণশক্তি নিখাদ এবং নির্বিবাদ। বুঝি, অনেকের পক্ষে এ বিষয় উপলব্ধি করা একটু কঠিন হবে। কথাটা ভেঙ্গে বলার চেষ্টা করা যাবে। মনে করুন, প্রাণশক্তির বলে কেহ অত্যাচার ও অনাচারকে দূর করেছেন; আমাদের দৃষ্টিতে তাঁর অহঙ্কারের একটা বীর্যময় চেতনাই ধরা পড়ছে অর্থাৎ তিনি অত্যাচারীকে ধ্বংস করবার দিকেই জোর দিচ্ছেন, আমরা এই দেখতে পাচ্ছি, অন্য কথায়, তাঁর হিংসার দিকটাই আমাদের নজরে পড়ছে; শৌর্য-কৃত্যের দিকটাই আমাদের দৃষ্টিতে সত্য হচ্ছে। কিন্তু শক্তির মূলতত্ত্বের অনুধাবন করলে দেখা যাবে ব্যাপার ঠিক তা নয়। দেশ এবং জাতি বা দুর্গতের প্রেমই তার প্রাণবলকে উদ্বেলিত করে তুলছে। তিনি সেই প্রেমের টানে, সেই মাধুর্যের আকর্ষণে নিরভিমানে আত্মদান করছেন। পর-বোধের চেয়ে তার মনে আত্মবোধ বা ভগবৎ-প্রবোধই কাজ কচ্ছে। প্রেমের সঞ্চারই তাঁর দেহের বিচার ভুলিয়ে দিয়ে তাঁর শক্তিকে দুর্নিবার করে তুলছে। তিনি ভিতরে প্রেমের লীলাতেই যুক্ত এবং বাইরের ব্যাপার সম্পর্কে অনাসক্ত। নিত্য জীবনের প্রেমছন্দোময় দেবতাকে আত্মদান করে তিনি মরণের উপরে চলে গেছেন। কামকারের ফলেই বিকার ঘটে, বন্ধনে পড়তে হয়, কিন্তু কামকার ছেড়ে তিনি রস সঞ্চারের উৎসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নৈষ্ঠিকী শান্তি লাভ করেছেন। সুতরাং দেখা যাবে আমরা মানবতার যে রুদ্র কর্মময় ছন্দ বাইরে বেজে উঠতে দেখি তার ভিতরে প্রেমের প্রত্যক্ষ সংবেদন একান্ত বা অত্যন্ত ভাবে রয়েছে। অন্তরে বলেই জগতে যত বড় কাজ হয়, বড় কাজ হয় হৃদয়ের উন্মেষে এবং রসেরই আবেগে শুধু কর্তব্যের বিচার খুব বেশী দূর যেতে পারে না। নিজে বুঝে চলা আর প্রেমের বলে বোঝা-বুঝি ছেড়ে সোজাসুজি চলা, এ দুইয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। জগতে যাদের দ্বারা বড় কাজ হয়েছে, তাঁরা বিচার ছেড়ে প্রেমের সঞ্চারেই চলেছেন। প্রতিকূলতা লঙ্ঘনের দুর্নিবার আবেগ প্রেমই দিতে পারে, প্রেমের স্পর্শেই সাধক সর্বাবস্থাকে অনুকূল করে অন্তরের মূল শক্তিকে উজ্জীবিত করে তুলতে পারেন। সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্বের এই প্রেমময়, আনন্দময় দিকটা বুঝতে না পারলে পরাধীন জীবনের শত প্রতিকূলতার মধ্যে বীর্যময় আত্মদানের স্বচ্ছন্দ সাধনা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। দেশের জন্য এবং জাতির জন্য যদি আমরা রুদ্র কর্মময় জীবন-সাধনায় প্রবৃত্ত হতে চাই, তবে শুধু থিওরীতেই কুলোবে না; দেশের নরনারীর মাধুরীতেও আমাদের ডুবতে হবে। পরের উপকার কর, এ বলার সাহায্যে যথেষ্ট বল পাওয়া যায় না, পরকে আপনার করে দেখা দরকার। ডাস্টবিনে যে ভিখারিণী উচ্ছিষ্ট সংগ্রহের দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি কচ্ছে, তার শ্রেণীভেদ ঘুচিয়ে দেব বললেই তা দেওয়া যায় না, সে যে আমারই মা, তাকে এমন দেখা চাই। শুধু তাই নয়, তার জন্যে প্রাণ দিলে আমি বাঁচি, তার তনুরুচি এমন দেখার মত আমার মনে শুদ্ধিই প্রয়োজন। কৃষ্ণতত্ত্বের সাধনার মধ্যে এই আত্মভাবকে পেতে হলে বাঙলার সাধকদের দৃষ্টির অনুশীলন করা দরকার। কৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলার রসধর্মে মনকে উজ্জীবিত করে তোলা প্রয়োজন। মহাপ্রভুর শরণাগতি অবলম্বন করলে তবে কৃষ্ণতত্ত্বের অন্তর্নিহিত এই শক্তিধর্মে নিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হতে পারে।

অধ্যাত্ম-জীবনের প্রেমই মুখ্য বস্তু; অন্তত ভারতীয় সাধনার তাই নির্দেশ। মহাপ্রভু বলেছেন, "ভগবান সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় হয়, প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বাক্য কয়।" একথা অবশ্য সত্য যে, আধ্যাত্মিক জীবন, আমাদের অনেকের কাছেই গৌণ হয়ে পড়েছে। আমাদের দার্শনিক আলোচনা শুধু অবসর সময়টা কোন রকমে কাটাবারই জন্যে, বাস্তব কর্মজীবনে তার প্রেরণা খুবই কম। সমাজ চেতনা ছাড়া আমরা মরা। ব্যক্তি-সর্বস্ব ক্ষুদ্র হয়ে পড়েছে আমাদের জীবন। আমাদের বল নাই শক্তি নাই; সুতরাং শুধু আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য নয়, এই পার্থিব প্রয়োজন-সাধনের ক্ষেত্রেও প্রেমেরই একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। ম্যাৎসিনীর কথায় বলতে হয়, কেমন করে ভালবাসতে হয়, আমরা তা ভুলে গেছি এবং সেই ভুলই আমাদের সকল রকম দুঃখের মূল। বিগত দুর্ভিক্ষে আমাদের সমাজ-জীবনের এই গলদ নানাদিক থেকে একেবারে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। বুভুক্ষু

নরনারীকে বাঁচাবার জন্যে আমাদের সমাজ-জীবনে বলিষ্ঠ প্রাণের প্রবল চেতনা জাগে নাই। জীবন্ত জাতির লক্ষণ এ নয়। উডহেড কমিশন আমাদের এ লজ্জার কথাটা বলেছেন। জাতির জন্য অন্তরে যদি আমাদের গভীর ভালবাসাই থাকত, তবে রুদ্র বিপ্লবের তালে তা বেজে উঠত। স্বাভাবিক টান যেখানে সেখানে বিচারের পাকে প্রাণধর্মের পরিস্ফূর্তি পিষ্ট হয় না, নির্বিচারে তার সঞ্চার ঘটায়। দুঃখ হয় বৈ কি। রুদ্র মাধুর্যের বীর্যময় প্রাচুর্যের পরিচয় আমরা এমন কুরুক্ষেত্রের মধ্যে পড়েও নয়নভরে দেখতে পেলাম না। প্রেম প্রাণকে তাজা করে। প্রেমের অভাবে আমাদের মন একেবারে মুসড়ে গেছে; শুধু কড়া কথার ইনজেকশন দিলে আমাদের এই স্থবির অঙ্গে জীবন্ত যৌবনের রৌদ্র-রসের তরঙ্গ খেলবে না। কুরুক্ষেত্রের ঠাকুরকে জাগাতে হলে আগে বৃন্দাবনের প্রেমের প্রত্যক্ষ স্পর্শ আমাদের অন্তরে পেতে হবে। আপন বেদনা একান্ত করতে হবে। এ জিনিস যদি আমরা লাভ করতে পারি, তবে সকল দিক থেকে আমরা বাঁচব, নইলে জগতের অবস্থা যেমন দাঁড়িয়েছে তাতে আমাদের বাঁচবার কোন উপায় নেই। 'এসব শত্রু নহে তেমন।' রাক্ষসী এবং আসুরী শক্তি আজ জগৎবিধ্বংসী অস্ত্রবলে সজ্জিত হয়ে উঠেছে। ছোটখাটো বিদ্রোহ বা বিপ্লব এর কাছে আর দাঁড়াতে পারবে না। পতিত জাতির বিক্ষোভ বজ্রবলে ধ্বংস করে অসুর কংসের দল পশুবলকে প্রতিষ্ঠিত করবে। এমন অবস্থায় সমগ্র জাতির অন্তরে প্রেম যদি নাড়া দিতে পারে, তবেই আমাদের মুক্তির পথ হতে পারে। ভারতের ৪০ কোটি নরনারী যদি প্রেমের প্রগাঢ় প্রাণধর্মে জেগে উঠে, তবে আণবিক বোমা বা কসমিকরের প্রয়োগ কৌশলও তাদের গতি রুদ্ধ করতে পারবে না। নিবিড় এই প্রীতির ছন্দই আমাদের জীবনকে অনপেক্ষ করতে পারে। তার শক্তি হয় দুর্জয়, কারণ ভয় বলে কোন জিনিস আর সেখানে থাকে না। স্বামীজী এই 'অভীঃ'কেই সাধনা করতে আমাদের উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন। সতাই আমরা আজ এক কঠোর পরীক্ষাস্থলে এসে পেঁৗছেছি। জগতের সকল নিপীড়িত জাতির বেদনা আমাদিগকে প্রেরণা দান করুক। ভারতের উপর সমগ্র জগতের সমস্যা সমাধান নির্ভর করছে। আশা করি, আপনারা এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করবেন। আজ প্রশ্ন উঠেছে—আসুরিক শক্তির সঙ্গে কোন বলে নিপীড়িত জগৎ সংগ্রামে দাঁড়াবে? বিশ্ব-ধ্বংসের শক্তিকে অসুর আয়ত্ত করে ফেলেছে। রুখে তো দাঁড়ালো তারা বড় বড় ফাঁকা বুলি ছেড়ে বিশ্বগ্রাসী স্বমূর্তি ধরে, দন্ত-নখর মেলে। একটা বোমা ছাড়লেই বিপ্লব-বিদ্রোহ সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। মানবতার উচ্ছ্বাসের যে বিলাস জগতে এতদিন আত্ম-দানের পথে বিদ্রোহ এবং বিপ্লবের ভিতর দিয়ে পশুত্বের অন্ধকার থেকে মাঝে মাঝে মনুষ্যত্বের প্রাণময় আলোক ঝলকে ঝলকে ফেলেছে, এরপর তারও আর অবকাশ থাকবে না। পশুবলের মদান্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তার বজ্র বোমার ধূম্রঝটিকাজালে আর নিঃশ্বাস ফেলবারও স্থান রইলো না। মানব জাতির এ মহাসংকটে ভারতবর্ষ একমাত্র আশার বাণী শুনোতে পারে। প্রেমের পথে আত্মদান বরণ করে, ভারতই অসুরের স্পর্ধাকে নির্জিত করতে সমর্থ; মানব-মহিমাকে রক্ষা করবার ক্ষমতা শুধু তারই আছে। ভারতের শক্তিতেই বিশ্বের পীড়িত জাতিসমূহের মুক্তি ঘটবে। বিষ্ণুপীঠ এই ভারতভূমিতে, ধর্মক্ষেত্র এই কুরুক্ষেত্রেই পশুবলের উপর চূড়ান্ত আঘাত এসে পড়বে; তার অন্তঃসার-হীনতা নিঃশেষে উন্মুক্ত হবে; প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং সভ্যতার যুগ জগতে আসবে। বিজ্ঞানের স্পর্ধা আমরা কতরকমে শুনছি; এদেশের সাধকেরা নরঘাতী এমন সব কূট অস্ত্র প্রয়োগের কৌশলকে বর্বরতা বলে নিন্দা করেছেন। এভাবে মানুষ মেরে আবার বিজয়ের গৌরব! কিন্তু এখনকার যুগ পশুত্বেরই যুগ, বর্বরতারই যুগ, তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এজন্যই আমার নিবেদন এই যে, কৃষ্ণতত্ত্বের রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্বের দিকটা আপনারা বিশেষভাবে অনুশীলন করুন। শুধু ফাঁকার উপর লাফালাফিতে আসুরিক প্রতাপের এমন প্রচণ্ড উল্লাসের মধ্যে কোন কাজ হবে না, জনগণের অন্তরের সঙ্গে প্রগাঢ় প্রেমে মাখামাখি হওয়াই এক্ষেত্রে প্রধান প্রয়োজন। ভারতের কৃষ্ণ-তত্ত্বের সাধনার মূলীভূত শক্তি সেইখানেই রয়েছে। এই সাধনার পথে যদি আমরা প্রাণধর্মে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারি; তবে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান তো হবেই; সেইসঙ্গে বিশ্বের বর্তমান সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। কৃষ্ণতত্ত্ব পরিচ্ছিন্ন বস্তু নয়; অপরিচ্ছিন্ন সম্মূর্তি সে দেবতার প্রেমের দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎ উদ্ভাসিত হচ্ছে। এদেশের ঋষিদের ভাষায়—'হাস্যচ্ছেরে-রবনতাখিললোকতাপ- শোকাশ্রু-সাগর-বিশোষণ-মন্ত্যুদারং' অবনত ও পীড়িত অখিল জগতের শোকাশ্রু-সাগর মুছে যায় সে দেবতার হাসি এমন উদার। সে হাসির রাশি একবার অন্তরে মাখুন; বৃন্দাবনের কুঞ্জকন্দরে যে বাঁশী বেজেছিল আমাদের লজ্জা ঘৃণা ভয় ভেঙ্গে দিক। আমরা সকল বিচার ছেড়ে যেন সেই প্রেমের দেবতাকেই বুকে করতে পারি, তাঁকে নির্নিমেষে দেশের নরনারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি, তবে তো শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সাধনা আমাদের সার্থক হবে; কারণ 'অনুমানে প্রমাণে এ সাধনা হয় না।' বেদান্ত-সূত্রে রয়েছে, "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং" আমরা বর্তমানে দেশের নরনারীকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করছি, এ প্রত্যক্ষতা এবং এর উপর ভিত্তি করে আমাদের যে অনুমান এ দুইকেই অতিক্রম করতে পারলে, তবে সে সংরাধনা সম্ভব হতে পারে এবং প্রেমই আমাদের এ সম্বন্ধে দৃষ্টি বদলে ফেলতে সক্ষম।*

---

* বজবজ বিবেকানন্দ সঙ্ঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় 'দেশ' সম্পাদকের বক্তৃতার অনুলিপি।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাঙলার কথা আলোচনা করিলে মনে হয়—অভাব বাঙলার বৈশিষ্ট্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙলায় অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, সরকারের ব্যবস্থায় কর্মীরও অভাব।

ভারত সরকারের খাদ্য সদস্য স্যার জওলা-প্রসাদ শ্রীবাস্তব সেদিন বাঙলার গভর্নর মিস্টার কেসীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন, বাঙলায় আর দুর্ভিক্ষ হইবে না, কারণ বাঙলায় ৭ লক্ষ টন চাউল মজুদ আছে। চাউল যেমন সরকারের গুদামে—তাহার হিসাব তেমনই সরকারের দপ্তরে থাকে। কাজেই সেই চাউল ও সেই হিসাব উভয়ই দেশের লোকের অধিকার বহির্ভূত। কিন্তু যখন দেশের লোক দেখিতে পায়, যদিও তাহারা শুনিতেছে, চাউলের অভাব থাকা ত পরের কথা, তাহার প্রাচুর্য ও বাঙলার জলবায়ু—উভয়ের আক্রমণে তাহা বিকৃত হইবে এই আশংকায় বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি করাও হইতেছে, তখন তাহারা মনে না করিয়া পারে না—অন্নের যে অভাব তাহারা অনুমান করিতেছে না, পরন্তু অনুভব করিতেছে, তাহা এত সত্য যে—

"Reams of hiccoughing platitudes lodged in the pigeon-holes of the Home Office by all the gentlemen clerks and gentlemen farmers of the world cannot mend this."

তাহারা শুনিতেছে, বাঙলায় ৭ লক্ষ টন চাউল মজুদ আছে, আর তাহাদিগকে ১৬ টাকা মণ দরে চাউল কিনিতে হওয়ায় তাহারা অপর্ণাহারে থাকিতেছে, এই অবস্থা যে অসামঞ্জস্যের পরিচায়ক, তাহা কিরূপে নিবারিত হইতে পারে?

ভারত সরকারের খাদ্য সদস্য ও বাঙলার গভর্নর "একসুরে" বলিয়াছেন, অভাব নাই। কিন্তু বাঙালীর মনে আছে, ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের তৎকালীন খাদ্য সদস্য অনায়াসে বলিয়াছিলেন—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় যেরূপ ধান্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে বাঙলা অন্যান্য প্রদেশকে এ চাউল দিয়া সাহায্য করিতে পারিবে। তখন তিনি যে "অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন কর"—ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থায় গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা ২ বৎসর চলিলেও আজ বলিতে হইতেছে—ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী করা প্রয়োজন হইবে!

আর আজ সার জওলাপ্রসাদের উক্তির পরে ভারত সরকার বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি নিষিদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে কি বুঝিতে হইবে?

আমরা দেখিয়াছি, পর পর ভারত সরকারের ৩জন খাদ্য সদস্যের কথা বৃথা হইয়াছে। ইহাতে যদি বাঙলার লোক তাঁহাদিগের উক্তি সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য বলিয়া মনে করিতে না পারে, তবে কি সে জন্য তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায়?

বাঙলার গভর্নর সার জন হার্বার্ট আপনি না বলিলেও তাঁহার সচিবরা—নাজিমুদ্দীন সচিব সঙ্ঘের সচিবরা এবং ভারত সরকারের খাদ্য সদস্য সার মহম্মদ আজিজুল হক যে খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য সম্বন্ধে ভিত্তিহীন প্রচার কার্য পরিচালিত করিয়াছিলেন এবং তাহার-ফলে লোককে আরও বিপন্ন করিয়াছিলেন, তাহা দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন অকুণ্ঠভাবে বলিয়া তাঁহাদিগের সেই কার্যের নিন্দা করিয়াছেন।

ইতোমধ্যেই যে কলিকাতার নিকটস্থ গ্রামসমূহ হইতে ক্ষুধিত ও বস্ত্রাভাবে পীড়িত জনগণ কলিকাতায় উপনীত হইতেছে, তাহা কি আসন্ন দুর্ভিক্ষের পূর্ব-লক্ষণ নহে? যিনি বড়লাট হইয়া বিহারের দারুণ দুর্ভিক্ষে লোকরক্ষায় অসাধারণ সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন, সেই লর্ড নর্থব্রুক বলিয়াছিলেন—সময় থাকিতে দুর্ভিক্ষে লোকক্ষয় নিবারণের উপায় করাই কর্তব্য।

এবার দেশের লোক সরকারকে সেই কথাই বলিতেছেঃ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তাহা নিবারণের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, পূর্বাহ্নে তাহার উপস্থিতি নিবারণের উপায় করিতে হয়।

বাঙলায় দুর্ভিক্ষ গিয়াছে, কিন্তু তাহার জের মিটে নাই। কানিংহাম দুর্ভিক্ষের দুই রূপের উল্লেখ করিয়াছেন—

(১) যাহাতে মূল্য দিলেও খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় না।

(২) যাহাতে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য এত অধিক হয় যে, ধনী ব্যতীত আর কেহ তাহা সংগ্রহ করিতে পারে না।

বাঙলায় দুর্ভিক্ষের প্রথম রূপ আর নাই বটে, কিন্তু দ্বিতীয় রূপ দেশের লোক প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিতেছে। কাজেই যাহাতে খাদ্যদ্রব্য সুলভ হয়, সর্বাগ্রে সেই ব্যবস্থা করা কর্তব্য। কিন্তু বাঙালী তাহাতেই বঞ্চিত হইতেছে।

কেন যে, এত চাউল সঞ্চিত থাকিতেও চাউলের দাম কমিতেছে না, তাহা কে বলিবে। বাঙলা সরকার ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে যখন অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তখন অব্যবস্থাহেতু, গুদামে, রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এমন কি বোটানিক্যাল গার্ডেনসেও বহু লক্ষ টাকার খাদ্যদ্রব্য বিকৃত হইতে দিয়াছিলেন। আর আজ বাঙলা সরকার, যখন গুদামে চাউল বিকৃত হইবার আশংকা আছে, তখনও বাঙালীর পক্ষে চাউল সুলভ করিতে দিতেছেন না। আমরা কেমন করিয়া বলিব, বাঙলায় চাউলের অভাব নাই?

তাহার পর—বস্ত্রাভাব। বস্ত্রাভাবে লজ্জা-নিবারণে অক্ষম নারীরা যে আত্মহত্যা করিয়াছেন, এমন সংবাদও পাওয়া গিয়াছে বাঙলার যে গভর্নর ছুটি লইয়া বিলাতে যাইতেছেন এবং আর ফিরিবেন কিনা তাহা আমরা জানি না—তিনি বলিয়াছেন বস্ত্রাভাবে লোকের আত্মহত্যার সংবাদ তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসে আমাদিগের নিকট প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন হয় না। তিনি তাঁহার এক বেতার বক্তৃতায় যখন ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরু প্রমুখ ব্যক্তি-দিগকে আক্রমণ করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা বাঙলার দুরবস্থা সম্বন্ধে যেসব সংবাদ দেন, সে সকল নির্ভরযোগ্য নহে—তাঁহারা যেন "উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসেন"—তখন শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা বিস্মৃত হই নাই। বিধানবাবু বলিয়াছিলেন, গভর্নররা যখন যে স্থান পরিদর্শনে গমন করেন, তখন তাঁহাদিগের জন্য সে স্থান এমনভাবে রাখা হয় যে, তাঁহারা ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করিতে পারেন না। আমাদিগের মনে আছে, একবার ছোটলাটের গমন সময়—যে পথে তিনি যাইবেন স্থির ছিল সেই পথের পার্শ্বস্থ একটি ডোবার উপর বাঁশ দিয়া তাহাতে ঘাসের চাপড়া বসাইয়া সেটি গোপন করা হইয়াছিল। আমরা জানি যখন লর্ড ওয়াভেলকে কাঁথিতে লওয়া হয়, তাহার পূর্বে কাঁথির বাজারে দোকানে দোকানে চাউলের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং বাঙলার গভর্নর সার টমাস রাদারফোর্ডও বাজারে চাউল দেখিতে পাইয়াছিলেন—লোক মাথায় করিয়া চাউল লইয়া যাইতেছে—এমনও যে দেখিতে পান নাই, এমন নহে।

বাস্তবিক বাঙলা সরকার অন্ন ও বস্ত্র—কোন সমস্যারই সুষ্ঠু সমাধান করিতে পারেন নাই! সেদিন ডক্টর শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় বলিয়াছেন—তিনি স্বয়ং দেখিয়াছেন, বোম্বাই-এ কাপড়ের কলের গুদামে কাপড় স্তূপাকার—আর বাঙলায় কাপড় পাওয়া যায় না। কমিটির উপর কমিটি নিযুক্ত করিলে সে সমস্যার সমাধান হইবে, এমন আশার অবকাশ নাই। এমন কি আমরা দেখিতেছি, সরকারের গঠিত কোন কোন কমিটির সভ্যরা প্রকাশ্যভাবে ব্যবস্থার নিন্দা করিলেও কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন না। কেহ কেহ হয়ত ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচনের পূর্বাহ্নে শেষ অস্ত্রত্যাগের মত সে কাজ করিবেন এবং তাহাতে তাঁহাদিগের নির্বাচনপথ সুগম হইবে—মনে করিতেছেন।

যাহাকে গোড়ায় গলদ বলে, বস্ত্র সরবরাহ সম্পর্কে তাহাই হইয়াছে। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দারুণ দুর্ভিক্ষে লোক রন্ধনের পাত্র হইতে বস্ত্র পর্যন্ত বিক্রয় করিয়াছিল—বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যদি সে বিষয় বিবেচিত হইত, তবে যে বাঙলায় বস্ত্র অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিক সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইত, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। কিন্তু বাঙলায় সর্বাপেক্ষা অল্প কাপড় দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। বাঙলা সরকার যে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এমন কথাও প্রকাশ পায় নাই।

এখনও বাঙলা সরকার বস্ত্র বণ্টনের সুব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। কলিকাতায়ও ওয়ার্ড কমিটিগুলি নানারূপ অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং পূজার সময়েও যে অতিরিক্ত বস্ত্র পাওয়া যাইতে পারিবে, এমন মনে করিবার উপায় নাই।

আর পল্লীগ্রামের কথাই নাই।

কলিকাতায় ওয়ার্ড কমিটিগুলিকে কি "বাফার" হিসাবে গঠিত করা হইয়াছে?

মধ্যবর্তী হ্যান্ডলিং এজেন্ট নিয়োগের কি প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। একাধিক হ্যান্ডলিং এজেন্টের সম্বন্ধে নানারূপ অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন হ্যান্ডলিং এজেন্ট যে উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীদিগের প্রশংসা—অন্য কাজ করিয়া লাভ করিয়াছেন, তাহাও দেখা গিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের সময় হইতে লোক যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহাতে স্বাস্থ্যাভাব অবশ্যম্ভাবী। আবার ঔষধ ও পথ্যের অভাবও তীব্র। ঔষধের অভাব কিরূপ তাহা মেজর জেনারেল ষ্টুয়ার্ট এক বেতার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন। ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ঘটিবা মাত্র তৎকালীন বড়লাট পাছে রোগব্যাপ্তি ঘটে সেই জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা বিস্তার করিয়াছিলেন। আর এ বার বাঙলায় আমরা সেরূপ কোন আয়োজনের পরিচয়ও পাই নাই।

বাঙলা সরকার বাঙলার এক স্থান হইতে অন্যান্য স্থানে শিল্পকেন্দ্রে কয়লা সরবরাহের সুব্যবস্থাও করাইতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন।

বাঙলার অভাবের অন্ত নাই—আর বাঙলা সরকার দেশের লোকের সহযোগে সেসব অভাব দূর—এমন কি হ্রাস করিবার কি চেষ্টা—কি উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করিয়াছেন?

যতদিন বাঙলায় সচিবসংঘ ছিল, ততদিন গভর্নরের পক্ষে সচিবদিগকে দায়ী করিবার সুযোগ ছিল। কিন্তু ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা জারী করিবার পর হইতে তাঁহার সে অধিকারও আর নাই।

...শের কথা

বাঙ...
দুর্ভি...
প্রাবল...
তাহার...
কমিটি...

সরকারে(১৮ই ভাদ্র—২৪শে ভাদ্র)
ভেষজ ; নির্বাচন—সৈনিকের অনাচার—বাঙলা...কা-প্রথা—দুর্ভিক্ষের আশংকা—ব্যাপারে ...ল্য।

নির্বাচন সম্পর্কে নির্দেশ

...জিলা কমিটিগুলি যেন নির্বাচন গত...য় যে সকল ত্রুটি ঘটিয়াছে সে প্র...র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

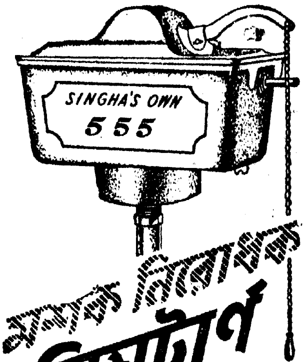
...) আগামী নির্বাচনের জন্য কাজ ...ত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেন।

...সনিকের অনাচার—শিলং হইতে সংবাদ ...ওয়া গিয়াছে—আসামের কণ্ট্রোলারের ...র্যালয়ের একজন হিসাব পরীক্ষক গত ...শে আগস্ট সন্ধ্যার পরে যখন শিলংএ ...গৃহে যাইতেছিলেন, তখন পথে ২জন ...পরিহিত ভারতীয় সৈনিক ছিল। ...কজন তাঁহার হাত ধরিয়া তিনি তাহা-...একটি খাশি তরুণী দি...

...করা হইবে। ...ভারতায় সোনকরা আর "বাট্টা", সামরিক কর্মচারীরা আর বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য ও বেসামরিক কর্মচারীরা আর "ফিল্ড এলাউএন্স" পাইবেন না। কেবল এখনও আগস্ট মাসে ঘোষিত ডাক প্রভৃতি সম্পর্কিত সুবিধা চলিবে।

বেসামরিকদিগের মধ্যেও বেকারের সংখ্যা যে অত্যন্ত অধিক হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। রেলে সামরিক কাজের জন্য নিযুক্ত প্রায় ২ লক্ষ ৬২ হাজার লোক বেকার হইবে। নিখিল ভারত রেলওয়ে কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিরা আগামী ১৮ই ও ১৯শে সেপ্টেম্বর এই বিষয়ের আলোচনা জন্য রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। প্রকাশ, সমিতি নিম্নলিখিত উপায়সমূহ অবলম্বন করিয়া বেকার সমস্যার উগ্রতা হ্রাসের প্রস্তাব করিবেন—(১) বর্তমানে সপ্তাহে যে ৬৪ ঘণ্টা কাজের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার স্থানে যুদ্ধপূর্ব ৪৮ ঘণ্টা কাজের প্রবর্তন; (২) নূতন রেল লাইন প্রতিষ্ঠা; (৩) মাল দি চলাচল ব্যবস্থা রেল বিভাগের অধীন করা; (৪) ছুটির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এই সকল উপায় অবলম্বিত হইলে বহু লোক আর বেকার হইবে না।

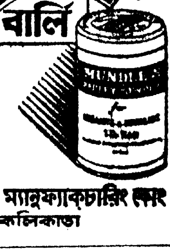
...কংগ্রেসের সংবাদ—পুণা ...ন্দ্র আচার্য) ...ভারত কমিটি...



SINGHA'S OWN
555



BI-VITA-B
A GENERAL TONIC
BENGAL IMMUNITY CO. LTD.
153 DHARAMTALA ST.
CALCUTTA



নূতন নির্বাচন—ব্যবস্থা পরিষদসমূহের নূতন সদস্য নির্বাচন হইবে বলিয়া পরিষদগুলির অনুষ্ঠান শেষ করা হইতেছে। পুণা হইতে ডক্টর জয়াকর, কুমার স্যার জগদীশপ্রসাদ ও স্যার গোপালস্বামী আয়াঙ্গার গত ২১শে ভাদ্র এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ ব্যবস্থার ফলে ৬ মাসকাল ৬টি প্রদেশে আর পরিষদের নিকট দায়িত্বশীল সচিবসংঘ থাকিতে পারিবে না। গভর্নরেরা স্বৈরশাসন পরিচালিত করিবেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের সম্বন্ধে মতবিরোধ হেতু কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলসমূহ পদত্যাগ করিয়াছিলেন—২০ কোটি ভারতবাসী তথাকথিত স্বায়ত্তশাসনেও বঞ্চিত হইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। এখন হয়ত কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিবেন। এখন অবিলম্বে ভারত শাসন আইনের বিধানানুসারে সচিবসংঘ গঠন করা সরকারের কর্তব্য। অথচ মিস্টার জিন্না প্রমুখ ব্যক্তিরা তাহাতে শঙ্কিত হইয়াছেন। গত আগস্ট মাসে বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর যে বক্তৃতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়াছিলেন, তাহাতে মনে হইয়াছিল, তিনি ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারার শাসনের অবসান ঘটাইতে চাহেন। কিন্তু মিস্টার জিন্নার দল দাবী করেন, যে সকল প্রদেশে মুসলিম লীগের সচিবরা বহাল আছেন, সে সকলে সচিবসংঘ থাকুক—কিন্তু নূতন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কংগ্রেসকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিতে দেওয়া হইবে না। তাহার পরে ব্যবস্থা পরিষদসমূহের অবসান ঘটান হইতেছে। ইহাতে আগামী মার্চ মাসের পূর্বে গভর্নরী স্বৈরশাসনই চলিবে। ইহাতে অনেকেই জিজ্ঞাসা করিবেন—কে ভারতবর্ষ শাসন করিতেছেন? লর্ড ওয়াভেল—না মিস্টার জিন্না। ইহার পরে কি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

দিল্লীতে কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছেন (২১শে ভাদ্র) বর্তমানে যে ভোটার তালিকা রহিয়াছে, তাহাতে নির্ভর করিয়া ব্যবস্থা পরিষদসমূহে সভ্য নির্বাচন অপেক্ষা নির্বাচনে বিলম্ব করাই ভাল। গত ২৫ বৎসরকাল কংগ্রেস প্রাপ্তবয়স্কমাত্রেরই ভোট প্রদানের অধিকার দাবী করিয়া আসিয়াছেন; কংগ্রেস কোটি কোটি লোককে সে অধিকারে বঞ্চিত করা সমর্থন করিতে পারেন না। বর্তমানে তালিকায় নির্ভর করিয়া নির্বাচন হইবে, সে নির্বাচনে অধিকাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মত প্রতিফলিত হইতে পারিবে না।

শ্রীনগরে মিস্টার আশফ আলী বলিয়াছেন—পুরাতন ভোটার তালিকা বর্জন করা কর্তব্য—সেজন্য যদি নির্বাচন এখনও স্থগিত রাখিতে হয়, তাহাও করা সংগত। বর্তমান নির্বাচন তালিকা অনুসারে ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা একজনও ভোট ব্যবহারের অধিকারী নহেন!

দীর্ঘ ৩ বৎসর পরে নিষেধ নির্দেশমুক্ত হইয়া বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি

দেশের কথা

(১৮ই ভাদ্র—২৪শে ভাদ্র)

নূতন নির্বাচন—সৈনিকের অনাচার—সংবাদ-পরীক্ষা-প্রথা—দুর্ভিক্ষের আশংকা—ভারতের প্রাপ্য।

আগামী নির্বাচন সম্পর্কে নির্দেশ দিয়াছেন—

(১) জিলা কমিটিগুলি যেন নির্বাচন তালিকায় যে সকল ত্রুটি ঘটিয়াছে সে সকলের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

(২) আগামী নির্বাচনের জন্য কাজ করিতে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করেন।

সৈনিকের অনাচার—শিলং হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—আসামের কণ্ট্রোলারের কার্যালয়ের একজন হিসাব পরীক্ষক গত ৩০শে আগস্ট সন্ধ্যার পরে যখন শিলংএ স্বগৃহে যাইতেছিলেন, তখন পথে ২জন উর্দীপরিহিত ভারতীয় সৈনিক ছিল। একজন তাঁহার হাত ধরিয়া তিনি তাহাদিগকে একটি খাশি তরুণী দিতে পারেন কিনা, জিজ্ঞাসা করে এবং তিনি তাহা দিতে পারেন না বলায় তাঁহাকে প্রহার করিতে থাকে। তিনি প্রহারে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পতিত থাকেন এবং কিছুক্ষণ পরে একজন পথিক তাঁহাকে গৃহে লইয়া যান।

শিলংএ ঐরূপ আরও একটি ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সংবাদ পরীক্ষা প্রথা—যুদ্ধের সময়ে সরকার যে সংবাদ পরীক্ষা প্রথা প্রবর্তিত ও পরিচালিত করিয়াছেন, জাপানের পরাভব স্বীকারের সর্তে স্বাক্ষরদানের সংগে সংগে তাহা প্রত্যাহৃত হইল—ভারত সরকার গত ৭ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। যুদ্ধ সম্বন্ধে সংবাদ নির্দেশের কতকগুলি কিন্তু বহাল থাকিবে। প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক সংবাদপত্র পরামর্শদাতা সেগুলির বিষয় সম্পাদকদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন।

যুদ্ধকালে আসামে "প্রেস এডভাইসরী কমিটি" ছিল না—যুদ্ধের পরে কিন্তু তাহা গঠিত হইল।

বেকার ও বেতন—গত ৭ই সেপ্টেম্বর দিল্লী হইতে ভারত সরকার জানাইয়াছেন, জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ হওয়ায় আসামে ও পূর্ব বংগে যাহারা সামরিক কার্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকে আর যুদ্ধকালীন সুবিধা দেওয়া হইবে না। তখন ঐ অঞ্চলে আক্রমণের সম্ভাবনা থাকায় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এ সকল সুবিধা প্রদান আরম্ভ হইয়াছিল। আগামী ১লা অক্টোবর হইতেই সে সব বন্ধ করা হইবে। ভারতীয় সৈনিকরা আর "বাট্টা", সামরিক কর্মচারীরা আর বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য ও বেসামরিক কর্মচারীরা আর "ফিল্ড এলাউএন্স" পাইবেন না। কেবল এখনও আগস্ট মাসে ঘোষিত ডাক প্রভৃতি সম্পর্কিত সুবিধা চলিবে।

বেসামরিকদিগের মধ্যেও বেকারের সংখ্যা যে অত্যন্ত অধিক হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। রেলে সামরিক কাজের জন্য নিযুক্ত প্রায় ২ লক্ষ ৬২ হাজার লোক বেকার হইবে। নিখিল ভারত রেলওয়ে কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিরা আগামী ১৮ই ও ১৯শে সেপ্টেম্বর এই বিষয়ের আলোচনা জন্য রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। প্রকাশ, সমিতি নিম্নলিখিত উপায়সমূহ অবলম্বন করিয়া বেকার সমস্যার উগ্রতা হ্রাসের প্রস্তাব করিবেন—(১) বর্তমানে সপ্তাহে যে ৬৪ ঘণ্টা কাজের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার স্থানে যুদ্ধপূর্ব ৪৮ ঘণ্টা কাজের প্রবর্তন; (২) নূতন রেল লাইন প্রতিষ্ঠা; (৩) মালদি চলাচল ব্যবস্থা রেল বিভাগের অধীন করা; (৪) ছুটির পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এই সকল উপায় অবলম্বিত হইলে বহু লোক আর বেকার হইবে না।

কংগ্রেসের সংবাদ—পুণা হইতে কংগ্রেসের নিখিল ভারত কমিটির সম্পাদক আচার্য কৃপালনী বিবৃতি প্রকাশ করিয়া (৭ই সেপ্টেম্বর) জানাইয়াছেন—এখনও এলাহাবাদে স্বরাজভবন পুলিশ ছাড়িয়া দেয় নাই।

গত ৬ই সেপ্টেম্বর বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে স্থির হইয়াছে—সমিতি বোম্বাই সরকারের নিকট এক লক্ষ ২৫ হাজার টাকার অধিক দাবী করিবেন। যে সকল সম্পত্তি সরকার প্রত্যর্পণ করেন নাই, এই দাবী সেই সকলের জন্য। সে সকলের মধ্যে "এম্বুলেন্সের" মূল্য প্রায় ২৫ হাজার টাকা, আর কংগ্রেসের সম্পত্তির মূল্য প্রায় ৭৫ হাজার টাকা। যে অধিবেশনে এই বিষয় স্থির হয়, তাহাতে কেবল ২ জন সভ্য অনুপস্থিত ছিলেন—(১) মিস্টার ইউসুফ মেহেরআলী (এখনও অসুস্থ), (২) শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস ত্রিকমদাস (এখনও মুক্তি পান নাই)।

বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের উদ্যোগ চলিতেছে।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর ৩ বৎসরেরও অধিককাল পরে শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা দত্তের সভানেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তারিখের পরে ইহাই প্রথম অধিবেশন। এই সময়ের মধ্যে—(১) শৈলজানন্দ সেন, (২) আশুতোষ দাশ, (৩) বিনয়েন্দ্রনাথ পালিত—এই ৩ জন সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে। আর ১০ জন সভ্য এখনও বন্দিদশায় রহিয়াছেন—(১) শ্রীভূপতি মজুমদার, (২) শ্রীরসিকলাল দাশ, (৩)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, (৪) শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, (৫) শ্রীউপেন্দ্রনাথ রায় (পাবনা) (৬) শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (খুলনা), (৭) শ্রীবিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী (ময়মনসিংহ), (৮) শ্রীশ্যামানন্দ সেন (ময়মনসিংহ), (৯) শ্রীপ্রমোদকুমার বসু (যশোহর), (১০) শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেন (হুগলী) এই কয়জন ব্যতীত শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর গতিবিধি এখনও নিয়ন্ত্রিত। অধিবেশনে বন্যা-প্লাবিত স্থানে লোককে সাহায্য দান জন্য অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ করিতে এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

গভর্নরী জনরব—দিল্লী হইতে কয়জন ভারতীয়কে প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগের জনরব প্রচারিত হইয়াছে। প্রথম জনরব, স্যার রামস্বামী মুদেলিয়ারকে মধ্য প্রদেশের ও স্যার আকবর হায়দরীকে উড়িষ্যার গভর্নর করা হইবে। দ্বিতীয় জনরব, স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু মাদ্রাজের গভর্নর হইবেন। হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড বলে—স্যার তেজ বাহাদুর বর্তমান অবস্থায় প্রাদেশিক গভর্নর হইতে সম্মত হইবেন, ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। তবে এইরূপ কয়টি নিয়োগে লোককে ভুলান যে সম্ভব হইলে না, তাহা বলা বাহুল্য।

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা—বাঙলায় একদিকে অনাবৃষ্টিতে শস্যহানি, আর একদিকে বন্যায় শস্যহানি—এতদুভয়ের সঙ্গে আবার বাঙলা হইতে সরকারের ব্যবস্থায় চাউল রপ্তানি এই তিনের সন্ধিক্ষণে পুনরায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা প্রবল হইয়াছে। বিলাতের 'ডেলী ওয়ার্কার' পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, এবার আবার বাঙলায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা আছে—এমন সংবাদ বিলাতে যাইতেছে। তিনি বলেন, "যদি বৃটেন আবার দুর্ভিক্ষের কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চান, তবে শ্রমিক দলের ভারত সচিবকে বাঙলা সরকারকে তাঁহাদিগের নীতির পরিবর্তন করিতে ও লোকমতের মর্যাদা রক্ষা করিতে প্ররোচিত করিতে হইবে। যদি এইভাবে আরও ৩ সপ্তাহ অতিবাহিত হয়, তবে আর প্রতীকারের উপায় থাকিবে না।"

গত ১৮ই ভাদ্রের সংবাদ—ক্ষুধার্ত ও অসমগ্র বস্ত্রে আবৃতদেহ প্রায় ৩ শত পুরুষ, ৪ শত স্ত্রীলোক ও বহু শিশু পূর্ব দিন খাদ্য ও বস্ত্র চাহিতে গ্রাম হইতে কলিকাতায় উপনীত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে ২০ হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী সোনারপুর ও ক্যানিং ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকা হইতে ইহারা কলিকাতায় আসিয়াছিল। তাহাদিগের দেহ শীর্ণ। তাহারা বালিগঞ্জে রাসবিহারী এভিনিউ দিয়া রসা রোড ও হাজরা রোডে যাইয়া ২৪ পরগণা জিলার সদর আলীপুরে সমবেত হয়। তাহারা ২৪ পরগণার জিলা বোর্ডের সহকারী সভাপতির সহিত সাক্ষাৎ করে। তাহাদিগের অভিযোগ সম্বন্ধে তিনি অবহিত হইবেন, জিলা ম্যাজিস্ট্রেট এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে তাহারা ফিরিয়া যায়।

গত দুর্ভিক্ষের সময়ও এইরূপ নিরন্নের অভিযানে দুর্ভিক্ষ সূচিত হইয়াছিল।

ভারত সভার সভাপতি ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাতে প্রধান সচিবকে ও ভারত সচিবকে তার করিয়া অবস্থা জানাইয়াছেন।

প্রকাশ, বাঙলার অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার বাঙলা সরকারকে নির্দেশ দিয়াছেন—বাঙলার জন্য সঞ্চিত চাউল হইতে যেন চাউল রপ্তানি করা না হয়। কারণ, সরকারের হিসাবে এবার বাঙলায় ধানের ফসল শতকরা ২৫ ভাগ কম হইবে। সরকার কলিকাতায় সঞ্চিত চাউলের ও গমের যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে হয়ত কলিকাতায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা ঘটিবে না। কিন্তু কলিকাতাই বাঙলা নহে। বাঙলার নানা স্থানে চাউলের অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা। আর ব্রহ্ম হইতে যদি চাউল আমদানী না হয়, তবে আগামী বর্ষে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা থাকিবে।

সরকারের "অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন" এর আন্দোলন বহু অর্থ ব্যয়েই পর্যবসিত হইয়াছে কিনা, তাহা জানান হয় নাই।

ভারতের প্রাপ্য—যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ বৃটেনকে এত দ্রব্য সরবরাহ করিয়াছে যে, বৃটিশ রাজনীতিকরা বহুবার বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ আর বৃটেনের অধমর্ণ নহে—উত্তমর্ণ হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যেই ভারতের প্রাপ্য টাকা হিসাব অনুসারে শোধ করিতে বৃটেনের আগ্রহের অভাব লক্ষিত হইয়াছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর আমেরিকা হইতে যে সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, বৃটেনের পক্ষে লর্ড কেইনস ও লর্ড হ্যালিফাক্স আমেরিকার অর্থনীতিক কর্তাদিগের সঙ্গে মীমাংসার যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহা শেষ হইলেই নাকি অধমর্ণ বৃটেন ভারতবর্ষের প্রাপ্য টাকা কমাইবার চেষ্টা করিবে। পূর্বে বলা হইয়াছিল, ভারতবর্ষ যে মাল যোগাইয়াছে, তাহার মূল্য অত্যন্ত অধিক ধরিয়া হিসাব করায় ভারতের প্রাপ্যের পরিমাণ অধিক হইয়াছে। এখন নাকি বলা হইবে, ভারতবর্ষ ও বৃটেন যখন একই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তখন বৃটেনের যে ক্ষয় হইয়াছে, তাহার আংশিক বহন করাই ভারতবর্ষের কর্তব্য।

বন্যার পরে—বাঙলার বন্যাপ্লাবিত স্থানসমূহ হইতে বন্যার জল সরিয়া যাইতেছে। লোকের অভাবের অন্ত নাই। এখন অন্নের, বস্ত্রের, ঔষধের, পথ্যের ও অর্থের প্রয়োজন। কংগ্রেস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হইতে সেজন্য আবেদন জানান হইয়াছে ও হইতেছে। সাহায্যদানে আর বিলম্ব ঘটিলে লোকের দুর্দশার সীমা থাকিবে না—লোকক্ষয়ও হইবে।

এবার ইতিমধ্যেই যে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাও ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় জানাইয়াছেন।

শিল্প-বিস্তারে বাধাদান—যে সকল ভারতীয় এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার সুবিধা বুঝিবার জন্য বৃটেন ও মার্কিনে গিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম দাস বিরলা গত ৭ই সেপ্টেম্বর করাচীতে উপনীত হইয়া পরদিন বলিয়াছেন—বিলাতের বস্ত্রোৎপাদকরা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ভারত সরকার তাঁহাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন, তাঁহারা যেন ভারতীয়দিগকে উৎপাদনের হিসাব না দেন। তিনি বলিয়াছেন, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, আজ ভারতবর্ষে জাতীয় সরকারের প্রয়োজন যত অধিক, তত আর কখন অনুভূত হয় নাই। ভারত সরকারই এই সকল ভারতীয়ের য়ুরোপে ও আমেরিকায় যাইয়া এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার সুবিধা ও অসুবিধা বুঝিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বাসা থাকিতে বাবুই ভিজে—বোম্বাই হইতে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় জানাইয়াছেন, (৫ই সেপ্টেম্বর) তিনি দেখিয়াছেন, তথায় কাপড়ের কলের গুদামে স্তূপাকার কাপড় মজুদ রহিয়াছে। অথচ বাঙলার লোক বস্ত্রাভাবে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে। কেন এমন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি কোন মত প্রকাশ করেন নাই; কেবল বলিয়াছেন, ঘটনা এইরূপ।

বিহারে রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার—বিহারে রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডার সম্বন্ধে ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ জানাইয়াছেন, রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য যে বিহারে অর্থ সংগ্রহ করা হইতেছে, তাহা জানিয়া তিনি প্রীত হইয়াছেন। "রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ প্রদেশের বা দেশের ছিলেন না। তিনি সকলের এবং বিহারীরা তাঁহার জন্য অন্য কোন প্রদেশের ভারতবাসীর তুলনায় অল্প গর্বানুভব করেন না। তিনি আশা করেন যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন। বিহারীরা বিহারের বাঙালীদিগের সহিত তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

কাহিনী নয় খবর
ভবঘুরে

দেখবার মত সুন্দর বটে!

পৃথিবীতে এতদিন ধরে মানুষ বহু সুন্দর নয়ন-মন-মুগ্ধকর জিনিস দেখেছে—কিন্তু 'এ্যাটম-বোমা'র বিস্ফোরণ দৃশ্যও যে তেমনই নয়ন-মন-মুগ্ধকর এই রহস্যই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সমর দপ্তর থেকে। অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখক উইলিয়াম লরেন্স, নাগাসাকীতে এ্যাটম-বোমা ফেলবার শুভ মুহূর্তে পর্যবেক্ষণ বিমানে চেপে নিজের চক্ষে এই এ্যাটম-বোমার বিস্ফোরণের ব্যাপারটা দেখে এসে খুব ফলাও করে বর্ণনা দিয়েছেন। নাগাসাকীতে 'এ্যাটম-বোমা' ফেলার ব্যাপারে তিনটি 'সুপার-ফোর্ট্রেস' বিমান অংশ গ্রহণ করেছিল—এর একটি বিমানে ছিল আসল বোমা,



এ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ!

একটি বিমানে ছিল বোমার বিস্ফোরণের শক্তি পরিমাপ করার জন্য বিশেষ কতকগুলি যন্ত্রপাতি আর একটিতে ছিল ফটো তোলার সাজ-সরঞ্জাম ও মালমশলা। মিঃ লরেন্স বলেছেন—"বোমাটা যদিও ফেলা হয় পরিষ্কার দিনের আলোতেই—কিন্তু বোমাটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা আকাশটা নীল-সবুজ মেশানো এক উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেলো—আর মাটিতে বোমার বিস্ফোরণের ফলে—শূন্যে পাঁচ পাঁচবার এমন হাওয়ার ঢেউ উঠলো যে তার ধাক্কায় তাঁর বিমানের লেজ থেকে নাকের ডগাটা পর্যন্ত প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠলো। তারপরেই দেখা গেল একটা বিরাট লাল টকটকে আগুনের গোলা সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়াতে ছড়াতে যেন মাটির গর্ত থেকে উপর দিকে বেগে উঠে আসছে। তারপরেই দেখা গেল, সেটা যেন ধোঁওয়াও নয়, ধুলোও নয়, মেঘও নয়, আগুনও নয়। একটা যেন বিরাট জীবন্ত কিছু, যার নীচের দিকটা, মাঝখানটা বাদামী আর পাঁশুটে রংয়ের, ওপরটা সাদা—সেটা ক্রমশ স্থির হয়ে একটা বিরাট স্তম্ভের মত দেখতে হলো, তারপরই একটা যেন বিরাট ব্যাঙের ছাতা সেই স্তম্ভের মাথায় ফট্ করে ফুটে উঠলো—ধোঁওয়ার ফেনায় ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো। সেটা একবার ওপরে উঠতে লাগলো, একবার নীচে নামতে লাগলো। খানিকক্ষণ এইরকম টানাটানি ওঠাপড়ার পর—সেই ব্যাঙের ছাতার মত বিরাট পদার্থটার মাথাটা যেন তার ডাঁটা থেকে ছিটকে শোঁ শোঁ করে প্রায় ৬০ হাজার ফুট শূন্যে উঠে গেলো। ওদিকে সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই রঙীন স্তম্ভের ওপর ধোঁওয়ার কুণ্ডলীতে যেন আর একটা ব্যাঙের ছাতার মাথা গজাতে থাকলো। এদিকে আগের সেই ছিটকে পড়া ধোঁওয়ার কুণ্ডলীটার চারধার তখন সাদা আর মাঝখানটা লাল টকটকে হয়ে একটা বিরাট ফুলের মতন দেখতে হয়েছে। শেষ যখন আমরা ২০০ মাইল দূর থেকে এই দৃশ্য দেখি তখনও সেটাকে ঐভাবে থাকতে দেখেছি।"

পড়লেন তো আগাগোড়া বর্ণনাটা—লরেন্স সাহেব এমন দৃশ্য দেখে সারকথা যা বলেছেন তা হচ্ছে—"এ্যাটম বোমার বিস্ফোরণ—সে এমন সুন্দর দৃশ্য—যা দেখলে চেয়ে থাকতেই সাধ যায়।" কিন্তু আমরা ভাবছি—এই সুন্দর দৃশ্যের নেপথ্যে—লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ, সহর, প্রাণী যে ধ্বংস হয়ে গেল—সে দৃশ্য লরেন্স সাহেব ও তাঁর জাতভাইদের চেখে ধরা না পড়লেও তাঁদের মনের পটে কি এ্যাটম বোমার ভীষণ রূপটা একবারও ফুটে ওঠেনি? সত্যই তাঁরা সুন্দরের পূজারী, সভ্য ও শিক্ষিত জাতি যে তাতে সন্দেহ নেই।

রুশ-সাম্যবাদের স্বরূপ

রুশ অধিকৃত জার্মানীর বার্লিন শহরে লালফৌজ সাম্যবাদের ধ্বজা তুলেছেন—নাৎসীবাদজনিত লুণ্ঠন, পরস্ব-অপহরণ প্রভৃতির অবসান ঘটাচ্ছেন এরকম খবরই আমরা পেয়ে থাকি—এদেশের সোভিয়েট সুহৃদের পত্র পত্রিকা মারফৎ। কিন্তু রুশদের সঙ্গে যারা মৈত্রীর বন্ধনে বাঁধা—মিত্রপক্ষের অন্যতম পক্ষ সেই আমেরিকান-দের 'টাইম' পত্রিকায় একটি খবর ও ছবি বেরিয়েছে—সেটিতে বলা হয়েছে সোভিয়েট সৈন্যরা যে কোনও জার্মানের পকেটে কয়েকটা রুবল্ ফেলে দিয়ে তার সম্পদটিকে আইনত অধিকার করে নিচ্ছেন। ছবিতে দেখুন—একটি জার্মান মেয়ের সাইকেলটা জোর করে ছিনিয়ে নিতে চাচ্ছেন একজন সোভিয়েট সৈন্য—তবে এটাকে নাকি লুণ্ঠন ও পরস্বাপহরণ বলা চলে না—কারণ সৈন্যটি জার্মান মেয়েটির পকেটে আগেই জোর করে এক মুঠো রুবল্ ফেলে দিয়েছেন। তবে তাতেও জার্মান মেয়েটি কিন্তু এই এক্সপ্রপ্রিয়েশনের ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি, সে তাই তার সাইকেল হাতছাড়া করতে রাজি নয়—এমনই অবুঝ জাতীয়তাবোধ ঐ জার্মান সমাজের। এদেশের সোভিয়েট-সুহৃদদের পকেটে রুশরা রুবল্ জোর করে ঢুকিয়ে দিয়েছেন কিনা জানিনা—তবে আর কেউ যে কিছু দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই—তা না হলে তাঁদের জাতীয়তাবোধটুকু তাঁরা কি অম্নি বিক্রী করেছেন মনে করেন?



পরস্বাপহরণ? লুণ্ঠন? এক্সপ্রপ্রিয়েশন!



ফিল্মের গুদামে আগুন লাগার একটা হিড়িক পড়ে গেছে। গত সপ্তাহে বম্বের প্যারামাউণ্ট অফিসে আগুন লেগে সতের জনের প্রাণহানি হয়। আর এ সপ্তাহে পাওয়া গেল লাহোরে অনুরূপ ভীষণ এক অগ্নিকাণ্ডের খবর। এবারে আগুন লাগে মতিমহল পিকচার্সের অফিসে এবং নিহতের সংখ্যা চৌদ্দজন। এ ছাড়া বছরের মধ্যে প্রায়ই এদিকে সেদিকে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। অসাবধানতাই যে এইসব অগ্নিকাণ্ডের প্রধান কারণ তাতে সন্দেহ নেই। ফিল্মের মত সহজদাহ্য পদার্থ বিষয়ে অসাবধানতা ক্ষমার যোগ্য অপরাধ নয়; এ বিষয়ে কোন সরকারি আইন যে কেন বলবৎ নেই আমরা বুঝতে পারি না। কলকাতাতেও আগে শহরের বুকে অফিসের ভিতরেই ফিল্ম গুদাম রাখার ব্যবস্থা ছিল; ভাগ্যিস বোমার হিড়িক আসে—তাই শহরের বাইরে ফাঁকা জায়গায় ফিল্ম রাখার আইন তৈরী হয়; কিন্তু সে আইনও ভারতরক্ষার অজুহাতে সুতরাং ভারতরক্ষা বিধি উঠে গেলে আবার শহরের মধ্যেই ফিল্ম এনে রাখার অনুমতি পাওয়া যাবে কি-না বলা যায় না। তবে ঐসব অগ্নিকাণ্ডের পর আমাদের বিশ্বাস এ বিষয়ে সরকার কোন-রকম শিথিলতা দেখাবে না। ভারতের আর সমস্ত শহরেও আইন ক'রে ফিল্ম গুদাম শহরের বাইরে স্বতন্ত্র জায়গায় স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া উচিত। ফিল্মের চেয়ে প্রাণের দাম অনেক বেশি এবং যে রেটে তা হানি হ'চ্ছে তা আতঙ্কেরই বিষয়।

মানে না মানা (নিউ সেঞ্চুরী)—কাহিনী ও পরিচালনাঃ শৈলজানন্দ, গীতিকারঃ মোহিনী চৌধুরী; আলোক চিত্র ঃ সুধীর বসু; শব্দ-নিয়ন্ত্রণঃ ইরানী; সুর-যোজনা ঃ শৈলেশ দত্তগুপ্ত; ভূমিকায়ঃ অহীন্দ্র চৌধুরী, জহর গাঙ্গুলী, ফণী রায়, সন্তোষ সিংহ, ধীরাজ ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, রঞ্জিৎ রায়, মলিনা, রেণুকা, সন্ধ্যা, প্রভা, রাজ-লক্ষ্মী, সাবিত্রী, নিভাননী প্রভৃতি।

বর্তমান সময়ে ছবির বিষয়বস্তুতে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসার জন্যে যার নাম সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে তিনি হ'চ্ছেন সাহিত্যিক-পরিচালক শৈলজানন্দ। বহুকাল থেকে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর চলচ্চিত্রজগতে উদয় মাত্র বছর কয়েক আগে 'নন্দিনী' ছবিখানি থেকে এবং 'মানে-না মানা' নিয়ে এ পর্যন্ত পাঁচখানির বেশি ছবি উপহার না দিতে পারলেও শৈলজানন্দ চলচ্চিত্রজগতে একটা প্রেরণায় দাঁড়িয়ে গেছেন। একমাত্র 'অভিনয়-নয়' ছাড়া বাকি ছবিগুলির মধ্য দিয়ে শৈলজানন্দ বাঙলা তথা ভারতীয় চিত্রের রূপই পালটে দিয়েছেন বলা যায়। আমাদের দেশে আমাদের দ্বারাই তৈরি হ'য়েও তাতে স্বদেশী ছাপের যে অভাবটা দেখা যেতো শৈলজানন্দ সে-ই অভাবটা পূরণ ক'রতে সাহায্য ক'রেছেন। শৈলজানন্দের চেয়ে বড় পরিচালক আছেন, তাঁর চেয়েও চলচ্চিত্র ব্যাপারে বিশেষজ্ঞও পাওয়া যাবে অনেক, কিন্তু জনমনের সঙ্গে পরিচয় স্থাপনে তাঁর চেয়ে সাফল্য আজও কেউ লাভ ক'রতে পারেননি। তার কারণ এই যে, দেশের লোক ব'লতে আসলে যাদের বোঝায় সেই দীন দরিদ্র, অশিক্ষিত, চাষী মজুর, কেরানী এদের দিকে নজর রেখে শৈলজানন্দ বিষয়বস্তু খাড়া করেন, এদের কথাই ব্যক্ত করেন যাতে এদের মনের দরজায় তার বক্তব্যের ছাড়পত্র পাওয়া সহজ হয়, এদের বোধশক্তিকে জাগিয়ে তোলার সাফল্য-লাভ করা যায়—অপরপক্ষে অন্যান্য ছোটবড় পরিচালকদের নজর শুধু পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও শিক্ষায় মার্জিত দেশের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে সেই সংখ্যাল্প শ্রেণীর ওপরে নিবদ্ধ থাকে তাই পাশ্চাত্যের অনুকরণে তে... আমাদের ভাল ছবিগুলিও প্রকৃত ... বাসীর অন্তরে কোন সাড়া জাগিয়ে ... পারে না। শৈলজানন্দের কৃতিত্ব এই ... দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর ক... নিয়েও তিনি যে যাদুকরী প্রভাব ... সক্ষম হ'চ্ছেন তার মূলেই হ'... মনের ধারায় লোককে নিয়ে ... না ক'রে লোকের মনের স... চিন্তাধারাকে খাপ খাইয়ে ... আজ এ কথা ...লে অত্যু... সমগ্র ভারতে শৈলজানন্দের ... মণ্ডিত পরিচালক আজও ...

'মানে-না মানা'র কাহি... নন্দ খাঁটি এদেশের আব... দীক্ষায় মানুষ, এদে... অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত... দান ক'রেছেন। চরি... মধ্যে অনেক বাড়াবা... অস্পষ্টতাও আছে, ... নিজের সার্থকতা জা... হয়নি। জীবনের শাশ্বত সমস্যা, আমাদের দারিদ্র্য, আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা, আমাদের আশা ও স্বপ্ন সে সবও কাহিনীর প্রাণ-বস্তু হ'য়ে রয়েছে। গ্রামের পটো নিঃসন্তান দেবী মুখুজ্যে আর স্ত্রীর যত স্নেহ মমতা তার বৈমাত্রেয় ভাই ভূতো আর বোন শিবানীকে নিয়ে। দেবু ধার দেনা ক'রে ভূতোকে কলকাতা থেকে ম্যাট্রিক পাস করালে কিন্তু তার বেশি পারলে না। ভূতো গ্রামেই থাকে ছেলেদের নিয়ে যাত্রা থিয়েটার করে, স্বদেশী দল গড়ে। শেষে চেষ্টা করে দেবু তারিণী খুড়োর সেরেস্তায় ভূতোর চাকরী ক'রে দিলে। সেদিন এক কাণ্ড বাঁধলো; আজীবন তারিণীর কাছে চাকরী ক'রে বাগদী বুড়ো সেদিন এসেছিলো একখানা ছেঁড়া কাপড় চাইতে। তারিণী তাকে গালাগালি দিয়ে ভাগিয়ে দিলে—ক্ষোভে ও দুঃখে বাগদীবুড়ো ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লো। ভূতো তাকে তুলে উঠোনে নিয়ে গিয়ে ফেললে। চিকিৎসার জন্যে টাকা দরকার; খুড়ো দিতে নারাজ, তাই ভূ... ভাঙার সংকল্প ক'রলে। কি... ধরা পড়লো দেবু। দেবুর ... স্বরূপ গহনা দিয়ে তা... দেবুকে উদ্ধার ক'... মাথায় ভূতোকে ক... ভূতো চলে গে... এবং গিয়ে উ... কাছে। স্ত্রীর

কিন্তু রামকৃষ্ণবাবু অবলীলাক্রমে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন। চন্দ্রের ভূমিকায় চারুপ্রকাশ ঘোষের অভিনয় ও রূপসজ্জা উচ্চ প্রশংসার যোগ্য এবং তিনি এই চরিত্রটিকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চ থেকে বিভিন্ন রূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন। অন্যান্য পুরুষ ভূমিকার মধ্যে শ্রীশ (ইন্দুপ্রকাশ ঘোষ) বিপিন (মৃগেন্দ্রমোহন সেন) এবং বিশেষ করে পূর্ণের (দেবনারায়ণ চৌধুরী) নাম উল্লেখযোগ্য। যাঁরা দুরাত্রিই অভিনয় দেখেছেন তাঁরা স্বীকার করবেন দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে বিপিনের অভিনয় অনেক উন্নত হয়েছিল।

স্ত্রীভূমিকায় সব চাইতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন 'নীরবালার' ভূমিকায় অরুন্ধতী গুহ ঠাকুরতা। দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে তাঁর কণ্ঠস্বর অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছিল, কিন্তু প্রথম দশ মিনিট ছাড়া তাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নি। নীরবালার এমন চরিত্রানুগত সাবলীল অভিনয় আমরা কখনও দেখি নি। গানে এবং অভিনয় পটুতায় তিনি কেবলমাত্র বিপিনের নয়, সমস্ত দর্শকের হৃদয়কে জয় করে নিয়েছেন। শৈলবালার ভূমিকায় বিজয়া দাশের অভিনয় অনবদ্য এবং তাঁর বিশুদ্ধ উচ্চারণ যে কোনও অভিনেতা কিম্বা অভিনেত্রীর ঈর্ষার যোগ্য। পুরবালার (কল্যাণী মুখোপাধ্যায়) অভিনয়ও প্রশংসনীয়। নৃপবালার (হেনা চৌধুরী) কথা কম, কিন্তু তাহলেও তাঁর "সলজ্জ হৃদয়ের মধুর ভাবটি" সুন্দর ফুটেছে। জগত্তারিণী তাঁর চার কন্যা এবং অক্ষয় সবাই মিলে সুন্দর একটি পারিবারিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন। আমাদের রঙ্গমঞ্চের দীনতা সত্ত্বেও অক্ষয়ের বৈঠকখানার দৃশ্যটি দেখতে মন্দ হয় নি।

প্রথম রজনীর চাইতে দ্বিতীয় রজনীতে অভিনয় জমতে একটু বেশী সময় লেগেছিল। যবনিকা উঠবার পর দশ পনেরো মিনিট অভিনেতা অভিনেত্রীদের কথা সব জায়গা থেকে ভাল করে শোনা যায় নি। তারজন্য অভিনেতাদের কণ্ঠস্বরের দুর্বলতা, ঠিক সময়ে প্রেক্ষাগৃহের দরজা বন্ধ করতে ঔদাসীন্য, ষ্টেজের সামনে দুটি পাথার বিরূপতা, কে বেশী দায়ী জানি না। অনেকে হয়তো মনে করেন নি যথাসময়ে যবনিকা উঠবে, সেজন্য কিছু দেরী করে এসেছিলেন। পরিশেষে একটি কথা বলবার আছে। 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' এবং তার সংক্ষিপ্ত রূপ চিরকুমার সভার গল্পটি বাঙলা দেশের একটি বিশেষ সময়কে নিয়ে লেখা। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় সাধারণত সেই সব ইঙ্গিত বর্জন করা হয়। কিন্তু তাহলেও কুমার সভার গল্পটি যে আধুনিক পরিবেশের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় এমন কথা বলব না। এই সম্প্রদায় যদি পুনরায় অভিনয় করেন, তবে আমাদের অনুরোধ যেন এটিকে period piece হিসাবে গ্রহণ করেন। আমাদের দেশে এ ধরণের জিনিস নতুন হবে এবং তাতে রসবোধেরও ব্যাঘাত হবে না। এ জিনিস দুঃসাধ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের অভিনয়কুশলতা এবং সূক্ষ্মরুচির যে পরিচয় পেলাম, তাতে তাঁদের এই অনুরোধ করতে সাহসী হচ্ছি।

সাহিত্য-সংবাদ

রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় সুবর্ণ পদক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

পাঁচথুপী বাণী মন্দিরের উদ্যোগে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন হইয়াছে। যে কোন সাহিত্যামোদীই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। এই প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ নির্ধারিত হইয়াছে—"সাহিত্যে আভিজাত্য"। প্রবন্ধটি জমা দিবার শেষ দিন হইতেছে ১৩৫২ সালের ৩০শে আশ্বিন, ইং ১৯৪৫ সালের ১৭ই অক্টোবর। সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারকে "রায় সাহেব রাধাগোবিন্দ রায় সুবর্ণ পদক" পুরস্কার দেওয়া হইবে ও তাহা বাঙলার সকল সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় ইহার বিচারক থাকিবেন এবং তাঁহার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে। পুরস্কার-প্রাপ্ত প্রবন্ধটির সর্বস্বত্ব বাণী মন্দিরের থাকিবে। প্রবন্ধটি ফুলস্কেপ কাগজের ১৫ পৃষ্ঠার বেশী না হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং তাহা শ্রীসুনীলমোহন ঘোষ মৌলিক, সম্পাদক, বাণী মন্দির, পাঁচথুপী পোস্ট, জেলা মুর্শিদাবাদ—এই ঠিকানায় ডাকে রেজিষ্টারীযোগে পাঠাইতে হইবে।

বালী সন্তোষ পাঠাগার

পূর্বাপূর্ব বৎসরের ন্যায় এবারও বালী সন্তোষ পাঠাগারের সভ্যগণ কর্তৃক "জাগরণী পত্রিকার" (হাতে লেখা) শারদীয় সংখ্যা খুব শীঘ্রই বালীতে প্রকাশিত হইবে, যাঁহারা এই সংখ্যায় তাঁহাদের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছবি প্রভৃতি পাঠাইতে চান তাঁহাদিগকে ২৫শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে শ্রীযুত ভরতচন্দ্র নিয়োগী, ৫৬নং প্রাণকৃষ্ণ গঙ্গা রোড, বালী—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। রচনা ও গল্পগুলি ছোট করিয়া লিখিতে অনুরোধ করা হইতেছে। ইতি (স্বাঃ) শ্রীকালীপদ বটব্যাল, প্রচার বিভাগ—সম্পাদক, বালী সন্তোষ পাঠাগার হাওড়া।



রাজভিখারী

জ্যোতির্মালা দেবী

এখানে সে খেতে আসত; আমার বাড়িতে নয়, সমুখের বড়লোকের বাড়িতে। অপরিচিত মুখখানি আমাকে আকর্ষণ করে, কেননা অপরিচয়ের মাধুর্য তার মধ্যে খুব বেশী। সে সাধারণ অথচ অসাধারণ, অপরিচিতা ভিখারিণী, তবু আত্মপরিচয়ের গরিমায় সংহত। এর বেশী ওকে চিনি না। একদিন আর থাকতে পারলাম না। উপর থেকে নেমে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম—অচিরে সে যাবে এই পথেই। ছোট ছোট সবুজ ও সুকোমল তৃণে দুধার ভরে রয়েছে, মাঝখানে লাল কাঁকর বিছানো। হঠাৎ সে এলো; পায়ে—খালি পায়ে কাঁকরের অলক্তক; রক্তও কি ঝরছে? না। কিন্তু মুখ লাল হয়ে উঠল আমাকে দেখে। রোজই বোধ হয় দেখে।

সাবধানে নিশ্বাস ফেলে অগ্রসর হয়ে বললাম, "নাম কি?"

"পর্ণা" সবুজ পাড়ের শাড়ির আঁচল দুলিয়ে তীক্ষ্ন দৃষ্টি হেনে বলল, "কেন?"

"এমনি।"

সতেজে বলল, "না, এমনি কখনো নয়। কু-মতলব আছে তোমার। ভিখারিণীর সঙ্গে সম্বন্ধ কিসের যে, রাস্তায় নেমে এসে কথা বলছ? যুবতী মেয়ের এটা অপমান নয়?"

শুনে আমার মুখ কতটা মলিন হলো, সে চেয়ে দেখল না। দ্রুত পায়ে হেঁটে ওই ফটকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো। ভাবলাম, এটা তো আমারও অপমান! কিন্তু মনে যত কাঁটা বেঁধে, চোখে যতই ঘুম হয় না, ততই বুঝি যে পর্ণা—পর্ণা—পর্ণা আমায় যাদু করেছে!

তবু মুখে স্বীকার করা অসম্ভব। সে রাস্তা দিয়ে চলে যায়, পারলে বোধ হয় এই পথে আর হাঁটত না, এতই উদ্ধত ওর ভঙ্গি। দেখে দেখে ওকে অপমান করবার ইচ্ছা আমার বেড়ে যায়, মনে হয় উপরের জানলা থেকে সিকি-দুয়ানি ফেলে দিই—কুড়িয়ে নিক! আমার কত যে আছে, ও কি জানে? ওই বাড়িতে কেন খেতে যাবে? ওরা ওর কে?

"রহস্য আছে কি, পর্ণা?" উপর থেকে একদিন চেঁচিয়ে বললাম। "আমিও তো বড়লোক, আমার দিকে তো একবার চেয়েও দেখো না, ওরাই কি শুধু ভিক্ষা দিতে জানে?"

থমকে দাঁড়ালো। এত অপমান সত্যিই হয়তো আর কেউ করেনি, আমার গায়ের জ্বালা বুঝবার শক্তি আছে ওর। বুঝতে পারল। চোখের কোল সজল হয়ে উঠল, আত্মসংবরণ করে মৌন নত মুখে ধীর পদে চলে গেলো আজ। আশ্চর্য হলাম।

সামনের দোকানে একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। ত্রস্তভাবে উঠে এসে বললেন, "মশায়, এসব আপনার কি রকম কথা? ভদ্রমহিলা। তার উপর অল্পবয়সী মেয়ে! ভিক্ষাব্রত নিয়েছেন সত্য। কিন্তু ওবাড়ি তো ওঁরই। আপনি কি এ পল্লীতে নতুন এসেছেন আজ? পর্ণা দেবী বুড়ো কর্তার একমাত্র মেয়ে, ভাইয়েরা বিলাসে মগ্ন, ভাইয়ের বউয়েরা—ওই তো দেখছেন এক একটি পরী! তাই বৃদ্ধ পিতা মেয়ের নামেই বিষয়সম্পত্তি রেখেছেন পাছে সব উড়িয়ে দেয় প্রজাপতির পাখার ফুৎকার।"... স্তম্ভিত হলাম। তবু বাধা দিয়ে ব্যঙ্গ করে বললাম, "তাই বুঝি ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করেছেন?"

"আজ্ঞে হাঁ, তাই।" ভদ্রলোক অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, "পর্ণাকে আমরা বুঝি না। কিন্তু আপনি বুঝি আমাদের চেয়েও অধম। আদর্শবাদিনীকে অন্তত শ্রদ্ধা করি আমরা, আপনার তাও নেই।"

"না, নেই। একশোবার বলছি—নেই। মনে করেছেন আমি পর্ণার সম্বন্ধে কিছুই জানি না? সাধারণ সে নয়—"

"নিশ্চয় না। দেশের জন্য—ওই যে কি এক উদ্দেশ্য, ভাইবোন সকলকে ব্রত গ্রহণ করাবে, ভিক্ষাব্রত! নিজে যেচে তাই আগে ভিখারিনী সেজেছে; পা ছিঁড়ে যায় মশাই, কাঁকরের আঘাতে, দুপুর রোদে তেতে মুখ লাল হয়ে ওঠে, দারিদ্র্য বরণ করেছে! বাপ কাঁদে, মেয়ে জেদী, কথা শোনে না মোটেই। আমরা ভাবি কি হবে এসবে? মনে মনে হাসিও। কিন্তু তবু এই দেখুন, এই তো এত বড়লোক আপনি, আপনি এখন—"

"কাঁদছি ওর ছেলে মানুষিতে।" বলে সরে গেলাম ওখান থেকে। এপাড়া আমার কাছে নতুন নয়, কিন্তু আমি সম্প্রতি এখানে নতুন এসেছি। রাজৈশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছি, রাজর্ষি জনককে চিনি, বুঝতেও পারি রামের ত্যাগ, সীতার দারিদ্র্য, কেননা ওরা আমারই মতন রাজা। কিন্তু পর্ণার এই ত্যাগবিলাস আমার ধারণায় আসে না।

আমার জানালার ওপারে শিরীষ গাছগুলি নিত্যই ফুলের প্রদীপ তুলে ধরে। ভোমরা যেন তার অভিজাত অভ্যাগত; কালো দেহ ফুলের বুকে ডুবিয়ে সামান্য একটু মধু সঞ্চয় করবার জন্য অঘটন ঘটিয়ে যায়, ফুলশিশু থেকে পরিণত ফলের জন্ম—হয়। অবাক হয়ে সেইদিকে তাকিয়ে ভোমরার কাণ্ড দেখছিলাম, আর ভাবছিলাম ওকে এই বুদ্ধি দিলে কে? প্রকৃতি, না ঈশ্বর? কিন্তু প্রকৃতি কি, ঈশ্বরই বা কে?

ভাবনা হয়তো শীঘ্র শেষ হতো না...... সিঁড়িতে মৃদু পদ শব্দ শুনে ফিরে তাকালাম বলেই শেষ হলো...কেউ উঠে আসছে, ইতস্তত করতে করতেই আসছে। তারপর আমার ঘরের দোরগোড়ায় এসে পদধ্বনি স্থির হলো। তাকিয়ে ছিলাম, দুই জোড়া চোখের শুভদৃষ্টি দুইজনের দুরকম তীব্রতা ও আবেগ নিয়ে পরস্পরকে যেন ব্যঙ্গ করতে লাগলো।

খানিক পরে পর্ণা দুই করতল একত্র করে আমার সামনে দাঁড়ালো। বললাম, "কি?"

"ভিক্ষা চাই। আমি ভিখারিনী।"

রুদ্ধ নিঃশ্বাসটি ধীরে ধীরে মোচন করে বললাম, "কত চাই?"

সে উত্তর দিলো না। তখন ঘরে গিয়ে আলমারি খুলে নগদ যা ছিলো সবই নিয়ে এলাম। দিলাম ওর হাতে ঢেলে। পর্ণা সমস্তই আমার পায়ের উপর রেখে আবার করজোড়ে দাঁড়ালো।

বললাম, "ঠাট্টা করছ?"

"না।"

"তবে ফিরিয়ে দিলে কেন?"

জবাব দিলো না। অধীর হয়ে আবার বললাম, "বুঝিয়ে বলো, পর্ণা। আমি তোমায় মোটে বুঝতে পারি না।"

চোখ তুলে পর্ণা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, "ভিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। তাই এসেছি।"

"দিলাম তো! কিন্তু তুমি নিলে না।"

পর্ণা চুপ।

অনেক ভেবে বললাম, "কম হয়েছে?" আরো চাও, কত দেবো?"

"সব।"

নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম পর্ণা ধীরে ফিরে চললো। চাকর দরোয়ান সবাই উপরে উঠে এসেছে। ভিখারিণী কারো দিকে আর তাকালো না। যেমন এসেছিল তেমনিই ফিরে গেলো। প্রত্যাখ্যানের বেদনা বাজতে লাগল শুধু আমারই বুকে।

কত দিন, কত রাত বসে বসে ভাবলাম—সে সব চায়! কিন্তু সব আমি দিই কি করে?

অন্তর বললো, ওকে বিশ্বাস করো।

তবু সাহস হয় না। বুঝতে পারি না এ রকম দেশসেবা জনসেবা; মন বিদোহী হয়ে ওঠে।

আমার ভালবাসা সে পায়ে দলিত করে, চূর্ণ করে চলে গেলো—দেশের জন্য ভিক্ষাই শুধু চায়? দেশ আমার কী?

আর একদিন পথের প্রান্তে দাঁড়ালাম। সেদিন সে বড় দেরী করে এসেছিল। আমাকে দেখে বললো, "আজ কি আপনিই আমাকে ব্যঙ্গ করতে এলেন?"

"সেদিন ভিক্ষা চেয়ে কি ব্যঙ্গই করেছিলে আমায়?"

"নিশ্চয়।"

"কেন?"

পর্ণা শুধু হাসল। আমি ওর হাসিকে নির্মম দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে বললাম, "কী অসামান্যই ভাবো নিজেকে; না?"

সত্যই মুখের হাসি ম্লান হল ওর। লক্ষ্য করলাম কণ্ঠ একটু কেঁপে উঠল কথা বলতে। উত্তর দিলো "আমি সামান্য মেয়ের মতোই আপনার কাছে ভিক্ষা চাই আজও!"

"কেন? আমি তোমার কে? আর কারো কাছে তো এমন করে চাও না, পর্ণা!"

"বাবার কাছে চাই।"

"ওই সামনের দোকানে একজন ভদ্রলোক বসে থাকেন। তাঁর কাছেও চেয়েছ কি?"

"না।" ম্লানতর হলো ওর মুখ, অপমানে।

"শুধু আমার কাছেই চাও? কেন?"

"আপনি—আপনি যে আমায় ডেকেছেন।"

"আর কেউ কখনো ডাকেনি?"

"না। সবাই দূরে থেকে শ্রদ্ধা করে। কাছে কেউ ডাকে না।"

আমার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হলো। মনে মনে বললাম, তাই তুমি এসেছ? কতবার কত অপমান করলাম। তবু? হায় অভিমানিনি, কার জন্য অভিমানও ত্যাগ করেছ? আমি তো তোমার আদর্শকে চিনি না, প্রাণের ডাকেই ডেকেছি। সেকথা বুঝবে কবে?

হঠাৎ সচকিত হয়ে দেখলাম আমাকে নীরব দেখে সে চলে গেলো। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে রাস্তায়? ভিড় জমে উঠেছে।



সে ভীতভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলো...

সেইদিন থেকে পাড়ায় কানাঘুষো সুরু হলো পর্ণা আর সুব্রত প্রেমে পড়েছে। কিন্তু কে জানে, এ কোন্ দেশী প্রেম? কেউ কাউকে ছোঁয় না, কেবল দেখা হলেই অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। দুজনেই জানে দুইজনের মাঝে দুস্তর ব্যবধান। সেই ব্যবধান অতিক্রম করা মানুষের সাধ্য নয়। ওদের সমাজ আলাদা। পর্ণার বাবা সশঙ্কিত হয়ে উঠেছেন পল্লীমণ্ডলের রটনাতে।

সবই বুঝলাম। সবই শুনলাম।

অতি দূরে ছিলাম, সেই আমাকে পর্ণা এখন কাছাকাছি এনে ধ্যান করে, ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারি। কিন্তু কর্তব্য আমার স্থির হয় না কিছুতেই। আমি লক্ষপতি পিতার এক পুত্র বটে, কিন্তু সম্পত্তি আমার একার নয়। পর্ণা সব চায়।

যদি বিয়ে হতো, ওকে ঘরে এনে দুদিনেই আবার ভুলে যেতাম। বিয়ে হয় না, তবু এই গরবিণী সব চায়! এখন আর আঘাতও করে না, দৃষ্টিতে দুঃখের দৈন্য ফুটিয়ে তোলে। ওর দিকে তাকাতে আমার ভয় হয়! আমি জানি, সম্ভব হলে, ও এ-পাড়া ছেড়ে চলে যেতো।

তাই কেন গেলে না পর্ণা? নিঃসীম অন্ধকারে তোমার দিকে তাকিয়ে আমার চোখের জল বাধা মানে না কিছুতেই। তোমার যে-মুখ দেখি, জানি সে-মুখ স্বপনমুখ; কিন্তু তোমার সত্য মুখের চেয়ে সেই মুখই আমার কাছে সত্য। কলায়-সন্ধানী চক্রবাকীর মতো তুমি ছুটে চলেছ—কোন্ দিগন্তে, তা তুমিই জানো! কিন্তু হৃদয় তোমার অদৃশ্য সূত্রধারের মতন টানছে তোমার পথিক বরকে। পর্ণা, সেই পান্থ কি আমিই?........

কিন্তু আমার পিছনে রয়েছে গৃহ। আছে অনেক পোষ্য। কত সুন্দরী আসে, তাদের কথাও সুন্দর, নয়নও মনোহর। পথচারিণী পর্ণাকে কি আমি রাত্রিদিনই মনে মনে জপ করি? না। সুতরাং দিনের মধ্যে আমার কতবার মানসিক অধঃপতন হয়! একটি মেয়ে, সতী, তার সঙ্গে আমার বিয়ের কথাবার্তা প্রায় ঠিক। উপযুক্ত গৃহিণী হবে সে; হবে আমার সন্তানদের জননী।

তবু, না-পড়া একখানা কাব্যের মতন পর্ণাকে আমি চেয়ে দেখি। পর্ণা আমার আকর্ষণ, সতী আমার প্রয়োজন। দুজনে কেন একজন হলো না? ভগবান যে এমন বিচিত্র পরিহাস করেছেন আমার সঙ্গে, তার জন্য কি আমিই দায়ী!

ধুমধাম করে একদিন আমার বিয়ে হয়ে



ভিখারিণী দেবীর দিকে হাত তুলে বললো, 'তুমি'!

গেলো। সমস্ত দিইনি বলে, সে আমার অল্পটুকুও নিলো না, সেই পর্ণাকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। আশ্চর্য কথা, সে এসেছিল। মান নাই, অভিমান নাই, হৃদয়হীন কৃপণতার সঙ্গে আমায় অভিনন্দন জানালো শুধু। বিষাক্ত বাষ্পের মতো নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "সতীকেই কি সব দেবো?"

"কি বলছেন?" খানিকক্ষণ বুঝতে পারল না আমার কথা। আমার চোখ ধক্ করে জ্বলে উঠে ওকে বুঝিয়ে দিলো, পুরোণো স্মৃতিতে ঈষৎ আরক্তও হয়ে উঠল ওর মুখ।

তারপর চোখ নামিয়ে আস্তে বললে, "না, আপনি কাউকেই পারবেন না সব দিতে।"

"স্ত্রীকেও পারব না দিতে?"

"স্ত্রী? অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে যে চিনল না, স্ত্রী তো তার কাছে দুইদিনের খেলনা মাত্র।"

"কি বলছ পর্ণা? যা-তা বলো না।"

"সুব্রতবাবু, আজ আপনি আর আমি দুজনেই নিরাপদ। আজ একবার বলুন দেখি, 'পর্ণা! আমি তোমাকে সব দিলাম'।"

"মিথ্যা কথা আমি পারি না বলতে—"

বাধা দিয়ে সে বললে, "তবু মিথ্যে করেই বলুন। আপনি তো জানেন সতী আপনাকে ছাড়বে না। ভয় কি?"

"ভয়?" বলে হাসলাম। হঠাৎ কী যে মনে হলো! ওর হাত দুখানি হাতে চেপে ধরে উদ্‌ভ্রান্তের মতন বললাম, "দেবো, দেবো সব, যদি তুমি নিজেকে আমায় দাও।"

সে ভীতভাবে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলো, "আমি—আমি তো কখনো নিজের জন্য চাইনি তোমাকে! তুমি জানো—"

"বলো পর্ণা, বলো। অনুরোধ করছি তোমায়, বলো! কেন এতদিন বলোনি কী চেয়েছ সত্য করে?"

"তোমাকেই চেয়েছি। তবে, নিজের জন্য নয়। ভিক্ষা দিতে তোমার সাহস হয়েছিল, আমাকে ভিখারিণী ভেবে কাছে ডেকেছিলে, কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝিয়ে দিলাম—বুঝিয়ে দিলাম—" বলতে বলতে পর্ণা চৌকাঠ পার হয়ে সিঁড়ির উপরে দাঁড়ালো। বললো, "সুব্রত, এ তো রোমান্স নয়, সত্য। তোমার হৃদয় আমাকে ডেকেছিল। কেন জানো? এই হৃদয়ে ভারতকে মাতারূপে দেখেছি। একদিন—দশবছর বয়স তখন—মাত্র দশবছর; গ্রামান্তরে দুর্গাপূজায় নিমন্ত্রিত বালিকা আমি। সকলের সঙ্গে মিশে ঠাকুরদালানে ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ শুনলাম কে যেন কাঁদছে, 'মা!' আশ্চর্য হয়ে দেখলাম এক ভিখারিণী, জীর্ণ চীর পরা, মলিন বর্ণ, চুলে একটু তেল নেই। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কাকে ডাকছো?' বললো, 'মাকে ডাকছি।'...'তোমার মা কই?' ভিখারিণী দেবীর দিকে হাত তুলে বললো, 'তুমি।'

সুব্রত, সে মা বললো আমাকে, দেখালো দেবীকে। এক মুহূর্তে আমার দশবছরের জীবন মরে গিয়ে একশো বছর বয়স হলো মনের ভিতরে। তারপরে কত ভিখারীর নগ্ন-মূর্তি দেখেছি, কত উলঙ্গিনী ভারতের শ্মশানে-শ্মশানে ঘোরে! ক্রমে আরো বড়ো হলাম মাথায়। শুনলাম, বছর-বছর শুনলাম দুর্গাস্তোত্র—'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'—অর্থ বুঝলাম হৃদয়ের গভীরতম স্তরে : যে দেবী রয়েছে সর্বদেশে,

সব চিত্তে জননী যে জন—
জাগো জাগো সে-চিত্তহারিনি!...

এমনি করে মাকে খুঁজতে শিখলাম—" হাঁটু গেড়ে মেজের মাটির উপর বসে পর্ণা বললো, "ভূমি স্পর্শ করো। এই দেখো—'মা'। অনুভব করেছি, এই মা-ই জন্ম নিলেন আমার মানবী মায়ের রূপে। আমি জন্ম নিলাম তাঁর থেকে। মাটি থেকে ফল, ফল থেকে আবার মাটি। মাটিতেই আমরা দেবীর প্রতিমা গড়ি। কিন্তু বিশেষ করে দুর্গা কেন? দুর্গা কী? এই যে মাটি—এর কি কোনো অনন্ত সত্য আছে, সুব্রত? যদি থাকে, দুর্গা তিনিই, দুর্গা সেই মায়ের চিন্ময় রূপ যিনি পায়ের নীচে মৃত্তিকা, চোখের সামনে সাগর তটিনী, পার্শ্বে ভূধর, মাথার উপরে অনন্ত আকাশ। আমার হৃদয়ে তিনিই মা, তিনিই মা—"

নিমেষহীন চোখে দেখতে লাগলাম পর্ণাকে, মনে হলো অন্ধকার কুহেলী কেটে যাবেই। বললাম "তুমি ভিক্ষাব্রত নিয়েছ কেন?"

মাথা নেড়ে পর্ণা অস্বীকার করলে, "তুমিই প্রথম আমাকে ভিখারিণী বলেছ। আমি তো বলিনি!"

"কিন্তু—"

"না। ওসব তোমাদের ভুল ধারনা। সমস্তই আমার। আমি কিছুই ত্যাগ করিনি, বাবাকে জিজ্ঞেস কোরো। কিন্তু—যে শ্মশানচারিণীরূপে মা আমাকে 'মেয়ে' বলে ডেকেছিলেন, তার—তার ধনেরই একজন রক্ষক আমি—"

"পর্ণা আমার প্রিয়া!" অপরিসীম আবেগে হাত বাড়িয়ে ওকে আকর্ষণ করলাম বুকের উপর। সে বাধা দিতেই বললাম, "কেন অমন করছ? তুমি কি জানো না সতী এখনো আমার ঘরে আসেনি, এখনো কি ত্যাগ করবে আমাকে?"

"ত্যাগ আমার ব্রত নয়, কিন্তু—"

"বিয়ের লগ্ন এখনো সামনে। আমাকে গ্রহণ করো, পর্ণা!"

"অনুরোধ রাখো, সতীকেই বিয়ে করো।"

"না, কিন্তু তার জন্য আমার চেয়েও

উপযুক্ত বর আছে—আমারই বন্ধু। সতী তাকে পেলে সৌভাগ্য বলে মনে করবে।... চুপ করো। আমি জানি তুমি ভয় করছ সমাজকে। পর্ণা, যিনি সেই সব চিত্তের জননী, তাঁকে সাক্ষী রেখে আমি তোমাকে বিয়ে করব আজই—এই লগ্নেই। আপত্তি কোরো না, আপত্তি শুনবো না।"

"বাবা?"

"দুঃখিত হবেন। কিন্তু তুমিই তো বলেছ—মাটির অনন্ত সত্য হচ্ছেন 'মা'। তিনি সাক্ষী, তুমি আমার স্ত্রী।"

বিপ্লবের ভূকম্পনে কেঁপে উঠল সেই রাতটা। বিয়ে আমরা করবই ঠিক করেছিলাম—করলাম। ব্রাহ্মণ পুরোহিত সকলেই সরে দাঁড়ালো। ঠোঁট বাঁকা হয়ে উঠল আত্মীয়স্বজনের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বঙ্কিম দৃষ্টিতে দেখল সতী আর সেই পরম বন্ধু, সতীকে যার হাতে সমর্পণ করে আগে নিশ্চিন্ত হলাম। মুহূর্তের জন্যও তারা সমাজ ভুলে আমাদের সাহায্য করল না। কিন্তু দেবী স্থির সাক্ষী রইলেন। আমিই মন্ত্র পড়লাম, আমিই গ্রহণ করলাম আমার স্ত্রীকে। বিরাট অট্টালিকার লোকজন চিত্রার্পিতের মতো এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখল। অদ্ভুত পরিণয়ের শেষ-অঙ্কে পর্ণার বাবা ছুটে এলেন খবর পেয়ে। চেঁচিয়ে বললেন, "সুব্রত, পাণিগ্রহণ একেই বলে। আমি জানি। কিন্তু সাংসারিক সুখের আশা কোরো না। যদি পর্ণাকে তুমি স্পর্শ না করতে, আমি তাকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যেতাম। যে মুহূর্তে ছুঁয়েছ, সেই মুহূর্ত থেকে এই নারী তোমার—আমি বাপ হয়ে সত্য উচ্চারণ করলাম। কিন্তু চেয়ে দেখো—" বলে আঙুল তুলে তিনি শত বিদ্রূপবাঁকা ক্রুদ্ধ অধর ও চোখ দেখালেন।

তারপর—কত মধুরজনীতে ধীরে ধীরে, ধীরে ধীরে পর্ণার হৃদয়ের পরিচয় পেলাম। তার কথা এজগতের নয়, তার অনুভূত সত্য কোথাও প্রচারিত হয়নি। জীর্ণচীরধারিণী মা এসে আপন সন্তানের কাছে আপন ধনের দাবী জানাচ্ছেন—এ কেমন দুর্গাপুজো?

ওকে স্ত্রীরূপে না পেলে কে-ই বা একথা বুঝত! আমি তো সহজে বুঝিনি। কেবল চেয়েছি—কেবলই চেয়েছি ওর সান্নিধ্য। ভোরে উঠে ভেবেছি পর্ণা আগে আমার পুজো করুক। কেন সে যাবে সূর্যদর্শন করতে? বাধা দিয়েছি।

"অত বড়ো বড়ো কথা বলো না, পর্ণা। তুমি জানো আমি তোমার স্বামী। মোটেই পাওয়া হয়নি তোমাকে। তোমার মন পড়ে রয়েছে সেই বৈদিক যুগে—"

পর্ণা হেসে বলত, "সে সময়েই যে মা জীবিত ছিলেন। এখন দেখো, তিনি শুধু প্রতিমা। গার্গী মৈত্রেয়ী, মেয়েদের বাণীরূপে তিনি কথা বলেছেন। পুরুষে হলেন তিনি ঋষি। এখন কেন বেদ তৈরী হয় না? গান লিখি আমরা ভঙ্গুর মধুর। অথচ জানো তো, এই মধুর কবি, আজকের এই ভঙ্গুর গায়কেরাই আগামীকাল হতে পারবে গত কালের উদাত্ত বেদবেত্তা, শুধু যদি—"

"কী?"

কিন্তু পর্ণা আর কিছু বলল না। হয়তো ভেবেছিল বলবার সময় আছে অনেক। কে জানত!

কেউ জানত না যে আমি সম্পত্তিতে অধিকার খুইয়েছি। যারা জানত তারা একদিন নিভৃতে গোপনে ডাকল আমায়।

তারপর মাসের পর মাস ছিন্নভিন্ন হতে লাগলাম মনে মনে। বুঝেছি, হয় পর্ণাকে বলতে হবে, 'তুমি যাও!'...নতুবা—

নিজের স্ত্রীকে কেউ বলতে পারে না যে 'তুমি যাও'—অন্তত মানুষ কেউ নয়। আমি শুধু ওকে বললাম, "পর্ণা, আজ আমি ভিখারী।"

বিস্মিত হয়ে শুধালো, "কেন?"

"বাবার উইলের জন্য।"

"আমাকে বিয়ে করাটা অপরাধ হয়েছে?"

"তাঁদের মতে—নিশ্চয়ই।"

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে পর্ণা বললে, "এ আমি জানতাম।"

"শ্রীরামচন্দ্র নই যে লক্ষ্মণকে দিয়ে বনবাসে পাঠাবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

এর পরে কলকাতার উদ্যানে উদ্যানে স্বর্গরচনা করলাম আমরা ঝোপেঝাড়ে। সত্য করেই বলব, আমার মধ্যে কেমন একটা পূর্বধারণা হয়েছিল যে পর্ণা আমার দুই-দিনের সাথী মাত্র। এই রাজৈশ্বর্য চির-দিনের। সুতরাং ঈষৎ দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও প্রাণপণ করতাম ওর মন পেতে। ওর কিন্তু সেই চেষ্টাই ছিল না।

ভোরবেলা বাগানে চলে যেতাম। পর্ণা খুঁজে বেড়ায় কোথায় রয়েছে ভাঙা বেঞ্চ, পরিত্যক্ত পুকুরের পুরানো জীর্ণ ঘাট আর ছায়াসমাচ্ছন্ন আবিষ্ট অনাদৃত ঝোপ। সেখানেই সে বসে।

একটু পরেই পিছনে পিছনে আমি আসি। একদিন পর্ণা ফিরে হেসে বললো, "কেন এলে? ওখানে বেশ তো গল্প করছিলে।"

"তুমি ভাবছিলে কী?"

সামনের দিকে তাকিয়ে বললো, "ভাবিনি কিছু। দেখছিলাম।"

পুরানো এই পুকুর। জল অনেক নীচে। উঁচু পাড় থেকে ঘাট একেবারে জলের তলা অবধি নেমে গেছে। পর্ণা শেষ ধাপে নেমে গেলো। জলে আঙুল ডুবিয়ে ঈষৎ ঢেউ তুলে চেয়ে রইল দুটি ফুলের দিকে। ফুল দুটো কুমুদ।

বললাম, "তুলে এনে দেবো?"

অকারণে শিউরে উঠে সে বললো, "না।"

"অমন করলে কেন?"

সেকথার জবাব না দিয়ে পর্ণা বললে, "ওদের রঙ দেখেছ?"

"তাই তো! এতক্ষণ খেয়াল করিনি। দুটো দেখছি দুই রঙের, একটা লাল অন্যটি সাদা।"

"প্রকৃতির ইঙ্গিত।"

কথাগুলো কিছুই নয়। কিন্তু ওর সুরে মনে মনে বিস্মিত হলাম।

পর্ণা আবার বললে, "দেখো, ওই দুই ফুলের সংমিশ্রণে আরো কি একটি নতুন ফুল হবে?"

"আমি নীল কুমুদও তো দেখেছি, পর্ণা। কোনো কোনো দেশের গ্রামে তাকে বলে দেবতার ফুল। তাঁর রোষের ভয়ে কেউ ছেঁড়ে না, জলেই ফোটে, জলেই শুকিয়ে ঝরে যায়—"

"আমিও তাই বলছি। ছিঁড়তে নেই, তুলতে নেই, বিচিত্রকে বিচিত্ররূপেই মায়ের বুকে থাকতে দিও। মা কে? ছেলেবেলায় দুর্গারূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন বটে, কিন্তু এখন দেখছি প্রতি তৃণে তাঁর প্রকাশ প্রতি ফুলে তাঁর হাসি। মা সব, মা সমুদয়। আমাদের বিয়ে কেন হলো? মার বুকে এমনি দুই রঙের দুটি ফুল হয়ে থাকলেই ভালো হতো। দেশ আমাদের মা। অথচ মা তার চেয়েও বেশী। ওই দেখো, ওরা ওদের প্রকৃতি মার রূপের রক্ষক। মানুষ কেন—মানুষ কেন—আত্মজননীর কিছুরই—কোনো সত্যেরই কোনো সৌন্দর্যেরই, কোনো ঐশ্বর্যেরই রক্ষক হতে জানে না? কেন কেবলই নিজের ভোগে লাগায়? ঐ ফুল দুইটি কত আনন্দ, কত ধ্যান, কত যে রস পরিবেশন করল আমাদের! আমরা—তুমি আর আমি কি করলাম? এই বিচিত্র ধরণীরূপিণী দেশ, দেশের নরনারীরূপিণী দেশ, আমাদের দুয়ারে অতিথি হলো। চৈতন্য জাগে যাদের, সুব্রত! মা তাদেরই। তাদেরই দায়িত্ব মায়ের কাছে। দুর্গারূপে মা—এই আমার জননী—" বলে সে যেন কোন্ অদৃশ্যচারিণীকে নির্দেশ করল। একটু স্তব্ধ থেকে তারপর বললো, "দুর্গারূপে তিনি আমায় জাগালেন। বললেন, 'মা, আমার সকলই জীর্ণ, তোর কত যে ধন!' তাই ভিখারিণী হয়েছিলাম। তুমি—শুধু তুমিই ভিখারিণীকে ডাকলে। স্ত্রীরূপে আমি কি তোমায় জাগাতে পেরেছি? না কি কেবলই ঝ'রে পড়া আমাদের নিয়তি?" সাদা-লাল কুমুদ দুইটির দিকে চেয়ে সে চুপ করলো।

অনেকক্ষণ পরে আমি বললাম, "আমাকে কি করতে বলো?"

"ত্যাগ করে গ্রহণ করো।"

নিঃশ্বাসটি রুদ্ধ করে বললাম, "কি বলছ?"

চকিতে আমার চোখে তাকিয়ে পর্ণা বললে, "ভালো করে চেয়ে দেখেছ আমাকে?"

কতক্ষণ যে অসাড় হয়ে রইল এই পোড়া চোখ দুইটি ওরই মুখের উপর! তারপর হঠাৎ অসীম আবেগে ওর দুই হাত নিপীড়ন করে বললাম, "সত্যি?"

"সত্যি।"

যা বলতে যাচ্ছিলাম বাধা দিয়ে তা' থামিয়ে পর্ণা বললে, "কিন্তু তোমার জীবনে আমি আর থাকব না, আমার—আমার ছেলে, যে আমার গর্ভে আছে, তাকে তুমি পাবে না—"

"কেন—কেন পর্ণা? কেন তুমি আমায়—" নিরতিশয় উত্তেজনার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

"কারণ ওই তোমার নিয়তি। শান্ত হও। লোকে কি বলবে? অমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না। বোসো।" হাত ধরে টেনে বসালো। বললো, "বিচিত্র রঙের বিচিত্র দুই ফুল সৃষ্টি করাই প্রকৃতির ইচ্ছা। সে ইচ্ছা মেনে আমি ফিরে চললাম পিতার ঘরে—আজই, এখনই! সুব্রত, আমি জানি মনে মনে তুমি বিরক্ত হয়ে উঠেছ আমাকে নিয়ে।"

লজ্জায় নতশির হলাম। কথা যে সত্য!

"তাই বলেছিলাম, প্রকৃতির ইঙ্গিত...... ওরে তোরা ফিরে যা, যে যার মধ্যে ফিরে যা......অবশিষ্ট ভালোবাসাটুকু যদি খুন করতে না চাও, আমায় ছেড়ে চলে যাও তোমার রঙের মধ্যে। ধনৈশ্বর্য তোমার জন্য প্রতীক্ষা করছে সুব্রত, তুমি লাল কুমুদ। আমি ওটি—ওই বর্ণহীনা। আমার ধন নাই, ঐশ্বর্য নাই, মান-অভিমানও রাখছি না মনে। প্রকৃতির ইচ্ছা যে আমি এই শ্বেতবর্ণাই থাকি—"

"কিন্তু—কিন্তু" রাগে অধীর হয়ে বললাম, "আমার ছেলে? আইনের জোরে আমি তোমায় শাসন করব, পর্ণা। স্ত্রী নও যদি বলো, তবু তুমি—তবু তুমি আমার—

"ভোগ্যা? না। যাও, এখনই চলে যাও। গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমি অন্য পথে ফিরলুম।"

"ফেরো, ফেরো এইদিকে। পর্ণা, আমি তোমার স্বামী!"

"না, সুব্রত। বর্ণের বাঞ্ছিত তুমি, তোমার অতুল ঐশ্বর্যই তোমার আসল বর্ণ, তুমি অভিজাত ধনী। সে ধন আবার আমি তোমায় ফিরিয়ে দিলাম। তাই নিয়ে নিজের নামকে সার্থক করো। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যিনি একেবারে সাদা, সকল বর্ণ তাঁর মধ্যে যদি কোনোদিন মিশে যায়, যদি এক হয়ে যায়, সেইদিন আবার আমাদের দেখা হবে।" বলেই সে হাঁটতে লাগল।

দৌড়ে অনুসরণ করে চেঁচিয়ে বললাম, "পাগল হওনি তো?"

থমকে মুখ ফিরিয়ে হাসল, কাছে এসে আমায় প্রণাম করল।

রুদ্ধকণ্ঠে বললাম, "আমি পুলিস ডাকতে তো পারি না। তাই বুঝি—"

"ভালোবাসা মরে যাচ্ছে, প্রেমের সমাধি হতো। পারব না—তাজমহল নই, তাজমহল নই সুব্রত! জীবন্ত নারী। যেতে দাও।"

আর বাধা দিলাম না।

আজ কিন্তু অসীম ধনে ধনী, এই সুব্রত। একটি রাজা।

লাল কুমুদের বাইরে কি রঙ! দিনের আলো ঝক-ঝক করে তার উপর। প্রায়ই দেখতে যাই নিজেকে, আলিপুরের সেই বাগানে। সেই গভীর কালো জল ভাঙা পুকুরের, জীর্ণ ঘাট। পাড়ের উপর থেকে লতার ঐশ্বর্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, আর একটি ফুলের উপর। আমি ওর দিকে তাকাই না, দুইদিনের জন্য সে কেন রহস্য করে লাল কুমুদের সঙ্গে? বর্ণ মেলে না, তবু পাশাপাশি ফুটতে আসে?

হে রাজভিখারী, কিছুই তোমার নাই—শুধু রঙ!

এত ঐশ্বর্যের রক্তবর্ণকে নিশ্চিহ্ন করে যদি মুছে নিতো এই মাটি-মা—এই দেশ; নির্মমভাবে যদি টেনে নিতো সব রস ওই সূর্য, তবেই হতো লাল কুমুদের মুক্তি। কিন্তু তা হবার নয়। বর্ণে গন্ধে রসে ঝকমক করাই তার নিয়তি। হায় ভিখারী, তোমার শূন্য অন্তর কে দেখে? তুমি যে মহান ভারতের রাজভিখারী!

সর্বস্ব ত্যাগ করে আজীবন তুমি শুধু শ্বেতবর্ণের জন্য বসে থাকো। কিন্তু—

পুস্তক পরিচয়

যুদ্ধ তখনও হয় নাই শেষ—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত; প্রকাশক—শ্রীজ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪৩।৪ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা; মূল্য আট আনা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে সাম্প্রতিক বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপার লইয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতার অবলম্বনে কয়েকটি লালিকা (Parody) রচনা করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন যুদ্ধসংক্রান্ত আরও কয়েকটি কবিতাও পুস্তিকাখানিতে স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলির ছন্দ ও ভাষা সাবলীল।

কুহকী (কাব্য-পুস্তিকা)—শ্রীগোপীনাথ অধিকারী প্রণীত, বীরকোট সেনবাগ, নোয়াখালী হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য বার আনা।

এই ক্ষুদ্র কাব্য-পুস্তিকার রচনা বৈশিষ্ট্যহীন ও আধুনিক যুগে অচল।

পটভূমিকা—ছোট গল্পের বই। রামপদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রমেশ ঘোষাল, ৩৫ বাদুড়বাগান রো, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য আড়াই টাকা। ১৫৯ পৃষ্ঠা

খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক রামপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রসসৃষ্টিতে একটি অসাধারণত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনের সামান্য ঘটনার ভিতর দিয়া তাঁহার দক্ষ তুলিকা এ দেশের নরনারীর অন্তরের প্রীতির রীতির সঙ্গে পাঠককে পরিচিত করাইয়া দেয় এবং অনুভূতিকে প্রেমের আলোকে উজ্জ্বল করিয়া তোলে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে দশটি গল্প আছে। এগুলি বাঙলার কথাসাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিবে।

অন্তরাল—সমস্যামূলক সামাজিক নাটক, শ্রীদিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মূল্য ২৲ টাকা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সমাজ জীবনে কানীন পুত্রের সমস্যা অবশ্য নূতন নয়। এই সমস্যা যুগে যুগে মানুষের চিন্তাশীল মনকে দোলা দিয়াছে এবং আজিও দিতেছে। আমাদের বর্তমান শিক্ষিত সমাজে ইহার স্বরূপ লেখক অতি চমৎকারভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দ্বন্দ্বের মধ্যে নাটকের পরিসমাপ্তি হইলেও সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত তিনি করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত লইয়া অধিকতর বিচার বিবেচনার প্রয়োজন হয়ত অনেকেই উপলব্ধি করিবেন। তবে একথা স্বীকার করিতে আপত্তি নাই যে, লেখকের মন প্রগতিপন্থী হইলেও সংযত এবং বিচারশীল। তিনি অতি আধুনিকতার মোহে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয়দানের পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু ইহাই লেখকের প্রধান বিশেষত্ব নহে,—তাঁহার রচনার বাহুল্যবর্জিত পরিচ্ছন্নতা এবং মাত্রাজ্ঞান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অবান্তর এবং অপ্রয়োজনীয় একটি শব্দও তিনি ব্যবহার করেন নাই। সুনিপুণ শিল্পী যেমন কয়েকটি মাত্র রেখায় এক একটা চিত্রকে জীবন্ত করিয়া তোলেন, 'অন্তরাল' নাটকের লেখকও তেমনি অল্পের মধ্যে তাঁহার জটিল বক্তব্য বিষয় সরল ও সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন, ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। অনাবশ্যক চরিত্র তিনি একটিও আমদানী করেন নাই, যে কয়টি না হইলে বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট হয় না, সেই কয়টিকেই তিনি জীবন্তরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার রণেশ, সুবিনয়, রেখা ও ঝরণা যেমন অদ্যকার শিক্ষিত তরুণ-তরুণী মহলে সুপরিচিত, তেমনি একটু ভারিক্কী মহলে ভবতোষ, বিনোদ, মিহিরবাবু ও মাধবী প্রভৃতিও অপরিচিত নহেন। এই সুপরিচিত চরিত্রগুলির আচরণের মধ্য দিয়াই লেখক বর্তমান সমাজজীবনের একটি সমস্যার স্বরূপ সাফল্যের সহিত উদ্ঘাটন করিয়াছেন। নাটকখানি ইতিমধ্যে একবার মঞ্চস্থও হইয়াছে। আমরা আশা করি, ইহার যথোচিত সমাদর হইবে। আধুনিক যুগের দাবী মিটাইবার জন্য এরূপ নাটকেরই প্রয়োজন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৫ই সেপ্টেম্বর—ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ২০ হইতে ২৫ হাজার লোকের মধ্যে তিনশত জনকে "ঘৃণ্য অপরাধের" দরুণ ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী বিচারার্থ আদালতে হাজির করা হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

৬ই সেপ্টেম্বর—আরার এক সংবাদে প্রকাশ, বারনারা গ্রাম হইতে নৌকাযোগে গঙ্গার অপর পারে যাইবার সময় ১৪ জন স্ত্রীলোকের সলিল-সমাধি হয়। প্রকাশ যে, চাষীরা নিজেদের মধ্যে বাদবিতণ্ডার ফলে নৌকাখানি ডুবাইয়া দেয়।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন পাঞ্জাবের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান তক্ষশীলায় অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া ওয়াকিবহাল মহল অনুমান করিতেছেন।

৭ই সেপ্টেম্বর—নয়াদিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, সংবাদ সেন্সর করাইবার ব্যবস্থা অদ্য মধ্যাহ্ন হইতে রহিত করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

মুসলিম লীগে যোগদান করার জন্য মিঃ আবদুল কোয়ায়ুম খান কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

৮ই সেপ্টেম্বর—কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যে সকল গুরুতর অভিযোগ শোনা গিয়াছে তাহার সত্যতা নিরূপণের জন্য কমিউনিস্ট নেতা পি সি যোশী শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই, শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী অথবা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর উপর ভারার্পণের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদনুযায়ী শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইয়ের উপর ভারার্পণ করা হয়। শ্রীযুত দেশাই বলিয়াছেন যে, তিনি যে-সকল কাগজপত্র পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, কমিউনিস্ট পার্টীর লোকেরা আগস্ট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছে বলিয়া তাহাদের সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হইয়া থাকে তাহা সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

শনিবার সায়াহ্নে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক বিরাট জনসভায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ও অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী, ব্যক্তি স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ফরওয়ার্ড ব্লক, কংগ্রেস সোসালিষ্ট পার্টী ও অপরাপর গণপ্রতিষ্ঠানের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। মিঃ ফজলুল হক সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

জব্বলপুরের সংবাদে প্রকাশ, পিপলস শহরের ছয় মাইল দূরবর্তী এক জলধার ফাটিয়া যাওয়ায় এক শতাধিক লোক ও দুই সহস্রাধিক গবাদি পশু ভাসিয়া গিয়া নিমজ্জিত হইয়াছে।

সর্দার সন্ত সিংয়ের পত্রের উত্তরে অস্থায়ী বড়লাট স্যার জন কলভিন জানাইয়াছেন যে, অবিলম্বে ভারতরক্ষা বিধান রদ হইবে না এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ শীঘ্র শিথিল করা সম্ভব নয়।

৯ই সেপ্টেম্বর—অদ্য মতিমহল থিয়েটার্সের লাহোর শাখার বিডন রোডস্থিত চারতলা ভবনে অগ্নিকাণ্ডের ফলে পাঁচটি শিশু ও একটি নারীসহ ১২ জন লোক অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে মতিমহলের বঙ্গালী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মিঃ আর এন বসুর পরিবারভুক্ত লোকজন অন্যতম।

বোম্বাই গভর্নমেণ্টের গত ৮ই সেপ্টেম্বরের এক আদেশে জনসভা, সম্মেলন ও শোভাযাত্রার উপর বাধানিষেধ একমাত্র সাতারা ভিন্ন অন্য জেলায় প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

১০ই সেপ্টেম্বর—গত ৫ই সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্থানের সংজ্ঞা বলিবার জন্য বার বার পীড়াপীড়ি করিলে মিঃ জিন্না বলেন, "পাকিস্থানের ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা নির্দেশ করিবার পূর্বে বিষয়টি প্রণিধানের জন্য আমি সময় চাই।"

শক্করের দাহারকারীর নিকটে এক পল্লীতে কৃষিকার্যের জন্য জল বণ্টন লইয়া দুই দল কৃষকের মধ্যে দাঙ্গা হওয়ার ফলে ৪ ব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

১১ই সেপ্টেম্বর—প্রকাশ, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পর্যন্ত চলিবে। বাঙ্গলায় আর একটি দুর্ভিক্ষের কথাও ওয়ার্কিং কমিটির আলোচনার অন্তর্ভুক্ত থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৫ই সেপ্টেম্বর—বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যরা অদ্য প্রাতে নির্বিবাদে সিঙ্গাপুরে অবতরণ করে। সিঙ্গাপুরের দরিয়ায় সিঙ্গাপুর দখলের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

বর্ণবৈষম্য অসহনীয় হওয়ায় নাইডু নামক একজন ভারতীয় সৈন্য সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া ডারবানের খবরে জানা গিয়াছে।

লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট চৌধুরী আকবর খান আজ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া বলেন, ভারতীয় কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতারা যে সময়োচিত সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা আমি অবগত হইয়াছি। এ সকল উৎপাত হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত রাখিতে হইবে। মক্কা বা মস্কো মারফৎ ভারতের স্বাধীনতা আসিবে না; ভারতের কমিউনিস্টরা লীগের পাকিস্থান দাবী সমর্থন করিতেছে। কমিউনিস্ট ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী—এই দুইয়ের মধ্যে যে অশোভন মৈত্রী দেখা দিয়াছে, ভারতের মুসলমান সমাজ নিশ্চয়ই উহার নিন্দা করিবে।

ওয়াশিংটনের কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, বৃটেন যাহাতে যুদ্ধ হইতে শান্তির অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে পারে তজ্জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিতে মার্কিন গভর্নমেণ্ট রাজী হইয়াছেন।

৬ই সেপ্টেম্বর—মার্কিন টহলদার সৈন্য অদ্য আনুষ্ঠানিকভাবে টোকিওয় প্রবেশ করিয়াছে।

৮ই সেপ্টেম্বর—ব্রহ্মের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বা ম আগস্ট মাসের মাঝামাঝি হইতে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন।

সম্প্রতি জার্মানী হইতে প্রত্যাগত নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কতিপয় পর্যবেক্ষকের নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, জার্মানীতে একটি ব্যাপক নাৎসী প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে এবং মিত্রপক্ষ এপর্যন্ত উক্ত প্রতিষ্ঠানের হেডকোয়ার্টার্স আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

৯ই সেপ্টেম্বর—রয়টারের রাজনৈতিক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী লর্ড ওয়াভেল বর্তমান সপ্তাহের শেষভাগে লণ্ডন হইতে নয়াদিল্লী যাত্রা করিবেন।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রাক্তন সদস্য মিঃ কেশব মেনন সিঙ্গাপুরে জাপ বন্দী নিবাস হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

১০ই সেপ্টেম্বর—সিঙ্গাপুর বেতারে প্রকাশ, জাপানের আত্মসমর্পণের সংবাদ প্রাপ্তির পর সিঙ্গাপুরে এক ভোজের আয়োজন হয় এবং ভোজের পর পাঁচশত জাপানী অফিসার হারিকিরি করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

অসলো বেতারে ঘোষিত হইয়াছে, নরওয়ের প্রধান মন্ত্রী ৫৯ বৎসর বয়স্ক ভিদকুন কুইসলিংকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

বিলাতের বামপন্থী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির পলিটিক্যাল সেক্রেটারী মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে এক বিবৃতিতে বলেন যে, অধিকৃত জার্মানীতে মিত্রসৈন্যের চক্ষের সম্মুখে জার্মানরা ব্যাপকভাবে মারা যাইতেছে এবং তাহাদের জন্য হাজার হাজার কবর পূর্ব হইতেই খনন করিয়া রাখা হইতেছে। সংক্রামক রোগও বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে।

জেনারেল ম্যাকআর্থার এক আদেশ জারী করিয়া জাপ ইম্পিরিয়েল হেডকোয়ার্টার্সের বিলোপ সাধন করিয়াছেন।

আণবিক বোমার গোপন রহস্য জানাইবার জন্য রুশিয়া, ফ্রান্স ও চীন সম্মিলিতভাবে পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে দাবী জানাইবেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় বিশেষ বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

১১ই সেপ্টেম্বর—যুদ্ধাপরাধীরূপে গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য প্রাক্তন জাপ প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হিদেকী তোজো বন্দুকের গুলীতে আত্মহত্যার চেষ্টায় জখম হন বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহাকে ও তাঁহার মন্ত্রিসভার ১০ জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ২২শে ভাদ্র, ১৩৫২ সাল। Saturday 8th September, 1945. [৪৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

অতঃপর

জাপানের আত্মসমর্পণের পর সমর-রঙ্গমঞ্চের যবনিকাপাত হইল; কিন্তু ইহাতে আমাদের বিশেষ কোন সান্ত্বনা নাই। বিজেতা শক্তিবর্গের মুখে বিশ্বমানবের স্বাধীনতার অনেক বড় বড় কথা শুনিয়াছি; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও পরাধীনতার অন্ধকার ভেদ করিয়া আশার ক্ষীণ আলোকের রেখাও এ পর্যন্ত আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে না। লর্ড ওয়াভেল বিলাতে গিয়া শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে ভারত সম্পর্কে আলোচনা শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনিতেছি; কিন্তু আগামী সাধারণ নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলী ভারতের সম্পর্কে নূতন কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না; অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই নির্বাচনে জনমত যাহাতে প্রাধান্য লাভ করে, ভারত-শাসন নীতিতে তেমন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে না। শুনিতেছি, অল্পদিনের মধ্যে বাঙলা দেশের পাঁচশত নিরাপত্তা বন্দীকে মুক্তিদান করা হইবে। এই সংবাদ সত্য হইলে আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু আমরা একথা বহুবার বলিয়াছি যে, ব্যাপকভাবে সকল রাজনীতিক বন্দীকে মুক্তিদান করা হয়, আমরা ইহাই চাই। শ্রমিক গভর্নমেণ্ট ব্রিটিশ নীতির কর্ণধারকত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের জন্য যদি সত্যই আগ্রহসম্পন্ন হইয়া থাকেন, তবে সর্বাগ্রে রাজনীতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে আমলাতান্ত্রিক স্বার্থ-সংস্কারগত সর্বপ্রকার কার্পণ্য তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, এই সত্যটি তাঁহারা এখনও উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন না। ফরোয়ার্ড ব্লকের অন্তর্ভুক্ত রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান করা হইবে না এবং কংগ্রেস-সোসিয়ালিস্টদিগকে মুক্তি দিলে দেশের শান্তি ও স্বস্তি ব্যাহত হইবে, শাসকদের তরফ হইতে এমন কথা আমরা শুনিতে পাইতেছি। আমলাতান্ত্রিক এই সংকীর্ণ দৃষ্টির মূলীভূত মূঢ়তা আমাদের মনকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে। ফরোয়ার্ড ব্লকের কর্মিগণ কংগ্রেসের আদর্শের প্রতিই নিষ্ঠাবান এবং কংগ্রেসের নির্দেশিত কর্মনীতি অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সাধনা করিয়াছেন; এরূপ ক্ষেত্রে ভারতের এই সব দেশপ্রেমিক সন্তানকে বন্দী করিয়া রাখিবার মূলে কোন যুক্তি থাকিতে পারে, আমরা ইহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। কংগ্রেস সোসিয়ালিস্টদের উপর কর্তৃপক্ষের রোষ-দৃষ্টি অনেক দিন হইতেই আছে। ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার ফ্রান্সিস মুডি এবং বিহারের গভর্নর স্যার টমাস রাদারফোর্ড, উভয়েই এখনও ইঁহাদের মুক্তির বিরোধী। ইহারও কারণ বোঝা যায় না। কংগ্রেস সোসিয়ালিস্টদের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর শাসকদের অভিযোগ এই যে, ইঁহারা ধ্বংসাত্মক নীতির সমর্থক; এই অভিযোগও প্রমাণ-সাপেক্ষ এবং এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আগস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে শাসকদের নিপীড়নমূলক নীতির ফলে দেশের সর্বত্র একটা বিক্ষোভ দেখা দিয়াছিল; সেই উত্তেজনাকর অবস্থার ভিতর পড়িয়া জনসাধারণ যদি কোথায়ও ধ্বংসাত্মক কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে, সেজন্য দলবিশেষকে দায়ী করা চলে না। এ সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে এই সত্য সুস্পষ্ট হইয়া পড়ে যে, জনগণের বিক্ষোভমূলক সেই সব ধ্বংসাত্মক কার্যের মূলেও দেশ-সেবারই প্রেরণা ছিল। কিন্তু বিক্ষোভ এবং উত্তেজনার সে অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে। এখন ধ্বংসাত্মক কার্যের সংস্রবে লিপ্ত এই সন্দেহে স্বদেশপ্রেমিক কর্মীদিগকে বন্দী রাখিবার পক্ষে উপযুক্ত কারণ আমরা দেখিতে পাই না। দেশপ্রেমকে আজ মুখ্যত মর্যাদা দান করা হয় এবং সেই সূত্রে উদার রাজনীতিক প্রতিবেশ দেশের সর্বত্র গড়িয়া উঠে; আর সঙ্গে সঙ্গে শাসকদের অবলম্বিত রুদ্রনীতির স্মৃতি লোকের মন হইতে চিরদিনের জন্য মুছিয়া যায়, আমরা ইহাই চাই। এদেশে স্বাধীনতার বলিষ্ঠ প্রেরণার স্বচ্ছন্দ বিকাশের সুযোগ দান করিতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি এখনও সংকুচিত হন, তবে বুঝিতে হইবে, সাম্রাজ্যবাদমূলক সংকীর্ণ মনোবৃত্তি হইতে তাঁহারা মুক্ত হন নাই। যুদ্ধ অবসান হইবার পরও যদি তাঁহাদের মনোবৃত্তির প্রকৃত পরিবর্তন না ঘটে এবং ভারতের স্বাধীনতা তাঁহারা স্বীকার করিয়া না লন, তবে জগতে স্থায়ী শান্তি সুদূরপরাহত বুঝিতে হইবে। পার্ল বাক সম্প্রতি এই সত্য সুস্পষ্ট ভাষায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতে অবলম্বিত ব্রিটিশ নীতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন, 'ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে এই কথা বলা হয় যে, ভারতবর্ষকে যদি এখন স্বাধীনতা দান করা হয়, তবে সেখানে গৃহযুদ্ধের শোণিতাক্ত অধ্যায় আরম্ভ হইবে। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীনতা দান করা না হয়, তবে শুধু ভারতেই নয়, জগতে সর্বাপেক্ষা অধিক রক্তপাত ঘটিবার কারণ সৃষ্টি হইবে।' পার্ল বাকের এই উক্তির যাথার্থ্য ব্রিটিশ শ্রমিক দলের গভর্নমেণ্ট উপলব্ধি করিবেন কি না, জানি না; কারণ, স্বার্থের সংকীর্ণ দৃষ্টি বৃহত্তর কল্যাণকে ব্যাহত করিয়া রাখে এবং কঠোর বাস্তবের প্রতিক্রিয়া পরে যখন দেখা দেয়, তখন অবস্থা সংশোধন করিবার আর কোন উপায়

থাকে না। অতীতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্য-নীতিতে এই ভ্রান্তি বহু ঐতিহাসিক বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছে। আমেরিকা এবং আয়র্লণ্ডের ক্ষেত্রেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারত সম্পর্কেও তাহাই সত্য হইবে কি না, ব্রিটিশের আসন্ন কর্মনীতির উপর তাহা নির্ভর করিতেছে।

স্বাধীনতার প্রশ্ন

ব্রিটিশ শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডল এবং তাঁহাদের মুখপাত্রস্বরূপে লর্ড পেথিক লরেন্স লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভারতের সম্পর্কে কি নীতি নির্ধারণ করিবেন, তাহার কূটনৈতিক বিচারে আমরা প্রবৃত্ত হইতে চাহি না; সে সম্বন্ধে চুলচেরা গবেষণার অবতারণা করাও আমরা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করি। এ সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে আমরা সোজাসুজি এই কথা জানাইয়া দিতে চাই যে, স্বাধীনতা ভিন্ন আমরা অন্য কিছুতেই নিরস্ত হইব না। নির্বাচনের ফলাফল দেখিয়া ব্রিটিশ নীতির কর্ণধারগণ সংখ্যা-লঘিষ্ঠের মামুলি যুক্তি তুলিয়া যদি ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব কায়েম করিবার কৌশল অবলম্বন করিবার প্রতীক্ষায় থাকেন, তবে তাঁহারা একান্তই ভুল বুঝিয়াছেন। দেখিতেছি, পার্লামেণ্টের অন্যতম শ্রমিক সদস্য মেজর উডরো ওয়েট সম্প্রতি বিলাতের 'রেনল্ডস নিউজ' পত্রে এ সম্বন্ধে সোজা কথাটা বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, "একটা জাতি অপর জাতির দ্বারা যতই সদয়ভাবে শাসিত হউক না কেন, পরাধীনতার ক্ষত তাহার অন্তরে থাকিয়াই যায়। সেক্ষেত্রে স্বাধীনতা সে কি উপায়ে লাভ করিবে, এই চিন্তাই তাহার কাছে প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। যতদিন পর্যন্ত সেই পরাধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ না করে, শাসক জাতি তাহার উপকারের জন্য কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে গেলেও সে তাহাতে সহযোগিতা করিতে প্রণোদিত হয় না। ভারতবর্ষে ৪০ কোটি নরনারীর বাস; এই দেশ আয়তনে রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের সমগ্র অংশের সমান। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, বিভিন্ন ভাষাভাষী নরনারী এখানে বাস করে। ইহারা সকলেই একমতাবলম্বী হইবে, এমন দাবী করা অঘটন ঘটাইতে বলারই সমান। এমন দাবীর মূলীভূত মনস্তত্ত্বের বিচার করিলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হইয়া পড়ে যে, তাহাদিগকে কোনদিন স্বাধীনতা দেওয়া হইবে, এমন অভিপ্রায় লইয়াই কাজ করা হইতেছে না এবং যাঁহারা তেমন দাবী করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষকে চিরদিনের জন্য অধীন করিয়াই রাখিতে চাহেন।" মেজর ওয়েট যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য নূতন কিছুই নাই। ভারতের স্বাধীনতা দাবী সম্বন্ধে বিবেচনার প্রশ্ন যখনই উঠে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার মামুলি যুক্তিই উপস্থিত করিয়া থাকেন। এই ধরণের যুক্তি ভারতবাসীদের অন্তরে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে তিক্ততারই সৃষ্টি করিয়া থাকে; আচার্য কৃপালনী সম্প্রতি পুণায় ছাত্রদের এক সভায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভারত সম্পর্কিত এই সদিচ্ছার স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে যিনিই গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসিয়াছেন, তিনিই দেশের শাসনকার্য পরিচালনায় দেশবাসীদের অধিকার সম্প্রসারণ করিবেন, এই ধরণের কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহারা প্রত্যেকেই নূতন আকারে দাসত্বের নিগড়েই আমাদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন। ইংরেজ সংরক্ষণশীলই হউক, সোসিয়ালিস্ট অথবা কমিউনিস্টই হউক, প্রকৃতপক্ষে ভারতের সম্বন্ধে তাহারা প্রত্যেকেই প্রগতিবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী। আমাদের আশঙ্কা হয়, বর্তমান ব্রিটিশ শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডল সম্পর্কেও আচার্য কৃপালনীর এই উক্তিই অবশেষে সত্যে পরিণত হইবে। হউক, আমাদের তাহাতে ক্ষতি নাই; তথাপি ভারতের হিতৈষণা প্রচারকারী শ্রমিক দলকে আমরা শুনাইয়া রাখিতে চাই যে, সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার মামুলি ধাপ্পাবাজী লর্ড ওয়াভেলের মারফতে তাঁহারা যেন ভারতের সম্পর্কে চালাইতে প্রবৃত্ত না হন। ব্রিটিশ রাজনীতিকদের অনুগ্রহের নিগ্রহ আমরা যথেষ্টই ভোগ করিয়াছি; শ্রমিক দল অন্তত আত্মমর্যাদায় প্রবুদ্ধ ভারতকে তেমন অনুগ্রহের মর্মভেদী অস্ত্রে আহত করিবেন না।

এ দেশ ও সে দেশ

ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হইবার ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হইতে না হইতেই গ্রেট ব্রিটেন হইতে ভারতরক্ষা আইনের সমতুল্য জরুরী বিধানসমূহ প্রত্যাহৃত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার অজুহাতে আটক বন্দীরা মুক্তিলাভ করেন। সম্প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, জাপানের আত্মসমর্পণ করিবার সাত ঘণ্টার মধ্যেই তথাকার সংবাদপত্রসমূহের উপর হইতে সর্বপ্রকার নিষেধাবিধি প্রত্যাহৃত হইয়াছে। কিন্তু পরাধীন আমরা, আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র। ইউরোপের যুদ্ধ বহুদিন শেষ হইয়াছে, এশিয়ার যুদ্ধেরও অবসান ঘটিল; অথচ বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে পরিগৃহীত প্রস্তাবে দেখা যায় যে, বাঙলা দেশের স্বদেশপ্রেমিক প্রায় এক সহস্র কর্মি-সন্তান এখনও বিনা বিচারে কারারুদ্ধ রহিয়াছেন। ভারতের সংবাদপত্রসমূহের উপর এখনও অতিরিক্ত কঠোর বিধানের অস্ত্র সমুদ্যত রহিয়াছে। বিশ্ব-মানবের স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসানের ফলে এতদিনে সত্য হইয়া উঠিয়াছে, জার্মানীর উপকূলভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া টোকিও উপসাগরের উপকূলে পর্যন্ত বিজয়ডঙ্কা-নিনাদে এই বার্তা ঘোষণা করা হইতেছে। পরাধীন ভারতের কাছে ইহা পরিহাস ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।

বাঙলার রাজনীতি

বাঙলার গভর্নর মিঃ কেসি কিছুদিন হইল মৌলবী ফজলুল হককে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে দেশের রাজনীতিক অবস্থা আলোচনা করিয়াছেন; এই আলোচনার ভিতরের কথা কিছু প্রকাশ পায় নাই। তবে মনে হয় যে, বাঙলা দেশের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সমাধান কিভাবে সম্ভব হয়, এই সম্বন্ধেই আলোচনা হইয়াছিল। এই সমস্যা সমাধানের জন্য মিঃ কেসি যদি এতদিন পরেও আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন, তবে দেশের লোকমতকে মর্যাদা দান করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন বোঝা যাইবে; কিন্তু বাঙলার বর্তমান সমস্যা শুধু মন্ত্রিমণ্ডল সম্পর্কিত ব্যাপারের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, তাহা আরও ব্যাপক। বিগত দুর্ভিক্ষে এবং তৎসংশ্লিষ্ট শাসন-নীতিক অনাচারে সমগ্র বাঙলার সামাজিক ব্যবস্থা একেবারে বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকারের সঙ্গে রাজনীতির গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে। বাঙলা দেশকে সত্যই আজ যদি দুর্নীতি হইতে মুক্ত করিতে হয়, তবে বাঙলার রাজনীতিতে আন্তরিকতাপূর্ণ স্বদেশ-প্রেমের প্রেরণা সঞ্চার করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। দেশপ্রেমের আগুনে অত্যাচার এবং অনাচারজনিত পুঞ্জীভূত পাপকে আজ দগ্ধ করিয়া ফেলিতে হইবে; অথচ জ্বলন্ত সেই স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন করিবার পক্ষে যিনি বাঙলার উপযুক্ত নেতা, তিনি এখনও বিনা বিচারে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর মুক্তির জন্য শুধু বাঙলা নহে, সমগ্র ভারত বহুদিন হইতে দাবী করিতেছে; কিন্তু ভারতের শাসকবর্গ সমভাবে সেই দাবীকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধও শেষ হইয়া গেল, এরূপ অবস্থাতেও শরৎচন্দ্রের ন্যায় একজন সর্বজনমান্য নেতাকে বিনা বিচারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখার ব্যাপারকে দেশের লোকে অত্যাচার ব্যতীত অন্য কিছুই মনে করিতে পারে না এবং শরৎচন্দ্র যদি বন্দী অবস্থায় থাকেন, বাঙলার রাজনীতিক অগ্রগতি কোনরূপেই সম্ভব হইবে না শুধু তাহাই নয়, শাসকবর্গের এতৎসম্পর্কিত অন্ধ দাম্ভিকতায় দেশের বুক দুর্নিবার বেদনায় ভারাক্রান্তই থাকিবে। অল্প-

দিনের মধ্যেই নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইবে। আমরা আশা করি, সে অধিবেশনে শরৎচন্দ্রের মুক্তি দাবী করিয়া স্বেচ্ছাচারী শাসকদিগের ভ্রান্তি উন্মুক্ত করা হইবে। শুধু বাঙলা নয়, সমগ্র ভারতে রাজনীতিক জীবনে নূতন শক্তি এবং প্রেরণা সঞ্চার করিবার জন্য শরৎচন্দ্রের ন্যায় ত্যাগব্রতী, স্বদেশপ্রেমিক সাধকের কর্ম-সাধনার আজ একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

উন্নতি না অবনতি

কিছুদিন পূর্বে বাঙলার গভর্নর মিঃ কেসি দেশের অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া আমাদিগকে এই আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন যে, আমাদের আর বিশেষ কোন চিন্তার কারণ নাই; বাঙলার অবস্থা উন্নতির দিকে মোড় ফিরিয়াছে। প্রধানত ধান্যের ফসলের সম্বন্ধেই তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অনাবৃষ্টির ফলে পশ্চিমবঙ্গে এবং অকালে অতিবৃষ্টি ও বন্যার ফলে উত্তর ও পূর্ববঙ্গে দস্তুরমত দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে চাউল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে এবং বুভুক্ষু নরনারীর নগরে অভিযান, আর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদনের পর্ব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া, কোন কোন অঞ্চলে বন্যার বিপর্যয়ে মহামারীর প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে। এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষের মুখে মামুলী আশার কথায় আমরা কোন আশ্বস্তি পাই না; অথচ, শাসকদের তরফ হইতে সে রীতি সমান ভাবেই চলিতেছে। সম্প্রতি বাঙলা সরকারের মৎস্য বিভাগের ডিরেক্টর ডাক্তার এস এল হোরা বাঙলা দেশ হইতে মৎস্যের আকস্মিক অন্তর্ধানের কারণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গবেষণা করিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে এই ভরসা দিয়াছেন যে, মৎস্যের অভাব দূর করিবার জন্য বাঙলা সরকার হইতে ব্যাপক পরিকল্পনা অবলম্বনে বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইতেছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, কর্তাদের এই সব পরিকল্পনার মূল্য আমরা ইহার মধ্যেই বুঝিয়া লইয়াছি। ইহার ফলে কার্যত মোটা মোটা বেতনে কতকগুলি কর্মচারী পোষণের কাজ চলিতেছে এবং সেই পথে বাঙলার গরীবদের কষ্টার্জিত অর্থের সম্বায়ের ব্যবস্থা করা হইতেছে, ইহা সত্য; কিন্তু দেশের লোকের দুঃখ-কষ্ট সকল দিক হইতে বাড়িতেছে বই, কমিতেছে না। বস্ত্রের অভাব, অন্নের অভাব, মাছ নাই, দুধ নাই, তরি-তরকারী তাহাও দিন দিন দুষ্প্রাপ্য হইয়াই উঠিতেছে; অথচ বৃটিশ শাসনের মহিমায় আমরা দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতেছি। যুদ্ধ শেষ হইল—মানবের কল্যাণ-ব্রতে আত্মনিয়োগকারী বিজেতা দলের অন্তরের কৃপার সিন্ধুতে কথার বান বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং অনেকটা নিশ্চিতরূপেই বুঝিতেছি যে, শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত দেশসমূহে নিজেদের স্বার্থের ঘাঁটি পাকা করিবার জন্য অবিলম্বে তাঁহাদের এই সেবাব্রতের স্রোত ভারত হইতে পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে প্রবল গতিতে বহিতে আরম্ভ করিবে। এই সেবাব্রতের টানে আমরা শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচিব কি না, আমাদের ইহাই আশঙ্কা হইতেছে। পরাধীন ভারত, এবং এই ভারত বৃটিশের কামধেনু। ইহাকে দোহন করিবার সুবিধা যখন বৃটিশের হাতে রহিয়াছে, তখন জগতে বৃটিশ মহিমা প্রচার এবং সেই প্রচারসূত্রে নিজেদের সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করিবার কৌশলও যে, নানাভাবে প্রযুক্ত হইবে ইহা বুঝি; সেজন্য সেই সূত্রে জগতের অন্নের ও বস্ত্রের দৈন্য দূর করিয়া এই ভারতভূমি কি পরিমাণ ধন্য হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া এই দারুণ দুর্দিনেও আমাদের অন্তরে দুর্নিবার হর্ষের সঞ্চার হইতেছে। সত্যই জগতের আকাশে যে নবীন সূর্যের উদয় হইতে চলিল ইহাতে সন্দেহ কি?

সাতারায় সংকট

বোম্বাইয়ের সাতারা জেলায় অশান্তি চলিতেছে এবং তাহা দমন করিবার জন্য বোম্বাই সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি একটি সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে। সাতারা শিবাজীর জন্মভূমি। এখানকার অধিবাসীরা কংগ্রেসের কর্মনীতি বহুদিন হইতেই দৃঢ়তার সঙ্গে অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। আজ কংগ্রেস সর্বপ্রকার প্রতিরোধ নীতি বর্জন করিলেও এখানে এই বিক্ষোভ এবং অশান্তি সত্যই যদি চলে, তবে তাহার কারণ কি? এ সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত শঙ্কর রাও একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট যদি এই অঞ্চল হইতে দমনমূলক কঠোর বিধানসমূহ প্রত্যাহার করেন এবং তাঁহাকে এই অঞ্চলে গতিবিধির এবং বক্তৃতা করিবার স্বাধীনতা প্রদান করেন, তবে অচিরেই তিনি সেখানে স্বাভাবিক শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। মহারাষ্ট্র কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট মিঃ এন ভি গ্যাডগিলও এ সম্বন্ধে বিবৃতি সূত্রে প্রকৃত অবস্থা দেশবাসীর নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাদের বিবৃতিতে দেখা যায়, বোম্বাই সরকার 'প্রতিপক্ষ গবর্ণমেণ্ট' বলিয়া যাহাকে বিদ্রোহাত্মক সংজ্ঞা দিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস-অনুমোদিত গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা ব্যতীত তাহা অন্য কিছু নয়। শাসক সম্প্রদায় ইহার প্রতিকূলতায় কঠোর নীতি অবলম্বন করিবার ফলেই জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের কারণ ঘটে। আমরা বাঙালী, জনগণের সংগঠনমূলক কর্মোদ্যমকে বাধাদানের প্রবৃত্তি এ দেশের শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ প্রবল, সে সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। অবিশ্বাসই অবিশ্বাসের কারণ সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং দৃষ্টিতে দোষ ঘটায়। এদেশের শাসকদের পীড়ন নীতির মূলে এই অবিশ্বাস প্রধানত কাজ করিয়া থাকে। বিগত আগস্ট আন্দোলনকে দমন করিবার জন্য এ দেশে কিরূপ পীড়ন নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল, সেদিন পণ্ডিত জওহরলাল সে কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যুক্তপ্রদেশ, বাঙলা, বিহার এই সব প্রদেশের কোন কোন অঞ্চলের অধিকারীদের উপর ঐ সময় শুধু মেশিন কামানই চালানো হয় নাই, তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই-ভাবে লোকজনকে উচ্ছেদ করিয়া পরে সেই জমি চষিয়া ফেলা হইয়াছে। পণ্ডিত জওহর-লালের এই উক্তির বিচার করিলে এই দেশের লোকের উপর ঐ সময় কতটা অত্যাচার হইয়াছে, তাহার কিছু ধারণা করা সম্ভব হইবে। এই যে অত্যাচার, আধুনিক জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা মিলিবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। এমন নিপীড়ন-নীতির প্রতিক্রিয়া ঘটিবে ইহা স্বাভাবিক; কারণ ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ হইলেও এ দেশের লোকেরা পাথর হইয়া পড়ে নাই। দেশের শান্তি সত্যই যদি গভর্নমেণ্টের কাম্য হয়, তবে আগস্ট আন্দোলনের স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত রাখিলে তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত মূঢ়তা এবং অদূরদর্শিতারই পরিচয় প্রদান করা হইবে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ইহা উপলব্ধি করিয়া যদি দমননীতি প্রত্যাহার করেন, তবেই তাঁহারা শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিবেন; পক্ষান্তরে আমলাতান্ত্রিক ইজ্জতের ভ্রান্ত মোহে যদি তাঁহারা এখনও পরিচালিত হইতে চাহেন, তবে অনর্থই বৃদ্ধি পাইবে।



অন্ধ-বাউল (লিথোপ্রিণ্ট)

শিল্পী: শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

বাঙলার গভর্নর—দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, (৩০শে আগস্ট) বাঙলার গভর্নর মিস্টার কেসী ছুটি লইয়া বিলাতে যাইতেছেন। বোধ হয় ১২ই সেপ্টেম্বর বা ঐরূপ সময়ে তিনি সস্ত্রীক বিলাতে যাইবেন এবং ৯ই অক্টোবর সস্ত্রীক প্রত্যাবর্তন করিবেন। মধ্যপ্রদেশের গভর্নর স্যার হেনরী টোয়াইনাম এখন ছুটিতে আছেন। তিনি মিস্টার কেসীর ছুটির সময়ে বাঙলার গভর্নর হইবেন এবং তিনি যতদিন বাঙলায় থাকিবেন, ততদিন স্যার ফ্রেডরিক বোর্নই মধ্যপ্রদেশের ও বেরারের গভর্নরের কাজ করিতে থাকিবেন।

বড়লাট লর্ড ওয়াভেল এখনও বিলাতে মন্ত্রীদিগের সহিত ভারতবর্ষের রাজনীতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। সেই সময়ে বাঙলার গভর্নর ছুটি লইয়া স্বদেশ অস্ট্রেলিয়ায় না যাইয়া বিলাতে যাইবেন—ইহাতে নানারূপ কল্পনা-জল্পনার উদ্ভব অনিবার্য। বাঙলায় এখনও বহু লোক রাজনীতিক কারণে কারারুদ্ধ—যুদ্ধের পরেও তাঁহাদিগকে আটক রাখায় যেমন প্রতিবাদ হইতেছে—বাঙলায় এখনও ভারতশাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে গভর্নরের স্বৈরশাসন বহাল রাখাও তেমনই নিয়মতান্ত্রিকতার বিরোধী বলা হইতেছে; আর বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানির প্রতিবাদও হইতেছে। অনেকের অনুমান, এই সকল বিষয় সম্বন্ধে বিলাতের নূতন মন্ত্রিমণ্ডল স্থানীয় গভর্নর মিস্টার কেসীর বক্তব্য শুনিয়া কর্তব্য নির্ধারণ করিতে চাহিতেছেন।

কিন্তু মিস্টার কেসীর বিলাত গমন সম্বন্ধে তিনি মন্ত্রিমণ্ডলের দ্বারা আহূত হইয়া যাইতেছেন, এমন কথা বলা হয় নাই; বলা হইয়াছে, তিনি ছুটিতে যাইতেছেন। স্যার হেনরী টোয়াইনাম বহুদিন বাঙলা সরকারে চাকরী করিয়া গিয়াছেন।

সৈনিকদিগের অত্যাচার—বাঙলায় ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য কুচবিহারে সৈনিকদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী কলিকাতায় আসিয়া গত ১লা সেপ্টেম্বর বলিয়াছেন, অত্যাচারের বিষয় একটি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ বিচারালয়ের বিচারাধীন হইবে। তবে বিচারক মনোনয়ন এখনও হয় নাই এবং ভারত সরকারের রাজনীতিক বিভাগের সহিত পরামর্শ করিয়া সে কাজ করা হইবে। অর্থাৎ সে বিষয়ে কুচবিহার দরবার ভারত সরকারের পরামর্শ লইবেন—কুচবিহারের প্রজাদিগের সহিত পরামর্শ করিবার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। ঘটনার দিন ও তাহার পরদিন অপরাধীদিগকে সনাক্ত করিবার জন্য সমবেত করা হয় এবং তাহারা কেহ কেহ বন্দী রহিয়াছে। কলিকাতা হইতে

দেশের কথা

(১২ই ভাদ্র—১৭ই ভাদ্র)

বাঙলার গভর্নর—সৈনিকদিগের অত্যাচার—বাঙলায় চাউল—নির্বাচন—তরুণ সাহিত্যিক সঙ্ঘ।

একজন সুপরিচিত চিকিৎসক লইয়া যাইয়া আহতদিগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী ঘটনার সময় কুচবিহারে ছিলেন না। তিনি বলিয়াছেন—কুচবিহার দরবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কুচবিহারের লোক, বিশেষ ছাত্রদল সন্তুষ্ট হইয়াছে; মহারাজা যুদ্ধের কার্যে রাজ্যে নাই—তাঁহাকে ঘটনার বিষয় জানান হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তিনি কোন নির্দেশ দেন নাই—তাঁহার নবেম্বর মাসে প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা। মহারাজার অনুপস্থিতিহেতু অত্যাচারী সৈনিক ও কর্মচারীদিগের বিচার বন্ধ থাকিবে কিনা, তাহা প্রধান মন্ত্রী বলেন নাই বা বলিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, কুচবিহার দরবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে কুচবিহারবাসীরা, বিশেষ কুচবিহারের ছাত্র-সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কুচবিহারের যে সকল অধিবাসী কলিকাতায় আছেন, তাঁহারা সভা আহ্বান করিয়া ঐ ব্যাপারের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং পূর্বাহ্নে সংবাদ পাইয়াও শিক্ষামন্ত্রী কেন আবশ্যক ব্যবস্থা করেন নাই, তাহা জানিবার দাবী জ্ঞাপন করিয়াছেন।

কলিকাতায় গত ১লা সেপ্টেম্বর সৈনিকদিগের অত্যাচারের আর একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। মিস্টার পামার কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। সেদিন আদালতের কাজ শেষ করিয়া তিনি যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন লালদিঘীর কাছে একখানি সামরিক যান তাঁহার মোটরগাড়িতে আঘাত করে। তিনি যখন সামরিক যানের "নম্বর" লইবার চেষ্টা করেন, তখন সৈনিকরা নামিয়া আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার চাপরাশীকে প্রহার করিতে থাকে। প্রহারের গুরুত্ব চাপরাশীর দেহেই অধিক প্রকট হইয়াছে—তাহার নাসিকার অস্থি ও একটি দন্ত ভাঙিয়া গিয়াছে। চাপরাশী আরিফ খাঁকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে লইতে হইয়াছে।

অপচয়ের বহর—ভারতবর্ষের কোন অপ্রকাশিত স্থানে চীনে, ব্রহ্মে ও ভারতে সৈনিকদিগকে সমর-সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য যে স্থানে ভাণ্ডার নির্মিত হইয়াছে, তাহার ভবিষ্যতের সামরিক অপচয়ের বহর বুঝা যায়। তথায় যে পরিমাণ বিস্ফোরক সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা নির্বিঘ্নতাসহকারে নষ্ট করিতে ৬ বৎসর সময় ব্যয়িত হইবে। যতদিন যুদ্ধ চলিয়াছে, ততদিন এই সকল বিস্ফোরক বহুমূল্য ও একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কিন্তু জাপানী যুদ্ধ শেষ হওয়ায় "রাতারাতি" ৫ হইতে ৮ কোটি ডলার মূল্যের সমর-সরঞ্জামের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে—তাহার মূল্য নাই বলিলেও বলা যায়। এখন কিভাবে সব সরঞ্জাম নষ্ট করা হইবে, সে সম্বন্ধে মার্কিনের নির্দেশ অপেক্ষা করা হইতেছে। পৃথিবীর সমর-সরঞ্জাম ভাণ্ডারসমূহের মধ্যে ইহা অন্যতম বৃহত্তম ভাণ্ডার—ইহাতে "আণবিক বোমা" ব্যতীত আর সর্ববিধ বিস্ফোরকই সঞ্চিত আছে। ইহা ৯ বর্গ মাইলেরও অধিক স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। এই "ডিপো" ভারতবর্ষে কোথায় অবস্থিত, তাহা বাঙলায় সহজেই অনুমান করা যায়।

নির্বাচন—ঘোষণা করা হইয়াছে, আগামী শীতকালে ব্যবস্থা পরিষদসমূহে সদস্য নির্বাচন হইবে। কিন্তু এখনও কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বহু সদস্য মুক্তিলাভ করেন নাই। গত ২৮শে আগস্ট কংগ্রেসের সেক্রেটারী মিস্টার কৃপালনী পুণা হইতে তার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কমিটিকে সেই সেই প্রদেশের বন্দী কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যদিগের নাম জানাইতে বলিয়াছেন। বাঙলার সদস্যদিগের মধ্যে—(১) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, (২) শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুপ্ত, (৩) শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র দত্ত, (৪) শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ, (৫) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস, (৬) শ্রীযুক্ত বিনোদচন্দ্র চক্রবর্তী, (৭) শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ রায়, (৮) শ্রীযুক্ত অরুণাংশু দে—এই ৮ জন এখনও মুক্তিলাভ করেন নাই; আর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর গমনাগমন এখনও নিয়ন্ত্রিত।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বলা হইতেছে—কংগ্রেসকে নির্বাচনের জন্য আবশ্যক আয়োজনের অবকাশ না দিয়া তাড়াতাড়ি নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলে কংগ্রেসের সম্বন্ধে অবিচার করা হইবে।

আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর ও তাহার পরবর্তী কয়দিন বোম্বাইএ কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির ও ২৫শে সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইবে। গত ২৮শে আগস্ট শ্রীনগর হইতে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইহাই নির্ধারিত করিয়াছেন। এই সকল অধিবেশনে যে নির্বাচন ব্যবস্থা আলোচিত হইবে, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে।

মসলেম লীগ নির্বাচনে লীগের মুসলমানদিগের প্রতিনিধি বলিয়া

পরিগণিত হইবার দাবী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

হিন্দু মহাসভা কংগ্রেসের সহিত এক-যোগে নির্বাচনে কাজ করিবেন কি না, তাহা মহাসভার বিবেচনার বিষয় হইয়াছে।

বাঙলায় চাউল—বাঙলায় চাউলের অবস্থা ও বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি সংগত কি না, সে বিষয়ে বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি মত-প্রকাশ করিতেছেন। দেশের লোকের মত, এবার ফসলের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে চাউল রপ্তানি করা অসংগত। কিন্তু সরকার কি করিবেন, বলা যায় না। বিশেষ বাঙলায় এখন ব্যবস্থা পরিষদও নাই; লোকের পক্ষে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিবার সে উপায় বন্ধ হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনে সুভাষ-প্রসংগ—গত ২৮শে আগস্ট এক অতিরিক্ত অধিবেশনে কলিকাতা কর্পোরেশন কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র ও কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে ৩ দিন কর্পোরেশনের কার্যালয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি বন্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত করেন। প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া প্রথানুসারে মেয়র শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যখন বলেন, সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করুন, তখন কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মসলেম লীগ সকল দলের কাউন্সিলাররা দণ্ডায়মান হইলে য়ুরোপীয় দলের কাউন্সিলাররা উপবিষ্ট থাকেন। সে দলের দলপতি দণ্ডায়মান হইতে অস্বীকার করায় মেয়র তাঁহাদিগকে সভাকক্ষ ত্যাগ করিতে বলেন। তখন মিস্টার ওয়াইজ ব্যতীত সে দলের আর সকল কাউন্সিলার কক্ষ ত্যাগ করেন। তিনি দণ্ডায়মান হইবেন কি না মেয়রের এই জিজ্ঞাসায় মিস্টার ওয়াইজ বলেন, সুভাষচন্দ্র যে মৃত তাহা তিনি বিশ্বাস করেন না। তাহাতে মেয়র বলেন—এ বিষয়ে কোন কৈফিয়তের অবকাশ নাই—তাঁহাকে হয় দণ্ডায়মান হইতে, নহে তো কক্ষ ত্যাগ করিতে হইবে। তখন মিস্টার ওয়াইজ দণ্ডায়মান হন। য়ুরোপীয় দল (ইহুদীরা ও ফিরিঙ্গীরা কি এই দলের?) মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রস্তাবেও এদেশের লোকের সহিত একযোগে কাজ করেন নাই।

সভাপতির পারিশ্রমিক—বাঙলার গভর্নর নির্ধারণ দিয়াছেন—ভারতশাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা বন্ধ হওয়া অবধি পরিষদের ও সভার সভাপতি ২ জন মাসিক ৩ শত টাকা যে বৃত্তি বেতনাতিরিক্ত পাইয়া আসিয়াছেন তাহা পাইবেন।

সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন—স্থানীয় বারজন মুসলমানের আবেদনে হাওড়া মহেন্দ্রনাথ রায় রোডে কয়খানি প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা বন্ধ ছিল। জিলা জজের নির্ধারণানুসারে এতদিনে সরকারী কর্মচারীদিগের উপস্থিতিতে প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রা সম্পন্ন হইয়াছে। জজের রায়ে তিনি নিম্ন আদালতের নির্ধারণ বহাল রাখিয়াছেন—নামাজের সময় ব্যতীত আর সকল সময়ে ঐ পথে বাদ্যসহ শোভাযাত্রা হইতে পারিবে।

কলিকাতায় আরও মোটর বাস—বাঙলা সরকার কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহার জন্য যে ১৭৫ খানি নূতন মোটর বাস দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন, জানা গিয়াছে, তাহার শতকরা ৮০ খানি অবাঙালীরা পাইয়াছেন। এই বণ্টনকার্যে নাকি সাম্প্রদায়িকতারও ব্যবস্থা হইয়াছে। আরও শুনা যাইতেছে, যদিও মোটর বাসের জন্য দরখাস্ত বোর্ডের নিকট করিবার নির্দেশ ছিল, তথাপি বণ্টনকার্য বোর্ডকে করিতে না দিয়া কলিকাতার পুলিশ কমিশনারই করিয়াছেন। বোর্ডের সদস্যগণ ইহাতে অপমানিত বোধ করিয়াছেন।

শত্রুদলে যোগদানকারী—দিল্লী হইতে সংবাদ পরিবেশিত হইয়াছে (২৭শে আগস্ট) ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন, যে সকল ভারতীয় ভারত সরকারের শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে সাধারণ সৈনিকদিগের সম্বন্ধে দয়া প্রদর্শিত হইবে, কিন্তু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের গুরুত্বপূর্ণ অপরাধে অপরাধীদিগের সম্বন্ধে সাধারণ সামরিক আইন প্রযুক্ত হইবে। এই ব্যবস্থা বৈষম্যের কারণ অনেকে শত্রুপক্ষের হস্তে পতিত হইয়া উপায়ান্তর বিহীন অবস্থায় শত্রুপক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাদিগের অপরাধ লঘু মনে করিতে হইবে।

পুরাতনের পুনরাগমন—লাহোরে (২৬শে আগস্ট) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, শুনা যাইতেছে, বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে (রাজনীতিক অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার অভিপ্রায়ে) নূতন প্রস্তাব করিবেন। তাঁহার বিশ্বাস, সে-প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ক্রীপস প্রস্তাবেরই অনুরূপ হইবে। তিনি চীন, ভারতবর্ষ ইরান, ইরাক ও আফগানিস্থান লইয়া দক্ষিণ এশিয়া সংঘ গঠনের বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং বলেন,—পাকিস্থান ভারতবর্ষের উন্নতির পক্ষে বিষম বিঘ্ন হইবে এবং যে মুসলমানগণ আজ তাহা চাহিতেছেন, তাঁহাদিগের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবে। সত্য বটে বহু মুসলমান পাকিস্থানের পক্ষপাতী; কিন্তু তাঁহারা যে আকাঙ্ক্ষায় তাহা চাহিতেছেন, তাহা সর্বতোভাবে ভিত্তিহীন কারণ, কেহই ৯ কোটি মুসলমানের উপর প্রভুত্ব করিতে মুসলমানদিগের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। কংগ্রেসের বয়স ৬১ বৎসর হইল। এই দীর্ঘকালে—বিশেষ গত ২৫ বৎসরকালে কংগ্রেস বহু লোকের ত্যাগে যে দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিয়াছে, সেই ভিত্তির উপরে স্বাধীনতার সৌধ নির্মিত করিতে হইবে। কংগ্রেস লোকের মন হইতে ভীতি দূর করিয়াছে এবং গত ৩ বৎসরের দারুণ দমন ও প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্তের অভাবনীয় পরিবর্তন সংসাধিত করিয়াছে।

বোম্বাই অগ্নিকাণ্ড—গত ২৯শে আগস্ট বোম্বাই শহরে বিষম অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। প্যারামাউণ্ট চলচ্চিত্রের গৃহ এই অগ্নিদাহে বহু প্রাণনাশ করিয়াছে। অনুমান চলচ্চিত্রের গুদামে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া ব্যাপ্তি লাভ করে। বোম্বাইএ এই দ্বিতীয়বার এইরূপ অগ্নিকাণ্ড ঘটিল। গত ৩০শে আগস্ট পর্যন্ত ১৭ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদিগের মধ্যে কার্যাধ্যক্ষ সুবোধ গঙ্গোপাধ্যায়ের, বি ডি মুখোপাধ্যায়ের, এ সি মৈত্রের, মিসেস কিনানের এবং হীরাবাঈ তাঁহার ২টি শিশুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদ—আসামের ব্যবস্থা পরিষদ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ৩১শে আগস্ট আসামে ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত গোপীনাথ বরদলৈ (কংগ্রেস) গৌহাটি হইতে এক বিবৃতি প্রচার করিয়া বলিয়াছেন—যে সময়ে আসামের বহু সমস্যার সমাধানে আর বিলম্ব করা সংগত নহে, সেই সময় আগামী নির্বাচনের অজুহাতে নির্বাচনের ৫ মাস পূর্বে ব্যবস্থা পরিষদের অবসান ঘটান কখনই সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করা যায় না। বৃটেনে জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ না হইলেও নূতন নির্বাচনের জন্য ৬ সপ্তাহের অধিক সময় দেওয়া হয় নাই। কিন্তু আসামে সেইজন্য ৫ মাসকাল গভর্নরের স্বৈর শাসন বহাল রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে। ইহার কারণ এই যে, স্যার মহম্মদ সাদুল্লা ও তাঁহার সহ সচিবরা যে সকল কাজ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা আর ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত হইতে সাহস করেন না—পরিষদে তাঁহাদিগের পরাভব অনিবার্য। সেইজন্য ব্যবস্থা পরিষদের অবসান ঘটাইয়া তাহার ও তাঁহার সচিবসংঘের "মুখরক্ষা" করা হইতেছে।

তরুণ সাহিত্যিক সংঘ—বাঙলা তরুণ সাহিত্যিকদিগের পক্ষ হইতে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যিক সংঘ গঠিত হইয়াছে। গত ১লা সেপ্টেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি হলে তাহার প্রথম অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাঙলার বাহিরেও ইহার শাখা প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে।

আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১১

মদনের দোকান আসিয়া পড়িয়াছিল।

বারান্দার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নবগোপাল উচ্চৈস্বরে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল, "ও মদন! মদনমোহন! চক্কোত্তী কোথায় গো?"

কোনো জিনিসের সন্ধানে মদন দোকান-ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল, কাজের মধ্যে নবগোপালের নিরবসর ডাকের পীড়নে বিরত হইয়া উঠিয়া বলিল, "বাস্‌রে! যেন ঘোড়ায় চ'ড়ে সমন ধরাতে এসেছে! বাপের নামটাই শুধু ডাকতে বাকি!"

কিন্তু বাহিরে আসিয়া নবগোপালের সঙ্গীর কান্তিমান অভিজাত আকৃতি এবং সম্ভ্রান্ত বেশভূষা দেখিয়া একেবারে কেঁচো হইয়া গেল। বহুকাল যাবৎ ব্যবসা করিয়া করিয়া বাজে মাল এবং কাজের মাল নির্ণয়ের একটা ক্ষমতা তাহার জন্মিয়াছে। অশোককে দেখিয়াই বুঝিল, ভাল করিয়া পিষিতে পারিলে এ সরিষা হইতে সুবিধামত কিছু তৈল নিশ্চয়ই নির্গত হইবে। নত হইয়া মদন করজোড়ে নিঃশব্দে নমস্কার করিল; তাহার পর উচ্চৈস্বরে পুত্রকে ডাক দিয়া বলিল, "ওরে ভুতো, বাবুদের বসবার জন্যে দুটো মোড়া বার ক'রে দে।"

নবগোপাল বলিল, "শুধু মোড়া নয় মদন, তক্তপোষেরও ব্যবস্থা করতে হবে। আজ রেতে আমরা দুজনে তোমার দোকানে শোব।"

বিনয়নম্র কণ্ঠে মদন বলিল, "যে আজ্ঞে বাবু, এ ত' আনন্দের কথা। এ ঘর-দোর সবই আপনাদের, আমি শুধু আগলে ব'সে আছি। তা, উপস্থিত চা ইচ্ছে করছেন ত?"

উচ্ছ্বাসের সহিত নবগোপাল বলিল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! খুব তোফা ক'রে চা বানাও মদন।"

মদন বলিল, "বুঝেছি বাবু, চোদ্দ আনা পাউন্ড চলবে না, পাঁচ সিকে পাউন্ড্‌ ফেলতে হবে। চায়ের সঙ্গে খাবার কি দেবো বাবু?",

অশোকের দিকে নবগোপাল দৃষ্টিপাত করিল,—"কি খাবে বল অশোকবাবু? কেক্‌, না বিস্কুট, না দিশী?" তারপর মদনকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "খান চেরেক ডিমের মামলেট ভেজে দিতে পারবে মদন?—মামলেট?"

মদন বলিল, "কেন পারব না বাবু? হুকুম করলেই ভেজে দেবো।"

অশোক বলিল, "ও-সব কিছুই দিতে হবে না নবগোপালবাবু, আমার সঙ্গে অমলেটও খানকতক আছে।"

পথেই অশোক তাহার টিফিন-কেরিয়ার খাদ্যহীন করে নাই অবগত হইয়া নবগোপাল আনন্দিত হইল। টিফিন-কেরিয়ারের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তোমার টিফিন বাক্সোয় আছে না-কি?"

'হ্যাঁ।'

তৎক্ষণাৎ আগ্রহ সহকারে টিফিন-কেরিয়ার খুলিয়া ফেলিয়া খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য দেখিয়া নবগোপালের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, "এ যে মেলাই খাবার রয়েছে রে ভায়া!" তাহার পর নাড়িয়া চাড়িয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া খাবারগুলো পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, "পাঁচ ছ' খানা মামলেট ত দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কই অমলেট তো দেখছিনে?" একটা মাংসের কাটলেট্‌ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "একে তোমরা অমলেট্‌ বল না-কি? আমরা ত' একে কার্টলিস্‌ বলি।"

নবগোপালের কথা শুনিয়া স্মিতমুখে অশোক বলিল, "ভুল হ'য়ে গেছে নবগোপালবাবু, অমলেট আর কাটলেট আনতে ভুল ক'রে মামলেট্‌ আর কার্টলিস্‌ এনেছি। কিন্তু এ দিয়েও চা খাওয়া এক রকম চলে পারবে।"

সবেগে মাথা নাড়া দিয়া নবগোপাল বলিল, "এক রকম নয়রে ভাই, যে-রকম খোসবাই ছাড়ছে আমাদের ত তোফা চলবে, কিন্তু মদন চক্কোত্তীর সন্ধ্যেবেলার লাভের গুড়ে বালি! দু পেয়ালা চায়ে আর কত লাভ করবে বল? খান চেরেক মামলেট ভাজলে তবু বেচারার গোটা আষ্টেক পয়সা পোষাতো।"

সহানুভূতির তাড়নায় মদন চক্রবর্তীর মুখ নিষ্প্রভ হইয়া উঠিয়াছে লক্ষ্য করিয়া অশোক বলিল, "খাবার-টাবার যা দেবে তার চার্জ আলাদা কোরো, আপাতত আমাদের দুজনের রাত্রিবাস করবার বাবতে এইটে রাখ।" বলিয়া মনিব্যাগ হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া মদনকে দিতে উদ্যত হইল।

সহসা ক্ষিপ্রবেগে নবগোপাল দুই হাত দিয়া অশোকের টাকা শুদ্ধ হাত চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "আরে, কর কি? কত দিচ্ছ ওকে?"

বিস্মিত হইয়া অশোক বলিল, "দু টাকা।"

অশোকের হাত হইতে টাকা দুইটা বাহির করিয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "টাকা তোমাকে কামড়াচ্ছে না-কি? জনা-প্রতি দু আনা ক'রে শোওয়া,—মোট চার আনা। তাও কাল যাবার সময়ে ফেলে দিয়ে যেয়ো।"

অপ্রত্যাশিত লাভের পথে বাধা উপস্থিত দেখিয়া মদন ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সজোরে নবগোপালের মুষ্টি চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "ছাড় বলছি ঠাকুর! আমার হকের পয়সায় আটক দিয়ো না!" বয়স তাহার পঞ্চাশের কিছু ঊর্ধ্বে হইবে, কিন্তু সক্ষম বলিষ্ঠ দেহে যৌবনের শক্তি।

নবগোপাল বলিল, "হকের পয়সা কি রকম? রাত্রিবাসের রেট আমি জানিনে নাকি?"

মদনের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল। মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "আরে, রেখে দাও তোমার রাত্রি-বাসের রেট! ভাল হবে না কিন্তু, ছেড়ে দাও বলছি!" বলিয়া সহসা প্রবল বেগে এমন একটা হ্যাঁচকা টান মারিল যে, নবগোপালের মুষ্টিচ্যুত হইয়া টাকা দুইটা ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া সিমেণ্ট বাঁধানো মেঝের উপর পড়িয়া গেল। দ্রুতবেগে মদন সে দুইটা কুড়াইয়া লইয়া ট্যাঁকের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল।

নবগোপাল বলিল, "এই বুঝি তোমার হকের পয়সা চক্কোত্তি? এ ত' জুলুমজবর-দস্তির পয়সা।" বলিয়া অশোকের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া এমন অদ্ভুত একটা হাসি হাসিল যে, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটার রঙ বদলাইয়া গেল। মনে হইল, এতক্ষণ ধরিয়া যাহা কিছু বকাবকি ও কাড়াকাড়ি হইয়াছিল, নবগোপাল যেন বুঝাইতে চাহে, অভিনয় ভিন্ন তাহা আর কিছুই নহে।

মদন বহুরূপী প্রকৃতির মানুষ। নানা-লোকের সহিত বিচিত্রভাবে কারবার করিয়া

করিয়া প্রয়োজন মত রূপ পরিবর্তনের আশ্চর্য ক্ষমতা তাহার পুষ্টিলাভ করিয়াছে। মুহূর্তের মধ্যে নবগোপালের হাসির সহিত সন্ধি করিয়া লইয়া ফ্যাক করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "তা বাবু, আপনাদের মতো রাজালোকের ওপর জুলুমজবরদস্তি করব না ত'-কি গরীব-গুরেবোর ওপর করব? আপনাদের কাছ থেকেই ত' আমরা আব্দার ক'রে কেড়েকুড়ে নোবো।"

সামান্য গোটা দুই টাকার জন্য নবগোপালকে মদনের সহিত ওরূপ বচসা করিতে দেখিয়া অশোক মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মদনের আচরণের অনাবৃত লজ্জাহীনতা দেখিয়া ঘৃণায় তাহার গা ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল। 'রাজালোক' কথাটা যদিই বা কোনো প্রকারে পরিপাক করা যায়, 'আব্দার' কথাটা গলাধঃকরণ করাও কঠিন। আব্দারই ত' বটে! হাত ধরিয়া টান মারিয়া ছিনাইয়া লওয়া যদি আব্দার না হইবে তাহা হইলে দ্বিতীয় কোন্ বস্তু আর হইবে! স্বার্থের কীলকের উপর বসিয়া এত দ্রুতবেগে পাক খাইতে ইতিপূর্বে আর কোনো ব্যক্তিকে দেখিয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িল না।

ইতিমধ্যে ভৃত্য দুইখানা মোড়া রাখিয়া গিয়াছে। একখানা অশোকের দিকে আগাইয়া দিয়া মদন বলিল, "বাবুমশায়, ততক্ষণ ব'সে একটু বিশ্রাম করুন।"

মোড়ায় উপবেশন করিয়া অশোক বলিল, "বিশ্রাম ত' করছি, কিন্তু চায়ের কত দেরি মদন?"

"দেরি নেই বাবু, জল চাপানো হয়েছে, এতক্ষণে বোধ হয় হয়ে এল।" বলিয়া মদন ভিতরের দিকে মুখ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিল, "জলটা যদি হ'য়ে গিয়ে থাকে ত' বাইরে টেবিলের উপর দিয়ে যাও।"

উত্তরে বাড়ির ভিতর হইতে তীক্ষ্ম কর্কশ কণ্ঠের যে কয়েকটি কথা ভাসিয়া আসিল তাহা সদুত্তরও নহে, এবং শ্রীযুক্ত মদনের প্রতি শ্রদ্ধাব্যঞ্জকও নহে। পাছে বাহির হইতে আর অধিক কথোপকথন চালাইলে অধিকতর মানহানির সম্ভাবনা প্রবল হয় সেই আশঙ্কায় কালবিলম্ব না করিয়া মদন গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া চাপা মৃদুস্বরে যে কথা বলিল তাহা শোনা গেল, কিন্তু বুঝা গেল না।

উত্তরে কিন্তু অপর পক্ষের মুখে যে ভাষা উদ্রিক্ত হইল তাহা যথেষ্ট স্পষ্ট এবং কঠোর। যথা,—"ওরে মুখ-পোড়া, পারব না দিয়ে আসতে। গরম ক'রে দিয়েছি এই ঢের! কেনা বাঁদী না-কি যে, দিবারাত্তির খেটে খেটে ম'রে যাব?"

এবার কিন্তু মদন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। চাপা অথচ শ্রুতিগম্য কণ্ঠে বলিল, "আবাগের বেটি, চেঁচাসনে! বাইরে দুজন ভদ্রলোক আছে।"

মদনের তিরস্কারে অপর পক্ষ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ভদ্রলোকের উপস্থিতির জন্য কিছুমাত্র অবহিত না হইয়া তীক্ষ্মকণ্ঠে বলিল, "বাপ তুলে গাল দিলে ভাল হবে না বলছি! ফের ও কথা বললে এই কেটলি ভরা গরম জল গায়ে ছুঁড়ে দোবো।"

দেহের পক্ষে এই অতীব অশুভ প্রস্তাব শুনিয়া বাহিরে অশোকের পর্যন্ত চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আত্মরক্ষারত মদনের পশ্চাতে গরমজলের আক্রমণ যদি বাহিরের ঘর পর্যন্ত ধাবিত হয় তাহা হইলে বিপন্ন শুধু মদনই একা হইবে না! কিন্তু সেরূপ বিপদের কোনো সম্ভাবনা দেখা গেল না। তৎপরিবর্তে ক্ষণকাল পরেই রৌপ্য মুদ্রার মৃদু শিঞ্জন শুনা গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে মদনের অস্পষ্ট গুঞ্জন।

১২

পর মুহূর্তেই বাহিরের ঘরে মদন প্রবেশ করিল, এবং তাহার পশ্চাতে প্রবেশ করিল দীর্ঘ-অবগুণ্ঠনবতী একটি স্ত্রীলোক,—কৃশ, খর্বকায়,—দক্ষিণ হস্তে ধূমায়িত গরম জলের কেটলি। ঘরের এক প্রান্তে একটা উঁচু টেবিলের উপর জলের কেটলি রাখিয়া সে চা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

স্ত্রীলোকটির সম্বন্ধে নবগোপালের মনে কৌতূহলের উদ্রেক হইয়াছিল; মদনকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ মেয়েটি কে মদন? ঠিক বুঝতে পারছিনে ত।"

ঈষৎ স্মিতমুখে বিনীত কণ্ঠে মদন বলিল, "আজ্ঞে, এটি আমাদের ভুতোর মা।"

"ভুতোর মা?" সবিস্ময়ে নবগোপাল বলিল, "ছেলেমানুষ দেখে আমি ভেবেছিলাম ভুতোর বউ।"

জিভ কাটিয়া মাথা নাড়িয়া মদন বলিল, "আজ্ঞে না, ভুতোর মা-ই বটে। মাথায় খাটো, আর ঘোমটা দিয়ে আছে ব'লে ভুল হচ্ছে। মুখ দেখলে বুঝতে পারতেন বয়েস হয়েছে।"

নিজের বিষয়ে মদনের মুখে এইরূপ ব্যাখ্যান শুনিয়া ভুতোর মা অবগুণ্ঠনের মধ্যে ফোঁস্ করিয়া উঠিল। বাক্য তার ঠিক বোঝা গেল না, কিন্তু তাৎপর্য দুর্বোধ্য নহে।

ভুতোর মার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অনুচ্চস্বরে মদন বলিল, "তাহ'লে তুমিই চা করছ ত?"

ভুতোর মা কথা কহিয়া উত্তর দিল না, কিন্তু তাহা অর্থব্যঞ্জক নীরবতা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে সে-ই চা প্রস্তুত করিতেছে।

প্রসন্নমুখে অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মদন বলিল, "তা হ'লে বাবুমশায়রা ভাল চা-ই আজ পাবেন। ও চা করে ভাল।"

চলাফেরা এবং কাজকর্মের অন্যমনস্কতায় ভুতোর মার অবগুণ্ঠন ধীরে ধীরে খানিকটা অপসৃত হইয়া গিয়াছিল। অ্যাসিটেলিনের উজ্জ্বল আলোকে সহসা এক সময়ে তাহার মুখের কিয়দংশ দেখিতে পাইয়া অশোক বুঝিল মদন কিছুমাত্র অত্যুক্তি করে নাই,—তাম্রাভ বর্ণের ক্ষুদ্র একটুখানি মুখের মধ্যে ঝুনো নারিকেলের মতো এমন একটা রুক্ষ পাকা ভাব যে, ভুতোর মা-র ত কথাই নাই, ভুতোর ঠাকুরমা বলিলেও অবিশ্বাস করিবার তেমন কিছু থাকে না। সেই অতি-পরিপক্ক মুখের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তীক্ষ্ম দুটি চক্ষু, আর চিলের চঞ্চুর মতো অত্যন্ত খাড়া এক নাসিকা।

স্বল্পোন্মোচিত অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া নবগোপালের সহিত হঠাৎ চোখোচোখী হইয়া যাওয়ায় ভুতোর মা চকিতে অশোককে দেখিয়া লইয়া বিস্মিত হইয়া অবগুণ্ঠন উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। তাহার পর মদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে বলিল, "আচ্ছা, তোমার আক্কেলটা কি রকম বল দেখি?"

শঙ্কিত হইয়া মদন বলিল, "কেন, কি হয়েছে?"

অশোক ও নবগোপালের দিকে অঙ্গুলি দেখাইয়া ভুতোর মা বলিল, "দুজনেই ত ছেলেমানুষ, আমার ভুতোর চেয়ে ছোট বই বড় নয়, আর তুমি যে বললে বাইরে দুজন ভদ্রলোক এসেছে?"

এ কথা মদনের বিলক্ষণ জানা ছিল যে, ভুতোর মার প্রশ্ন যতই অবৈধ হোক না কেন, তাহার প্রতিবাদে ন্যায়সঙ্গত উত্তর দেওয়ার মতো অমার্জনীয় অপরাধ আর নাই। সুতরাং প্রশ্নের আসল দিকটা এড়াইয়া গিয়া, অর্থাৎ ছেলেমানুষের পক্ষেও যে ভদ্রলোক হইবার বিষয়ে অনতিক্রমণীয় বাধা নাই, তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া বলিল, "না, ছেলেমানুষ ত বটেই।"

"তবে যে ভদ্দরলোক ব'লে ওদের সামনে তুমি আমাকে ঘোমটা দিইয়ে আনলে? ছেলেমানুষদের সামনে ঘোমটা দিয়ে আসতে আমার লজ্জা করে না?"

মদন ঘোমটা দেওয়াইয়া আনে নাই, পরন্তু ভুতোর মা নিজেই ঘোমটা দিয়া আসিয়াছিল, সে কথা বলিলে অবশ্য সত্য কথা বলা হইত। কিন্তু সময় বিশেষে ভুতোর মার কাছে সত্যকথা বলায় বিপদ আছে সেই বিবেচনায় মদন চুপ করিয়া রহিল। আর ভুতোর মার মতো লজ্জাশীলা স্ত্রীলোকের পক্ষে ঘোমটা দিয়া আসা যে

সত্যই লজ্জার কথা তাহার বিরুদ্ধে মদনের কোন বক্তব্যই ছিল না।

চুপ করিয়া থাকিয়াও কিন্তু মদন রেহাই পাইল না। চায়ের পেয়ালায় চিনি মিশাইতে মিশাইতে ভুতোর মা গজ্ গজ্ করিতে লাগিল, "একটুও যদি আক্কেল থাকে! নিজে ভদ্রলোক ব'লে সব্বাইকে বলতে হবে ভদ্রলোক!"

ছেলেমানুষ এবং ভদ্রলোকের সমস্যার সূক্ষ্ম জটিলতার মধ্যে নবগোপাল বোধহয় ঠিক প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না, তাই সে নিরুপায় হইয়া চুপ করিয়া ছিল। কিন্তু বারংবার একই কথার অকারণ আবৃত্তি দুঃসহ হইল অশোকের। সে বলিল, "মদন ভদ্রলোক তা'তে আপত্তি করিনে, কিন্তু তাই ব'লে আমাদের ভদ্রলোক বলায় মদনের কি অপরাধ হ'ল তাও কিন্তু বুঝতে পারছিনে!"

পেয়ালা দুইটা টেবিলের এক প্রান্তে রাখিতে রাখিতে সহাস্যমুখে অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভুতোর মা বলিল, "তাই কি কখনো হ'য়ে থাকে বাবা? যে ছেলেটা আজকে পেট থেকে পড়ল তাকেও কি তুমি ভদ্রলোক বলবে? আজ তিন দিন হ'ল মুখুজ্যেদের সেজ বউয়ের একটি ছেলে হয়েছে। কি তুমি বলবে বল?—সেজ বউয়ের খোকা হয়েছে না ব'লে ভদ্দোর লোক হয়েছে বলবে কি?"

দৃষ্টান্তর দ্বারা সমর্থিত ভদ্রলোক শব্দের ব্যঞ্জনার এই নবতর সীমা-বন্ধনের বিরুদ্ধে ঠিক কি বলিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া অশোক এক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "তা হয় ত' বলব না, কিন্তু তাই ব'লে ভদ্রলোক মানে বুড়োলোকও নয়।"

ভুতোর মা বলিল, "কিন্তু ভদ্রলোক মানে ত' ছেলেমানুষও নয় বাবা।"

এ কথার পর অশোক চুপ করিয়া গেল। এই যুক্তিহীন যুক্তির বেয়াড়া তর্কপদ্ধতির বিরুদ্ধে যুত করিয়া তর্ক করিবার সে বাগ পাইল না।

অশোকের নিরুত্তরতা লক্ষ্য করিয়া মদন মনে করিল তাহার স্ত্রীর যুক্তির নিকট সে পরাভূত হইয়াছে। সহানুভূতিমিশ্রিত পরামর্শের অনুচ্চ কণ্ঠে সে বলিল, "তক্কো করবেন না বাবু, ওর সঙ্গে। ভারি তাক্কিক মেয়ে-মানুষ, তক্কো করে ওর সঙ্গে পেরে উঠবেন না। পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে কি-না তাই অত তক্কো করতে পারে। ওর মেজ মামার ভায়রাভাই নবদ্বীপে কোন টোলে পণ্ডিতি করে।" তাহার পর কণ্ঠস্বর আরো নিচু করিয়া অশোকের কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, "তাই আমি তক্কো করিনে, চুপ ক'রে থাকি।"

মদনের কথা শুনিয়া অশোকের মুখে হাসি দেখা দিল। কেন যে মদন তাহার স্ত্রীর সহিত তর্ক করে না তার কিছু আভাস ইতিপূর্বেই সে পাইয়াছে; মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, আমিও করব না।"

খুসি হইয়া মদন বলিল, "ক'রে কোনো লাভ নেই বাবু, ভারি আড়বুঝো মানুষ, আর অত্যন্ত বদরাগী। কিন্তু আসলে লোক খারাপ নয়, মনটা ওর ভাল। সুখের দিনে ও কারো নয়, কিন্তু বিপদের দিনে ওর মত বন্ধু আর নেই।"

ওদিকে নবগোপালের সহযোগিতায় ভুতোর মা অশোকের টিফিন-কেরিয়ার হইতে খাদ্যদ্রব্য বাহির করিয়া দুইটা প্লেটে সাজাইয়া রাখিতে ব্যস্ত ছিল, হঠাৎ পিছন ফিরিয়া মদনকে অশোকের সহিত নিম্নকণ্ঠে কথা কহিতে দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল। খানিকটা আগাইয়া আসিয়া সে বলিল, "ফিস্ফিস্ ক'রে বাবুর কাছে কি আমার এত নিন্দে করছ শুনি?"

কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া মদনের মুখ শুকাইয়া উঠিল। অশোক কিন্তু তাহাকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সহাস্য-মুখে বলিল, "নিন্দে নয় ভুতোর মা, মদন তোমার সুখ্যাতিই করছিল।"

অশোকের কথা শুনিয়া ভুতোর মা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "তুমি আমাকে ছেলেমানুষ পেলে বাবা? সুখ্যাতি আবার কেউ চুপিচুপি করে?"

অশোক বলিল, "পাছে তুমি নিজের সুখ্যাতি শুনে লজ্জা পাও, তাই বোধহয় চুপিচুপি করছিল।"

এ কৈফিয়ৎ ভুতোর মার মোটেই মনঃপূত হইল না। ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "ও তুমি আমাকে বাজে কথা বলছ বাবা। ভুতোর বাপ ভালরকমই জানে যে, নিজের সুখ্যাতি শুনে লজ্জা পাব, এমন বেহায়া মেয়ে আমি নই। কিন্তু এখন এসব কথা থাক। চা দিয়েছি, খাবে এস।"

একটা ঘটিতে জল ছিল, ভুতোর মা সেটা লইয়া অশোককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "নাও, মুখ হাত একটু ধুয়ে ফেল, শরীরটা ঠাণ্ডা হবে।" বলিয়া বারান্দার ধারে আসিয়া অশোকের হাতে জল ঢালিয়া দিল।

টেবিলের ধারে একটা বেঞ্চ পাতা। মুখ হাত ধুইয়া আসিয়া অশোক তাহার উপর উপবেশন করিল। পার্শ্বে নবগোপাল,—বামহস্তে অর্ধনিঃশেষ চায়ের পেয়ালা এবং দক্ষিণ হস্তে একটা কাটলেটের সামান্য একটু ভুক্তাবশেষ। মুখমণ্ডলে পরিতৃপ্তি এবং আনন্দের অনাবৃত দীপ্তি।

"কিছু মনে কোরো না ভায়া, আগেই আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। তোমার কাটলিসের যা খোসবায়, সামলাতে পারলাম না।"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "না, না, মনে করব কি? আরম্ভ করেছেন এ ত' সুখের কথা।"

"তা ছাড়া তোমার জিনিস আমি আরম্ভ করব না ত কি তুমি আরম্ভ করবে? তুমি আরম্ভ করলেই ত খারাপ দেখাত। কি বল?"

ঘাড় নাড়িয়া অশোক বলিল, "খুব খারাপ দেখাত।"

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়াই অশোক বুঝিল, ভুতোর মার চা প্রস্তুত করিবার প্রশংসার বিষয়ে মদন অত্যুক্তি করে নাই। সুগন্ধ সুস্বাদু চা পাইয়া খুসি হইয়া সে প্রশংসার দ্বারা ভুতোর মাকে সন্তুষ্ট করিয়া আর এক পেয়ালা চাহিয়া লইয়া পান করিল।

১৩

ভুতোর মার সৌজন্যে রাত্রে আহারের ব্যবস্থাও পরিতোষজনক হইল। লুচি তরকারি, মাছ, মাংস, ডিম, মিষ্টান্ন, খাঁটি দুধ,—কোনো কিছুরই অভাব ছিল না; কিন্তু সব কিছুকেই অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল উভয়কে আহার করানোর মধ্যে ভুতোর মার ঐকান্তিক যত্ন। আহারান্তে অশোক এবং নবগোপাল শয়নের জন্য পাশের ঘরে উপস্থিত হইল।

অশোকের বেডিং-এর সহিত কিছু কিছু নিজেদের শয্যাদ্রব্য যোগ করিয়া ভুতোর মা একটা তক্তপোষের উপর পাশাপাশি দুইটি শয্যা বিছাইয়া অশোকের প্রশস্ত মশারি দিয়া উভয় শয্যা ঢাকিয়া দিয়াছিল। পথশ্রমক্লান্ত অশোক সুরচিত শয্যার আকর্ষণে লুব্ধ হইয়া মশারির ভিতর প্রবেশ করিল, কিন্তু নিদ্রা তাহার চক্ষে কিছুতেই নামিতে চাহে না। নূতন জায়গায় স্বস্তিহীনতার একটা সূক্ষ্ম বিঘ্ন ত' ছিলই; তাহার উপর ছিল নির্বাত বর্ষাদিনের ভাপসা গরম। ভুতোর মা অবশ্য গরমের কথা ভাবিয়া একটা তাল-পাতার পাখা দিতে ভুলে নাই; কিন্তু হাত পাখায় অনভ্যস্ত অশোক পাখা চালনা এবং নিদ্রাকর্ষণের মধ্যে সুবিধামত কোনো প্রকার যোগ-সাধন করিতে পারিতেছিল না। পাখা চালাইলে গরম যায় বটে, কিন্তু সেই ব্যায়ামের তাড়নায় নিদ্রা দূরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। পাশে শুইয়া নবগোপাল কিন্তু নূতন জায়গার এবং ভাপসা গরমের উভয় বাধাকেই সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়াছে। পরিপাটি আহারের কল্যাণে পরিতৃপ্ত দেহ সুগভীর নিদ্রার কবলে নিজেকে অর্পণ করিয়া সজোরে নাসিকাগর্জন করিয়া চালিয়াছিল। অশোকের নিদ্রার পক্ষে তাহাই হইয়াছিল

তৃতীয়, এবং বোধ করি সর্বাপেক্ষা উৎপীড়ক, বাধা।

ইহার উপর ক্ষণকাল পরে যোগ দিল আরশ্লার উৎপাত। কতকগ্লো আরশ্লা উড়িয়া ঝপ্‌ঝপ্‌ করিয়া মশারির গায়ে বসে, তাহাতে অবশ্য মনের মধ্যে শ্ধ্ অস্বস্তিই দেখা দেয়; কিন্তু মশারির বাহিরে তক্তপোষের উপর খস্‌খসানি শব্দ শ্নিয়া অশোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। ইহা নিশ্চয়ই আরশ্লার শব্দ নহে। নবগোপালের দেহে ধীরে ধীরে নাড়া দিয়া সে ডাকিতে লাগিল, "নবগোপাল-বাব্! নবগোপালবাব্!"

নাড়া খাইয়া প্রথমে নবগোপালের নাক-ডাকা বন্ধ হইল, তাহার পর সচেতন হইয়া অশোকের দিকে ফিরিয়া বলিল, "কি হ'ল ভায়া? জল খাবে না-কি?"

ঈষৎ ভীতকণ্ঠে অশোক বলিল, "মশারির বাইরে কিসের খস্‌খস্‌ শব্দ হচ্ছে।"

ঠিক সেই সময় একটা আরশ্লা উড়িয়া আসিয়া ঝপ্‌ করিয়া মশারির গায়ে বসিল। নিশ্চিন্ত হইয়া নবগোপাল বলিল, "ভয় নেই, আরশ্লা।"

অশোক বলিল, "এ আরশ্লা তা জানি, কিন্তু তক্তপোষের উপর যা খস্‌খস্‌ ক'রে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে তা কখ্খনো আরশ্লা নয়। বোধহয় সাপ-টাপ কিছ্ হবে।"

অশোকের কথা শ্নিয়া নবগোপাল তাড়াতাড়ি মাঝখানের দিকে খানিকটা সরিয়া আসিয়া বলিল, "রেতের বেলা ও কথা উচ্চারণ করতে নেই, লতা বলতে হয়।" তাহার পর পা দ্'টো সামান্য গ্টাইয়া লইয়া বলিল, "তা হ'তেও পারে। এই সব দোকান ঘরেই ত' গোখরো-লতাদের আড্ডা। হাত-পা একট্ গ্টিয়ে শোও ভায়া, মশারির গায়ে যেন না ঠেকে।"

বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে অশোক বলিল, "হাত-পা না-হয় গোটালাম, কিন্তু মাথা? মাথায় যদি গোখরো-লতা ছোবল মারে তার কি করছেন বল্ন? মাথাও গোটাতে হ'লে সারারাত এই রকম খাড়া হ'য়ে ব'সে থাকতে হয়।"

ঠিক সেই সময় মশারির পাশে নবগোপালের দিকে একটা জোর খস্‌খসানি শোনা গেল। তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া নবগোপাল বলিল, "মদনকে ডাকবো না-কি একবার?"

মদনকে ডাকিবার প্রয়োজন হইল না। কাজকর্ম সারিয়া রান্নাঘর নিকাইয়া ভুতোর মা শ্ইতে যাইতেছিল, অশোক এবং নবগোপালের কথোপকথনের শব্দ শ্নিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এখনো জেগে রয়েছ বাবারা? গরমে ঘ্ম হচ্ছে না ব্ঝি?"

নবগোপাল বলিল, "গরম নয় ভুতোর মা, মশারির ধারে তক্তপোষের ওপর কি খস্‌খস্‌ ক'রে চ'লে বেড়াচ্ছে। লতাটতা কি-না কে জানে!"

হ্যারিকেনটা তেজ করিয়া লইয়া ভুতোর মা তক্তপোষের নিকট আসিতেই একটা বড় ইঁদ্র তক্তপোষের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলাইয়া গেল। নিশ্চিন্ত হইয়া ভুতোর মা বলিল, "একটা ইঁদ্র ছিল বাবা। এ ঘরে তাঁদের বড় একটা দেখা-টেখা যায় না। তবে ওপাশের গ্দোম ঘরে গোটা দ্ই আছে বটে। কিন্তু তাঁরা বাস্তু-নতা ব'লে কোনো অনিষ্ট করে না।" বলিয়া ভুতোর মা 'বাস্তু-নতা'দের উদ্দেশে কর-জোড়ে প্রণাম করিল।

অশোক বলিল, "বাস্তু-নতা কোন্‌ নতা? গোখরো-নতা?"

ভুতোর মা বলিল, "হ্যাঁ। বাস্তু-নতা মানেই তাই। কিন্তু তোমাদের কোনো ভয় নেই বাবা, এ ঘরে তাঁরা আসে না। নিশ্চিন্তি হ'য়ে তোমরা ঘ্মোও।"

নিশ্চিন্ত বলিলেই যদি নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত তাহা হইলে আর দ্ঃখ ছিল না! ইঁদ্র-রূপ খাদ্য যদি এ ঘরে খাদককে নিমন্ত্রণ করিয়া টানিয়া লইয়া আসে এবং তাহার পর মশারির মধ্যে নড়ন্ত পায়ের বৃদ্ধাঙ্গ্লিকে খাদ্য বলিয়া ভুল করিয়া বাস্তু-নতা যদি তাহাকে ছোবল মারিয়া বসে, তাহা হইলে যে মারাত্মক অবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহার দ্শ্চিন্তা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া অশোক চুপ করিয়া রহিল।

লণ্ঠনটা প্নরায় নিস্তেজ করিয়া রাখিয়া ভুতোর মা কক্ষ পরিত্যাগ করিল।

"কিছ্ ভয় নেই, দ্র্গা ব'লে শ্য়ে পড় ভায়া।" বলিয়া হাত-পা এবং মাথা যথা-সম্ভব গ্টাইয়া নবগোপাল শ্ইয়া পড়িল, এবং অবিলম্বে ভুতোর মার উপদেশ পালন করিয়া নিশ্চিন্তভাবে নাক ডাকাইতে লাগিল।

বিরক্তিবিরূপ মন লইয়া অশোক ক্ষণ-কাল খাড়া হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর নবগোপালের দৃষ্টান্ত অন্সরণ করিয়া সে-ও যথাসম্ভব দেহ কুঁকড়াইয়া শ্ইয়া পড়িল। নিদ্রাল্তা এবং নিদ্রাহীনতার সহিত য্দ্ধ করিতে করিতে অজ্ঞাতসারে এক সময়ে সে যখন ঘ্মাইয়া পড়িল, তখন রাত্রি দ্'টা অতিক্রম করিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

ক্ষারধর্ম্মী খাদ্য ও স্বাস্থ্য

শ্রীকুঞ্জরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

(১)

আমাদের রক্ত ক্ষার ও অম্লের মধ্যবর্তী অবস্থায় (neutral) থাকিলেও, ইহার ভিতর ক্ষারের ভাগই কিঞ্চিৎ বেশি এবং অম্লের ভাগ কতকটা কম। দেহের স্বাস্থ্য বিশেষভাবে রক্তের এই অবস্থার উপর নির্ভর করে।

কোন কারণে রক্তের ক্ষারত্ব কমিয়া গেলে শ্বেতকণিকার কার্যকারিতা হ্রাস পায়, দেহের স্নায়বিক শক্তি (normal reflexes) কমিয়া আসে এবং যে-সকল ব্যবস্থার (reactions) উপর দেহ-যন্ত্রের পরিচালনা (life processes) নির্ভর করে, তাহা দুর্বল হইয়া আসে। তাহা ব্যতীত রক্তের ক্ষারত্ব কমিয়া গেলে সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়া আসে (J. H. Kellog, M. D.—Rational Hydrotheraphy, P. 967). এই জন্যই মধুমেহ (diabetes) রোগে যখন রক্তের ক্ষারত্ব কমিয়া যায়, তখনি বিভিন্ন চর্মরোগ, গ্যাংগ্রিণ ও চক্ষের হানি প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সর্বপ্রকার জ্বর, বাতব্যাধি গ্রন্থিবাত (Gout) এবং বিভিন্ন শ্রেণীর অজীর্ণ রোগেও রক্তের ক্ষারত্ব কমিয়া আসে। আবার এই সকল রোগও কেবল রক্তের ক্ষারত্ব কমিয়া গেলেই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে যদি রক্ত একটু কম ক্ষার-ভাবাপন্ন হয় এবং রক্তে এই অম্লের পরিমাণ কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে আমাদের মৃত্যু হইয়া থাকে (W. D. Halliburton, M.D., F.R.C.P.—Hand-book of Physiology, P. 588).

কেহ কেহ বলেন, আমাদের যে মৃত্যু হয়, তাহা দিনের পর দিন দেহে অম্লবিষ শোষিত হইবার শেষ ফল মাত্র (Willam Howard Hay, M.D.—Health via food, P. 58).

দেহে ক্ষার ও অম্লের সঞ্চয় হয়, প্রধানতঃ আমাদের গৃহীত খাদ্য হইতে। আমরা যাহা আহার করি, পরিপাকের পর তাহা হয় ক্ষার জাতীয় না হয় অম্ল জাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। কোন খাদ্য দ্রব্য যদি বাহিরে দগ্ধ করা হয়, তবে তাহার একটা ভস্ম অবশিষ্ট থাকে। দেহের ভিতরও অক্সিজেনের আগুনে যখন খাদ্য দগ্ধ হয়, তখনও তাহা একটা ভস্ম অবশিষ্ট রাখে। এই ভস্মের ভিতর যে ধাতব পদার্থ (mineral salts) থাকে, উহারা দেহের ভিতর গলিয়া গিয়া দেহের অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করে। কতগুলি ধাতব লবণ (সোডিয়ম, পটাসিয়ম, ক্যালসিয়ম, ম্যাগনেসিয়ম ও লোহ) দেহের ক্ষারত্ব উৎপন্ন করে। আবার কতগুলি (ক্লোরিন, সালফর, ফসফরাস ও কার্বন) অম্লত্ব উৎপন্ন করিয়া থাকে।

যে-সকল খাদ্যের প্রতিক্রিয়া ক্ষারত্বজনক, উহাদিগকে ক্ষারধর্মী খাদ্য (alkaline ash residue) বলা হয়। এই সকল খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করিলেই দেহে ক্ষারের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আবার যে-সকল খাদ্যের প্রতিক্রিয়া অম্লত্বজনক উহাদিগকে অম্লধর্মী খাদ্য (acid ash residue) বলা হয়। এই জাতীয় খাদ্য বেশি পরিমাণ খাইলে রক্তের প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক হইতে কম ক্ষারভাবাপন্ন হইতে পারে। কখন কখন বা সমভাবাপন্ন (neutral) হয়। যখন আহারের দোষে রক্ত কম ক্ষারভাবাপন্ন হয়, তখন অনেক সময় রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

জীবন ক্রিয়ার ফলেও (during metabolism) সর্বদাই আমাদের দেহে বিভিন্ন জাতীয় অম্লবিষ (carbonic, phosphoric, এবং sulphuric acid প্রভৃতি) উৎপন্ন হইতেছে। কিন্তু দেহের এই বিষ ধ্বংস ও দেহ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য ভগবান দেহের ভিতরে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

যদিও রক্ত সামান্য মাত্র অধিক ক্ষারধর্মী, তথাপি ইহার ভিতর এমন কতগুলি জিনিস (sodium bicarbonate, di-sodium hydrogen phosphate এবং alkali salts of proteins) রহিয়াছে যাহার জন্য রক্ত যথেষ্ট অম্ল নষ্ট করিতে পারে। ইহারাই রক্তের ক্ষার সঞ্চয় (alkali reserve) গঠন করে। ইংরেজীতে ইহাদিগকে buffer substances বলা হয়। তাহা ব্যতীত নিশ্বাসের সঙ্গে দেহ হইতে যথেষ্ট অম্লবিষ (carbonic acid) বাহির হইয়া যায় এবং মল, মূত্র ও ঘর্মের ভিতর দিয়াও প্রচুর অম্লবিষ দেহ হইতে বিদায় লাভ করে, এই জন্য খাদ্যে ক্ষার ও অম্লের অনুপাত ঠিক ঠিক না হইলেও স্বাভাবিক অবস্থায় সর্বদাই রক্ত ক্ষারধর্মী থাকে (N. Thomas Saxi, M.D.—Pediakric Dictetics, P. 152).

কিন্তু যদি দীর্ঘ দিন অনিয়ম চলিতে থাকে তবে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে দেহের বিভিন্ন যন্ত্র ক্রমশ দুর্বল হইয়া আসে এবং দেহের ভিতর একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তখন দেহে অম্লের অনুপাত বৃদ্ধি পায় এবং তখনই একটা রোগ হইয়া থাকে।

এই জন্য খাদ্য নির্বাচনে খাদ্যের পরিণতি ক্ষার কি অম্ল তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা একান্ত ভাবে আবশ্যক।

(২)

মোটামুটি কথায় বলা যাইতে পারে মাত্র দুধ, ফল, বিভিন্ন শাক সবজি, সীম-জাতীয় বীজ এবং ডাল ক্ষারধর্মী খাদ্য। ইহা ব্যতীত ভাত, রুটি, মাছ, মাংস ও ডিম্ব প্রভৃতি সাধারণতঃ আমরা যাহা খাই, সমস্তই প্রায় অম্লধর্মী খাদ্য।

কোন খাদ্যের স্বাদ মুখে অম্ল বোধ হইলেই যে, তাহা অম্লধর্মী খাদ্য হইবে, তাহা কিন্তু মনে করা উচিত নয়। কোন খাদ্যের প্রতিক্রিয়া তাহার আস্বাদ দ্বারা স্থির করা যায় না। টকজাতীয় ফলগুলি খাইতে টক হইলেও উহারা ক্ষারধর্মী খাদ্য। কারণ পরিপাকের পর সর্বদাই উহারা ক্ষারধর্মী পদার্থে পরিণত হয়। উহাদের ভিতর যে টকজাতীয় জিনিস থাকে তাহা শর্করা ও শ্বেতসারের (carbohydrate) মতই দগ্ধ (oxidised) হইয়া দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে এবং অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা একটা ক্ষারজাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত হয়। (James S. Mc Lister, M. O.—Nutrition and Diet, P. 230)

এই জন্য দেহে ক্ষারের সঞ্চয় বৃদ্ধি করার প্রধান উপায়ই টকজাতীয় ফল (acid fruits) গ্রহণ করা।

বিভিন্ন অম্ল পদার্থের (good acids) মধ্যে citric acid, malic acid, tartaric acid ও lactic acid মাত্র দেহের কাজে ও উপকারে আসে। আর কোন অম্লই (acetic, oxalic, tannic, benzoic ও uric acid) দেহের কাজে আসে না এবং অল্পাধিকরূপে দেহের অনিষ্ট করিয়া থাকে।

ল্যাকটিক এ্যাসিড সাধারণতঃ দধির

ভিতর থাকে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় অম্ল-বলী প্রধানতঃ ফলের ভিতর থাকে। কমলা নেবু, বাতাবি নেবু, পাতি নেবু ও কাগজি নেবুর ভিতর যথেষ্টরূপে সাইট্রিক এ্যাসিড পাওয়া যায়। এই জন্য এই ফল-গুলি (citrus fruits) যথেষ্টরূপে গ্রহণ করিলে সর্বপ্রকার রক্তাম্লতা (acidosis) দ্রুত নষ্ট হয়। তাহা ব্যতীত বেদানা, কাল কিসমিস ও টমেটোর ভিতরও ইহা থাকে।

আপেল, পিয়ারা ও আঙুর প্রভৃতিও উপকারী ফল। কারণ ইহাদের ভিতর ম্যালিক এ্যাসিড আছে। এই এ্যাসিড সাইট্রিক এ্যাসিডের মতই সম্পূর্ণভাবে দেহের ভিতর দগ্ধ হয়। সুতরাং এই ফলগুলি ক্ষার সম্পদে কমলা নেবু প্রভৃতির মতই মূল্যবান। টমেটোও এই এ্যাসিডের একটি শ্রেষ্ঠ আধার।

আঙুরের ভিতর টারটারিক এ্যাসিডও যথেষ্ট পরিমাণ থাকে। আঙুরের ভিতর যে-টক পদার্থ থাকে, তাহা আসে প্রধানতঃ এই এ্যাসিড হইতে। এই এ্যাসিড সম্পূর্ণ দগ্ধ না হইলেও, দেহের পক্ষে বিশেষভাবে হিতকর।

সাধারণ খাদ্যের ভিতর সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষার উৎপন্ন হয় কিসমিস ও বিভিন্ন সিম জাতীয় বীজে। এই জন্য প্রতিদিন যত বেশি সম্ভব কিসমিস গ্রহণ করা উচিত। কিসমিসগুলি খাইবার পূর্বে সর্বদাই ১২ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখা উচিত। তাহা হইলে উহা জলে ফুলিয়া গন্ধে ও স্বাদে অনেকটা আঙুরের মতই হয় এবং অনেকটা সুপাচ্য হয়। যে-জলে কিসমিস ভিজান হয়, তাহাও ফেলিয়া দিতে নাই। কারণ ঐ জলের ভিতর অনেকটা খাদ্য দ্রব্য নামিয়া আসে।

সীম জাতীয় বীজের আমাদের দেশে ততটা চলন নাই। কিন্তু সমস্ত সভ্য জগতেই ইহা যথেষ্টরূপে চলিয়া থাকে। সয়াবিন, হোরিকর্টাবিন এবং ব্রাডবিন প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর বিন আছে। এই সমস্ত বিনই বিভিন্ন খাদ্যসম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

কিসমিস ও বিনের পরই আলুর কথা বলিতে হয়। আলু একটি বিশিষ্ট ক্ষার-ধর্মী খাদ্য। খাদ্য নির্বাচনে সর্বদাই আলুর উপর জোর দেওয়া আবশ্যক।

কোন্ খাদ্য পরিপাকান্তে কতটা ক্ষার বা অম্ল উৎপন্ন করে বর্তমানে তাহা নির্ণীত হইয়াছে। গোদুগ্ধ প্রতি ১০০ গ্রামে (c. c. net alkali per hundred grams) ক্ষার উৎপন্ন করে ২.৩৭, মূলা ২.৯৭, ফুলকপি ৩.৩৩, আপেল ৩.৭৬, বাঁধাকপি ৪.৩৪, পিচ ফল ৫.০৪, নেবু ৫.৪৫, কলা ৫.৫৬, কমলা নেবু ৫.৬১, কাল কিসমিস ৫.৯৭, শুষ্ক কলাই শুটি ৭.০৭, আলু ৭.১৯, লেটুস ৭.৩৭, গাজর ১০.৮২, বিট ১০.৮৬, বাদাম ১২.৩৮, কিসমিস ২৩.৬৮, শুষ্ক সীম জাতীয় বীজ ২৩.৮৭ এবং শুষ্ক মিলা বিন ৪১.৬৭। ডালও একটি ক্ষারধর্মী খাদ্য। ইহাদের ভিতর মুগ ডালই ক্ষার সম্পদে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাহার পর কড়াই এবং তাহার পর অড়হরের স্থান।

এই সঙ্গে অম্লধর্মী পদার্থগুলির পরিচয়ও জানিয়া রাখা আবশ্যক। গমের রুটি প্রতি ১০০ গ্রামে অম্ল উৎপন্ন করে ৩.০, ডিম্বের শ্বেতাংশ ৫·২৪, ভাত ৮·১, ক্রেকার ৭.৮১, ডিম ১১.১০, ওটমিল ১২.৯৩, মাংস ১৩.৯১, মাছ ১৬.০৭ ও ডিম্বের কুসুম ২৬.৬৯ (Clifford J. Barborka—Treatment by Diet, p. 9).

ইহা ব্যতীত এমন কতগুলি দ্রব্য আছে যাহাদের খাদ্য-শেষ ভস্ম অম্ল অথবা ক্ষার ভাবাপন্ন নয়। উহাদিগকে সমভাবাপন্ন খাদ্য (Neutral food) বলা হয়। চিনি ও উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ চর্বিজাতীয় পদার্থ (fat) এই শ্রেণীর অন্তর্গত (Robert Hutchinson, M.D., F.R.C.P.—Food and Principles of Dietatics, p. 335).

এই খাদ্যগুলি হইতে কোন দ্রব্য গ্রহণ এবং কোন দ্রব্য বর্জন করিয়া, ইচ্ছামত দেহের ক্ষার সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

(৩)

বর্তমানে সর্বগুণযুক্ত খাদ্যের (balanced diet) দিকে সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু খাদ্যের ভিতর কেবল শর্করা, আমিষ, স্নেহ জাতীয় পদার্থ ও ধাতব লবণ, ভাইটামিন ও জল থাকিলেই খাদ্য সমতুল হয় না। অন্যান্য গুণের সহিত খাদ্যে ক্ষারধর্মী ও অম্লধর্মী পদার্থের অনুপাত ঠিক হইলেই তবে খাদ্য ঠিক ঠিক ভাবে সর্বগুণান্বিত হয়।

আমাদের রক্তে অম্ল অপেক্ষা ক্ষারের ভাগই বেশি। এই জন্য প্রতিদিনের খাদ্যও এইরূপ ভাবে নির্বাচিত হওয়া আবশ্যক যেন ইহার অধিকাংশ ভাগই ক্ষারধর্মী হয়। একজন খ্যাতনামা ডাক্তার (Julius Friedenwald, M.D.) বলিয়াছেন, যেকোন পূর্ণাঙ্গ খাদ্যে ক্ষারধর্মী খাদ্য অম্লধর্মী খাদ্যের সমান হওয়া চাইই, বরং ক্ষারধর্মী খাদ্য কিছু বেশি হওয়া প্রয়োজন (Diet in Health and Disease, p. 45).

কিন্তু আবার কেহ কেহ বলেন, কেবল বেশির ভাগ ক্ষারধর্মী খাদ্য খাইলেই হইবে না। ইহার পরিমাণ মোট খাদ্যের শতকরা ৮০% হওয়া আবশ্যক।

আমাদের দেহে প্রধানত ১৬টি রাসায়নিক পদার্থ ও তাহাদের লবণ আছে। উহাদের দ্বারাই আমাদের দেহ গঠিত। ইহাদের ছয়টি ক্ষারধর্মী এবং দশটি অম্ল-ধর্মী। যে কয়টি ক্ষারধর্মী উহাদের দ্বারা দেহের শতকরা আশীভাগ গঠিত এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ অম্লধর্মী পদার্থের দ্বারা গঠিত। সুতরাং দেহের রাসায়নিক সমতা, যাহার অপর নাম স্বাস্থ্য, তাহা রক্ষার জন্য, আমাদের খাদ্যের শতকরা ৮০ ভাগ হওয়া উচিত ক্ষারধর্মী এবং মাত্র ২০ ভাগ হওয়া উচিত অম্লধর্মী (Edward H. Dengel—Hay System, p. 4).

সুস্থ অবস্থায় এরূপ খাদ্য সবদা গ্রহণ করা সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু রুগ্ন অবস্থায় সর্বদাই এই অনুপাতে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। ব্লাড-প্রেসার প্রভৃতি কোন কোন রোগে অম্লধর্মী খাদ্য খুবই কমাইয়া দেওয়া উচিত অথবা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা কর্তব্য (W. O. Sansun M.D., F.A.C.P.—The Normal Diet p. 44). মোটের উপর খাদ্য যত ক্ষারধর্মী হয়, স্থূলতা, কৃশতা, রোগ ও বার্ধক্যের জড়তা প্রভৃতি হইতে দেহকে তত রক্ষা করা যায় (William Haward Hay M.D.—Weight Control, p. 55).

সুস্থ অবস্থাতেও ক্ষারধর্মী খাদ্যের অনুপাত কখনই শতকরা ৫২'র নীচে হওয়া উচিত নয়। এরূপ খাদ্য নির্বাচন করা কঠিন মনে হইতে পারে। কারণ আমরা যাহা খাই, তাহার শতকরা ৯০ ভাগই অম্লধর্মী খাদ্য। কিন্তু ইচ্ছা করিলে দৈনন্দিন খাদ্যকে অনায়াসেই ক্ষারত্ববহুল করা যাইতে পারে।

ভাত-রুটি কম খাইয়া পরিবর্তে যথেষ্ট আলু গ্রহণ করাই খাদ্যকে ক্ষারধর্মীবহুল করার একটি সহজ পদ্ধতি। ভাত-রুটি খাইলে যে কাজ হয়, ঠিক সেই কাজই হইতে পারে বেশি করিয়া আলু খাইলে। কারণ উহাও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। কিন্তু ভাত-রুটি অম্লধর্মী, আর আলু ক্ষারধর্মী। এইজন্য প্রতিদিন অর্ধেকটা বা নামমাত্র ভাত-রুটি খাইয়া আলুর দ্বারা ভাত-রুটির কাজ চালাইয়া লইলে অত্যন্ত উপকার হয়। তরকারীর সহিতও যথেষ্ট আলু খাওয়া চলিতে পারে। কিন্তু অনেকটা তৈল বা ঘৃত দিয়া আলু কসাইলে উহা অত্যন্ত দুষ্পাচ্য হইয়া পড়ে। অন্যথা আলু ভাতের ন্যায়ই সুপাচ্য।

এই সঙ্গে যথেষ্ট মানকচু, ওলকচু ও গাঠিকচু সিদ্ধ করিয়া খাওয়া যাইতে পারে। উহারাও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য এবং ক্ষারধর্মী। ইহাদের সঙ্গে প্রতিদিন যথেষ্টরূপে সবুজ শাকসব্জী ও দুধ খাইলে খাদ্য অনায়াসে ক্ষারত্ববহুল হইতে পারে। দুধ-ভাতের সহিত সর্বদাই যথেষ্টরূপে পাকা কলা খাওয়া উচিত। ভাত-রুটি যাহা, কলাও তাহাই। ইংরেজিতে ইহাকে bread fruit--রুটি-জাতীয় ফল বলা হয়। কিন্তু ইহা ক্ষার-

ধর্মী এবং ভাত-রুটি অপেক্ষা অনেক বেশী উপকারী। কেবল যথেষ্ট সুপক্ক কলাই যদি যথেষ্টরূপ খাওয়া যায়, তবে ভাত না খাইলেও চলে।

আহারের প্রথম দিকে ভাত-রুটির সংগে যথেষ্টরূপ সুসিদ্ধ ডাল খাওয়া উচিত। কারণ ডালটা ক্ষারধর্মী। ডাল দ্বারা ভাত-রুটি মাখিয়া খাইলে ভাতের অম্ল-দোষ অনেকটা নষ্ট হয় (অধ্যাপক নিবারণ-চন্দ্র ভট্টাচার্য, এম-এ; বি-এস-সি—বাঙালীর খাদ্য ও পুষ্টি, ২৯ পৃঃ)।

তাহা ব্যতীত প্রত্যেক সংসারেই কোথাও সকালে একবার এবং কোথাও সকালে বিকালে দুইবার জলখাবার গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই খাবারটা—শশা, কমলা নেবু, টমেটো, শাকআলু ও পেয়ারা প্রভৃতির দ্বারা করা যাইতে পারে। এই সংগে অবশ্যই কতকটা স্যালাড খাওয়া উচিত। গৃহিণীরা ইচ্ছা করিলে কোন কোনদিন বিন ও আলু সংযোগে নানাপ্রকার মুখরোচক খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারেন। চায়ের পরিবর্তে গরম দুধ খাওয়া যাইতে পারে। অথবা দুধ বেশী দিয়া চা খাওয়া যায়।

আমাদের প্রতিদিন কয়েক গ্লাস করিয়া জল পান করা আবশ্যক। এই জলটা খালি পেটে প্রতি গ্লাসে একটা করিয়া নেবুর রস দিয়া পান করিলেই বহু রোগ হইতেই অব্যাহতি লাভ করা যাইতে পারে (H. Valentine Kuaggs—The Lemon Cuss, p. 6).

এইভাবে খাদ্য নির্বাচন করিলে খাদ্য অনায়াসেই ক্ষারধর্মী হয়।

কিন্তু তাহার জন্য মাছ-মাংস প্রভৃতি খাদ্যগুলি যে পরিত্যাগ করিতেই হইবে, তাহা নয়। শতকরা ৪০ হইতে ২০ ভাগ খাদ্য ভাত, রুটি, মাছ, মাংস প্রভৃতি অম্লধর্মী খাদ্য হইতে নির্বাচন করা যাইতে পারে। অথবা প্রতিদিন কতকটা অম্লধর্মী পদার্থও খাদ্যের সহিত থাকা প্রয়োজন। স্বাস্থ্য লাভের জন্য যেমন ক্ষারধর্মী খাদ্য চাই, তেমনি অম্লধর্মী খাদ্যও আবশ্যক।

যখন খাদ্যে ইহাদের অনুপাত ঠিক ঠিক হয়, তখন স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া কঠিন হইয়া থাকে।

লেখু-ভেক

অ · ক্রু · র

* ভালগারিটি *

ধনপতি কহিল, 'দেখ, ভালগারিটি (vulgarity) কথাটার সঠিক বাঙলা প্রতি-শব্দ পাওয়া সম্ভব কি না জানি না। শব্দ যে নেই তো বুঝতেই পারছি। তোমরাও পারছো। ভালগারিটির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে স্থূলতা। ভালগার মাত্রেই স্থূল, যদিও স্থূল মাত্রেই ভালগার নয়। যে জিনিসের সূক্ষ্ম প্রকাশ আর্টিস্টিক, শিল্প সুকুমার, তারই স্থূল প্রকাশ হতে পারে ভালগার।'

প্রশ্ন করিলাম, 'উদাহরণ ?'

ধনপতি কহিল, 'সত্যিকারের জোরালো উদাহরণ দিতে গেলেই ভালগার হতে হবে। একটা খুব নরম উদাহরণ দিচ্ছি। তোমরা রোম্যাণ্টিক ছোকরা, প্রেম-জগৎ থেকে উদাহরণ দিলে বুঝবে ভালো। তাই দিচ্ছি।' বলিয়া ধনপতি যে ছোট একটি সটীক কাহিনী কহিল, তাহা নিম্নলিখিতরূপ।

এক প্রেমিক তরুণ (ধরা যাক্ তাহার নাম চন্দ্রকেতু) এক বড়লোক-কন্যার (তরুণী) প্রেমে পড়িল। কন্যাটির নাম শ্যামলী। তাহার ভ্রাতা বা ভগ্নী কেহ জীবিত নাই। অগাধ সম্পত্তির মালিক পিতা জীবিত আছেন। পিতার নাম মৃত্যুঞ্জয়। নামটির সত্যতা লোকে প্রথম প্রথম বিশ্বাস করিত না, কিন্তু ভদ্রলোকের কাণ্ড দেখিয়া ক্রমে অনেকেই সন্দেহ করিতে লাগিল, তিনি মৃত্যুকে সত্যই জয় করিয়াছেন।

তদুপরি ভদ্রলোক অত্যন্ত কৃপণ এবং অদ্ভুত রকম খামখেয়ালী। শ্যামলীর জনৈক পাণিপ্রার্থী (চন্দ্রকেতু নহে) একবার মৃত্যুঞ্জয়-বাবুর নিকটে শ্যামলীর পাণি প্রার্থনা করিয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু কহিয়াছিলেন, তা বেশ, কন্যার পাণি দান করিতে তাঁহার কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু 'কন্যার বাপের একটি আধলাও পাচ্ছ না, সে গুড়ে বালি। বুঝলে হে ছোক্‌রা? মেয়ের বাপের ব্যাংক একাউণ্ট দেখে অনেক ছোঁড়াই অমন ধপাস্ করে প্রেমে পড়ে। ওসব বুজরুকী ফুজরুকী আমার কাছে চলবে না।'

কথাটা ভদ্রলোক অত্যন্ত স্থূলভাবে বলিয়াছিলেন, তাই কথাটা হইয়াছিল প্রায় ভালগার। কিন্তু ঐ কথাটাই সূক্ষ্মভাবে ঘুরাইয়া বলা যাইত; যেমন :

'আশীর্বাদ করি তোমাদের এই স্বর্গীয় প্রেম সার্থক হোক, সফল হোক, ধন্য করুক তোমাদের দুটি সবুজ জীবনকে। তোমাদের প্রেম স্বর্গের অম্লান পারিজাত, মর্তের সমস্ত বৈভব এর কাছে তুচ্ছ। তোমরা এগিয়ে চলো নতুন জীবনের পথে, তাকিও না পিছনের তুচ্ছ ঐশ্বর্যের পানে। আমি তোমাদের পিছু ডাকবো না। সামান্য যে অর্থ আমি এ-জীবনে সঞ্চয় করেছি, তোমাদের প্রেমের পবিত্র পথে তা হবে অনর্থস্বরূপ, সে আমি হতে দেবো না। সে অনর্থ আমারই থাকবে। আমার শ্রেষ্ঠ রত্ন, আমার শ্যামলীকে নিয়ে তুমি সুখী হও, আমি আশীর্বাদ করি.....' ইত্যাদি।

মূল কথা সেই একই—অর্থাৎ শ্যামলীকে যে বিবাহ করিবে, সে শ্যামলীকেই বিবাহ করিবে, শ্যামলীর বাপের একটি আধলাও পাইবে না। কিন্তু কথাটা সূক্ষ্মভাবে বলায় ভালগার না হইয়া আর্টিস্টিক হইল।

প্রেমিকগণ যখন দেখিল, শ্যামলীকে লাভ করিলে সংগে ফাউ আসিবে না, তখন তাহারা একে একে ভাসিয়া গেল। রহিল শুধু চন্দ্রকেতু। ছোক্‌রা চালাক এবং ধৈর্যশীল। সে বুঝিল মৃত্যুঞ্জয় আর কয়েকটা বছর হয়তো মৃত্যুকে জয় করিয়া থাকিতে পারিবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যু তাঁহাকে জয় করিবেই। তখন তাঁহার একমাত্র সন্তান শ্যামলীর হাতেই তাঁহার যা কিছু দিয়া তাঁহাকে বিদায় নিতে হইবে। তাই অন্য সবাই চলিয়া গেলেও সে রহিয়া গেল। ভগবান ভরসা করিয়া সে শ্যামলীকে বিবাহ করিয়া ফেলিল। ভগবান ছাড়া আরেকটি ভরসা তাহার ছিল, কোন এক ব্যবসাদারের অফিসে কেরানীগিরি। যদি কেহ প্রশ্ন করেন, সামান্য কেরানীর সংগে ধনী-কন্যার প্রেম কিরূপে জমিল, তাহা হইলে প্রথমত বলিতে হয় প্রেম অন্ধ। তাহার পর শ্যামলীর রূপ সম্বন্ধে সত্য কথা খোলাখুলি অর্থাৎ স্থূল-ভাবে বলিতে গেলেই তাহা 'ভালগার' হইবে। সূক্ষ্মভাবে ঘুরাইয়া বলিতে হইবে। বর্তমানিক কবিতার ভংগীতে :

দুটি তার কালো হরিণ চোখ
তাকে আগাগোড়া
রাঙিয়ে দিয়েছে আপন রঙে।
যখন হাতের ওপর এলিয়ে পড়ে চুল,
যায় না বোঝা
কোনটুকু চুল আর কোনটুকু হাত,
চুল আর হাত, হাত আর চুল
বেমালুম মিশে যায়,

যেমন মিশে যায় দূরে চক্রবালে
আকাশের সাথে সাগরজল।........"
ইত্যাদি।

কবিতা আমি ভাল লিখিতে পারি না বলিয়া উদাহরণটা ঠিক জুৎসই হইল না। কবি বিদ্যাপতির রচিত একটি কবিতা সেজন্যই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কবিতাটি যাঁহার উক্তি, তিনি বিদ্যাপতির পরিচিত জনৈক 'কাপ্তান' ছোক্‌রা, মর্ত্তের পেশাদার উর্ব্বশীদের পিছনে বহু পৈতৃক টাকা উড়াইয়া বর্ত্তমানে দেউলিয়া হইয়াছেন। টাকা ফুরাইয়া যাওয়ায় সেই কাপ্তান ছোক্‌রার জীবনের পঞ্চম উর্ব্বশী তাহাকে জীর্ণ বসনের মত পরিত্যাগ করিয়া ভরতি-পকেটওয়ালা আরেক কাপ্তানের আশ্রয়ে চলিয়া গেল। তখন পান-বিহ্বল অবস্থায় ছোক্‌রা অনর্গল ভাষায় যাহা বলিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত স্থূল বলিয়াই শুনিবামাত্র আপনারা প্রকাশ্যে কানে আঙুল দিতেন; কেননা, 'ভাল্‌গার' কথা অবিচলিতভাবে শোনা ভদ্রসমাজে কুরুচির পরিচায়ক। ছোক্‌রার সেই 'ভাল্‌গার' বক্তৃতারই সার-মর্ম্ম বিদ্যাপতি সূক্ষ্ম কবিতায় রূপান্তরিত করিয়াছে। কবিতাটি 'ভাল্‌গার' নহে; কিন্তু স্থূলভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলেই দেখিবেন, ব্যাখ্যাটি 'ভাল্‌গার' হইয়া পড়িয়াছে। আর কিছু না বলিয়া আমি শুধু কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

"হে সুন্দরি, উর্ব্বশীরে দেখি নাই চোখে,
নাহি জানি কোন্‌ দিব্যলোকে
নৃত্য করে অনন্ত যৌবনা
ছন্দে তারি জাগে চিত্তে তৃপ্তিহীন অনন্ত কামনা।

তবু তারি লাগি'
তৃষিত নয়ন ছিলো জাগি'
অনিমেষে
তুমি এলে স্বপ্নসম ম্লান গোধূলির লগ্ন শেষে।

মুহূর্ত্তে আমার
খুলে গেল মর্ম্মের দুয়ার,
মনে হলো চিনি চিনি,
তনুর দেউলে এ যে অতনুর চির-পূজারিণী,
এরি মাঝে সুপ্ত আছে অন্তহীন স্বপ্নের
ইসারা।'

মুগ্ধ আঁখি, চিত্ত আত্মহারা।
আমার জীবন-পথে দিলে দেখা অকলঙ্ক শশী
তুমি মর্ত্ত্যবাসিনী উর্ব্বশী!

হে সুন্দরী নর্ম্ম-সহচরি!
কামনার শ্রেষ্ঠ ফুলে আমার অঞ্জলি দিলে ভরি'।
অপরূপ তোমার ভাণ্ডার
মুক্ত করি' দিলে তুমি সম্মুখে আমার
অকৃপণ হাতে
আমার রঙীণ স্বপ্ন মূর্ত্ত হলো তোমার কায়াতে।

তারপর মিলন-মদির
একান্ত অধীর
চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলি
বেগবান পক্ষীসম দ্রুত পক্ষ তুলি'
স্বপ্ন সম নিলো যে বিদায়।
আজি হায়,
এলো তব বিদায়ের ক্ষণ;
নূতন পূজারী হতে এসেছে তোমার আমন্ত্রণ।

শূন্য আজি আমার ভাণ্ডার
তোমারে রাখিতে পারি সাধ্য নাহি আর
হে সুন্দরি সুচারুহাসিনি।

তোমারে তো চিনি নাই, শুধু মনে হয়েছিলো
চিনি।
এখনো বসন্ত আছে, সুন্দরি, তোমার তণু প্রাণে
এক পূর্ণে শূণ্য করি' তাই চলো অন্য পূর্ণ
পানে।

আমার নালিশ কিছু নাই,
যাহা কিছু দিয়েছিলে স্মরণে জাগিয়া রবে তাই।
জীবন ভরিয়া শুধু নিয়ত ধ্বনিবে এই সুর:
সে ছিলো একান্ত কাছে, যে আজিকে একান্ত
সুদূর।......"



অনুবাদসাহিত্য

মৌলী

“পাহাড়ী”

[হিন্দী গল্পের অনুবাদ। লেখক রঘুনাথপ্রসাদ খিণ্ডিয়াল 'পাহাড়ী', বর্তমান হিন্দী শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীদের অন্যতম। আলমোরার অধিবাসী বলে কাহিনীতে পাহাড়ী জীবনের ছাপ থাকে সবচেয়ে বেশী। হিন্দী সাহিত্য সঙ্ঘের একজন উদ্যোগী কর্মী।]

এইখানে বসেই লিখতে মন চায়। কিন্তু এ লেখার আর দরকারই বা কি। নিজের যে দরকারই থাক্, যাই থাক্, ওর মধ্যে থেকে নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে কোন তথ্যতে কি পৌঁছতে পারবো কোনদিন?

মনে হচ্ছে এই লম্বা-চওড়া, সাদা-কালো ধুলোয়ভরা ময়দানে মৌলী নিজের হাতে লেখা একখানা লম্বা চিঠি এইমাত্র দিয়ে ব'লে গেল—পড়ে দেখো। পড়তে আমাকে হবেই। এই এতবড় দুনিয়ায় শত কাজের মধ্যে থেকেও নিজেকে একলা পাওয়া মাত্র একটা অনুভূতি তো আসবে।

মৌলীর সেই চিঠি—

"ভাই গোবিন্দ,

তোমার চিঠি পেয়েছিলুম, যেন ঐ চিঠিখানা পেতেই দুনিয়ায় একটা ঠাঁই পেয়ে গেলুম। আজব সব সমস্যায় জীবন ভরে রয়েছে। কিছু হয়তো বিতর্কের বিষয় যাই হোক, মনে হয় না তা থেকে ত্রাণ পাবো। হয়তো এর মাঝেই একদিন সমাধি লাভ করতে হবে! বড় আমি নই, আর সমপর্যায়ের ব'লে তোমাকেও বড় ব'লে মানি না। তোমাদের সমাজের জন্যে চিন্তা আমার কবেই বা ছিল, না তোমারই আছে! আমার পরোয়া ক'রবে তাও আমি চাই না। যাক, তোমার আমার সম্পর্কের মাঝে ওসব বাধা হ'য়ে থাকে কেন; আমরা আলাদা আলাদা জীব। তুমি তোমার ওকালতীর পুঁথির মধ্যেই ডুবে থাকো। আমার দপ্তরে রঙীন চেহারার একজন আছে। হাসি পায়; তুমি চিঠিতে তথ্য জানতে চেয়েছো, কিন্তু আমার যে প্রাণান্ত। বাস্তব কী জানিনা, ফুরসৎ পেলেই চিঠি লেখা আমার অভ্যেস। আমার জগতে কানুনের নজীর নেই, না সেই যোগ্যতা আছে যার জোরে একটা তথ্য হ'য়ে উঠতে পারি।

তোমাকেও মনে পড়ছে। আচ্ছা, এই মনটা কি বলতো? কেন মনে পড়ে জানিনা, কিন্তু তবুও পড়ে। বৌদির কথাও বারবার মনে পড়ে। নারীর সান্নিধ্যে থেকে, দূরে থেকে, তার ঘৃণা পেতে চাই। কিন্তু বৌদি যদি আজও এসে বলে—

বৌদিকে নিয়ে একটা ছোট্ট কাহিনী আছে। পাড়া সম্পর্কের সেই ভাই মরে যেতে বৌদি দুনিয়ায় মুখ লুকিয়ে চলতো তবুও শেষে বাপের বাড়ি চলে গেল। যাবার সময়ে ব'লে গেল "এই বৈধব্যই, মৌলী, আমার খাঁটি পরীক্ষা।'

সে পরীক্ষা যে কেমন, তখন অল্পই বুঝেছিলুম।

যাবার সময় বৌদির চোখের পাতা ভিজে উঠলো। গদ্‌গদ্ স্বরে বলেছিলো—"দুঃখ কেন কিনে নিচ্ছো। এভাবে চলা ঠিক নয়। চোখের আড়ালে চলে গেলেই ভুলে যেও। আমার দিব্যি রইলো।"

বৌদির পা ছোঁবার জন্যে হাত বাড়াতেই একগজ পিছু হটে গিয়ে বললে, "পাপের বোঝা আরও কি বাড়িয়ে যাবে?"

সাত বছর পর সেই বৌদির অবস্থা ছবি মনে পড়ছে। বৌদির কথা শুনিয়ে কি ভুল করলুম? তাহলে সেকথা তোলাই থাক। অকারণ আজ তা সামনে তুলে ধরার সামর্থ্যও আমার নেই।

জীবনে কৌতূহল জমা ক'রে রাখতে কে আর না চায়। আমার জীবনকে চালু রাখতে তার দরকার, রোজ তার সঙ্গ পেলে আমার চলা যে সহজ হ'য়ে যায় তাতে সন্দেহ নেই। শরীরকে রোমাঞ্চিত করার মত চিন্তারও দরকার! কিন্তু তোমার সে অবসর কোথায়—কাজের যে তাগাদা! কোথায় উঁচু কানয়ালা কালো টুপী পরে তুমি গাড়ি থেকে নামচো—দশটায় কোর্টে যাবে আর আমি কামরায় শুয়ে চাদর মুড়ি দিয়ে ডাকছি, 'গোবিন্দজী!'

তোমার কোর্টের ইমারৎটা আমার ভারি পছন্দ। ওখানকার নাসপাতির উঁচু ডাল রোজ দেখে দেখে আজ সেসব কথা মনে পড়তেই তো যাবার জন্যে মন চঞ্চল হ'য়ে পড়ছে। আর সেই বেঞ্চ কি নাম যেনো? সেই বারান্দার ধারে থামের কাছে? তোমার তো মনে আছে? যাক্! আর সেই উঁচু চুড়ো, যেখান থেকে চৌখম্বা আর নন্দোদকী বরফে ঢাকা দেখা যেতো। আশেপাশে সে কী ঘন জঙ্গল! কেমন সবুজ! মনে হয় প্রকৃতি যেন জীবন সুরক্ষিত রাখার উপযুক্ত জায়গাই তৈরি ক'রে রেখেছে।

আবার সেই লীলার কথা! গত বছর সব চিঠিতেই লীলার বিষয়ে না জানি কত কী লিখেছি—লীলা সুন্দরী। ওর নীল চোখ দুটো বড় ভাল লাগে। আমার জীবনের প্রেরণা, আমার জীবনকে চালিয়ে নিয়ে যাবার ঠিক অস্ত্র। আমি তো মৃত, আর লীলা জীবন চঞ্চল......

লীলা! ওর একটা ছোট্ট ছেলে ছিল। ভারি উদ্ব্যস্ত ক'রতো ওকে। ছেলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতো, বেশ লাগতো দেখতে। লীলা শহর ছেড়ে যাবার পর মনটা খারাপ হ'য়ে ছিল। তারপর যেদিন শুনলুম ছেলেটা মারা যেতে, লীলা একখানা ভাল কাপড় পরে, তার ওপর কেরোসিন ছিটিয়ে দেশালাইয়ের আগুনে নিজেকে ছাই ক'রে ফেলেছে, আমার সেদিন হাসি এসেছিল; আর ধোঁকা দিয়ে যখন পৃথিবীর দৃষ্টি থেকে উঠি তো তখনো হাসি পায়। নিজের ওপরে হাসা অসাধারণ ব্যাপার, সে-অভ্যেস কাউকে ধরিয়ে দেওয়া যায় না।

জানো তো পৃথিবীতে কত রকমের লোক আছে। তা না হ'লে এই সমাজ-ব্যবস্থা চলতোই-বা কি ক'রে? অনেকে বিয়ে না করাটাই একটা ফ্যাশন ধ'রে নিয়েছে, এতে মনের পীড়া বেড়েই যায়।

তুমি বিয়ে করেচো, আমিই করিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা তোমাকে কি তাতে পস্তাতে হয়েচে? তারপর তোমাদের মাঝে যখন সন্তান এলো তখন ভাবলে, এবারে সংসার সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ ক'রলে। শুনেচি প্রত্যেক নারীর অন্তরের কামনা মা হবার, আর প্রত্যেক পুরুষের বাহ্যিক কামনা পিতা হবার। তুমি সুখে আছ, ভালই। সুখেই তুমি থাকো। ভাল লোক কে আর নিজেকে উদ্ব্যস্ত রাখতে চায়। মনের মধ্যে নারীতত্ত্বমূলক ধারণাগুলো আর কতো ঘুলিয়ে যাবো। এটা একটা অনিশ্চিত চক্কর, ক্লান্তির অবসর নেই, রুখে যাবার সুযোগও নেই। সত্যি কথা জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে দাঁড়ায়। আসল কথা তোমার কাছ থেকে আমি বরাবরই লুকিয়ে এসেচি যাতে সব সময়ে তোমার কাছে নতুনই থেকে যেতে পারি। আজব সব সমস্যা গড়ে তোমাকে নিজের পাশে টেনে নিতে মন চায়, এমনিতে তো তোমাকে নিজের বাইরে কখনো পাই না। কিন্তু..."

* * *

সেই জুন মাস। গাঁয়ের ধারে গঙ্গায় স্নান করচি। জায়গাটা নিরালা। পাশেই শ্মশান, সমস্ত পৃথিবীকে ছাই ক'রে একদিন শুধু নিজেই বিরাজিত থাকবে। স্নান-সাঁতার সেরে পাশের মাঠ ধ'রে ফিরে

আসতুম। ওপরে সুন্দর নীল আকাশ। আজ সেই মাঠেই বেড়াবার বড় সাধ।

একদিন ছিল ওই গঙ্গায় স্নান ক'রতে আর ওই মাঠে বেড়াতে ক্লান্তি আসতো না। একদিন দুপুরে জল নিয়ে খেলতে খেলতে সমস্ত দুনিয়াকে ভুলে গেছি, ঠিক সেই সময় রাণীর আবির্ভাব। রাণীকে তো জানোই, সেই যে একদিন যাকে কুলগাছের নীচে মরা অবস্থায় পাওয়া গেল। ও চেয়েছিল অপ্সরা হ'তে। পাহাড়ে অনেক কথা চলে না। রাণী একদিন তাঁবার ঘড়ায় জল ভ'রে সুন্দর কাপড় পরে, মাথায় মহাদেব-মন্দিরের টিপ লাগিয়ে সেই কুলগাছের ডালের নীচে ক্লান্ত হ'য়ে দাঁড়ায়। তারপর, শুনলুম, তের বছরের সেই মেয়েটিকে অপ্সরারা নিয়ে গেল। আমারও তাই বিশ্বাস, তুমিও মেনে নিও। প্রমাণের জন্যে মাথা খারাপ ক'রো না। আমার কথাই মেনে নিও। রাণী ছিল অপ্সরার মত সুন্দরী, নিশ্চয়ই অপ্সরাই হ'য়ে গেছে ও। তাইতো ওর বাড়ির লোকে প্রতি বছর ওর মৃত্যু-দিনের সকালে ভাল ভাল ঘাঘরা আর চোলী মন্দিরে রেখে আসে।

রাণীর কথাই বলি। রাণী এসেছিলো শোনাতে যে গাঁয়ে কলেরা হ'চ্ছে। গাঁয়ের একটি ছেলে রাতভর বমি আর দাস্তের পর যখন স্বর্গের সিঁড়ি পার হ'চ্ছে, আমরা তখন গিয়ে পেঁছিলুম। ওর মা কাঁদছিল। ও শুয়ে আছে চুপচাপ হাত একেবারে ঠাণ্ডা। বুকের কাছটা একটু যা গরম, তখনও ধুকধুক ক'রছে।

সেই দুপুরের গরমে, খালি পায়ে খালি মাথায় বেনিয়ানের ওপরে ধুতিটা পাট ক'রে জড়িয়ে ভাইসাহেব আর আমি কস্‌বায় ডাক্তারের কাছে পেঁছিই। ডাক্তার অনেক লেকচার দিলেন। সঙ্গে না এসে আমায় নিজেকে সাবধানে থাকবার উপদেশ দিলেন। ছেলেটা মারা গেল। ভাইসাহেবের কোলে নিশ্চিন্দে শুয়েছিল।

ঠিক কথাই বলচি। শুনেচি, প্রথম দিন যখন ও বন্ধুদের সঙ্গে সন্ধ্যেবেলা ক্ষেতের ওপর দিয়ে আসছিলো, সেই প্রায়ান্ধকারের মধ্যে ও দেখলে—দূরে অন্ধকারে এক সুন্দরী স্ত্রীলোক, লাল কাপড় পরা, ওকে যেন ডাকছে। ওলাউঠার দেবী সে। তুমি হয়তো বলবে নির্জলা বাজে কথা। কিন্তু ওকালতী ক'রে আর কি শিখেছো বলো; তোমার সব কথাতেই তো সাক্ষী প্রমাণ চাই কিন্তু আমি পাহাড়ের মধ্যে হরদম দূর-দুরান্তের প্রতিধ্বনি শুনেছি। সেইসব প্রতিধ্বনির মধ্যে উল্লুকের ডাক ভেসে যখন আসে, মনে হয় জীবনে একলা থাকা সত্যিই সাহসের কাজ।

পাহাড় আমার ভারি সুন্দর লাগে। তোমার বাড়িটা নীচের পৈঁঠেতে ব'লে আমার পছন্দ হয় না। এদিকে ওদিকে কোথাও নজর টেকে না। আমার বাড়ি তাকে অবহেলা করে না। ক্লান্ত হ'য়ে প্রায়ই ভাবি, তোমার কাছে গিয়ে উঠি, একটা আকর্ষণ তো আছে। কিন্তু তোমাকে সংসারী দেখে ভয় করে, অথচ তোমার স্ত্রীকেও তো জানি। আবার সেই আত্ম-বঞ্চনা। তোমার কাছে আরও কিছু আছে; তোমার মার কাছে থাকবো। ওঁর সঙ্গে কথা বলবো। বলতেন—আবার এসো—যেন দয়া ক'রে তোমার কাছে কিছুদিন কাটাতুম। তোমার মা তারপরেও বলেছিলেন—'বড়লোক, গরীবের ঘর কি ভাল লাগবে!'

গরীবের ঘর আর আমি বড়লোক......?

চায়ের সঙ্গে আলুভাজা বেশ লাগে। প্রথমেই তুমি মাকে ব'লে তৈরি ক'রে আনতে। আমাকে যেন উনি যুগ যুগ ধ'রেই জানেন। আমার সব রকম রুচিই তিনি জানতেন। তোমার মার কাছেই থাকবো কিছুদিন; যতই ঝঞ্ঝাট থাকুক সব মিটে যাবে।

* * *

তারপর নিজের এই দপ্তর, এখানকার লোক, আবহাওয়া।

সকালে উঠি, সাতটা বেজে যায়। তাড়াতাড়ি শেভ্ ক'রে দু'পেয়ালা চা আর টোস্ট গিলে সাইকেলে চড়ে বসি। দিনেতে আর খেতে ভাল লাগে না। ফিরে এসে একটু পায়চারি ক'রে পালঙ্কে শুয়ে পড়ি। দিন তেমন দীর্ঘও মনে হয় না। ঠিক তিন তারিখে নিজের দুরবস্থা এসে ধর্ণা দেয়, তখনই বসতে হয় গণিতের হিসেব নিয়ে। নিজের শরীর ও আত্মার খাতিরে তোমার কাছে হাত পাতবো সে সাহসও আজ নেই। কলেজী জীবনে যেমন প্রায়ই বলতুম—'আজও ফি দিইনি ভাই!'—তুমি কখনও ব'লতে না কিছু। কাছে পয়সা না থাকাও ভাল লাগে না। এমনিই বাজে খরচ হ'য়ে যায় যদিও। এদিকে মনও বসচে না। অফিস ছেড়েছুড়ে একদিন চলে যাবো, অবশ্য কোথায় ভাবিনি এখনও।

পূর্ব পরিচিতাদের একজন এসে ডাকে—'এসো!'

কাছে যাই, কেউ মনে মনে বলে, 'ছি ছি!'

এ কেন?

তোমাকে না ব'লে মানছি না। একদিন তোমাকে বলেছিলুম না, 'এর সম্পর্কে তোমার মত জানিও।'

তুমি চুপ ক'রে ছিলে।

'আমাকে একদিন ওরই আঁচল ধরে থাকতে হবে।'

'ওই বেশ্যাটার!' তুমি চমকে উঠেছিলে।

সতর্ক হ'য়ে বলেছিলুম, 'বোধহয় তাই।'

'আমি জোর ক'রে বলচি, তুমি ভুল ক'রবে।' তোমার সেই জোর ক'রে বলা! তাই যদি হ'তো তো ভাল হ'তো।

* * *

মায়া সুন্দরী। কেশগুচ্ছ ক্লিপ দিয়ে আঁটা। মুখখানা গোল; মাথায় সিঁদুর লাগায়। ঠোঁটটা পানে রাঙা ক'রে রাখে। হাতে সাদা আর কালো কাঁচের চুড়ী। হিরোইনের মত মোটেই নয়।

মায়া একদিন বললে, 'শ্যামার মত আমারও একখানা সাড়ি চাই; ওই রকম বেগুণে রঙের।'

'আচ্ছা, একদিন দেব এনে।'

'না, কালই আনতে হবে। ওজর শুনচি না।'

'কিছু ভেবেচো কি কোনদিন?'

'যাক্, আমি বুঝেচি।'

'কি?'

'তোমাকে এলাহাবাদে যেতে হবে, না?'

'এলাহাবাদ!'

'তুমিই তো বলছিলে, বিয়ে করবে গিয়ে।'

'আরে, ওতো তোমায় ভোলাচ্ছিলুম ওই ব'লে।'

'ভোলাচ্ছিলে?'

'হ্যাঁ, মায়া।'

ভাবনায় ভাসতে ভাসতে নিজেকে ধরতে পারি না। ঠাট্টা করা আসে না। জানিও না নারীর ব্যবহার কেমনতর হয়, পুরুষের কাছে কি প্রতিদান চায় সে। কি-ই বা ওর বাসনা?......ঠাট্টার ছলে যখন মিথ্যে বলেচি, মায়া ধরে ফেলেচে। তারপর আর কি বলি বলো।

মায়া এক বেশ্যা। এই মায়াই একদিন তার হাতের চুড়ি রাগের মাথায় একটা একটা করে ভেঙে ফরাসে ছড়িয়ে দিয়েছিল। বোঝাবার পর বলেছিল, 'অন্য লোকের দেওয়া বলে ঠাট্টা তো; আমার অক্ষমতার প্রমাণ করতে চাও, ধন্য তোমার স্বার্থপরতা! ও চুড়ি আর রাখবো না, কাল তুমিই চার গাছা চুড়ি এনো।'

আজও ওর জন্যে চুড়ি নিয়ে যেতে পারি নি। ওর হাত আজও খালি। না আমি চুড়ি দেব, না ও পরবে নিজে থেকে। কাঁচের সেই চুড়ি ফরাসের ওপর যখন ঝন ঝন ক'রে বেজে উঠেছিলো, আমার মনে হয়েছিল—মায়া কী নিজেকে কোনদিন চিনতে পারবে?

তোমাকে বলতে ভুলে গেছি। গত বছর এক দার্শনিকের পাল্লায় পড়েছিলুম। সেই দার্শনিক বন্ধুটির জীবন অধ্যায় বড় মজার! এতটুকুও কোথাও আফশোস নেই। সদাই হাসিমুখ, নির্ঝঞ্ঝাট, সদাপ্রফুল্ল, সবায়ের সঙ্গেই আলাপ, নবাবী মেজাজ। এদিকে ঘরে রুগ্না স্ত্রী আর একটা পয়সা নেই মাঝ রাতে কৈলেরেটের বোতল বগলে হাজির, বললে, 'চলো।'

ভাবলুম সব বোধহয় শেষ হয়ে গেচে। 'নারে ভাই, ও ভালই আছে।' বলে খ'্‌টি থেকে ওভারকোটটা নিয়ে আমার কাছে স'পে দিলে। চলে এলুম ওর সঙ্গে। বন্ধু তখন কদিন ধরে শহরের নামী বেশ্যা হুস্নবানুর কাছ থেকে 'ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ' সম্পর্কে শিক্ষা নিচ্ছিলেন।

বাঈজীর ঢংঢাং ভালই; লাল জল গেলাসে ঢেলে পান করতে দিলে যখন, খেয়ে মনে হলো দৃষ্টি খুলে গেচে। ওর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললুম, 'দেবী, তুমি কোন লোকের অপ্সরা?'

ও হেসে ফেললে।

তুমি থাকলে সেই হাসিতে তোমারও মোহ লাগতো। পরের শনিবারে শুনলুম দেনার দায়ে বন্ধুটির জেল হয়ে গেচে। তখন না হুস্নবানু সঙ্গ দিলে, না কৈলেরেট!

মায়াকে এ সব কথা বলতে সারা রাত সে কি কান্না! বললে, 'সবাই সমান হয় না।'

কথা বাড়াবার আমার ইচ্ছে ছিল না। বললে, 'ওই এককথাই বারবার কেন ভাবো বলতো?'

'পকেট খালি থাকে কি না।'

'বাজে বকো না।'

রহস্যময়ী নারী এই মায়া। পরশু সন্ধ্যেবেলা অফিস থেকে ফিরে দেখি পালঙ্কের ওপর বসে আছে। ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'মায়া!'

মায়ার পরণে সাদা শাড়ি।

বললুম, 'মায়া এ তোমার উচিত হয় নি। পৃথিবীকে ভয় করতে শেখা চাই।'

আবার মায়া কে'দে ফেললে। যেন ওর স্বাধীনতার উপর কারুর কিছু বলবার অধিকার নেই। ও যা করে সবই ঠিক।

জানি তুমি আমার পতনে হাসবে না। আমিও কখনও ওরকম ঘৃণা অস্বীকার করি না; তোমার তিরস্কারও সহ্য করবো। আজ আমার নিজের এবং নিজের দুনিয়ার জন্যে দুঃখ নেই; আর চাইও না যে তুমি আমার কথাগুলো নিয়ে নিজের সংসারে উদাস হয়ে ওঠো। জানি, চিঠি তুমি পড়বেই, ফেলে দেবে না; এর জন্যে তোমাকে একলাও পাওয়া যাবে।

ভাই, ওকালতী খারাপ আর কি! ঘর আছে, বৌ ছেলে রয়েছে। বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত রয়েছো, আমার মত চাকুরের ওপর সংসার টিকে থাকতো যদি তো অন্নপ্রাসনের দুধের কথা মনে পড়তো। এখানে তো ওই মোটা রুটি আর খেসার ডাল। স্বাদবদলের খেয়াল ওতে কম থাকে।

আবার সেই মিথ্যে। মায়া একদিন খাবার তৈরী করলে। প্রথমে চাটুতে খুব ঘী গরম করলে তার ওপরে দিলে ভাত। জানেনা না তো কিছুই, ঘী বেশী দেখে যখন আর কিছুই ভেবে পেলে না তখন চটপট তাতে ডাল দিয়ে দিলে। খাওয়া গেল না দেখে হেসে ফেললে। বললে, 'কখনও কি আর রে'ধেছি!'

কিন্তু......

* * *

মৌলীর মত ছেলে আমার জীবনে তো দেখি নি। যা কিছু করতো, বলতো, ভাবতো, একেবারে আলাদা। একেবারে পরিষ্কার, কোন লুকোচুরি নেই, যা কিছু যতটা বলতে হবে বলে দিত, তার ওপর মন্তব্য শোনার অপেক্ষায় থাকতো না। আশ্চর্য লোক! সমস্ত পৃথিবীকেই যেন খেলোয়াড় মনে করতো, প্রায়ই এসে বলতো—'দেখলে তো, আমি ঠিকই বলেছিলুম।'

একদিন এসে বললে, 'একটা কথা জিগ্যেস করবো, বেশী কাজ তো নেই?'

'বলো না কি?'

'আচ্ছা, গায়ত্রীর বিষয় কি জানো বলতো?'

'গায়ত্রীর বিষয়!' চক্ষু বিস্ফারিত করে ওর দিকে চাইলুম।

'হ'্যা। লোকে বলে ওর নাকি চরিত্র ঠিক নেই।'

'আমি আর কি বলবো বলো!'

তাহলে শোন আমিই বলি। গায়ত্রীর বিষয় লোকের ধারণা ভুল। পুরুষেরা নারীকে পৃথিবীর চোখে এতো নামিয়ে দিতে চায় যে লুকিয়ে নিজেকে কোথাও স্বতন্ত্র হয়ে থাকতে পারে না।

'তার মানে?'

'না জেনেশুনে গায়ত্রীর চরিত্রের ওপর কোন ধারণা করা অতি ভুল।'

'আসল কথাটা কি বলতো?'

'সেদিন তুমিও তো ক্লাবে ছিলে, মনে নেই। লোকে তো কতো কি-ই বলছিলো। আচ্ছা, পাড়াপড়শীর মান কি নেই কারুর কাছে। সেই মেয়েটার জীবন......'

'জীবন?'

'ওকে আমি ছোট করে দেখতে পারি না। বেশ সমঝদার মেয়ে। বুঝলুম না হয়, ভাবের ঘোরে এক যুবককে ও খানকয়েক চিটি লিখেছিলো, তার জন্যে আজীবন কি ও ঠোক্কর খেয়ে যাবে?'

'কি বলতে চাও আসল কথাটা বলতো? বাজে কথার দরকার কি?'

'যাক্, আজ কিছু বলবো না। আর একদিন এসে সব বলবো।' বলেই মৌলী চলে গিয়েছিল।

এক মাস ওর দেখা নেই। পরের মাসও কেটে যায় ও আর আসেই না। অমন আত্মভোলার ঠিকানাই বা পাই কোত্থেকে!

হঠাৎ এক বাদলা রাতে এসে হাজির। দরজা খট্‌খট্ করে বললে, 'ভাই সাহেব?'

'কে, মৌলী?'

'খোল, খোল! উঃ বৃষ্টিতে কি ডুবিয়ে দেবে?'

বাইরে শন শন শব্দে হাওয়া বইচে। ছিট্‌কিনী খুলে দেখি—

মৌলী ছাতা মাথায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ওর পাশে বর্ষাতী গায়ে, ছাতা মাথায় এক যুবতী।

আমি যেমন তেমনি দাঁড়িয়ে। মৌলী বলে উঠলো, 'ভাই সাহেব, ইনি হচ্ছেন গায়ত্রীদি।' থেমে আবার বললে, 'দিদি, ভাই সাহেবকে নমস্কার করলে না!'

গায়ত্রী হাতজোড় করে মাথা নুইয়ে দিলে। গায়ত্রীকে সেই প্রথম দেখলুম। মৌলীর ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলুম না। আর মৌলী বুঝে ওঠার সময় দিলে তো! তারপর নিশ্চিন্দে বললে, 'দিদি, বসো না!'

গায়ত্রী বসলো। যেন মৌলীর সব কথাই ও মেনে চলে। মৌলী আলনা থেকে তোয়ালে নিয়ে তারপর পাশের ঘরে গিয়ে আমার সিন্দুক খুলে ধোয়া ধুতি আর সিল্কের জামাটা নিয়ে এলো। গায়ত্রীর হাতে দিয়ে বললে, 'নাও বদলে নাও। এতে লজ্জা কি? দাদাকে কোনদিন ভয় করেচি যে আজ ভয় করবো?'

গায়ত্রী চুল খুলে দিলে। তারপর পাশের ছোট ঘরে গিয়ে কাপড় বদলে এলো।

মৌলী গিয়ে চা তৈরী করে আনলে তারপর চুমুক দিতে দিতে বললে, 'জানো, এদ্দিন কোথায় ছিলুম? দিদি মাপ করো ভাই।' গায়ত্রীর দিকে পলকের দৃষ্টি ফেলে বললে, 'আর তোমার কে'দে কে'দে দিন যাবে না। তারপর এক নিঃশ্বাসে বলে গেল, 'এই দিদিটিকে দুনিয়ার দৃষ্টি থেকে হটিয়ে তোমার হাতে স'পে দিতে এলুম। জানি তুমি তাড়িয়ে দেবে না, আমার কথা রাখবে। জানি হাজার কলঙ্ক থাক তোমার চরণে জায়গা পাবেই।'

'মৌলী!' বেখাপ্পা স্বর বেরিয়ে এলো মুখ থেকে।

'তুমিও না বলবে—উফ্! পৃথিবীতে তাহলে আর কাকে বিশ্বাস করবো? তুমি তোমার সমাজের মণ্ডে বসে থাকো, আমি যাই। ওঠো দিদি, আমাদের ভাইবোনকে পৃথিবী সফর একলাই করতে হবে। নিজের কাপড়খানা পরে নাও। যার ওপরে এতদিন বিশ্বাস ছিল সে-ই ঠোক্কর মারলে। অন্যের কাছ থেকে আর এক মুহূর্তেও কিছু আশা করা যায় না।'

সত্যিই গায়ত্রী ভিজে কাপড় আবার পরে নিলে। বাইরে তখনও ভীষণ বৃষ্টি। হাওয়ার তেজ খুব। মৌলী দরজা খুললে, বললে, 'এসো দিদি!' আর দুজনে বেরিয়ে পড়লো।

সেই বাদলায় মৌলীকে ফিরিয়ে দেবার সাহস ছিল না আমার। দৌড়ে গিয়ে ওদের নিয়ে এলুম। ওর দিদি গায়ত্রী আজও আমার কাছে।

গায়ত্রীকে আমার কাছে স'পে দিয়ে মৌলী চলে যায়। এই উপকার মাত্র করলে, আমার স্বভাবটা জেনেছিল বলেই, কি করে ধ্বঝে নিয়েছিল যে গায়ত্রী আমারই উপযুক্ত। ওর ঐ বুদ্ধি দেখে আজও আমি আশ্চর্য হই।

কার যেন টানে মৌলী চলে যায়। গায়ত্রীকে চিঠি দিয়েছিল একখানা—

'ভাই দিদি,

তোমার উপযুক্ত আশ্রয়ই আমি বেচে দিয়েছি। ওইখেনেই তোমায় স'পে দিলুম। যাকে নিয়ে আমার গর্ব তারই কাছে তোমাকে দেখে আমার সুখের অন্ত নেই। তোমাদের মাঝখানে গিয়ে উপদ্রব বাড়াতে চাই না; দরকারই বা কি?

'মানুষকে চিনতে সময় লাগে। আজকের মানুষ চালাকী আর ফন্দিতে নিজেকে কারুর কাছে প্রকট হতে দেয় না। তবুও এইসব লোকের ভিড়ের মধ্যে কেউ একলাই বা থাকে কি করে। তাই আশ্রয় দরকার হয়। সেই একমাত্র আশ্রয়ে তোমাকে ছেড়ে আসতে পেরে আমি সুখী হয়েছি। এখন তুমিও ওকে চিনতে পারবে। আমাকে বলতো রোজই—তুই এখানেই থাক। আচ্ছা, আমার সে সময় কোথায় বলতো? এই এত বড় পৃথিবীতে কাজ কি কম! তোমার কাজ শেষ করেছি, কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকবার এক মিনিটও সময় নেই।

'তুমি যাচ্ছিলে কোথায়? জানি, সেই লোকের কাছেই আশ্রয় নিতে যে তোমায় ধোকাই দিত শুধু। তোমায় ছলনা করে সে ভেগে গেছে। ঐ ঘনঘোর বর্ষায় ওকে আশ্রয় ভেবে তুমি ওর কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে ভেবেছিলে। নিরাশ হয়ে খিড়কী দরজা খুলে যখন বাপের বাড়ি চিরকালের জন্যে ছেড়ে এলে, সে কথা তুললে মন খারাপ হয়ে যায়।

'ও তোমায় আশ্রয় দিতো, পৃথিবী থেকে সে উদারতা উঠে গেছে। তখন তো তুমি ভেবেছিলে বোধ হয় পায়ের নীচে মাটি চৌচীর হয়ে তোমায় ঝড়ঝঞ্ঝা থেকে চিরদিনের জন্যে রেহাই দেবে। গাছের নীচে পৈ'ঠের ওপর বেহুঁস হয়ে পড়েছিলে, তখুনি দেখে বুঝেছিলুম, আমার সাহায্য তোমায় দিতে হবে। আমি দেখেই চিনেছিলুম, দিদি হবার সামর্থ্য তোমার আছে। সমাজের মধ্যে তোমায় প্রতিষ্ঠিত করার জায়গা খুঁজলুম। এতকাল নিজের সেই কর্তব্যের মধ্যেই ডুবেছিলুম।

'গায়ত্রীদি, তোমার বিষয় কত কথাই না শুনেছি, শুনেছি কিন্তু সবই নিজের মধ্যে চেপে রেখেছি। সে সবের ওপর লোকের রায়ও শুনেছি। ইচ্ছে আছে একদিন তোমার নিজের মুখ থেকে একটা রায় শুনবো। হয়তো তাতে কোন লাভ নেই; সেইজন্যেই এতদিন তা মুলতুবী রেখে দিয়েছি। আচ্ছা, সেই অন্ধকারের মধ্যে একমাত্র যে পুরুষের ওপর তুমি নির্ভর করেছিলে সে-ই যখন ছেড়ে গেল, কি ভেবেছিলে বলতো?

'কিন্তু থাক, নিজের পুরুষত্বের শক্তিতে উ'চুতে আসন নিয়ে, তোমার নারী অনুভূতিকে জাগিয়ে তোমার সামনে একটা উ'চু স্তরের ওপর দাঁড়াতে চাই-না। নীচে থাকাই আমার স্বভাব, শুধু শুধু সে স্বভাবটা বিগড়োতে চাই না। নিজের ওপর এ অন্যায় সইতে পারবো না, আমার দ্বারা তা হবেও না।'

'তোমার যে আশ্রয় দরকার ছিল পেয়েছো। আমার দ্বারা কোথাও জমে বসা সম্ভব নয়। বন্ধন আর আইন বিধির মাঝে আমি থাকতে পারি না। এমনিই হয়তো আবার একদিন ভাইসাহেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

'ওকেও মাপ করো। অভাগার ওপরে রাগ করো না। ঐ রকম লোকের সংখ্যাই আজ পৃথিবীতে বেশী। ওকে খুঁজে আমি ঠিক করে নেবো। ওর সঙ্গে সম্পর্ক না রেখে ওর মধ্যে দিয়ে চলে ওকে চিনতে চাই, দেখবো ও তৈরী কোন তত্ত্বের ওপরে। নিজেকেও মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন করি।'

* * * *

গায়ত্রী চিঠিখানা আমার হাতে দিয়েছিল। পড়া হলে বললে, "মৌলী যা লিখেছে তাই শিখে পৃথিবীকে প্রলুব্ধ করাই ওর বাকী এখন।'

"গায়ত্রী!"

গায়ত্রীর মনের বড় আশা মৌলী পৃথিবীতে আর সব মানুষের মত চলে। সংসারী হয়। অনেক খুঁজে গায়ত্রী ওর হাতে নিজেকে স'পেছিল। মৌলী গায়ত্রীকে যা শিখিয়েছে, যে রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছে তার মর্যাদা ও রাখতে চায়।

"তুমিও কি ওকে আসতে বলতে পার না?" নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে গায়ত্রী ব'ললে।

"না, ওতো বলেই গিয়েছে, ডাকলে কোনদিন আসবে না। নিজের কথা নড়চড় হতে দেয় না। এমনি হঠাৎ হয়তো একদিন এসে দাঁড়িয়ে বলবে—এই নাও, এলুম; অপেক্ষায় থেকে থেকে ক্লান্ত হওনি তো?"

আর ঠিক সেই সন্ধ্যেতেই হঠাৎ মৌলী এলো। কোর্ট থেকে ফিরে বসে আছি, গায়ত্রী ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। "ভাই সাহেব, এই দেখো মায়া এসেছে।"

"মায়া"। কথাটা মনের ভিতরেই ঘুরে ফিরে অন্তরে ছোঁয়া দিলে।

মৌলীর চেয়ে মায়াকে যেন বেশী চিনি, এমনি ভাব দেখিয়ে বললুম, "বসো মায়া," তারপর মৌলীকে বললুম, "তোর জন্যে অপেক্ষা ক'রে ক'রে যে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ি।"

"কথা থাক, গায়ত্রীদিকে বলি মায়া এসেছে।" ব'লেই মৌলী অন্দরে ঢুকছিল', কিন্তু আমি আটকে বললাম, "ওতো এখন বেড়াতে গেছে।"

"বেড়াতে!" স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে বললে।

মায়া তখনও দাঁড়িয়েই ছিল। মৌলী সামলে নিয়ে বললে, "নমস্কারও ক'রলে না? মাথায় ভাই সাহেবের পায়ের ধুলোর টিপ পরে নাও। কৌটয় সব ধুলোটুকু জমা ক'রে রাখতে ইচ্ছে যায়, রোজ মাথায় দিতে পারবো। বড় স্বার্থপর আমি, না ভাইসাহেব।"

তবুও মায়া দাঁড়িয়েই ছিল। এত বড় পৃথিবীকে বুঝে নেবার শক্তি মৌলী কোথা থেকে পেলে? মনে পড়লো ছেলেবেলায় গাছে গাছে লাফ ঝাঁপ, এখেনে সেখেনে ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া এই নিয়েই তো কেটেছে। কার বাগানে আম, পেয়ারা, কুল, যখন যেখানে মন পড়ে লুটপাট ক'রে ভাগাভাগি ক'রতেই শিখেছিল। তখন ভাবিনি একদিন ও এমনি ধারা মাথা তুলে দাঁড়াবে। পৃথিবীকে বলবে—"তুমি না হয় অচল থাকো, আমাকে তো চলতে দাও। আমাকে যে চলতেই হবে, পিছনে ফিরে তাকাই না আমি।"

মৌলী অসংলগ্নভাবে বললে, "চললুম, ভাইসাহেব! সময় নেই আর, মোটরে যেতে হবে। দিদিকে ব'লো এসেছিলুম। আর এই মায়া, একে চিনে রাখ। আজ এর আশ্রয়ের অভাব নেই, কিন্তু কোনদিন আমি না থাকতে ও এলে ঠাঁই দিও।"

"মৌলী!"

"আর দাঁড়াতে পারি না। মায়ারও তাড়াতাড়ি আছে। ওকে যেখান থেকে এনেছি সেখানেই পে'ছে দিতে হবে। নিজের কথা নড়চড় হ'তে দিইনি কোনদিন। তার একটা দাম আছে—সেটা আমিই।"

'মায়া', বললাম মায়ার দিকে ফিরে; মৌলী যাকে এক পত্রে বেশ্যা ব'লে আখ্যাত ক'রেছিল ওকে তেমন দেখাচ্ছিল না মোটেই; পরনে তার খদ্দরের সাদা শাড়ী।

বললে মায়া, "একদিন তোমার কাছে আসবো। আজ আমার সবই আছে, নিজেও আমি বড় স্বার্থপর, সে স্বভাব যাবে না। যেদিন সব কিছু খোয়া যাবে সেইদিনই......"

"মায়া!" আর কিছু বলা গেল না।

"আর সে কথা কেন? তুমি যার গুরু, ভাই, শ্রদ্ধেয়, তাকেই যখন কিছু বলতে পারলে না, তখন থাক। আবার আমি......"

"মৌলী, গায়ত্রী তোমাকে আটকে রাখতে বলেছিল, এসে কি বলবে বলতো? আমার দায় যে শেষ হয় নি!"

"বা ভাইসাহেব!" মৌলী বললে, "বেশ তো! দিদি কিছু বলবে না। তোমার সঙ্গে থেকেও মানুষ হলো না! চলো মায়া। আরে, দাঁড়িয়ে কেন, তাড়াতাড়ি করে ভাই-

সাহেবের পায়ের ধুলো নাও। আচ্ছা ভাইসাহেব, দেখা যাক্ আবার কবে দেখা হয়।"

পায়ের ওপর নিজেও ঝুঁকে বললে, পা সরিয়ে নিচ্ছো—কিন্তু আমার আর কি চাইবার আছে বলো?'"

কিছু বলবার আগেই মায়া আর মৌলী চলে গেল। মায়া চুপচাপ পিছনে পিছনে চললো; মায়াকে দেখে খুসী হলুম। ভাবলুম, দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারলে বেশ মানায়। সেই সন্ধ্যায় মায়া আর মৌলী এসেছিল যেন ইকরারনামা লিখিয়ে নিতে।

ফিরে এসেই গায়ত্রী বললে, "মৌলী এসেছিলো?"

"হ্যাঁ।"

"মোটরে যাচ্ছিল দেখলুম, মনে হল পাশে ছিল যেন মায়া।"

"এসেছিলো তোমার আমার সঙ্গে মায়ার পরিচয় করিয়ে দিতে। দাঁড়ালো না, ওদের দেরী হয়ে যাচ্ছিল।"

"পরস্পরকে ওরা এবারে বোধ হয় ধরে রাখতে পারবে।"

"ভুল ধারণা।"

"জানতুম না, তোমার মনেরও এই ভাব।"

"ওর সম্পর্কে রায় দেওয়া ঠিক হবে না, এখনও ওকে চিনতে বাকী আছে। কতদিন যে এমনি পালিয়ে বেড়াবে।"

* * * *

বসে আছি এই বিস্তৃত ময়দানের মাঝে। মাথায় ঘাস আর কাঠের বোঝা নিয়ে পাহাড়ী মেয়ে ছোট ছোট ডিঙিতে দাঁড়িয়ে—বড় নিভীক ওরা, ডিঙিগুলো ঢেউয়ের তোড়ে হেলছে দুলছে। ওদের অভ্যেস হয়ে গেছে; হাসছে সবাই, এতটুকু ভয় আছে বলে মনে হয় না।

আর এই মাঠ; কত ফুটবল ম্যাচই খেলে গিয়েছি এখানে। আমাকে গ্রামে ডাকলেই মৌলী তার আগে ম্যাচ ঠিক করে রাখতো। আমের সময় গঙ্গার ধারে পাথরের ওপরে বসে, খেলা শেষ হলে আম চুষতাম। এদিকে ওদিকে নুড়িগুলো নিরর্থক ছুড়তুম; তারপরে পরস্পরকে দেখবার বা জিজ্ঞাসাবাদ করবার খেয়ালই হতো না।

পাশেই টিলার মাঝে মৌলীর গ্রাম। উঁচু পিপুল গাছের পাশে বেলের ক্ষেত, অপর দিকে, নীচে রাস্তায় নামবার পায়ে চলা পথ।

আর এই মায়া, যে এইমাত্র হাতের চুড়ী চূর্ণবিচূর্ণ করে ঐ কালো ধুলোর মধ্যে ছড়িয়ে গেল, তাও আর চকচক করে না। ওর রঙ জীবনের শেষদিনের মতই যেন ফিকে লাগছে।

দেখছি, ঐ চওড়া সরকারী রাস্তা ধরে গাইগুলো জঙ্গল থেকে ফিরে আসছে। কতবার সকালে উঠে আমি আর মৌলী খুঁটী থেকে গাই খুলে রাখালের সোপর্দ করে দিয়েছি। চেষ্টা করলেও সে কথা ভোলা যায় না, এদিকে সেদিকে পালিয়ে আমাদের হয়রান করতো। মৌলীই ওকে ধরে এনে বাঁধতে পারতো।

আমার এখনকার সাথী মৌলীর হাতের এই অক্ষরগুলো চিঠিতে লেখা অক্ষর—"ভাই সাহেব,

এখানেও এসেচি। কাল মানুষ কোথায় যাবে কে আর জানতে পারে বলো। এতদিন চিঠি লিখি নি, কত দোষই তুমি দেবে। সব দোষই মেনে নেবো।

তোমার কাছ থেকে ফিরে মায়াকে নিজের কাছে রাখিনি কিন্তু, কারণ কাছে রাখতে পারবো না বলে। মায়ার সঙ্গে সমস্ত জীবন কেটে গেলে ভালই হতো। কিন্তু মায়ার সঙ্গে থাকবো, কথাটা তেমন ভাল লাগলো না। মায়ারও ভুল—একদিন মাঝ-রাতে মুজরো থেকে ফিরে সাজগোজ শুদ্ধ যখন আস্তে আমার ঘরের দরজা ঠেলে ভিতরে এলো, তখন কি ভাবছিলুম জানো? মায়ার কাছে আর থাকা যাবে না, শরীরটাকে একটু আরাম দিয়েই সরে পড়বো।

মায়ার ঐ সৌন্দর্য! মনে হলো মায়া একদিন আমাকে বশীভূত করে ফেলবে। তখন ছেড়ে যাবার আর সুযোগ পাব না। কেন যে সে খেয়াল মনে এলো, নিজেও বলতে পারি না, আর বোঝবারও চেষ্টা করিনি। এমনি ধারা আটকা পড়তে আমি চাই না।

সেই রাত্রেই ঘুমন্ত মায়াকে ছেড়ে চলে এসেছি। আশ্চর্য ওর টান ছিল। সেই থেকেই ঘুরে মরছি, আর তারপর একদিন একজন এই হাসপাতালে আমায় তুলে দিয়ে যায়।

লোকে বলে—জমিদারের মেয়ে বাপের বাড়ি ফিরছিল। দয়া এলো; ওষুধের কি যেন ব্যবস্থা করে দিয়েছে। রেশন তো পুরোই মিলে যায়, কিন্তু এই দয়া.....!

নাম তার শীলা। বলে বলে আর পারে না যে ঘরে অথর্বের মত পড়ে থাকি। আর ওর এবং ওর বাড়ির কাজ বাড়িয়ে দিই। তার চেয়ে এই দাতব্য হাসপাতালই ভাল।

'কার নাম করি বলো—আছেই বা আমার কে?' বললুম—একদিন যখন হাসপাতালের লোহার চেয়ারে অনেকক্ষণ বসে থেকে আমার খুঁটিনাটি জানতে চাইলে। এখন মরলে চলবে না। আচ্ছা, এমন আশ্রয় পেয়েও কৃতার্থ হব না, তো ধিক্কার আমার জীবনে! আমার কোথাও কোন মোহ নেই।

ও কিছুতেই বুঝতে চায় না। শেষে নিজেই মীমাংসা করে বললাম, বড় করে বলচি না, পৃথিবীতে যে কোন লোকের সম্পর্কে এসেচি, বলেচে—দুঃখের দিনে আমার স্মরণ নিও। দুঃখ কী জানি না, দুঃখের পরিভাষাও কিছু ঠিক করতে পারি না। একদিন দুঃখ সত্যিই যখন আসবে সবাইকে ডেকে ডেকে বলবো—দুঃখ এসেচে আজ!

"এর মাঝে অনেকখানি পৃথিবী দেখেচি, অনেক কিছু দেখেছি, সব মনেও থাকে না। শুধু এই বলতে পারি যে, পৃথিবী আমার খারাপ লাগেনি। ঘরে ঘরে গিয়েছি, বাধা পাইনি। আজ এই হাসপাতালেও শান্তিতে শুয়ে আছি। কাল রাতে কিন্তু ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, মনে হলো গালের ওপর চোখের জল পড়েছে কার। চোখ খুলে দেখি শীলা আঁচলে চোখ মুছচে।

বললুম, 'শীলা', আর বলতে পারলুম না।

শীলা চুপ করে মাথা ঝুঁকিয়ে ছিল।

বললুম, 'শীলা যাও, এত রাত হয়েচে। চাকর জেগেই আছে, তুমি যাও।'

তবুও উঠলে না শীলা।

তখন বললুম, 'নিজের জন্য আমার চিন্তা নেই। তবে কেন তুমি তোমার মোহ বিস্তার করে আমাকে আঁকড়াতে চাইচো?'

শীলার বুকে আঘাত লাগলো। যেন আবেগকে রুখতে না পেরে এক দমকায় বাইরে চলে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে আবার বসলো।

'মিছিমিছি তুমি ভাবচো।' বললুম তাকে।

'মৌলীবাবু!' বলেই চুপ করে গেল। একটু থেমে আবার বললে, 'প্রাণ চায় তোমার চরণে বসে.........!'

"না, না," কথা কেটে বললুম, 'পার তো গোবিন্দকে চিনবার চেষ্টা করো, ওকে দেখো, ভাল হলেই আমি তোমায় ওর কাছে নিয়ে যাব। আজ একথা যাক, সব ব্যবস্থা গায়ত্রীদি করে দেবে। ওর কাছে তুমি নিজেকে অপরিচিত মনে করতে পারবে না।"

চঞ্চল হয়ে উঠেছিলুম। এই শীলার সামনেই কি নিজেকে একদিন উন্মুক্ত করে দিয়ে বলবো—দুনিয়ার একটা অমূল্য জিনিস আমার কাছে ছিল, যাকে চাইতুম বরাবরই তাকে নিজের পাশে রাখতে পারতুম, আর সেও থাকতো আমার পাশে। ছলনা আমি শিখিই নি।

আলস্যও ঘিরে থাকে। শীলা চায় হাসপাতালের কামরা থেকে তুলে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বেঁধে ফেলে আমাকে। তারপর আমার মনের তালা ভেঙে তোমাদের সবাইকে ওখেনে জড়ো করতে চায় ও। সব কিছুর ওপরে এমন একটা বেপরোয়া ভাব যে ওষুধ খেতেও মন চায় না। মাল্লা-

দাগা শিশিগুলির ওপরেই যেন যত বিতৃষ্ণা। দিনের বেলা হাসপাতালের বারান্দায় চুপচাপ শুয়ে থাকি; ভাববার শক্তিও নেই। নিজেকে অবহেলায় ফেলে রাখতে চাই। এই ইঞ্জেকসনের টিউব আর মাত্রাদাগা শিশিতে কি বাকী কপালের মাপাভাত বাড়িয়ে দেওয়া যায়। তাই যদি হতো, তবে কলেরা-রোগীর খবর বার ঘণ্টা পরে দিয়ে, ডাক্তারকে নিয়ে গিয়ে বদনাম করানোই তো হবে। ও কি গিয়ে ইঞ্জেকসন দিতে পারতো না? সেই ছেলেটির মার ওই একমাত্র কামনা ছিল। আজও দুনিয়াময় ও বলে বেড়াচ্ছে—ওর ছেলের ভাগ্যে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু লেখা ছিল।

খাওয়া-না-খাওয়া নিয়ে শীলার সঙ্গে ঝগড়া বেধে যায়। বুঝতে পারিনি যে, মেয়েটা এত ঝগড়াটে হতে পারে। পরশুর কথা। আমার দরকার বুঝে রোজই ও কিছু রেজগী আমার বালিসের নীচে রেখে যায়। দিনের বেলা বাইরে বারান্দায় রোদ পোয়া-চ্ছিলুম। শীলার চাকর এক কোণে পিকদানি সাফ করচে, মাঝে মাঝে গুনগুনিয়ে গানও চলেছে। আমারই মত পাহাড়ের লোক, পাহাড়ী গানই গায়। পিকদানী মেজে চাকর এসে আমার পা টিপতে লাগলো। সামনেই বাগান। কিছু লেবু আনিয়ে খেয়েচি। টক আমার বেশ লাগে। কিন্তু সে রাত্রে শীলা চাকরের ওপরে খুব রেগে গেল। তখুনি ওকে তাড়িয়ে দিতে যায় আর কি: চাকরের মুখ শুকিয়ে গেল। আমার প্রতি মালিকের শ্রদ্ধা দেখে ও আমার মুখের দিকে চাইলে, যাতে আমি বলে-কয়ে মাফ করিয়ে দিই। তাই বললুম, 'দোষ তো আমার, মন চাইলে কি করে না করি। তোমাকেই যদি বলতুম লেবু খাওয়াও, তুমি কি অবহেলা করতে পারতে?'

শীলার কিছু বলবার ছিল। খোলা দৃষ্টি শূন্য হয়ে আসতে লাগলো।

দেখে বললুম, 'শীলা চুপ কেন! চুপ করে থাকতে শিখে আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করলে চলবে না। বলছিলুম যে, দুনিয়াকে অনুচিত প্রমাণ করার জন্যে জন্মাই নি। কারুর সঙ্গে আমার মিল না খেলে আমি দোষ দিয়ে অবজ্ঞা করতে চাই না। তাই—'

কথার মাঝেই বললে ও, 'নিজেকে এমন বেপরোয়া করে আমার দায়িত্ব যে বাড়িয়ে দিচ্ছ, তাও বোঝ না?'

'তোমার দায়িত্ব?'

'তোমাকে লেবু খাওয়াতে পারি, যদি জানি, আমার দুর্বলতাকে বেঁধে তুমি চলবে না। ওই শাস্ত্রতেই একদিন ঘায়েল করতে শিখবে; বিশ্বাস হয় না।'

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললাম, 'তুমি জান না শীলা, উপচার আমি শিখিনি। ছেলেবেলায় শীত পড়লে লোকে যখন নিজের নিজের সন্তানদের সামলাতো, তখন আমি চুপচাপ বাইরে গিয়ে বরফের ওপরে খেলতুম। একদিন প্রাইমারী স্কুলে, ধুতরোতে লোকে বাঁচতে পারে না, এই কথার ওপর বাজী রেখে, শুধু এই জানতে যে, মৃত্যু কি, আমি খুব করে ধুতরোর বীজ চিবিয়েছিলুম।'

'কি বলচো?' সব পুরণো পরিচয় মিথ্যা ধরে নিয়ে যেন প্রকৃত অনুমানে এসে পেঁাচেছে ও।

আর একদিন গঙ্গায় তক্তার ভেলার ওপরে যখন খেলতে শিখি সব সঙ্গী পালিয়ে গিয়েছিল। একলা ধুতিতে বাঁধা সেই ভেলা জলের তোড়ের মুখে নিয়ে গিয়েছিলুম। জেলেরা আমাকে বাঁচায়। মরে যাইনি সেদিনও। সবাই সাবধান করেচে। পরে সরকারী মাদ্রাসায় পড়ি—কয়লা, গন্ধক, সোরা মিলে বারুদ হয়।

আমিও তিনটে জিনিস পিষে অনেক-খানি বারুদ তৈরী করে পকেটে রাখলুম। কাগজের একটা লম্বা নল তৈরী করে তাতে আগুন লাগিয়ে দিই। তাতে একটা ছেলের পকেটে আগুন ধরে যায়। সেদিন ঠেকেও শিখিনি যে, নিজেকে সামলানো দরকার। সেই সব ছোট ছোট খেলার পর কত বড় বড় খেলা খেলেচি।'

শীলা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তোমার পাত্তা নিতে চায়। বোধ হয় আমার বিষয়ে তোমার কাছে নালিশ করতে চায়। ও বুঝেচে যে, আমার ওপরে তোমারই যা কিছু হুকুম চলে। তাই ওকে বলেচি, 'তুমি নিজেই কেন আমাকে ধরে রাখ না!'

'এত সামর্থ্য থাকলে জীবন সার্থক হতো।' আর কিছু বলেনি শীলা। ঝগড়া বাড়াতে জানে না ও।

কতবার ভেবেচি, এই হাসপাতালে বৌদি, লীলা, গায়ত্রী, মায়া আর সব যাদের সম্পর্কে এসেচি, সবাইকে জড়ো করে তারপর শেষ যাত্রায় পাড়ি দিই, কিন্তু......।

শীলা বলে, আমি ভাল হয়ে যাবার পর ও শ্বশুরবাড়ি গেলে আমাকে একদিন নিমন্ত্রণ করবে। কিন্তু আমার যাওয়া কি উচিত হবে?

বলেছিলুম, 'আমায় ডাকবার লোক কে আছে বলো? কেউ নেই। জেনেশুনেই ডাকে না।'

'আসবে তো?' গম্ভীর হয়েই শীলা জানতে চাইলে।

"আজও যখন কেউই ডাকেনি, তখন তুমি ডাকলে কি করে যাব বলো? আমার ঠিক লাগছে না কথাটা!"

শীলা অভিভূত বিমূঢ় হয়ে গেল।

* * *

গঙ্গার এই ঠাণ্ডা জল, অঞ্জলি ভরে পান করবার সামর্থ্য চলে যেতেই পাথরের ওপরে যেমনকে তেমন বসেই আছি। এই ময়দানে বসেই যেন একটা যুগ কাটিয়ে দিয়েচি।

ধীরে ধীরে রাত্রি নেমে এসে যখন সমস্ত দুনিয়া অন্ধকারে ছেয়ে যাবে, তখন গঙ্গার কাল জলপ্রবাহে আমায় কি ডুবিয়ে নিতে পারবে না? সেই অন্ধকারে কে দেবে আমাকে ডুবিয়ে?

শীলা চিনতো না, না চিনুক। কিন্তু একদিন এসে বললে, "গোবিন্দবাবু, তোমার মৌলীকে বাঁচাতে পারলুম না।"

"সে কি শীলা?" অবাক হয়ে ব'লেছিলুম।

"ওঠো। তুমি পুরুষ। ও'র কথামত আমি এসেচি। তোমাকে আমিও চিনি। দূর কোন দেশে ও যেতে চায়নি। ব'লেছিল—যেখানে দীর্ঘকাল কাটিয়েছি, গোবিন্দ জানে—আমাকে সেখানেই সঁপে দিও। বলেছিল, একদিন মৌলীই এসেছিল বোনকে সঙ্গে নিয়ে, আর আজ অজ্ঞাতে বোনই তাকে সঙ্গে নিয়ে এলো।

মৌলীর দেহ যখন দেখলুম, মনে পড়লো—মায়া কোথায় এখন?

শীলা সব চিন্তার অবসান করে দিলে। মায়াও এসেচে। কেন জানো? ঘাটেতে নিজের সব চুড়ী সঁপে দিতে। একদিন রাগের মাথায় কথার অবহেলা করেচে, আজ সেই অপমানের......

মায়া এসে পায়ের ধুলো নিলে। বললে, 'বাড়ি আর ঐশ্বর্য ছেড়ে এসেচি আজ। তোমার পায়ে আশ্রয় দেবে না?

"দূরে পাগলী!" ওকে তুলে শীলা বললে।

যে ঘাটে ফুটবল ম্যাচে মৌলী বরাবর জিতে এসেচে, তারই পাশের শ্মশানে ও আজ শেষ বাজী জিতে গেল। আর এই মায়া তার সমস্ত রঙীন চুড়ী ভেঙে ছড়িয়ে গেল কেন? গায়ত্রী পায়ের তলায় বসে কাঁদতে লাগলো।

শীলা গম্ভীর হয়েই ছিল—সমস্ত কথা ওই জানতে পেরেছিল, বলেছিল—"জীবনের মাঝে একটা দিনও ঠিকমত হাসবার সুযোগ আসেনি।"

নিস্তব্ধ রাত্রি, ঘন অন্ধকার ছেয়ে গেছে। সামনে অনেক দূরে গাঁয়ের প্রদীপশিখায়, গঙ্গার ঠাণ্ডা বাতাসে মৌলীর বিজয়ের হাসিই যেন পাচ্ছিলুম।

অনুবাদক—পঙ্কজ দত্ত

পুস্তক পরিচয়

ভারত-পথিক রামমোহন রায়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

রামমোহন রায় শতবার্ষিকীর সভাপতিরূপে ১৩৪০ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল "ভারত-পথিক রামমোহন রায়।" পুস্তিকাটির আরম্ভ হইয়াছে সেই অভিভাষণটি দিয়া, নামকরণও হইয়াছে তদনুরূপ। কিন্তু রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ১২৯১ বঙ্গাব্দে ভারতীতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা হইতে ও তাঁহার অন্যান্য লেখা ও বক্তৃতা হইতে সংকলিত বহু উক্তি এই পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগে আণবিক বোমার ধ্বংসলীলার মধ্যেও রামমোহনের বাণী অকেজো হইয়া পড়ে নাই। তাহা হইতে পারে না, কারণ তাঁহার বাণী যে সর্বকালের; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'রামমোহন যে কালে বিরাজ করেন সে কাল' 'অতীতে অনাগতে পরিব্যাপ্ত, আমরা তাঁর সেই কালকে আজও উত্তীর্ণ হোতে পারিনি।' রামমোহন ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন ঐক্যের বার্তা, সে ঐক্যকে স্বীকার না করিলে যে "মহতী বিনষ্টিঃ" তাহা রামমোহন আমাদের উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছিলেন, সেই মহতী বিনষ্টির পরিচয় আমরা তো আজ প্রত্যক্ষ করিতেছি। রামমোহন ভারতবর্ষের সত্য পরিচয় দিয়াছিলেন নিজের জীবনের দ্বারা, কারণ "যে মানুষের মধ্যে সকল মানুষের সম্মান আছে স্বীকৃতি আছে," "ভারতের সত্য পরিচয় সেই মানুষে।" মানুষে মানুষে যে ছোট ছোট বেড়ার আড়াল সেই বেড়া ভাঙিতে গিয়া রামমোহন নিজের জীবনে ভারতের প্রকৃত পরিচয় জগতের সামনে তুলিয়া ধরিলেন।

কিন্তু এই ঐক্য ধর্মকে বাদ দিয়া নয়, একথা স্বীকার করিতে হইবে। 'যা প্রবল অথচ প্রশান্ত, ব্যাপক অথচ গভীর, আত্মসমাহিত অথচ বিশ্বানুপ্রবিষ্ট সেই আধ্যাত্মিক জীবনসূত্রের ধারা না বেঁধে তুলতে পারলে অন্য কোন কৃত্রিম জোড়াতাড়ার দ্বারা জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞান, কর্মের সঙ্গে কর্ম, জাতির সঙ্গে জাতি যথার্থভাবে সম্মিলিত হোতে পারবে না।' জাতির উৎকর্ষের বিচার যে আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারাই করিতে হইবে, রামমোহন বা রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে এতটুকু সংশয়ের স্থান রাখেন নাই।

ধর্মের সম্বন্ধে এমন মনোভাব সত্ত্বেও কিন্তু রামমোহন একেবারে আধুনিক। তাঁহার এই দিকটা যাহাতে আমরা সম্যক্ অনুধাবন করিতে পারি, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—

Rammohan was the only person in his time, in the whole world of man, to realise completely the significance of the Modern Age. The ideal of human civilization does not lie in the isolation of independence, but in the brotherhood of interdependence of individuals as well as of nations in all spheres of thought and activity.

রামমোহনের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে।

বিনয়-সরকারের বৈঠকে (বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি) দ্বিতীয় ভাগ—প্রকাশক: চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ, ১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; মূল্য ছয় টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা—৭০০।

বিভিন্ন সময়ে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সঙ্গে শ্রীযুক্ত হরিদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রবিজয় সেন, শ্রীযুক্ত ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল ও শ্রীযুক্ত মন্মথ সরকারের সঙ্গে বাঙলার সাহিত্য, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধন-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে যে সমস্ত আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল, প্রশ্নোত্তরের আকারে সেগুলি এই বিরাট গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে "মার্কস্-নিষ্ঠায় বাঙালী প্রাবন্ধিক," "সমাজ-নিষ্ঠায় আন্দোলন," "'গৃহস্থ'-'উপাসনা' গম্ভীরার আবহাওয়ায়," "রকমারি সামাজিক ব্যাখ্যা," "মার্কসিস্ট সাহিত্য সমালোচনার গলদ," "লড়াইয়ের অর্থশাস্ত্র," "লড়াইয়ের পরোক্ষ খর্চা," "পরাধীন জাতের আর্থিক আইন-কানুন," "প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ," "বিবেকানন্দ ও রামেন্দ্রসুন্দর," "ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব," "জাতি-ভেদ হীন হিন্দুত্ব," "খাদ্য সংস্কার," "বাড়তির পথে বাঙালী," "মেয়ে চাকুরে," "গরীব বনাম পয়সাওয়ালা," "রবিহীন বাঙালী," "সাম্প্রতিক সাহিত্যের শুরু কবে?" "স্বদেশী যুগের গাল্পিক ও নাট্যকার," "সাহিত্য স্রষ্টার দল বনাম পয়সাওয়ালার দল," "সুভাষের প্রস্তাব," "জন-নায়ক ও সাংবাদিক"—ইত্যাদি—এত বহু বিচিত্র বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, যাহার সুদীর্ঘ তালিকা সূচীপত্রের ১৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী স্থান জুড়িয়া আছে। এই সমস্ত আলোচনা-প্রসঙ্গে দেশী, বিদেশী বহু প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক দার্শনিক, অর্থনীতিবিৎ, রাজনীতিক, সমাজ-তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাঁহাদের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। ভারতের তথা বাঙলার অতীতের ও বর্তমানের বহু সাংবাদিক প্রাবন্ধিক কথাসাহিত্যিক ও কবি, যেমন অক্ষয়-কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, সুরেশ সমাজপতি, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেন, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নাগ, শ্রীযুক্ত চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, ইকবাল, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, রবীন্দ্র-নাথ মৈত্র, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায়, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্ত, শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস, শ্রীযুক্ত, বলাই-চাঁদ মুখোপাধ্যায়, কাজি আবদুল ওদুদ, শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষ, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচি, শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোজ বসু, নাট্যকার শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ, শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত, শ্রীযুক্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্তা আশালতা দেবী, শ্রীযুক্তা অপরাজিতা দেবী, কাজী নজরুল ইসলাম, বন্দে আলি মিয়া, জসিমুদ্দিন, দীনেশ দাশ, শ্রীযুক্ত দিলীপকমার রায়, জলধর সেন, শ্রীযুক্ত নরেন মিত্র, শ্রীযুক্ত কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ ও তরুণ সাহিত্যিকগণের রচনা ও নানা বিষয়ে অবদান সম্বন্ধে আলোচনা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে। এই সাহিত্য সমালোচনা পাঠক সমাজে প্রচুর কৌতূহল জাগ্রত করিবে। এত বহুসংখ্যক ব্যক্তি ও বিষয়ের অবতারণা এই ৭০০ পৃষ্ঠাব্যাপী বিপুলকায় গ্রন্থে করা হইয়াছে যে, তাহার সম্পর্কে উল্লেখ সম্ভবপর নহে। এই গ্রন্থ একাধারে সমাজ, সাহিত্য, রাজ-নীতি সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ের সমালোচনা ও ইতিহাস। পূর্বাপর বহু ঘটনার ক্রনিকল হিসাবেও এই গ্রন্থখানির যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের ন্যায় দ্বিতীয় ভাগও যথেষ্ট সমাদর লাভ করিবে।

রাজকন্যার ঝাঁপি—শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত; প্রাপ্তিস্থান—শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণ-ওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থ চার অঙ্কের একখানি নাটিকা। এই নাটিকা স্বর্ণ দেউলে বন্দিনী এক রাজ-কুমারীকে অবলম্বন করিয়া রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে। সাতমহলায় রক্ষিদলের প্রহরায় বন্দিনী রাজকন্যা। রাজকুমার দলের বিলাস-সামগ্রী হইয়া বহুমূল্য সাজসজ্জা ও আভরণে রাজকুমারীর প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। সে চায় মুক্তি। স্বর্ণ দেউলের চূড়া হইতে দূরে লোকালয়ে যে জন-গণের অস্পষ্ট সাক্ষাৎ মেলে, সে চায় তাহাদের সহিত অবাধভাবে মিশিতে, তাহাদের সুখদুঃখের অংশভাগিনী হইতে। অবশেষে সেই মুক্তি ও জনগণের আকাঙ্ক্ষিত সংসর্গ মিলিল। কিন্তু তাহারাও চায় তাহাকে তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালনা করিতে। এই অবস্থায়ও রাজকন্যার শান্তি মিলিল না। রাজকন্যা শান্তির সন্ধানে চলিতে লাগিল, অবশেষে রাজকন্যার সাক্ষাৎ মিলিল মেহেরের সঙ্গে। নৌকা ডুবি হইতে সে তাহার পিতৃহন্তার প্রাণরক্ষা করিয়া আসিয়াছে। যে ছোরার দ্বারা তাহার পিতাকে খুন করা হইয়াছিল, সেই ছোরার বাঁটে সে পিতৃহন্তা শিবু চৌধুরীর গলা হইতে রুদ্রাক্ষের মালা ছিঁড়িয়া আনিয়া জড়াইয়া রাখিয়াছে। রাজকুমারী সেই মালার একটি রুদ্রাক্ষ রাখিল তাহার ঝাঁপিতে। তারপর তাহার দেখা হইল সাঁওতাল জুহুর সঙ্গে। সে তাহার বিশ্বাসহন্ত্রী লখিয়াকে তীরের সাহায্যে খুন করিয়া তাহার বুক হইতে রক্তাক্ত মালা খুলিয়া আনিয়াছে। রাজকুমারী সেই মালার একটি রক্তাক্ত ফুল রাখিল তাহার ঝাঁপিতে। সংক্ষেপে ইহাই হইল নাটিকার আখ্যানভাগ। সংলাপগুলি সংক্ষিপ্ত, অথচ প্রাঞ্জল, ভাষার ওজোগুণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নাটিকাটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে।

পতিতা—কাব্যগ্রন্থ। শ্রীবিমলানন্দ শাসমল। প্রাপ্তিস্থান সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সি, ১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা বার আনা।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট অনেকগুলি কবিতাই লেখকের কৈশোরে রচিত—এই বয়সের রচনা কাব্যহিসাবে সার্থক হইয়া উঠিবে, সাধারণত এ রকম আশা করা যায় না। কিন্তু কাব্যরূপের নানা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই রচনাগুলির মধ্যে আমরা একটি কবিমনের বেদনাবোধের পরিচয় পাইয়া আশান্বিত হইয়াছি। গৌরবময় উত্তরা-ধিকাররূপে কবি যে দেশাত্মবোধ, উৎপীড়িতের প্রতি সমবেদনা অর্জন করিয়াছেন, অনেকগুলি কবিতার মধ্য দিয়া তাহা প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিয়াছে—আশা করি উত্তরকালে কাব্যে ও জীবনে উভয়ত্র তাহা সার্থকতা লাভ করিবে।

কাফে দে জেনি

সৈয়দ মুজতবা আলী

রাত বারোটায় প্যারিসে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ভাবলুম যাই কোথায়? হোটেল? তাও কি হয়! খাস প্যারিসের বাসিন্দা ছাড়া আর তো কেউ কখনো তিনটের আগে শুতে যায় না। আমার এক রুশ বন্ধুকে প্যারিসে সকাল হওয়ার আগে কখনও বাড়ি ফিরতে দেখিনি। রাত তিনটে চারটের সময় যদি বলতুম, "রবের চল, বাড়ি যাই" সে আমার কোটের আস্তিন বেড়াল-ছানার মত আঁকড়ে ধরে বলত, "এই অন্ধকারে? তার চেয়ে ঘণ্টা তিনেক সবুর করো, উজ্জ্বল দিবালোকে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম দিয়ে বাড়ি ফিরব। আমি কি নিশাচর, চোর, না অভিসারিকা? অত সাহস আমার নেই।"

জানতুম ম' পারনাস বা আভেন্যু রশো-শুয়ারের কোনো একটা কাফেতে তাকে পাবই। না পেলেও ক্ষতি নেই, একটু কফি খেয়ে, এদিক ওদিক আঁখ মেরে 'নিশার প্যারিসের' হাতখানা চোখের পাতার উপর বুলিয়ে নিয়ে আধা-ঘুমো-আধা-জাগা অবস্থায় হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়ব।

জুনের রাত্রি। না-গরম না-ঠাণ্ডা। প্লাস দ্য লা মাদলেন দিয়ে থিয়েটারের গানের শেষ রেশের নেশায় এগিয়ে চললুম। গুণ গুণ করছি;—

তাজা হাওয়া বয়
খুঁজিয়া দেশের ভুঁই।
ও মোর বিদেশী যাদু
কোথায় রহিলি তুই?

ভাবছি রাধার চেয়ে কৃষ্ণের প্রেম ছিল ঢের বেশি ফিকে। অথচ ত্রিস্তানের প্রেম কি ইজলদের চেয়ে কম ছিল? না, জর্মনরা অপেরা লিখতে পারে বটে, ইতালিয়েরা গাইতে পারে বটে ও ফরাসীরা রস চাখতে জানে বটে। বলেও, "খাবার তৈরী করা তো রাঁধুনির কম্ম, খাবেন গুণীরা। আমরা অপেরা লিখতে যাব কোন দুঃখে?"

দেখি, হঠাৎ কখন এক অজানা রাস্তায় এসে পড়েছি। লোকজনের চলাচল কম। মোটরের ভেঁপু প্রায় বাজেই না। চঞ্চল দ্রুত জীবন স্পন্দন থেকে জনহীন রাস্তায় এসে কেমন যেন ক্লান্তি অনুভব করলুম। একটু জিরোলে হত। তার ভাবনা আর যেখানেই থাক প্যারিসে নাই। কলকাতায় যে রকম পদে পদে না হ'ক বাঁকে বাঁকে পানের দোকান, প্যারিসেও তাই। সর্বত্র কাফে। প্রথম যেটা চোখে পড়ল সেটাতেই ঢুকে পড়লুম।

মাঝারি রকমের ভিড়। নাচের জায়গা নয়। ক্যানেস্তারা ব্যাণ্ড বা রেডিওর বাদ্যি-বাজনা নেই দেখে সোয়াস্তি অনুভব করলুম। একটি টেবিলে জায়গা খালি ছিল; শুধু একজন খবরের কাগজের ফেরিওলা, কালো টুপিতে সোনালি হরফে 'ল্য মার্তা' লেখা চোখ বন্ধ করে সিগারেটে দম দিচ্ছেন, সামনে অর্ধশূন্য কফির পেয়ালা। আমি একটু মোলায়েম সুরে বললুম, "মসিয়ো যদি অনুমতি করেন, তবে—"। "তবে এই টেবিলে কি অল্পক্ষণের জন্য বসতে পারি?" এই অংশটুকু কেউ আর বলে না। গোড়ার দিকটা শেষ না হতেই সবাই বলে "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ!" কিন্তু ল্য মার্তার হরকরা দেখলুম সে দলের নন। আমার বাক্যের প্রথমার্ধ শেষ করে যখন 'বিলক্ষণ বিলক্ষণ' শোনবার প্রত্যাশায় থেমেছি, তিনি তখন চোখ মেলে, মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে, স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে, আমার অনুরোধ শব্দে শব্দে ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করলেন, "মসিয়ো যদি অনুমতি করেন তবে?—তবে কি?" হেন অপ্রয়োজনীয় অবান্তর প্রশ্ন আমি হিল্লি-দিল্লি-কলোন-বুলোন কোথাও শুনিনি। কি আর করি, বললুম, "তবে এই টেবিলে অল্পক্ষণের জন্য বসি।" ল্য মার্তা বললেন, "তাই বলুন। তা না হলে আপনি যে আমার গলাকাটার অনুমতি চাই-ছিলেন না কি করে জানব? যারা সকল্পন বাক্যের পূর্বার্ধ বলে উত্তরার্ধ নির্ণয় করে না তারা ভাষার কোমর কাটে। মানুষের গলা কাটতে তাদের কতক্ষণ? বসুন।" বলে ল্য মার্তা চোখ বন্ধ করে সিগারেটে আরেক-প্রস্ত দীর্ঘ দম দিলেন। অনেকক্ষণ পরে চোখ না মেলেই আস্তে আস্তে বললেন, যেন কোন্ ভীষণ প্রাণ হরণ উচাটন মন্ত্র জপে যাচ্ছেন, "ভাষার উচ্ছৃংখলতা, তাও আবার আমার সামনে!"

আমি বে-বাক অবাক! এ আবার কোন রায়বাঘা সাহিত্যরথী রে বাবা। কিন্তু রা কাড়তে হিম্মৎ হল না পাছে ভাষা নিয়ে ভদ্রলোক আরেকদফা, একতরফা রফারফি করে ফেলেন। আধঘণ্টা-টাক কেটে যাওয়ার পর ল্য মার্তা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে যেন ঘুম ভাঙালেন। ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "ফরাসী জানেন বলে মনে হচ্ছে।" কথাটা ঠিক প্রশ্ন নয়, তথ্য নিরূপণও নয়। আমি তাই বিনীতভাবে শুধু, 'ওয়াঁও ওয়াঁও' গোছ একটা শব্দ বের করলুম। অত্যন্ত শান্তস্বরে ল্য মার্তা বললেন, "ভাষা সৃষ্টি কি করে হল তার সমাধান সাধনা নিষ্ফল। এ জ্ঞানটা প্যারিসের ফিলোলজিস্ট এসোসিয়েশনের ছিল বলেই তাদের পয়লা নম্বর আইন, তাদের কোনও বৈঠকে ভাষার সৃষ্টি তত্ত্ব, গোড়াপত্তন নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না। তবু অনায়াসে একথা বলা যেতে পারে যে, সৃষ্টির আদিম প্রভাতে মানুষের ভাষা ছিল না, পশুপক্ষীর যেমন আজও নেই। আজও পশুপক্ষীরা কিচির-মিচির করে ভাব প্রকাশ করে। মানুষ কিন্তু 'ওয়াঁও, ওয়াঁও', করে না।"

লোকটার বেআদবী দেখে আমি থ' হয়ে গেলুম। ল্য মার্তা জিজ্ঞেস করলেন, "ফের্না রুমোর নাম শুনেছেন?" গোসসা হয়ে বেশ উষ্মার সঙ্গে বললুম, 'শুনিনি।' "শোনেননি।" ল্য মার্তা অতিবিজ্ঞের অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, "জানেন না, অথচ কী গর্ব জানেন না। এই গর্ব যেদিন লজ্জা হয়ে সর্ব অস্তিত্বকে খর্ব করবে, সেদিন সে লজ্জার জ্বালা জুড়োবেন কোন পঙ্ক দিয়ে? ও রেভোয়া!" বলে ল্য মার্তা গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে লোকটার কথা খানিকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলুম। তারপর আপন মনেই বললুম, 'দুত্তোর ছাই, মরুকগে।' একটা খবরের কাগজের সন্ধানে ওয়েটারকে বললুম, "কোনও একটা বিকেলের কাগজ, সকালেরটা বেরিয়ে থাকলে তাই ভালো।" ওয়েটার খানিকক্ষণ হাবার মত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি বিদেশী মঁসিয়ো, তাই জানেন না আমাদের ক্রিয়াতেল-গাহকরা সবাই জিনিয়স। কাফের নাম 'কাফে দে জেনি' 'প্রতিভা-কাফে'। এনুরা কেউ খবরের কাগজ পড়েন না। তবে সবাই মিলে একটা সাপ্তাহিক বের করেন—বজবানে গ্রীক্। তার একখণ্ড এনে দেব?" আমি বললুম "থাক।" এসিরিয়ন কি ব্যাবিলনিয়ন যে বলে নি সেই অন্ততঃ এ পুরুষের ভাগ্যি।

ততক্ষণে দেখি আরেকটি ভদ্রলোক ল্য মার্তার শূন্য চেয়ারখানা চেপে বসেছেন। বেশ মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললেন, "আপনি বুঝি ফের্না রুমোর বন্ধু?" আমি জিজ্ঞেস করলুম "ফের্না রুমো কে?" ভদ্রলোকটি আশ্চর্য হয়ে বললেন "কেন? এই যার সঙ্গে কথা বলছিলেন!" হালে পানি পেলুম;

হাল মাল্‌ম হল। বললন্ম, "না এই প্রথম আলাপ।" "ও, তাই বলনে। আমার নাম পল রর্না। আপনার সংগে আলাপ হয়ে খুসী হলন্ম।" "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, আমার নাম ইরশাদ চৌধ্রী।" শ্ধালম্ম, "মসিয়ো কি গ্রীক খবরের কাগজ পড়েন?" রর্না উত্তর দিলেন, "আপনি আমাদের কাগজটার কথা বলছেন তো? নাঃ, আমি গ্রীক জানিনে। কিন্তু ওয়েটারটা জানে। ওঁকে ডাকব? সে আপনাকে তর্জমা করে শুনিয়ে দেবে। তবে তার ফরাসী বোঝাও এক কর্ম।"

গোলকধাঁধাটি আমার কাছে আরো পেঁচিয়ে যেতে লাগল। জিজ্ঞেস করলম্ম, "মসিয়ো র্য়মো কি ল্য মাঁতায় কাজ করেন?" রর্না বললেন "পেটের দায়ে। এক কপ্‌ কফি মেরে সে তিনদিন কাটাতে পারে। কিন্তু চারদিনের দিন? বছর দশেক প্র্বে তার একটা কবিতা বিক্রি হয়েছিল। পয়সাটা পেলে ভালো করে একপেট খাবে। হালে যে কবিতাটা 'ল্য মেরক্যুরে' পাঠিয়েছিল, তারা সেটার কোঠ ঠিক না করতে পেরে, বিজ্ঞাপন ভেবে মলাটে ছাপিয়েছে। কিন্তু টাকার দ্ঃখ এইবার তার ঘ্চল বলে। বাস্তাইয়ের জেলে ফাঁস্ড়ের চাকরীটা খালি পড়েছে। র্যমো দরখাস্ত করেছে। খ্ব সম্ভব পাবে। ফাঁসী দেওয়াতে ওয়াকিবহাল হয়ে যখন ন্তন কবিতা ঝাড়বে তখন আর সব চ্যাংড়াদের ঘায়েল করে দেবে।"

জিজ্ঞেস করলম্ম, "আপনি কিছ্ লেখেন?"

"লেখাপড়াই ভুলে গিয়েছি, তো লিখব কি করে?"

"লেখাপড়া ভুলে গিয়েছেন মানে?"

"মানে অত্যন্ত সরল। আমি ছবি আঁকি। ছবি আঁকায় নিজকে সম্প্র্ণ আত্মবিস্মৃতিতে লোপ করে দিতে হয়। কবিতা, গান, নাচ এক কথায় আর সব কিছ্ তখন শ্ধ্ অবান্তর নয় জঞ্জাল। নদী যদি তরঙ্গের কলরোল তোলে তবে কি তাতে স্নদর ধরার প্রতিচ্ছবি ফোটে? ঝাড়া দশটি বছর লেগেছে, মোশয়, ভাষা ভুলতে। এখন ইস্তেক রাস্তার নামও পড়তে পারি না, নাম সইও করতে পারিনে! বেঁচে গেছি। জীবনের প্রথম প্রভাতে মান্ষ কি দেখেছিল চোখ মেলে?—য্গ য্গ সঞ্চিত সভ্যতার বর্বর কল্ষ-কালিমাম্ক্ত জ্যোতির্দ্ষ্টি দিয়ে? তাই দেখি, তাই আঁকি।"

লোভ সম্বরণ করতে পারলম্ম না। বললম্ম, "স্ষ্টির প্রথম প্রভাতে মান্ষ তার অন্ভূতির প্রকাশ কি 'ওয়াঁও, ওয়াঁও' করে করেনি?" দেখলম্ম, রর্না বড় মিষ্টি স্বভাবের লোক। বাধা পেয়ে বাঘা জিনিয়সের মত তেড়ে এলেন না। পর্ন্তু গালে টোল লাগিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, "র্যমো বলেছে তো? ও তার স্বপ্ন। আর স্বপ্ন মানেই তো ছবি। স্পর্শ নেই, গন্ধ নেই, শব্দ নেই; এমন কি সে ছবিতে রঙও নেই; কম্পজিশন নেই। সে বড় নবীন ছবি, সে বড় প্রাচীন ছবি! সে তো আত্মদর্শন, ভূমাদর্শন!"

জিজ্ঞেস করলম্ম, "সে ছবি ব্ঝবে কে? তাতে রস পাবে কে? আমাদের চোখের উপর যে হাজার হাজার বৎসরের পলস্তরা।"

রর্না বড় খ্শী হলেন। মাথা হেলিয়ে দ্লিয়ে বললেন, "লাখ কথার এক কথা বললেন, মসিয়ো। তাই বলি প্রাচ্য দেশীয়রা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী অসভ্য, অর্থাৎ সভ্য। চিরকাল ম্ক্তির সন্ধান করেছে বলে তাদের চোখ ম্ক্ত। চলনু, আপনাকেই আমার ছবি দেখাব।" জানালার পাশে বসেছিলেন, পর্দাটা সরিয়ে বললেন, "এই আলোতেই আমার ছবি দেখার প্রশস্ততম সময়।"

ব্থা আপত্তি করলম্ম না। বাইরে তখন ভোরের আলো ফ্টছে।

রাস্তায় চলতে চলতে রর্না বললেন, "আদিম প্রভাতের স্ষ্টি দেখতে হলে প্রদোষের অর্ধনিমীলিত চেতনার প্রয়োজন।"

তেতলার একটা ঘরে গিয়ে ঢ্কলম্ম। ডাক দিলেন "নানেৎ!"

ঘরের চারদিকে তাকাবার প্র্বে নজর পড়ল নানেতের দিকে। সোফায় অর্ধশায়িতা কিশোরী না য্বতী ঠিক ঠাহর করতে পারলম্ম না। একগাদা সোনালি চুল আর দ্টি স্ডৌল বাহ্। রর্না আলাপ করিয়ে দিলেন, "মসিয়ো ইরশাদ; নানেৎ—আমার মডেল, ফিয়াঁসে, বন্ধ্। নানেৎ, জানলাগ্লো খ্লে দাও।"

চারদিকে তাকিয়ে আমার কি মনে হয়েছিল

আজ আর স্পষ্ট মনে নেই। ছাত থেকে মেঝে পর্যন্ত ছবি, ছবি আর ছবি। আগাগোড়া যেন ক্যানভাসে মোড়া। সোফাতে মেঝেতে, কৌচে, চেয়ারে সর্বত্র ছবি ছড়ানো। অদ্ভুত সামঞ্জস্যহীন অর্থবিহীন অতি নবীন না বহু প্রাচীন তালগোল পাকানো বস্তুপিন্ড; না জ্বরের বেঘোরে ঘোরপাক খাওয়া আধা চেতনার বিভীষিকার সৃষ্টি? পাশুটে, তামাটে, ঘোলাটে, ধোঁয়াটে এ কি?

হঠাৎ কানে গেল রণী ও নানেতে যেন আলাপ হচ্ছে।

"নানেৎ।"

"মন আমি (বন্ধু!)"

"দেখছ?"

"তুমি ছাড়া কি কেউ কখনও এমন সৃষ্টির কল্পনা করতে পারত?"

"নানেৎ।"

"প্যারিস, পৃথিবী তোমাকে রাজার আসনে বসাবে।"

"না বন্ধু আমার আসন চিরকাল তোমার পায়ের কাছে। নানেৎ মা শেরি" (প্রিয়তমে)।

"মন আমি।"

নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে এলুম। দেখি প্রভাতসূর্য ইফেল মিনারের কোমরে পেঁচেছে। চোখোচোখি হতে যেন স্বপ্ন কেটে গেল।

রবেরের মুখে তাই
হামেশাই;
'নিশার প্যারিসে' কভু, হাবা ওরে, বলি
তোরে, কাফে ছেড়ে বাহিরিতে নাই।

সাহিত্য সংবাদ

সনাতন ধর্ম সমিতি

"সংস্কৃত আবৃত্তি প্রতিযোগিতা"

এতদ্দ্বারা সংস্কৃত শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদিগকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ৩০শে ভাদ্র (ইং ১৬ই সেপ্টেম্বর) রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় উক্ত সমিতি কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়ে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় যাহারা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করা হইবে। যাহারা উহাতে যোগদান করিতে ইচ্ছুক তাহারা অদ্য হইতে ১ সপ্তাহের মধ্যে ৩নং জোড়াপুকুর লেন, কলিকাতা এই ঠিকানায় সমিতির সম্পাদকের নিকট লিখিত আবেদন করিবেন।

প্রতিযোগিতার স্থানঃ—মহাবোধি সোসাইটি হল।

সভাপতি—বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় এম এ ডি এল।

বিষয়ঃ—(১) গীতা—১১শ অধ্যায়—ত্বমাদিদেব (৩৮) হইতে ময়া প্রসাদাৎ প্রণয়েনবাপি (৪১) পর্যন্ত। (২) শ্রীশ্রীচণ্ডীঃ—৪র্থ অধ্যায়—যা শ্রীঃ স্বয়ং (৪নং) হইতে "ভগবতী পরমা হি দেবি॥ (৮নং) পর্যন্ত॥

রবীন্দ্র-চর্চা

রবীন্দ্র-রচনা-সূচী

শ্রীপুলিনবিহারী সেন-সংকলিত

[গত ২ আষাঢ় সংখ্যার অনুবৃত্তি]

সবুজ পত্র

প্রথম বর্ষ ॥ ১৩২১ বৈশাখ-চৈত্র

বৈশাখ

সবুজের অভিযান

বলাকা (১)

বিবেচনা ও অবিবেচনা

কালান্তর

হালদার-গোষ্ঠী

গল্প সপ্তক; বর্তমানে, গল্পগুচ্ছ ৩, বিশ্বভারতী সংস্করণ

জ্যৈষ্ঠ

বাংলা ছন্দ

জে ডি অ্যান্ডারসনকে লিখিত।
ছন্দ, প্রথম সং, "পত্র" (১)

আমরা চলি সমুখ পানে

বলাকা (৩)

হৈমন্তী

গল্প সপ্তক; বর্তমানে, গল্পগুচ্ছ ৩, বিশ্বভারতী

আষাঢ়

শঙ্খ

বলাকা (৪)

আষাঢ়

পরিচয়; পরে, বিচিত্র প্রবন্ধ. দ্বিতীয় সংস্করণ

বোষ্টমী

গল্প সপ্তক; বর্তমানে, গল্পগুচ্ছ ৩, বিশ্বভারতী

শ্রাবণ

সর্বনেশে

বলাকা (২)

বাস্তব ॥ ১ ॥

সাহিত্যের পথে

বাংলা ছন্দ

জে ডি অ্যান্ডারসনকে লিখিত।
ছন্দ ২য় সংস্করণ, (যন্ত্রস্থ)

স্ত্রীর পত্র

গল্প সপ্তক; বর্তমানে, গল্পগুচ্ছ ৩, বিশ্বভারতী

ভাদ্র

লোকহিত

কালান্তর

ভাইফোঁটা

গল্প সপ্তক; বর্তমানে, গল্পগুচ্ছ ৩, বিশ্বভারতী

পাড়ি

বলাকা (৫)

আশ্বিন

আমার জগৎ

সঞ্চয়

শেষের রাত্রি ॥ ২ ॥

গল্প সপ্তক; বর্তমানে, গল্পগুচ্ছ ৩, বিশ্বভারতী

কার্তিক

সন্ধ্যার যাত্রী

গীতালি (১০৭)

অপরিচিতা

গল্প সপ্তক; বর্তমানে, গল্পগুচ্ছ ৩, বিশ্বভারতী

শেষ প্রণাম

গীতালি (১০৮)

অগ্রহায়ণ

ছবি

বলাকা (৬)

জ্যাঠামশায়

চতুরঙ্গ

তাজমহল

বলাকা (৭) "একথা জানিতে তুমি"

পৌষ

চঞ্চলা

বলাকা (৮)

লড়াইয়ের মূল

কালান্তর

তাজমহল

বলাকা (৯) "কে তোমারে দিল প্রাণ"

খৃষ্টধর্ম

"খৃষ্ট জন্মদিনে শান্তিনিকেতনে কথিত।" অপ্রকাশিত

শচীশ

চতুরঙ্গ

মাঘ

উপহার

বলাকা (১০)

দামিনী

চতুরঙ্গ

বিচার

বলাকা (১১)

ফাল্গুন

শ্রীবিলাস

চতুরঙ্গ

দুই নারী

বলাকা (২৩)

কর্মযজ্ঞ

"হিতসাধনমণ্ডলীর প্রথম সভাধিবেশনে কথিত বক্তৃতার সারমর্ম।" অপ্রকাশিত

এবার

বলাকা (২৫)

আবার

বলাকা (২৬)

চৈত্র

বসন্তের পালা ॥ ৩ ॥

ফাল্গুনী। বিভিন্ন দৃশ্যের "গীতিভূমিকা" ও 'উৎসবের গান'। ভূমিকাংশ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, ফাল্গুনীর গ্রন্থপরিচয়

ফাল্গুনী

ফাল্গুনী। ভূমিকাংশ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১২, ফাল্গুনীর গ্রন্থপরিচয়।

দ্বিতীয় বর্ষ ॥ ১৩২২ বৈশাখ-চৈত্র

বৈশাখ

ঘরে-বাইরে

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাস এই সংখ্যায় আরম্ভ হইয়া ১৩২২ ফাল্গুন সংখ্যায় সমাপ্ত।

আমার গান ॥ ৪ ॥

বলাকা, (১৫)

তুমি-আমি

বলাকা, (২৯)

"ডায়ারি"র ভূমিকা ॥ ৫ ॥

অপ্রকাশিত

॥ ১ ॥ দ্রষ্টব্য, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩২১, "লোক-শিক্ষক না জননায়ক," শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়; সবুজপত্র, মাঘ ১৩২১, "সাহিত্যে বাস্তবতা" শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও "বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি?", শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

॥ ২ ॥ এই গল্পটি অবলম্বনে পরে 'গৃহ-প্রবেশ' নাটক রচিত হয়।

॥ ৩ ॥ "আর কয়েক পৃষ্ঠা পরে পাঠক ফাল্গুনী বলিয়া একটা নাটকের ধরণের ব্যাপার দেখিতে পাইবেন। এই বসন্তের পালার গান-গুলি তম্বুরার মত তাহারি মূল সুর কয়টি ধরাইয়া দিতেছে।"

॥ ৪ ॥ এই কবিতাটির গীতরূপ, "গান-গুলি মোর শৈবালেরি দল।"

॥ ৫ ॥ "পঁচিশ বছর পূর্বেকার এক-খানি ডায়ারির কয়েকটি পাতা আমার হাতে পড়িয়াছে। তখনকার দিনের একজন কলেজের [শ্রীপ্রমথ চৌধুরী?] লেখা। সবুজ পত্রের সম্পাদকের দরবারে এই পাতা কয়খানি দাখিল করিলাম।"......

জ্যৈষ্ঠ

কবির কৈফিয়ৎ

সাহিত্যের পথে

সোনার কাঠি

পরিচয়; পরে, বিচিত্র প্রবন্ধ, দ্বিতীয় সংস্করণ

আষাঢ়

বেদনা

গান, "বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা," ১৩ পৌষ ১৩২১, শান্তিনিকেতন

যৌবনের পত্র

বলাকা, (১৩)

ছবির অঙ্গ

পরিচয়; পরে, বিচিত্র প্রবন্ধ, দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রাবণ

টীকা টিপ্পনী ॥ ৬ ॥

অপ্রকাশিত

যাত্রা

বলাকা, (১৮)

ভাদ্র ও আশ্বিন

কৃপণতা

পরিচয়; পরে, সমাজ

অজানা

বলাকা, (৩০)

শরৎ

পরিচয়; পরে, বিচিত্র প্রবন্ধ, দ্বিতীয় সংস্করণ

স্ত্রীশিক্ষা

সমাজ, ১৩৪৪ সং; শিক্ষা ১৩৫২ সং, প্রথম খণ্ড

কার্তিক

বলাকা

বলাকা, (৩৬)

অগ্রহায়ণ

নূতন বসন

বলাকা, (৩৮)

টীকাটিপ্পনী

রবীন্দ্র-রচনাবলী ৮, 'ঘরে বাইরে'র গ্রন্থপরিচয়

পৌষ

শিক্ষার বাহন ॥ ৭ ॥

পরিচয়, পরে শিক্ষা, ১৩৪২ সং; বা ১৩৫২ সং, প্রথম খণ্ড

শেক্সপিয়র

"কবির মৃত্যুর তিনশো বছর পরের স্মৃতিবার্ষিক উপলক্ষ্যে।" বলাকা, (৩৯)

মাঘ

বৈরাগ্য সাধন

ফাল্গুনী, "সূচনা"

ফাল্গুন

রূপ

বলাকা, (১৬)

চেয়ে দেখা

বলাকা, (৪০)

চৈত্র

ছাত্রশাসনতন্ত্র ॥ ৮ ॥

শিক্ষা, ১৩৫২ সং, প্রথম খণ্ড।

"যে কথা বলিতে চাই"

বলাকা, (৪১)

তৃতীয় বর্ষ ॥ ১৩২৩ বৈশাখ-চৈত্র

বৈশাখ

নববর্ষের আশীর্বাদ

বলাকা, (৪৫)

পত্র

শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে লিখিত। "সবুজ পত্রের আসরে যখন তোমরা।"

অপ্রকাশিত

জাপান-যাত্রীর পত্র

জাপান-যাত্রী; বর্তমানে, জাপানে-পারস্যে

জ্যৈষ্ঠ

জাপান-যাত্রীর পত্র

জাপান-যাত্রী; বর্তমানে, জাপানে-পারস্যে

আষাঢ়

জাপান-যাত্রীর পত্র

জাপান-যাত্রী; বর্তমানে, জাপানে-পারস্যে

শ্রাবণ

জাপান-যাত্রীর পত্র

জাপান-যাত্রী; বর্তমানে, জাপানে-পারস্যে

ভাদ্র

জাপান-যাত্রীর পত্র

জাপান-যাত্রী; বর্তমানে, জাপানে-পারস্যে

আশ্বিন—কার্তিক

জাপানের পত্র

জাপান-যাত্রী; বর্তমানে, জাপানে-পারস্যে

অগ্রহায়ণ

জাপানের পত্র

॥ ৬ ॥ স্বাক্ষরহীন ও সূচীতে রচয়িতার নামোল্লেখহীন এই রচনা যে রবীন্দ্রনাথের, এই অনুমান সবুজপত্র-সম্পাদক কর্তৃক সমর্থিত। তুলনীয়, 'চিঠিপত্র' ৫, (যন্ত্রস্থ) ৪০ সংখ্যক চিঠি, ১৮ আগষ্ট ১৯১৫, "এবারকার সবুজ পত্রে আমি ত টীকাটিপ্পনি আরম্ভ করিয়ে দিয়েছি।"

● এই সংখ্যায় প্রকাশিত দুইটি "টিপ্পনী"র একটি, পরীক্ষায় অধিকসংখ্যক ছাত্র উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে। এই আলোচনা বর্তমানে প্রাসঙ্গিক বলিয়া, সেটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল।—

"শিক্ষা নিয়ে আমাদের সরকারী শিক্ষাবিধান সভায় একটা গোলমাল চলচে।

ডাক্তার ওয়াটসন বলেন, কিছুকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এত ছেলে পাস্ করচে যে, সেটা ক্রমে একটা বিভীষিকা হয়ে উঠল।

ইংরেজপক্ষ আমাদের এই বলে দোষ দিচ্ছেন যে, এই নিয়ে তোমরা যে খুসী হোচ্ছ সেটা বিদ্যার দিকে তাকিয়ে নয়, ব্যবসার দিকে তাকিয়ে। ছেলে যে সত্যই কিছু শিখবে সেটা তোমাদের কাছে গৌণ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানা-ঘরের ছাপ নিয়ে চাকরির বাজারে সে কোনোমতে বিকিয়ে যাবে এইটেই তোমাদের কাছে মুখ্য। চাকরির লোভে পড়ে তোমরা দেশে শিক্ষার স্ট্যাণ্ডার্ড খাটো করে দিলে।

এখানে মুস্কিল হচ্চে এই যে, ইংরেজপক্ষ তাঁদের য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে আমাদের য়ুনিভার্সিটির তুলনা করে থাকেন।

সেটা অন্যায়। তার কারণ, তাঁদের দেশে শিক্ষা সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত। শিক্ষার যে অংশটা সবচেয়ে কম, মানুষের যেটুকু না হলে নয় সেটুকুর ব্যবস্থা দেশের মেয়েপুরুষ সকলের জন্যেই আছে।

অতএব নীচের দিকে যখন মোটা প্রয়োজনটা মেটানো হয়েচে উপরের দিকে তখন আদর্শের সূক্ষ্মতার দিকে মন দেওয়া যেতে পারে।

আমাদের দেশে আশু দরকার হয়েচে শিক্ষাটাকে যতটা পারা যায় ছড়িয়ে দেওয়া,—ইংরেজের সে দরকার মোটেই নেই। এমন স্থলে ভরাপেটের বিচার খালি-পেটের বিচারের সঙ্গে মোটেই মেলে না।

মোটা প্রয়োজনটাই যখন প্রবল, আদর্শটা তখন খাটো না হয়ে উপায় নেই। একথা মানতে রাজি আছি য়ুরোপীয় য়ুনিভার্সিটির গ্রাজুয়েট-দের সঙ্গে এখানকার য়ুনিভার্সিটির গ্রাজুয়েটের সমান ওজন নয়। তার কারণ আমাদের দেশের য়ুনিভার্সিটিকে একটা মাঝারি চালে চলতে হয়। খুব উঁচু চালও নয়, নেহাৎ নীচু চালও নয়। একই সঙ্গে শিক্ষাকে যথাসম্ভব উপরে টেনে রেখে যথাসম্ভব চারদিকে ছড়িয়ে দেবার ভার তাকে নিতে হয়েচে।

দেশের অবস্থা ও প্রয়োজন থেকে স্বতন্ত্র য়ুনিভার্সিটি বলে কোনো একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ নেই। আমাদের য়ুনিভার্সিটি আমাদের বিশেষ দায় অনুসারে স্বভাবতই একটা বিশেষ চাল অবলম্বন করেচে। যাদের সে দায় নেই তারা সে চালকে নিন্দে করতে পারে। কি করা যায়! নিন্দে মাথায় করে নিতে হবে কিন্তু চাল বদলানো শক্ত।

যদি কেবলমাত্র ইংরেজের হাতে য়ুনিভার্সিটির ভার থাকত তা হলে তাঁরা উচ্চ-শিক্ষাকে খুবই উচ্চ করে তোলবার জন্যে মজুর লাগিয়ে দিতেন—ভুলে যেতেন, উপর এবং নীচের মাঝখানে মইটা নেই। অতি সূক্ষ্ম এবং সংকীর্ণ একটা উচ্চ-শিক্ষা উচ্চে বসে চোখবুজে হাওয়া খেত, নীচের সঙ্গে তার কোনো কারবার থাকত না। কিন্তু আমরা, যারা আমাদের দেশের প্রয়োজন বুঝি—ইচ্ছা করচি বাঙলা দেশের পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে মোটামুটি পাস করা ছেলে অজস্র ছড়িয়ে যাক্। কেরানিগিরি করবার জন্যে নয়—বিশ্বের সঙ্গে দেশের একটা সাধারণ যোগের রাস্তা খুলে দেবার জন্যে—যে রাস্তা দিয়ে ক্রমে ক্রমে আমাদের ঘরে ঘরে একদিন সর্বজগতের পণ্য কিছু কিছু এসে পৌঁছতে পারবে; শিক্ষার প্রাণস্রোত আমাদের সমস্ত দেশের নাড়ির মধ্যে সঞ্চার করে দেবার জন্যে, যাতে করে কেবল দু'দশজন লোকের নয়, সমস্ত দেশের চিত্ত জাগরূক হয়ে ওঠে।"

॥ ৭ ॥ দ্রষ্টব্য, এই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে আলোচনা, "শিক্ষাবিস্তার," ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সবুজ পত্র পৌষ ১৩২২; "শিক্ষার নব আদর্শ;" বীরবল, সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২২; "ছাত্রের পত্র," শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায়, সবুজপত্র চৈত্র ১৩২২।

॥ ৮ ॥ "প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রদের সহিত কোনো কোনো য়ুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা লইয়া......।"

জাপান-যাত্রী; বর্তমানে, জাপানে-পারস্যে

চৈত্র

ভাষার কথা

বাংলা শব্দতত্ত্ব, ভূমিকা

চতুর্থ বর্ষ॥ ১৩২৪ বৈশাখ-চৈত্র

বৈশাখ

জাপানের কথা

জাপান-যাত্রী; বর্তমানে, জাপানে-পারস্যে

জ্যৈষ্ঠ

পরমায়ু

পলাতকা, "শেষ গান"; পূরবী, "পূরবী" ॥ ৯ ॥

তপস্বিনী

পয়লা নম্বর; পরে গল্পগুচ্ছ ৩, বিশ্বভারতী

আষাঢ়

পয়লা নম্বর

পয়লা নম্বর; পরে গল্পগুচ্ছ ৩, বিশ্বভারতী,

শ্রাবণ

দুখানি চিঠি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে লিখিত। চিঠিপত্র ৫ (যন্ত্রস্থ), ১ ও ৪ সংখ্যক চিঠি।

ভাদ্র

সংগীতের মুক্তি

ছন্দ, প্রথম সংস্করণ

আশ্বিন-কার্তিক

আমার ধর্ম

আত্মপরিচয়

পৌষ

পাত্র ও পাত্রী

গল্পগুচ্ছ ৩, বিশ্বভারতী

মাঘ

তোতাকাহিনী

পয়লা নম্বর; পরে লিপিকা

চৈত্র

ছন্দ

ছন্দ, প্রথম সংস্করণ "ছন্দের অর্থ"

পঞ্চম বর্ষ॥ ১৩২৫ বৈশাখ-চৈত্র

বৈশাখ

মুক্তি

পলাতকা

জ্যৈষ্ঠ

রবীন্দ্রনাথের পত্র

শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে লিখিত। চিঠিপত্র ৫ (যন্ত্রস্থ) ৬ সংখ্যক চিঠি

ছিন্ন পত্র

পলাতকা

আষাঢ়

কালো মেয়ে

পলাতকা

॥ ৯ ॥ সবুজ পত্র, পলাতকা ও পূরবী—কবিতাটি পাঠে অনেক প্রভেদ আছে।

ফাল্গুন

স্বর্গ-মর্ত্য

লিপিকা

ষষ্ঠ বর্ষ॥ ১৩২৬ বৈশাখ-চৈত্র

বৈশাখ

গান

"আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায়।" ২৪ বৈশাখ, ১৩২৬

রবীন্দ্রনাথের পত্র

"আমার শারীরিক অবসাদ এত বেশি হয়েছে।" ১৭ বৈশাখ, ১৩২৬

শ্রীপ্রমথ চৌধুরীকে লিখিত। চিঠিপত্র ৫ (যন্ত্রস্থ)

মুক্তির ইতিহাস

লিপিকা, "ঘোড়া"

আষাঢ়

কথিকা

লিপিকা, "প্রথম শোক"

শ্রাবণ

কথিকা

লিপিকা, "অস্পষ্ট"। পরিবর্তিত

ভাদ্র

কথিকা

লিপিকা, "বাণী"

কার্তিক

বাঁশি

লিপিকা

অগ্রহায়ণ

কথিকা

লিপিকা, "গলি"

ফাল্গুন

আমার কথা

লিপিকা, "প্রাণমন"। পরিবর্ধিত

অষ্টম বর্ষ॥ শ্রাবণ ১৩২৮—আষাঢ়, ১৩২৯ *

ভাদ্র

আমাদের সংগীত

"সংগীত সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসবে উক্ত।" অপ্রকাশিত

শিক্ষার মিলন

শিক্ষা ১৩৪২ সং; ১৩৫২ সং, প্রথম খণ্ড

অভিভাষণ

১৯ ভাদ্র, ১৩২৮ তারিখে "সুদীর্ঘ প্রবাস হইতে বিদেশের শ্রদ্ধাঞ্জলি বহন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন" উপলক্ষে ॥১১॥ বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সম্বর্ধনার উত্তরে। অপ্রকাশিত।

* সবুজ পত্রের সপ্তম বর্ষে রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা প্রকাশিত হয় নাই।

॥ ১১ ॥ এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "আশীর্বচন" ও হীরেন্দ্রনাথ দত্তের "অভিনন্দন" ঐ সংখ্যায় মুদ্রিত আছে। (সংবর্ধনা সভার সভাপতি?) জগদিন্দ্রনাথ রায়ের ভাষণ "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা" নামে ১৩২৮ আশ্বিন মানসী ও মর্মবাণী পত্রে মুদ্রিত আছে।

পট

লিপিকা

আশ্বিন

ভারতের শিক্ষার আদর্শ

The Centre of Indian Culture প্রবন্ধের শ্রীঅমূল্যরতন প্রামাণিক কৃত অনুবাদ। অপ্রকাশিত ॥ ১১ক॥

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ

ভারতের শিক্ষার আদর্শ

পূর্বানুবৃত্তি

পৌষ

ভারতের শিক্ষার আদর্শ

পূর্বানুবৃত্তি

মাঘ ও ফাল্গুন

ভারতের শিক্ষার আদর্শ

পূর্বানুবৃত্তি

সিন্ধি

লিপিকা

চৈত্র ও বৈশাখ

জাপানের জাতীয়তা

Nationalism in Japan প্রবন্ধের শ্রীঅমূল্যরতন প্রামাণিক কৃত অনুবাদ। অপ্রকাশিত।

পঁচিশে বৈশাখ

পূরবী

নবম বর্ষ॥ ভাদ্র ১৩৩২—শ্রাবণ ১৩৩৩

ভাদ্র

চরকা ॥ ১২ ॥

অপ্রকাশিত। প্রবন্ধ

অতীত

পূরবী, "অতীত কাল"

প্রভাতী

পূরবী

একদা

পূরবী "মিলন"

আশ্বিন

স্বরাজ সাধন

অপ্রকাশিত। প্রবন্ধ

কার্তিক

শেষ বর্ষণ

ঋতু-উৎসব।

পৌষ

নাতনীর উদ্দেশে

অপ্রকাশিত। কবিতা

॥ ১১ক॥ অন্য একটি অনুবাদ 'শিক্ষা' ১৩৪২ সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৩৫ সংস্করণে বর্জিত।

॥ ১২ ॥ দ্রষ্টব্য, আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীযতীন্দ্রনা সেনগুপ্ত লিখিত সমালোচনা "পাঠকের কথা' তদুত্তরে ঐ সংখ্যায় "সম্পাদকের কথা" অগ্রহায়ণে শ্রীপ্রসন্নকুমার সমাদ্দার লিখি "পাঠকের কথার জের।"

গান

"সকাল বেলার কুঁড়ি আমার"

মাঘ

পত্র ॥ ১৩ ॥

অপ্রকাশিত। "তোমার চিঠিখানি পেয়ে বড় খুসি হলুম। সুভাষের চিঠি বড় সুন্দর"......

চৈত্র

গান (১—২)

"দোলে প্রেমের দোলনচাঁপা"; "ফাগুনের নবীন আনন্দে"। ১৫ ফাল্গুন, ১৩৩২

দীপালি সংঘ ॥ ১৪ ॥

অপ্রকাশিত। প্রবন্ধ

॥ ১৩ ॥ শ্রীদিলীপকুমার রায়ের পত্রের উত্তরে লিখিত সুভাষচন্দ্র বসুর চিঠি পড়িয়া দিলীপকুমারকে লিখিত।

॥ ১৪ ॥ ১৯২৬ সালে পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় ঢাকার দীপালি সংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় কথিত।

আষাঢ়

রায়তের কথা ॥ ১৫ ॥

অপ্রকাশিত

১০ম বর্ষ ॥ আশ্বিন ১৩৩৩—ভাদ্র ১৩৩৪

আশ্বিন

রবীন্দ্রনাথের পত্র

২০শে জুলাই, ১৯২৬। অপ্রকাশিত

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ

গীত-পঞ্চক

"সকালবেলার আলোয় বাজে," নুরেমবর্গ, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬; "ভালো লাগার (পরিবর্তিত, "মধুর তোমার") শেষ যে না পাই" স্টুটগার্ট ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬, "চাহিয়া দেখো রসের স্রোতে স্রোতে," কলোন, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬; "আপন গানের টানে তোমার বন্ধন যাক্ টুটে," ড্যুসেলডর্ফ, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৬; "আপনি আমার কোন্‌খানে," বার্লিন ৬ অক্টোবর, ১৯২৬

॥ ১৫ ॥ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী লিখিত রায়তের কথা সম্বন্ধে পত্রচ্ছলে আলোচনা; ঐ গ্রন্থের ভূমিকারূপে ব্যবহৃত।

বৈশাখ

শেষ মধু

মহুয়া

[অপ্রকাশিত = রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থে অপ্রকাশিত। গানগুলি সবই রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় গানের একত্র সংগ্রহ গীতাবিতানে প্রকাশিত হইয়াছে বা বর্তমানে যন্ত্রস্থ তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হইবে; সেগুলির প্রকাশ বিষয়ে কোনো স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হয় নাই। অন্য রচনাগুলি কোন্ কোন্ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা রচনার নামের পরে উল্লিখিত হইয়াছে; গ্রন্থে রচনার নাম দেওয়া থাকিলে, উহা গ্রন্থের কতসংখ্যক রচনা, তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে।

পত্রিকায় যে সকল সংখ্যার উল্লেখ নাই, সেগুলিতে রবীন্দ্রনাথের কোনো রচনা প্রকাশিত হয় নাই।]

ব্যবসা বাণিজ্য

স্বর্ণের বর্তমান মূল্য

শ্রীঅনিলকুমার বসু

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগিবার পর হইতেই সোনার মূল্য ধীরে ধীরে বাড়িতে আরম্ভ করে। যুদ্ধের গতির সাথে সাথে এই মূল্য দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্বে যেখানে সোনার ভরি ২২৷৷৩, টাকাতে বিকাইত, সেই মূল্যই অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়া ১০৭৷১০৮ পর্যন্ত উঠে। তারপর আস্তে আস্তে ঐ মূল্য পড়িতে আরম্ভ করে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে যখন সাধারণ মূল্য রেখা বাড়িয়া গিয়াছে, সেই কারণে সোনার মূল্যও চড়িয়া যাওয়া স্বাভাবিক। এই মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ করিবার জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। গত এক বৎসর ধরিয়া তাহারা মূল্যের উচ্চগতি রোধ করিতে অনেকটা সক্ষমও হইয়াছেন। এইখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই মুদ্রাস্ফীতি নিরোধক উপায়গুলির মধ্যে স্বর্ণ বিক্রয় অন্যতম। বাজারে টাকার পরিমাণ ও চলতি বাড়িয়া গেলেই বাজার দরও সেইভাবে বাড়িতে থাকে। কাজেই টাকার পরিমাণ কমাইতে হইলে, উহা বাজার হইতে গুটাইয়া আনিতে হইবে। এতদ্দ্বারা টাকার পরিমাণ হ্রাস পাইলেই বাজার দরও সেই অনুপাতে নিম্নগামী হইবে। ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া লোকের হস্তস্থিত টাকা বাজার হইতে কুড়াইয়া লইয়া মূল্য বৃদ্ধি অনেকটা রোধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এইভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মারফৎ মাঝে মাঝে সুযোগ বুঝিয়া প্রচুর স্বর্ণ বিক্রয় করা হইয়াছে। কিন্তু মজা হইল এই যে, যে অস্ত্র দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি জনিত মূল্য বৃদ্ধি নিবারণ করিবার চেষ্টা করা গিয়াছিল, সেই অস্ত্রকেই আয়ত্তের মধ্যে রাখা সম্ভব হইল না। অর্থাৎ যে স্বর্ণ বিক্রয় দ্বারা বাজার দর নামাইবার উপায় অবলম্বিত হইল, সেই স্বর্ণের মূল্যই দিন দিন চড়িতে আরম্ভ করিল। কাজেই ভারত সরকার স্বর্ণমূল্যের বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিলেন। তাহাতে এরূপ বিধি-ব্যবস্থা হইল যে, স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রভৃতি ধাতব পদার্থে কোন ফটকা (speculation) খেলা হইবে না। ফটকা খেলিলেই উহা উক্ত জরুরী বিধি অনুসারে দোষ বলিয়া সাব্যস্ত হইবে এবং আইন অনুসারে শাস্তি বিধান হইবে। কিন্তু এই ব্যাপারে ফটকা খেলিতে হইলেই অর্থের প্রাচুর্য থাকা প্রয়োজন। এই অর্থ সংগতি অর্জন করিতে হইলেই সাধারণত ব্যাঙ্কের সাথে উক্ত ধাতব পদার্থের জামিনে টাকা ধারের একটা বন্দোবস্ত করিতে হয়। যাহাতে ব্যাঙ্ক হইতে এরূপ কোন অবাধ টাকা ধার না দেওয়া হয়, এইজন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমস্ত ব্যাঙ্কগুলিকে অনুরোধ সূচক এরূপ নির্দেশ দেন যে, সোনা রূপা জামিনে টাকা ধার দেওয়ার পূর্বে তাহারা যেন এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হন যে, উক্ত লগ্নী দ্বারা যেন সোনা-রূপার বাজারে ফটকার সৃষ্টি না হয় বা এমন কোন লোককে ধার না দেওয়া হয় যাহারা এই সকল ধাতু লইয়া জুয়া খেলিয়া বিপদের সৃষ্টি করিতে পারেন। এই নির্দেশ পাওয়ার পর হইতে ব্যাঙ্কগুলিকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে সত্য, কিন্তু উক্ত নির্দেশগুলি বর্ণে বর্ণে পালন করা সম্ভবপর নয়। মুদ্রাস্ফীতি নিরোধক বিধি-ব্যবস্থাগুলি বলবৎ থাকায় বাজার দর অনেকটা আয়ত্তাধীন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণের মূল্যও কমিতে থাকে। কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও ঐ সকল ধাতুর বাজারে ফটকা পূর্ণভাবে চলিতে থাকে। এবং সোনার দাম ৮০, টাকার মধ্যে উঠানামা করে।

সোনার দরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কথা চিন্তা করিলে ইহাই মনে হয় যে, ফটকা ব্যতিরেকেও সোনার চাহিদা অত্যন্ত বেশী থাকাতেই উক্ত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল। প্রথমত চীনদেশে প্রচুর স্বর্ণ ভারত হইতে রপ্তানি হয়। কারণ চীনদেশে মুদ্রাস্ফীতি এত অধিক হইয়াছে যে, উহা নিবারণ করিতে চীনের মুদ্রার পিছনে স্বর্ণের ভর শক্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। কাজেই চীন দেশের অত্যধিক চাহিদা থাকাতে ভারত হইতে অনেক সোনা সেই দেশে

প্রেরিত হইয়াছিল। কত পরিমাণ সোনা যে এইভাবে চীনে রপ্তানি হইয়াছিল তাহার কোন হিসাব জনসাধারণের সম্মুখে উত্থাপিত হয় নাই। কাজেই এই বিষয়ে আমাদের কোন সঠিক জ্ঞান না থাকাতে মন্তব্য করা সম্ভব হইল না। তথাপি ইহা অতি সত্য কথা যে, চীনে প্রচুর সোনা রপ্তানি করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, দেশীয় রাজ্যগুলি যুদ্ধকালে অনেক সোনা ক্রয় করিয়াছে। এই সকল রাজ্যগুলি হইতে অনবরত সোনার চাহিদা থাকাতে উহার মূল্যও অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাজেই সোনার আভ্যন্তরিক চাহিদা অনেক বেশী থাকাতে উহার মূল্য চড়তির দিকেই বরাবর আছে। ইহা ছাড়া ফটকা খেলোয়াড়দের চাহিদার কথাতো ছাড়িয়াই দিলাম। তৃতীয়ত, কাগজে কলমে ধরা না গেলেও ইহা স্বীকার্য যে চোরাবাজারের কামান পয়সা সরকারের ধূম্রলোচন হইতে বাঁচাইবার নিমিত্ত অনেকে সোনাতে রূপান্তরিত করিয়াছে। কত পরিমাণ অর্থ যে, এইভাবে সোনাতে রূপান্তরিত হইয়াছে তাহার রহস্যময় বিবরণ উদ্ঘাটন করা স্বয়ং চিত্র গুপ্তেরও ক্ষমতা নাই। মোট কথা, যে কোন কারণেই হউক, সোনার চাহিদা ভিতরে ভিতরে উত্তরোত্তর বাড়িতেই ছিল। কিন্তু যুদ্ধের আকস্মিক নাটকীয় পরিসমাপ্তিতে উক্ত বৃদ্ধি অনেকটা শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। ১৪ই আগস্ট জাপানের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের সংবাদ পেঁছা মাত্রই সোনার দর সেইদিন ৭৪৲ টাকা হইতে ৭০৲ টাকাতে নামিয়া যায়। ১৫ই আগস্ট সকালে সেই সংবাদ সরকারী-ভাবে ঘোষিত হইলে সোনার দাম ৬৭৲ টাকাতে আসিয়া ঠেকে। কিন্তু ইহার এক সপ্তাহ পূর্বে সোনার দর ৭৮৲ টাকা ছিল। তারপর হইতেই ঐ দর কমিতে কমিতে ৬৩৲ টাকা পর্যন্ত আসিয়া নামে। যুদ্ধ-বিরতিই যে এরূপ দর পড়ার কারণ তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যেই যুদ্ধ থামিয়া গেল, সকলেরই মনে হইল এখন মুদ্রা সংকুচিত হইতে থাকিবে, নিয়ন্ত্রণ বিধি-গুলি প্রত্যাহৃত হইবে, ব্যবসায়-বাণিজ্য অবাধভাবে চলিতে থাকিবে, জিনিসপত্রের দামও কমিয়া যাইবে। এইভাবের প্রতিক্রিয়া সোনার দামকেও প্রভাবিত করিল। কাজেই আমরা দেখিলাম দুই সপ্তাহের মধ্যে সোনার দাম প্রায় ১৩৲ টাকা কমিয়া গেল। এইখানে রিজার্ভ ব্যাংক ফটকা নিবারণের জন্য যে বাধ্যতা-মূলক নির্দেশ দিয়াছিল তাহার আলোচনা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ঐরূপ নির্দেশ যে সোনার মূল্য হ্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতঃপর রিজার্ভ ব্যাংক এপ্রিল মাসে বোম্বাই শহরে সোনার ফটকা খেলা বন্ধ করিয়া দিবার মানসেই আলোচ্য বিধিগুলি প্রয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু শেষে দেখা গেল যে, বোম্বাইতেই কেবল স্বর্ণ-মৃগ হইতে লোককে নিবৃত্ত করিলে চলিবে না, কারণ বোম্বাইর বাহিরে ভারতের অন্যান্য স্থানেও অনুরূপ বিধি প্রয়োগ না করিলে স্বর্ণ মৃগের মরীচিকা হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। বোম্বাইর বাহিরেও এমন সব বোম্বেটে আছেন, যাহারা স্বর্ণ মৃগের দ্বারা সরল বুদ্ধি অনেক রামকে প্রলুব্ধ করিতে পারেন। কাজেই সুবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া...রিজার্ভ ব্যাংক সম্প্রতি ঐ সকল নির্দেশগুলি ভারতের সর্বত্র সকল ব্যাংকগুলির নিকটই প্রেরণ করিলেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যাংক কোন ব্যক্তিকে ১০ লক্ষ টাকার বেশী সোনা-রূপার জামীনে ধার দিতে পারিবে না। এতদ্ব্যতীত সোনারূপার জামীনে বাজার দরের কত ভাগ কত টাকা পর্যন্ত ধার দিতে পারিবে তাহারও একটি বিধি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ টাকা সোনার জামীনে ধার দিতে হইলে, সোনার বাজার দরের শতকরা ৮০ ভাগের বেশী টাকা দেওয়া যাইবে না। ১ লক্ষ টাকার উপরে ২½ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শতকরা ৭০ ভাগ ও ২½ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত শতকরা ৬০ ভাগ এবং ৫ লক্ষের ঊর্ধ্বে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সোনার বাজার দরের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী ধার দেওয়া কোনমতেই চলিবে না। এতদ্ব্যতীত প্রতি দিনে যে সকল ব্যক্তির নামে স্বর্ণের জামীনে ২৫০০০৲ টাকা ধার নেওয়া আছে, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ সহ একটি বিবৃতি রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে পাঠাইতে হইবে। ইহা ছাড়া সোনার বদলা কারবার অর্থাৎ অগ্রিম বিক্রি সর্তে সোনা কেনা উক্ত বিধি অনুসারে একেবারে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এই নির্দেশ পাওয়ার পর প্রত্যেক ব্যাংককেই উক্ত সর্ত প্রতিপালনের জন্য স্ব স্ব দেনাদারকে ঐ মর্মে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যেখানে উক্ত বিধি অনুমোদিত নির্দেশের অতিরিক্ত ধার দেওয়া হইয়াছে, সেখানে প্রত্যেককে টাকা জমা দিয়া লগ্নীকৃত অর্থ পরিশোধ করিতে বলা হইয়াছে। কাজেই হিসাব নিকাশ সাপেক্ষে ও টাকা পরিশোধ করিবার তাগিদে সোনার বাজারে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহাতেই সোনার দর আরও পড়িয়া যায়। কিন্তু হিসাব নিকাশ শেষ হইয়া গেলে আবার সোনার দাম আস্তে আস্তে চড়িতে আরম্ভ করে। এবং বর্তমানে ৭৬৲ টাকা পর্যন্ত উঠিয়া আসে। এই মূল্য বৃদ্ধির পশ্চাতেও লোকের Psychology অনেকখানি কার্য করিয়াছে। যুদ্ধাবসানে প্রথম ধাক্কাটা সামলাইয়া উঠিতেই ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণ নীতি অপরিবর্তিত রাখার ইচ্ছা ঘোষিত হইল। জনসাধারণ বুঝিতে পারিল ব্যবসায় বাণিজ্য স্বাভাবিক সহজ ও অবাধ অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে আরও কিছুকাল বিলম্ব আছে। ইতিমধ্যে সোনার কারবার তেজীদলের (Bull) হাতেই অধিকাংশ আসিয়া পড়িল। ব্যবসায় বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ নীতি সম্ভূত মনোভাবের সহিত তেজীদলের (Bull) বাজার উঠাইবার অমিত চেষ্টা যোগ হইয়া সোনার দরকে আবার একটু চাঙ্গা করিয়া তোলা হইল। এই অবস্থা অব্যাহতভাবে এখন পর্যন্ত চলিতেছে। তেজী কারবারীর দল (Bull) নিজেদের লোকসানের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া শেষ পর্যন্ত কিঞ্চিৎ সাফল্যও অর্জন করিয়াছে। কারণ সোনার বাজার অল্প সময়ের মধ্যে ১০৲ টাকা বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই কিছুকালের জন্য (short period) সোনার দর একটু একটু করিয়া চড়িতে থাকিবে বলিয়া অনুমান করা যায়। এই বৃদ্ধির সাথে সাথে কিন্তু প্রত্যেকের সোনা বিক্রয় করিবার মনোবৃত্তিও দেখা দিয়াছে। কারণ সকলেই মনে প্রাণে অনুভব করেন যে, যুদ্ধান্তে স্বাভাবিক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইলে বর্তমান অস্বাভাবিক স্বর্ণমূল্য কিছুতেই স্থায়ী থাকিতে পারে না। কাজেই যে যার মজুত সোনা সুবিধা মত ইতিমধ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিবে। যদিও স্বর্ণের ভবিষ্যৎ মূল্য আন্তর্জাতিক চাহিদা ও জোগানের উপর অনেকখানি নির্ভর করিবে এবং উহার বাড়াকমা আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় নিরূপিত হইবে, তথাপি ইহা স্বীকার্য যে, উপস্থিত চড়া স্বর্ণ মূল্য চির-প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। স্বর্ণের দর একটু পড়িলে এমন অনেক লোক আছেন, যাহারা চড়া দরের জন্য এত-কাল স্বর্ণ ক্রয় করিতে পারে নাই—তাহারা হয়ত কিছু কিছু স্বর্ণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইবে। ইহা ছাড়া শীঘ্র বিদেশ হইতে ভারতে স্বর্ণ আমদানী হইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। কাজেই অন্তর্নিহিত চাহিদা (Pent up demand) হেতু স্বর্ণের দর অনেকখানি পড়িবার কারণও নাই। তবে পূর্বেকার ২২৲।২৩৲ টাকা মূল্যে ফিরিয়া আসিবার পথ একেবারে রুদ্ধ। সব দিক বিবেচনা করিয়া ইহাই অনুমান হয় যে, বর্তমান সোনার বাজার তেজী কারবারীর (Bull) হাত হইতে মুক্ত হইলেই যুদ্ধ বিরতি হেতু ও মুদ্রাস্ফীতি নিরোধক নীতিগুলি বলবৎ থাকায়, উহার মূল্য পড়িবার সম্ভাবনা আছে এবং শেষ পর্যন্ত ৫০৲।৫৫৲ টাকা পর্যন্ত নামিবার কারণ দেখা যায়।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

অন্ন ও বস্ত্র—বাঙলার কোন সমস্যাই বাঙলা সরকার সমাধান করিতে পারিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেন বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি। তিনি এক বিবৃতিতে বাঙলা সরকারকে সব আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে বলিয়াছেন—যেন ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষ আবার দেখা না যায়। সরকার যদি তাহা না করেন, তবে যখন লোককে সাহায্য প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন হইবে, তখন ব্যবস্থার অভাবে সরকারকে বিব্রত হইতে হইবে। অবস্থা যেরূপ, তাহাতে নিশ্চিন্ত হওয়া ত পরের কথা—আশঙ্কার কারণই অধিক; এমন কি, দুর্দিনের ভয় স্বতঃই হইতেছে। পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে বৃষ্টির অভাবে এবং পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে বন্যায় আশু ও আমন উভয়বিধ ধান্যের ফলনের অবস্থা শোচনীয়। সরকার বলিয়াছেন, আশু ধান্যের ফলন শতকরা ৭৫ ও আমনের শতকরা ৮০ ভাগ হইবে; কিন্তু ব্যবসায়ীদিগের হিসাব—৩ ভাগের ২ ভাগের অধিক শস্য পাওয়া যাইবে না। বাঙলায় লোকের জন্য বৎসরে ৮০ লক্ষ টন চাউল প্রয়োজন—এবার সেস্থলে ৫৫ হইতে ৬০ লক্ষ টনের অধিক পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই অবস্থায় বাঙলা হইতে সরকার চাউল রপ্তানি করিতেছেন। ইহা সমর্থন-যোগ্য নহে।

সেন মহাশয় বলেন—অভাব হইবে না এই মত পোষণ করিয়া বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি করিবার পূর্বে বাঙলায় চাউলের মূল্য হ্রাস করা কর্তব্য ছিল। কারণ, এখনও বাঙলায় চাউলের মূল্য যেরূপ তাহাতে সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা ক্রয় করা দুঃসাধ্য।

আমরা এই কথা একাধিকবার বলিয়াছি। চেম্বার অব কমার্স ব্যবসায়ীদিগের প্রতিষ্ঠান। তাহার সভাপতি যে উক্তির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ভিত্তি নিশ্চয়ই ব্যবসায়ীদিগের প্রদত্ত সংবাদ। গত শত বৎসরে যে কখন চাউলের মূল্য ষোল টাকা মণ হয় নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কয় বৎসরে সমগ্র ভারতে খাদ্যশস্যের যে দাম ছিল, তাহার হিসাব সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায়, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্বে বাঙলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চাউলের দর ছিল—

জানুয়ারী মাসের শেষার্ধে—

বর্ধমানে	টাকায় ১৪ সের
মেদিনীপুরে	,, ১৮ সের
কলিকাতায়	,, ১২॥ সের
মুর্শিদাবাদে	ঐ
দিনাজপুরে	টাকায় তের সেরের কিছু অধিক
ঢাকায়	,, ১৬ সের
বাকরগঞ্জে	১৫॥ সের
চট্টগ্রামে	,, ১৮ সের

জাপানের সহিত ইংরেজের যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্বে বাঙলায় চাউলের দাম মোটামুটি ৫ হইতে ৬ টাকা মণ হইয়াছিল এবং তাহাতে যে লোকের পক্ষে চাউল ক্রয় করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল, তাহা তৎকালে বাঙলা সরকারই স্বীকার করিয়াছিলেন। তাহার পরে বাঙলার উপর দিয়া দুর্ভিক্ষ গিয়াছে—লোক সর্বস্বান্ত হইয়াছে। অথচ চাউলের মূল্য—ফসলের অধিক ফলনের পরেও—শতকরা ১৬ টাকা ৪ আনা রাখিতে দ্বিধানুভব করেন না। আমরা অনায়াসে বলিতে পারি, সরকার যদি ব্যবসা না করিয়া ব্যবসার সাধারণ ও স্বাভাবিক পথ মুক্ত করিয়া দিতেন, তবে চাউলের মূল্য অনেক হ্রাস পাইত। সঙ্গে সঙ্গে আমরা একথাও বলিব যে, সরকার চাউলের যে মূল্য নির্ধারিত করিয়াছেন, তাহার ফলে বহু লোক অপূর্ণাহারে দুর্বল হইয়া তিলে তিলে মৃত্যুপথযাত্রী হইতেছে।

লর্ড ওয়েভেলও স্বীকার করিয়াছেন, এদেশের লোক সাধারণত যে আহার্য সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার আর পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব নহে। কিন্তু সরকারের মূল্য-নির্ধারণের ফলে লোককে তাহাই করিতে হইতেছে। বিলাতে সরকার এরূপ ব্যবস্থা করা সমীচীন বলিয়া বিবেচনা করেন নাই।

বাঙলার গভর্নর একদিকে বলিয়াছেন—সরবরাহ (বহু অর্থব্যয়ে) যে সকল গোলা নির্মাণ করাইয়াছেন, সে সকলে শস্য কখন বিকৃত হইবে না; আর একদিকে বলিয়াছেন—বর্ষাকালে বাঙলায় খাদ্যশস্যের বিকৃতি নিবারণ করা যায় না। তাহার শেষোক্ত উক্তিই যদি গ্রহণ করিতে হয়, তবে সরকারী গোলা নির্মাণে দরিদ্র প্রজার বহু অর্থব্যয় কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে?

বাঙলায় একদিকে চাউল সঞ্চিত, আর একদিকে বিকৃত হইয়াছে—এখনও যে তাহা হইতেছে না, এমন বলিতে পারি না।

দারুণ দুর্ভিক্ষের পরে লোক যে ফসলের ফলন বিস্ময়কররূপে অধিক হইলেও উদর-পূর্তি করিতে পারিল না—প্রকৃতির দয়াও যে তাহারা সম্ভোগ করিতে পাইল না—এজন্য দায়ী কে?

আমরা শ্রীযুত ইন্দুভূষণ সেনের বিবৃতির উল্লেখ প্রবন্ধের প্রথমে করিয়াছি।

ডক্টর ইন্দ্রনারায়ণ সেন লিখিয়াছেন—যে ব্যবস্থাদোষে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহা শেষ হয় নাই, পরন্তু এখনও সমভাবে চলিতেছে। এক মাস পূর্বে দিল্লী হইতে ঘোষণা করা হইয়াছিল, বাঙলায় বাঙলার লোকের প্রয়োজনাতিরিক্ত চাউল আছে। সংবাদপত্রে সেই ঘোষণার প্রতিবাদ হইয়াছিল। তাহার পরে পূর্ববঙ্গে বন্যায় শস্যহানি হইয়াছে, মধ্য, উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে পর্যাপ্ত বারিবর্ষণ হয় নাই। বিহারে ও উড়িষ্যায়ও সেই অবস্থা।

সরকার বলিয়াছেন, আশু ধান্যের ফলন সাধারণ ফলনের শতকরা ৭৫ ভাগ হইবে; কিন্তু বর্ধমান বিভাগে শতকরা ৭৫ ভাগেরও অধিক ধান্যের চারা অনাবৃষ্টিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সরকারের দায়িত্বশীল কর্মচারীরা যদি বিমানে বাঙলার অবস্থা দেখিতেন, তবে কখনই ঐ কথা বলিতে পারিতেন না।

শ্রীযুত সাতকড়িপতি রায় ২২শে শ্রাবণ হইতে ২৮শে শ্রাবণ পর্যন্ত মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল মহকুমার বহু গ্রাম পরিদর্শন করিয়া আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ—সে অঞ্চলে 'চাষীর অবস্থা উৎকণ্ঠার কারণ হইয়াছে।' কৃষকগণ জমিতে ধান বুনিয়াছিল—কিন্তু বৃষ্টির অভাবে ধানের চারা নষ্ট হইয়াছে। আশু ধান্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ জমিতে হয়—তাহা জলাভাবে আর হইবে না। ঐ অঞ্চলে আরও একপ্রকার ধান্য জন্মে; তাহাকে কাঁটি ধান বলে। উহা রোপণ করিতে হয় এবং ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে পক্ক হয়। ১২ই শ্রাবণ স্থানে স্থানে যে বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার জন্য অনেক স্থানে ঐ ধান্য রোপণ করা হয়; কিন্তু আর বৃষ্টি না হওয়ায় চারা নষ্ট হইয়াছে। মহকুমার মধ্য দিয়া যে ৫টি নদী বা খাল বহিয়া গিয়াছে, সে সকলের জলে যদি যথাকালে সেচের ব্যবস্থা করা হইত, তবে অনেক উপকার হইত। তাহা হয় নাই। 'যদি ভাদ্র মাসে সুবর্ষা হয় এবং ৪টি নদীতে বন্যা আসিয়া আবাদ নষ্ট না করে, তবে মহকুমায় সিকি পরিমাণ ফসল হইতে পারে; নহিলে তাহাও হইবে না।' ইতিমধ্যেই চারিদিকে হাহাকার রব উঠিয়াছে।

সেদিন 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রে দেখা গিয়াছে—চাউল কল সমিতির সম্পাদক জানাইয়াছেন, সরকারী রপ্তানির হিসাবে দেখা যায়, ইতোমধ্যেই মেসার্স শাওয়ালেস কোম্পানী বাঙলা হইতে হাজার হাজার টন চাউল রপ্তানি করিতেছেন।

ইহার প্রতিকার কে করিবে?

বাঁকুড়ার সংবাদ—তথায় কয়খানি গ্রাম হইতে এক হাজার বা বারশত অধিবাসী একযোগে ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে যাইয়া চাউল সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে বলে। তাহারা সমস্ত দিন অনাহারে তথায় থাকিলেও ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে আশু প্রতিকারের কোন আশ্বাস পায় নাই। বরং তিরস্কৃত হইয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট কবুল জবাব দেন, তাহারা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেও তিনি প্রতিকার করিতে পারিবেন না। সহস্র সহস্র লোক আহারের সন্ধানে জিলা হইতে চলিয়া যাইতেছে—জমিতে চাষ হইতেছে না।

অবস্থা যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে ইন্দুভূষণবাবুর উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিতে হয়—সরকারের এখনই সাহায্যদান ব্যবস্থা করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে—পাছে আবার দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষ যে দূর হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না—কারণ, শস্যহানি হেতু খাদ্যশস্যের অভাবে যেমন দুর্ভিক্ষ হয়, দুর্মূল্যতা হেতু লোক যদি খাদ্যশস্য কিনিতে অক্ষম হয়, তখনও তেমনই দুর্ভিক্ষ হয়। কাজেই বলা যায়—দুর্ভিক্ষের অবসান হয় নাই; কেবল তাহার তীব্রতা আর নাই। সেই তীব্রতা যাহাতে পুনরায় দেখা না দেয়, সেই জন্যই সরকারকে সতর্ক করা প্রয়োজন। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের কারণ, ভীতিহেতু বাঙলার তৎকালীন গভর্নরের সচিবদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়াই অপসরণ নীতি প্রবর্তনে উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন। এবার কি বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানির ফলে দারুণ দুর্ভিক্ষ ঘটিতে পারে না?

বাঙলার চাউলে বাঙালীর অধিকার কি অস্বীকৃত হইবে? যদি অস্বীকৃত না হয়, তবে—যখন মজুদ চাউল নষ্ট হইতেছে এই কারণ দেখাইয়া বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি করা হইতেছে, তখনও কেন ব্যবসার স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ রাখিয়া চাউলের মূল্য হ্রাসে বাধা দেওয়া হইতেছে?

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সরকার যে অভাব নাই এই মিথ্যা কথা বলিয়া দেশের লোকের অসীম অপকার করিয়াছিলেন, তাহা উডহেড কমিশনের সদস্যগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এবার যেন আবার সেইরূপে প্রচারকার্য পরিচালিত না হয়। লোক সেই জন্য আতঙ্কিত হইলে তাহা অসঙ্গত বলা যায় না।

বস্ত্র সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধান হয় নাই।

আজ আমরা একই দিনে ২খানি সংবাদ-পত্র হইতে ২টি সংবাদ দিতেছি—

(১) বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেসের সম্পাদক সংবাদ দিতেছেন—যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার ছাত্র কংগ্রেসের সম্পাদক জ্ঞানপ্রকাশ বসু আত্মহত্যা করিয়াছেন। প্রকাশ, জ্ঞানপ্রকাশ ৫জন ছাত্রের সঙ্গে বেসামরিক সরবরাহ কণ্ট্রোলারের নিকট গ্রামের বালকদিগের জন্য বস্ত্র চাহিতে গিয়াছিলেন। রাজকর্মচারীরা তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। ঐ ৬জনকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং স্কুলের কর্তারা ছাত্রসঙ্ঘের আরও কয়জনকে জরিমানা করিয়াছেন।

(২) ২৪পরগণায় সরকারী ব্যবস্থায় লোক যে বস্ত্র পাইবে তাহাতে প্রতিজনের ভাগ্যে সাড়ে সাত ইঞ্চের অধিক কাপড় পড়িবে না। বারসাই গ্রামের ওমর সেখের পত্নী বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। কাঙ্গালী মোল্লার পুত্র এবং আরও দশজন মৃতকে উলঙ্গ অবস্থায় কবর দেওয়া হইয়াছে। অনেক স্থলে স্ত্রীলোকেরা বস্ত্রের অভাবে শতছিদ্র কন্থা জড়াইয়া লজ্জা নিবারণের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইতেছে।

তৈলাভাবে লোক তরকারী রন্ধন করিতে পারিতেছে না—যে তৈল বিক্রীত হইতেছে, তাহাতে লোকের স্বাস্থ্যহানি অনিবার্য।

দুগ্ধ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে সংবাদ প্রচারিত হয়—কলিকাতায় (সমগ্র বঙ্গে নহে) দুগ্ধের অভাব হেতু ভারত সরকারও চিন্তিত। কিন্তু তাঁহাদিগের চিন্তায় শিশুরও দুগ্ধ জুটে না। মিস্টার সিক্কাকে বাঙলা সরকার বোম্বাই শহরে দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা পরিদর্শন জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু 'রাম না হইতেই রামায়ণ রচনা'র মত তিনি যাইবার পূর্বেই ফতোয়া দিয়াছিলেন, কলিকাতায় বোম্বাইয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে! ইহাই কি বিশেষজ্ঞের লক্ষণ?

অভাবের জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হইতেছে কি নিয়ন্ত্রণের ফলে অভাব তীব্র হইতেছে, তাহা স্থির করিবার জন্য কি কমিশন নিয়োগ প্রয়োজন হইবে?

জাপানের যুদ্ধে বাঙলার নদীতে মৎস্যের অভাব হয় নাই। প্রথমে বলা হইয়াছিল, বরফের অভাব ঘটায় কলিকাতায় মৎস্যের আমদানী কম হইয়াছে। কিন্তু পল্লীগ্রামে মৎস্যের অভাবের কারণ কি তাহা যদি গভর্নর মিস্টার কেসি বিবেচনা করিবার চেষ্টা করিতেন, তবে তিনি বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার নিদানে ভুল আছে। তিনি পরে বলেন, বরফের বরাদ্দ বাড়াইলেও কেন যে কলিকাতায় মৎস্যের অভাব হইতেছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি কি জানেন না—দুর্ভিক্ষের তীব্রতা দেখা দিলেই কুমার স্যার জগদীশ প্রসাদ পরিদর্শনকালে লিখিয়াছিলেন, ধীবরগণের জালও আর নাই? অন্নাভাবে কত ধীবর মরিয়াছে, সে সন্ধান কে রাখে?

গ্রামের কর্মকার, সূত্রধর মরিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য কি করা হইতেছে?

ঔষধের ও পথ্যের অভাব এখনও দূর হয় নাই। ঔষধ দুষ্প্রাপ্য—দুর্মূল্য। ইতি-মধ্যেই আবার ম্যালেরিয়া মহামারী হইয়া আবির্ভূত হইতেছে।

সরকারের অনেক কাজে গোড়ায় গলদ থাকে। তাঁহারা কিন্তু লোকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক—আপনাদিগের ভুল স্বীকার করিতে অসম্মত।

গত প্রবল দুর্ভিক্ষের সময় সুরাবর্দি-চক্রবর্তী মার্কা পেটেণ্ট খাদ্য বাজরা খাইয়া কতলোক মরিয়াছে, তাহা কি কেহ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন? বাঙলার এই দুর্ভিক্ষের সময় মিস্টার বেনেডিকস্ ট্রেঞ্চ নামক এক-জন য়ুরোপীয় বিলাতের কোন সাময়িকপত্রে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, ইতপূর্বে একবার দুর্ভিক্ষের পরে একপ্রকার রোগ দেখা গিয়াছিল—তাহাতে রোগীর দেহ কটি হইতে পদ পর্যন্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া যাইত। তিনি দুইশত লোকের বাস এমন একখানি গ্রামেই ঐরূপ পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক ৩৭ জন দেখিয়াছিলেন। সরকার যে খাদ্যশস্য দিয়াছিলেন, তাহাতে খেশারীর দাইল দেওয়ায় উহা হইয়াছিল—খেশারীর দাইল পশুখাদ্য, কিন্তু মানুষ যখন দুগ্ধ পান করিতে পারে না অথচ উহা ব্যবহার করে, তখন উহা ধীরে ধীরে কার্যকর বিষের মত হয়। সরকার তাহা বিবেচনা করেন নাই।

গত তীব্র দুর্ভিক্ষে যাহা হইবার হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরেও লোককে ক্ষয়িতশক্তির পুনরুদ্ধার করিতে সাহায্য করা হয় নাই। চাউলের মূল্য কৃত্রিম উপায়ে অধিক রাখা হইয়াছে।

তাহারই প্রতিবাদ দেশের লোক করিতেছে।

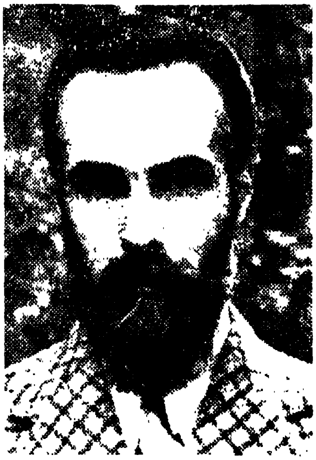
রঙ্গ জগৎ

যুদ্ধের পর ছবির বাজার কি দাঁড়াবে এবং কি অবস্থায় দাঁড় করাতে হবে গত কয়েক বছর ধরে এই চিন্তা এবং ফাঁদ-ফন্দী ঠিক ক'রে ক'রেই চলচ্চিত্রের কর্ণধারেরা এখন যেন একেবারে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন। গোড়াতে যে উৎসাহ ও কর্মসামর্থ্যের পরিচয় তারা দিচ্ছিলেন এখন আসল কাজের সময়ে তা ঝিমিয়েই গেছে বলতে হবে। আগেকার সব জল্পনা-কল্পনা ধামাচাপা দিয়ে এখন নবাগতদের প্রতিযোগিতার সামনে কি করে নিজেদের টিঁকিয়ে রাখা যায় সেই চিন্তাটাই বড় হ'য়ে দেখা দিচ্ছে। এমন যে হবে আমরা তা আগেই বুঝতে পেরেছিলুম, কারণ পুরনো চিত্রব্যবসায়ী যারা রয়েছেন তারা ব্যবসায়ে যতই লাভ করুন কেউই শিল্পপতি হবার যোগ্য নন, শিল্পপ্রসারের পথ কেউই প্রশস্ত করিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখেন না বা কারুর এমন কিছু দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না যা থেকে এটা কোনকালে বিরাট একটা শিল্প হ'য়ে ওঠার যোগ্যতা অর্জন ক'রতে পারে। আসলে একদল স্বার্থান্ধ বেনিয়াবুদ্ধি সম্পন্ন ও একদল বিলাসপ্রিয় লোকের দ্বারাই এ ব্যবসা-চালিত হ'চ্ছে। প্রমোদ-ব্যবসা যে দেশসেবার মতই একটা কাজ, দেশের শিক্ষা-দীক্ষার প্রসারে মস্তবড় সহায়ক হবার যোগ্যতা সম্পন্ন, সে দায়িত্ব বোঝবার মত বোধশক্তি নামমাত্র কজন ছাড়া আর কারুর আছে ব'লে জানা নেই। এই তিরিশ বছর ধ'রে চলচ্চিত্রের প্রতি দেশের লোকের মনে কোন মাহই তারা সৃষ্টি ক'রতে পারলে না তার শিল্পের প্রসার ক'রবে কোত্থেকে! একটা কথা ঠিক যে যুদ্ধের বাজারে ছবির ব্যবসা খুব ফেঁপে ওঠা সত্ত্বেও আমরা যে শিল্পটাকে প্রসারিত করতে পারিনি তার কারণ আমাদের হাত-পা বাঁধা ছিল ব'লে। প্রত্যেকটি জিনিসের জন্যেই আমাদের বিদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হয় তাই যানবাহন নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সংগে সেসব মাল আমদানীও নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে যায় ফলে কোন দিকে এতটুকুও প্রসারলাভ সম্ভব হয়নি; কিন্তু সেই-সব কাঁচামাল এদেশে তৈরির কোন ব্যবস্থা এই পাঁচ বছরের মধ্যে কেন যে হ'তে পারলো না তার কি যুক্তি থাকতে পারে? যুদ্ধের বাজারে যে যা কামিয়েছে তা আজ সেই আগেকার মতই বিদেশে মালের অর্ডার দিতেই ব্যয় ক'রে বসচে সবাই; দেশে কাঁচামাল উৎপাদন বিষয়ে লোকের নজর স্বতঃই দূরে সরে গেছে—অর্থাৎ অবস্থা আজ যুদ্ধপূর্ব দিনের অবস্থার চেয়ে কোন অংশেই ভিন্ন হ'তে পারলো না।



এম পি প্রডাকসন্সের ৭ নম্বর বাড়ি চিত্রে শ্রীমতী সাবিত্রী





দেবিকারাণী ও তাঁর স্বামী স্বাতিলাভ রোয়েরিক্

দুই পুরুষ (নিউ থিয়েটার্স)—কাহিনী: তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়, চিত্রনাট্য: বিনয় চট্টোপাধ্যায়, গান: শৈলেন রায়, পরিচালনা: সুবোধ মিত্র, আলোকচিত্র: ইয়ুসুফ-মুলজী ও সুধীন মজুমদার, শব্দনিয়ন্ত্রণ: লোকেন বসু, সুরযোজনা: পংকজ মল্লিক, ভূমিকায়: ছবি বিশ্বাস, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, শৈলেন চৌধুরী, তুলসী চক্রবর্তী, দেবকুমার, হরিমোহন, চন্দ্রাবতী, সুনন্দা, লতিকা, রেখা, শুক্তিধারা প্রভৃতি। ছবিখানি ৩০শে আগস্ট চিত্রা ও রূপালিতে মুক্তিলাভ করেছে।

বিখ্যাত লেখকের জনপ্রিয় রচনা এবং ততোধিক খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগও যে ছবির উৎকর্ষে কোনই সাহায্য ক'রতে পারে না 'দুইপুরুষ' তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হ'য়ে রইলো। এক বছর মুক্তি পিছিয়ে যাওয়ায় লোকের মনে ছবিখানি সম্পর্কে যে ঐৎসুক্য দেখা গিয়েছিল, সম্প্রতি কোন ছবির জন্যে তা দেখা যায়নি। দীর্ঘ ঐৎসুক্যের উপযুক্ত ফলও পাওয়া গেল! দেখলে মনে হবে না তারাশংকরের এই বইখানাই এত নাম করেছে বা এই নিউথিয়েটার্স'ই হালে 'উদয়ের পথে'র মত ছবি পরিবেশন ক'রেছে। ছবিখানিকে লম্বা করার জন্যে অযৌক্তিক বাজে ঘটনার সমাবেশই ছবিখানিকে নিরস করে তোলার প্রধান কারণ হ'য়েছে। দুই পুরুষের প্রথম পুরুষ হার্ডল মেরে তেমনি দ্বিতীয় পুরুষকে পাকিয়ে দেওয়া হ'য়েছে কিলিয়ে। এ ছাড়া ছবিখানির সব দিকই ভাল—অভিনয়—নাম করাদের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী এবং নবাগত দেবনারায়ণ ছাড়া প্রায় সকলের অভিনয়ই প্রাণবন্ত হ'য়েছে, বিশেষ ক'রে চন্দ্রাবতী, সুনন্দা ও ছবি বিশ্বাস তো নতুন ক'রে খ্যাতিলাভ ক'রবেন; এরাই লোকের মনকে ছবিখানির দিকে টেনে রাখতে সাহায্য ক'রেছেন। গান কখানিও ছবির বড় আকর্ষণ, সুর ও কথা উভয় রচনাই মাতিয়ে তোলার মত। কলাকুশলের দিক সুখ্যাতিই পাবে।

ভর্তৃহরি (নবীন পিকচার্স)—পরিচালক: চতুর্ভুজ দোশী, সুরযোজনা: খেমচাঁদ প্রকাশ। ভূমিকায়: সুরেন্দ্র, অরুণ, মমতাজ, শান্তি প্রভৃতি। ছবিখানি ২৯শে আগস্ট মানসাটার পরিবেশনে জ্যোতিতে মুক্তিলাভ করেছে।

সংসার ত্যাগী রাজা গোপীচাঁদের অলৌকিক জীবন ঘটনা অবলম্বনে

"দেশ"-এর

নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩, ষাণ্মাসিক—৬৷৷

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে

১০০" ও তদূর্ধ্ব ... ৩, প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

৫০"—৯৯" ... ৩৷৷০ " " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিবেন। লেখা পাঠাইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে যদি তাহা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে লেখাটি অমনোনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অমনোনীত লেখা ছয় মাসের পর নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে এক মাসের মধ্যেই নষ্ট করা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ"

১নং বর্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আলোচ্য ছবিখানির কাহিনী গঠিত। ক্ল্যাসিকাল-ঘে'ষা খানকয়েক গান ছাড়া ছবিখানিতে আধুনিক মনের খোরাকের একান্তই অভাব বরং অলৌকিক ব্যাপারসমূহ অত্যন্ত বিসদৃশ লাগে। মমতাজ শান্তিকে এত খারাপ আর কোনও ছবিতে দেখা যায়নি; সুরেন্দ্র গানে এবং অরুণ চীৎকারে আসর মাত ক'রে দেয়।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এ সপ্তাহের প্রধান আকর্ষণ উত্তরা, পূরবী ও পূর্ণতে নিউ সেঞ্চুরী পিকচার্সের 'মানে না মানা' যার পরিচালক জুবিলীকার শৈলজানন্দ এবং দলে তারই সাঙ্গপাঙ্গ। প্যারাডাইসে মুক্তিলাভ করছে ঐ ৭ই সেপ্টেম্বর ফেমাস ফিল্মসের 'ফুল' যার ভূমিকায় পৃথ্বীরাজ, দুর্গা খোটে, সিতারা, মজহর খাঁ, সুরৈয়া, ইয়াকুব, ওয়াস্তি প্রভৃতি ডজনখানেক জনপ্রিয় তারকাকে দিয়ে ছবিখানিকে অবশ্য দ্রষ্টব্য ক'রে তোলা হ'য়েছে। ৮ই তারিখে মিনার্ভা, গণেশ, আলেয়া ও টকী শো-তে জনক পিকচার্সের 'নলদময়ন্তী' মুক্তিলাভ করবে।

বিবিধ

গত সপ্তাহে বম্বেতে আমেরিকার প্যারামাউণ্ট ফিল্মসের অফিসে আগুন লেগে সতেরজন লোকের মৃত্যু ঘটেছে। ভারতবর্ষের চলচ্চিত্র ইতিহাসে এইরকম ভীষণ ব্যাপার আর কখনও হয়নি। বম্বের ফিল্ম-গুদামে প্রায়ই আগুন লাগার সংবাদ পাওয়া যায় এর মানে কি?

* * *

'ফুল' ছবিখানিতে অতিমাত্রায় পাকিস্থানী উপাদান থাকায় জানা গেল, দিল্লীর সেন্সর সেখানকার জনসাধারণের আপত্তিতে কতকাংশ বাদ দিয়ে দিয়েছে।

* * *

দেবীকারাণী ছাড়ার পর বম্বে টকীজে রকম রদ বদলের কথা কানে আসছে। তার মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ হ'লো প্রাক্তন কণ্ট্রোলার অফ প্রডাকশন্স এবং অধুনা ফিল্মিস্তানের কর্ণধার শশধর মুখার্জির ফিরে আসার কথা।

প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান জাতিধর্মনির্বিশেষে সমস্ত সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদিগকে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংগ্রহে সমান অধিকার দানের সদিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ট্রুম্যানের এই বদান্যতায় মসীজীবীরা অবশ্যই আনন্দিত হইবেন, কিন্তু অসিজীবীরা প্রেসিডেন্ট-প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ হইতে পারেন নাই। কেননা আণবিক বোমা প্রস্তুত-প্রণালীর গোপন তথ্যটির



সর্বস্বত্ব প্রেসিডেন্ট মহোদয় শুধু আমেরিকার জন্যই সংরক্ষণের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন। আত্মীয়-প্রতিম বৃটেন ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন সন্দেহ নাই। শুধু রাশিয়া নাকি বলিতেছেন—"আণবিক বোমা তুমি কি দেখাও ভয়, ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়"—অর্থাৎ বোমার গোপন তথ্য তাঁরাও উদ্ধার করিয়াছেন। অর্থাৎ বিশ্ব একদিন চিরদিনের জন্যই উদ্ধার হইয়া যাইবে!

* * *

New York World Telegram কাগজে জনৈক প্রবন্ধকার বলিতেছেন U. S. will not go galloping about the earth rescuing damsels from 'those who now embrace them—' কথাটা অবশ্য তিনি "কলোনি-কুমারী"দের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা জানি, মানবী কুমারীদেরও যাঁরা বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া রাখেন তাঁদের সম্বন্ধেও যুক্তরাষ্ট্র চিরদিন উদার মতই পোষণ করিয়া থাকেন!

* * *

ভারত এবং ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমেরী সাহেব নাকি অচিরেই সভাসমিতি এবং কাগজপত্রে অনেক কিছু বলিবেন এবং লিখিবেন। ভারত সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন তাহাতেও তাঁর বলা ফুরাইল না ভাবিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম এবং অতঃপর "মহাভারতের কথা অমৃত সমান, আমেরী সাহেব ভণে শোনে পুণ্যবান"—বাণী শুনিবার জন্য আতঙ্কিত হইয়া রহিলাম!

ট্রামে-বাসে

অত্যধিক ভাঙ খাওয়ার ফলে মাথা গরম হওয়ায় বায়ু সেবনের জন্য দুইটি যুবককে নাকি সেদিন হাওড়ার পোলের সর্বোচ্চ স্থানে বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। অনেক হাঙ্গামার পর তাহাদিগকে নামাইয়া আনিলে দেখা গেল একজনের পকেটে এক প্যাকেট তাস রহিয়াছে। ইহাদের ভাগ্য ভাল যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। না হইলে ব্রিজের উপর বসিয়া দুহাত্তা ব্রিজ খেলিবার অজুহাত তো লাল বাজারে চলিতই না, এমন কি ভাঙ দিয়াও ভারতরক্ষার কবল ভাঙা যাইত না।

* * *

আমেরিকা বৃটেনের সঙ্গে ঋণ ইজারা চুক্তি খারিজ করিয়া দেওয়ায় এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। সেই সঙ্গে সংবাদ আসিয়াছে যে, বৃটেনের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলার অনুপাত প্রতি সপ্তাহে একশত করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে। দাম্পত্য ইজারা চুক্তিটাও কি তবে বিলকুল বাতিল হইতে



চলিল? বিশুখুড়ো বলিলেন—সমস্যাটা এমন কিছু গুরুতর নয়। শ্রমিক গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষে বশীকরণ তাবিজের জন্য টেণ্ডার ডাকুন—দেখিবেন একপক্ষের মধ্যেই তার কি আশ্চর্য ফল ফলে। আমরা পরবশে জীবন-যাপন করি বটে, কিন্তু বশীকরণে আমাদের জুড়ি নাই।

* * *

বম্বেতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার ফল আশাপ্রদ হয় নাই বলিয়া প্রতিবাদ সভা হইয়াছে। কলিকাতায় হয় নাই। কলিকাতা কেন্দ্রে জনৈক পরীক্ষার্থী নাকি তাঁর প্রশ্নোত্তরে লিখিয়াছেন—"শকুন্তলা কম্বমুনির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন!" বোধ হয় আশাপ্রদ ফলের দাবী এই জন্যই কলিকাতার ছাত্ররা ছাড়িয়া দিয়াছেন। আমরা ভাবিতেছি বেচারী শকুন্তলার কথা। দুর্বাসার শাপে কি শেষে পরীক্ষার্থীরও স্মৃতিবিভ্রম ঘটিল?

* * *

একটি বিচিত্র সংবাদে প্রকাশ বৃটিশ সিংহাসনের নাকি একটি আদি এবং অকৃত্রিম উত্তরাধিকারী আবিষ্কৃত



হইয়াছে। তাঁর দাবী অনুসারে এই সিংহাসনের একচ্ছত্র মালিক নাকি তিনি নিজে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"হুইস্কি, বিয়ারটার শুধু এদেশেই অনটন হয়নি। বৃটেনেও লোকেরা গাঁজা ধরতে বাধ্য হয়েছে।"

* * *

প্রখ্যাতা অভিনেত্রী শ্রীমতী দেবীকারাণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সংবাদদাতা বলিতেছেন—বিবাহের পরই দম্পতি হিমালয়ে যাত্রা করিয়াছেন। পঞ্চাশের পর বনে যাওয়ার নির্দেশ আমাদের শাস্ত্রে আছে। বরের বয়স অবশ্য জানিনা, কিন্তু শ্রীমতীর পঞ্চাশ পূর্ণ হয় নাই তা জানি। তবু বিবাহের পরই হিমালয় যাইতে হইল? আহা গো!

* * *

কুমিল্লা হইতে আগত R. A. F. টিমের কাছে লীগ এবং শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল টিমের চার গোলের ব্যবধানে পরাজয়ে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। করেন নাই শুধু বিশুখুড়ো। তিনি বলেন, "R. A. Fএর কাছে জার্মানী এবং জাপানের মত টিম কাৎ মেরে গেল, ইস্টবেঙ্গল কোন্ ছার। তবে হ্যাঁ, এতে ইস্টবেঙ্গলের আরও খানিকটা সান্ত্বনা আছে। হাজার হোক টিমটা কুমিল্লার এবং কুমিল্লাটা পদ্মার "হেপারের" সুতরাং তোমার কাছে যে-হার মানি......

অন্তরাল

শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়

সারাদিন ধরে মালপত্র এসেছে, সন্ধ্যার দিকে মেয়েরা এল। মেয়েরা বলতে—২৫।২৬ বছরের একটি বৌ, কোলে বছর খানেকের একটি খোকা।

প্রতীক্ষায় ছিল লক্ষ্মী; মাথায় ঘোমটা টেনে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অভিবাদন জানাল, আসুন।

এই বুঝি আপনার ঘর? —সুলতা জিজ্ঞেস করল, কলতলার পাশে একতলারই একটি ঘরের দিকে নির্দেশ করে। দরজার বাইরেই একটি খাঁচায় টিয়াপাখি, আর এক কোণে এঁটোকাঁটা ঘাটছে বিড়াল একটা।

হাঁ, এইটেই আমার ঘর। —জবাব দিলে লক্ষ্মী।

আপনারা ক'দিন হল এসেছেন?

ক'দিন আর, এই দিন পনের হল।

ভালই হল ভাই, সমবয়সী একটি সঙ্গী পেলাম। মনে মনে কতই না ভাবনা হয়েছিল, পাড়াটা ত ভাল নয়। কী করব বলুন, সারা কলকাতা খুঁজেও ভদ্রপাড়ায় এক ফালি জায়গাও মিললো না।

লক্ষ্মী নিরুত্তর।

অর্থপূর্ণ হাসি হেসে সুলতাই প্রশ্ন করল আবার (এবার মৃদুস্বরে), সব ভুলে গিয়েছে ত, না এখনো কিছু কিছু—

না-না, সব ভুলে গিয়েছে। —লক্ষ্মীও হাসল একটু, শুধু বাড়িউলীরা—

ও বাড়িউলীটি কেমন?

কে, বাড়িউলী? ভাল লোক। ওই ত। —দোতলার দিকে তাকাল লক্ষ্মী।

সুলতা দেখল, রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বছর চল্লিশের একটি মেয়েছেলে, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, সাজামাজা রং, গালে পান, শাদা ব্লাউজ, রঙীন শাড়ি গায়ে। সুলতারই দিকে তাকিয়ে হাসছে।

সুলতা তাকাতেই ডাকল, আসুন ওপরে।

খোকা কেঁদে উঠল। দোল দিতে দিতে উঠে গেল সুলতা। দোতলারই এক অংশ তারা ভাড়া নিয়েছে—দুখানা ঘর, একটি রান্নাঘর। আর এক অংশে থাকে বাড়িউলী আর তার বাবু।

সেদিন রাত্রে রামচরণ জিজ্ঞেস করল, এসেছে ভাড়াটে?

হাঁ।

একতলায় না দোতলায়?

দোতলায়। —জরদা মুখে দিয়ে পান চিবোতে চিবোতে জবাব দিলে লক্ষ্মী।

বাবু কী করে? —সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়ল রামচরণ।

জানি না।

ক'জন লোক ওরা?

বৌ, বাচ্চা খোকা একটা—কী সুন্দর মাইরি, আর—আর হচ্ছে বাবু আর তার বুড়ো বাবা।

একতলার ভাড়াটে বুঝি আসে নি এখনো? —সিগারেটে জোর এক টান দিলে রামচরণ।

না, আসবে পরশু। —লক্ষ্মীও শুয়ে পড়ল কোলবালিশটা টেনে নিয়ে।

আরে, বাতিটা নেভালি না?

থাক্ না।

কেনো?

না, এমনি।

আচ্ছা, আমি নিভিয়ে দোব এখন। একটু থেমে বললে রামচরণ, দেখিস বাবা, সমঝে চলিস। বুঝতে পারলে বড় খতরা হোবে। বলছি, একটা ঘর দেখি অন্য জায়গায়। তা ত তুই—

না-না, এই বেশ ভাল লাগছে। কেন, শাঁখা সিঁদুর মানায় নি আমাকে?

দেখ্, মনেই ছিল না আমার। আরে, বে মানিয়েছে। লে, টান। —অস্বাভাবিক খুশিতে সিগারেটটা এগিয়ে দেয় রামচরণ।

ছিঃ, কেউ দেখে ফেলবে।

পেট ফুলে মরবি যে। আদত কি একদিনে ছাড়া যায়? সিগারেটটা লক্ষ্মীর প্রায় মুখের কাছে এগিয়ে দেয় রামচরণ।

লক্ষ্মী সরিয়ে দেয় হাতটা, বলে, আঃ আস্তে কথা বলতে পারো না।

একটু থেমে বলে, তুমি বাপু চুড়িদার ফুলকাটা পাঞ্জাবী ছাড়। ওদের বাবু কেমন সুন্দর একটা শাদামাটা পাঞ্জাবি পরে এসেছে দেখলুম। আর ওই নাগরা জুতোও ছাড়তে হবে তোমায়।

রোজ রোজ নতুন পরবো। অত পয়সা কোথেয়। তোর ত কারবার গেল।

ভালই হল।

আমি একা চালাব কি করে?

কেন? আমার ত আর সাজপোশাকের দরকার নেই। সে যাক। তুমি বরং দুপুরবেলায় এসে এক ফাঁকে খেয়ে যেও, আর রাত্তির এগারটার আগে ফিরো না। রাত্তিরে পরের দিনের বাজার নিয়ে এস। আবার ভোরবেলায় চলে যেও। মেয়েছেলেরা দেখলে তত বুঝতে পারবে না। কিন্তু বাবুরা তোমায় দেখলেই সন্দেহ করবে। মা বলে দিয়েছে এসব কথা তোমায় বলতে। (মা মানে বাড়িউলী।)

—তবু তুই অন্য জায়গায় যাবি না? বললে, রামচরণ।

জবাব দিলে না লক্ষ্মী, তন্দ্রা আসছিল তার। রামচরণ উঠে বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল।

মন্দ লাগে না লক্ষ্মীর। নীচে থেকে চুরি করে লক্ষ্য করে দোতলার অনাবিল দাম্পত্য জীবন আর কেমন একটা রাঙা আকাঙ্ক্ষা, কী রকম উদগ্র তৃষ্ণা বোধ করে অন্তরের অন্তস্তলে। বহু দিনের অভ্যাসে ঘুম থেকে ওঠে অনেক বেলায়, রামচরণ যে কখন বেরিয়ে যায় জানতেও পারে না। ঘুম থেকে উঠে সকালের নানা কাজ সারতে সারতেই ওপরের বাবুটি বেরিয়ে যায় অফিসে। লক্ষ্মী দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসে খোকাটাকে, বুকের তলে পেষণ করে ওই বিস্ময়পিণ্ডটাকে আগ্রহের উত্তাপে। গয়লার দুধ থেকে সবটুকুই খাওয়ায় খোকাকে, চুমু খায়, খেলনা দেয়, হাসে, খেলা করে। ওপর থেকে সুলতা মাঝে মাঝে বলে, 'পাগলী! অত যদি শখ ত বলতে পারিস না তোর কর্তাকে। তারপর রান্নাখাওয়া সারতে লক্ষ্মীর বেলা প্রায় তিনটে। তারপর ঘুম প্রায় সন্ধ্যে পর্যন্ত। আবার খোকা, আবার রান্নাখাওয়া। বিকেলে মাঝে মাঝে ঘুমের ব্যতিক্রম হয় সুলতার অত্যাচারে। আড্ডা বসে, নির্দিষ্ট স্থান নেই, এক একদিন এক একজনের ঘরে। বাড়িউলী আর একতলার ভাড়াটে গিন্নীও এসে যোগ দেয়।

লক্ষ্মী কিন্তু দিন দিনই আড়ষ্ট হয়ে যায়, অস্বস্তি বোধ করে একতলার ভাড়াটে ওই নতুন গিন্নীর জন্যে। মাগীটা যেন সব সময়েই কি রকম করে তাকায় লক্ষ্মীর দিকে। লক্ষ্মীর ঘরে একটিমাত্র জানালা, তার সামনা-সামনিই দর্জিগিন্নীর ঘর। লক্ষ্মী ভয়ে ভয়ে বন্ধ করে রাখে জানালাটা। সুলতার নজরে পড়ে, রহস্য বুঝতে পারে না। তার তাগাদায় আবার দু একদিন জানালাটা খুলে রাখে লক্ষ্মী, আবার বন্ধ করে। নাঃ, আর পারা যায় না, ভাবে সে। ইতিমধ্যে তিন রাত্রি মদ খেয়ে এসেছে রামচরণ। লক্ষ্মী যে কী করেই তাকে সামলেছে! তার একমাত্র বুলি, অন্য জায়গায় চলুক লক্ষ্মী, অত চোরের মত এখানে পারা যায় না। একটু আমোদ ফুর্তি না করলে কি, আরে ছোঃ! একদিন মারও খেয়েছে লক্ষ্মী, অপরাধ—

অন্য জায়গায় গিয়ে ব্যবসা করছে না কেন। তখন রাত প্রায় দুটো ছিল তাই, নইলে—লজ্জায় ভয়ে এতটুকু হয়ে যায় লক্ষ্মী। মনে মনে হাসেও, রামচরণের পীরিত ফুরিয়ে আসছে।

সেদিন দুপুরবেলা।

পা ছড়িয়ে সলতে পাকাতে পাকাতে লক্ষ্মীকে জিজ্ঞেস করলে দত্ত গিন্নী, তোমার কর্তা কোথায় কাজ করে?

রামচরণের পানবিড়ির দোকান। আর একটু হলেই বলে ফেলত লক্ষ্মী। কিন্তু কোন রকমে সামলে নিয়ে বললে, মিলটারিতে।

সে কোথায়?

আঃ, ভা—রি বিরক্ত করে ছেলেটা—সুলতার খোকাটাকে কোলে দোল দিতে দিতে ভাববার জন্যে সময় নেয় লক্ষ্মী।

অবস্থা বুঝে বাড়িউলী টপ্ করে উত্তর দেয়, গোরাবাজারে।

সেখানে অনেক হিন্দুস্থানী বুঝি?

চমকে ওঠে লক্ষ্মী।

বাড়িউলি কাঠ হাসি হেসে জবাব দেয়, হাঁ। তুমি বুঝি ওর কর্তার কথা শুনে বলছ? মানে, সব সময় হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে মিশতে হয় কি না তাই। কুলীখাটানো কাজ।

আসন বুনতে বুনতে সুলতা বলে ওঠে, আজও তুই ভাল করে সিঁদুর লাগাস নি সিঁথেয়! মেয়েটা কী ক্যাব্লা গো! ছিঃ, স্বামীর আয়ু কমে যায়, জানিস না। অপরকে সিঁদুর পরিয়ে তার শাঁখায় সিঁদুর ছোঁয়াস না, নিজে ঠিকমত সিঁদুর পরতে ভুলে যাস, কী রে তুই!—খিলখিল্ করে হেসে ওঠে সুলতা। লক্ষ্মীও হাসে বিবর্ণ হাসি।

ও ওই এক ধরণের বাপু। বাড়িউলী জবাব দেয় (এক ফাঁকে দৃষ্টি-বিনিময় হয়ে যায় লক্ষ্মীর সংগে, তীব্র ভর্ৎসনা জানায়), তোমরা আর ক'দিন দেখছ ওকে। তোমাদের অনেক আগে, মানে, (কথাটা সমলে নেয় বাড়িউলী) কয়েকদিন আগে থেকেই ত দেখছি ওকে। 'মা' 'মা' বলে ডাকে, মায়া হয়। তোমরা আসার আগে পর্যন্ত আমিই ত ওকে চালিয়েছি। মাইরি!

আমাদের কর্তাও বলেন,—সুলতা বলে, নীচের বৌটি বড্ড লাজুক ত, একেবারেই সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

হাঁ, বড্ড লাজুক আর সরল।—গর্ব বোধ করে বাড়িউলী।

•

লক্ষ্মী কিছুতেই যাবে না, সুলতাও ছাড়বে না। শেষবেলায় সুলতা অভিমান করে, বেশ, টাকা ক'টা যাক জলে, আমিও যাব না।

লক্ষ্মীর যে কোথায় বাধা, কি দুঃখ, তা সে বোঝাবে কি করে। উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে বলে, চল্ বাপু চল্, আর রাগ করতে হবে না।

সুলতার স্বামী সিনেমার টিকিট কেটে এনেছিল তিনখানা। চলল ওরা। বেরোবার সময় মৃদু হেসে আশ্বাস দিলে সুলতার স্বামী, আপনার উনি এলে আমি বুঝিয়ে বলব'খন, কোন ভয় নেই।

ঘোড়ার গাড়ির এককোণে শামুকের মতো সংকোচে নিজেকে গুটিয়ে রাখল লক্ষ্মী। এই সেদিনও গেছে বারোয়ারী জীবন, যদিই কোন অতর্কিত মুহূর্তে কোন পরিচিত বল্লভ এসে এদের সামনে আবার কাদা ছিটিয়ে দেয়! শিউরে ওঠে লক্ষ্মী।

গাড়ি থেকে নেমে হলে ঢুকতে পারলে বাঁচে। সুলতাকে টান দিয়ে বলে, আর তাড়াতাড়ি, আরম্ভ হয়ে গেল যে। হাঁটতেও পার না মরণ! দে।—বলেই খোকাটাকে ছিনিয়ে নেয়, আগে আগে গিয়ে ঢোকে হলে।

বিরতির সময়। লক্ষ্মীর নজরে পড়ে নি। সুলতাই তার আঁচল ধরে টান দেয়, আ মরণ, দেখ্ ভাই, লোক দুটো তোর দিকেই তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে না?

সুলতার নির্দেশমত লক্ষ্মী সামনের দিকে দূরে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নেয়, তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, বদমাইস লোক, তাকাস নি। —হায়রে! লক্ষ্মীর ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে।

ছবি যতই শেষ হয়ে আসতে লাগল, ততই ভয় হতে লাগল লক্ষ্মীর। লোক দুটো রামচরণের বন্ধু, যদিই পেছনে পেছনে আসুনা দেয়।

হলও তাই। সিনেমা-শেষে রাস্তায় বেরিয়ে সুলতার স্বামী যখন গাড়ি ডাকছিল, সুলতা লক্ষ্য করল, পেছনেই সেই লোক দুটো দাঁড়িয়ে।

তেড়ে উঠল সুলতা, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দোব, বদমাইস কোথাকার। লোক চেনো না?

ঘোমটাটা আর একটু টেনে দিয়ে এক-ধারে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল লক্ষ্মী।

কি হয়েছে, কি হয়েছে।—বলতে বলতে সুলতার স্বামী এগিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন ভদ্রলোক। লোক দুটো ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

শেষরক্ষা হল না। একদিন প্রকাশ হয়ে পড়ল সব।

খোকার কল্যাণে মানত করেছিল সুলতা, সত্যনারায়ণ পুজো হবে। পুরুত ডেকে দিন স্থির করে সব আয়োজন হল। দোতলার রেলিঙে চাঁদোয়া খাটানো হ'ল। পুজো উঠোনে। সামনে বেদীর ওপর লক্ষ্মীনারায়ণ। চারধারে ফলমূল, সন্দেশ সিন্নির প্রাচুর্য। ধূপ-ধুনো কাঁসর-ঘণ্টা ইত্যাদি। ঠিক সন্ধ্যা সাতটায় পুরুত পাঠ আরম্ভ করলেন।

অনুষ্ঠান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় সদরে জড়িত-কণ্ঠের হাঁক শোনা গেল, পাঁচি বাড়িউলী আছিস, আরে এ পাঁচি?—সঙ্গে সঙ্গে টর্চের আলো এসে পড়ল উঠোনের আলোতে।

একি!—পাঁচি লাফিয়ে উঠল।

গ্যাস্‌লাইটের আলোতে লক্ষ্মী আর সুলতা লক্ষ্য করল, সেদিনের সেই লোক দুটো। লক্ষ্মী ছুটে পালাল ঘরে।

লক্ষ্মী, পালালি মাইরি?—সদর থেকে মত্ত কণ্ঠের আওয়াজ এল।

ভদ্দরলোকের বাড়িতে এসব কি!—চীৎকার করে উঠল বাড়িউলী, তার বাবুকে উদ্দেশ করে বললে, দাঁড়িয়ে দেখছ কি হাঁ করে? শীগ্‌গির পুলিস ডাকো।

কি বললি প্রাণ, ভদ্রলোকের বাড়ি?—একটা মাতাল হেসে উঠল অট্টহাসি।

পাঁচির বাবু এগিয়ে গেল সিংহ-বিক্রমে।

সদরের একজন বাধা দিলে, না—না, আমরা যাচ্ছি। পুলিস ডাকতে হবে না বিশু-দা'। তবে বড় দুঃখু, প্রাণে বড় দাগা পেয়েছি মাইরি, তাই জানাতে এসেছিলুম।

বেরিয়ে যাবে কি না, তাই আমি জানতে চাই।—বিশ্বনাথ একজনের ঘাড় ধরে দিলে ধাক্কা।

লোকটা পড়ে যেতে যেতে সামলে নিলে, তারপর জিভে একরকম আওয়াজ করে বললে, রামো বল, এক্ষুনি যাচ্ছি। তবে কিনা, সেদিন সিনেমায় লক্ষ্মী যা ব্যাভার করলে, মাইরি তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। রামচরণের সঙ্গে এসে কতদিন কত—ঠাকুরপোকে ভুলে গেলি বৌদি। —বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো লোকটা।

ততক্ষণে বাড়িউলী এসে গেছে। বাবুর সঙ্গে যোগ দিয়ে মাতাল দুটোকে রাস্তায় ঠেলে ফেলে দিলে, তারপর খিল তুলে দিলে দরজায়।

এর পরের ইতিহাস বেশি নয়।

সারারাত ধরে সুলতার স্বামীকে অনেক অনুনয় করল বাড়িউলী ও আমার নিজের পেটের মেয়ে বাবু, বিশ্বাস করুন আপনি। ভগবানের দোহাই। এখন থেকে চলে গেলে ও বাঁচবে না বাবু। ব্যবসা করতে চায় না ও মাইরি বলছি।

চিরপুরাতন পদস্খলনের ইতিবৃত্ত। বহুকাল পূর্বে লক্ষ্মীকে গর্ভে ধরে এক দুবৃত্তের সংগে চলে আসে পঞ্চাননী কলকাতায়। কিছুকাল ঘর-সংসার করে লোকটা পালিয়ে যায়। তারপর থেকে এই ব্যবসা।

কিছুতেই শুনল না সুলতার স্বামী। সত্যিই ত, শুচিতা সম্ভ্রম সব নষ্ট হয়ে গেছে যে। বললে, ওকে কালই যদি না আমি তুলতে পারি ত কোর্টে আমি থোড়াই কাজ করি।

সুলতা বললে, বাবা, কী ডাইনী! ছেলেটাকে কালই গঙ্গায় নাইয়ে নিয়ে আসব।

দত্তগিন্নী বললে, আমি অনেক আগেই টের পেয়েছিলুম।

পুলিশ এসে সাত দিনের নোটিশ দিয়ে গিয়েছিল লক্ষ্মীকে। সাতদিন পরে ঘর থেকে বেরোল লক্ষ্মী, শরীর আধখানা হয়ে গেছে। সবচেয়ে খুশী হল রামচরণ।

কাহিনী খবর ভরপুরে

ষ্টীলওয়েলের টুপী কোথায়?

কয়েকদিন আগে আমেরিকার এক কাগজে খবর বেরিয়েছে যে, যখন জেনারেল জোসেফ স্টীলওয়েল 'ওকিনাওয়া'র ওপর দিয়ে বিমানে চেপে যাচ্ছিলেন—তখন হঠাৎ দেখা গেল যে, তাঁর টুপীটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখনই তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁর টুপীটি ফেরৎ দিলে ২৫ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। চার ঘণ্টা পরেই কয়েকশত টুপী সন্ধানীদের মধ্যে একজন দেখলে যে সমুদ্রতট থেকে দু'শো গজ দূরে জলের



"ফিরে পেয়েছেন টুপিটা?"—স্টীলওয়েল—

ওপর একটা টুপী ভাসছে। জল থেকে টুপীটি তুলে এনে জেনারেল স্টীলওয়েলকে যখন দেওয়া হলো—তখনও টুপী থেকে জল ঝরছিল, তিনি খুসি হয়ে সেটির জল ঝেড়ে নিয়ে রোদে টাঙিয়ে দিলেন শুকোবার জন্য। এজন্য পুরস্কার পেলেন যিনি তিনি একটি কর্পোরাল। স্টীল-ওয়েলের ঐ টুপীটির প্রতি অতটা টান দেখে মনে হচ্ছে চীন থেকে বিদায় নেবার সময় চ্যাঙ কাইশেক হয়তো সেটি স্পর্শ করেছিলেন।

হাইলে সেলাসীর হারানো সম্পদ

আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসী ১৯৪১ সালে তাঁর হৃতরাজ্য ফিরে পেয়েছেন একথা সবাই জানেন। কিন্তু সম্প্রতি তিনি প্রায় দশ মণ ওজনের একটি রাজকীয় পুঁটলী ফেরৎ পেয়েছেন—এই পুঁটলিটি নাকি ইতালীয়ানরা তাঁর প্রাসাদ থেকে চুরি করেছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সন্ধানী বাহিনী উত্তর ইতালীর এক অংশ থেকে হাইলে সেলাসীর এই লুণ্ঠিত পুঁটলিটি উদ্ধার করেছেন। এই পুঁটলিতে রুপোর বাসনকোসন থেকে রাজার পোষাক-পরিচ্ছদ পর্যন্ত ৩৫০ দফা জিনিষ ছিল। সাধু আমেরিকানরা পুঁটলিটি পেয়েই একটি বিশেষ বিমানে চাপিয়ে সেটি আদ্দিসআব্বায় পাঠিয়ে দেন। মিত্রশক্তির সততা, সাধুতা, এর পরে নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না।

একেই বলে অদৃষ্ট

সম্প্রতি ফ্রান্সের ঘটনাবলীতে 'মানুষের অদৃষ্টের ফের' যে কতরকম হতে পারে তা বেশ ভাল করেই বোঝা যাচ্ছে। ফ্রান্সের জনগণের দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা যাঁরা ছিলেন একদিন—তাঁদেরই আজ একের পর একে বিচারালয়ে হাজির করে বিচার করা হচ্ছে, প্রাণদণ্ড দেওয়া হচ্ছে—আবার তা মকুবও করা হচ্ছে, সেসব তো কাগজেই পড়েছেন। ফ্রান্সের 'প্যালে দ্য জাস্তিস্' বিচারালয়ে এই বিচারপর্ব ক'দিন ধরেই চলেছিল—এই বিচারে পিয়ারে লাভালের মুখ থেকে যে সমস্ত কথা শোনা গেছে—তার মধ্যে সত্য মিথ্যা খুঁজে বার করা শক্ত—কারণ সেগুলি উত্তেজনা ও উন্মাদনায় ভরা ছিল। তিনি বলেছিলেন—"অন্তরে অন্তরে কে ভাবেনি একথা যে জার্মানী হয়তো এযুদ্ধে জয়ী হবে?" (তাঁর একথা শুনে বিচারালয়ে জনতা চীৎকার করে ওঠে)। তখন লাভাল আরও দ্বিগুণ জোরে চেঁচিয়ে বলেন, "আমি নাৎসী নই—আমি ফ্যাসিষ্ট নই। আমরা হারি কিংবা জিতি সব অবস্থাতেই আমি যুদ্ধকে ঘৃণা করি। আমি ফরাসী রিপাব্লিককে ভালবাসি। আমাকে পেঁত্যার 'কুবুদ্ধিদাতা' বলা হয়েছে—এর আমি প্রতিবাদ করি।"

লাভালের এ ঘোষণা এ্যাটম বোমার শব্দের চেয়ে জোরালো নয়, কাজেই কেউ শুনেও শুনতে পায়নি নিশ্চয়ই। একেই বলে অদৃষ্ট!

সের দরে নোট বিক্রয়

মুদ্রাস্ফীতি বা 'ইনফ্লেশনে'র যে কত শোচনীয় পরিণাম ঘটতে পারে—তা মাসখানেক আগের সাংহাই-এর এক ঘটনায় স্পষ্ট বোঝা যায়। আমেরিকার এক খবরে প্রকাশ যে, সাংহাই-এর এক চীনা ব্যবসায়ী তাঁর ব্যাঙ্কে উপস্থিত হয়ে তাঁর গচ্ছিত আট লক্ষ চীনা ডলার তখন তখনই তুলে নিতে চাইলেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের অবুঝ কেরাণী বল্লেন—দশ ডলারের নোটে সে এখন মাত্র এক লক্ষ ডলারই দিতে পারে তার বেশী দিতে পারবে না। সেই চীনা ব্যবসাদার মরিয়া হয়ে বললেন—"বেশ দশ ডলারের নোটে সব টাকাটা না দিতে পারো—পাঁচ ডলার, এক ডলার এমন কি পঞ্চাশ সেণ্টের নোট দিয়েই ঐ টাকাটা আমার এখনই মিটিয়ে দাও।" যাই হোক, তাই হোল—ব্যাঙ্কের কেরাণী বড় নোটে টাকা না দিয়ে খুচরো নোটেই সব টাকাটা মিটিয়ে দিলেন। তাতে ব্যাপারটা দাঁড়ালো কড়ি দিয়ে জাহাজ কেনার মতই। চীনা ব্যবসায়ী তাড়া তাড়া খুচরো নোটের বাণ্ডিল বস্তা বোঝাই করে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে এক পুরানো কাগজ-ওয়ালাকে খবর দিলে। কাগজওয়ালা এসে ওজন দরে সব নোট কিনে নিলে—তাতে ঐ আট লক্ষ ডলারের নোটের দাম হলো সাড়ে আট লক্ষ ডলার। এর পরে আবার ঐ কাগজওয়ালা পুরানো কাগজের দরে কাগজের মিলকে নোট-গুলো বিক্রী করে দিলে—তা থেকে নতুন কাগজ তৈরী হয়ে নোট ছাপা হলো যখন, তখন দেখা গেল তার দাম হয়েছে—৩২ লক্ষ ডলার। এর নাম মুদ্রাস্ফীতি! এদেশে ব্ল্যাক মার্কেট করে যাঁরা নোটের তাড়া বেঁধেছেন—তাঁরা খুশি হবেন এই ভেবে যে, শেষে যদি একান্তই সের দরে নোটগুলি বিক্রী করতে হয়, তাহলে তাতেও লাভ হবে।



বিচারালয়ে লাভাল্ ও পেতাঁ

লিখিয়াছেন—মধ্যপ্রাচীতে ব্যাপারটা যে এতটা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, ব্রিটেন তাহার অধীন দেশে প্রতিদিন যাহা করিতেছে, সেখানে সে সর্মাধিক সৈন্যবলে বলীয়ান্ হইয়া তাহার মিত্রশক্তি ফরাসীদের ঠিক তেমন কাজেই বাধা দিতেছে।

মধ্যপ্রাচীর স্বার্থ

ইরাক ও ইরানের তৈলসম্পদ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বার্থের সংঘাত এই সমস্যার মূলে রহিয়াছে। উপর হইতে দেখিলে ফরাসী দ্য গলের দলের সঙ্গে ব্রিটেনের বিরোধের কারণ দেখা যায়; কিন্তু মার্কিনের সঙ্গে বিরোধের কারণ চোখে পড়ে না। তেলের প্রশ্নটি ভাল করিয়া বুঝিলে বিষয়টা অধিক স্পষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে ইংরেজের ভারত সম্পর্কিত নীতির গলদও আছে। মার্কিন যুক্তরাজ্যে ভারতের স্বাধীনতার দাবীকে চাপিয়া দিবার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিতান্ত নির্লজ্জভাবে যে অপকৌশল প্রয়োগ করিতেছেন, তাহাতে মার্কিনের জনমত তাঁহাদের প্রতি অশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং মার্কিন সংবাদপত্রসমূহ এইভাবে ব্রিটেনকে আক্রমণ করিবার সুযোগ লাভ করিতেছে। সানফ্রান্সিস্কোর বৈঠকে খুরশীদ খাঁর কেরামতি শেষ হইয়াছে। এখন এম এন রায়ের দল সেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ধামা ধরিতে দাঁড়াইয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি রায়ের দলের প্রতিনিধি-স্বরূপে তায়েব সেখ নামে এক ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়া এক ইস্তাহার বিলি করেন। এই ইস্তাহারে বলা হইয়াছে,—

"কংগ্রেস ফ্যাসিস্টবিরোধী জিগীর মুখে তোলে; কিন্তু যুদ্ধ বাধিলে কংগ্রেস হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিতে অস্বীকার করে; পক্ষান্তরে সে রাজনীতিক সুবিধা পাইবার জন্য দরদস্তুর চালাইতে শুরু করে। এই প্রতিষ্ঠান প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধোদ্যম বর্জনের পক্ষে প্রচারকার্য চালায়। ফ্যাসিস্টবিরোধী সংগ্রাম পরিচালনে কংগ্রেস কোনরূপে আন্তরিকতা দেখায় নাই। জাপানীরা ভারতের সীমানার মধ্যেই ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। কংগ্রেসীরা বিদেশী আক্রমণকারীদের সঙ্গে কোনরূপ বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিত। যুদ্ধের মোড় যেই ঘুরিয়াছে, অমনই কংগ্রেস কেন্দ্র এবং প্রদেশসমূহে রাজনীতিক অধিকার লুফিয়া লইবার জন্য পুনরায় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে। মেসার্স টাটা, বিড়লা এন্ড কোম্পানী কংগ্রেসের কর্তৃত্ব যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাই কামনা করেন। মুষ্টিমেয় ধনীদের ধনসম্পদ বাড়াইবার জন্যই কংগ্রেস ন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার ধ্বনি তুলিয়াছে।"

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাইয়া রায়ের দল মাসিক ১৩ হাজার টাকা বাগাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মার্কিন মুলুকে এই প্রচারকার্যের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে নিশ্চয়ই তাঁহারা স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীর মারফতে বিশেষভাবে পুরস্কৃত হইবেন। কারণ, ভারতের মার্কিন এজেণ্ট জেনারেল ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের গোলাম ছাড়া অন্য কিছু নহেন। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক 'জন্মভূমি' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুত অমৃতলাল শেঠ সম্প্রতি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"ওয়াশিংটনে অবস্থানকালে আমেরিকাস্থ ভারতের এজেণ্ট-জেনারেলের পদমর্যাদা সম্বন্ধে আমি একটা খবর পাই। এজেণ্ট-জেনারেলের অফিস এবং সেখান হইতে ভারতের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রচারকার্য চালানো হয়, ভারতে আমরা সকলেই তাহা জানি। কিন্তু তিনি যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের গোলাম ছাড়া কিছু নহেন, আমি এতটা জানিতাম না। তাঁহাকে ওয়াশিংটনস্থ ব্রিটিশ দূতাবাসের অন্যতম কর্মচারীস্বরূপে গণ্য করা হইয়া থাকে এবং নিম্ন-কর্মচারীদের নামের তালিকার মধ্যে তাঁহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি মার্কিনস্থ ব্রিটিশ প্রতিনিধি-দের একজন অধীন কর্মচারী মাত্র। এজেণ্ট-জেনারেলের অফিস হইতে যে সব প্রচারকার্য পরিচালিত হয়, এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিলেই তাহার তাৎপর্য উপলব্ধি করা সহজ হইবে।"

আদর্শ ও প্রলোভন

এরূপ অবস্থায় ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যে স্বেচ্ছায় আমাদের দেশ শাসনের অধিকার আমাদের হাতে ছাড়িয়া দিবেন, এরূপ মনে করা বাতুলতামাত্র। ইহাও সত্য যে, প্রকৃত স্বাধীনতা ভারতবাসীরা যদি না পায়, তবে ব্রিটিশের সাময়িক নিগ্রহানুগ্রহের সূক্ষ্ম হিসাবে যাহারা মাতা-মাতি করিতে চাহেন, তাহারা তাহা করুন, কিন্তু তদ্দ্বারা ভারতের সমস্যার কিছুতেই স্থায়ীভাবে সমাধান হইবে না। যাহাদের বুকে বল নাই, তাহারা পিছাইয়া পড়িলেও স্বাধীনতার সাধনায় আত্মোৎসর্গকারীদের অন্তরের আগুন নিভিবে না; তাহারা দুঃখ বিপদ অগ্রাহ্য করিয়াই আগাইয়া যাইবে। বড়-লাটের প্রস্তাব লইয়াই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইবে মনে হয়। 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্র এ সত্য উপলব্ধি করিয়া সম্প্রতি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"ভারতের অবস্থা এমন হইয়া উঠিয়াছে যে, কোন ফরমুলা রচনা করিয়া সেখানকার সমস্যার মীমাংসা করা চলিবে না। জাপানের পরাজয় নিকটবর্তী হওয়ায় এশিয়াখণ্ডে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহার পরে এশিয়াবাসীরা আর স্বেচ্ছায় বৈদেশিক শাসন স্বীকার করিয়া লইবে না। তিন বৎসর পূর্বের অপেক্ষা এখন অধিকতর শুভেচ্ছাপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে এবং অপেক্ষাকৃত সহজে ভারতের স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে। ইংরেজরা অবশ্যম্ভাবী অবস্থার নিকট কিভাবে নত হইতে হয়, তাহা জানে। ইংরেজ যদি যথা-সময়ে তেমন নতি-স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহারা এখনও ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কমন-ওয়েলথের মধ্যে রাখিতে সমর্থ হইতে পারে।"

ইংরেজরা অবশ্যম্ভাবী অবস্থার নিকট নতি স্বীকার করিতে জানে, 'নিউইয়র্ক টাইমসের' এই মন্তব্যের আমরা প্রতিবাদ করিব না; অবস্থা যদি তাহাদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টি করিবার মত হয়, তবে সেক্ষেত্রে তাহারা নতি স্বীকার করে ইহা সত্য, আমেরিকা এবং আয়র্লণ্ডই তাহার প্রমাণ; কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যাপারে যথাসময়ে তেমন নতি স্বীকার করিবার মত মতি যে অহাদের হইবে—এমন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। তাহারা এখনও ভবিষ্যত বরাতের প্রতিশ্রুতি দিয়াই ভারতের সমস্যাকে চাপা দিতে চায়। ব্রহ্মের ব্যাপারেই আমরা সে পরিচয় পাইয়াছি। সেদিন ব্রহ্ম সম্পর্কে ব্রিটিশের বর্তমান নীতির সাফাই গাহিয়া ভূতপূর্ব সহকারী ভারত সচিব এবং শ্রমিক দলের অন্যতম প্রধান পুরুষ লর্ড লিস্টোয়েল বলিয়াছেন,—

"গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবসমূহ এখানে এবং বিদেশে পুরাপুরি সাদরে গৃহীত হইবে না। যদি দায়িত্বহীন সমালোচনার ফলে ব্রহ্মবাসীরা ইহার প্রতিরোধে প্রবৃত্ত হয় কিংবা নিষ্ক্রিয় অসহযোগ অবলম্বন করিতে প্ররোচিত হয়, তবে শাসন পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবসমূহ সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ ভ্রান্তধারণাপ্রসূত। ব্রহ্মবাসীদের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য আমাদিগকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে যে, আমরা যখন সত্বর স্বায়ত্তশাসন দিবার কথা বলি, তখন আমরা যথার্থই অকপটভাবে তাহা বলিয়া থাকি।"

লর্ড লিস্টোয়েলকে ধন্যবাদ। ব্রিটিশ শ্রমিক দলের স্বরূপ তিনি উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশের প্রতিশ্রুতিতে ব্রহ্ম বা ভারতবাসীরা বিশ্বাস করিবে, শুধু কি তাঁহার মত সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থপোষণকারী শোষণপ্রয়াসী শ্রমিক নেতাদের সুপারিশের জোরে? নিজেদের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করাইবার মত কোন কাজ ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ এ পর্যন্ত করিয়াছেন কি? ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড লিটনের সার্টিফিকেট এ ক্ষেত্রে রহিয়াছে। তিনি তাঁহার ডেসপাচে একথা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যত প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, তাহার কোনটিই রক্ষিত হয় নাই। লর্ড লিটনের এই উক্তির পর টেমস নদী দিয়া অনেক জল বহিয়া গেলেও সাম্রাজ্য-স্বার্থরক্ষায় ইংলণ্ডের বিভিন্ন দলের মনোভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নাই।

দেশের লোককে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দানে ব্রিটিশ সরকারের কিরূপ আগ্রহ তাঁহাদের প্রভাবাধীন বাঙলা সরকারের দিকে তাকাইলেই তাহার পরিচয় পাইবেন। গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার কর্পোরেশনের সভায় প্রকাশ পায় যে, ৩০শে মে তারিখ কর্পোরেশন বাঙলা সরকারের নিকট হইতে এই নির্দেশ পান যে, শহরের জল সরবরাহের সময় কমাইতে হইবে; সাড়ে আট ঘণ্টার

পরিবর্তে ৬ ঘণ্টার বেশী শহরে জল সরবরাহ করা চলিবে না; বাড়ি বাড়ি জল মাপিবার মিটার হইবে। জলের সরবরাহের নূতন ব্যবস্থা মঞ্জুর করিবার ভার কর্পোরেশনের হাতে রাখা হইবে না; এ সম্বন্ধে সব কর্তৃত্ব অতঃপর বাঙলা সরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের চীফ ইঞ্জিনীয়ারের হাতে গেল। সদাশয় গভর্নমেণ্ট; তাঁহাদের শুভ ইচ্ছার গতি বা রীতি আমরা না বুঝিলেও আপত্তি করিবার উপায় নাই। সুতরাং 'তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ' এই বলিয়া দারুণ গ্রীষ্মে জলাভাবের বিষম আশঙ্কায় দীর্ণকণ্ঠ অবস্থায় কোনরূপে নিজেরা ধন্য হইতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু ২৫শে জ্যৈষ্ঠ সংবাদপত্রে সরকারী নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে দেখা গেল,—

"৬ই জুন পূর্বাহ্নে কর্পোরেশনের জলের কলের ইঞ্জিনীয়ার বাঙলা গভর্নমেণ্টের কলিকাতা শহরের জল সরবরাহ সম্পর্কিত আদেশের ফলে যে সমস্ত অসুবিধার উদ্ভব হইবে, তৎসমুদয়, বিশেষত বর্তমান সময়ে মিটার বসাইবার ব্যয়ের বিষয় গভর্নমেণ্টের স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট বিবৃত করেন। তাঁহার সুপারিশ গ্রহণ করিয়া গভর্নমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশন এবং মফঃস্বলের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহ সম্পর্কিত আদেশ প্রত্যাহার করিয়াছেন।"

গভর্নমেণ্টের সদাশয়তা এবং সুবিচার সম্বন্ধে আমাদের আস্থা আরও সুদৃঢ় হইল এবং আমরা বুঝিলাম, পূর্বের আদেশ যদি তাঁহারা না দিতেন, তবে আমাদের ভাগ্যে তাঁহাদের সদাশয়তা উপলব্ধি করিবার এমন সুবিধা হইত না। নিজেরা যে এমন শাসকদের আশ্রয়ে আছি, ইহা ভাবিয়া কৃতার্থ বোধ করিলাম; কিন্তু পরদিন, অর্থাৎ ২৬শে জ্যৈষ্ঠের সংবাদপত্র খুলিয়া দেখা গেল,—

"শুক্রবার বাঙলা গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে বলা হইয়াছে—কোন অবস্থায় বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে না জানাইয়া এবং স্থায়ী আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে বাঙলা সরকারের দপ্তর হইতে দুই বৎসর পূর্বের কোন প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতরক্ষা বিধি অনুযায়ী এক আদেশ প্রদত্ত ও জারী হইয়াছিল, তৎসম্পর্কে তদন্তের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। পূর্বোক্ত আদেশ জল সরবরাহ সম্পর্কিত; পরে তাহা বাতিল করা হইয়াছে।"

শুনিতেছি, দুই বৎসর আগে জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় বাঙলা সরকার জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটি আদেশপত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সেই নথি হইতে তাহা ক্রমক্রমে কর্পোরেশনের অফিসে চালান হইয়া গিয়াছে। শাসন বিভাগীয় যোগ্যতার পরিচয় সন্দেহ নাই। বাঙলা সরকারের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা সম্পর্কেও এই যোগ্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটি সংবাদে প্রকাশ,—

"ভারতের অনেক প্রদেশই তাহাদের যুদ্ধোত্তর সংগঠনের পরিকল্পনা কয়েক মাস পূর্বেই ভারত সরকারের নিকট পাঠাইয়াছে; কিন্তু বাঙলা সরকারের সে পরিকল্পনা এ পর্যন্ত প্রস্তুতই হয় নাই। বিগত মন্ত্রিসভার অনুরোধক্রমে ভারত সরকার বাঙলা হইতে ঐ পরিকল্পনা পেশ করিবার সময়ের মেয়াদ গত এপ্রিল মাসের শেষ পর্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর বাঙলা সরকার পুনরায় অনুরোধ করতে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেও যে উক্ত পরিকল্পনা পেশ করা সম্ভব হইবে, তাহা মনে হয় না। বিলম্ব ঘটিবার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ শোনা যায় যে, প্রথমত অভিজ্ঞ কর্মচারীর অভাব, দ্বিতীয়ত মন্ত্রিমণ্ডলের পতন ঘটাতে কাজকর্ম বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে।"

এরূপ অবস্থায় কাপড় নাই, কয়লা নাই, মাছ নাই, দুধ নাই, এসব কথা তুলিয়া আর লাভ কি? সংবাদপত্রে প্রতিদিন দফায় দফায় আমাদের স্বার্থের জন্য সরকার পক্ষের বিবৃতি পাঠ করিবার সৌভাগ্য যে আমাদের হইতেছে, সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকাই কর্তব্য।

বাঙলার সমস্যার স্বরূপ

গত ৯ই জুন বরিশাল জেলা হিন্দু মহাসভা সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ওজস্বিনী ভাষায় বাঙলা দেশের শাসন ব্যাপারে এই অ-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন—

"মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের ফলে বাঙলাদেশ বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে। আমরা গভর্নমেণ্ট, বিশেষভাবে নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিমণ্ডলকে আক্রমণ করিয়া দুর্ভিক্ষের সময় বিপুল লোকক্ষয় এবং সম্পত্তিনাশের সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ করিয়াছিলাম, উডহেড কমিশনের সিদ্ধান্তে প্রধানত তাহা সমর্থিত হইয়াছে। আমাদের দেশ যদি স্বাধীন দেশ হইত, তবে উডহেড কমিটির রিপোর্টের ফলে অপরাধী কর্মচারীদের প্রকাশ্য আদালতে বিচারার্থ উপস্থিত করা হইত—ভারতসচিবও নিস্তার পাইতেন না। লীগ মন্ত্রিমণ্ডল বিতাড়িত হইয়াছে; কিন্তু মিঃ কেসী নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বনে অস্বীকৃত হইয়াছেন; তিনি ৯৩ ধারা প্রয়োগ করিয়া শাসনভার নিজের হাতে লইয়াছেন। ৯৩ ধারার আমলে গত কয়েক মাসে আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই বিধানের আবরণে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলের শাসনই অন্য আকারে চলিতেছে। বস্ত্র-দুর্ভিক্ষ সরকারী অব্যবস্থার চূড়ান্ত প্রমাণ। যে অবস্থায় পড়িয়া বাঙলার কতকগুলি মিল বন্ধ হইয়াছে, তাহাতে বর্তমান গভর্নমেণ্টের যোগ্যতা সম্বন্ধে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে। বাঙলার মিলগুলি এইভাবে কেন বন্ধ হইল, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার আমাদের আছে। ভারতে বস্ত্রোৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য মিলগুলিতে যাহাতে তিন সিফট্ কাজ চলে, তাহা করা হইল না কেন? বস্তুত ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের বাজারে বিদেশী বস্ত্রের কারবার ফাঁপাইয়া তুলিবার জন্য এবং দেশীয় শিল্প-ব্যবসায় নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কৃত্রিমভাবে বস্ত্রের এই দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা হইতেছে। যুদ্ধের সময় বাঙলাদেশে যে সব ছোট ছোট [illegible] গভর্নমেণ্টের ঔদাসীন্য এবং বিদেশীর আসন্ন প্রতিযোগিতায় পড়িয়া সেইগুলি নষ্ট হইবার আশঙ্কা ঘটিয়াছে।

ভারতীয় শিল্পপতিদের অবস্থা

ভারতীয় শিল্পপতিদের মুখপাত্রস্বরূপে শ্রীযুত ঘনশ্যাম দাস বিড়লা সেদিন ম্যাঞ্চেস্টারের বক্তৃতায় গর্ব করিয়া বলিয়াছেন,—

"আমরা ব্রিটিশ কিংবা মার্কিন ব্যবসায়ীদের নাম-জাকানো এজেণ্ট হইতে চাই না। আমরা ব্রিটিশ এবং মার্কিন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গৌরব-জনক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতেই চাই। ইহা নিশ্চয়ই নিন্দনীয় কিছু নয়। ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও আমাদের চেষ্টায় ভারতবর্ষ বস্ত্র-শিল্পে স্বাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছে। সেইরূপ জাভার চিনি ভারতের বাজার হইতে বিতাড়িত হইয়াছে এবং ইহার ফলে ভারতের লোকের লাখ লাখ টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে; সিমেণ্ট, লোহা এবং ইস্পাতের সম্বন্ধে ঐ কথা বলা চলে। ব্রিটিশ এবং মার্কিনদের এজেণ্ট হওয়ার অর্থ আমাদেরই নিজের হাতে আমাদের গলা কাটা। আমরা তাহাই করিতে চাইব, এতটা বোকা নই।"

শ্রীযুত বিড়লার কথাগুলিও মন্দ নয়; কিন্তু শাসনতন্ত্র দেশের লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলে, দুই একজন বা দুই-একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উন্নতি ঘটিলেও সমগ্রভাবে জনসাধারণের অভ্যুন্নতি ঘটিতে পারে না। শাসন-ব্যবস্থাগত দুর্নীতি জনগণের দুর্গতিকে দৃঢ় করিয়া তোলে। সুতরাং শাসন ব্যাপারে জনগণের কর্তৃত্বই প্রথমে প্রয়োজন। বাঙলার বর্তমান দুর্দশার আলোচনা প্রসঙ্গে সেদিন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি-রূপে শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু মহাশয়ও তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

"অন্নের দুর্ভিক্ষের ক্ষেত্রে শাসন-ব্যবস্থায় আমরা যেরূপ কেলেঙ্কারির পরিচয় পাইয়াছি, সাম্প্রতিক বস্ত্র-দুর্ভিক্ষেও তাহাই দেখা যাইতেছে। রোল্যান্ডস্ কমিটির রিপোর্টে শাসন বিভাগীয় এই অযোগ্যতার সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। বর্তমানে মন্ত্রীদের উপর আর দোষ চাপাইবার উপায় নাই; গত ৯ সপ্তাহ হইল মিঃ কেসি নিজের হাতে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন। সুতরাং অসংশয়িত-ভাবে এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যেই একান্ত-ভাবে এই অযোগ্যতার মূল কারণ রহিয়াছে; প্রকৃতপক্ষে আমলাতন্ত্রের দ্বারাই দেশের শাসন-কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই আমলাতান্ত্রিক প্রভুত্ব অপসারিত করিতেই হইবে এবং তৎপরিবর্তে জনগণের নিকট প্রকৃতভাবে দায়িত্বসম্পন্ন এবং জনগণের সমর্থনে আগ্রহ-পরায়ণ শাসনপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"

ভ্রম-সংশোধন

দেশ, ২৬ জ্যৈষ্ঠ, "দেশের কথা", ১ম কলম ২৪ ছত্র অশুদ্ধ—মা হন; শুদ্ধ—হন।

খেলাধুলা

ফুটবল

আন্তঃপ্রাদেশিক সন্তোষ মেমোরিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতা অক্টোবর মাসে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রায় সকল প্রাদেশিক ফুটবল এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ এই প্রতিযোগিতায় নিজ নিজ প্রদেশের সুনাম বৃদ্ধি করিবার জন্য এখন হইতেই আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত আছেন। কেবল বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণ সম্পূর্ণভাবে নীরব আছেন। ইহাদের এই নীরবতার অর্থ বুঝা ভার। গত বৎসরের পরাজয়ের গ্লানি এত শীঘ্র যে কিরূপে ইহাদের মন হইতে মুছিয়া গেল, কল্পনা করা যায় না। কবে ইহাদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতার জন্য আলাপ আলোচনা আরম্ভ হইবে কেহই বলিতে পারে না। তবে শীঘ্র আরম্ভ হইলেই মঙ্গল। কারণ বাঙলার প্রতিনিধি করিয়া যে দল গঠিত হইবে সেই দলের খেলোয়াড়গণ বিভিন্ন অনুশীলন খেলায় যোগদান করিয়া নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া লইতে পারেন। ঠিক বোম্বাই যাত্রার পূর্বে যদি দল গঠিত হয়, খেলোয়াড়গণ এই অনুশীলনের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবেন। দল তাহাতে ভাল হইতে পারে না।

বাঙলার দল কোন্ কোন্ খেলোয়াড়গণকে লইয়া গঠন করিলে বেশ শক্তিশালী দল হইবে সেই সম্পর্কে যদি আমরা কিছু উল্লেখ করি, তাহা পরিচালকগণ যে গ্রহণ করিবেনই এইরূপ আশা আমরা করি না। তবে আমাদের মতে যে দল হওয়া উচিত, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ—গোলরক্ষক—ডি সেন, ব্যাকদ্বয়—তাজমহম্মদ ও পি চক্রবর্তী, হাফ ব্যাকত্রয়—কাইজার, টি আও ও মহাবীর। ফরওয়ার্ডগণ—রবি দাস, আপ্পা রাও, পাগসলী, অমল মজুমদার ও সেকেন্দার। অতিরিক্ত—শরৎ দাস (ব্যাক), ইসমাইল (গোল), ডি চন্দ (হাফ) বচী (ফরওয়ার্ড)।

সন্তরণ

বেঙ্গল এ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের নবগঠিত পরিচালকগণের কর্মপদ্ধতি খুব সুচিন্তিত না হইলেও ইহাদের কর্ম ব্যবস্থা সাধারণ সাঁতারুগণকে সাঁতারের বিভিন্ন বিভাগে উন্নতি করিবার জন্য যে উৎসাহিত করিয়াছে, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ওয়াটারপোলো খেলায় গত কয়েক বৎসর সাধারণ সাঁতারুগণ যোগদান করিতেন না। কিন্তু এই বৎসর সেই অবস্থা আর নাই। বিশিষ্ট সন্তরণ ক্লাবসমূহ অনায়াসে দুইটি তিনটি করিয়া দল গঠন করিবার মত খেলোয়াড় পাইতেছেন। এমন কি প্রথম শ্রেণীর খেলায় যাহাতে যোগদান করিতে পারেন, তাহার জন্য উৎসাহী সাঁতারুগণকে নিয়মিতভাবে অনুশীলন করিতে দেখা যাইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে বাঙলার ওয়াটারপোলো খেলোয়াড়ের কোনরূপ অভাব হইবে না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বাঙলার বিভিন্ন জেলায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সন্তরণ কৌশলের অধিকারী সাঁতারুর যাহাতে অভাব বিদূরিত হয়, তাহার জন্য বেঙ্গল এ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ বিভিন্ন জেলার উৎসাহী সাঁতারুগণকে কৌশল শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিভিন্ন জেলার উৎসাহী সাঁতারুগণ এই সুযোগ নিশ্চয় হেলায় নষ্ট করিবেন না।

মুষ্টিযুদ্ধ

বাঙলায় মুষ্টিযুদ্ধ পরিচালনা লইয়া বেঙ্গল এ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন ও বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বর্তমান আছে, তাহার অবসানের জন্য সম্প্রতি যে প্রচেষ্টা হইয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে শুনিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।



উৎসাহী বালিকা এ্যাথলিট কুমারী চিত্রা সেন

বাঙলার উৎসাহী মুষ্টিযোদ্ধাগণের চরম উন্নতি যদি প্রকৃতই আমাদের কাম্য হয়, তবে এই দ্বন্দ্বের অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আমরা আশা করি উভয় দলের মুষ্টিযোদ্ধাগণ ইহার জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করিবেন। তাঁহাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে না ইহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি।

এ্যাথলেটিকস্

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন একটি গুরুদায়িত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যাঁহারা জড়িত তাঁহাদের সকলেই দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সম্প্রতি উক্ত এসোসিয়েশনের সাধারণ বার্ষিক সভার পরিণতি দেখিয়া সন্দেহ হয় কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোক আছেন কি না? যদি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা এসোসিয়েশনের কার্যকলাপে বিশেষ দৃষ্টি দেন না, ইহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তবে এইভাবে একটি এসোসিয়েশন যদি পরিচালিত হয়, তবে এই এসোসিয়েশনের অধীনে যাহারা বর্তমান তাহাদের ভবিষ্যৎ যে কিরূপ উজ্জ্বল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বাঙলার এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের ষ্ট্যাণ্ডার্ড খুবই নৈরাশ্যজনক। বিশেষ করিয়া গত কয়েক বৎসর ইহার ষ্ট্যাণ্ডার্ড এত নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে যে, ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের এ্যাথলিটগণ অনায়াসে স্পোর্টসের বিভিন্ন বিভাগে বাঙলার এ্যাথলিটগণকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইতেছেন। ইহা খুব গৌরবের বিষয় নহে।

গত বৎসর বিশিষ্ট এ্যাথলিটগণ একত্র হইয়া 'এ্যাথলিটস ইউনিয়ন' গঠন করিলে আশা হইয়াছিল, স্পোর্টসের উন্নতির একটা নূতন পথ রচিত হইবে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সেই আশা ত্যাগ করিতে হইতেছে।

ব্যাডমিন্টন

ব্যাডমিন্টন খেলায় বাঙলা প্রদেশ এখনও পর্যন্ত ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। ইহা সম্ভব করিবার জন্য বেঙ্গল ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ আচ্ছাদিত কোর্টের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং আশা হইয়াছিল, শীঘ্রই বাঙলা এই খেলায় ভারতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে গঠিত আচ্ছাদিত কোর্টটি তুলিয়া দিতে হইল। কিন্তু ব্যাডমিন্টন এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ ইহাতে হতাশ হন নাই। পুনরায় একটি নূতনভাবে আচ্ছাদিত কোর্ট নির্মাণের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ইঁহাদের প্রচেষ্টায় দেশবাসী সাহায্য করুন, ইঁহারা সাফল্যমণ্ডিত হউন, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

উৎসাহী বালিকা এ্যাথলিট

শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সভ্যা কুমারী চিত্রা সেন গত কয়েক বৎসর হইতে স্পোর্টসের বিভিন্ন বিষয়ে সাফল্যলাভ করিতেছে। সম্প্রতি কুমারী সেন সাইকেল চালনা শিক্ষা করিয়াছে। তাহার প্রচেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতা থাকায় কয়েকটি অনুষ্ঠানে এই বিষয় পুরস্কার লাভে সমর্থা হইয়াছে। আমরা তাহার উন্নতি কামনা করি।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৯শে আগস্ট—বোম্বাইয়ের প্যারামাউণ্ট পিকচার্স লিমিটেড গৃহ এক ধ্বংসাত্মক অগ্নিকাণ্ডের ফলে সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়াছে এবং বহু লোকের প্রাণহানি ঘটিয়াছে।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি উক্ত কমিটির অন্তর্ভুক্ত কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

নয়াদিল্লীর গান্ধীচকে এক বিরাট জনসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন, ১৯৪২ সালে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার সকল দায়িত্ব আমি লইতে রাজী আছি, কারণ দেশের যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থা সৃষ্টির জন্য দায়ী আমিই।

একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, স্যার ফিরোজ খাঁ নূতন বড়লাটকে জানাইয়াছেন যে, তিনি আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে শাসন পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে চাহেন, কারণ তিনি দলগত রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিতে চাহেন। বড়লাট তাহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

গান্ধীজী একটি প্রবন্ধে বলেন, 'জনসাধারণ যদি মুদ্রার বদলে সূতা দ্বারা ক্রয়বিক্রয়ের এবং সূতা সংগ্রহের পরিকল্পনা পছন্দ করে, তবে সূতার সাহায্যে কোটি কোটি টাকা মূল্যের মাল সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে।' অর্থ বলিতে কায়িক শ্রমকেই বুঝাইবে এবং ইহা দ্বারা পুঁজিপতিদের সহিত অনায়াসেই প্রতিযোগিতা করা যাইবে।'

বিহারের গভর্নর বিহার ব্যবস্থা পরিষদ বাতিল করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন, সাধারণ নির্বাচনের জন্যই নাকি এরূপ করা হইয়াছে।

ফরিদপুর অসামরিক বিভাগ হইতে জনসাধারণকে তিন হাজার মণ পচা আটা বিনা মূল্যে লইবার জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে।

৩০শে আগস্ট—ডায়মণ্ডহারবারের ২৯শে আগস্টের সংবাদে প্রকাশ, গত ৫ই আগস্ট রবিবার বৈকালে কতিপয় মহিলা ডায়মণ্ডহারবার পুলিশ স্টেশনের সম্মুখবর্তী রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দুইজন নৌ সৈন্য উন্মত্তাবস্থায় মহিলাদ্বয়কে আক্রমণ করে ও তাহাদের উপর পাশবিক অত্যাচারের উপক্রম করে। পুলিশ ও জনসাধারণের চেষ্টায় পরে মহিলাদ্বয় রক্ষা পান।

কুচবিহারে সৈন্যদল কর্তৃক ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের প্রতি মারপিট সম্পর্কে চারিজন অফিসার ও শতাধিক সৈন্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া হাউস হোল্ড মিনিষ্টার জানাইয়াছেন। সৈন্যদলের এই আক্রমণে প্রায় ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন।

৩১শে আগস্ট—বোম্বাইএর শ্রমিক অঞ্চলে এক জনসভায় মারামারির ফলে প্রায় ৫০জন আহত হইয়াছে। ইহাদের ২০জনকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে পাঠান হয়। সভায় শ্রীযুত শঙ্কররাও দেও বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তথাকথিত তিন প্রধানের দ্বারা পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়— শুধু মহাত্মা গান্ধীর দ্বারাই তাহা সম্ভব। ভারতের স্বাধীনতা লাভে স্ট্যালিন সাহায্য করিতে পারেন বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করেন, শ্রীযুত দেও তাহাদের সমালোচনা করিলে তুমুল গোলযোগ ও মারামারি শুরু হয়।

কলিকাতায় চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডবলিউ জে পামার আই সি এস দুইজন সৈন্য কর্তৃক বিশেষভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

২রা সেপ্টেম্বর—প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দত্তের নিকট এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, তিনি বাঙলায় বন্ধুদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে উৎসুক। তবে, কখন্ তিনি এ প্রদেশে আসিতে পারিবেন, সে সম্বন্ধে কিছু স্থির করেন নাই।

৩রা সেপ্টেম্বর—কমিউনিস্টগণ ১৯৪২ সালের পর কংগ্রেসের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়াছেন, যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কাউন্সিলের আগামী অধিবেশনে তাঁহাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিষয়ই প্রধান আলোচনার বিষয় হইবে।

গতকল্য 'পিপলস্ ওয়ার'এর মারাঠী সংস্করণ 'লোকযুদ্ধ' বিক্রয়কালে বোম্বাইয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ২০জন কমিউনিস্ট প্রহৃত হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের ব্যবস্থা পরিষদ গভর্নর কর্তৃক ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গেল।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—এরূপ জানা গিয়াছে যে, ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর লোকজনদিগকে সাদা, ধূসর ও কাল এই তিনভাগে ভাগ করা হইবে—যাহারা মিত্রপক্ষের সৈন্যদিগকে সাহায্য করিয়াছে তাহারা শাদা, যাহারা চাপে পড়িয়া জাপানীদের পক্ষে গিয়াছে তাহারা ধূসর এবং যাহারা স্বেচ্ছায় শত্রুপক্ষকে সাহায্য করিয়াছে তাহারা কাল। প্রকাশ, ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীর যে সকল সৈন্য ও অফিসার ঘৃণিত অপরাধ করিয়াছে, তাহাদের বিচারের জন্য সামরিক আদালতও গঠন করা হইবে।

গত ৩ বৎসর গভর্নমেণ্টের অধিকারের রাখার পর অদ্য বার্দোলী স্বরাজ আশ্রম ইহার ট্রাস্টিগণের নিকট প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।

কাণপুরের নিকটে একটি বিমান ভাঙ্গিয়া পড়ায় একজন লোক নিহত ও একটি কুটীর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ২রা সেপ্টেম্বর এই দুর্ঘটনা ঘটে।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে আগস্ট—মার্কিন প্রতিনিধি সভার সদস্য হমাতুয়েন শেলারে তাহার প্রশ্নের যে উত্তর মহাত্মা গান্ধী দিয়াছেন, তদুত্তরে বলিয়াছেন, 'আমার বিশ্বাস গান্ধীজী এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, বৃটিশ প্রচারক দিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে সব বিবৃতি দেন, সেগুলি সম্পর্কে আমাদের সচেতনও থাকা উচিত। আমার বিশ্বাস, বৃটেন প্রতি বৎসর এখানে দেড় কোটি করিয়া ডলার ব্যয় করিতেছেন, তাহার আসল উদ্দেশ্য হইল সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করা এবং যাহাতে ভারতকে সাহায্য না করা হয়, তাহার চেষ্টা করা। গান্ধীজীর কথাই ঠিক।'

৩০শে আগস্ট—অদ্য প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সম্মিলিত জাতিসমূহের যে চার হাজার দুইশত কোটি ডলার ঋণ আছে, তাহা পরিশোধ করিবার চেষ্টা করিলে একটা অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হইবে এবং উহার ফলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইতে পারে।

রকেটযোগে যন্ত্র পরিচালনা বিষয়ে অগ্রণী মার্কিন বিজ্ঞানী ডাঃ রবার্ট গডার্ড ৬২ বৎসর বয়সে বাল্টিমোর বিশ্ববিদ্যালয়ে মারা গিয়াছেন।

৩১শে আগস্ট—মিত্রপক্ষের বোমাবর্ষণের ফলে জাপ রাজধানীর ১৩ লক্ষাধিক ঘরবাড়ি বিনষ্ট হইয়াছে। ৬ লক্ষ ৮০ হাজার লোক হতাহত হইয়াছে। মোট ৯২ লক্ষ লোক বোমাঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

১লা সেপ্টেম্বর—হামবুর্গ অঞ্চলে জার্মান গুপ্ত আন্দোলন সম্পর্কে ১০০জনকে গ্রেফ্তার করা হইয়াছে। গতকল্য ফিল্ড মার্শাল ফন ব্রাউশিচ্ ও ফিল্ড মার্শাল মানস্টাইনকে গ্রেফ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের গ্রেপ্তারের সহিত উক্ত আন্দোলনের সম্পর্ক আছে বলিয়া বেসরকারী মহলের বিশ্বাস।

২রা সেপ্টেম্বর—অদ্য টোকিও টাইম ১০-৩০ মিনিটে মার্কিন ব্যাটেলশিপ 'মিসৌরী'তে বসিয়া জাপানের আত্মসমর্পণ পত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

৩রা সেপ্টেম্বর—জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক ও চীন কমিউনিস্ট নেতা মাও সে তুংএর মধ্যে অদ্য এক সাময়িক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর—বার্মিংহামে ভারতীয় মুসলমানগণ ও তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গ এক সভায় সমবেত হইয়া শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর অকালমৃত্যুতে শোকপ্রকাশপূর্বক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

ফরাসী ইন্দোচীনে সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় দশজন ফরাসী নিহত হইয়াছে।

জেঃ চিয়াংকাইশেক চীনের কমিউনিষ্ট নেতা জেঃ মাও সে চুং-এর সহিত সাময়িকভাবে একটি চুক্তি বিধান করিয়াছেন এবং চীনে একদলীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান ও পাশ্চাত্য রীতিতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ৫ই আশ্বিন, ১৩৫২ সাল। Saturday 22nd September, 1945. [৪৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের সংগ্রাম

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বোম্বাই অধিবেশন ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই অধিবেশনে কংগ্রেস দৃঢ়তার সঙ্গে আগস্ট প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে. কংগ্রেস শাসকবৃন্দকে অভ্রান্ত ভাষায় জানাইয়া দিয়াছে যে, বিদেশীর প্রভুত্ব দেশবাসী আর কোন ক্রমেই মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে; ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যখন এখন পর্যন্ত সোজাসুজি ভারতের স্বাধীনতার দাবী মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহে. তখন তাহাদের সঙ্গে কোনরূপে মীমাংসায় পৌঁছাও সম্ভব নয়। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত এই প্রস্তাব শাসক সম্প্রদায়ের মর্মপীড়ার সঞ্চার করিবে, ইহা আমরা জানি; কারণ আগস্ট প্রস্তাবের মূলীভূত ভারত ত্যাগের দাবীকে তাহারা বিদ্রোহাত্মক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন এবং প্রধানত এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হওয়ার জন্যই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের দাবীর ভিতর তাঁহারা বিদ্রোহ বা বিপ্লবের যেরূপ আভাসই লাভ করুন এবং তাহাকে যেরূপ ব্যাখ্যানই দান করুন না কেন, ভারতবর্ষ পরাধীনতা আর স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে দুঃখ কষ্ট এবং ত্যাগকে বরণ করিয়া লইতে হইবে. ভারতবাসীরা ইহা জানে। গত তিন বৎসরের দমননীতি হইতে তাহারা তাহা বুঝিয়া লইয়াছে এবং শাসকদের নির্মম পীড়ন বুক পাতিয়া লইয়া স্বাধীনতা লাভে তাহাদের দুর্জয় সংকল্পের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। আমরা স্বাধীনতাকে মানুষের জন্মগত অধিকার বলিয়া মনে করি এবং আমাদের বিশ্বাস এই যে, মানবের সেই মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে পশুবলে বাধা দিতে গেলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবেই এবং সেই প্রতিক্রিয়া যদি বিদ্রোহ বা বিপ্লবের আকার ধারণ করে সেজন্য যাহারা মানুষের ন্যায্য অধিকারকে পিষ্ট করিতে যায় তাহারাই দায়ী। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এই চিরন্তন সত্য শাসকবর্গকে শুনাইয়া দিয়াছেন এবং যাঁহারা শাসকবর্গের দেশব্যাপী নিপীড়নকে বীরত্বের সহিত প্রতিরোধ করিয়া সেই পথে মানব মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেহ কেহ মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করিয়া লইয়াছেন. ভারতের সেই সুসন্তানগণের স্মৃতির উদ্দেশে ওয়ার্কিং কমিটি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। আগস্ট প্রস্তাব পরিগৃহীত হইবার পর কয়েক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে এবং চার্চিল গভর্নমেণ্টের পতন ঘটিয়াছে। ইংলণ্ডে এখন শ্রমিক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্বেই বহুবার একথা বলিয়াছি. বিলাতের এই শ্রমিক গভর্নমেণ্টের প্রতিও আমরা কিছুমাত্র আস্থা পোষণ করি না। আমাদের মতে ব্রিটিশ সংরক্ষণশীল দল এবং শ্রমিক দলের মধ্যে ভারত সম্পর্কিত নীতি সম্পর্কে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই। ওয়ার্কিং কমিটি আমাদের এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছেন যে, ব্রিটিশ শ্রমিক দল মুখে ভারতের জন্য যেরূপ সদিচ্ছাই ব্যক্ত করুন না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবাসীদের হাতে দেশের শাসনাধিকার ছাড়িয়া দিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই। তাঁহারা কূটতর কৌশল প্রয়োগ করিয়া ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্যই চেষ্টা করিতেছেন এবং শাসনসূত্রে ভারত শোষণের পথ প্রশস্ত করিয়া ব্রিটেনের আর্থিক সমস্যার সমাধানের ফিকিরেই আছেন। এই প্রসঙ্গে ওয়াভেল প্রস্তাবের কথা স্বভাবতই মনে পড়িবে। আমরা পূর্বেই এ কথা বলিয়াছি যে, দেশবাসীর হাতে কিছু ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবার সত্যই যদি তেমন অভিপ্রায় ওয়াভেল প্রস্তাবের মূলে থাকিত. তবে সিমলার বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইত না। এই সম্পর্কে মিঃ জিন্নার আপত্তির যুক্তি উত্থাপন করা নিতান্তই বোকা বুঝাইবার ছল মাত্র। এরূপ অবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটি ভারতবাসীকে স্বাধীনতা দান করিবার জন্য গভর্নমেণ্টের অভিপ্রায় নাই বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপেই সমীচীন হইয়াছে।

ব্রিটিশ নীতির চক্র

লর্ড ওয়াভেল ভারতের শাসন ভার পুনরায় স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বিলাত হইতে আমাদের জন্য নূতন কি সওদা লইয়া আসিয়াছেন, এখন জানা গেল কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি তাহা জানিবার জন্য আমাদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না। অবস্থা দৃষ্টে আমরা স্বচ্ছন্দেই এই অনুমান করিয়াছিলাম যে, ভারতের দাবী তাঁহার প্রস্তাবে মিটিবে না এবং বিলাতের আবহাওয়াও তদনুকূল নহে। প্রধানমন্ত্রী এটলী আর নূতন কথা কি বলিবেন? —শুধু কথার ধোকাবাজী মাত্র। যদি ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান করিবার ইচ্ছাই তাঁহাদের থাকিত তবে জনমতানুকূল নীতির দিকে ভারতের শাসননীতি ইহার মধ্যেই অন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত; কিন্তু তেমন কোন লক্ষণই দেখিতেছি না। অনেকেই এই আশা

অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন যে, শ্রমিক গভর্নমেণ্ট ভারতের রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দান করিবেন। রাজনীতিক বন্দীদের কাহাকে কাহাকেও মুক্তি দান করা হইয়াছে, ইহা সত্য, কিন্তু এখনও বহু সংখ্যক রাজনীতিক বন্দী ভারতের বিভিন্ন কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছেন। আমরা একথা বহু পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিনা বিচারে বন্দী, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বন্দী, রাজনীতিক বন্দীদের মধ্যে আমরা এইরূপ শ্রেণীবিভেদ স্বীকার করি না। শুধু তাহাই নয়, হিংস বা অহিংস বন্দীদের মধ্যে এরূপ বৈষম্যও আমরা বর্তমান ক্ষেত্রে অনাবশ্যক মনে করি। যাঁহারা রাজনীতিক বন্দী তাঁহারা সকলেই দেশপ্রেমিক এবং দেশের স্বাধীনতাই তাঁহাদের কার্যের স্থলে প্রেরণাস্বরূপে বিদ্যমান ছিল; দেশের স্বাধীনতা সম্পর্কিত বৃহত্তর প্রশ্নের ক্ষেত্রে রাজনীতিক বন্দীদের সেই মুখ্য প্রেরণাই বিবেচ্য বিষয় হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদান করাই যদি বর্তমান ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য হয়, তবে রাজনীতিক বন্দীদের সকলকেই মুক্তি দান করিতে হইবে। অথচ এখনও ভারতের বিশিষ্ট সন্তানগণ বিনা বিচারে বন্দী অবস্থায় রহিয়াছেন। ফরোয়ার্ড ব্লকের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে মুক্তিদান করা হইয়াছে; কিন্তু সর্দার শার্দুল সিং কবিশের এখনও কারারুদ্ধ আছেন। শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং রাম মনোহর লোহিয়া আজও কারারুদ্ধ। বাঙলার চট্টগ্রাম এবং মেদিনীপুরের কয়েকটি মামলায় দীর্ঘ কারাদণ্ড প্রাপ্ত দেশপ্রেমিকদিগের অনেকের দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাপি তাঁহাদিগকে মুক্তি দান করা হইতেছে না। স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, ভারতে নূতন সাধারণ নির্বাচনের পর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট অবস্থা বুঝিয়া নিজেদের সাম্রাজ্যবাদমূলক নীতির নূতন কৌশল প্রয়োগ করিবেন, এই অপেক্ষায় আছেন। কিন্তু কংগ্রেস এজন্য প্রস্তুত হইতেছে। কংগ্রেসের আহ্বানে নব জাগ্রত ভারত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সেই কূটকৌশল বিচূর্ণ করিবে; কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাছে প্রতিক্রিয়াপন্থী দল কোন ক্রমেই মাথা তুলিতে পারিবে না, আমরা একান্তভাবেই এমন আশা অন্তরে পোষণ করি।

বাঙলার খাদ্যসমস্যা

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বিগত দুর্ভিক্ষের জন্য গভর্নমেণ্টকেই দায়ী করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, দুর্ভিক্ষ মানুষেই সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মানুষ ইচ্ছা করিলেই তাহা দূর করিতে পারিত। দুর্ভিক্ষে কেবল লক্ষ লক্ষ নরনারীই প্রাণ হারায় নাই, তাহারও অধিক দুঃখের কথা এই যে, জাতির মেরুদণ্ড ভাঙিগয়া দিয়াছে। জাতির দুর্গতি আজও কাটে নাই। ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্যসচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব সম্প্রতি খাদ্য উপদেষ্টা সমিতির অধিবেশনে আমাদিগকে পুনরায় আশঙ্কার কথা শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ১৯৪৩ সালের ন্যায় অবস্থা যাহাতে সৃষ্টি না হয়, সেজন্য যথোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। স্যার জওলাপ্রসাদের মতে পশ্চিম বঙ্গ এবং ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলের শস্যের অবস্থা ভাল নয়। ভারত গভর্নমেণ্টের খাদ্যসচিবের এই উক্তি—নিতান্তই অস্পষ্ট। কারণ, তিনি কোন হিসাব উপস্থিত করেন নাই। বাঙলা গভর্নমেণ্ট কিছুদিন আগে এই সম্পর্কে একটা হিসাব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, বাঙলা দেশে আউশ শতকরা ২০ ভাগ এবং আমন শতকরা ২৫ ভাগ কম উৎপন্ন হইবে; কিন্তু এ হিসাবের উপর নির্ভর করা চলে না। বাঙলার ফসলের অবস্থা সম্বন্ধে বিলাতের 'টাইমস' পত্র সম্প্রতি যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছে, এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখযোগ্য। 'টাইমসের' মতে বাঙলায় যে পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত রহিয়াছে, তাহাতে শীতকাল পর্যন্ত ভালভাবেই কাটিবে; কিন্তু কর্তৃপক্ষের আশঙ্কানুযায়ী যদি আমন ধান সত্যই শতকরা ২৫ ভাগ কম উৎপন্ন হয়, তবে আগামী বৎসর আনুমানিক ১৫ লক্ষ টন চাউলের ঘাটতি দেখা দিবে! বাঙলা সরকারের হিসাব মত ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বাঙলায় ১৯ লক্ষ টন চাউলের ঘাটতি ছিল। আগামী বৎসর যদি ১৫ লক্ষ টন ঘাটতি দাঁড়ায়, তবে অবস্থা কিরূপ বিপদজনক আকার ধারণ করিবে, সহজে বোঝা যায়। খাদ্যশস্য-সংগ্রহ ও বণ্টনের ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া গভর্নমেণ্ট লোকের খাদ্য যোগাইবার সুব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এমন যে ব্যবস্থা সহজে উহা ছাড়া যায় না, এই ধরণের কথা আমরা প্রতিনিয়তই শাসকবর্গের মুখে শুনিতে পাইতেছি। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাঙলার মফঃস্বলের কোন কোন স্থানে চাউল মিলিতেছে না, এমন খবর প্রায় প্রত্যহই আসিতেছে। বাঁকুড়া, আরামবাগ প্রভৃতি স্থানে চাউলের অভাবে নরনারী অনশনে এবং অর্ধাশনে কষ্ট পাইতেছে। মুন্সীগঞ্জে অন্নাভাবে মৃত্যুর সংবাদ সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ আউশ ধান এখনও লোকের ঘরে কিছু কিছু আছে, তথাপি এই অবস্থা, ইহার পর সংকট কেমন আকার ধারণ করিবে, আমরা ভাবিয়া শঙ্কিত হইতেছি। মফঃস্বলের কোন কোন অঞ্চলে চাউলের দাম বেশ বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। খাদ্য শস্যের মূল্য বাঙলার দরিদ্রশ্রেণী এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে এখনও নামিয়া আসে নাই। অথচ দুর্ভিক্ষের পর বাঙলায় অন্নের প্রাচুর্য ঘটিয়াছে সরকারী সূত্রে একথা বহু প্রচারিত হইয়াছে। দেশবাসীর স্বার্থ সম্পর্কে অনবহিত শাসননীতিরই এই সব ফল এবং পরাধীন দুর্বল দেশেই এই ধরণের দায়িত্বহীনতা প্রশ্রয় পায় এবং মানুষের জীবনমরণের সমস্যাকে স্বচ্ছন্দে উপেক্ষা করিয়া শাসকদের স্পর্ধিত মিথ্যাময় কৃতিত্ব বিঘোষিত হয়।

যুদ্ধের পর বিচার

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে জাপানে গ্রেপ্তার করিয়া মার্কিন সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে এবং যুদ্ধাপরাধী স্বরূপে তাঁহার বিচার করা হইবে, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র প্রতাপ বহুদিন হইল প্রবাসে নির্বাসিতের জীবন যাপন করিতেছিলেন, তাঁহার অপরাধ কি, আমরা অবগত নহি। একখানা মার্কিন সংবাদপত্রে এই সম্পর্কে এই মর্মে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে যে, তাঁহার উপর বৃটিশ গভর্নমেণ্টের আক্রোশ আছে, গ্রেপ্তারের মূলে সেই আক্রোশই কাজ করিয়াছে। এ ব্যাপারে আমাদের মনে এই প্রশ্ন উঠে যে, পরাজিত পক্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই শুধু যুদ্ধ ব্যাপারে অপরাধী; বিজেতা পক্ষ তাঁহাদের বিচার করিবেন; কিন্তু বিজেতাদের মধ্যে যাহারা অপরাধী, তাহাদের বিচার করিবে কে? যুদ্ধোদ্যমের নামে যাহারা নিজেদের অধীন দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনের সম্বন্ধে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছে এবং দুর্নীতির প্রভাবে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিয়া অগণিত লোকের মৃত্যুর কারণ ঘটাইয়াছে, তাঁহাদের বিচার কে করিবে, যাহারা একটা বোমা ফেলিয়া কয়েক মিনিটের মধ্যে সহস্র সহস্র অসহায় নরনারীকে হত্যা করিয়াছে, তাহাদের বিচার কে করিবে? এই প্রসঙ্গে "ভারতীয় জাতীয় সেনাবাহিনী"র বিচারের কথাও আসিয়া পড়ে। ১৯৪২ সালে ব্রহ্ম ও মালয়ে এই বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। এই বাহিনী জাপানের পক্ষে যোগ দিয়াছিল, ইহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ। সেনাবিভাগীয় আইনকানুনের কথা আমরা এক্ষেত্রে তুলিব না। আমরা সোজাসুজি ইহাই বুঝি যে ভ্রান্ত ভাবে হইলেও ভারতের স্বাধীনতাই

এই বাহিনীর লক্ষ্য ছিল। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, এই বাহিনীর অফিসার ও নারী এবং পুরুষ সৈন্যদের প্রতি যুদ্ধবন্দীদের ন্যায় ব্যবহার করা উচিত এবং যুদ্ধ যখন অবসান হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে মুক্তিদান করা কর্তব্য। বস্তুত যে অবস্থার ভিতর পড়িয়া এই বাহিনী কার্য করিয়াছিল, সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন ইহাদের দেশপ্রেমের প্রেরণা সুষ্ঠুভাবে নিয়োজিত করা সম্ভব হইবে এবং নূতন ও স্বাধীন ভারত গঠনে ইহারা প্রভূতভাবে সাহায্য করিবে; এরূপ অবস্থায় বৃটিশ গভর্নমেণ্ট সত্যই যদি ভারতবাসীদের সখ্য এবং সৌহার্দ্যই কামনা করেন, তবে ইহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করাই তাঁহাদের পক্ষে কর্তব্য। ভারতের এই বীর সন্তানদের কাহাকেও যদি শাস্তি প্রদান করা হয়, তবে ভারতবাসীদের চিত্তে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে।

ভারত শোষণেরই ক্ষেত্র

যুদ্ধোত্তরকালে শিল্প-প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষ বিদেশ হইতে কিরূপে সাহায্য লাভ করিতে পারে, সেই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের জন্য ভারতীয় বাণিজ্যপতিদের কয়েকজনকে লইয়া গঠিত একটি শিল্প-মিশন ইংলণ্ড এবং আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। কিছুদিন হইল এই মিশনের সদস্যগণ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই দুই দেশে গিয়া তাঁহারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে একটি বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। শিল্প-মিশনের মতে যুদ্ধের ফলে গ্রেটব্রিটেনের ব্যবসা-বাণিজ্যের শক্তি যতটা বিপর্যস্ত হইয়াছে, আমেরিকায় ততটা ঘটে নাই। আগামী এক বৎসরের মধ্যেই মার্কিন শ্রমশিল্প যুদ্ধকালীন বিপর্যয়ের ধাক্কা কাটাইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু ব্রিটেনের আরও অধিক সময় আবশ্যক হইবে। গ্রেট ব্রিটেন এবং আমেরিকার শ্রমশিল্পের বিপর্যয়ে আমাদের অবশ্য চিন্তায় পড়িবার কোন কারণ ছিল না; পক্ষান্তরে বিদেশীর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না থাকাতে এই অবসরে ভারতের পক্ষে তাহার শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করিবারই সুবিধা হইত; কিন্তু ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন দেশ হইত, তবেই তেমন কথা বলা চলিত; দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত পরাধীন। ভারতের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেও সে সম্পদ সুগঠিত করিবার ক্ষমতা নাই; বিদেশী গভর্নমেণ্ট এতদিন পর্যন্ত ভারতের সে প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং নিজেদের স্বার্থের দিক হইতে তাহাই তাঁহারা প্রয়োজন বলিয়া বোধ করিয়াছেন। বর্তমানে ভারতের শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারিত করিতে হইলে যন্ত্রপাতির জন্য তাহাকে ইংলণ্ড এবং আমেরিকার দ্বারস্থ হইতে হইবে। সে দিক হইতে ভারতের যে বিশেষ কিছু সুবিধা হইবে, শিল্প-মিশন এরূপ আশা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, পুরাতন ধরণের কিছু কিছু যন্ত্রপাতি অত্যধিক মূল্যে মিলিতে পারে; কিন্তু যুদ্ধকালে যে সব নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, বিদেশী ব্যবসায়ীরা তদ্দ্বারা নূতন যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিয়া ফেলিবে, নবোদ্ভাবিত যন্ত্রপাতির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পুরাতন পদ্ধতি টিকিতে পারিবে না। এরূপ ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে জাতীয় স্বার্থে যাহাতে শুল্ক-নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়, সেজন্যই সর্বপ্রথমে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন; কিন্তু পরাধীন ভারতে তাহা সম্ভব নয়; নানাভাবে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া এখানে বিদেশী বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুবিধা রহিয়াছে। সুতরাং জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা ব্যতীত যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতীয় শিল্পের আত্মরক্ষা করিবার কোন উপায় নাই। সেক্ষেত্রে অসহায় ভারত বিদেশীদের দ্বারা শোষিত হইতেই থাকিবে, এমন আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে।

তেলের রেশন

বাঙলা সরকার একটি বিবৃতিতে জানাইয়াছেন যে, বৃহত্তর কলিকাতা অঞ্চলে ১লা অক্টোবর হইতে সরিষার তেল রেশন-ভুক্ত বস্তু বলিয়া গণ্য এবং বিতরিত হইবে। প্রতি সের এক টাকা মূল্যে এই তেল পাওয়া যাইবে। কণ্ট্রোলের মাল পাইলেই আমরা কৃতার্থ, সেক্ষেত্রে দোষ-গুণের বিচার যে চলে না, এতকালের ব্যাপারে আমরা সে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি। কিন্তু গুণ-দোষ নির্বিচারে এ তেল আমাদের পক্ষে কতটা প্রাপ্য হইবে, এই সম্পর্কেই প্রশ্ন উঠিয়াছে। সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে দেখিতেছি, মাথাপিছু চার সপ্তাহে অর্থাৎ এক মাসে আধ সের পরিমাণে রেশনের তেল পাওয়া যাইবে। এই ব্যবস্থায় রেশনের নিয়ামকদের মস্তিষ্ক শক্তির পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। এক একটি বাঙালী পরিবারে সরিষার তেলের প্রয়োজন কিরূপ, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের যদি কোন জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ হাস্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে তাঁহারা স্বভাবতই সঙ্কোচবোধ করিতেন এবং এমন ঝক্কি ঘাড়ে লইতে যাইতেন না। রেশনের মহিমার অন্ত নাই, আমরা সরকারী ব্যবস্থাপকদের মুখে অবিরত এমন কথাই শুনিয়া থাকি; সাধারণ বাঙালী পরিবার হইতে আজ মাছ উঠিয়া গিয়াছে, দুধের স্বাদ বাঙালী ভুলিয়াছে, আলুর চিন্তা করিয়া লাভ নাই, দেখিতেছি। অতঃপর রেশনের সুব্যবস্থায় সরিষার তেলের পাটও উঠিয়া যাইবে। আমাদের জীবন ধারণের প্রয়োজন সকল দিক হইতেই এমন করিয়া হ্রাস পাইতেছে, অথচ আমরা এখনও বাঁচিয়া আছি, মরি নাই, কণ্ট্রোলের এমনই মহিমা; রেশনিংয়ের এমনই মাহাত্ম্য। অন্য দেশে কিম্বা অন্য শাসনে ইহা সম্ভব হইত কি?

রাণী গুইদালো

শিলংয়ের একটি সংবাদে প্রকাশ, রাণী গুইদালো কয়েকটি সর্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সর্তানুসারে তিনি তাঁহার নিজ পল্লীর এলাকা ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে পারিবেন না, রাজনীতিক ব্যাপারে যোগ দিতে পারিবেন না, কাহারও সঙ্গে আলোচনা করিতে পারিবেন না। নাগা মহিলা রাণী গুইদালো অসহযোগ আন্দোলনের সময় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, দণ্ডকাল অতীত হইবার পরও তাঁহাকে মুক্তিদান করা হয় নাই। পণ্ডিত জওহরলাল একদিন রাণী গুইদালোর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছিলেন, যে কোন দেশ এবং জাতি এমন বীরাঙ্গনার জন্য গর্ববোধ করিতে পারে। দেশের স্বাধীনতার জন্য বেদনা এবং তাহার প্রেরণা অন্তরে পোষণ করা পরাধীন জাতির পক্ষে অপরাধ, ইহা আমরা জানি; কিন্তু গভর্নমেণ্ট দশ বৎসরেরও অধিককাল তাঁহাকে অবরুদ্ধ রাখিয়াছেন; এখনও কি একজন নাগা মহিলাকে আটক রাখিবার প্রয়োজন তাঁহাদের শেষ হইল না? কারণ কারামুক্তির নামে তাঁহাকে কার্যত কারাগারের বাহিরে আটকই রাখা হইয়াছে। স্বদেশপ্রেম এমনই অমার্জনীয় অপরাধ!

স্বাগত শরৎচন্দ্র

'কিছুদিনের জন্য হয়ত রণভেরী বন্ধ হইয়াছে; কিন্তু কালই হউক, আর পরশুই হউক, রণভেরী আবার যখন বাজিবে, তখন বাঙলার যুবক-যুবতীদের পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমি জানি, আগস্ট আন্দোলনের পর অনেক কিছু অত্যাচার বিভিন্ন প্রদেশে হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের পক্ষে ইহা নূতন হইতে পারে, কিন্তু বাঙলার পক্ষে এ অত্যাচার নূতন নহে। বাঙলার যুবকেরা বৃটিশ বেয়নেট ও বুলেটের সামনে বুক পাতিয়া দিয়াছে। আমি আশা করি, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য বাঙলার যুবক আবার বুক পাতিয়া দিতে রাজী হইবে। বাঙলার যুবকেরা বলুক, তাহাদের রক্তবিন্দু ভারতের স্বাধীনতার বীজ বপন করিবে। আপনারা যদি প্রাণ বিসর্জন দিতে রাজী থাকেন, তাহা হইলে স্বাধীনতা আসিবে, না হইলে আসিবে না'— সুদীর্ঘকাল পরে কারামুক্ত শরৎচন্দ্রের মুখে আমরা সেদিন এই অগ্নিময়ী বাণী শ্রবণ করিয়াছি। এমন কথা বাঙালী বহুদিন শোনে নাই। বাঙালী নেতৃহীন হইয়া পড়িয়াছিল; বাঙালীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়াছিল। বাঙলায় বৃটিশ শাসনের ইতিহাস পশু শক্তির সঙ্গে মানুষের মনোবলের সংগ্রামেরই ইতিহাস। ব্রিটিশ রাজশক্তি বাঙলার প্রাণধর্মকে পিষ্ট করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়াছে এবং অদ্যাপি সে চেষ্টার অবসান ঘটে নাই। এই সংগ্রামের আধুনিক অধ্যায়ে পশুবলের আশ্রয়ে শাসক শক্তি বাঙলার নিজস্ব প্রাণধর্মে বলিষ্ঠ শরৎচন্দ্রকে জীবন্ত সমাহিত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই; অবশেষে স্বৈরাচারের সমগ্র শক্তি দেশপ্রেমিকের দুর্নিবার অন্তরবলের কাছে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে। শরৎচন্দ্রের মুক্তিতে বাঙলার অন্তর-শতদল উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। দেশসেবার পবিত্র



কর্তব্য লইয়া ক্লেশ, লাঞ্ছনা ও কারাবরণ শরৎচন্দ্রের জীবনে এই নূতন নহে। বিক্ষুব্ধ রাজরোষের প্রকোপে শেষ পর্যন্ত বসু-পরিবারের বালকেরা পর্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে। বাঙলার কবি গাহিয়াছেন— 'দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে সেই রুদ্রদূতে ব'লো কোন রাজা কবে পারে শাস্তি দিতে?' বসু-পরিবারের চরিত্র-শক্তির অনমনীয় প্রভাবে কবির এই বাণী সত্য হইয়াছে। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সুভাষচন্দ্রের সাধনা শুধু বাঙলার নহে, কিংবা ভারতের নহে, সমগ্র জগতের ইতিহাসে চিরন্তনভাবে জ্যোতির্ময় প্রেরণা সঞ্চার করিবে। শরৎচন্দ্রের অন্তরের অগ্নিময় জ্বালা পরাধীনতার গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভারতের দিকচক্রবালকে আজ আলো করিয়া ছুটিয়াছে। আমরা আজ এই সত্য একান্তভাবে উপলব্ধি করিতেছি যে, প্রতিকূল শক্তিকে নির্জিত করিয়া সে আগুন দ্বিগুণতর বেগে জ্বলিয়া উঠিবে। 'রুষ্ট রাহু দেবতার সূর্যপানে বাড়াইয়া বাহু আপনি বিলুপ্ত হয় ছায়ার মতন'— কারামুক্ত শরৎচন্দ্রের বাণী আমাদের অন্তরে কবির এই উক্তির যাথার্থ্যকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেছে। সত্যই আজ ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম-ভেরীর ধ্বনি আমাদের কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে এবং আমাদের ধমনীতে শোণিত-স্রোত স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে।

লাঞ্ছনা, পীড়ন, দুঃখ ও অসম্মানের মধ্যে বাঙলার এই বীর সন্তানের মূর্তি আমরা আমাদের মানস-নেত্রে অন্তরের বেদনা মাখিয়া কয়েক বৎসর আঁকিয়াছি, বলিব, শুধু শ্রীভগবানের একান্ত অনুগ্রহেই আজ আমাদের নিজেদের সম্মুখে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলাম। সুভাষচন্দ্রের নিদারুণ শোকে তিনি মুহ্যমান, দীর্ঘ নির্যাতনে তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য; কিন্তু স্বাধীনতার সাধনায় অদম্য মনোবলে তিনি সমধিক উজ্জ্বল এবং ভাস্বর। বাঙলার এই প্রাণময় এবং জ্যোতির্ময় পুরুষকে আমরা আজ সসম্ভ্রমে অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। নির্যাতনে, নিপীড়নে এবং মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে বিপন্ন ও বিপর্যস্ত বাঙলার নেতৃত্বভার তিনি গ্রহণ করুন। তিনি আমাদিগকে স্বাধীনতার সংগ্রামে পরিচালিত করুন।

'৪২—'৪৫

সত্যপীর

কেহ বলেন বিয়াল্লিশের আন্দোলন ফলপ্রসূ হয় নাই; কেহ বলেন আন্দোলন কংগ্রেসের ছিল না, ফলপ্রসূ হইল কি না তাহাতে কংগ্রেসের লজ্জিত বা মর্মাহত হইবার কিছুই নাই; কেহ বলেন, না, আন্দোলন কংগ্রেসেরই এবং বহু দেশপ্রেমিক তাহার সর্ব দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত আছেন।

এসব তো তৈলাধার পাত্র ও পাত্রাধার তৈল লইয়া হাতীবাগানের নৈয়ায়িকদের



মহাত্মা গান্ধী

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্ক। জিজ্ঞাসা করি আগস্ট মাসে সমস্ত দেশব্যাপী জাগরণে যাঁহারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহারা কি উকিল ডাকিয়া আইন মিলাইয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন? মনে পড়ে বোম্বাই সহরের স্কুল কলেজের ছেলেরা সেদিন উৎসাহের আবেগে কী কাণ্ডটাই না করিয়াছিল। যাহা কিছু করিয়াছিল, তাহার কোনটাই হয়ত স্বরাজের পথ সুগম করিয়া দেয় নাই, পক্ষান্তরে কোনোটা হয়ত স্বরাজ সাধনার পথে অন্তরায় ছিল, কিন্তু সেই রাসায়নিক বিশ্লেষণই তো শেষ কথা নয়। গরুড়ের ক্ষুধা লইয়া মানুষ যখন জাগে, তখন কি তার খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা বোধ থাকে? কিন্তু ক্ষুধাকে নমস্কার করি, সেই জাগরণকে দেশের চরম মোক্ষ বলিয়া জানি, স্বরাজ আজ পাইলাম অথবা দশ বৎসর পরেই পাইলাম। ভুলিলে চলিবে না যে কংগ্রেস পূর্ণ অখণ্ড ভারতবর্ষের মুখপাত্র। কংগ্রেসের আন্দোলন দেশের আন্দোলন, ও স্বরাজ লাভের জন্য দেশের জনসাধারণের ব্যাপক আন্দোলন মাত্রই কংগ্রেসের আন্দোলন—সে স্বতঃস্ফূর্তই হউক আর ধৈর্যচ্যুতি বশতই হউক।

কারণ, এই জাগরণই কি সত্য নয়? এই জাগরণের পুরোভাগে থাকিয়া যাঁহারা প্রাণ দিলেন তাঁহারা কি স্বরাজ পান নাই? তাঁহাদের আত্মা কি অবিনশ্বর লোকে যায় নাই? রাজার রাজা যিনি তাঁহার ক্রোড়ে কি তাঁহারা আসন পান নাই; স্বরাজ যেদিন আসিবে সেদিন দুই মুষ্টি অন্ন হয়ত বেশী পাইব; হয়ত রমণীরা আরো বেশী অলঙ্কার পরিবেন; হয়ত পণ্ডিতেরা আরো বেশী পুস্তক লিখিবেন, হয়ত বিসূচিকায় কম প্রজা মরিবে, কিন্তু মুখ্য যাহা পাইব তাহাতো স্বাধীনতা; এবং নিশ্চয় জানি সে স্বাধীনতার প্রথম যুগে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত দেশকে গড়িতে গিয়া আমাদিগকে অনেক দুঃখ অনেক দৈন্য সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু তবুও যাহা আসিবে তাহা স্বরাজ।

সেই স্বরাজ কি তাঁহারা পান নাই—যাঁহারা প্রাণ দিলেন যাঁহারা কারাগারে উৎপীড়িত হইলেন? জাগ্রত হইয়া মরিবার পূর্বে যে কয়দিন, যে কয় দণ্ড তাঁহারা বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহাদের মনে, তাঁহাদের সর্বঅস্তিত্বে, সর্বচৈতন্যে তো তখন স্বরাজ। তখন তাঁহারা পুলিশের এ আইন মানেন নাই, কানুন ভাঙিয়াছেন,



রাষ্ট্রপতি আজাদ

রাজাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, রাজপুরুষের হুঙ্কারের সম্মুখে অট্টহাস্য করিয়াছেন। তাঁহারা তো তখন দেহেমনে মুক্ত পুরুষ। তাঁহারা তো চলিয়াছেন, চলার পথে—

নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি

চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত তাহার আর শ্রীর অন্ত নাই, হে রোহিত এই কথাই চিরদিন শুনিয়াছি। যে চলে, দেবতা ইন্দ্রও সখা হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলিতে চাহে না, সে শ্রেষ্ঠ জন হইলেও সে ক্রমে নীচ (পাপী) হইতে থাকে, অতএব অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।

পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ
শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে
হতাঃ॥ চরৈবেতি, চরৈবেতি।

যে চলে, দেহের দিক হইতেও তাহার অপূর্ব শোভা পুষ্পের মত প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তাহার আত্মা দিনে দিনে বিকশিত হইতে থাকে; এই তো মস্ত ফল।



পণ্ডিত জওহরলাল

তারপর তাহার চলার শ্রমে চলিবার মুক্ত পথে তাহার পাপগুলি আপনিই অবসন্ন হইয়া শুইয়া পড়ে। অতএব, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।

চরন্ বৈ মধু বিন্দতি চরন স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরন॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি

চলাই হইল অমৃত লাভ, চলাই তার স্বাদু ফল, চাহিয়া দেখ ঐ সূর্যের আলোকসম্পদ, যিনি সৃষ্টির আদি হইতে চলিতে চলিতে একদিনের জন্যও ঘুমাইয়া পড়েন নাই। অতএব অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ; ভারতের সংস্কৃতি, পৃ ১৩।৪)

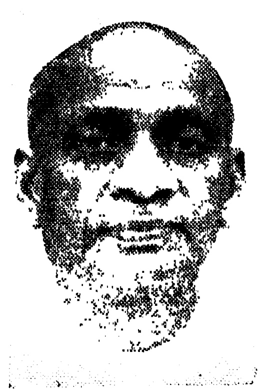
চলা ও পেঁৗছা সে মৃত্যুঞ্জয় বীরদের এক হইয়া গিয়াছিল। কে বলিবে তাঁহারা শুধু কর্মই করিয়াছিলেন, ফল পান নাই। স্বাধীন জাতি যে-আনন্দ ভোগ করিবার সুযোগ কখনও পায় না—অধীনতা হইতে স্বাধীনতা অর্জনের যে আনন্দ, বিরহের পর রাধার কৃষ্ণ মিলনে যে আনন্দ—সেই আনন্দ

সেই অমৃত মৃত্যুক্ষণে তাঁহারা পান করিয়া অমর হইলেন।

আর যাঁহারা অধর্ম, অন্যায়ের স্বহস্ত-নির্মিত কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরের অন্তরালে সংগীহীন বন্ধুহীন কর্মহীন জীবনযাপন করিলেন, তাঁহারা তো আরও নমস্য। স্বরাজ তাঁহারা কারারুদ্ধাবস্থায় অন্তরে অন্তরে হারাইলেন না তাঁহাদের আত্মত্যাগ রুদ্ধগতি অন্তর্মুখী হইয়া পর্বতকন্দরে আবদ্ধ বর্ষার স্রোতের মত ফুলিয়া ফুলিয়া স্ফীত হইয়া তাঁহাদিগকে ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। এইমাত্র বলিতে পারি, কর্তব্যকর্ম উপেক্ষা না করার যে-বিবেকানন্দ, তাহা তাঁহারা সকলেই পাইয়াছেন—আজ যাঁহারা নষ্টস্বাস্থ্য, ভগ্নোৎসাহ, হৃতআদর্শ হইয়াও নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, তাঁহারাও তো কিয়ৎকালের জন্যও পরমহংস হইয়াছিলেন। আজ যদি তাঁহাদের কেহ কেহ নির্জীব, প্রাণহীন হইয়া থাকেন, তবে তাহার জন্য দায়ী কে? দায়ী আমরা। আমরা যাঁহারা তখন উঠিয়া দাঁড়াই নাই, সে রাজাধিরাজদের হাত ধরিয়া সম্মুখে চলি নাই, আমরা যাহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের লোভে, ক্ষুদ্র ভয়ের ভ্রূকুটিতে গৃহকোণে আশ্রয় লইয়াছিলাম, শ্যামল নির্মল কোমল উত্তরীয় বিছাইয়া নিদ্রালস নয়নে দেখিলাম প্রসারিত হস্ত আমাদিগকে স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল, শুনিলাম চরৈবেতি, চরৈবেতি, কিন্তু উঠিলাম না। তবু জানি, সে হস্ত আমাদের আশীর্বাদ করিয়াছিল—তাঁহারা তো স্বরাজ পাইয়াছেন; এই পাপীদের জন্যই তো তাঁহাদের আত্মদান, বলিদান।

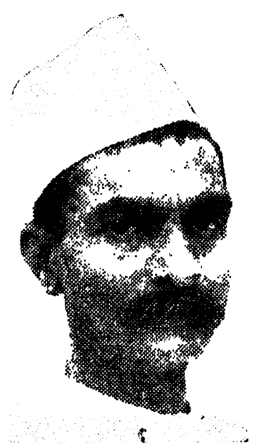
কারাগারে কি প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তাঁহারা অপেক্ষা করেন নাই, আশা করেন নাই যে, আমরা, তাঁহাদের ভ্রাতা-বন্ধুরা তাঁহাদের দেবত্বের এককণাও অন্তত পাইয়াছি? বিদেশী রাজের দয়ায় যেন একদিন তাঁহাদের নিষ্কৃতি পাইতে না হয়। তাঁহারা কি আশা করেন নাই যে, একদিন আমরা তাঁহাদিগকে মাথার মণি করিয়া বাহিরে লইয়া আসিব? এখনও যাঁহারা মুক্তি পান নাই, তাঁহাদের জন্যই বা আমরা কি করিতেছি?

তারপর আসিল দুর্ভিক্ষ। তাঁহাদের অভাব আমরা যে তখন কি নিদারুণভাবে বুঝিয়াছিলাম, তাহা বাঙলা দেশ কখনো ভুলিবে না। অন্নাভাবে মরিল বহু লোক কিন্তু তাহারও বেশী লোক মরিল প্রয়োজনীয়, উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে। এক বিদেশী তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কোটি কোটি জনগণের মধ্যে সামান্য যে-কয়টি দেশসেবক জেলে আছেন, তাঁহারা ছাড়া দেশে কি অন্য কর্মী নাই?" শিরে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিলাম, 'নাই, এই হতভাগা দেশে ভগবান যে-কয়টি মানুষ নির্মাণ করেন, তাঁহাদিগকে তিনি সর্বগুণেই অকৃপণভাবে ঢালিয়া দেন। তাঁহাদের কেহ কবি, কেহ চিত্রকর, কেহ দার্শনিক, কিন্তু সকলেই সেসব গুণ উপেক্ষা করিয়া দেশসেবাকে প্রধান স্থান দেন। কবি বলিলে কবি লজ্জিত হন, দার্শনিককে দার্শনিক বলিলে তিনি আর বন্ধুর মুখদর্শন পর্যন্ত



বল্লভভাই প্যাটেল

করিতে চাহেন না; তিনি হয় হইতে চান স্বাধীনতা জেহাদের সিপাহী নতুবা শহীদ। কাব্যে, দর্শনে যেসব কৃতিত্ব পূর্বে দেখাইয়াছিলেন, সেগুলিকে অবান্তর, অপরিপক্ক বালসুলভ চপলতা বলিয়া ধিক্কার দেন। বিদেশীকে বলিয়াছিলাম, ইঁহারাই আমাদের সাত রাজার ধন মাণিক, সর্পের মণি। মণি অপেক্ষা সর্প আয়তনে অনেক বৃহৎ, কিন্তু



বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

মণিহারা ফণী, আর আমাদের দেশপ্রেমী কর্মী ব্যতীত দেশ একই অভিসম্পাত।'।

জানি, কেহ কেহ সস্তায় দেশের জনসাধারণের মন কাড়িবার জন্য কাজের ভাণ করিয়াছিলেন, অথবা যেখানে ভাণ করিতে সক্ষম হন নাই, সেখানে ঈষৎ কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-ও জানি, তাঁহাদের বিরুদ্ধ-আন্দোলনের ফলেই বহু দেশপ্রেমিককে বহু কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল—সেকথা ভুলি নাই, ভুলিবার ইচ্ছাও রাখি না। তবে সে বিচারের দিন এখনও আসে নাই।

তারপর ছিন্নভিন্ন কর্মীদের মধ্যে অবসাদের যুগ আসিল। পলায়িত, পুলিস-তাড়িত ইঁহারা এই গৃহে ঐ গৃহে আশ্রয় খুঁজিলেন। আমরা অধঃপাতের শেষ সীমায় পোঁছাই নাই বলিয়া ইঁহারা আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের উদামহীন ভগ্ন জীবন দেখিয়া অন্তরে অন্তরে কি যাতনাই না ভোগ করিয়াছি। এক বন্ধুকে বলিয়াছিলাম, তুমি তো এককালে ভালো কবিতা লিখিতে, লেখো না দুই একটি; আমার বাড়িতে কি অমনি অন্নধ্বংস করিবে? মনে আছে আমার রুগ্ন বন্ধু ঈষৎ হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তোর বাড়ি দেখি জেলের চেয়েও খারাপ। জেলেও তো সরকার বিনা পয়সায় খাইতে দেয়, তুই যে কবিতা চাস্। না হয় তোর বাগানে জল ঢালিয়া দিব।' আশ্চর্য হইলাম, মাসের পর মাস গ্রাম হইতে গ্রাম অনশনে, পথশ্রান্তিতে, মানসিক উদ্বেগে কাটাইয়াও তাহার সেই নির্মল রসিকতা করিবার ক্ষমতাটি যায় নাই। আশা আছে; তাহা হইলে আশা আছে ইঁহাদের মেরুদণ্ড কোনো রাজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিতে পারিবে না। ইঁহাদের অবসাদ ক্ষণিক, ইঁহাদের স্থিতি মায়া, মিথ্যা। ইঁহারা আবার অগ্রসর হইবেন।

এখনও আমাদের আত্মজনেরা কারাগারে আছেন। নিষ্কৃতি তাঁহারা পাইবেন কিন্তু তাহা মুক্তি নহে। তাঁহাদিগকে মুক্তি দানের সম্মান আমাদের হাতে ছিল; আমরা খোয়াইয়াছি।

বোম্বায়ের সম্মেলনে ইঁহাদের অশরীরী সত্তা উপস্থিত থাকিবে। আমরা যেন এমন কিছু না বলি বা করি যাহাতে তাঁহাদের মনে আঘাত লাগে অথবা তাঁহাদের কর্তব্যবোধের বিপক্ষে যায়। নিষ্কৃতিপ্রাপ্ত কর্মীরা ইঁহাদের সঙ্গে এতদিন কারাগারে কাটাইয়াছেন। তাঁহাদের কপালে কারাগারের লাঞ্ছনা-লাঞ্ছন অঙ্কিত তাঁহারাই ইঁহাদের চিনেন; তাঁহারাই যেন সেখানে প্রধান হোতা প্রধান বক্তা হন।

আর যাহারা অগ্রদানী হইয়াছিল, তাহারা যেন সে-সভায় প্রবেশাধিকার না পায়।

আর যাঁহারা পুণ্যলোকে চলিয়া গিয়াছেন, যেখানে রাজায় প্রজায় ভেদ নাই, যেখানে আলীপুর, দমদম নাই, যেখানে পূজার থালাতে ভাইয়ের রক্ত ছিটাইবার লোক নাই, সেখান হইতে তাঁহাদের আত্মা এই সম্মেলনের কর্মকর্তাগণকে শুভবুদ্ধি দান করুক।

দূরদৃষ্টি

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

তারিণীকে স্বীকার করে না শুধু একজন—তার মেয়ে সরযূ।

জ্যোতিষী তারিণী বাচস্পতির নাম আজ কে না জানে! সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি তার বাড়িতে ভীড় লেগে থাকে। মাঝে মাঝে অনেক মোটর গাড়িও দাঁড়াতে দেখা যায়। লোকের বিপদে আপদে তারা সর্বপ্রথম ছুটে আসে এখানে—হাত মেলে দেয় তার সামনে আর তারিণী যখন তাদের অদূর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধান দেয় তখন সরযূ হাসে। মাঝে মাঝে তার হাসিটা এত জোরে হয় যে পাশের ঘরে তারিণী শঙ্কিত হয়ে ওঠে—তার তাল কেটে যায়, একটা চাপা আক্রোশে চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে, শিরাগুলো ফুলে যায়।

এই রকম একটা ব্যাপারে একদিন তারিণীর আর ধৈর্য রইলো না। একটি চমৎকার হাত দেখতে দেখতে চেপে চেপে তারিণী বলছিল, সব ভালো আপনার, সুখ-শান্তি, টাকা-পয়সা, কিছুরই অভাব থাকবে না, তবে হ্যাঁ, মামলা-মোকদ্দমা আপনাকে ছাড়বে না। অনেকবার আদালতে ছুটোছুটি করতে হবে—এমন সময় শোনা গেল সরযূর সেই খিল্ খিল্ হাসি। সেই চমৎকার হাতওলা লোকটিকে তারিণী বললো একটু বসুন তো—তারপর রাগে কাঁপতে কাঁপতে দুমদুম্ ক'রে সটান্ ভেতরে চলে এলো।

তুই ভেবেছিস কি সরযূ, তোকে আমি খুন করে ফেলবো।

বারে, আমি কি করলাম?

আমি কি করলাম? মুখ ভেঙিয়ে তারিণী বললো, ফের্ অমন যখন-তখন হি-হি করে হাসলে মুখ ভেঙে দেব একেবারে।

বাঃ, হাসি পেলে হাসবো না?

কেন, হাসবি কেন শুনি?

তুমি হাত দেখে লোককে অত বাজে কথা বললেই আমার হাসি পায়।

ওসব বাজে কথা নয়!

বাজে কথাই তো, মানুষের ভবিষ্যৎ কেউ বলতে পারে নাকি? তুমি তো আর ভগবান নও।

যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা, লোকে আমার কাছে আসে দু'টো মিথ্যে কথা শুনতে না?

অনেক মানুষ অমনি বোকা থাকে, সরযূ কোমরে কাপড় জড়িয়ে বললো, তাদের যা বলবে তাই বিশ্বাস করবে। কই বল দেখি আমার হাত দেখে আমার কবে কি হবে? ছাই পারবে বলতে—বাপের উত্তর শোনবার আগেই সরযূ সেখান থেকে পালিয়ে গেল। আর তারিণী দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ—রাগে তার শরীর কাঁপছে।

কালীঘাটের কাছে ছোট একটি বাড়ি। বাইরে বিরাট সাইনবোর্ড—ভাগ্য গণনা! ভাগ্য গণনা! ভাগ্য গণনা! এই যে, সুবিখ্যাত জ্যোতিষী তারিণী বাচস্পতি!

বাড়িতে সবশুদ্ধ আড়াইখানি ছোট ছোট ঘর। আলো-বাতাস আসে না—দরকারও নেই। ভাড়া ষোল টাকা। বাইরের ঘরটা তারিণীর। একটা তক্তপোষ, একটা পায়া-ভাঙা চেয়ার একটা ছোট টেবিল, কয়েকটা মা কালীর ছবি আর খানকয়েক জ্যোতিষের বাঙলা বই—এইতেই ঘর ভরে গেছে! হুঁকো হাতে নিয়ে প্রায় সমস্তক্ষণই তারিণী বসে থাকে সে-ঘরে। সরযূর সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই বললেই চলে। শুধু খাবার সময় তাদের মধ্যে দু'একটা প্রয়োজনীয় কথা হয়। মেয়েটার ওপর একটা চাপা বিদ্বেষ তারিণীর দিন দিন বেড়ে উঠছে। সরযূ বড় পাকাপাকা কথা শিখেছে আজকাল। কোথা থেকে শিখলো এত জ্যাঠামি? ব্যঙ্গ যে তারিণীকে সহ্য করতে না হয়েছে তা' নয়। কিন্তু নিজের মেয়ের কাছ থেকে—তার শিরাগুলো দপ্‌দপ্ করে।

সেইসব দিন তারিণীর আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। প্রথম এ পাড়ায় এসে যখন সে বিরাট সাইনবোর্ড টাঙালো তখন ভীড় জমে গিয়েছিল বাড়ির সামনে। তারপর রাস্তায় বার হলেই ছড়া কাটতে কাটতে পাড়ার ছেলেরা পেছনে পেছনে আসতো। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে যেত তারিণীর। কিন্তু যারা একদিন ব্যঙ্গ করতো, আজ ভীড়ের জন্য তারিণীর বাড়িতে এসে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তাদের—অনেককে সে ব্যর্থও করে। মনে মনে তারিণীর দৃঢ় বিশ্বাস সরযূকে একদিন হার মানতেই হবে—ভীড় ঠেলে হাত বাড়াবার জন্যে তাকেও ঠেলাঠেলি করতে হবে—আর তখন সে দেখে নেবে তার মেয়েকে।

আজ থেকে কয়েক বছর আগে যখন তারিণীর স্ত্রী মারা যায়, তখন তার মনে হয়েছিল সে এক কাণ্ড করেছে। তার স্ত্রী কামিনীর কলেরা হয়েছিল। হঠাৎ এক সময় চোখের জল মুছতে মুছতে তারিণী সরযূকে বলেছিল, আর কবিরাজ দেখিয়ে লাভ নেই মা।

শুকনো গলায় সরযূ বলে উঠেছিল, কেন বাবা, কবরেজ মশাই কিছু ব'লে গেছেন?

প্রচ্ছন্ন গর্বের চাপা হাসি হেসে তারিণী উত্তর দিয়েছিল, কবরেজ আর কি বলবে মা, গণনা করে আমিই দেখেছি ওর আয়ু আর মোটে তিন দিন—

কি বল বাবা যা তা', সরযূ কঠিন গলায় বলেছিল, তোমার কি একটু লজ্জাও করে না মার সম্বন্ধে অমন কথা বলতে?

সত্যি কথা বলতে আবার লজ্জা কি?

থাক বাবা, চোখে জল নিয়ে সরযূ বলেছিল, ওসব বাজে কথা শোনার তো অনেক লোক আছে, মার সম্বন্ধে আর নাই-বা বললে!

থাম, থাম, তারিণী চীৎকার করে উঠেছিল, আমার মুখের ওপর ফের্ কথা বললে তোকে—কথা শেষ করতে গিয়ে তারিণী দেখলো সরযূ সে-ঘরে নেই।

ঠিক তিন দিনের দিন কামিনী সত্যিই মারা গেল। স্থানকাল ভুলে সরযূর একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে তারিণী বললো, যা বলেছিলাম তা হলো কি না?

সরযূ একটি কথাও বলেনি। শুধু কটমট্ করে বাপের দিকে চেয়েছিল। আর কামিনীর মৃত্যুর পর বাপ আর মেয়ের সম্বন্ধটা আরও অদ্ভুত হয়ে দাঁড়ালো।

সরযূ আজকাল স্পষ্টই বুঝতে পারে তারিণীর জ্বালা কোথায়—সে মনে মনে হাসে। আর তারিণীর সব সময় মনে হয় মেয়ে তাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে বসে আছে। ফলে সরযূ তাকে যাই জিজ্ঞেস করুক না কেন, তারিণী মনে করে সে তাকে আঘাত করছে—সামান্য কথাতেই ঝগড়া বেধে যায়।

একদিন হয়তো সরযূ জিজ্ঞেস করলো, আজ ক'জন এসেছিল সবশুদ্ধ?

তোর কি দরকার শুনি?

নাঃ, এমনি!

সবটাতে মাথা গলানো কেন? হ্যাঁ আসে, রোজই আমার কাছে লোক আসে। পাঁজি খুলে হাঁ করে যারা বসে থাকে আমি সে-জাতের গণক নই বুঝেছিস?

মুচকি হেসে সরযূ বললো, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি চটে যাচ্ছ কেন বাবা?

না চটবে না? ওর পাকাপাকা কথা শুনে ফ্যা ফ্যা করে হাসবে—যা যা, আমার সঙ্গে কথা বলতে আসিস কেন তুই?

বেশ, কথা বলবো না আর!

হ্যাঁ, সেই ভালো!

তারপর সত্যিই কিছুদিনের জন্যে বাপ আর মেয়ের কথা বন্ধ হয়ে গেল। খাবার সময় পাশে বসে বাতাস করতে করতে সরযূ

বলে, কারুর কিছু দরকার হলে যেন চেয়ে নেয়।

থাক্ থাক্ কাউকে আর দালালি করতে হবে না।

দালালি আবার কে করলো?

হুঁ, তাড়াতাড়ি কোন রকমে খাওয়া শেষ করে তারিণী চলে যায়।

হঠাৎ একদিন বাপ আর মেয়ের ভাব হয়ে গেল আবার। এক গাল হেসে তারিণী বললো, জানিস সরযূ, জজ্ সাহেব এসেছিল আজ হাত দেখাতে—খুব বড়লোক, মস্ত গাড়ি করে এসেছিল। হর্নের আওয়াজ শুনেছিলি তো? বেশ ভালো করে হাত দেখে দিলাম।

তাই নাকি? হেসে সরযূ বললো, কি বললে তুমি?

হাসির অর্থটা তারিণী ঠিক বুঝতে পারলো না। উৎসাহের সঙ্গে ব'লে গেল, বললাম ভয়ের কোন কারণ নেই সাহেব, আপনার স্ত্রী ঠিক সেরে উঠবেন। আরও বলেছি—কিন্তু সে সব কি আর মনে থাকে রে?

তাতো ঠিকই, কত কি বলেছ!

হ্যাঁ হ্যাঁ, কড়া নাড়ার শব্দ শুনে তারিণী চ'লে গেল।

সরযূ স্পষ্ট বুঝতে পারে মাঝে মাঝে তারিণী কী অসীম আগ্রহ নিয়ে তার কাছে নিজের প্রতিষ্ঠা প্রচার করার চেষ্টা করে। সরযূর মায়া হয়—কখনও কখনও এইজন্যে সে তারিণীকে সমর্থনও করে।

একদিন অনেক খাবার আর ফলমূল নিয়ে তারিণী ভেতরে এলো, নে রে সরযূ, এগুলো তুলে রাখ—

একি, এত সব কোথা থেকে এলো? অবাক হ'য়ে সরযূ জিজ্ঞেস করলো। সেই জজ সাহেব, হাসতে হাসতে তারিণী বললো, আমার কথা তো ভুল হবার নয় রে! তাঁর স্ত্রী সেরে উঠেছেন—তাই খুসী হ'য়ে সাহেব ভেট দিয়ে গেলেন।

তাই নাকি? বাঃ, বেশ তো!

হুঁ হুঁ বাবা, বলি না তোকে? বাজে কথা ব'লে ভালো জ্যোতিষ হওয়া যায় না রে, ফাঁকি একদিন ধরা পড়েই। এই ফাঁকি-বাজদের জন্যেই তো অনেক ভালো লোককে লোকে বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু আমাদের কাছেই বা এত লোক আসে কেন? খাঁটি জিনিস চাপা থাকে না রে। তাই তো তোকে বলি, অত অশ্রদ্ধা করিস না জ্যোতিষশাস্ত্রকে।

না বাবা, আমি তো অশ্রদ্ধা করি না—তবে কি জানো? ওসব বাজে কথা আমার ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না—

বাজে কথা? আবার সেই পাকামি—দাঁত খিঁচিয়ে তারিণী ঘর ছেড়ে গেল।

যখন ঘরে কোন লোক থাকে না, দুপুরে শুয়ে শুয়ে তারিণী এপাশ ওপাশ করে তখন হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় সরযূর কথা। তার সমস্ত মনকে এ চিন্তা যেন দংশন করে—মনে হয় সে যেন এই মাত্র অসহ্য পরিশ্রম ক'রে এলো। কিন্তু তাকে সরযূ বিশ্বাসই বা করে না কেন? এখন তার এত যশ, এত প্রতিষ্ঠা বাইরের লোকের কাছে—তবু সরযূর এই একগুঁয়েমি কেন? কেন সে স্বীকার করে না তারিণীর সত্য শাস্ত্রকে? রাগে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে তারিণী। কিন্তু আবার এক সময় সে ভাবে, সে-ই বা সরযূকে অত প্রাধান্য দেয় কেন? কি এসে যায় ওই রকম একটা পুচকে মেয়ের মতামতে? কে মানে তার কথা? কে গ্রাহ্য ক'রে তাকে? এই তো, বাইরের কতলোক তাকে শ্রদ্ধা করে—তাকে স্বীকার করে—তবে? তবু কোথায় যেন সরযূর প্রতি তার একটা ব্যাপক দুর্বলতা থেকে যায়।

দেখ্ সরযূ, এক সময় তারিণী বললো, গণনা ক'রে দেখলাম, আর এক হপ্তার মধ্যে তোর অসুখ হবে বুঝলি?

হুঁ? হেসে ফেলে সরযূ বললো, কখ্খনো হবে না।

দেখ্ তুই, বেশ গম্ভীর হ'য়ে তারিণী বললো, আজ সোমবার আমি তোকে বললাম, আগামী সোমবারের মধ্যে তুই দেখে নিস্—

বেশ তো দেখাই যাক না, কিন্তু আমার কিচ্ছু হবে না তুমি দেখে নিও বাবা।

থাম্ থাম্, সরযূকে তাড়া দিয়ে তারিণী বেরিয়ে গেল।

সাত দিনের মধ্যে যখন পাঁচ দিন কেটে গেল অথচ সরযূর অসুস্থতার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন তারিণী মনে মনে সত্যিই চিন্তিত এবং শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো। যদি সরযূর কিছু না হয়, তাহ'লে মেয়ের কাছে তার মুখ থাকবে কেমন করে! তারিণী বিচলিত হ'য়ে পড়লো।

শীতকাল। চারদিক থম্ থম্ করছে। সন্ধ্যেবেলা কালীঘাটের সেই ছোট বাড়িটাকে মনে হচ্ছে যেন ধোঁয়ার রাজ্য। মাঝে মাঝে দম বন্ধ হ'য়ে আসে। ট্রাম-বাসের একঘেয়ে শব্দ আর যাত্রীদের কোলাহল তবু কিছুটা বৈচিত্র্য আনে।

তারিণী বললো, সরযূ, যা মা চান ক'রে এসে—মাথাটাও ধুয়ে ফেলবি বেশ করে।

তারিণীর কণ্ঠস্বর অনেকদিন পর হঠাৎ অত্যন্ত মিষ্টি মনে হলো সরযূর। তবু অবাক হয়ে সে বললো, চান করে আসবো? কি বলছ বাবা? এই শীতে ঠাণ্ডা জল মাথায় দিলে অসুখ করবে যে—

না না, তুই চানটা করে নে, বড় শুকনো দেখাচ্ছে তোকে আর মাথাটাও অমনি বেশ করে ধুয়ে ফেলিস।

কিন্তু বাবা—

না না না, আর কিন্তু-টিন্তু নয়, বড়ো শুকনো আর বিশ্রী দেখাচ্ছে তোকে—চেহারাটা বড়ো খারাপ মনে হচ্ছে তোর—

ম্লান হেসে সরযূ বললো, চেহারা তো আমার অনেকদিন থেকেই খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে, মা নেই কে আর দেখবে? তুমি তো আর—

কি যে বলিস মা! হ্যাঁ, যা যা আর দেরী নয়, চানটা ক'রে আয়।

কিন্তু তারিণীর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হলো। সন্ধ্যেবেলা কনকনে ঠাণ্ডা জলে মাথা ভিজিয়ে অনভ্যস্ত সরযূ চান করলো। কিন্তু অসুখ তার হ'লো না। সাত দিন কেটে গেল।

কই বাবা, আজ তো সোমবার, আমার অসুখ—

অমন হয়—মাঝে মাঝে একটু এদিক-ওদিক—

সাধে কি আর বলি? সরযূ হাসলো।

ফের্ ছোটমুখে বড়ো কথা!

ঠিক কথাই বলছি তো!

এই ভয়ই তারিণী করছিল। সে জানতো মেয়ে তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। আর মনে মনে যথেষ্ট শঙ্কিত হ'য়েই সে দিন কাটাচ্ছিল।

তবু চীৎকার ক'রে তারিণী বললো, তুই যা, অলক্ষ্মী তুই, তাই দেব-দেবী শাস্ত্র তোকে ছোঁয় না—তোর মা ছিলেন সতী-লক্ষ্মী তাই তার বেলা আমার কথাটা ফলে গেল আর তুই—

কেন মার কথা তুলছো বাবা? তার বেলা আবার ভবিষ্যদ্বাণী কি সে তো জানা কথাই, কলেরায় কে বাঁচে?

তিন দিনের মধ্যে—সে কথাও বলেছিলাম না?

অমন দু'একটা আন্দাজ লেগে যায়, সরযূ মনে মনে একটু রেগেছিল আজ, তাই কঠিন গলায় বললো, কিন্তু মার কথা আর তুমি তুলো না বাবা, ওতে বাহাদুরী করবার কিছু নেই।

কিছু নেই না? আন্দাজে বলেছিলাম? তোকে আমি—তুই আমার শনি, তোকে বিদেয় করতে না পারলে আমার শান্তি নেই—তারিণীর চোখ দুটো যেন জ্বলছিল।

নাঃ, যেমন করে হোক যত শীগ্‌গির পারা যায় সরযূর বিয়ে না দিলে তারিণীর নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। ওকে সামনে দেখলে একটা চাপা অতৃপ্তি তার দেহমন আচ্ছন্ন করে দেয় বিয়ে দিতে পারলে তবু এই জ্বালাময় অতৃপ্তি কিছুটা দূর হবে। সে বাইরের ঘরে ব'সে হুঁকো হাতে নিয়ে সরযূর বিয়ের কথা ভাবতে লাগলো। আর দেরী নয়, তারিণীকে তাড়াতাড়ি শান্তি পেতেই হবে।

ফাল্গুনের প্রথম দিকেই তারিণীর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। তার সমস্ত মনের ওপর দিয়ে একটা নিশ্চিন্তির তরঙ্গ ব'য়ে গেল যেন। পাত্রের নাম সদাশিব ভট্টাচার্য। তার আর কেউ নেই কাজেই কোন বাধা, আপত্তি কিংবা হ্যাঙ্গাম হলো না—একে একে সমস্তই চুকে গেল।

আজ তারিণী নিশ্চিন্ত। তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কি যেন ছিল—কে যেন আজ নেই আর কেমন একটা অলস আমেজ চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরে। যাবার সময় খুব কাঁদছিল সরযূ। তার অমন কান্না তারিণী আর কখনও দেখে নি।

সরযূ সংসারের সমস্ত ভার তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। পাছে তারিণীর অসুবিধা হয় তাই কোথা থেকে একটা বিশ্বাসী ঝি-ও ঠিক ক'রে গেছে। কিন্তু তবু তারিণীর বড়ো খারাপ লাগে। এ যেন তার এক নতুন অতৃপ্তি।

• • •

দিন কেটে যায়।

মা, তুমি কোথায়? কেন বাবা আমার এ বিয়ে দিলেন? তার চেয়ে কেন দুখানা করে কেটে আমাকে নদীতে ভাসিয়ে দিলেন না? এখন আমি কি করবো? এমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করা আমার মতো মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। তবে কি আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে? না, আমি তা' পারবো না। আর কেনই বা মরবো? তবে হ্যাঁ, এমন করে এখানে থাকলে আমি শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবো! এখন আমার কি উপায় হবে? এ বিপদ থেকে কে আমায় রক্ষা করবে—বিয়ের পর ভাবনায়—ভাবনায় সরযূ শুকিয়ে গেল। তার চোখের কোণায় কালি পড়লো। মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

রাত্রে হঠাৎ এক সময় সদাশিব বললো, ওগো, আমাকে তো একবার বেরুতে হবে এখন—

আজ আবার কোথায় যাবে? খুব আস্তে সরযূ জিজ্ঞেস করলো।

বিশেষ দরকারে যেতেই হবে, না গেলে মনোরমা না খেয়ে থাকবে।

মনোরমা কে?

জিব্ বের করে সদাশিব বললো, না, না, কেউ না। ইস্, তোমার সামনে আবার নাম করে ফেললাম—

বল কে? গম্ভীর স্বরে সরযূ জিজ্ঞেস করলো আবার।

কামড়াবে নাকি?

আজ তুমি কিছুতেই বেরুতে পারবে না।

এর মধ্যেই হুকুম করতে আরম্ভ ক'রেছ দেখছি, কিন্তু ফল হবে না, এ বড়ো শক্ত ঠাঁই—দরজা খুলে গট্ গট্ ক'রে সদাশিব বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে লোকটাকে দেখে সরযূর ঘৃণা হ'লো। এই তার স্বামী। একটা মাতাল, দুশ্চরিত্র, অমানুষ। সদাশিবের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

মনোরমার বাড়ীতে, শুনলে? হ'লো তো এবার?

কে মনোরমা?

একটা মেয়েমানুষ।

চীৎকার ক'রে বললো, কেন তুমি আমাকে বিয়ে ক'রেছিলে?

চেঁচামেচি ক'রো না—এটা ভদ্রলোকের বাড়ী। ফের্ অমন গলা বের করলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবো। বিয়ে আমি ক'রেছিলাম কেন, সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দেবো না—আমার খুসী তাই বিয়ে ক'রেছিলাম। একটা বাটপাড় গণৎকারের মেয়ের আবার তেজ!

দেখ, খবরদার বাবার নাম তুলো না বলছি।

আবার চেঁচাচ্ছ—চোখ রাঙিয়ে সরযূর দিকে তাকিয়ে সদাশিব বললো, না, বাবার নাম তুলবে না, কী আমার হাত দেখনেওয়ালারে—জোচ্চর!—

মুখ সামলে কথা ব'লো বলছি—ঝর্ ঝর্ ক'রে সরযূর চোখ থেকে জল পড়তে লাগলো।

শুরু না হ'তেই সারা। হঠাৎ একদিন একা একা সরযূ আবার বাপের বাড়ীতে ফিরে এলো। তারিণী শুয়েছিল। তাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বললো, কি মা, কি খবর? খারাপ কিছু ঘটেনি তো?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ভারী কান্নায় তারিণীর কোলের ওপর ভেঙে পড়লো সরযূ।

সরযূকে আবার এমন ক'রে ফিরে পেয়ে খুশীই হ'লো তারিণী। সমস্ত ঘটনা মেয়ের মুখ থেকে শুনে তার নিজেকে মনে হ'ল অপরাধী।

আর তুই সেখানে ফিরে যাসনে মা, মাথা নীচু ক'রে তারিণী বললো। মেয়ের মুখের দিকে সে চাইতে পারছিল না।

না বাবা, আমি আর যাবো না, ফিরিয়ে নিতে এলেও না, দৃঢ় স্বরে সরযূ বললো।

হাঁ সেই ভালো, তুই আমার কাছেই থাক্ মা।

কিন্তু ওবাড়ী থেকে আর কেউ সরযূকে ডাকতে এলো না। প্রথম প্রথম সরযূর মনে ভয় ছিল, একটু মৃদু আশাও ছিল যেন, হয়তো আসবে। দিন কেটে যেতে লাগলো। কেউ এলো না। সরযূ বরাবরের জন্যেই এ বাড়ীতে থেকে গেল।

সরযূর আকস্মিক প্রচণ্ড পরিবর্তন তারিণী লক্ষ্য করে। তার দিকে চেয়ে চেয়ে সে অবাক হ'য়ে যায়। মানুষের এত পরিবর্তন হয় কেমন ক'রে!

সরযূর চেহারা আধখানা হয়ে গেছে। আর তার হাসি শোনা যায় না—কথা বলে খুব কম, আর মনে হয় হঠাৎ তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে চেহারা দেখলে বোঝা যায়, আড়ালে অনেকক্ষণ ধরে সে কেঁদেছে—আজকাল বোধ হয় সে ভাল করে খায়ও না। এসব তারিণীর আরও অসহ্য মনে হয়। সমস্ত বাড়িটায় যেন নিরানন্দের ছায়া স্ফীত হয়ে উঠেছে—চারপাশে একটা থমথমে ভাব—তারিণীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

একদিন আর থাকতে না পেরে তারিণী বললো, অমন গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াস কেন মা?

কই, না তো বাবা।

তোর কি খুব মন খারাপ হয় রে? তাহলে বল না, আমি গিয়ে একবার সদাশিবের হাতে ধরে বলি—

না বাবা, অমন লোকের হাতে ধরতে তোমায় আমি দেব না, আর কিছুতেই আমি আর সেখানে ফিরে যাব না।

সেটা কি ভালো হবে মা?

হ্যাঁ বাবা, খুব ভালো হবে।

এর পর এ নিয়ে সরযূর সঙ্গে তার আর কোন কথা হয়নি।

শেষ অপরাহ্নের স্তিমিত গৈরিক আলো বাইরের পৃথিবীকে অপরূপ করে তুলেছে! এরই মধ্যে তারিণীর ঘর অল্প অল্প অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। সে হাত দেখছিল একজনের।

কিছু ভাবনা নেই, শুধু হোম করতে হবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রায় মশাই, আমি সব ঠিক করে দেব—

ভক্তিতে ভরে গিয়ে তারিণীর পায়ের ধুলো নিয়ে ভদ্রলোক চলে গেল। তারিণী তক্তপোষ ছেড়ে উঠতে যাবে, এমন সময় কালো পেড়ে শাদা শাড়ি পরে আস্তে আস্তে সরযূ এসে তার সামনে দাঁড়ালো।

কি মা, কিছু বলবে?

তেমনি নিঃশব্দে সরযূ হাতটা তারিণীর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমার হাতটা একবার দেখ বাবা!

আনন্দে তারিণীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গেল। এতদিন পরে সত্যিই সরযূর হার হয়েছে তার কাছে।

কিন্তু তারিণী একটি কথাও বলতে পারলো না।

তার চোখের জলে সরযূর হাতের প্রত্যেকটি রেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

ব্যবসা বাণিজ্য

ভারত বাণিজ্যের গতি

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

যুদ্ধের আগুন সবেমাত্র নির্বাপিত হইয়াছে, সন্ধি পত্রের কালি, শুষ্ক হইতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই ভারতে বাণিজ্যের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা আলোচনা করিবার বিষয়। আমরা একটি বিষয়ে বিশেষ অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছিলাম। বহু প্রকারে ভারত সরকার আমাদের বুঝাইয়াছিলেন, যুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষে বিরাট শিল্প প্রসার হইতেছে এবং ভারতবর্ষ কেবল যে স্বাবলম্বী হইবে তাহা নহে, ভারতের সন্নিকটবর্তী অঞ্চলে ভারতীয় শিল্পজাত মালপত্রের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে এবং ক্রমশই ইহা ভারতীয় শিল্প বিস্তারে সহায়তা করিবে। ভারতীয় শিল্পের প্রসার কিরূপ দ্রুত হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য প্রতি বৎসরই সরকারী প্রচার পত্রিকা পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বর্ধিত কলেবরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছিল এবং তাহাদের পৃষ্ঠা সংখ্যা গণনা করিয়া মনে হইত, যুদ্ধপূর্ব কালের সহিত তুলনায় প্রচার পুস্তিকার এক এক পৃষ্ঠার হিসাবে এক একটি ভারতীয় শিল্প বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

প্রকৃত অবস্থা যে কি তাহা আমরা কতকটা উপলব্ধি করিতেছি; ভ্রান্ত আমরা পরের প্রচারে বিশ্বাস করিয়াছিলাম, এখন দেখা যাইতেছে, যে সকল শিল্প জন্মলাভ করিয়াছিল, তাহারা কেবলমাত্র যুদ্ধকালে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, সুতরাং যুদ্ধ-নিবৃত্তিতে তাহাদের দেহান্ত ঘটিয়াছে! তাহা ছাড়া অপর শিল্পের যে সমৃদ্ধি তাহা স্বদেশী আর বিদেশী কোম্পানীর লভ্যাংশ বৃদ্ধি করিয়াছে, জনসাধারণ ধনীর লোভে আত্মাহুতি দিয়াছে। ইহার উপর অপর ক্ষতি যে হইয়াছে, তাহা মারাত্মক;—যুদ্ধের সরঞ্জাম যোগাইতে যন্ত্রপাতি এত অতিরিক্ত চালিত হইয়াছে যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নূতন করিয়া অথবা নূতনের মত করিয়া মেরামত করিতে না পারিলে শীঘ্রই অচল হইয়া পড়িবে। বর্তমানে তাহাদের যে অবস্থা তাহাতে দেশের প্রয়োজনমত মাল উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে না, বিদেশে চালান দেওয়া ত দূরের কথা।

কিন্তু যাহারা সত্য সত্যই যুদ্ধ-লিপ্ত, যাহাদের যুদ্ধ চালাইতে, যুদ্ধের জন্য কাঁচা মাল যোগাইতে দুর্ভিক্ষের কবলে ৫০ লক্ষ ভারতবাসী আত্মাহুতি দিয়াছে, তাহারা নিজের কাজ ভুলে নাই। আমাদের স্তোক দিয়াছে, নিজেদের ঘর সামলাইয়াছে। আমাদের শিল্প যাহাতে হঠাৎ আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে না পারে, তাহার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখিয়াছে এবং নিজেরা যুদ্ধ-লিপ্ত বলিয়া "ভারতের প্রয়োজনের মাল সরবরাহ করিতে পারিব না" বলিয়া অনেক যুক্তি-তর্ক বিস্তার করিয়াছে।

ফলে দাঁড়াইল, ভারতের নিত্য প্রয়োজনের মালপত্রের কোনও সংস্থান না থাকায় বহু চেষ্টায় আমরা যে স্বদেশী শিল্পের ভিত্তি স্থাপন করিতে এবং তাহার প্রসারের সহায়তা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহা নিরর্থক হইয়া গেল। যাহাদের দ্রব্য বর্জন করিতে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম, যে বর্জন প্রচার করিতে "বন্দে মাতরম্" উচ্চারণ করিতে লাঠি খাইয়াছিলাম, দেশের যুবকদল অকাতরে কারাবরণ করিয়াছে, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইয়া স্বদেশী ব্রত সফল করিবার মূক নির্দেশ দিয়াছে, তাহাও ব্যর্থ হইয়া গেল। এখন বারে বারে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে, আমাদের স্বার্থ-বিরোধী জাতির নিকট নিত্য প্রয়োজনের দ্রব্যাদি পাইবার আশায়, ভিক্ষাপাত্র হাতে লইয়া সফর করিয়া বেড়াইতে হইতেছে।

বিদেশীর কূটনীতি বিফল হয় নাই; সে ধীরে ধীরে ভারতের নিকট আপনার নগ্ন মূর্তি দেখাইতেছে, বিরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া আমরা তাহাই সানন্দ চিত্তে বরণ করিয়া লইতেছি। আমরা বলিতে পারি না, যখন তাহারা আমাদের পুরাতন শিল্পগুলির পুনর্গঠনের সুযোগ সুবিধা দিবে না, যখন তাহারা ভারতীয় নূতন শিল্পের অংশ না পাইলে, যন্ত্র, বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি দিয়া কোনও সাহায্যই করিবে না, তখন তাহাদের কোনও দ্রব্যই আমরা স্পর্শ করিব না। তাহা বলিবার আজ আর উপায় নাই; আমরা আজ এমনই নিঃস্ব, আজ আমরা এমনই সহায়হীন। যুদ্ধ-জয় করিয়া আজ আমরা পরাজিত জাতি অপেক্ষা হেয়, কৃপার পাত্র।

যুদ্ধ কাগজপত্রে শেষ হইলেও প্রকৃতপক্ষে যে শেষ হয় নাই তাহা সকলেরই জানা আছে, কিন্তু বিদেশী কত তৎপর, তাহার কিছু প্রমাণ দেওয়া দরকার। যুদ্ধের শেষ তিন বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে আমরা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিব; আমরা দেখিব ভারত বাণিজ্যের গতি যে দিকে বহিতেছিল, তাহার যে পরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে আমরা অধিক মাত্রায় বিদেশীর করায়ত্ত হইয়া পড়িতেছি। সাধারণের ধারণা, যুদ্ধ উপলক্ষে আমাদের কাঁচা মালের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় ভারতীয় রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছে; প্রকৃত অবস্থা ঠিক তাহা নহে।

সাল	লক্ষ টাকা	শতকরা বৃদ্ধির হার
১৯৪২-৪৩	১৮৭,৯০	—
১৯৪৩-৪৪	১৯৯,০৩	৬·৪
১৯৪৪-৪৫	২১১,০৪	৬·৫

অর্থাৎ ১৯৪২-৪৩ সাল হইতে ১৯৪৩-৪৪ সালে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৬·৪ এবং ১৯৪৩-৪৪ হইতে ১৯৪৪-৪৫ সালে শতকরা ৬·৫ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন যুদ্ধ সর্বপ্রকারে অবসান লাভ করিবে, তাহার পর আবার নূতন কি অবস্থা দাঁড়ায় তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইংরেজ এবং তাহার 'মাসতুতো' ভাই আমেরিকা কি ভাবে বাণিজ্যের প্রসার সাধন করিতেছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। বিদেশী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ কি ভাবে হইতেছে এবং তাহার গুরুত্বের প্রভাব ভারত শিল্পের উপর কি ভাবে কাজ করিবে, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই এখন হইতে ভাবিয়া স্থির করিবেন।

সাল	লক্ষ টাকা	শতকরা বৃদ্ধি-হার
১৯৪২-৪৩	১১০,৪৪	—
১৯৪৩-৪৪	১১৭,১৮	১·১৬
১৯৪৪-৪৫	২০০,৯৮	৭০·৩০

অর্থাৎ ১৯৪২-৪৩ সালের গুরুতর যুদ্ধের অবস্থা হইতে ১৯৪৩-৪৪ সালে বিদেশী এদেশে বিশেষ বেশী মাল পাঠাইতে পারে নাই, কিন্তু যুদ্ধের চাপ একটু কম পড়িতেই ১৯৪৩-৪৪ সাল হইতে ১৯৪৪-৪৫ সালে শতকরা ৭০·৩ ভাগ মূল্যের বেশী মাল পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছে।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে হইলে যুদ্ধের পূর্বের আমদানীর কথা একবার আলোচনা করা দরকার। ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৫২ কোটী ৩২ লক্ষ টাকার মাল আসিয়াছিল; আর এখন দাঁড়াইয়াছে ২০০ কোটী ৫৮ লক্ষ। বলা যাইতে পারে, তখনকার মালের দর কম ছিল, কাজে কাজেই এখনকার মূল্য দেখিয়া পূর্বের সহিত তুলনা করা ভুল হইবে। কিন্তু অপর দিকেও ভাবা দরকার; তখন যুদ্ধ ছিল না, ইউরোপ বিধ্বস্ত হয় নাই, জার্মাণী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি সকলেই মাল পাঠাইত, এখন তাহাদের অবস্থা কাহিল, আর আমেরিকার কোনও বালাই ছিল না।

সুতরাং সকল দিক বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, অবস্থা গুরুতর হইয়াছে। তখন যে সকল মাল ভারতীয় শিল্প উৎপন্ন করিত, তাহা এখন করিতে পারে না, তাহাতেই সমস্যা জটিলতর হইয়াছে। ক্রমশ অধিকতর পরিমাণে মাল আমদানী না করিলে আমাদের উপায় নাই।

আরও এক কথা। জার্মাণী, জাপান প্রভৃতি সকলে মিলিয়া ভারতের বাজারে যে বেচা-কেনা করিত, এখন তাহারা তাহা করিল না, অথচ আমদানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ভারতীয় শিল্প পঙ্গু হইয়া রহিল। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, অপর জাতি অবশ্যই আমাদের মিত্র-পক্ষ জাতি—ধীরে ধীরে আপনার মোহের জাল ভারতবাসীর উপর বিস্তার করি-তেছে। ইহা যে মোটেই শুভ লক্ষণ নহে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন।

যে সকল মাল আমদানী হইয়াছে বর্তমান পরিস্থিতিতে মনে হইবে, তাহা না হইলে আমাদের চলিবার আর উপায় নাই; বিদেশী সুব্যবস্থার ইহাই বৈচিত্র্য। খাদ্য তণ্ডুল আসিয়াছে আট কোটী টাকা মূল্যের। বর্তমান অন্ন-সমস্যার দিনে আপত্তি জানাইয়া লাভ নাই, কিন্তু একটা কথা না বলিয়া চলে না। আমাদের দেশের চাষের অবনতি রোধ করিবার ব্যবস্থা কিছুই হয় নাই, উন্নতির কথা দূরে থাকুক। কৃষি বিভাগ, কৃষি গবেষণা ক্ষেত্র সবই প্রহসনের রঙ্গমঞ্চ। তাহার উপর ভারত সরকারের খাদ্যশস্য বৃদ্ধি আন্দোলন যে কত বড় অন্তঃসার-শূন্য ঘটনা তাহা আমদানীর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তণ্ডুল আমদানীর অপর একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা খনিজ তেলের আমদানী। যুদ্ধ-পূর্বে ইহা ১৫ কোটী টাকা ছিল, বর্তমানে (১৯৪৪-৪৫) ইহা ৮১ কোটী টাকা হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে ইহা বে-সরকারী আমদানী; যুদ্ধ-সংক্রান্ত আমদানী ধার ইজারা হিসাবে আসিয়াছে। দুঃখ এবং চিন্তার বিষয় বিদেশী তুলার আমদানীর দারুণ বৃদ্ধি। যুদ্ধের পূর্বে ইহা সাড়ে ৮ কোটি টাকা ছিল, আলোচ্যবর্ষে ইহা ২৪ কোটি টাকা হইয়াছে। ভারতীয় মিল ক্রমশ বিদেশী তুলা ব্যবহারে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে কেবল যে দেশীয় তুলার বিপদ তাহা নহে, বিদেশী আমদানী রোধ করা পরে কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া পড়িতে পারে। রাসায়নিক দ্রব্যাদি, রঞ্জন দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, ধাতব দ্রব্যাদি, কাগজ, কার্পাস বস্ত্রাদি সকলেই যে যাহার আপন পথে অগ্রসর হইয়াছে। তামাকজাত বিদেশী দ্রব্য প্রায় দেড় কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পথ চলিতে চলিতে যে পরিমাণ সিগারেট ব্যবহারের নমুনা পাওয়া যায়, তাহাতে আশঙ্কা আছে, ইহা শীঘ্রই তিন কোটি টাকা দাঁড়াইবে। কতগুলি লোকের হাতে যে বিশেষ অর্থাগম হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় বহুমূল্য মণি-পাথরের আমদানী বৃদ্ধি হইতে। ১৯৪২-৪৩ সালের ৫৬ লক্ষ টাকার আমদানী ১৯৪৪-৪৫ সালে ২ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা হইয়াছে অর্থাৎ দুই কোটি বাড়িয়াছে। ধন্য দেশ!

রপ্তানির ব্যাপারে আমাদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। পাটজাত দ্রব্যাদির বৃদ্ধি কিছু শুভলক্ষণ। পাটের থলে বা বস্তা এবং পাটের কাপড় যথাক্রমে ১৯৪৩-৪৪ হইতে ১৯৪৪-৪৫ সালে বৃদ্ধি পাইয়া ২০ কোটি হইতে ২৪ কোটি এবং ২৯ কোটি হইতে ৩৪ কোটি টাকা হইয়াছে। রপ্তানির অপর প্রধান দ্রব্য চা; ১৯৪৩-৪৪ এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে ৩৭ কোটি টাকায় অপরিবর্তিত অবস্থায় আছে, যুদ্ধের পূর্বে ইহা ২৩ কোটি টাকায় ছিল। সুতরাং চায়ের দর পড়িলে ইহা পূর্বাবস্থায় আসিতে বিলম্ব হইবে না। তাহা ছাড়া মোটামুটি যাহা গিয়াছে, তাহা জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক নয়, উহা কাঁচা বা অপরিবর্তিত অবস্থায় গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে লাক্ষার স্থান খুবই উচ্চে। ১৯৪২-৪৩, ১৯৪৩-৪৪ এবং ১৯৪৪-৪৫ সালে যথাক্রমে ইহার মূল্যে ২ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা, ২ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা এবং ৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের শেষ দিকটায় ভারতীয় লাক্ষার উপর খুব বেশী টান পড়িয়াছে, কারণ যৌগিক প্লাষ্টিক প্রস্তুত করিবার উপকরণ সংগ্রহে বিশেষ অসুবিধা ঘটে। ভারতের অভ্রের মত গুণশালী অভ্র কোথাও পাওয়া যায় না; তাহাতে উহা রপ্তানির পরিমাণ প্রায় তিন কোটি টাকা। আমাদের দেশে যখন অভ্রের প্রয়োজন হইবে, তখন আমরা বিদেশ হইতে আমদানী করিব, এই আশঙ্কা। আমাদের দেশে অভ্র সংক্রান্ত শিল্পের আশানুরূপ প্রসার নাই, তাহা ছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে যত অভ্র প্রয়োজন হইয়াছে, এখন আর তাহা লাগিবে না। সুতরাং উভয় দিক দিয়াই আমাদের বিপদ। তুলো এক সময় ৯৫ কোটি টাকার রপ্তানি গিয়াছে, এখন দাঁড়াইয়াছে সাত কোটি টাকা। আবার কাঁচা পশম রপ্তানি বাড়িয়াছে। বিদেশী পশমী মাল আসার সুযোগ উপস্থিত হইতেছে। কার্পাস বস্ত্রাদির রপ্তানি সামান্য কমিয়াছে, সাড়ে ৩৬ হইতে ৩৪ কোটি টাকা হইয়াছে। দেশে যখন দারুণ বস্ত্রাভাব, তখন বিদেশে এই-ভাবে বস্ত্র রপ্তানি করা এক ভারত সরকারের পক্ষেই সম্ভব।

বিদেশী যন্ত্রপাতির মালিকরা ভারতকে কোনও সাহায্য করিল না, তাহাদের দেশে উহার প্রয়োজন আছে বলিয়া। কিন্তু আমাদের দেশে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলেও, আমরা তণ্ডুল রপ্তানি করিতে বাধ্য হই, যেহেতু আমাদের "প্রভুর" উহাতে স্বার্থ-সিদ্ধি হইবে। সকল কথা এক সঙ্গে আলোচনা করিলে ঘুরিয়া ফিরিয়া মনে পড়ে, স্বাধীনতা না আসিলে কোনও দিকই রক্ষা করা যাইবে না।

ভারত বাণিজ্যের গতির আরও একটা দিক আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। আগে, বহুকাল হইতে অর্থাৎ প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া ইংরেজ ভারতকে শোষণ করিয়াছে, তাহার স্থান বরাবরই প্রধান। এইবার "মাসতুতো" ভাই আমেরিকার শক্ত পাল্লায় পড়িয়া তাহার কিঞ্চিৎ দুরবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। যে সকল আমেরিকান বন্ধু-বান্ধবের সহিত আলাপ আলোচনা হইয়াছে, তাঁহারা আমাদের এই দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বার্থ-সিদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের যে বিপদ বাড়ে নাই, তাহা বলা যায় না।

১৯৩৭-৩৮ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে আমেরিকা হইতে আমদানীর পরিমাণ যথাক্রমে ১৩ কোটি এবং ৮ কোটি টাকা ছিল। ১৯৪৪-৪৫ সালে ৫০ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা হইয়াছে। ইহাতে আরও একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার রহিয়াছে। আমেরিকা আজ ভারত বাণিজ্যে ইংরেজকে অনেক পিছাইয়া ফেলিয়াছে; তাহার অংশে সাড়ে ৫০ কোটি টাকার স্থলে ইংরেজের ৪০ কোটি টাকা হইয়াছে। অর্থাৎ মোট ২০১ কোটি টাকা আমদানী বাণিজ্যে আমেরিকা প্রতি শত টাকার মধ্যে লইয়াছে ২৫.১০ আর ইংরেজ ১৯.৯৮ অর্থাৎ কুড়ি টাকারও কম।

নানা অজুহাতে ইংরেজ অপর জাতিকে ভারত বাণিজ্যে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। চুক্তি, শুল্ক প্রভৃতি ভদ্রনামে নিজের সুবিধাজনক যত উপায় আছে, তাহা সে বরাবরই অবলম্বন করিয়াছে। এখন দেনার দায়ে আমেরিকার নিকট ইংরেজ বিক্রীত হইয়া আছে, সুতরাং এক্ষেত্রে ঐ সকল সনাতন প্রথা অবলম্বন করিতে তাহার দ্বিধাসংকোচ হইতে পারে।

ভারত বাণিজ্যের গতি এইবার মোড় ফিরিল বলিয়া মনে করা অযৌক্তিক নয়। যুদ্ধ শেষে আমেরিকা ইংলণ্ড হইতেও বহু প্রকারে শক্তিশালী, সমর্থ আছে। ইংলণ্ড বিধ্বস্ত, বিব্রত; ঘর সামলাইতে তাহাকে এখন বেশ কিছুদিন আপনাকে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইবে। আমেরিকার পক্ষে ইহা পরম সুযোগ, এরূপ মনে করা হয়ত ভুল হইবে না। ভারতকে শিল্পপ্রচেষ্টায় সাহায্য না করিবার পক্ষে সে তাহার নিকট আত্মীয় ইংরেজের সহিত একমত হইলেও, ভারতবর্ষের বাজারে আত্মপ্রভাব বিস্তার করিয়া ইংরেজকে হটাইতে পারিলে সে পশ্চাদপদ হইবে না।

অনুবাদসাহিত্য

মথাগ্ন

উমাশঙ্কর যোশী

[আধুনিক গুজরাটি লেখকের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন উমাশংকর। ইনি বম্বের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা এবং অবসর সময়ে সাহিত্যসেবা করেন। এ পর্যন্ত 'বিশ্বশান্তি' ও 'গঙ্গোত্রী' নামক কবিতা পুস্তক, 'সাপ না মারা' নামক একাঙ্কিকা সংগ্রহ এবং শ্রাবণীমেলা' নামক গল্প-সংগ্রহ এই কখানি বই প্রকাশিত হয়েছে। গুজরাটে এ'র লেখা অত্যন্ত জনপ্রিয়।]

সূর্যাস্ত। পশ্চিমমুখো ঘর। সন্ধ্যার কেশরী রঙের প্রলেপ লাগানো বারান্দায় খাটিয়ার ওপরে বসে বেণী আর হিম্মৎ। হিম্মৎ বাঁশের ছড়ি ধরে উঠে দাঁড়ালো।

'আচ্ছা, বেণীলাল! সময় থাকতে কুয়োতলাটা একবার ঘুরে যাই। এখন থেকেই দেখছো না ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ হয়েছে......'

'অতো জলদি কেন?' বেণী বললে।

ঠিক সেই সময় একটি স্ত্রীলোক সাড়ি সামলাতে সামলাতে এদের দুজনের পাশ দিয়ে চলে গেল। হাতে তার একটা ঘুটে। এদিকে ওদিকে চেয়ে তার পায়ের গতিতে সান্ধ্য-তেজ দেখেই যেন হতচকিত হয়ে হিম্মৎ খাটিয়ায় আবার বসে যায়। বাঁশের সেই গাঁটিয়ালা ছড়িটা দুজনের মাঝে থাকে। বেণী বলে ওঠে—

'বোধ হয় আগুন নিতে এসেচে।'

'ব্যাপার কি বলতো?'

'শুনিস্‌নি বুঝি? জয়রাম তো গেলো মরে; এখন তো ঐ বুড়ি, বেচারীকে যেন চিবিয়ে খাচ্ছে।'

'বুড়ী তো তোরও চাচী হয় না! তোর কুটুম্ব হয়েও ঐ রকম? তবে কিন্তু আমি লিখে দিতে পারি, দেখিস তোর জীবীও বুড়ীকে চিবিয়ে খাবে, দেখিস '

'আরে নে! কুটুম্বের সঙ্গে লেনদেন কিসের রে? এখন সব সম্পর্কই তো চুকে গেছে। এখন আর মুখের কুটুম্বিতেটুকুও নেই, বাপ-দাদার আমলের ঘরই যা পাশা-পাশি শুধু। এছাড়া আর কিছুই নেই এখন। ঐ ডাইনী বুড়ী......'

'ও বেচারীর কি দোষ? তোমরা যেমন ব্যবহার দেখাবে, সেও চলবে সেইরকম, সে তো জানা কথা।'

'ও! তোর যে খুব দরদ দেখছি! তাহলে আয় না, এই টিলের ওপরে কুঁড়ে বেঁধে তুইও থেকে যা!'

জীবী ঘুটের ওপরে আগুন নিয়ে ফিরে চললো।

লালিমা চলে গিয়েও মনে হলো ওর মুখ দেখে সন্ধ্যা যেন আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। গম্ভীরমুখে, দৃঢ়পদবিক্ষেপে ও হিম্মৎ আর বেণীর পাশ কাটিয়ে ছড়িটা ডিঙিয়ে যাবে কি হিম্মৎও দাঁড়িয়ে উঠল যাবার জন্যে। 'আচ্ছা মকাই ক্ষেতে আবার জানোয়ার ঢুকলো কি দেখি!'

নিজের কথা নিজেরই কানে বোধ হয় পেঁছিলো না। ছড়ির গাঁটে সাড়ী আটকে জীবী পড়তে পড়তে বেঁচে গেল, হাতের ঘুটে টুকরো হয়ে উঠানময় আগুন ছড়িয়ে পড়লো।

আগুনের চেয়ে চোখ লাল করে জীবী ওদের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—

'দেখতে পাও না? অন্ধ নাকি! বুদ্ধি নেই, পড়ে যেতুম যদি? আগুন যদি গায়ে পড়তো?'

ক্রোধে রাঙা ওর দেহের ওপর সন্ধ্যার অন্তিম লালিমা ওর ক্রোধের প্রভাব যেন লোপ করে দিতে লাগলো। ওরা দু'জনে চুপচাপ বসে, যেন জীবীর রাগের মধ্যে একটা উপভোগ্য কিছু ছিল।

জীবীর ঠোঁট ক্রোধে কাঁপতে লাগলো। নিষ্প্রভ সন্ধ্যার সেই মুহূর্তে ওকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল। হিম্মৎ আর বেণী চকমকী জেবলে ওকে দেখতে লাগলো, অপূর্ব আনন্দের সঙ্গে।

জীবী আর থাকতে পারলে না। চেঁচিয়ে উঠলো—'হারামজাদারা কোথাকার! মুখ দেখগে যা তোর মা-বোনের।' বলতে বলতে উঠোন থেকে ঘুটের এক টুকরো কুড়িয়ে নিলে।

ঠিক সেই মুহূর্তে 'মা'র নাম শুনে, বেণীর মা, পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের এক বৃদ্ধা হাতে হাঁড়ি নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালো। আকাশে—এবং সবায়ের মুখের ওপর অন্ধকার ছেয়ে গেল।

'কি রে বেণী? অত গোলমাল কিসের?'

'কিছু নয় মা। বৌদি আগুন নিয়ে যাচ্ছিল, তা হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে আমাদের গালি দিচ্ছে।'

'হোঁচট খেয়েচি! হোঁচট থাক্ তোর শত্তুর।' জীবী বলে উঠলো। তারপর বৃদ্ধার দিকে চেয়ে বললে, 'বেণীকে বলে দাও, ভদ্দরতা শেখে যেন, আর সারা গাঁয়ের বদমায়েসদের যেন এখেনে না জড়ো করে!'

বৃদ্ধা হিম্মতের দিকে চাইলে।

'না না মাসিমা, আমি তো কুয়োতলায় যাচ্ছিলাম। বেণী ডাকলে তাই এসে বসেছিলুম।'

'......ওর স্বভাবই ঐরকম মাসিমা। আমাকে দেখলেই যেন কাটতে আসে! অথচ কি যে ওর করেছি আমি!'

'দেখ্ জীবী! তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না, তবে মিছিমিছি যদি এমন দুর্নাম করবি তো আগুন নিতে আসা কেন বাপু?'

'আমি নিজের কাজে, নয় মঙ্গলের জন্যে। তা যদি ব'লে দাও আসতে হবে না, আসবো না। কিন্তু এলে যে সারা গাঁয়ের লোক ঠাট্টা-ইয়ার্কী করবে......'

আর বেশী বলতে পারলে না। কণ্ঠ রোধ হ'য়ে এলো।

'কাঁদিস্‌নি বাপু! এক্ষুনি ঐ ডাইনী এসে লড়াই শুরু করবে! জানিস তো আমি ওর কাছে ঘেঁসি না, কথাও বলি না পর্যন্ত। তুই আসা-যাওয়া করিস, তাই তোর সঙ্গে কথাবার্তা বলি, তোর কানে কি ফুঁকে দিয়েছে, তুইই জানিস।'

কার কানে ফুঁকে দিইচি রে?' বলতে বলতে পাশের ঘর থেকে জীবীর শাশুড়ী অতিকষ্টে দালান পর্যন্ত এসে বললে, 'বলি, তুমি কানে ফুঁকচো না আমি?' বলতে বলতে তুলোর সলতের মত ভ্রূর ওপর কম্পমান আঙুলের সাহায্যে মাথাটা ধরে বারান্দা আর উঠোনের দৃশ্যটা দেখে নিলে।

'এই ঠাণ্ডায় বাইরে এলে কেন মা?' শাশুড়ীকে ভিতরে পাঠাবার জন্যে জীবী বললে।

হিম্মৎ ছড়িটা নিয়ে যেতে উদ্যত হলো।

'যাচ্ছিস যে বড়ো?' জীবী বললে, 'তোদের দুজনের মাথায় এই আগুন যদি না চেপে ধরি তো আমার নামই নয়! সোজা চলে যাচ্ছি, তা পায়ের ভেতর লাঠিটা জড়িয়ে কেন দিলি?'

'হুঁ।' জীবীর শাশুড়ী এবারে বললে, 'হারামজাদা! আমার বেটাটাকে তো খেয়েচিস, এখন এই বেচারীর পিছনে কেন লেগেচিস বল? আগুন লাগবে যে তোর ঘরে!'

হিম্মৎ কিছু না বলে রাস্তা নিলে। শাশুড়ী বৌয়ের রাগ আরও বেড়ে গেল।

'শুনে রাখ বেণী! নিজেদের মধ্যে যত শত্রুতা থাক, জীবী তো কুটুম-বৌ, আর তুই থাকতে তোমই উঠোনে ওকে কেউ ইয়ার্কী-ঠাট্টা করবে, তাতে তোর ভাল হবে ভেবেচিস?'

'ভাল না দেখায়, না দেখাক। ভাল দেখাবার দরকার হলে তোমায় ডাকবো'খন। মিছিমিছি যত সব আপদ এসে জোটে! চল বৌদি, ঘুটে কুড়িয়ে আগুন নিয়ে রাস্তা দেখ তো?'

'খবরদার জীবী। থাক পড়ে। জ্বলুক ওদের ঘর।'

বেণী জ্বলে উঠলো।

'দেখ্ বুড়ী, মুখ সামলে ব'লো, নয়তো দেবো মাথা চুরমার ক'রে।'

'বেণী ঘরে আসবি কি বল? ডাইনী তোকে খাবে তবে ছাড়বে। ঘরে আয় বলচি।' বেণীর মা বললে।

'ডাইনী? আর তুই কোন্ মন্দিরের দেবী রে? লজ্জা করে না! বুড়ী হয়ে মরতে চললি, তবু বেটার মাথা খাচ্চিস? আমড়া গাছে কি আর আম ফলে রে?'

'থাক আমার আমড়াই থাক। আমাদের কথায় তুই কেন মাথা গলাচ্চিস! ছেলেটার ওপর নজর দিয়েই আছে—যা ভাগ এখান থেকে!'

'হারামজাদা! কেন বলবে আমার বৌকে?'

বেণীর ডানপিটে ছেলে মংগু হাতে রুটির টুকরো নিয়ে চিবোতে চিবোতে বাইরে এসে চেঁচিয়ে উঠলো—'চাচী! ও চাচী! এই আগুন, আগুন ছড়ালো কি ক'রে? বেশ হয়েছে—কেমন মজা!'

'বুড়ীয়া যাবি, না না? দোব ঠুকে? তোর বৌও আজীব মেয়েমানুষ—কেউ কিছু বললে না, শুধু শুধু এলো ঝগড়া করতে। যাও না বৌদি, ঢের হয়েছে। কে আসতে বলেচে এখানে?'

'বেণী! ঘরে আসবি কি বল? মংগুকেও নিয়ে আয়। যে ঠাণ্ডা পড়েছে—এ ডাইনীটাও যদি হটবার নাম নেয়।'

'জীবী, আয় তো এদিকে।'

'এত বড় ঘুটে এনেছিলি, সারা উঠানময় আগুন ছড়িয়ে রেখেচিস—সাফ করবার জন্যে কে তোর চাকর আছে রে? যা সব সাফ ক'রে ঘরে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া করে আপনার রাজত্ব করগে।' হাসতে হাসতে বেণী বললে।

'আস্ত ঘুটে নিয়ে এসেছিলো বুঝি? ও! বুড়ী তাহলে শিখিয়ে পড়িয়েই পাঠিয়েছিল? নয়তো অতো বুড়ো মেয়ের খেয়াল নেই যে, আস্ত ঘুটে নিয়ে আসতে নেই? দেখ্ তোকে বলে রাখচি, টুকরো নিয়ে আসতে হয়তো আসবি, নয়তো গোটা ঘুটে নিয়ে আসবি তো.........' বেণীর মা বলতে লাগলো।

মংগু জীবীকে বললে, 'দাও চাচী, আমি দিচ্ছি জড়ো করে।' কিন্তু মার চোখ দেখে চুপচাপ ভিতরে চলে গেল।

জীবীর শাশুড়ীকে এতো দুর্বল দেখাচ্ছিল যে, কোন কথা বলাও যেন ওর ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু না বলেই বা ও থাকে কি ক'রে?

'জীবী, আসবি কি না? ঘুটের টুকরো বৈতো নয়? থাকতে দে পড়ে......লাগুক ওর কপালে আগুন।'

'দেখ্ বুড়ী! বেশী বকবক করিস তো দেবো......' বেণী আর চুপ করে থাকতে পারলে না।'

সমাধানের চেষ্টায় বেণীর মা বললে—'ঘরে আসবি কি বল? কখন থেকে বলচি না তোকে? নির্বংশ ছাড়া ও কি আর কিছু ভাবতে পারে? নিজের ঘর তো নির্বংশ হয়ে আছে, এখন আমার ঘরও তাই দেখতে চায়। সাক্ষাৎ কেউটে যে! উফ্! যা বলছি—

'বলচি তো, সব যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকো।' হাঁপাতে হাঁপাতে জীবীর শাশুড়ী বললে। ঝগড়ার সঙ্গে অন্ধকারও ঘনীভূত হয়ে আসতে লাগলো।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বাঁচবোই তো! আর তুই দেখবি আর জ্বলে পুড়ে মরবি! পাড়াপড়শীরাও তবু নিজের না হলে পরের জন্যেও ব'লে ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক; ভারী আমার কুটুম্ব রে!'

'অমন কুটুম্বর মুখে আগুন।'

'তা তো ঠিকই। মুখে আগুন কি আর খারাপ লোকেরও বাদ থাকে?' বেণী বললে, 'সেবার মামা মরতে আমিই তো আগুন নিয়ে শ্মশানে গেলুম। আর এই জয়রাম মরবার সময়—সেও তো আমিই——তোমাদের তখন কথা পর্যন্ত বন্ধ—আগুন নিয়ে আমিই তো গেলুম আগে আগে। কৈ গাঁয়ের তো আর কেউ এলো না আগুন নিয়ে যেতে?'

বেণীর মা বললে, 'তবুও তোর অত মুখসাপট! অমর হয়ে থাকার বর নিয়ে এয়েচিস নাকি? সারাজীবন তোরা শাপমন্যি দিলেও শেষে দেখিস ম'লে আমাদেরই যেতে হবে তোদের আগুন বয়ে!'

জীবী শাশুড়ীর পাশে গিয়ে তাকে ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল।

'আমার বেটাকে সইতে পারিস না, শেষে ঐ তোকে শ্মশানে পেঁাছবে দেখবি! ও তোর মুখে আগুন দিলে তবে স্বর্গে যেতে পারবি।' বেণীর মা ঘরে যেতে যেতে বলে গেল।

জীবী শাশুড়ীকে ধরে ভেতরে নিয়ে গেল এবং খাটিয়ায় শুইয়ে জল দিলে। জল খেয়ে শাশুড়ী বললে, 'কোথায় চললি?'

'কোথাও নয় মা, তবে বল তো সামনের বাড়ি থেকে আগুন নিয়ে আসি।'

'আর থাক মা! ভয় করে, অন্ধকারে একলা কি ক'রে যাবি বল? রাস্তায় শত্তুরের তো অভাব নেই, তুইও যাবি, আর বেণী এসে যদি আমার গলা টিপে মারে?' দম নেবার জন্যে একটু থেমে আবার বললে, 'তা আর হবেই বা কি? মরবো, এই তো! তোর বড় শীত লেগেচে, না? তেমন শীত তো নেই, না? শীত তা, হ্যাঁ শীত...... দেখ তো—এই ছেঁড়া কাঁথাটা নে; আর ঐ সাড়ীখানাও।'

কাঁথাটা তুলে নিয়ে বিনা অগ্নি আংটা আর নিস্প্রদীপ অন্ধকারে জীবী বসলো।

'আমারও ভুল, দুপুরে যদি আগুন রেখে দিতুম! বেনের দোকানে দেশলাইও দেয় না, ধান দিই তবুও। হারামজাদা বলে, নগদ পয়সা আনো! ওরাও কাজ করিয়ে নগদ পয়সা দিতে চায় না। মলো বেচে এলে তবু কিছু পয়সা পাওয়া যেতো। ঘরের জন্যেও তো কাঠ চাই?'

'থাক্‌গে রে থাক্!......তুই শোন মা এদিকে।'

সামনে পশ্চিম থেকে হাওয়া চলেছে।

'আগে সামনের দরজাটা ঠিক ক'রে লাগিয়ে দে.........দিইচিস মা?'

'লাগানোই তো রয়েচে! হাওয়া যে দরজার ফাঁক দিয়ে আসছে। আর আছেই বা কি দরজায়?'

'ওতে কিছু হবে না মা! যাক্‌গে...... তুই শোন। বোধ হয়......আচ্ছা আমি যদি মরি......আমার বোধ হয় হ'য়ে এসেচে...... আজকাল ব্যারামে পড়ে থাকি খালি, আর সবাই পেছনেও লাগে যেন বেশী ক'রে...... মরিই যদি তো একটা কাজ করতে হবে, করবি তো?'

অন্ধকারে কেউ কারুর মুখ দেখতে পায় না, যেন ভূতপ্রেতের মত কথা বলে যাচ্ছে। দুজনে তা উপলব্ধিও করছে।

'কি মা?'

'তবেই হয়েচে! তাও পারবি না?'

'কি বলবে, তবে তো?'

'দেখ্, আমি ম'লে আগুন নিয়ে তুই শ্মশানে যাবি। বুঝলি? বেণী কি বেণীর ছেলে যদি ও কাজ নেয় তো জন্ম জন্ম আমার আত্মা গুমুরে মরবে। যা বললুম, করবি তো?'

ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে, কুঁকড়ে বসে যেন তন্দ্রার ঘোরে জীবী উত্তরে বললে,—

'আচ্ছা, তাই করবো। ওতে আর কি? সব্বাইকে দেবো বের ক'রে। খারাপ একটু দেখাবে, তা হোক্! বেণীর হাতের আগুন পেলে নরক ছাড়া আর গতি হবে কি? ওর

হাতের আগ্নুন আমি মানতে পারি কখনো?

'ও নিজের আগুন শ্মশানে নিয়ে থাক, না যাক, আমাদের কি? দেখ......দে তো মা তোর হাতখানা.....তুই-ই আমার আগ্নুন নিয়ে যাবি, কেমন?'

'নিশ্চয়, আমিই নিয়ে যাবো।'

এর পর চুপচাপ।

হাওয়া দরজার ফাঁক দিয়ে যেন ছ্নরির ফলার মত জীবীর গায়ে কেটে যেতে লাগলো।

'মা......শ্ননছো?'

'অ্যাঁ!'

'আর আমিও যদি মরে যাই তো........ তাহলে কে আগ্নুন নিয়ে যাবে?......তুমি বে'চে থাকলে তুমিই তো নিয়ে যাবে, না?'

'তা যাব, কিন্তু আমি কি আর বাঁচবো রে।' স্বরে যেন প্রচ্ছন্ন পরিহাস।

'হ্যাঁ, বে'চে থাকলে তবেই তো! যদ্দ্নর পারবে নিয়ে যাবে, না পারলে তখন যাত্রীদের কার্নর হাতে দিয়ে দিও।......'

'আচ্ছা।'

এরপর দ্নজনে ঘ্নমিয়ে পড়লো কি না বলা শক্ত, কারণ সারারাত সন্‌সনে হাওয়া দরজায় ধাক্কা মেরে মেরে দ্নটি শব্দ শ্ননিয়ে দিতে লাগলো—

'হ্নঃ!'

'হ্নঃ!'

সকালে রোদ ওঠার কিছ্ন পরে মংগ্ন নারকোলপাতার বিড়ি ধরিয়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো। তখনো চাচীকে না দেখতে পেয়ে ও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ছিল যেন। শেষে মা-ব্নপের দ্নষ্টি এড়িয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে খিল টেনে দরজাটা খ্নলে ফেলে ভিতরে গিয়ে দাঁড়ালো।

'চাচী! এখনও শ্নয়ে আছ যে বড়! দেখো তো সামনের ঘরে চালায় কত রোদ এসে গেছে?'

'আরে! উঠবে কি না বল?'

'ইচ্ছে ক'রে কথা বলবে না ব্নঝি? বাবা মা তো ঝগড়া ক'রলে, আমি ব্নঝি ঝগড়া করিচি?'

'কথা বলবে না তো? এবারে না ব'ললে বিড়ির আগ্নুন গায়ে চেপে দেবো কিন্তু বলচি!'

'বেশ তো, আগ্নুন দরকার ছিল, আমাকে বললে হতো না ব্নঝি! চুপিচুপি এনে দিতুম। বাবা আর মা তো অমনিই— আংগটার কাছে ঘ্নটে একখানা পড়েছিল, সেটা ভেঙে বিড়ির আগ্ননে জ্বালিয়ে নিলে।

'কেউ নড়চো না যে বড়।'

'এবারে কিন্তু তোমাদের দোষ......তিন অবধি গ্ননবো......না উঠলে সত্যি সত্যি আগ্নুন চেপে দেবো।'

'এক, দ্নই......তিন......'

আর সেই সঙ্গে চাচীর হাতে জ্বলন্ত বিড়ি চেপে ধরলে। কিন্তু এক রোমও শিউরে উঠলো না।

'চাচী! ও চাচী!' ঠান্ডা লাগচে যে তোমার?' সাড়ীটা গায়ে দিয়ে নাও না।

একদম আড়ি ব্নঝি?—বলে জীবীর কোলের ভেতরে ল্নকোতে যেতেই জীবী যেন গ্ননগ্ননিয়ে উঠলো—

'হ্নট্.........হ্নঃ!'

অন্নবাদক—**পঙ্কজ দত্ত**



আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৬

আবারও ঘুম ভাঙিল পাঁচু গাড়োয়ানের ডাকাডাকিতে। অশোক এবং নবগোপাল উভয়ে উঠিয়া বসিয়া দেখিল দোলতপুরের পাকা সড়ক কখন্ পশ্চাতে ফেলিয়া গাড়ি সঙ্কীর্ণ কাঁচা রাস্তায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাঁচু বলিল, "হরিপুরের মোড় এসেছে বাবু, এইখানে ত' আপনি নেবে যাবেন?"

"হ্যাঁ।" বলিয়া নবগোপাল একটা বড় রকম হাই তুলিয়া দক্ষিণ হস্তে তুড়ি বাজাইল, তাহার পর ছাতা লইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল।

শিবানীপুর পর্যন্ত না গিয়া নবগোপাল হরিপুরের পথে নামিয়া পদব্রজে গৃহে যাইবে, এ ব্যবস্থার কথা অশোক অবগত ছিল। তথাপি সে বলিল, "আপনাকে হরিপুরে পৌঁছে দিয়ে যাই নবগোপাল বাবু, রোদ কড়া হয়েছে, আপনার কষ্ট হবে।"

"রোদ কড়া হয়েছে ত' এ রয়েছে কেন?" বলিয়া নবগোপাল হাসিমুখে ছাতা আগাইয়া দেখাইল। তাহার পর নিকটে ঘেঁসিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, "বৈকেল চারটে সাড়ে চারটের সময়ে আমি আসব। আমাকে দেখে যেন চেনো না, যেন প্রথম দেখলে, অপর লোকের কাছে এইরকম ভাব কোরো। বুঝলে?"

এ সকল পরামর্শই পূর্বে হইয়াছিল, তথাপি অশোক হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।"

"আর দেখ, ঐ ভবতারা মাসী একটি খাণ্ডার মেয়েমানুষ, ওর সঙ্গে বেশি মেলা-মেশা, বেশি কথাবার্তা কোরো না,—ঐ দু'চারটে আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো মামুলি কথা:—বুঝলে?"

ঘাড় নাড়িয়া অশোক সম্মতি জানাইল।

দুই চার পা আগাইয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া ঘেঁসিয়া নবগোপাল বলিল, "আর একটা কথা অশোকবাবু। এই শেরাবোন মাসে একটা বিয়ের তারিখ ঠিক ক'রে এবারে একেবারে 'ফাইনেল' কথা দিয়ে এসো ভাই,—তা হ'লে গিরি মাসী হয়ত বেঁচে উঠবে। বুঝলে? একেবারে 'ফাইনেল' কথা।"

অশোক বলিল, "দেখি।"

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া নির্বন্ধ সহকারে নবগোপাল বলিল, "দেখি বললে হবে না ভায়া। সে তোমাকে একেবারে সোয়ামী ব'লে ধ'রে রেখেছে। বল, 'আচ্ছা'।"

মৃদু হাসিয়া অশোক বলিল, "কাল ত' আপনাকে সব কথা বলেছি, একেবারে 'আচ্ছা' কি ক'রে বলি বলুন?"

"পাঁচু!"

গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িয়া নবগোপালের সম্মুখে আসিয়া পাঁচু বলিল, "বাবু?"

"যা বলেছি মনে থাকে যেন। খবরদার কেউ যেন জানতে না পারে।"

মাথা নাড়িয়া পাঁচু বলিল, "না বাবু, কেউ জানতে পারবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"আচ্ছা, যত্ন ক'রে বাবুকে শিবানীপুর নিয়ে যাও। তারপর আজ হোক, কাল হোক, বাবুকে সাতক্ষীরের বাসে তুলে দিয়ে তবে তোমার ছুটি।"

"যে আজ্ঞে বাবু, তাই হবে।"

"আচ্ছা, গাড়ি ছেড়ে দাও।" বলিয়া নবগোপাল ছাতা মাথায় দিয়া হরিপুরের পথে নামিয়া গেল। পাঁচু গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া মুখে হিররে হিররে শব্দ করিতে করিতে এবং দুই হস্তের প্ররোচনায় বলদ-দ্বয়কে অতিমাত্রায় উত্তেজিত করিতে করিতে সজোরে গাড়ি ছুটাইয়া চলিল।

প্রায় পোয়া মাইলটাক পথ ঐ বেগে আসিবার পরও পাঁচুর উৎসাহ শিথিল হইতেছে না দেখিয়া অশোক প্রতিবাদ না করিয়া পারিল না; বলিল, "পাঁচু, তোমার গাড়িতে স্প্রীং নেই, সে কথা একেবারে ভুলো না।"

গাড়ির গতি কিছু মন্থর করিয়া পাঁচু বলিল, "কেন বাবু, কষ্ট হচ্ছে না-কি?"

"তা একটু হচ্ছে বইকি।"

"আচ্ছা, তা হ'লে মিঠে চালেই চলি।" বলিয়া গতি আরও কিছু মন্থর করিয়া পাঁচু পূর্বের চাল অবলম্বন করিল।

গরুর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া অশোক গরুর প্রশংসা করিয়া বলিল, "তোমার গরু দুটি কিন্তু খুব চমৎকার পাঁচু, প্রায় ঘোড়ার মতো দৌড়েছিল।"

পাঁচু বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, বলদদুটি আমার খুব তাগড়া। আপনি নিষেধ না করলে ঐ চালে আমি শিবানীপুর পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে যেতাম।"

শুনিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "পাকা সড়ক হ'লে তেমন কিছু আপত্তি ছিল না পাঁচু, কাঁচা রাস্তায় একটু কষ্ট হয়।"

এ কথায় আপত্তি করিয়া পাঁচু বলিল, "আজ্ঞে না বাবু, কাঁচা রাস্তায় যদি ধুলো কাদা আর খাল না থাকে তা হ'লে পাকা সড়কের চেয়েও আরাম বেশি। কাল বৈকেলে বিষ্টি হয়েছিল ব'লে ধুলো নেই, আর আজ সকাল থেকে খাড়া রোদ্দুর পেয়েছে ব'লে কাদাটুকুও ম'রে গেছে। সামনে তাকিয়ে দেখুন না, মনে হচ্ছে যেন পিচ-বাঁধানো পথ।"

পাঁচুর কথা শুনিয়া শঙ্কিত হইয়া পথ এবং গরুর প্রসঙ্গ বন্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অশোক বলিল, "শিবানীপুর আর কতদূর পাঁচু—"

বলদদ্বয়ের পুচ্ছমূলে সামান্য কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া পাঁচু বলিল, "আর বেশি দূরে নেই বাবু, বড় জোর পোয়া দেড়েক পথ হবে। সামনের ঐ লোকনাথপুর গ্রাম পার হ'লেই মাঠের ওপারে শিবানী-পুরের গাছপালা নজরে পড়বে।"

লোকনাথপুরে প্রবেশ করিবার অব্যবহিত পূর্বেই কিন্তু এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটিল। লোকনাথপুরের দিক হইতে একজন পথিক আসিতেছিল, নিকটবর্তী হইলে পাঁচুকে দেখিয়া সে বলিল, "কোথাকার সওয়ারি পাঁচু? লোকনাথপুরের?"

গাড়ি থামাইয়া ঘাড় নাড়িয়া পাঁচু বলিল, "না, তোমাদেরই গাঁয়ের শিবানীপুরের।"

"শিবানীপুরে কাদের বাড়ি যাচ্ছ?"

"মুখুজ্যেদের বাড়ি।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভাবিয়া পথিক বলিল, "আহা, আজ ভোর-সকালে মুখুজ্যে-দের বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে গেল।"

পথিকের কথা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "বল কি হে! কি দুর্ঘটনা ঘটল?"

অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পথিক বলিল, "আজ্ঞে, মুখুজোদের ছোটগিন্নী দেহ রক্ষে করলেন।"

বিস্মিত আর্ত কণ্ঠে অশোক বলিল, "সে কি! গিরিবালা দেবী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। রাত তিনটে পর্যন্ত এক-রকম ভালই ছিলেন, তারপর নাড়ী খারাপ হ'তে আরম্ভ হয়। পুণ্যের শরীর, চোখ

বোজবার আগে পর্যন্ত কথা ক'য়েছেন।"

তাহার পর পাঁচুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "অজ্ঞ চাটুজ্যে, পঞ্চানন গোসাই—কারো আসতে আর বাকি নেই। অমন মানুষ ত' হবে না, সকলেই ভক্তি করত, ভালবাসত।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "এখনো বাড়িতে আছেন? না—"

অশোকের অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে পথিক বলিল, "আজ্ঞে না,—এই কতক্ষণ হ'ল নিয়ে গেছে।" শিবানীপুরের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কই, ধুঁয়া দেখা যায় না,—এখনো বোধহয় সৎকার আরম্ভ হয়নি।"

"তাঁর মেয়ে বাড়িতে আছেন, না সঙ্গে গেছেন,—তা জানো?"

"আজ্ঞে, শক্তি দিদিমণি সঙ্গে গেছেন। যেমন মা, তেমনি মেয়ে! চোখ দিয়ে অনবরত জল ঝরছে, কিন্তু চেঁচিয়ে কান্না-কাটির কোনো উৎপাত নেই।"

আর কালাতিপাত না করিয়া অশোক বলিল, "পাঁচু গাড়ি ছাড়।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিয়া পাঁচু বলিল, "ছোট-গিন্নী আপনার কে হ'তেন বাবু?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া অশোক বলিল, "তুমি শিবানীপুরের শ্মশান জানো পাঁচু?"

"জানি বইকি বাবু। জন্মাবধি এই অঞ্চলে মানুষ, আর শিবানীপুরের শ্মশান জানিনে।"

"তবে আগে আমাকে সেখানেই নিয়ে চল। যত শীঘ্র পারো।"

অশোকের আদেশ শোনা মাত্র পূর্বের ন্যায় মুখ এবং হস্তের সাহায্যে বলদদ্বয়কে প্রচণ্ড ভাবে উত্তেজিত করিতে করিতে পাঁচু গাড়ি ছুটাইয়া চলিল। লোকনাথপুর ছাড়াইয়া কিছুদূর গিয়া সদর রাস্তা হইতে মাঠের পথে নামিয়া পড়িয়া পাঁচু বলিল, "আর এসে পড়েছি বাবু। ঐ যে সামনে একটা বড় পাকুর গাছ দেখচেন, ঐ পর্যন্ত গাড়ি যাবে। তার একটু পরেই শ্মশান।

পাকুড় গাছতলায় গাড়ি পেঁছিলে অশোক তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল।

পাঁচু বলিল, "এই পায়ে হাঁটা পথ ধরে সোজা একটুখানি গেলে সামনেই পড়বে শ্মশান। ডাইনে বাঁয়ে কোনো দিকে যাবেন না। আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারতাম, কিন্তু চোর ছ্যাঁচোড়ের জায়গা, গাড়িতে জিনিসপত্র ছেড়ে যেতে সাহস হয় না বাবু।"

অশোক বলিল, তোমার যাবার দরকার নেই পাঁচু, তুমি এইখানেই থাক।" বলিয়া জুতা খুলিয়া গাড়িতে রাখিয়া পাঁচুর প্রদর্শিত পথ ধরিয়া নগ্নপদে সে অগ্রসর হইল।

ঘটনার আশ্চর্যতায় এবং আকস্মিকত্বে বাস্তব জগতের অসংশয়তার কঠিন চেতনা হারাইয়া অশোক যেন কোন্ স্বপ্নালোকের মধ্যে বিচরণ করিতেছিল। কাল বৈকাল পর্যন্ত যাহারা তাহার পরিচিত জগতের কেহই ছিল না,—সেই নবগোপাল, মদন চক্রোত্তী, ভুতোর মা, পাঁচু গাড়োয়ান, শিবানীপুরের পথিক,—সকলে মিলিয়া এই স্বপ্নলোক রচনা করিয়াছে। কল্পনার কোনো সুদূর নিভৃত প্রদেশেও ছিল না শিবানীপুরের এই ছায়াশীতল শষ্পাচ্ছাদিত বনপথ, যাহা আজ তাহাকে লইয়া চলিয়াছে অভাগিনী গিরিবালার চরম বিলয়ের স্থলে। কানের কাছে কেহ যেন গুঞ্জন করিয়া উঠিল মদন চক্রোত্তীর গানের একটা পদ—"তুমি নিখিল বিশ্বমাতা, সমর কি সাজে সুত সঙ্গে।" কিন্তু পরমুহূর্তে আশাবরী রাগিণীর সেই উদাস-মধুর সুর রূপায়িত হইয়া গেল বর্ষাকালে কোনো বেগবতী নদীর কলধ্বনিতে। কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া চোখে পড়িল কপোতাক্ষ নদের দ্রুতগতিশীল জলরেখা এবং তাহার অল্প পরেই দৃষ্টিগোচর হইল তটান্তবর্তী শ্মশান-ভূমি। সেই শ্মশান-ভূমিও যেন একই স্বপ্নলোকের অলৌকিক রঙে রঞ্জিত। সৎকার কার্যের উদ্যোগ আয়োজনে রত পনের ষোল জন ব্যক্তির মধ্যে কাহাকেও সে চেনে না; শুধু সজ্জিত চিতার উপর শায়িত গিরিবালার শবদেহ এবং একটা পাকুড় গাছতলায় একটি তরুণী বিধবার পার্শ্বে উপবিষ্ট শক্তি তাহার পরিচিত।

নদীর উচ্চ পাড় হইতে নিম্নভূমিতে অবতরণ করিয়া অশোক প্রথমে চিতা পার্শ্বে উপস্থিত হইল। তৎপরে ক্ষণকাল নির্নিমেষনেত্রে গিরিবালার মৃত্যুপাংশু মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া নত হইয়া যুক্তকরে বোধ করি গিরিবালার দেহবিমুক্ত আত্মার উদ্দেশ্যেই প্রণাম করিল।

অদৃষ্টপূর্ব, অপরিচিত, কান্তিমান যুবককে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া দুই-একজন তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সংক্ষেপে তাহাদের ঔৎসুক্য নিবৃত্ত করিয়া অশোক শক্তির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

অশোককে দেখিয়া পর্যন্ত শক্তি নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছিল, অশোক নিকটে আসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জিত করিয়া বলিল, "কখন্ এলে অশোকদা'? বাড়ি গেছলে?"

অশোকেরও চক্ষু সিক্ত হইয়া আসিয়াছিল। রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু মুছিয়া সে বলিল, "না, বাড়ি যাইনি। পথে খবর পেয়ে বরাবর এখানেই এসেছি। এত শীঘ্র এমন ব্যাপার হয়ে যাবে তা একবারও মনে করিনি শক্তি।"

এক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া শক্তি বলিল, "শেষ রাত্রে শরীর খারাপ হতে আরম্ভ হওয়া থেকে কতবার যে মা তোমার কথা বলেছেন তার ঠিক নেই। সব শেষ হয়ে যাবার পাঁচ মিনিট আগেও তোমার নাম করেছেন। ভারি ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে দেখা হয়; কিন্তু একটুর জন্যে তা আর হ'ল না!" পুনরায় শক্তির দুই চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

অশোক এবং শক্তিকে অবাধে কথা কহিবার সুযোগ দিবার অভিপ্রায়ে বিধবা স্ত্রীলোকটি একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

অশোক বলিল, "দেখা হয়েছে, শক্তি, আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার বাকি নেই। যে কথা বলবার জন্যে আমি এসেছিলাম, সে কথা এখানে এসে তাঁকে বলেছি। নিশ্চয় জেনো, আমার সে কথা তিনি শুনতে পেয়েছেন। তুমি শান্ত হও, নিশ্চিন্ত হও।"

বৈরাগ্যগম্ভীর উদাস পরিবেশের মধ্যে উচ্চারিত এই আবেগগর্ভ বাণী সহসা এমন একটা অননুভূতপূর্ব অবস্থার সৃষ্টি করিল, যাহার মধ্যে অশোক এবং শক্তি বাক্‌শক্তি হারাইয়া ক্ষণকালের জন্য নির্বাক হইয়া রহিল। শুধু আর্দ্র চক্ষুর ব্যথিত-করুণ দৃষ্টি দিয়া ব্যক্ত হইতে লাগিল দুইটি আর্ত হৃদয়ের বেদনা এবং সমবেদনা।

মৌনভঙ্গ করিল শক্তি। বলিল, "এখানে থাকলে তোমার কষ্ট হবে অশোকদা, তুমি বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম কর। আমি মোহিনী দিদিকে বলে দিচ্ছি, তিনি তোমাকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন। আমাদের বাড়িতে ত' এ বেলা রান্না হবার উপায় নেই।"

অশোক বলিল, "সে-সব কিছুর দরকার নেই শক্তি, আমি এখনি কলকাতায় ফিরে যেতে চাই, যদি না তুমি কোনো কারণে আমার এখানে থাকা একান্ত দরকার মনে কর। কিন্তু তুমি ভেবে দেখ, তোমাদের এ বিপদের বাড়িতে আমাকে নিয়ে মোটের ওপর অসুবিধেয় পড়বে।"

একথা ভাবিয়া দেখিবার জন্য শক্তিকে বেশি বেগ পাইতে হইল না। একদিকে অশোককে এবং অপর দিকে ভবতারাকে লইয়া তাহাকে হয়ত একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে, সে দুশ্চিন্তা তাহার মনের মধ্যেও ছিল। তা ছাড়া, উপস্থিত কয়েক দিনের জন্য তাহাদের সংসারের যে অবস্থা হইল, তাহার মধ্যে অশোককে অনর্থক ধরিয়া রাখিয়া কোনো লাভ নাই। অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে সে বলিল, "শুধু আমার কথাই নয়, অশোকদাদা, তোমারও কষ্ট হবে। কিন্তু তুমি নাওয়া-খাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিয়ে তারপর যেয়ো। মোহিনী দিদির সঙ্গে আমি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও'রা খুব ভাল লোক;

তুমি একটুও কুণ্ঠিত হ'য়ো না।"

"এর জন্যে তোমার মোহিনী দিদিকে ব্যস্ত করবার কোনো দরকার নেই। আমার সঙ্গে গাড়িতে যথেষ্ট খাবার আছে, টাটকা, আজ সকালে তৈরি করা। যা আছে তাতে, শুধু আমার নয়, পাঁচু গাড়োয়ানেরও পেট-ভরা হবে।"

"কিন্তু নাওয়ার কি করবে?"

"পাশের গ্রাম লোকনাথপুরে পথের ধারে একটা ভাল পুকুর দেখলাম,—সেইখানেই নাওয়া-খাওয়া সেরে নেবো।"

শুনিয়া শক্তির মুখে-চোখে ঈষৎ উদ্বেগের ছায়া দেখা দিল; বলিল, "সাঁতার জানো ত' অশোকদাদা?"

শক্তির আশঙ্কা দেখিয়া এত দুঃখের মধ্যেও অশোকের অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাস্য-রেখা দেখা দিল; বলিল, "জানি, কিন্তু ভয় নেই তোমার, সাঁতার কাটব না।" একটু অপেক্ষা করিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে একটা ঝোড়ায় কিছু ফল আর সন্দেশ আছে,—পাঁচুকে দিয়ে তোমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে যাই।"

মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "তার দরকার নেই অশোকদাদা।"

"দরকার হবে শক্তি;—যাঁর জন্যে এনে-ছিলাম, তাঁরই কাজে লাগবে।"

এ কথার শক্তি কোন উত্তর দিল না,—শুধু দুই চক্ষু পুনরায় জলে ভরিয়া আসিল।

"শোনো শক্তি!"

শক্তি তাহার সজল ব্যথিত নেত্রের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি অশোকের মুখের উপর স্থাপিত করিল।

"মাসিমার অভাবে তোমার যে ক্ষতি হ'ল তার পূরণ নেই, কিন্তু তবু তুমি ভয় পেয়ো না, আমি আছি। আজ তোমাকে এই কথাটা জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি যে, এখান থেকে যত শীঘ্র তোমাকে নিয়ে যেতে পারি, তার ব্যবস্থা করতে অবহেলা করব না। আচ্ছা, চললাম তা হ'লে।"

"এস।"

"কিছু টাকা রেখে যাব?—শ' খানেক? এখন না-হয় তোমার মোহিনী দিদির কাছে রেখে দাও?"

ঘাড় নাড়িয়া শক্তি বলিল, "না।"

"না কেন শক্তি? এতে কিন্তু তোমার কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। তোমার আমার মধ্যে কুণ্ঠার স্থান আর নিশ্চয় নেই।"

"কুণ্ঠার কথা নয় অশোকদাদা, টাকা আমার কাছে এখনো আছে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "আচ্ছা, তা হলে থাক। চিঠিপত্র সর্বদা দিয়ো। এই নির্বান্ধব জায়গায় তোমাকে ফেলে যেতে মনের মধ্যে ভারি একটা অস্বস্তি বোধ করছি।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া, হয়ত অশোককে কিছু আশ্বাস দিবারই অভিপ্রায়ে, শক্তি বলিল, "একেবারে নির্বান্ধব নয়, নবগোপাল দাদা আছেন।"

বাগ্রোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অশোক বলিল, "সত্যি সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই! চমৎকার লোক নবগোপাল বাবু। তাঁর কথাটা ভুলে যাওয়া আমার উচিত হয়নি। আচ্ছা চলি।" বলিয়া অশোক প্রস্থান করিল।

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই কিন্তু সে ফিরিয়া আসিল। তাহার গতি-পথের দিকে চাহিয়া শক্তি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিকটে আসিয়া অশোক বলিল, "কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে দিয়ে যাই শক্তি। তোমার মাথায় সিঁদুর দেওয়াটাই শুধু বাকি রইল; তা ছাড়া, আর বড় কিছু রইল না। সেই কথা মনে রেখে যদি আমাকে এই আশ্বাসটুকু দাও যে, কোনো রকম দরকার হলে আমার ওপর ষোল-আনা অধিকার খাটাতে কিছুমাত্র সংকোচ করবে না, তা হ'লে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারি। লক্ষ্মীটি, এ কথা বলতেও কুণ্ঠিত হ'য়ো না।"

প্রণয়সুরভিত সোহাগের এই নির্বিকল্প প্রকাশের মহিমায় শক্তির মুখমণ্ডল আশ্বাসে-আনন্দে রক্তাভ হইয়া উঠিল। সলজ্জ নেত্রে অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া বলিল, "আচ্ছা।"

আর কোনো কথা না বলিয়া অশোক প্রস্থান করিল। নদীর পাড়ের উপর উঠিয়া একবার পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিল, তখনো শক্তি ঠিক একই স্থানে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত শ্মশানভূমির উপর সে দৃষ্টি স্থাপিত করিল। চিতার উপর গিরিবালার শবদেহ তেমনি শুইয়া আছে। অদূরে চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান শক্তির নিঃশব্দ নির্বাক মূর্তি, কিছু দূরে পাঁচ-সাতটা শকুনি কিসের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেছে সে কথা শুধু তাহারাই জানে, কঙ্কালসার দুইটা কুকুর মুখ নীচু করিয়া শুঁকিয়া শুঁকিয়া খাদ্যবস্তুর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে, সম্ভবত মুখাগ্নির জন্য কয়েক ব্যক্তি একটা মশাল প্রস্তুত করিবার কার্যে ব্যস্ত এবং পশ্চাতের পট-ভূমিকায় মহাকালের প্রতীক স্বরূপ ফেনোচ্ছ্বসিত কপোতাক্ষের সঞ্চরমান জলরাশি ইহলোকের নশ্বরতা প্রকাশ করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছে।

অশোকের মনে হইল, সে যেন অবস্থান করিতেছে বাস্তব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন কোনো এক ছায়াচিত্রের অলীক দৃশ্যের সম্মুখে। একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে পূর্বকথিত বনপথে প্রবেশ করিল। চলিতে চলিতে কপোতাক্ষের কলরোল মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিতেছিল। তাহারই মধ্যে সহসা এক সময়ে তাহার মনে হইল, কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে সেই নদীজলকল্লোল আশাবরী রাগিণীর উদাস সুরে রূপান্তরিত হইয়াছে এবং সেই সুরের মধ্যে যেন ধ্বনিত হইতেছে মদন চক্রবর্তীর গানের পদ,—'তুমি নিখিল বিশ্বমাতা, সমর কি সাজে সুত সঙ্গে!'

১৭

দিন পনের পরের কথা।

সন্ধ্যা হইতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। কলিকাতার বাসায় পড়িবার ঘরে বসিয়া অশোক তাহার বন্ধু প্রণবনাথের সহিত চা পান করিতে করিতে কথোপকথন করিতে-ছিল। বয়সে অশোক প্রণব অপেক্ষা যৎসামান্য বড় হইলেও, একই সময়ে একই কলেজে উভয়ে কলেজ-জীবন আরম্ভ করিয়াছিল। পরিচয়ের প্রথম দিবস হইতেই উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণ ক্রমশ বাড়িয়া বাড়িয়া অবশেষে তাহা প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া এই পরিণতির মূলে উভয়ের রুচি এবং প্রকৃতিগত মিলই যে শুধু ছিল, তাহা নহে; বৈষম্যও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এ সেই শ্রেণীর বৈষম্য যাহা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণকে শিথিল না করিয়া প্রবলই করে। অশোক যতটা ছিল দুর্বলপ্রকৃতি, প্রণব ততটা ছিল দৃঢ়চরিত্র। অশোক যদি ছিল সৌন্দর্যের উপাসক ত' প্রণব ছিল শক্তির; সংগীতে অশোক যতটা ছিল খেয়ালের অনুরাগী, প্রণব বোধ করি ততটাই ছিল ধ্রুপদের; ইতিহাসের প্রতি যতটা অনাগ্রহ ছিল অশোকের, কাব্যের প্রতি প্রণবের ততটাই অনাগ্রহ দেখা যাইত। এই কাব্য এবং ইতিহাস, ধ্রুপদ এবং খেয়াল ইত্যাদি সংক্রান্ত মতভেদ লইয়া উভয়ের মধ্যে বিতর্কের অন্ত ছিল না, কিন্তু তাই বলিয়া সেই সকল বিতর্কের হাত ধরিয়া কোনদিন বিরোধকে উপস্থিত হইতে দেখা যায় নাই।

সমাজদেহে বিপ্লবের শুভকারিতা কতটা আছে অথবা নাই, সেই সম্বন্ধে আজ আলোচনা চলিতেছিল।

অশোক বলিল, "রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ধাইল প্রচণ্ড ঝড় বাধাইল রণ কে শেষে হইল জয়ী? মৃদু সমীরণ।' এ কথা বিধাতার প্রকৃতির বিষয়ে যেমন সত্যি, মানুষের সমাজের বিষয়েও তেমনি। তুমি যাকে বিপ্লব বলছ, রবীন্দ্রনাথ তাকেই ঝড় বলেছেন।"

প্রণব বলিল, "বলেছেন, কিন্তু কাব্যে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে যেটা সরস করে বলেছেন, সেটা যদি বাস্তবের একটা সূত্র বলে জীবনে খাটাতে যাও, তাহলে ভুল

করবে। 'অমৃতং বালাভাষিতং'-এত অর্থ হচ্ছে, একটি এক বৎসরের শিশু যদি কাকাকে মামা বলে ডাকে, তা হলে সেটা অসঙ্গত হলেও, আমাদের মিষ্টি লাগে। তেমনি, অমৃতং কাব্যভাষিতং—অর্থাৎ কাব্যে যেটা মিষ্টি লাগে, বাস্তবেও সেটা সব সময়েই সত্যি হবে, তার কোন মানে নেই। মানব-সমাজের ইতিহাসের ধারা যদি পরীক্ষা করে দেখ, তা হলে দেখবে, যত কিছু বড় আর দ্রুত পরিবর্তন তা বিপ্লবের দ্বারাই হয়েছে।"

পেয়ালার শেষ চা-টুকু নিঃশেষে পান করিয়া অশোক বলিল, "ইতিহাসকেও সব সময়ে বিশ্বাস করো না প্রণব, ইতিহাসও সব সময়ে সত্যি কথা বলে না। একজন খুব নামজাদা ইংরেজ লেখক ইতিহাসের বিষয়ে কি বলেছিল শুনবে?"

"কে ইংরেজ লেখক?"

এক মুহূর্ত মনে করিবার চেষ্টা করিয়া অশোক বলিল, "নামটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না।"

প্রণব বলিল, "তবে শুনে কি হবে? নাম না বললে যা বলবে, তা প্রমাণ-গ্রাহ্য হবে না।"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "তা হলে নামটা না হয় আপাতত অশোকনাথ বাঁড়ুজ্যেই ধরা যাক। আমি বললে চলবে ত?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া প্রণব বলিল "না, তা-ও ঠিক চলবে না। তুমি হচ্ছ এ মামলার বাদীপক্ষ, তোমার উক্তি বিনা প্রমাণে কি করে চলতে পারে? তবুও, কথাটা কি শুনি?"

অশোক বলিল, "ইতিহাস এবং উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য কি, এই প্রশ্নটি সেই ইংরেজ লেখক তুলেছিলেন; এবং নিজেই সে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ইতিহাসে জায়গার নাম, লোকের নাম, সন তারিখ এইগুলো সব ঠিক, আর সমস্তই ভুল,—আর উপন্যাসে নাম-ধাম তারিখ-গুলোই কল্পিত, বাকি সমস্ত ঠিক। পুরো না হলেও কথাটা যে খানিকটা সত্যি, তার প্রমাণ রয়েছে লালদীঘির উত্তর-পশ্চিম কোণে সম্প্রতি ভেঙেফেলা ব্ল্যাকহোল মনুমেণ্টে।"

"তবে ভাল ক'রে আর এক পেয়ালা চা ফরমাস্ করো।" বলিয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিয়া প্রণব সমারোহের সহিত তর্ক করিবার জন্য কোমর বাঁধিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই অভিলষিত তর্কের পথে অচিন্তিত বাধা উপস্থিত হওয়ায় তর্ক আর হইল না।

পাচক গোবিন্দ একতলা হইতে এমন অদ্ভুত একটা সংবাদ লইয়া আসিল, যাহা শুনিয়া উৎকট দুশ্চিন্তায় অশোকের ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। গোবিন্দর কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া পাংশু মুখে সে বলিল, "একটি বাবুর সঙ্গে একটি মেয়েছেলে এসেছেন?"

ঘাড় নাড়িয়া গোবিন্দ বলিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"ঘোড়ার গাড়ি ক'রে?"

"ঘোড়ার গাড়ি ক'রে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "বাবুটি ফরসা, না কালো?"

"আজ্ঞে, খুব কালো।"

শুনিয়া অশোকের মুখে আর এক পোঁছ কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রণবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তুমি বোসো প্রণব, এখনি আসছি আমি।"

উৎসুক হইয়া প্রণব জিজ্ঞাসা করিল, "কে এলেন অশোক?"

"দেখি কে।" বলিয়া অশোক প্রস্থান করিল। কিন্তু দেখিবার তেমন কিছু প্রয়োজন ছিল না, সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া সে দেখিল মনে মনে যাহা আশঙ্কা করিয়াছিল ঠিক তাই, বাম বগলে একটা ছোট পোঁটলা চাপিয়া এবং দক্ষিণ হস্তে একটা চামড়ার ব্যাগ ঝুলাইয়া পথে দাঁড়াইয়া নবগোপাল কোচমানের সহিত কথা কহিতেছে।

পাশের বাড়িতেই নূতন ভাড়া পাইয়া কোচমান নবগোপালের নিকট হইতে ভাড়া চুকাইয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। নব-গোপাল তাহাকে উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতে-ছিল, "আরে বাপু, ফস্ করে যেখানে সেখানে মেয়ে-সওয়ারী নামালেই হল? আগে বাবুকে দেখে বাড়ি সনাক্ত হ'ক, তবে তো নামাব?"

ইঙ্গিতে পিছন দিক দেখাইয়া দিয়া কোচমান বলিল, "ঐ বাবু এসেছেন।"

পিছন ফিরিয়া অশোককে দেখিয়া এক গাল হাসিয়া নবগোপাল বলিল, "ঠিক! তা হলে ঠিকই এসেছি।" তাহার পর কোচমানের দিকে চাহিয়া বলিল, "ঠিক বাড়ি,—আর কোনো সন্দেহ নেই।"

সহাস্যমুখে কোচমান বলিল, "তা হলে সনাক্ত হল ত বাবু?"

নবগোপাল বলিল, "নিশ্চয় হল।" তাহার পর অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কথায় বলে কলকাতা শহর, সাবধান হয়ে কাজ করা উচিত নয় কি ভায়া?"

সে কথার কোন উত্তর না দিয়া অশোক বলিল, "ব্যাপার কি নবগোপালবাবু?"

অশোকের প্রশ্নের ফলে নবগোপালের মুখের উৎফুল্ল ভাব নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। কণ্ঠের স্বর গভীর করিয়া সে বলিল, "ব্যাপার খুবই গুরুচরণ! আজ থেকে আটদিন পরে, শেরাবণ মাসের দশুই তারিখে অজু চাটুজ্যের এক মুখখু মাতাল শালার সঙ্গে শক্তির বিয়ে দেওয়ার সমস্ত ষড়যন্ত্র একেবারে পাকা! আমি সেই ষড়যন্ত্রের বাড়া আর এক ষড়যন্ত্র চালিয়ে শক্তিকে একেবারে তোমার কাছে এনে হাজির করেছি; সে এক মস্ত বড় কেচ্ছা রে ভায়া!"

ভাড়ার তাগাদা ভুলিয়া কোচমান গভীর মনোযোগের সহিত নবগোপালের কথা শুনিতেছে লক্ষ্য করিয়া অশোক বলিল, "আচ্ছা, পরে সে শুনব।" তাহার পর গাড়ির পাশে শক্তির নিকট উপস্থিত হইল।

নামিবার ঈষৎ উপক্রম করিয়া অশোকের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া শক্তি বলিল, "নাবব?"

"আমার কাছেই আসছ ত?"

"তা ছাড়া আর কার কাছে আসব?"

সহসা বিনা নোটিশে পুরুষের নারীহীন বাসায় শক্তি আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় অশোকের মনের একটা দিক বেশ খানিকটা বিব্রত এবং বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; বাহিরে সে ভাব যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়া সে বলিল, "তা হলে নাববে বইকি।"

কিন্তু তথাপি শক্তি বুঝিতে পারিল অশোকের অভ্যর্থনার সুর সম্পূর্ণ কুণ্ঠাহীন নহে। গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত সে বলিল, "সেদিন শিবানীপুরে তুমি আমাকে যে অধিকার দিয়ে এসেছিলে, এত শীঘ্র তা ব্যবহার করতে হল বলে সত্যিই আমি লজ্জিত।"

অকস্মাৎ অনিবার্যভাবে যে বিরক্তি অশোকের মনের আকাশে দেখা দিয়া-ছিল, শক্তির সঙ্কোচ এবং ক্ষোভ প্রকাশক কথা শুনিয়া সূর্যকিরণের স্পর্শে প্রভাতকালের লঘু খণ্ড মেঘের ন্যায় তাহা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। সমবেদনার সদয় কণ্ঠে হাসিমুখে সে বলিল, "অধিকার ব্যবহার করবার মতো অবস্থাই যদি শীঘ্র এসে থাকে, তাতে তোমার লজ্জিত হবার কারণ নেই শক্তি। চল, ভিতরে চল।"

বিনোদ আসিয়া অদূরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া অশোক নবগোপালের পোঁটলা ও ব্যাগ ভিতরে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিল, তাহার পর কোচমানকে ভাড়া দেওয়া হইলে শক্তি এবং নবগোপালকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে দ্বিতলে উপস্থিত হইল।

দ্বিতলে তিনখানা ঘর এবং একটা বন্ধ বারান্দা। উত্তর দিকের ঘরটা অশোকের শয়নকক্ষ, মাঝখানের ঘরটা তাহার বসিবার এবং পড়িবার ঘর এবং দক্ষিণ দিকের সর্বোৎকৃষ্ট ঘরখানা মূল্যবান আসবাবপত্রে সজ্জিত হইয়া অশোকের পিতা যাদবচন্দ্রের জন্য প্রস্তুত থাকে, কার্যোপলক্ষে কলিকাতায় আসিলে সে সেই ঘরে বাস করে।

সিঁড়ি ভাঙিয়া দ্বিতলের বারান্দায়

উঠিলে প্রথমেই পড়ে যাদবচন্দ্রের ঘর। প্রত্যহ সে ঘর খোলা, বন্ধ করা, ঝাড়া-পোঁছা হয়; রাত্রে তালা দেওয়া থাকে। এখন খোলাই ছিল, কিন্তু পিতার জন্য পৃথকীকৃত কক্ষে শক্তি এবং নবগোপালকে বসানো অশোক সমীচীন মনে করিল না। নিজের শয়ন-কক্ষে সহসা তাহাদিগকে লইয়া যাইতেও কোন দিক হইতে কেমন একটু বাধিল। বাকি রহিল বারান্দায় প্রবেশ করিয়া দ্বিতীয় ঘর, অর্থাৎ তাহার পাঠ-কক্ষ। অগত্যা সেই ঘরের সম্মুখে আসিয়া অশোক তাহার অতিথিদ্বয়কে লইয়া দাঁড়াইল।

ভিতরে বসিয়া ছিল প্রণব। দরজার সম্মুখে অভ্যাগতগণসহ অশোককে দেখিয়া বিশেষত তাহাদের মধ্যে একজন অপরিচিত যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া সে তাড়াতাড়ি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল। তাহাকে বাধা দিয়া অশোক বলিল, "পালাতে হবে না, বোস তুমি প্রণব।" তাহার পর শক্তি এবং নবগোপালকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আমার বন্ধু প্রণবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।" তৎপরে প্রণবের দিকে চাহিয়া কহিল, "ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী শক্তি মুখোপাধ্যায়।"

শক্তিকে নমস্কার করিয়া এবং বিনিময়ে তাহার নিকট হইতে প্রতি-নমস্কার পাইয়া প্রণব বলিল, "আমাকে ত তোমার বন্ধু বলে পরিচয় দিলে অশোক, কিন্তু ইনি তোমার কে হন এ'র সে পরিচয় ত' তুমি দিলে না।" তাহার পর শক্তিকে সম্বোধন করিয়া সহাস্য-মুখে বলিল, "সে আপনি যাই হোন্ না কেন, পরেই না হয় তা হবেন, আমার কিন্তু এখন থেকেই বৌদি হলেন আপনি। দেখুন আসবার আগেই আপনার কাউ লাভ হয়ে গেল। রাম না পেতেই লক্ষ্মণ!" বলিয়া হাসিতে লাগিল। কিন্তু শক্তির লজ্জানত মুখের রক্তিমার মধ্যেই বেদনার ম্লান ছায়া লক্ষ্য করিয়া সহসা একটা কথা মনে পড়িয়া তাহার মুখের হাসি মুখেই মিলাইয়া গেল। কৌতুক-তরল কণ্ঠস্বরকে গভীর করিয়া লইয়া সে বলিল, "আমার এ সব কথা থেকে হয়ত আপনি বুঝতে পাচ্ছেন যে, আপনাদের অনেক কথাই আমার জানা আছে। তাই, সম্প্রতি যে দুঃখ আপনি পেয়েছেন সেকথা ভুলে থেকে অন্য কথা পাড়ার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি মিস্ মুখার্জি। আমি আপনাকে আমার অন্তরের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।"

শক্তি কোনোদিনই প্রণবকে দেখে নাই, সম্ভবত অশোকের কাছে কোনদিন তাহার বিষয়ে কোন কথাও শুনে নাই, কিন্তু তাহার মাতৃবিয়োগের কথা উপলক্ষ্য করিয়া এই অনাবশ্যক ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়া এবং সমবেদনা প্রকাশ করা তাহাকে তাহার অন্তরের অনেকখানি পরিচয়ই দিয়া গেল। মুখে সে কোন উত্তর দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার সজল নেত্রের সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি দিয়া সে-কাজ সে সম্পন্ন করিল।

নবগোপালকে দেখাইয়া অশোক বলিল, "ইনি নবগোপাল চট্টোপাধ্যায়,—শক্তির দাদা।"

অশোকের কথা শুনিয়া নবগোপালের ঘন-কৃষ্ণ মুখমণ্ডলের মধ্যে বিদ্যুচ্ছটার ন্যায় সাদা সাদা দুই পাটি দন্ত বিচ্ছুরিত হইল। বলিল, "আর, তোমার কে হই, তা'ত বললে না?" তাহার পর প্রণবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সম্বন্ধী বলতে লাজ হচ্ছে।"

স্মিতমুখে প্রণব বলিল, "সে কথা বলতে ওর লজ্জা হবে কেন? বরং গর্ব হবারই ত কথা।"

এই গর্বিত হইবার কথার ষোল আনা মূলই নিজের মধ্যে আরোপ করিয়া নবগোপাল কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। শিষ্টতা-সঙ্গত বিনয়ের মৃদু সংকোচ মুখে ফুটাইয়া সে বলিল, "না, না, আমি আর এমন কি, যাতে আমার জন্যে গর্ব হবে।" তাহার পর এই কথার সূত্র ধরিয়া আর একটা কথা মনে হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা অশোক তোমাকে সব বলেছে বুঝি?"

"বলেছে।"

"সে কথাও?"

নবগোপালের অনেক বিবরণই অশোকের নিকট প্রণব পাইয়াছিল। চক্ষের সম্মুখে তাহার বাস্তব অভিনয় দেখিয়া যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইয়া স্মিতমুখে বলিল, "বোধ হয় সে কথাও।"

এই 'বোধ হয়'-এর মধ্যে যেটুকু অনিশ্চয়তা থাকিবার কথা তাহাকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে নবগোপাল বোধ করি কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু তাহাকে বাধা দিয়া অশোক বলিল, "এ সব কথার আগে আপনার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে নবগোপালবাবু।" বলিয়া তাহাকে বারান্দায় লইয়া গিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে শক্তির বিয়ে হবার কথা আপনি কারো কাছে, বিশেষ ক'রে আমার চাকর-বামুনের কাছে, কখনও যেন বলবেন না।"

অশোকের কথা শুনিয়া উগ্র কৌতূহলে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবগোপাল বলিল, "কেন বল দেখি? মানে আছে বুঝি?"

"খুব কঠিন মানে আছে।"

কঠিন মানে আছে শুনিয়া নবগোপাল মনে মনে চিন্তিত হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিল, "তা থাক্,—কিন্তু বিয়ে তোমাদের ঠিক হবে ত অশোকবাবু?"

"তাড়াতাড়ি না ক'রে একটু সবুর ক'রে থাকলে, আর, এ কথা নিয়ে যার তার সঙ্গে অনাবশ্যক চর্চা না করলে, না হবার ত কোন কারণ দেখিনে।"

কড়ার এবং সর্তের দ্বারা অনিশ্চিত অশোকের এই আশ্বাসবাণী নবগোপালের নিকট যথেষ্ট ঋজু এবং স্পষ্ট মনে হইল না। চিন্তিত মুখে সে বলিল, "শেরাবোন মাস প'ড়ে গেছে এখন তাড়াতাড়ি না করলে সেই অঘ্রাণ মাসের আগে ত' আর নয়! তা ছাড়া যার তার সঙ্গে চর্চা ক'রেই বা কি দরকার? বল ত' তোমাদের গাঁয়ে গিয়ে খোদ কর্তার সঙ্গে দেখা ক'রে একেবারে বিয়ের তারিখ ঠিক ক'রে আসি।"

প্রস্তাব শুনিয়া অশোকের চক্ষু বিস্ফারিত হইল। সভীতি কণ্ঠে সে বলিল, "খবরদার নবগোপালবাবু, খবরদার এমন কর্ম করবেন না!"

ততোধিক বিস্ফারিত নেত্রে নবগোপাল বলিল, "কেন বল দেখি?" তাহার পর উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "এরও মানে আছে বুঝি?"

"নিশ্চয় আছে। খুব শক্ত মানে।"

"আমাকে বলা উচিত নয়?"

একটু ইতস্তত করিয়া মাথা নাড়িয়া অশোক বলিল, "এখন হয়ত নয়।"

বিরক্তিবিরূপ মুখে নবগোপাল বলিল, "নাঃ!—এমন জানলে—। কিন্তু না এনেই বা করি কি! শিবানীপুরে বাঘ, হরিপুরে কুমীর,—কোথায় রাখি তা বলো?"

"কুমীর আবার কে?"

অশোকের প্রশ্ন শুনিয়া বিস্মিত কণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "কি আশ্চর্য! সে কথাও বলতে হবে নাকি? আমি গো, আমি,—আমি কুমীর। তোমার ইস্তিরী হবে, তাইতেই শক্তি এখানে আসায় তোমার মুখ শুকিয়ে আসি,—আর ওই সোমোথো সুন্দরী মেয়েকে হরিপুরে নিয়ে গেলে আমার সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে বাবা কি ক'রে চিরকাল বাড়িতে ঠাঁই দেয় বল দেখি? তাই তোমার মাল তোমার ঘাটে পেঁাছে দিয়ে এখন আমি নিশ্চিন্তি। কিন্তু নিশ্চিন্তিই বা কি ক'রে বলি? তুমি ত' তোমার চাকর বামুনকে কোন কথা বলতে নিষেধ করছ, কিন্তু তারা যদি আমাকে শক্তির কথা শুধোয় তা হ'লে কি বলব তা বল?"

কথা মিথ্যা নহে। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "বলবেন, আপনি আমার বন্ধু, আর শক্তি আপনার দূর সম্পর্কের বোন, কয়েক দিনের মধ্যে ইস্কুলে আর হোস্টেলে ভর্তি হবে।"

অশোকের কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে নবগোপাল বলিল, "ইস্তিরী যে হবে, তাকে বন্ধুর দূর সম্পর্কের বোন কি ক'রে বলব গো!"

নবগোপালের কথা শুনিয়া অশোকের মুখ শুকাইল মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "এখনো ত' তা' হয়নি,—এখনো ত' দেরী আছে।"

"কত দেরি আছে?"

"তা' কিছুটা আছে ত।"

কথাটা স্পষ্টতর করিবার জন্য নবগোপাল আর পীড়াপীড়ি করিল না, কিন্তু মনটা তাহার চিন্তাভারগ্রস্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "কাল সকালে আমি হরিপুর রওনা দোব। তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে খবর জানিয়ো ভাই।"

অশোক বলিল, "তা নিশ্চয় জানাব। কিন্তু কালই কেন যাবেন দু-চার দিন থেকে যান না এখানে।"

সজোরে মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "না, তা কিছুতেই হয় না। শিবানীপুরে যাচ্ছি ব'লে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। কাল সন্ধ্যার মধ্যে হরিপুরে না পৌঁছলে একটা হৈ চৈ প'ড়ে যাবে।" নবগোপাল আর কিছু বলিল না, কিন্তু তাহার মনের মধ্যে একটা অস্বস্তির প্লানি লাগিয়া রহিল।

মিনিট দশ-পনের পরে অশোককে একান্তে পাইয়া শক্তি বলিল, খুব ভাবিত করেছি তোমাকে,—না?"

মৃদু হাসিয়া অশোক বলিল, "ভাবিত না খুশি, কোনটা বেশি করেছ, তা ঠিক বুঝতে পারছিনে। কিন্তু সে-সব মনের ভেতরকার হিসেব-পত্র পরে করলেও চলবে, আপাতত শরীরের প্রতি একটু সুবিচার কর। মুখ দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত দিন অন্ন জোটে নি, মাথা দেখে মনে হচ্ছে স্নান হয়নি। একেবারে ষোল আনা পলাতকার অবস্থা। স্নান করবে ত?"

পথের ধূলি এবং ধকলে দেহ ত' বটেই, উদ্বেগ এবং উত্তেজনায় মন পর্যন্ত যেন চড়চড় করিতেছিল,—স্নানের প্রস্তাব মাত্রেই শক্তি দেহ-মনে খানিকটা আরাম পাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "করব।"

"ওপরেই ঐ কোণের আড়ালে স্নান-ঘর আছে। সাবান, তেল, গামছা, তোয়ালে, সমস্তই সেখানে পাবে;—কিন্তু শাড়ি ত' আমার নেই শক্তি।" এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সায়াও যে নেই, সে কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য।"

অশোকের কথা শুনিয়া শক্তির মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল; বলিল, "ভয় নেই, শাড়ি সায়া আমার সঙ্গে আছে।"

"ঐ পুঁটলিতে?"

"হ্যাঁ। হরিপুর যাবার নাম ক'রে দুখানা শাড়ি, একটা সায়া, একটা জামা আর একখানা গামছা বেঁধে নিয়েছিলাম।"

"অ্যাটাসি কেসে কি আছে?"

"কিছু টাকা, আর মার আর আমার গহনা।"

"টাকা আছে কত?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া শক্তি বলিল, "হাজার দুয়েকের কিছু কম।"

অশোক বলিল, "যদিও চাকর বামুন যথেষ্ট বিশ্বাসী, তবুও অ্যাটাসি কেসটা তুলে রাখ।"

"কোথায়?"

"তোমার আলমারির ভেতরে।"

বিস্মিতকণ্ঠে শক্তি বলিল, "আমার আলমারির ভেতরে?"

সহজ-শান্ত কণ্ঠে অশোক বলিল, "হ্যাঁ গো, হ্যাঁ,—তোমারই আলমারির ভেতরে। চাবির রিং আছে তোমার?"

"আছে।"

"কই, দেখি।"

পিছন হইতে অঞ্চলের প্রান্ত সম্মুখে আনিয়া শক্তি অশোকের সম্মুখে চাবির রিং মেলিয়া ধরিল। অঞ্চল হইতে শক্তির রিংটা খুলিয়া লইয়া নিজের রিং হইতে একটা দীর্ঘ চক্‌চকে এবং বিচিত্র গঠনের চাবি খুলিয়া শক্তির রিংএ পরাইয়া রিংটা শক্তির হাতে ফিরাইয়া দিয়া অশোক বলিল, "এবার চল, তোমার আলমারি দেখিয়ে দিই।" (ক্রমশ)

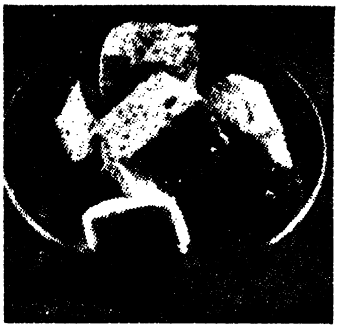
স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ

প্রাণ রস

শ্রীঅমরজ্যোতি সেন

রক্ত বিনা আমরা জীবন কল্পনা করতে পারি না। শরীর থেকে যদি সমস্ত রক্ত বার করে' নেওয়া যায় তাহলে মানুষ যে বাঁচেনা এ জ্ঞান আমাদের সকলেরই আছে। রক্তকে প্রাণরস অথবা জীবনস্রোত বলা হয়। রক্ত যতক্ষণ মানব দেহে থাকে ততক্ষণ সে মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখে, কিন্তু আজকাল তাকে মানুষের দেহ থেকে বার করে এনে তার বিভিন্ন উপাদানগুলি বিভিন্নভাবে ঐ প্রাণ বাঁচানরই কাযে লাগানো হচ্চে।

রক্ত খাদ্যের সারাংশ এবং জীবনধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক অক্সিজেন গ্যাস ও



ফাইব্রিনের ফেনা স্পঞ্জের মতো জমান হয়েছে। থ্রমবিনের দ্রবণে ডুবিয়ে ক্ষতস্থানে দিলে সহজেই রক্তপাত বন্ধ হয়।

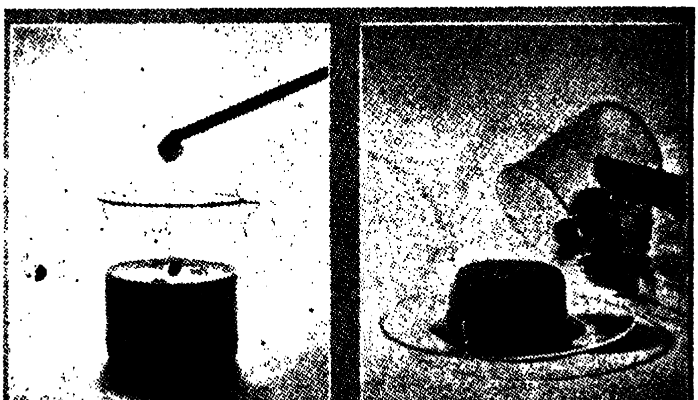
নালীহীন গ্রন্থিদের (ductless glands) অন্তঃক্ষরণ দেহের এক অংশ থেকে আর এক অংশে পৌছে দেয়। শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর (pathogenic) জীবাণুর বিরুদ্ধে রক্ত লড়াই করে ও যে সব বিষাক্ত (toxin) পদার্থ জন্মায়, সেগুলিকে শরীর থেকে বার করে দিতে সাহায্য করে। এ ছাড়া রক্ত খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে, দেহের উত্তাপ রক্ষা করে এবং আরও নানারকম কাজ করে।

মানুষের শরীরে যে রক্ত থাকে তার পঞ্চান্ন ভাগ হল রক্তরস (plasma) স্বচ্ছ ও ঘন তরল অংশ, রং ফিকে হলদে। এতে দ্রবীভূত থাকে গ্লুকোজ, অ্যামিনো এ্যাসিড, অজৈবনিক লবণ, ইউরিয়া, সিরাম অ্যালবুমিন, সিরাম গ্লাবিউলিন ও ফাইব্রিনোজেন। এই রক্তরস জমে গেলে যখন তা থেকে যে জলীয় অংশ বার হয়ে আসে তার নাম সিরাম অথবা রক্তমস্তু। রক্তরসে অসংখ্য কণিকা এবং অনুচক্রিকা (platelets) থাকে। কণিকা হল দু'রকম লাল ও সাদা (Red and white corpuscles)। লাল রক্ত কণিকায় হিমোগ্লোবিন নামক রঞ্জক পদার্থ থাকে এরই জন্য রক্ত গাঢ় লাল দেখায়। সাদা কণিকাগুলি লাল কণিকা অপেক্ষা আকারে বড় এবং সংখ্যাও কম। শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর জীবাণুর বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করে। অনুচক্রিকাগুলি খুব ছোট, লাল কণিকার এক-তৃতীয়াংশ। যখন কোথাও কেটে গেলে রক্তপাত হয়, তখন এরা সাদা কণিকার সঙ্গে জড় হয় এবং রক্তরসের প্রোথ্রম্বিন নামে যে উপাদান আছে তাকে থ্রমবিনে রূপান্তরিত করে কিন্তু তখন ক্যালসিয়ামের উপস্থিত থাকা চাই। এই প্রক্রিয়াতে আবার রক্তরসের ফাইব্রিনোজেন থেকে ফাইব্রিন তৈরী হয়। এই ফাইব্রিন রক্ত জমাট বাঁধিয়ে দেয়। এই হল মোটামুটি রক্ত ও তার উপাদানের কথা।

আজকাল পৃথিবীর নানাস্থানে ব্লাড ব্যাঙ্ক অথবা রক্তভাণ্ড স্থাপিত হয়েছে। এখানে মানুষের শরীর থেকে পূর্ণ রক্তই নেওয়া হয়, কিন্তু কাজে লাগে কেবলমাত্র তরল অংশ অথবা রক্তরস। রক্তের বাকি উপাদানগুলি নষ্ট হয়। আজকাল অবশ্য রক্তের প্রত্যেক উপাদান রক্তরস, রক্তমস্তু, ফাইব্রিনোজেন, থ্রমবিন ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে অভীষ্ট ফল লাভ হচ্ছে, এবং কি উপায়ে, আমরা ক্রমশ তা জানতে পারব।

কিছুদিন আগে অ্যামেরিকার ডিট্রয়েট নামক শহরের একটি হাসপাতালে একজন বৃদ্ধা নিউমোনিয়াগ্রস্ত রোগিণীকে ভর্তি করা হয়। এর অবস্থা আগে থাকতেই ছিল খারাপ ধরণের অ্যানিমিয়া। এই রোগিণীকে প্রথমে সালফা জাতীয় ঔষধ (যেমন Sulphapyridine অথবা Sulphathiozol; M. & B. 693 অথবা cibazol) খাইয়ে নিউমোনিয়া দূর করা হল ও পরে তার দেহে কেবল মাত্র লাল রক্ত কণিকা সঞ্চার করে তার রক্তহীনতার চিকিৎসা করে তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো হল। কিছুদিন আগে হলে তাকে কিছুতেই বাঁচানো যেত না।

রুগ্ন ও মুমূর্ষু ব্যক্তিদের শিরায় রক্ত সঞ্চার করে তাদের নবজীবন দান করবার আকাঙ্ক্ষা বহু শতাব্দী থেকেই অনেক চিকিৎসকের মনে জেগে আসছে কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। তাদের এই বিফলতার কারণ দেখিয়ে দিলেন ১৯০১ সালে অস্ট্রিয়ার বৈজ্ঞানিক-চিকিৎসক কার্ল ল্যাণ্ডস্টাইনার। আগে যে কোন লোকের দেহ থেকে অপর একজন লোকের দেহে রক্ত সঞ্চার করা হত এতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগীর মৃত্যু হত। ল্যাণ্ডস্টাইনার দেখিয়ে দিলেন যে, রক্তের শ্রেণীভেদ আছে এবং শ্রেণীবিচার করে রক্ত সঞ্চার না করলে বিপদ ঘটে। এই আবিষ্কারের জন্য ল্যাণ্ডস্টাইনার ১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রক্তের লাল কণিকায় হিমোগ্লোবিন ছাড়া agglutinogess নামে একটি পদার্থ আছে যা হল রক্তের শ্রেণীভেদের কারণ।



চিমটের ডগায় ফাইব্রিনের ফেনা। থ্রমবিনের প্লাবনে টুকরাটি ডুবিয়ে নিয়ে পাত্রের রক্তে ফেলেলেই রক্ত জেলির মতো কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জমে যায়।

মানুষের রক্ত চারটি পৃথক শ্রেণীতে পড়ে, ইংরাজী বর্ণমালা অনুযায়ী তাদের নাম হয়েছে A, B, AB এবং O। রক্তের শ্রেণী বিভাগ শিখলেও রক্ত সঞ্চারের কাজটা কিন্তু তখনও সহজ হল না কারণ একজনের দেহ থেকে আর একজনের দেহে রক্ত সঞ্চার তখন ছিল বিপজ্জনক ও ক্লেশদায়ক আর তা ছাড়া রক্তকে তরল অবস্থায় সঞ্চিত রাখবার কৌশল তখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

শিরা থেকে রক্ত একবার বার হয়ে আসবার অল্পক্ষণ পরেই জমে যায়। রক্তকে তরল অবস্থায় রাখতে প্রথমে সক্ষম হন আর্জেণ্টিনার ডাঃ লুই অ্যাগোট সোডিয়াম সাইট্রেটের সাহায্যে, কিন্তু এক সপ্তাহের বেশি তিনি রক্তকে তরল রাখতে সক্ষম হননি। তাহলেও এই সময় থেকে পরোক্ষ-ভাবে রক্ত সঞ্চার করা সম্ভব হয়েছিল।



ফাইব্রিনের পাতলা ফিল্ম্। সূক্ষ্ম অস্ত্র প্রয়োগের পর তালি লাগাতে খুব সুবিধা। ক্ষতস্থান খুব শীঘ্র সেরে যায়।

১৯৩০ সালে অর্থাৎ যে বৎসর ল্যাণ্ড-স্টাইনার নোবেল প্রাইজ পান, মস্কোর ডাঃ যুদিন যথেষ্ট গবেষণার পর রক্তকে পঁচিশ দিন পর্যন্ত তরল রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরপর প্রায় ছয় সাত বৎসর পরে যুদিনের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে চিকাগোর কুক কাউণ্টি হাসপাতাল প্রথম দস্তুরমতো ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপন করলেন। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর তরল রক্ত জমা রাখা হত ও প্রয়োজনভেদে খরচ করা হত। স্পেনে গৃহযুদ্ধের সময় রক্ত সঞ্চারের পদ্ধতি খুব সহজ করা সম্ভব হয়েছিল এবং যে কোনো ব্যক্তি এই কাজ করতে পারত।

পূর্ণরক্তের পরিবর্তে (whole blood) কেবলমাত্র রক্তরসে সমান কাজ পাওয়া যায় এই মত প্রচার করেন ১৯১৮ সালে ইংরাজ সামরিক চিকিৎসক ক্যাপ্টেন গর্ডন ওআর্ড কিন্তু প্রমাণিত হল আঠারো বছর পরে মার্কিণ চিকিৎসক ডক্টর জন ইলিয়ট কর্তৃক। সরু মুখওয়ালা বড় বোতলে তরল রক্ত রাখা হয় এবং এই বোতলগুলিকে সেণ্ট্রিফ্যুগাল যন্ত্রের সাহায্যে চাকার মতো ঘোরানো হয় যে পর্যন্ত না রক্ত কণিকাগুলি বোতলের তলায় থিতিয়ে যায় আর রক্তরস যার রং অনেকটা খড়ের মতো বোতলের ওপরের দিকে পৃথক হয়ে জমে। তখন এই রক্তরসকে পৃথক করে ব্যবহার করা হতো।

চার বছর পরে ১৯৪০ সালে রক্তাধানের চরম উন্নতি সাধন করলেন ডক্টর ম্যাক্স এম স্ট্রুমিয়া। তিনি দেখাইয়া দিলেন যে রক্তরস তরল অবস্থায় ব্যবহার করে যে ফল পাওয়া যায়, রক্তরসকে শুকিয়ে নিয়ে তাকে গুঁড়ো করে পরে পরিশোধিত জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেহে সঞ্চার করলে একই ফল পাওয়া যায়। আমরা মাথা ধরলে যেমন সহজেই শিশি থেকে অ্যাস্পিরিনের একটা বড়ি বার করে জল দিয়ে গিলে খাই, এখন রক্তাধান কাজটা প্রায় ততটাই সহজ হয়ে এল। শুকনো রক্ত-রসের সুবিধা অনেক। একে সর্বদা হিমকক্ষে রাখতে হয় না, এক জায়গা থেকে পাঠাতে হলে জায়গা কম লাগে অথচ বোতল ভাঙবার ভয় থাকে না। তার থেকে আরও সুবিধা এই যে, রক্তাধানের সময় শ্রেণীবিচার করতে হয় না। যে সমস্ত কেন্দ্রে রক্তাধান করা হয় সে সব জায়গায় এক বোতল শুকনো রক্তরসের সঙ্গে এক বোতল পরি-শোধিত জল, রক্তাধানের ছুঁচ এবং রবারের সরু নল যা-কিছু আবশ্যক একই সঙ্গে প্রস্তুত রাখা হয় যাতে খুব শীঘ্র রোগীর দেহে রক্ত সঞ্চার করা যায়।

এতক্ষণ রক্তের উপকারিতার একটা দিক দেখানো হল। রক্তের এই উপকারিতায় উৎসাহিত হয়ে ১৯৪০ সালে অ্যামেরিকার ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল এবং তথাকার রেডক্রস, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত জৈব রাসায়নিক ডক্টর এডুইন জে কন-এর উপর রক্ত ও তার উপাদানগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করবার ভার দেওয়া হল। আমরা যেমন কয়লা এবং পেট্রোলের বিভিন্ন ভগ্নাংশ থেকে নানারকম উপকারী রসায়ন এবং ঔষধাদি পাই, ডক্টর কনও সেইরকম রক্তের প্রায় প্রত্যেক বিশ্লেষিত অংশ থেকে নানা-রকম অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উপকারী পদার্থ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন।

তাঁর গবেষণার প্রথম ফল হল সিরাম অ্যালবুমিনের প্রয়োগ। একজন মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে বাঁচাবার জন্য যতটা রক্তরসের প্রয়োজন তার মাত্র পাঁচভাগের এক ভাগ সিরাম অ্যালবুমিন ব্যবহার করলে কাজ পাওয়া যায়। বর্তমান যুদ্ধে প্রশান্ত মহা-সাগরের দ্বীপগুলিতে আহত সৈন্যদের জন্য এই সিরাম অ্যালবুমিন পাঠান হত।

দ্বিতীয় ফল পাওয়া গেল রক্তরসের গ্লবিউলিন থেকে। আমাদের দেহে রক্তের এই গ্লবিউলিন নানারকম রোগের বীজাণু-বিধ্বংসী প্রক্রিয়ার (Antibody) সৃষ্টি করে যেমন হাম, মাম্পস্, ডিপথিরিয়া, হুপিং কফ, স্কারলেট ফিভার ইত্যাদির। বসন্তের প্রতিষেধক হিসাবে যেমন টিকার প্রচলন আছে সেই রকম আজকাল ঐ সমস্ত রোগের গ্লবিউলিন বেছে নিয়ে মানুষের দেহে প্রয়োগ করে প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

রক্ত যখন জমে যায় তখন তা থেকে পাওয়া যায় ফাইব্রিন ও থ্রবিন যেগুলিকেও সাদা



ফাইব্রিনের প্লাস্টিক। রবারের মতো নরম অথবা শক্ত করা যায়। অস্ত্রোপচারের পর নানারূপে ব্যবহার করা যায়।

গুঁড়োতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয় ফাইব্রিনের পাতলা ফিল্ম, আঠা, ফেনা ও প্লাস্টিক প্রস্তুতও সম্ভব হয়েছে। কোথাও ক্ষতের ওপর তালি লাগাতে অথবা কোনো সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের সময় অসংখ্য ছিদ্র থেকে রক্তপাত নিবারণ করতে এবং নানারকম প্রয়োজনে এই ফাইব্রিন অথবা থ্রবিনের বিভিন্ন রূপান্তর ব্যবহার করে অভিষ্ট ফললাভ হচ্ছে।

"হেমোফিলিয়া" নামক একটি ব্যাধির কথা আমরা শুনেছি। এটি রক্তপাতের ব্যাধি। কেবল পুরুষদেরই এই ব্যাধি হয়। এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের একবার রক্তপাত আরম্ভ হলে কিছুতেই তা রোধ করা যায় না এমন কি নব আবিষ্কৃত ভিটামিন-'কে' যা নাকি রক্তপাত বন্ধ করতে অদ্বিতীয় তাতেও কোনো ফল পাওয়া যায় না। প্রচুর রক্তপাতের ফলে এই সমস্ত লোকেরা অনেক সময়েই মারা যায়, কিন্তু আশার কথা যে ডক্টর কন ফাইব্রিনের ফেনার সাহায্যে হেমোফিলিয়া

রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের রক্তপাত বন্ধ করতে সক্ষম হইয়াছেন।

রক্তের লাল কণিকাগুলি রক্তরস থেকে পৃথক হলেই নষ্ট হয়ে যায় এবং সেগুলিকে ফেলে দেওয়া হত অথচ কত লোকের পূর্ণ রক্তের আবশ্যক হত। ডিট্রয়েটের ডাঃ ওয়ারেন বি কুকসী এই রক্তকণিকাগুলিকে সাধারণ লবণের দ্রাবণে ভাসিয়ে অবিকৃত রাখতে সক্ষম হন। এই পদ্ধতিতে তিনি লাল রক্ত কণিকাগুলিকে পাঁচ দিন পর্যন্ত অবিকৃত রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। রক্তহীনদের পূর্ণ রক্ত প্রয়োগ করে যে ফল পাওয়া যায়, শুধু মাত্র লাল কণিকা প্রয়োগ করে একই ফল পাওয়া যায়; এর প্রমাণ পাওয়া গেছে দুইশত রক্তহীনের দেহে লাল রক্তকণিকা সঞ্চার করে। এখন লাল রক্তকণিকা আর-থ্রাইটিস ও যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীদের দেহে সঞ্চার করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে নিউইর্কের দুজন চিকিৎসক ডাঃ জন জে মুরহেড এবং লেস্টার জে উংগার লাল রক্তকণিকার একরকম প্রলেপ প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন যা নাকি বিষাক্ত ক্ষত, পোড়া ঘা এবং ফোঁড়ার উপর লাগিয়ে আশ্চর্যজনক সুফল পাওয়া গেছে। লাল রক্তকণিকাগুলি শুকিয়ে গুড়ো করে ব্যবহার করা হচ্ছে। এদের স্থায়িত্ব খুব বেশী এবং কার্যকারিতায় কমতি নয়।

তিন সঙ্গী

শ্রীবিমল চন্দ্র সিংহ

[২]

তিন সংগীর গল্পগুলি যদিও পূর্বের গল্পগুলি থেকে বিভিন্ন, তবু কতকগুলি জিনিসের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পুরানো পক্ষপাত এখানেও ধরা পড়ে। যেমন অভীকের চেহারার বর্ণনা। 'অভীকের চেহারাটা আশ্চর্য রকম বিলিতি ছাঁদের। আঁট লম্বা দেহ, গৌরবর্ণ, চোখ কটা, নাক তীক্ষ্ম, চিবুকটা ঝুঁকেছে যেন কোনো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভংগীতে। আর ওর মুষ্টিযোগ ছিল অমোঘ, সহপাঠীরা যারা কদাচিৎ এর পাণিপীড়ন সহ্য করেছে, তারা এ'কে শতহস্ত দূরে বর্জনীয় বলে গণ্য করত।' এ তো শ্যামল বাঙালীর চেহারা নয়, এ অসাধারণ অস্বাভাবিক চেহারা। যেন, গোরার চেহারার বর্ণনা মনে পড়ে। 'তাহাকে আত্মীয়-বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকে। সে চারিদিকের সকলকে যেন খাপছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। ...... তাহার গায়ের রংটা কিছু উগ্র রকমের শাদা —হলদের আভা তাহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই। মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মতো বড়ো......চোয়াল এবং চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মতো; ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা; তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মতো ঝুঁকিয়া আছে।' শেষ কথা গল্পের নায়ক নবীনমাধবও তেমনি অসাধারণ চেহারার লোক। তাছাড়া, অমিতের মত এই সব নায়কেরাও সাধারণ মানুষ নয়। অভীক নিজেই বলেছে যে, 'ও জানে যে, প্রচলিত নমুনার মানুষ ও নয়। ওর নামটা ভিড়ের নামের সঙ্গে হাটে-বাজারে ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘর্মাক্ত হবে সেটা ওর রুচিতে বাধে।' বাস্তবিক পক্ষে অভীকের মধ্যে অমিতের ছায়া আছে! তেমনি বিভার নিরুচ্ছ্বাস গোপন ভালবাসার চেষ্টা যে লাবণ্যের মধ্যে কিছু কিছু না মেলে তা নয়। অধ্যাপক অনিলকুমারের পূর্ববর্তী হিসেবে পরেশবাবুর নাম মনে পড়ে, অচিরাকে প্রথম দেখার মধ্যে অমিত-লাবণ্যের প্রথম দেখার আভাস আছে। শেষের কবিতার শেষে যে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, শেষ কথায় আবার তার আভাস দেখা দিয়েছে, যদিও দুয়ের চেহারা এক নয়। আরও আছে নতুন সিসি-লিসি-কেটির দল, যারা 'জাত-বান্ধবী' মেয়ে—অমরবাবু বা আগরওয়ালের আড়ালে শোভনলালের সন্ধান পাওয়া যায় মনে হয়, এমন কি, সুস্মির আড়ালে সুরমারও। কিন্তু শুধু চরিত্রগত সাদৃশ্যই নয়, আরও সাদৃশ্য আছে—তার মধ্যে ভাষার ভংগী ও বাক্চাতুরী, উপমা ও এপিগ্রামের ছড়াছড়ি—এ সবও শেষের কবিতার যুগের মতই আছে, বরং বেড়েছে। তার উপর ভাষার রোমাণ্টিক উদ্দামতা বাদ দিয়ে অনেক সময় একটা স্বেচ্ছাকৃত নীরসতা আনা হয়েছে। তার ফলে এই সমস্ত বাক্চাতুরী ও এপিগ্রাম আরও দৃঢ় রেখায় ফুটে উঠেছে।

কিন্তু তবু তিন সংগীর গল্পগুলিতে শেষের কবিতার যুগের আবহাওয়া নেই, এখানে আবহাওয়া অন্য। এই গল্পগুলির নায়কেরা কেউ-ই সাধারণ বাঙালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইদানীং সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের নায়কদের বদলে এই ধরণের নগর-নির্ভর উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজের নায়কেরাই রবীন্দ্র-রচনায় স্থায়ী আসন নিয়েছিল, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। রবিবার গল্পের নায়ক অভীক হচ্ছে সনাতনী ঘরের পয়সাওয়ালা বাপের ছেলে, সে কিন্তু নিজে নাস্তিক। বিশুদ্ধ নাস্তিকতাই তার ধর্ম। 'নিরেট আচার-বাঁধা সনাতনী ঘরের ফাটল ফুঁড়ে যদি দৈবাৎ কাঁটাওয়ালা নাস্তিক ওঠে গজিয়ে, তাহলে তার ভিত-দেয়াল ভাঙা মন সাংঘাতিক ঠেলা মারতে থাকে ইঁট-কাঠের প্রাচীন গাঁথুনির উপরে।' এই অভীক বাপের ত্যাজ্যপুত্র হয়ে কিছুদিন করল আর্টচর্চা, তারপর অর্থের অভাব হতে ময়লা টুপি আর তেল-কালিমাখা নীল রঙের জামা-ইজের পরে মিস্ত্রিগিরি করতে লাগল চার পয়সার পরোটা আর তার চেয়ে কম দামের শাস্ত্রনিষিদ্ধ পশুমাংস খেয়ে। হাতে টাকা জমতে সে অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এ'সে পূর্ণ পরিস্ফুট আর্টিস্টরূপে বোহেমিয়ানি করতে লেগে গেল। শিষ্য জুটল, শিষ্যা জুটল। 'চশমাপরা তরুণীরা তার স্টুডিয়োতে আধুনিক বেআব্রু রীতিতে যেসব নগ্ন মনস্তত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগল, ঘন সিগারেটের ধোঁয়া জমল তার কালিমা আবৃত করে।' অভীক বিভাকে ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসা এক অদ্ভুত ধরণের। খানিকটা এগোবার পর অভীক বিভার হার চুরি করে বিলেতে পালাল বাঙালী টিশিয়ান হতে, সেখান থেকে চিঠি লিখে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করল বিভার কাছে।

গল্পটিতে অনেক স্খলন আছে মনে হয়। এ গল্পগুলিতে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের প্রতি পক্ষপাত দেখিয়েছেন; নায়কেরা সকলেই বিজ্ঞানী। হলেও মজুরগিরি করা তাদের একটা অংগ। আবার তারা সকলেই বিত্তশালী কিন্তু এই রকম দ্বিধারা এ চরিত্রগুলির কোথায়ও মিশ খায় নি। অভীকের চরিত্রেও আর্টের চর্চা ও মিস্ত্রিগিরি পাশাপাশি বাস করে, একবার সে আর্টিস্ট পরক্ষণেই সে যন্ত্রবিদ্। কিন্তু তার এই রকম ঘন ঘন চেহারা-বদল হতে মনে হয় ও দুটো ধারার কোনটিই তার জীবনে সত্য হয়ে ওঠে নি। তারা হয়তো পাশপাশি বয়ে চলেছে, কিন্তু পরস্পর মেশে নি। দুঃখের যে দাহে প্রাণে পোড় খেয়ে অন্তর বিশুদ্ধীকৃত হয়, নতুন রং ধরে, বিশ্বাস আরও স্থির হয়ে নিষ্কম্প দীপশিখার মত জ্বলতে থাকে, অভীকের অভাব-দুঃখ তো সে অভাব-দুঃখ নয়। এরকম ওঠাপড়া, এরকম অস্থিরতা তার লক্ষণ নয়। নাস্তিকতারও একটি ধর্ম আছে। যেমন, শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্নে'র কমল। এক ধরণের নাস্তিকতাই, অন্তত প্রথম দিকে, তার ধর্ম ছিল। কিন্তু সেই ধর্ম তাকে চঞ্চল অস্থির না করে বরং আরও শক্তি দিয়েছে, যে অসাধারণ শক্তির বলে মাছের গায়ে জল না লাগার মত সংসারের কোনও আঘাত কোনও কালিমাই তার গায়ে লাগত না। দারিদ্র্যেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বরং জামা-সেলাই করে দিন চালানোর চেষ্টায় তার ধর্মের সজীবতা প্রকাশ পেয়েছে, তার মনের নতুন চেহারা ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে। অজিতের সংগে যখন সে চলে গেল, তখন পর্যন্ত তার এই নাস্তিকতা বজায় আছে। অভীকের চরিত্র এরকম অবিচলতা বা স্থিরতার চিহ্নমাত্রও নেই—যেন প্রাণের কি একটা জ্বালায় সে ছটফট করে বেড়ায়—ছবি আঁকা, প্রেম করা এবং মিস্ত্রিগিরি সবই সেই ছটফটানির বিভিন্ন দিক্ মাত্র। কোনও ব্যাপারটিই যে একটি সমগ্রতার মধ্যে গ্রথিত নয়, তার প্রমাণ মেলে যখন দেখি, কি প্রেম, কি আর্ট কোনটিতেই তার হৃদয় ক্রমশ ক্রমশ বিকশিত হয়ে উঠছে না, দুটোই সময়ে সময়ে শিশিরকণার মতো ঝিকমিক করে উঠছে, কিন্তু বৃষ্টিবিন্দুর মতো মূলে রস জোগাচ্ছে না। আর্ট তার বুক ভরালো

না; বোঝা গেল যখন তার খ্যাতির মূলে হচ্ছে তার ধনী পিতার তহবিলে, তখনই সে খ্যাতির দাম উড়ে গেল। শিষ্যাশিষ্যার প্রশংসা ইনস্পিরেশন জোগানোর বদলে অনেক সময়ই অশিক্ষিতের ন্যাকামি বলে তার অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। শেষ পর্যন্ত অভীককে বিদেশে দৌড়তে হল আর্টিস্ট হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য—'আমাদের এই চোখে-ঠুলি-পরা ঘানি-ঘোরানোর দেশে আমার চলবে না।' আমাদের দেশের উপর এই কটাক্ষটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আসলে মেয়েরা অভীকের স্তুতি করত তার আর্টের কদর বুঝে নয়, তারা নিজেরাই সন্দেহ করেছে যে, স্বয়ং তারা দুই-একজন ছাড়া বাকি সবাই আর্টের বোঝে না কিছুই, 'ভণ্ডামি করে, গা জ্বলে যায়।' তাদের স্তুতি হচ্ছে মুগ্ধাদের কলগুঞ্জন, তা সে যতই নগ্ন মনস্তত্ত্বের বেআব্রু আলোচনার মধ্যে প্রকাশ পাক না কেন। বিভা ছিল এদের বাইরে; সে উগ্র নয়, বাড়িতে তার মেলামেশার বাধা ছিল না বলেই সে বাইরের মেলামেশাতেই অস্বাভাবিক ঝাঁঝালো হয়ে উঠতে পারে নি, বাইরে বেরোলেও তার রক্ষাকর্তার দরকার ঘোচে নি। কবি বলতে চেয়েছেন, এই বিভাই হচ্ছে অভীকের সত্যিকারের ভালবাসার পাত্রী, অভীকের মনে শিল্প-প্রীতি ও প্রেমের দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র ক'রেই গল্পটি গড়ে উঠেছে। একবার সে আর্টের দিকে ঝুঁকছে, একবার সে ঝুঁকছে শীলার দিকে, কিন্তু তার কেন্দ্রে রয়েছে বিভা—যার কাছে শেষ পর্যন্ত অভীক সমস্ত বুদ্ধি-বিচার ত্যাগ করে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে চেয়েছে—কবির বোধ হয় এই রকমই উদ্দেশ্য। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। অভীক যতই বলুক না কেন, বিভা অভীকের সত্যিকারের ভালবাসার পাত্রী নয়। অভীক অবশ্য বিভাকে বলেছে, 'আশ্চর্য, তুমি আশ্চর্য,' শেষ চিঠিতে লিখেছে, 'বী, আমার মধুকরী, জগতে সবচেয়ে ভালবেসেছি তোমাকে।' কিন্তু তবুও অভীক-বিভার ব্যাপারটা সবটাই ছেলেমানুষি। যে প্রেমের আলোয় হৃদয়কমল ফুটে ওঠে, সে আলোর কোন সন্ধানই নেই। বাস্তবিক, অভীক-বিভার প্রেমের প্রতি পদেই কি অসংগতি! অভীক এসে বিভার কাছে প্রথম দাবী জানাচ্ছে, বিভাকে কিনতে হবে অভীককে দেওয়া মনীষার উপহারের ঘড়ি। অভীকের ফোর্ড গাড়ির চালচলনের ঢিলেমি তার অসহ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে যেদিন সেই ফোর্ড গাড়িতে শীলাকে নিয়ে যাবার সময় পাকড়াশি-গিন্নি নতুন ফায়াট গাড়িতে তাদের ছাড়িয়ে চলে গেল, সেইদিন হতে অভীকের সংকল্প জাগলো নতুন গাড়ি কিনে শীলাকে চড়িয়ে পাকড়াশি-গিন্নির নাকের সামনে দিয়ে শিঙা বাজিয়ে চলে যেতে হবে। সেইজন্য সে একটা ক্রাইসলার গাড়ি কিনবে, তারই জন্য সে টাকা নিতে এসেছে বিভার কাছে। এই আবদারটা কেমন কেমন ঠেকে। না হয় মানলুম, মনীষার মৃত্যুর পর তার উপহার বেঁচে ফেলতে নাস্তিক অভীকের মন বিচলিত হল না; কিন্তু তা বলে অভীক নির্বিকারচিত্তে টাকা চাইছে জগতে তার সব-চেয়ে ভালবাসার পাত্রীর কাছ থেকে অপর একটি মেয়েকে পরিপূর্ণ করে তোলবার জন্য—একথা কি করে স্বাভাবিকভাবে সম্ভব হতে পারে? প্রেম-কাহিনীর কোনরকম মারপ্যাঁচেই কি এই অঘটন-ঘটন সম্ভব? অভীক জানে, শীলার মধ্যে যখন গর্ব জাগে তখন তার ঝলক বাড়ে। 'মেয়েদের এত গয়না কাপড় জোগাতে হয় সেইজন্যেই। আমরা চাই মেয়েদের মাধুর্য, ওরা চায় পুরুষের ঐশ্বর্য। তারি সোনালি পূর্ণতার উপর ওদের প্রকাশের ব্যাকগ্রাউণ্ড।' বিভাকে সে যে এই সব অসম্ভব কথা শোনাতে পারছে সে কিসের জোরে? কবি এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়েছেন দুটি কৈফিয়ৎ দিয়ে। প্রথমত, অভীকের মুখ দিয়ে তিনি বিভার স্তুতি করিয়েছেন 'তুমি লোভী নও, তোমার নিরাসক্ত মনের সবচেয়ে বড়ো দান স্বাধীনতা।' বিভার মুখ দিয়েও তিনি বলিয়েছেন 'আর্টিস্ট, তোমরা সাবালক শিশু, এবার যে খেলাটা ফেঁদেছ, তার খেলনাটি না হয় আমার হাত থেকেই নেবে।' কিন্তু প্রেমের ব্যাপার কি এতই সহজ এবং এতই অগভীর? অভীকের স্তুতির নির্গলিতার্থ হচ্ছে, বিভা খুব ভাল, বিভা দেবী, টানাটানি করবার লোক সে নয়—আর তার ভালোত্ব বজায় রাখতে হলে তার নির্বিকারত্বও বজায় রাখতে হবে। অর্থাৎ দেবী-পদবীর লোভে বিভাকে আসল দাবীই ত্যাগ করতে হবে, সস্তা চাটুকথায় বিভার দাবী মিটিয়ে দিয়ে অভীক নিজের খুশিমত চলতে চায়। এটা আর যাই হোক, সত্যি-কারের প্রেমের কথা নয়। সত্য প্রেমের মধ্যে একটা রক্তমাংসের সজীবতা আছে, ব্যাকুলতা আছে, সেটা এমন নির্বিকার নিশ্চিন্ত হতে পারে না। গল্পগুচ্ছেরই 'ত্যাগ' নামে একটি গল্পের শেষ ক' লাইন উদ্ধৃত করছি। এমন হৃদয়-বেঁধা গল্প বেশী পাওয়া যায় না। সমস্ত গল্পটি না জানলে শেষ লাইন ক'টির তীব্রতা সবটা উপলব্ধি করা যায় না, তবুও শেষ লাইন ক'টি এমনি'তই কি স্পষ্টভাবে প্রেমের বুক-ফাটা ব্যাকুলতাকে ফুটিয়ে তুলেছে!

আবার চটিজুতার শব্দ হইল। হরিহর মুখুজ্যে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন, 'অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, আর সময় দিতে পারি না। মেয়েটাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও।'

কুসুম এই স্বর শুনিবামাত্র একবার মুহূর্তের মতো চিরজীবনের সাধ মিটাইয়া হেমন্তের দুই পা দ্বিগুণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল—চরণ-চুম্বন করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া পা ছাড়িয়া দিল।

হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল, 'আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।'

হরিহর গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, 'জাত খোয়াইবি?'

হেমন্ত কহিল, 'আমি জাত মানি না।'

'তবে তুই শুদ্ধ দূর হইয়া যা।'

প্রতিবেশীদের চক্রান্তে কায়স্থ-কন্যা কুসুমের সঙ্গে হেমন্তের বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর যখন সেকথা প্রকাশ পেল তখন নিরপরাধা কুসুমকে ত্যাগ করবার আদেশ এল বাবার কাছ থেকে। এই যে শেষ দৃশ্য, তার মধ্যে ঐ যে কুসুম একবার দ্বিগুণ আবেগে হেমন্তের পা চেপে ধরে পরক্ষণে পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে পা ছেড়ে দিল—এর মধ্যে যে তীব্র বুক-ছেঁড়া বুক-ভাঙা প্রেম এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চরম আত্মোৎসর্গ—যে প্রেম সত্যিই এক মুহূর্তে সম্রাট করে দিতে পারে, সাহসে পৌরুষে উদ্বুদ্ধ করতে পারে প্রেমিককে, অথচ নিজেকে বিলুপ্ত করে দিতে সক্ষম করে—সে প্রেম এর চেয়ে আর কি তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশিত হতে পারে? কুসুমও তো হেমন্তকে স্বাধীনতা দিতে কুণ্ঠিত নয়, কিন্তু তবু কি সে চিরকালের মত স্বাধীনতা দেবার আগে একবার দ্বিগুণ-তর আবেগে পা না চেপে ধরে পারে? এই তো সজীব জ্বলন্ত প্রেমের লক্ষণ। কিন্তু এ প্রেম কি বিভা-অভীকের কাহিনীতে আছে? তা নেই। এবং তা নেই বলেই অভীকের উপর বিভা সেরকম করে দাবী জানাতে পারছে না, প্রেমের দাবীর চেয়ে নিরাসক্তির বাহবাই তার কাছে বড় হতে চলেছে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিভার মনে প্রেমের অঙ্কুরোদ্গম সত্যিই হয়েছিল, কিন্তু অভীকের হয় নি। অভীক যে ভালবাসতে জানে না তা নয়—শীলার প্রতি তার প্রেম বিভার প্রতি প্রেমের মত সাবালক শিশুর ছেলেখেলা নয়। শীলা সম্বন্ধে অভীক বলছে, 'ওযে আমার পালের হাওয়া। ও নইলে আমার তুলি যায় আটকে বালির চরে। বুঝতে পারি আমার পাশে বসলে শীলার হৃৎপিণ্ডে একটা লাল রঙের আগুন জ্বলতে থাকে, ডেনজার সিগনাল, তার তেজ প্রবেশ করে আমার শিরায় শিরায়।' কই, শীলার প্রেম তো ভাসাভাসা নৈর্ব্যক্তিক নয়, সাবালক শিশুর ছেলেখেলা নয়! এর মধ্যে সেই প্রেমেরই আভাস পাওয়া যাচ্ছে, যার উত্তাপে হৃদয় হঠাৎ ফুটে উঠে দেহমনকে অনির্বচনীয় করে তোলে। সুতরাং অভীক যে সবটাই সাবালক শিশু, একথা সত্যি নয়। শীলার সংস্পর্শে যে হৃদয় বুদ্ধির বাধা এড়িয়ে

নিছক প্রেমের আগুনে জ্বলতে থাকে বিভাকে ভালবাসবার বেলা হৃদয়ে সে উত্তাপ জাগে না, নানা রকম বুদ্ধির মার-প্যাঁচ, নানা রকম খামখেয়াল বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তার একমাত্র কারণ বিভাকে সে সত্যিকারের ভালবাসে না। বিভাও তো গোড়ার দিকে তাতে ক্ষুব্ধ হয় নি। অভীকের ছেলেমানুষিকে প্রশ্রয় দিয়েই তার আনন্দ। কিন্তু সেটা তাহলে আনন্দ হতে পারে, কিন্তু প্রেম নয়। ঠিক এই কারণেই অভীক বিভার অন্তরের প্রবেশপথ কোনও-দিন জানল না। যখন ক্রমশঃ ক্রমশঃ বিভার অন্তরে সজীব প্রেমের অঙ্কুর একটু উদ্গত হল, তখনও অভীক সেটিকে বুঝেও বুঝছে না। বিভা যখন বলল, 'পস্টারিটির জন্য অপেক্ষা করতে হবে না, অভী, নিষ্ঠুর শাস্তি আমার আরম্ভ হয়েছে,' তখনও অভীক বুঝল না বিভার বেদনা। তার উত্তরে সে বলে বসল, 'কোন শাস্তির কথা তুমি বলছ জানি না, কিন্তু জানি তোমার সব-চেয়ে বড়ো শাস্তি তুমি বুঝতে পারো নি আমার ছবি।' কি কথার কি উত্তর। বিভাকে সবচেয়ে ভালবাসে বলে অভীক যতই আস্ফালন করুক না কেন, আসলে সে বিভাকে সত্যি করে চায় না। বিভা তার খেয়াল মেটাবার উপলক্ষ্য পর্যন্ত হতে পারে, তার বেশী কিছু নয়।

শীলার প্রেম-কাহিনীকে সুসংগতি দেবার জন্য কবি আর একটা প্যাঁচের অবতারণা করেছেন। অভীক এসে বিভাকে এই যে শীলা-উপাখ্যান বলছে কবি এক জায়গায় ইঙ্গিত করেছেন এটা হচ্ছে শুধু বিভাকে জাগাবার জন্য, তার মনে আগুন ধরানোর জন্য। অভীক বিভাকে বলছে, 'স্বীকার করো আমাকে না হলে নয় বলে জেনেই উৎকণ্ঠিত তোমার সমস্ত দেহমন। ......আমি চাই, আমি কাঙাল। আমি দিন-রাত বলব আমি চাই, আমি তোমাকেই চাই। ......মাঝে মাঝে ঘনিয়ে উঠুক ধোঁয়া জেলাসির, প্রমাণ হোক ভালবাসার অন্তর্গূঢ় আগুন। নিবে-যাওয়া ভলক্যানো নয় তোমার মন। তাজা ভিসুভিয়স।' (মজার কথা এই যে, যখন বিভা বলল যে অভীকের জন্য সত্যই তার দেহমন উৎকণ্ঠিত তখন কিন্তু অভীক তার সে কথায় সাড়া দিল না, বলল, তার শাস্তি হওয়াই উচিত, কেননা, সে অভীকের ছবি বোঝে না!) কিন্তু এ কৌশলটিও তো লাগে নি। এত বলা সত্ত্বেও তো বিভা উত্তপ্ত হল না, বরং সব ব্যাপারটিকেই উড়িয়ে দিতে চাইল, বলল, 'এ কী ছেলেমানুষি করছ।' বিভার মন জাগল না। বাস্তবিক তা জাগতে পারে না। বিভার মত শান্ত কোমল মেয়ে, যার নিরাসক্তি স্বতঃই এত বেশী, তার মন জয় করতে হলে তা ধীরে ধীরে করতে হবে, প্রতিপক্ষের তাড়না আশঙ্কা থাকলে সে আরও কুঁকড়ে যাবে নিজের মধ্যে, প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে আসবে না। জেলাসির আগুনে জ্বলবার মেয়ে বিভা নয়; সে বরং সোহিনীর মত মেয়ের সম্ভব, কিন্তু বিভার ধরণ অন্য।

এই রকম অদ্ভুত রকমের ঘোরপ্যাঁচের মধ্য দিয়ে গল্পটি অগ্রসর হয়েছে। অভীক-বিভার কাহিনী আর একটু অগ্রসর হতে দেখি শীলাকে পূর্ণ করে তোলার চেয়ে অমরবাবুর প্রতি ঈর্ষাই অভীকের মনে বড় হয়ে উঠেছে। বিভা অমরবাবুর প্রতিভার পায়ে অর্ঘ্য দিচ্ছে এটা অভীকের অসহ্য। সেও যে অমরবাবুর চেয়ে কম প্রতিভাবান্ নয়, এটা প্রমাণ করবার দরকার হয়ে পড়ল। কিন্তু প্রতিভার সমাদর এদেশে হওয়া কঠিন, তাই অভীককে দৌড়তে হল বিলেত। অমরবাবুর পাথেয় জোগাড় করবার জন্য বিভা তার হার বিক্রি করবে স্থির করেছিল' সেটা অভীকের সহ্য হল না। যে হার বিভা পরেছিল অভীক ও তার প্রথম দেখার দিনে, সেই হার বিভার সত্তা থেকে বিচ্যুত হবে এটা অভীকের অসহ্য। সেই জন্য এক পাবলিক ফন্ডের তহবিল ভেঙে টাকা চাঁদা দিয়ে অভীক অমরবাবুর পাথেয় জোগাড় করে দিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, সে নিজে করল সেই হার চুরি, সেই হার বিক্রি করে চলল বিলেতে। এই কাজগুলির যেন কোনই পূর্বাপর সংগতি নেই। বিভার সত্তা থেকে হার বিচ্যুত হবে এইটেই যদি অভীকের অসহ্য হয়, তাহলে সে নিজের দরকারে তা বিক্রি করল কেমন করে? এইভাবে বিলেতে পৌঁছে অভীক বিভাকে চিঠি লিখল যে, 'আজ দূরে এসে ভালবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে, যুক্তিতর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছে আমাকে—আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়।' এ-ও একটা ফাঁকি,—এমন কি, অভীক-বিভার কাহিনীতে ফাঁকির যে বেড়াজাল সযত্নে রচিত হয়েছে এটা তার চরম ও শেষ গ্রন্থি। যতদিন অভীক বিভার কাছাকাছি ছিল, ততদিন এরকম নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করবার সুবুদ্ধি তার হয় নি। আজ সে যখন দূরে অর্থাৎ কি না safe distance-এ, তখন এই রকম চিঠিপত্রে আত্মসমর্পণ করতে বাধা কি? সে কথা তো কাজে ফলবে না, বিভার দিন তো কাটবেই পাজর-ভেঙে-দেওয়া বোঝার মতন—অভীক তো আর আত্মসমর্পণ করবার জন্য খ্যাতির লোভ ছেড়ে সত্যি কিছু বিভার কাছে ফিরেও আসছে না—তবে চিঠিতে দুটো স্তুতিবাক্য করতে আপত্তি কি? ভাল করে আলোচনা করলে দেখা যাবে, অভীক অনেক সময় নিজেই জানে না সে কি চায় বা সে কি করবে। অমিতের মত সে বলতে পারত,

নতুন অমিত রায় কী যে কাণ্ড করে বসবে পুরোনো অমিত রায়ের তা জানা নেই। হয়তো বা সে এখনই লড়াই করতে বেরুবে।' অভীকের নিজেরই কথায় 'এই তীব্র অতৃপ্তি আমাকে এমন কাঙাল করে রেখেছে। গল্পের মধ্যে স্থির প্রবাহ নেই, নানা ঘটনার পাকে পাকে গল্প পাক খেয়েছে, ছোট ছোট মানসম্বন্ধের সমষ্টিও আছে—কিন্তু সেগুলি একত্রিত হয়ে একটা সমুদ্রের মধ্যে দানা বাঁধে নি। যেন, আচমকা অসংগত।

এই লক্ষণগুলি যে শুধু 'রবিবার' গল্পে দেখা যায় তা নয়। 'শেষ কথা' গল্পটি এ সব দোষ হতে সব চেয়ে বেশী মুক্ত, তবু তাতেও এরকম স্খলন ঘটেছে। এখানেও গল্পের নায়ক নবীনমাধব দেখতে ভাল, এতই ভাল যে এপ্স্টাইন তার মূর্তি গড়তে চেয়েছিলেন। প্রথমে নবীনমাধব বিপ্লবীদের দলে কিছুদিন কাটিয়ে উপলব্ধি করল দেশের উন্নতি করতে হলে বিজ্ঞানচর্চার দরকার, তার প্রতিজ্ঞা হচ্ছে, মায়ের আঁচলধরা বুড়ো খোকাদের দলে মিশে মা মা ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্রবলেই মানব, দরিদ্রনারায়ণ বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। সেইজন্য প্রথমে সে নিল কেম্ব্রিজের ভালো ডিগ্রী, তারপর ছুটল ফোর্ডের ডেট্রয়েটের ফ্যাক্টরীতে কাজ শিখতে। অভীক মিস্ত্রি-গিরি করেছিল বার্ণ কোম্পানির কারখানায়, কিন্তু নবীনমাধব আরও দূর পাল্লার লোক, তার দৌড় একেবারে ডেট্রয়েট পর্যন্ত। ফিরে এসে মিললো ভাল চাকরি এক রাজদরবারে, তার মাইনের অংকও সম্ভবতঃ মোটা। কবি তাঁর নায়কদের অনেক উপকরণে সাজিয়েছেন,—ভাল চেহারা, বৈপ্লবিক কৈশোর, তারপরে কেম্ব্রিজের ডিগ্রী আর ডেট্রয়েটে মিস্ত্রি-গিরি—এরকম সমন্বয় ক'টা দেখতে পাওয়া যায়?

এই নবীনমাধবের সঙ্গে যেদিন অচিরার প্রথম দেখা হল সেদিন অমিত-লাবণ্যের প্রথম দেখার মত বিজ্ঞানী নবীনমাধবের মনেও প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। "সেদিন মেঘের মধ্যে আশ্চর্য একটা দীপ্তি ফেটে পড়েছিল। বনের সেই ফাঁকটাতে ছায়ার ভিতরে আলো যেন দিগঙ্গনার গাঁট-ছেঁড়া সোনার মুঠোর মতো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক সেই আলোর পথে বসে আছে মেয়েটি...এক মুহূর্তে আমার কাছে প্রকাশ পেল একটি অপূর্ব বিস্ময়। জীবনে এ রকম দৈবাৎ ঘটে। পূর্নিমার বান ডেকে আসার মতো বক্ষতটে ধাক্কা দিতে লাগল জোয়ারের ঢেউ।" শেষের কবিতায় অনুরূপ মুহূর্তে অমিত ও লাবণ্যের পরিচয় গড়ে তুলবার জন্য রবীন্দ্রনাথ আমদানী করেছিলেন মোটরে মোটরে ধাক্কা। সে গল্পের পরিবেশে ঘটনাটা অসংগত হয়নি। এখানে নবীনমাধব আরও বিজ্ঞানী আরও দৃঢ়পৌরুষের উপাসক হলেও আসলে সোজাসুজি গিয়ে অচিরার সঙ্গে আলাপ করবার সাহস তার একটুও নেই। এমন কি, প্রথম দেখার পর অমিতও লাবণ্যের পিছনে দৌড়ে যাবার সাহস দেখিয়েছিল; আলাপ জমাতে তার দ্বিধা হয়নি। নবীনমাধব মনে করে সে "জাগ্রত-বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছে," বুড়ো খোকাদের দলে সে নেই। কিন্তু আসলে তার এই বৈজ্ঞানিকতার বড়াই যে নিতান্ত অসার তা টের পাওয়া যায় যখন অচিরার সঙ্গে প্রথম আলাপ করবার জন্য এক উদ্ভট ঘটনার অবতারণা করতে হল। নবীনমাধবের বরকন্দাজ একদিন সন্ধ্যার দিকে অচিরার উপর আক্রমণ করলো ডাকাত সেজে, নবীন-মাধব হল অচিরার উদ্ধার কর্তা—এই থেকে আলাপের শুরু। সামান্য একটা কথা কইবার জন্য এরকম লম্বা চওড়া রূপকথার অবতারণা এমনিতেই খারাপ লাগে, এইরকম আধুনিক মনো-বিজ্ঞানী গল্পে তো এর অসংগতি অত্যন্ত বেশী। কবি এখানেও একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করেছেন। "যদি বিজ্ঞানী না হয়ে হতুম সাহিত্যরসিক, কিম্বা বাঙাল না হয়ে হতুম পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক, তাহলে নিশ্চয়ই মুখে কথা বাধত না। কিন্তু বাঙালী মেয়েকে ভয় করি, চিনিনে বলে বোধ হয়। একটা ধারণা ছিল, হিন্দুনারী অজানা পর-পুরুষমাত্রের কাছে একান্তই অনধিগম্য। খামকা কথা কইতে যাই যদি, তাহলে ওর রক্তে লাগবে অশুচিতা। এখানে কাজে যোগ দিবার পূর্বে কিছুদিন তো কলকাতায় কাটিয়ে এসেছি—আত্মীয় বন্ধু-মহলে দেখে এলুম সিনেমামণ্ডপথবর্তিনী রং মাখানো বাঙালী মেয়ে, যারা জাতবান্ধবী, তাদের—থাক্ তাদের কথা। কিন্তু অচিরার কোনো পরিচয় না পেয়েই মনে হোলো ও আর এক জাতের,—একালের বাইরে আছে দাঁড়িয়ে, নির্মল আত্মমর্যাদায়, স্পর্শভীরু মেয়ে।" এ কৈফিয়ৎ কিন্তু লাগে না। প্রথম কথা হচ্ছে, নবীনমাধব বিজ্ঞানী ও বাঙাল সেইজন্য তার মুখে কথা ফোটে না, তার পুরোণো সংস্কার এখনও যায় নি যে বাঙালী মেয়ে অজানা পর-পুরুষের কাছে একান্তই অনধিগম্য। কিন্তু নবীনমাধব বহু সমাজে মিশেছে, সে যতই নারীপ্রভাবের প্রতি "কোমর বেঁধে অন্যমনস্ক" থাক্ না কেন, মেয়েদের সঙ্গে সে মেশে নি তা নয়। তার উপর নবীনমাধব নিজেই স্বীকার করেছে যে সে বাঙাল হলেও মনোবিজ্ঞানী, অচিরার চাউনি দেখে 'আমার বিজ্ঞানী-বুদ্ধিতে মনোরহস্যের আলোচনা জেগে উঠল।' এই মনোবিজ্ঞানের জোরে শুধু যে তার সংস্কার কাটাই উচিত ছিল তা নয়, তার আরও বোঝা উচিত ছিল অচিরার মতো স্পর্শভীরু মেয়ের পক্ষে খামকা কথা কওয়া যদি না সহ্য হয়, ওরকম নাটকীয় ঢং তার আরও অসহ্য হবে। যারা জাতবান্ধবী, দিনরাত্রি থ্রিলের আশায় ঘুরে বেড়ায়, বিভার ভাষায় যাদের ভালো লাগার ধার ভোঁতা হয়ে গেছে তাদের চিত্তজয় করতে এইরকম নাটকীয়তা সহায়ক হতে পারে। আমরা স্পষ্ট কল্পনা করতে পারি এরকম ঘটনার মধ্যে পড়লে নীলার মতো মেয়ে হাউ থ্রিলিং বলে হী হী করে হেসে উঠতে পারত। কিন্তু অচিরার মতো মেয়ের পক্ষে এ ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে নেওয়া কষ্টকল্পনা। অচিরা সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে একালের বাইরে, নির্মল আত্মমর্যাদায় —কিন্তু সে-ও কাঁচ শিশু নয়, পোড়-খাওয়া তার জীবন। যৌবনের ঝাঁঝালো আবর্তে সে হাবুডুবু খায় না, কিন্তু তার স্থিরতা ও শুচিতাবোধ এসেছে তার ভালোবাসার আদর্শের সাধনা হতে। তার মূলে আছে অনভিজ্ঞার অজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞার স্থির শান্তি। ব্যক্তিক ভালোবাসার বদলে নৈর্ব্যক্তিক ভালোবাসার সাধনা তার চলছিল। এবং সে সাধনা যে তার খানিকটা সত্য হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ সে ভবতোষের কাছ থেকে আঘাত পাবার পরও বিকৃত বিভ্রান্ত হয়ে যায় নি, প্রাণের প্রাচুর্য ও হৃদয়ের সুস্থতা তার মধ্যে যথেষ্টই আছে। এ হেন অসাধারণ স্থিতপ্রজ্ঞ অথচ কৌতুক-স্নিগ্ধ করুণাকোমল মেয়ের সঙ্গে প্রথম আলাপটা সোজাসুজি হলে অনেক মানানসই হত—তার জন্য ডাকাতসাজা বরকন্দাজের আবির্ভাব যেন অনেকটা বাড়াবাড়ি। এখানে ঐ ঘটনা ঘটবার পর অচিরা যদি ঈষৎ বিরক্ত হত তাহলে যেন চরিত্রে সামঞ্জস্য বজায় থাকত। অথচ গল্পে তা হয় নি। বরং অচিরা হেসে বলেছিল ঘটনাটা সত্যি হলে খুব মজা হত। পূর্বাপর চরিত্রচিত্রণের সঙ্গে এই ব্যাপারটার সুসংগতি নেই। কেমন যেন খাপছাড়া কিন্তু তবু স্বীকার করতে হবে 'শেষ কথা' গল্পের মধ্যে রাবীন্দ্রিক সৌরভ যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই অনাড়ম্বর ভালোবাসার কাহিনী খুব সহজে গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে না আছে অকারণ সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব, না আছে মিছে মানসিক দ্বন্দ্ব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনের অন্ধ প্রাণশক্তি জয়ী হল না, পাকে পাকে তার শিকড় জড়াতে পারল না। ভালোবাসার আদর্শের সাধনা হতে অচিরা বিচ্যুত হল না, সেই সাধনায় তার একটা সত্য আশ্রয়

মিলেছিল। নবীনমাধবও শেষ পর্যন্ত অচিরাকে মুক্তি দিতে পেরেছে, তার ক্ষোভে তার জীবনও ব্যর্থ বিকৃত হয় নি, বরং তাতে তার জীবনও একটা উদার শান্তিতে ভরে উঠল। কেবলমাত্র, "সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ ক'রে বারান্দায় এসে বোধ হোলো—খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে একটুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।" এরকম সুন্দর পরিসমাপ্তি খুব কম গল্পেই আছে। লক্ষ্য করার কথা, এই তিনটি গল্পের মধ্যে 'শেষ-কথার' ভাষাই সব চেয়ে সরল, সব চেয়ে বক্রোক্তিবর্জিত শ্লেষহীন। কিন্তু তবু প্রশ্ন জাগে, ভালোবাসার বন্ধন কি খাঁচার বন্ধন? অচিরা নবীনমাধবকে যে মুক্তি দিল সেটাকে কি খাঁচা থেকে পাখীর মুক্তির সঙ্গে তুলনা করা চলে? এই সমস্যাটিও ইদানীং রবীন্দ্র-সাহিত্যে বড় হয়ে উঠেছে। ভালোবাসা কি বন্ধন? শেষের কবিতাতেও এই প্রশ্ন আছে—সেখানে কবি তার সমাধান করতে চেয়েছেন এই বলে যে, ভালোবাসারও বিভিন্ন স্তর বা ভঙ্গী আছে, দু'ধরণের ভালোবাসাই একজন লোক এক সঙ্গে বাসতে পারে। অমিত বলেছে, সে হচ্ছে রোমান্সের পরমহংস। "ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে স্থলে উপলব্ধি করব, আবার আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল, আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা করব সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়।" এইভাবে সেখানে ভালোবাসার বাঁধন আলগা করে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ভালো-বাসাকে আমরা বন্ধন বলেই বা মনে করি কেন? এমন ভালোবাসা তো দেখতে পাওয়া যায়, যে ভালোবাসা মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে, তার অকারণ অস্থিরতা তার তীব্র অতৃপ্তি দূর করে তাকে আত্মস্থ হবার সহায়তা করে,—সোণার কাঠির স্পর্শে তাকে পরিপূর্ণ করে তোলে। যেমন গোরা-সুচরিতার কাহিনী। ভালোবাসা কি সেখানে বন্ধন, না ভালোবাসাই সেখানে উভয়কে সম্পূর্ণ করেছে? নারী যে পুরুষের পায়ে শিকল হয়েই বসবে এমন কি কোনও বাঁধাধরা নিয়ম আছে? আসল কথা, অমিত-অভীক-নবীনমাধবদের চেহারা নতুন রকম। তারা অসুস্থ, সর্বদা ছটফট করে বেড়ায়। আলেয়ার মত যার বস্তু নেই অথচ জ্বালা আছে সেরকম জিনিষকে বাঁধা যায় না। এরাও ঠিক তাই। একবার এখানে জ্বলে উঠছে, আর একবার ওখানে জ্বলে উঠছে। এদের মূল যদি মাটিতে প্রবেশ করত তাহলে সেই মূলে রস জোগাবার সহায় হতে পারত নারী, কিন্তু যার মূল নেই, হাওয়ায় ভেসে বেড়ায় তাকে আটকাবার চেষ্টা করলে সেটা বন্ধনই হয়ে দাঁড়ায়। অথচ এরা যে কোনও একটা আদর্শের য়্যাবষ্ট্রাক্‌ট রূপ তাও নয়। কোন জিনিসের শুদ্ধসত্ব নির্যাস এরা নয়। বরং কবি ঠিক উলটো করে এদের সৃষ্টি করেছেন। এরা নির্যাস বটে, মানবহৃদয়ের বিস্তৃতি, গভীরতা ও প্রাণস্পন্দের পরিচয় পাওয়ার চেয়ে এদের মধ্যে পাওয়া যায় চমকধরানো কথা, চোখ-ধাঁধাঁনো ঘটনা আর সৌখিন জলচরের মত ফাঁকা রঙের খেলা—কিন্তু সে নির্যাস আসলে রূপ-হীনতা, মূল-হীনতা ও অসুস্থ আত্ম-বিস্মৃতির নির্যাস। সেইজন্যই এক-একটা ঘটনা আচমকা এসে পড়ে, এক-একটি চরিত্র এক এক সময়ে এক এক রকম কথা বলে, আর গল্প অকারণ প্যাঁচে পাক খেতে থাকে। মহৎ সৃষ্টি এরা নয়।

(ক্রমশ)

ট্রামে-বাসে

প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলি যুদ্ধজয়ে ভারতের কাছে বৃটেনের ঋণের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সেই ঋণ বৃটেন কি করিয়া শোধ করিবেন সে সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রীটের মোড়ে কাবুলিওয়ালার মত ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকা যখন ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়—তখন আর এই ঋণ আদায়ের



কোনই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং শ্রমিক মন্ত্রিসভার মুখে এই ঋণের স্বীকার উক্তি—"রাধে তুমি আমার প্রেমের গুরু, তুমি মহাজন"—গোছের স্বীকার-উক্তির মত প্রেমের খেলাতেই পরিসমাপ্তি লাভ করিবে।

* * *

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্রুত পরিসমাপ্তিতে আণবিক বোমার প্রভাবের কথা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। আগত-প্রায় নির্বাচনী মহাযুদ্ধে জনাব জিন্না সাহেব রৌপ্যমুদ্রার "বুলেট্" প্রার্থনা করিয়াছেন। "আমাদের মুদ্রা-বুলেট্ দিন, দেখবেন আমরা সব সাবাড় করে দেবো"—এই তাঁর উক্তির মর্মার্থ। অতঃপর আমরা আশা করি—ভারতের "somewhere" এই মুদ্রা-বুলেট বস্তায় বস্তায় প্রস্তুত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা মনে পড়িতেছে—"পশিয়া মরমমাঝে, নারীকণ্ঠ যদি বাজে, তা-ও ছার তুমি যদি কর ঝনঝন"। কায়েদে আজম ঠিক্ অস্ত্রটিই চাহিয়াছেন—মারাত্মকতায় এই অস্ত্রের জুড়ি নাই।

* * *

ইয়োকোহামাতে মিত্রশক্তির সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য সিনেমার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাপানীরা হয়ত শীঘ্রই "অস্তের পথে" ছবি তুলিয়া তাহাদের সুখ্যাতি অর্জন করিবেন! অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচনে আমাদের কিছু বলিবার নাই—তবে—এই ধরণের ছবির পরিচালক ভারত হইতে মনোনয়ন করিলে প্রযোজক ব্যবসা-বুদ্ধির পরিচয় দিবেন কেন না—"অস্তের পথের" জন্য এমন Realistic touch অন্যের হাতে বড় একটা আসিবে না।

* * *

ত্রিপুরায় অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে নাকি "বাক্‌শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে"—সংবাদ দিতেছেন "আজাদ"। বিশু খুড়ো বলেন—"নিশ্চয়ই খবরটায় ভুল আছে। বৃষ্টি নয়, পাকিস্থানী-প্রচারের প্রভাবেই হয়ত ত্রিপুরাবাসী হতবাক্ হইয়া ভাবিতেছেন—"অবাক হয়ে শুনি তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী"!

* * *

অন্য একটি সংবাদে প্রকাশ যে, জনৈক সাংবাদিক নাকি জিন্না সাহেবকে পাকিস্থান ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছিলেন—কিন্তু জিন্না সাহেব তাহা ব্যাখ্যা করিতে



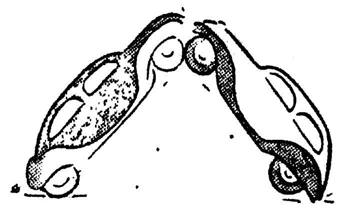
পারেন নাই। বিশু খুড়ো বলেন—"ভাগ্যিস সাংবাদিক স্কুলমাস্টার এবং জিন্না সাহেব ছাত্র ন'ন। নইলে পাকিস্থান ব্যাখ্যা করার অপারগতার জন্য জিন্নাজীকে হয়ত এক পায়ে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হতো"।

* * *

এক জোড়া ধুতি সপ্তাহে দুই আনা হারে ভাড়া নেওয়ার জন্য জনৈক বিজ্ঞাপনদাতা—রাঁচীর "সেণ্টিনেল" কাগজে একটি বিজ্ঞাপন ছাড়িয়াছেন। সংবাদটি রাঁচীর বলিয়া বস্ত্র বণ্টনের কর্তারা হয়ত তা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তাহারা হয়ত জানেন না যে, বস্ত্রের জন্য অচিরেই হয়ত দেশশুদ্ধ লোককে রাঁচী-বাসী হইতে হইবে।" "আর তা যদি হয়"—বলিতেছেন বিশু খুড়ো—"তাহলে স্বদেশী আর ম্যানচেস্টার, কোন কিছুর প্রতিই আর এ'দের বস্ত্র পরাবার ঝামেলা পোয়াতে মানুষের কৌতূহল থাকিবে না, এবং তখন এদের বস্ত্র পরাবার ঝামেলা পোয়াতে পোয়াতে স্বয়ং কর্তারাই হয়ত রাঁচীবাসী হয়ে পড়বেন। সুতরাং সাধু সাবধান!"

* * *

শ্রীযুক্ত বিড়লাজী নাকি ছয়মাসের মধ্যেই ভারতের বাজারে "হিন্দুস্থান" মোটর চালু করিবেন। ট্রাম-যাত্রীদের পক্ষে "বুইক" আর "হিন্দুস্থান" দুই-ই সমান



কেন না দুইটি মডেলের গাড়ি ধুলো সমানই উড়াইবে। তবু আমরা বিড়লাজীর পরিকল্পনাকে অভিনন্দন জানাইতেছি এবং ঐ সংগে অদূর ভবিষ্যতে "পাকিস্থান" মোটর কোম্পানীর প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সতর্ক হইতে বলিতেছি।

* * *

বর্মার সংগে আবার বেতারের যোগ হইয়াছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। কিন্তু তার চাইতেও আনন্দিত হইতাম যদি বর্মার সংগে আবার চাউল আমদানীর যোগসূত্র স্থাপিত হইত। সুইচ্ টিপিয়া অতঃপর বর্মা কেন্দ্রের বাণী শুনিব বটে কিন্তু পেট যে বলিতেছে—"শুধু তোমার বাণী নয় গো বন্ধু, হে প্রিয়"।

* * *

বিলাতের ফুটবল এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ রাউস বলিয়াছেন যে লর্ড ওয়াভেলের সংগে তাঁর বিশেষ পরিচয় আছে এবং তিনি ইস্টবেংগল ক্লাবের মিঃ গুহকে একখানা পরিচয়পত্র দিবেন যাহাতে তিনি লাট সাহেবের সংগে কলিকাতায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের আলোচনা করিতে পারেন। সর্বনাশে সমুৎপন্নে আমরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ছাড়িয়া দিয়া—একটি স্টেডিয়াম নিয়াই খুশী থাকিতে পারিতাম—কেন না পাণ্ডিত্যে আমাদের আস্থা আছে। কিন্তু কপাল আমাদের যা—তা'তে স্বাধীনতা আর স্টেডিয়াম্ দুই-ই আমাদের সুদুর্লভ। সুতরাং স্টেডিয়াম চাহিয়া লাট সাহেবকে লজ্জা না দেওয়াই উচিত!



"সত্যিকারের উদীয়মান

যাঁরা ... রয়েল ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স-এর বৈমানিকেরা শুধু যে বিমানচালনা করতেই জানেন তা নয়, তাঁদের অন্য গুণও আছে। সব গুণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ সাহস—চল্‌তি কথায় যাকে আমরা বলি 'বুকের পাটা', তা এদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

এ ছাড়া এদের বুদ্ধিমত্তা, কাজের গুরুদায়িত্ব এবং দেশের ও নিজেদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য এদের প্রচেষ্টা—এ সব দিক বিচার করলে সহজেই বুঝতে পারবেন ভারতের উদীয়মান যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এরাই সবচেয়ে সেরা কেন। যে-কোনো রিক্রুটিং অফিসারের কাছ থেকে আবেদনের নিয়মাবলী পাবেন।

AAA 82

বৈষ্ণব সাহিত্য

শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., বি.এল

নব ভাষা ও ছন্দে বাঙলার কাব্য-সাহিত্য আজ সমৃদ্ধ, সভ্যজগতে সম্মানিত। বৈষ্ণব সাহিত্য ইহার এক বিশিষ্ট অংশ, এ অংশটি বাঙলার একান্ত নিজস্ব। অনুবাদ বা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ইহাকে পুষ্ট করে নাই, প্রকৃতির বন্দনায় ইহা ধ্বনিত নহে, মধুকরী কল্পনার ইন্দ্রজালে ইহা রূপায়িত হয় নাই।

ভাবোন্মাদমাধুরী ইহার বৈশিষ্ট্য, করুণ বাৎসল্য ও মধুর রস ইহার উপজীব্য, আবেগ ইহার প্রাণ, পুলক ইহার সৌষ্ঠব, প্রেম ইহার লাবণ্য, বিরহ ইহার সুরভি, মিলন ইহার আনন্দ।

বাঙলার বৈষ্ণব সাহিত্যের বয়স মাত্র ৫০০ বৎসর। মোটামুটি ইং ১৮০০ সালে বাঙলা অক্ষরে ছাপা আবিষ্কারের পূর্বে, বৈষ্ণব-রচনা পুঁথির আকারে চন্দনচর্চিত হইয়া গোস্বামীদের গৃহে থাকিত - প্রসার ছিল না; মুখে মুখে ছোট ছোট পদাবলী ঘুরিত, সুখে দুঃখে উৎসবে শোকে, রঙ্গে সামাজিকতায় উপযুক্ত পদাবলী গ্রামাসুরে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হইত।

জয়দেব ইহার আদি কবি; তাঁহার কোমল-কান্ত পদাবলীর মধ্যে বাঙলা ভাষার প্রথম সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাই। সংস্কৃতের প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় না থাকিলেও, তাহার ঝংকার ও সুরমাধুর্য জয়দেবের পদাবলীকে আভিজাত্যের গৌরব দিয়াছিল। তারপর সুখের কবি বিদ্যাপতি, ইনি মৈথিলীতেও মাগধীর মিশ্রণে গৌড়ীয় ব্রজবুলীর অপূর্ব নিক্কণ শুনাইলেন—ক্ষণপরে আসিলেন দুঃখবাদী চণ্ডীদাস (জন্ম ইং ১৪১৭ খৃঃ); দুইজনের মিলিত সঙ্গীতে বাঙলার কুঞ্জ-কানন মুখরিত হইল; ভাবের বন্যার সূচনা হইল—এ'রা যেন অগ্রদূত, শ্রীচৈতন্যের (জন্ম ইং ১৪৮৬ খৃঃ—তিরোভাব ১৫৩৪) জন্য পথনির্মাণ করিয়া চলিলেন।

নিষ্ফল মায়াবাদের কঠোরতায় বাঙলার আধ্যাত্মিক জীবন যখন বিশুষ্ক, সেই ধর্ম-বিপর্যয়ের দুর্দিনে শ্রীচৈতন্য অবতীর্ণ হইয়া ভক্তিপথ সম্প্রসারিত করিয়া প্রেমের বন্যায় সেই কঠোরতা ভাসাইয়া দিলেন। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদাবলী-ভক্ত শ্রীচৈতন্যের ধর্ম-প্রচার বাঙলা সাহিত্যকে নূতন প্রেরণা, নূতন আশা, নূতন বাণীলাবণ্য দান করিল। নবীন বৈষ্ণবসমাজ সাহিত্যের পুষ্টি করিলেন; গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, জ্ঞানদাস প্রভৃতির আবির্ভাব হইল। এই নবজাগরণের প্রভাবে সৃষ্ট হইল জীবনীগ্রন্থ, গান, কড়চা ও ছন্দবৈচিত্র্যময় বহুবিধ রচনা ও শিল্প। গোবিন্দদাস শ্রীচৈতন্যের সাহচর্যের ফলে অনেক নূতন তথ্য শুনাইলেন; কৃষ্ণদাস কবিরাজ (১৫১৫—১৫৩০) 'চৈতন্য চরিতামৃত'রূপে বাঙলা ভাষায় প্রথম জীবনীগ্রন্থ রচনা করিলেন। অদ্ভুত অসংখ্য পদাবলী এবং চৈতন্যদেবের ও তাঁহার পার্ষদগণের বহুবিধ জীবনচরিতের মধ্যে এই পুস্তকখানি বাঙলা ভাষার পরম সম্পদ; আজীবন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৩০।৪০ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন বাসকালে রূপ-সনাতন শ্রীজীব গোস্বামীর সাহচর্যে ও অনুপ্রেরণায় গভীর অধ্যয়নের ফলে এবং বৃন্দাবনে গোস্বামীদের সহিত সংস্কৃত প্রেমভক্তিতত্ত্ব আলোচনায় বহুদিন যাপন করিয়া ৭৫ বৎসর বয়সে বঙ্গভাষায় ঐ পুস্তক (চৈতন্যচরিতামৃত) প্রকাশ করেন। কেহ কেহ বলেন ইহা দর্শন ও মহাকাব্যের সমন্বয়। ইহাতে গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, রঘুবংশ, অভিজ্ঞান শকুন্তলা বহুবিধ পুরাণ, বৃহৎ গৌতমীয় তন্ত্র, বিদগ্ধমাধব, অলঙ্কার শাস্ত্র, গীতগোবিন্দ, সংস্কৃত পদাবলী ও নাটক, ভাবার্থদীপিকা, বাশিষ্ঠ রামায়ণ, পঞ্চদশী, ললিতমাধব, উজ্জ্বল-নীলমণি, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতির বিশিষ্ট উল্লেখ ও আলোচনা রহিয়াছে। ইহাতে তৎকালীন বাঙালী গৃহস্থের আচার ব্যবহার, খাদ্যপ্রণালী ও সুখশান্তির খণ্ড-ইতিহাস, দক্ষিণ-দেশ-তীর্থ-ভ্রমণকথা সরস রসিকতা ও ভক্তসুলভ মাধুর্যের সহিত, সংযমের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব ইহার গঠনসৌকর্যে দৃষ্ট হয়। প্রথম সতেরটি শ্লোক সংস্কৃতে রচিত; সংস্কৃত পুস্তকের মতোই আরম্ভ ও মঙ্গলাচরণ; মাঝে মাঝে সেই মতোই ভাব-গম্ভীর আধ্যাত্মিকতা ও প্রেমসাধনার পরিচয়। নিজের কৃতিত্ব অস্বীকার করিয়া, বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে কৃষ্ণদাস পুস্তকটির বিষয়ে বলিলেন —"এই গ্রন্থ লিখায় মোরে মদনগোপাল"। মনে হয় ইহাই তাঁহার যথার্থ অনুভূতি ছিল। এই অনুভূতি—পবিত্র, অনির্বচনীয়—Milton, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। কিঞ্চিৎ অবান্তর হইলেও অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি—Milton বলিলেন—

"Celestial patroness who deigns
Her mighty visitation unimplored
And dictates to me slumbering, or inspires
Easy my unpremeditated verse."

মধুসূদন বলিলেন—

উর তবে, উর দয়াময়ী
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত;' উরি দাসে দেহ পদছায়া।"

রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

"অন্তর মাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে।"

বহু সংস্কৃত কবি এবং কৃত্তিবাস, কবি-কঙ্কণ, Homér, Dante প্রভৃতি অমর কবিগণ রচনার প্রারম্ভে দেবতার প্রসাদ প্রার্থনা করিয়াছেন—কিন্তু "এই গ্রন্থ লিখায় মোরে মদনগোপাল"—এই প্রকার দৃঢ় অনুভূতির দৃষ্টান্ত অধিক পাই নাই।

বাঙলার শ্রীচৈতন্য (ইং ১৪৮৬—১৫৩৪) আর পঞ্জাবের গুরু নানক (ইং ১৪৬৯—১৫৩৮) সমসাময়িক বলিলেই চলে। দুই-জনের কয়েকটা আশ্চর্য মিল আছে; ধ্বংসোন্মুখ জাতির যুগসন্ধিক্ষণে উভয়ের আবির্ভাব। উভয়েই কবি, দার্শনিক ও ঈশ্বরানুগৃহীত। সঙ্গীত ও সমবেত কীর্তনাদির মাধ্যমে উভয়েরই ধর্মপ্রচার। "নাম" মাহাত্ম্যের উপর উভয়েরই আস্থা। উভয়েই স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রেমে বিগলিত। বিবাহিত জীবন ত্যাগ করিয়া উভয়েই প্রেম-ধর্ম প্রচারে প্রাণ ঢালিয়া ছিলেন। বিখ্যাত শিখ লেখক কাশ্মীর প্রবাসী সর্দার শের সিং M. Sc., মহাশয়ের "Guru Nanak" নামক পুস্তক হইতে সামান্য উদ্ধৃত করিতেছি,—

"This Divine Symphony reflected in the Guru's hymns and sung in accompaniment of instrumental music has always exercised the same influence on me as a tremendous magnet has on a magnetic needle. This music keeps thousands of Sikh souls gathered in a congregation spell-bound.... 'Shabad Kirtan' is therefore the very essence of Sikh religion."

"We should worship the Name, believe in the Name which is ever and ever the same and true." (Sri Rag of Guru Nanak.)

বৈষ্ণব সাহিত্যে শ্রাবণ ও ভাদ্র (বর্ষাকাল) কবিচিত্তে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে। এ যেন চিরন্তন গান "সেদিন মেঘদলে, শ্রাবণ

নভতলে, মাদল বাজাইয়া গাহিতে ছিল গান" (বসন্তকুমার)। কেকাধ্বনি মিলনের সুর জাগাইতেছে, রিমঝিম রিমঝিম ঘন বরষে, কিন্তু হায়, প্রিয়তমের জন্য বৃথায় শয্যা-রচনা, বৃথায় কবরী-বিলাস, সাজসজ্জা—শ্রাবণ ভাদ্রে মিলাইল—তবু তাঁর দেখা নাই! মন্দির শূন্য, মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া! তিনি আসিলেন না—তবে কি লইয়া থাকিব? বর্ষার কবি রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবরসের চরমোৎকর্ষে বাঙলা সাহিত্যকে অভিসিঞ্চিত করিয়া গাহিলেন—

"আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা অভিসার
পাগলিনী রাধিকার
না জানি কবে কার দূর বৃন্দাবনে
* * * *
আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে
এখনও প্রেমের খেলা
সারাদিন সারাবেলা
এখনও কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটিরে"

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গুরু নানক শ্রাবণের ধারাসঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণব-কবিতার মতো মধুর কবিতা রচনা করিয়াছিলন! সর্দার শের সিংএর ইংরাজী অনুবাদ কিয়দংশ দিতেছি:—

"The following hymn describes the feelings started in the poet's mind by the pattering (Rhun-Jhun) of the monsoon rain:—

Reveries in the month of Rain (Sawan). The peacocks have begun their dance. It is the month of Rain, it raineth Rhum-Jhum: it raineth joy!

O Beloved! I would fair be a sacrifice myself to Thee, if Thou wouldst come, yea, but for one glimpse of Thine honeyed-Name. They say I am proud! I am proud because Thou art mine. [Cf,

তোমার গরবে গরবিনী হাম,
রূপসী তোমার রূপে।]

without Thee what am I? Dust, dust, ashes vacant is my House my bed for the Lord hath not come:

বঁধুর লাগিয়া শেজ বিছাইনু,
গাঁথিনু ফুলের মালা,
ইত্যাদি)

Let me break my crimson—Lacquired ivory bangles against the crimson-coloured bed; in vain these jewelled arms, in vain this crimson-coloured bed when the Lord cometh not.

পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু
মরমে রহল কথা।
কি বুদ্ধি করিব পাষাণে ধরিয়া ভাঙ্গিব
আমার মাথা।

* * * *

Ah! my misery; my soul crieth out from the very depths;
I weep, and with me weeps the whole world!

* * * *

In a Dream once He came to me,
He came and went away.
(Cf, পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু বসিয়া শিয়র পাশে ইত্যাদি

The month of Bhador (ভাদ্র) leadeth me astray . . . . the lakes and meadows are full of rainwater for it is the rainy season—the season of joy.

It raineth even at night, and in the dark night the frogs crock, and the peacocks coo, but how can the young bride revel without the Bridegroom.

The brain-fever bird shrieks for her mate . . . . . without the Beloved how may I obtain comfort?

এ যেন পদাবলীর অনুবাদ! তেমনি শুভ্র, তেমনি মনোহর! গুরু নানকও বংশীরবে চঞ্চল হইয়াছিলেন—প্রিয়তমের চিরন্তন সান্নিধ্য কামনা করিয়া মর্মস্পর্শী প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"O Lord Merciful vouchsafe unto me understanding to see Thee everywhere, O Sportive Lord! Thou playeth the Bo-peep eternally, come and envelop me by Thine bliss-ful Presence; may I hold Thee ever and ever by the silken cords of my love!"

এ যে বৈষ্ণব কবির প্রার্থনার সুর
"এসো এসো বঁধু এসো"!

শ্রীচৈতন্যের জীবন ও বাণীকে কেন্দ্র করিয়া যে নূতন বৈষ্ণবসাহিত্য—জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস রচিত পদাবলীর অনুসরণে গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে কয়েকজন মুসলমান কবি ও মহিলা কবির অবদান নগণ্য নহে। শালবেগ, সৈয়দ মর্তুজা আলোয়াল, মহম্মদ জ্যায়সী, "হরিদাস" প্রভৃতি মুসলমান পদকর্তা, মাধবীদাসী রসময়ী দাসী প্রভৃতি মহিলা কবির নাম উল্লেখযোগ্য। বৈষ্ণব জীবনচরিত লেখকের সংখ্যা কম নহে; তন্মধ্যে সুবিখ্যাত যদুনন্দন দাস, বৃন্দাবন দাস, নরহরি দাস, লোচন দাস প্রভৃতি কয়েকজনের রচনা সহজপ্রাপ্য।

বৈষ্ণবেরা সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন প্রাণের আবেগে; অর্থোপার্জন বা সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না—কারণ তাহা হইলে একই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে একই প্রণালীতে রচনা করিতেন না। তখন ছাপাখানা ছিল না—পুঁথিই সম্বল। ইঁহাদের নিকট সাহিত্য অলস কল্পনাবিলাস ছিল না—কারণ ইঁহারা দরিদ্র। ভক্তিই ইঁহাদের প্রেরণা যোগাইত। তাই মনে হয়, ইঁহাদের কাছে সাহিত্যই ছিল জীবন, সাহিত্যই সাধনা, সাহিত্যই ধর্ম ও প্রাণের বিকাশ। পূজার মন্ত্রের মতো, আত্মনিবেদন-তৎপর এই ভক্তগোষ্ঠী মনের মাধুরী মিশাইয়া প্রাণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

ক্ষীরোদবাবুর বিখ্যাত প্রতাপাদিত্য নাটকে ইঙ্গিত আছে—এবং অনেকেও তাই বলিয়া থাকেন—যে বৈষ্ণব সাহিত্য জাতিকে দুর্বল করিয়াছে। "বাঁশি ছেড়ে অসি" ধরিবার আহ্বান হয়ত ক্ষীরোদবাবুর যুগোপযোগী ছিল। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্য শুধু করুণ রসাশ্রিত নহে, বাৎসল্য ও মধুররসের যথেষ্ট প্রাচুর্য ইহাতে আছে। মনকে ইহা "নরম" করিয়া আনে ইহা সত্য হইলেও একটি কথা ভাবনায় আসে—মানুষ কঠোর হইলেই কি বীর হয়, নির্ভীক হয়? মরুহৃদয় লইয়া মানুষ কি কোন বড় কাজ করিতে পারে? মন কোমল হইলেও মানুষের সত্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় হইতে বাধা কোথায়? সংযম, সাহস ও কর্তব্যবোধের অভাব হইবে কেন? তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, লৌকিক ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত আচার-পদ্ধতির কিয়দংশ বৈষ্ণব সাহিত্যে সুমার্জিত নহে। পূর্বেই বলিয়াছি ইহার প্রধান অবলম্বন ভাব ও আবেগ। যুক্তির সহিত অন্ধ-ভক্তির অনেকটা লক্ষ্মী-সরস্বতী সম্বন্ধ। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব সাহিত্যের বন্ধু হইয়াও লিখিয়াছেন—

"যে ভক্তি তোমারে ল'য়ে ধৈর্য নাহি মানে,
মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্য-গীত গানে
ভাবোন্মাদ-মত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছল-ফেন-ভক্তি মদধারা
নাহি চাহি নাথ। দাও ভক্তি শান্তি-রস,
স্নিগ্ধ সুধাপূর্ণ করি মঙ্গল-কলস
সংসার ভবন-দ্বারে। যে ভক্তি-অমৃত
সমস্ত জীবনে মোর হইবে বিস্তৃত
নিগূঢ় গভীর, সর্বকর্মে দিবে বল,
ব্যর্থ শুভ চেষ্টারেও করিবে সফল
আনন্দে কল্যাণে; সর্বপ্রেমে দিবে তৃপ্তি
সর্বদুঃখে দিবে ক্ষেম, সর্বসুখে দীপ্তি
দাহহীন। সম্বরিয়া ভাব-অশ্রুনীর
চিত্তরবে পরিপূর্ণ অমত্ত গভীর"

শ্রীচৈতন্য সর্বসুখে দাহহীন দীপ্তির কথাই বলিয়াছিলেন। আগে শুচি, দেহে ও মনে পরে ভক্তি: এই ছিল তাঁর বেদ। আমরা করিয়াছি বিপরীত, আগে "ভক্তি"র ভাবোন্মাদ, পরে শুচিতার চেষ্টা বা নিবৃত্তি। ক্রমশ নামিয়া যাইতেছি। কালধর্মে মলিনতা ও ক্ষয় সর্ববিষয়ে অবশ্যম্ভাবী। তবে ভরসা এই, মাঝে মাঝে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়া আসে। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রকৃত ভক্তিবাদ উচ্চ আসন পাইয়াছে। "প্রকৃত" সকল সময়েই 'লৌকিক' হইতে বিভিন্ন। প্রসিদ্ধ "ভক্তমাল" গ্রন্থে ভক্তির নয়টি রূপকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ঐ একটি মাত্র বৈষ্ণব গ্রন্থের উল্লেখ করিলাম। বাঙলার বাহিরে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাবের কথা স্মরণ রাখা উচিত। দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের উদিপী ও অন্যান্য বিদ্যালোকিত সজ্জনস্থানে, উৎকলে, বিহারে, সুদূর রাজপুতনায় ও মারবাড়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের বংশীধ্বনি ও দর্শনালোচনার কথা নূতন নহে। বাঙলার অভ্যন্তরে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব যাত্রা-গানে, কবিগানে, এমন কি টপ্পা পাঁচালীতে ও বিশেষত কীর্তনে বিচিত্র সৌন্দর্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। বাঙালী বৈষ্ণবের 'রস-কবিতা, বাউল কীর্তনীয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়া সাবলীল গতিতে জনসাধারণের মর্মে

প্রবেশ করিয়াছে। বন্দ্র-একতারা অথবা খোল করতাল, সবরও সমধর্মী, ভাষা ভাব লালায়িত—অথচ এই সরল কাব্যসাধনা আধ্যাত্মিক সাধনার অংগ হইয়া রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর সংগীতকে "জাতে উঠাইয়াছেন"। বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুশীলনে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনেশচন্দ্র সেন, শিশিরকুমার ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রফুল্লকুমার সরকার, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, সুশীলকুমার চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ, প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, বৈষ্ণবাচার্য পণ্ডিতবর একশত সাত বর্ষ বয়স্ক শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুকুমার সেন ও ভক্তিভারতী বঙ্কিমচন্দ্র সেন প্রভৃতি সুধীবৃন্দ এবং সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী, অনঙ্গমোহন হরিসভা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যুক্তিপূর্ণ আলোচনা দ্বারা বৈষ্ণব-সাহিত্যের সম্যক বিকাশের সহায়তা করিতেছেন। স্থানাভাবে যাঁহাদের নাম বাদ পড়িল, তাঁহারা বৈষ্ণবোচিত ক্ষমাগুণে আমায় মার্জনা করিবেন।

আলোচনা যত হয় ততই মংগল। সাহিত্যের সৌন্দর্য কেবলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অনেক বৈষ্ণব কবিতায় দেহের সম্বন্ধে এমনি উন্মত্ততা আছে যে সেখানে দেহাতীতের কোন সন্ধানই মিলে না। এই যুক্তিহীন চাঞ্চল্য ও ধ্বংসকারী মাদকতা অশিক্ষার সুযোগে সমাজবিশেষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যকে রাহুগ্রস্ত করিয়াছে।

"যুগলতত্ত্ব" বিদ্যাপতির বিশিষ্ট অদ্বৈত-বাদের মাধ্যমে পরম সুন্দর রূপ পাইয়াছিলঃ

"অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি মাধাই"

রাধা অনুক্ষণ কৃষ্ণের কথা ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ হইয়া গেলেন।

Coventry Patmore লিখিয়াছেন—

"In the Arithmetic of Life
The smallest unit is a pair"

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের শৈলজা (অনার্য কন্যা) প্রিয়তম অর্জুনের কথা অনুক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে অর্জুন হইয়া গেলেন।

* * * * *

"কভু আমি পার্থ, পার্থ শৈলজা আমার
অভিন্ন-হৃদয় কভু—নদী-পারাবার"

ইহাই বোধ হয় বৈষ্ণবীয় যুগলতত্ত্বের সার-মর্ম; রূপকের মধ্য দিয়া আত্মার পরমাত্মীয়ের সহিত সংযোগ ও একত্বপ্রাপ্তি এই বুঝি শ্রীচৈতন্যের বাণী। সুপণ্ডিত Grierson তাঁহার "Modern Vernacular Literature of Hindusthan"এ বৈষ্ণব-দর্শনের বহু প্রশংসার সহিত এই মন্তব্য করিয়াছেনঃ—

"The Vaisnab method of dealing allegorically with the relation of the soul to God under the form of love which Radha bore to Krishna"

বৈষ্ণব সাহিত্যে এই মিলনের প্রতীক্ষার বর্ণনা অতুলনীয়ঃ

এখন তখন করি দিবস গোঙায়নু
দিবস দিবস করি মাসা
মাস মাস করি বরিষ গোঙায়নু
খোয়নু এতনু-আশা।
মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।"

পরিণাম নিরাশা নহে;

"হৃদয় মন্দিরে মোর কানু ঘুমাওল
প্রেম প্রহরী রহু জাগি"

এই ভাবটি পরম শ্রদ্ধার সহিত কবি বসন্তকুমার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

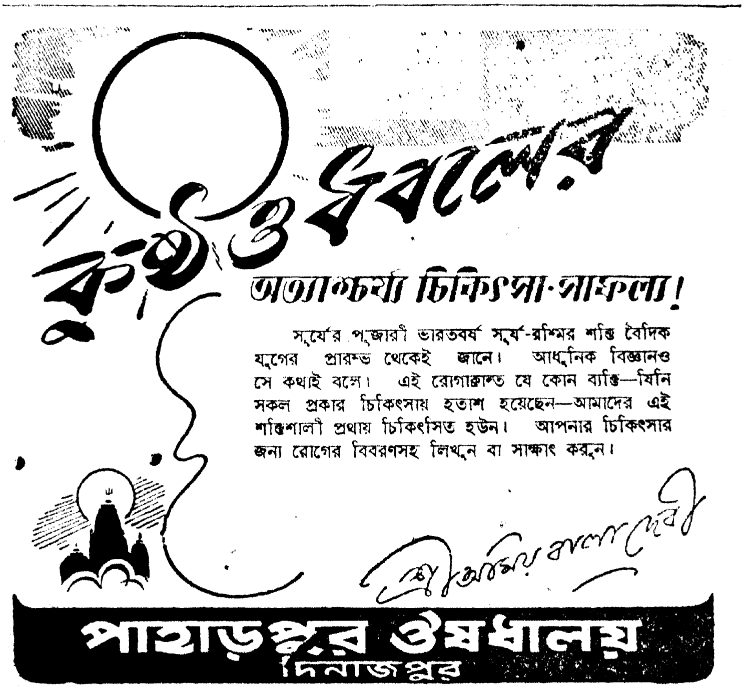
"চিত্তপুরে নিত্যসেবা চলিল সারা নিখিলে
মেদুর মেঘে মিলনমেলা বসিল·
মনের বনে সুরভিসম অরূপ হয়ে উঠিলে
তনুর মাঝে অতনু আসি পশিল।"

মিলন সার্থক হইল—বৈষ্ণব কবি গাহিলেন—

"কি কহব রে সখি, আনন্দ মোর
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।"

বৈষ্ণবসাহিত্য বিশাল—পদাবলীর পরিমাণও সমুদ্র; ইহার কণামাত্র পরশে মন জুড়াইয়া যায়।





বিশ্বকর্মা উৎসব

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

৩১শে ভাদ্র। বিশ্বকর্মাকে বিশেষভাবে স্মরণ করিবার দিন। আমাদের দেশের শিল্পীরা আজ সর্বত্র উৎসব করেন। কিন্তু আজ আমাদের শিল্প শক্তিহীন ও দরিদ্র শিল্পশালাগুলিও সংকীর্ণ। বরং পাশ্চাত্য সব দেশে লোকেরা বিরাট বিরাট শিল্পশালাতে যে সাধনা করিতেছেন, তাহা কতকটা বিশ্বকর্মশালায় শিল্পরত বিশ্বকর্মার উপযুক্ত।

তবু শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কারু-শিল্পীর দল বৎসরের পর বৎসর এই দিনে উৎসব করিতেন; শিল্প-রসিক রবীন্দ্রনাথ তাহাতে চিরদিনই মহানন্দে যোগ দিতেন। এই দিনটি রবীন্দ্রনাথেরও অত্যন্ত মহনীয় ছিল। তাঁহার অনুরোধে প্রতি উৎসবে আমিও উৎসবোচিত কিছু মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিতাম। বিশ্বকর্মা পূজার প্রচলিত অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে ভাল কোন মন্ত্রই নাই দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ বড়ই দুঃখ করিতেন। বলিতেন, "আমাদের দেশের শিল্পীরা বড়ই হতভাগা, ইহারা সর্বদিক দিয়াই উপেক্ষিত। যদি পারেন, তবে বেদ-পুরাণাদি হইতে ভাল ভাল মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া একটি বিশ্বকর্মা উৎসব পদ্ধতি রচনা করিতেন।"

তদনুসারে প্রাচীন বেদ হইতে এই মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া এবং পুরাণ হইতে বিশ্বকর্মার ধ্যানটি সংকলন করিয়া এই পদ্ধতিটি তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম; তিনি অতিশয় প্রসন্ন মনে এই পদ্ধতিটি গ্রহণ করিয়া এখানকার বিশ্বকর্মার পূজায় তাহা নিয়োজিত করিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর তাহাই চলিতেছে।

আজ রবীন্দ্রনাথ পরলোকগত, আমাদেরও কর্মজীবন সমাপ্তির মুখে। তাই তাঁহারই শেষ জীবনের ইচ্ছানুসারে সংকলিত এই মন্ত্রগুলি এইবার মুদ্রিত হইল। নহিলে হয়তো পরে আবার এই মন্ত্রগুলির কথা লোকে ভুলিয়া যাইতে পারেন।

চরাচরব্যাপী বিরাট বিশ্বচক্রের আবর্তনে বিশ্বশিল্পী যে নিত্যকাল তাঁর বিশ্ব রচনা করিয়া চলিয়াছেন এই ধ্যানটি অতি বিরাট। সেই সদা-জাগ্রত জীবন্ত সৃষ্টি সাধনারত বিশ্বকর্মাই শিল্পীদের গুরু, এই কথা মনে রাখিলে শিল্পের সর্ব দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতির ভরসা থাকে।

অতঃপর শ্রীনিকেতনের বিশ্বকর্মা উৎসবের জন্য মুদ্রিত সেই পদ্ধতিটি দেওয়া যাইতেছে।

শিল্পোৎসব

মাল্যচন্দনাদি। যন্ত্রহস্তে শিল্পীর দল।

ধ্যান—

পুরোহিত—আদিতে সৃষ্টিহীন দেবতা নিরানন্দমনে নিঃসঙ্গ বসিয়াছিলেন। আপনার পূর্ণতার আনন্দে তাঁহার অন্তরে সৃষ্টির লীলারস আবির্ভূত হইল। তিনি সৃষ্টির তপস্যা করিলেন। সেই তপস্যার বলেই তিনি বিশ্বভুবন রচনা করিলেন।

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং
সর্বমসৃজত যদিদং কিংচ।

যাহা কিছু সেই বিশ্বশিল্পীর হাতে রচিত হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, সবই সেই মহাতপস্যার প্রকাশ। সৃষ্টির এই রহস্য যিনি জানেন তাঁহার সৃষ্টি-তপস্যাও শ্রীতে ও আনন্দে উঠে পূর্ণ হইয়া।

বিশ্বং ভূতং ভবাং ভুবনম্।
শ্রিয়া তর্পতি য এবং বেদ॥

তখন ধ্যাননেত্রে সাধক দেখে সৃষ্টির আদিতে আকারহীন তেজঃপুঞ্জ ছিল বিশ্বব্যাপিয়া। তাহার কোনো নামরূপ ছিল না। বিশ্বশিল্পী তাঁহার চরাচরব্যাপী বিশাল ব্রহ্মাণ্ডশিল্পশালায় বিশ্বরচনার জন্য বিরাট ভ্রমিযন্ত্র আবর্তন করিলেন। দিবা-রাত্রি সৃষ্টির ছন্দে ঘুরিতে লাগিল সেই আবর্তনৃত্য। সেই ঘূর্ণ্যনৃত্যেই অরূপ হইতে অশেষবিধ নামরূপ নানা বৈচিত্র্য লইয়া হইতে লাগিল উচ্ছ্বসিত। সেই চরাচর-আবর্তের কুলালচক্রে ঘটের মত নানা সৃষ্টি রূপ ধরিয়া উঠিতে লাগিল।

ভ্রমিমারোপ্য তৎ তেজঃ শাতনায়োপচক্রমে।
ভ্রমতাশেষজগতাং নাভিভূতেন ভাস্বতা॥
সমুদ্রাদ্রিবনোপেতা সারুরোহ মহী নভঃ।
গগনাণ্ডাখিলং ব্রহ্মন্ সচন্দ্রগ্রহতারকম্॥
অধোগতং মহাভাগ বভূবাক্ষিপ্তমাকুলম্॥

বিশ্বকর্মা সেই চরাচরব্যাপী মহাতেজকে বিশ্বব্যাপী ভ্রমিযন্ত্রে আরোপণ করিয়া শাতনের (কুঁদিবার) আয়োজন করিলেন। নিখিল জগতের কেন্দ্রস্থলে আদিত্য ঘূর্ণিত হইতে থাকিলে সাগরগিরিবন-বেষ্টিত মহীতল ঊর্ধ্বে আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতে লাগিল। গ্রহচন্দ্রতারাময় অনন্তগগন আকুল বেগে অবক্ষিপ্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। শাণযন্ত্রারূঢ় সেই বিরাট তেজেরই মধ্য হইতে বিস্ফুলিঙ্গের মত বিকীর্ণ হইয়া চলিল সব গ্রহচন্দ্রতারা।

তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্মা শনৈঃ শনৈঃ॥

সেই তেজোময় ভ্রমিতে ক্রমাগত শাতন চলিতে লাগিল। তাহা হইতে ক্রমে গ্রহচন্দ্রতারা জীবপ্রাণলীলা বাণী-নৃত্য-গীতাদির হইল উদ্ভব। রূপহীন চরাচরময় ঘূর্ণ্যমান তেজকে শাতনে সংযত করিয়া ছন্দোময় বিশেষ বিশেষ নানারূপকে বিশ্বশিল্পী রচিয়া চলিলেন।

মন্ত্র রাখিয়া—অর্ঘ্য হস্তে শিল্পীর দল
সপ্রণতি

বিশ্বকর্মা মা রক্ষতু। তস্মা আত্মানম্ পরিদদে॥

আমরা সব ক্ষুদ্র শিল্পীর দল সেই পরম শিল্পী মহাগুরু বিশ্বকর্মার কাছে প্রণত হই। তিনি আমাদিগকে নানা শিল্প-দুর্গতি হইতে রক্ষা করুন।

প্রণতি

পুরোহিত—

ওঁ শিল্পানি শংসন্তি দেবশিল্পানি।
এতেষাং বৈ শিল্পানাম্ অনুকৃতীহ
শিল্পম্ অধিগম্যতে......।
শিল্পং হাস্মিন্ অধিমগ্যতে য এবং বেদ
যদেব শিল্পানি।
আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি
ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং
সংস্কুরুতে।

আমাদের এই সব শিল্পই দেবশিল্পের স্তবগান। দেবশিল্পেরই অনুপ্রেরণায় আমাদের এই মানব শিল্প। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তিনিই শিল্পের যথার্থ রহস্য জানেন। মানবের এই শিল্পসাধনা যজ্ঞেরই সমতুল্য। আত্মার সংস্কৃতির জন্যই মানবের এই শিল্পসাধনা। ইহার দ্বারা সাধক আপন আত্মাকে বিশ্বছন্দে ছন্দোময় করিয়া তোলেন।

এই শিল্পসাধনার মূলে অন্তরাত্মার আনন্দ। প্রয়োজনের অতীত এই আনন্দকে "উচ্ছিষ্ট" বলা যায়। এই উচ্ছিষ্ট হইতেই জগতের যত শিল্প ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি।

উচ্ছিষ্টে নামরূপং চোচ্ছিষ্টে লোক আহিতঃ।
ঋক্ সাম যজুরুচ্ছিষ্টে সাম্নো মোঁড়শ্চ তস্মিয়।
সূনৃতা সংনতিঃ ক্ষেমঃ স্বধোর্জা অমৃতং সহঃ।
রাদ্ধিঃ প্রাপ্তিঃ সমাপ্তির্ব্যাপ্তির্মহ এধতুঃ।
আনন্দা মোদাঃ প্রমুদোভীমোদমুদশ্চ যে॥

উচ্ছিষ্টেই নাম-রূপ ও লোক সকল আহিত। ঋক্ সাম যজুও এই উচ্ছিষ্টেই প্রাপ্ত। সামগানের যে সুর আমাতে বিদ্যমান তাহারও আশ্রয় এই উচ্ছিষ্ট। কাব্য ও সংগীতের মধুর বাণী, ভক্তির প্রণতি, সেবার কল্যাণ, অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা শক্তি অমৃত বীরত্ব সবই এই উচ্ছিষ্টে। সংসিদ্ধি প্রাপ্তি সমাপ্তি ব্যাপ্তি মহত্ত্ব ঐশ্বর্য আনন্দ মোদ প্রমোদ আনন্দের মহোচ্ছ্বাস সবই এই উচ্ছিষ্টে সমাশ্রিত।

এবং বিজানতঃ আত্মতঃ প্রাণ,
আত্মত আশা, আত্মত আবির্ভাবতিরোভাবৌ,
আত্মতো বলং,
আত্মতো বিজ্ঞানমাত্মতো ধ্যানমাত্মতঃ সংকল্প
আত্মতো মনঃ আত্মতো বাগ্,
আত্মতঃ কর্মাণ্যাত্মত এবেদং সর্বম্॥

যিনি এই রহস্য জানেন তিনি দেখেন আমাদের আত্মা হইতেই সকল প্রাণ-আশা-আবির্ভাব- তিরোভাব- বল- বিজ্ঞান- ধ্যান-

শিল্প-মন-বাক্-কর্ম-ও আর সব কিছুই উচ্ছ্বসিত।

প্রণতি—সকলের

ইতি সকলজগৎপ্রসূতিভূতং
ত্রিভুবনপাবনধামভূতম্।
রবিমখিলজগৎপ্রদীপভূতং
দেবং প্রণতোস্মি বিশ্বকর্মাণম্॥

হে দীপ্ত কলাগুরু, বিশ্ব তোমারই রচনা, সৃষ্টির সেই আনন্দে বিশ্ব চিরপবিত্র, সেই আনন্দজ্যোতিতে অখিল জগৎ দীপ্যমান। হে বিশ্বকর্মা, আমরা ক্ষুদ্রকর্মা ও ক্ষুদ্র শিল্পী, আমরা তোমাকে প্রণাম করি।

আত্মনিবেদন

পুরোহিত—

বিশ্বস্য তপসঃ পতে। রহন্নন্ ত্বমসি বিশ্বসৃক্।

হে মহান, তুমি অন্যকেও মহৎ কর। বিশ্ব রচনার তপস্যায় তুমিই মহাগুরু, তুমিই বিশ্বশিল্পী।

বিশ্বকর্মা বিশ্বদেবো মহান্ অসি।

হে বিশ্বশিল্পী, তোমার সকল রচনায় তুমিই দীপ্যমান, তাই তোমার মহত্ব।

দেবো বিশ্বকর্মা প্রজয়া সংররাণঃ।

আপন আনন্দে দীপ্ত হে বিশ্বশিল্পী, তোমার এই রচনার সুরে আমাদের সুরও লও মিলাইয়া।

দ্যুমন্নমো বিশ্বকর্মন্।
নমস্তে পাহি অস্মান্।

হে দীপ্যমান বিশ্বশিল্পী, তোমাকে নমস্কার। তোমার দীপ্তিতে প্রদীপ্ত করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

ইমং যজ্ঞং বিতত্‌ং বিশ্বকর্মণা
আ দেবা যন্তু সুমনস্যমানাঃ।

হে বিশ্বশিল্পী, তোমার এই শিল্পশালাই এক বিরাট সাধনার যজ্ঞবেদি। এই পবিত্র সাধনাভূমিতে দেবতারাও প্রীত মনে আসুন।

সু-ইষ্টিং নস্তং কৃণবদ্ বিশ্বকর্মা।

এই শিল্পশালার শিল্পসাধনাকেই বিশ্বকর্মা পরম সুন্দরের তপস্যায় পরিণত করুন।

সং নস্ তেভিঃ সৃজতু বিশ্বকর্মা।

এখানকার এই শিল্পসাধনাকে বিশ্বকর্মা তাঁহার সকল সাধনার সহিত যোগযুক্ত করুন।

সকলের নিবেদন

ত্বং নশ্চিত্রো বজ্রহস্ত।

হে পরম গুরু, তুমি যেমনি পরম রমণীয় পরম বিস্ময় তেমনি তুমি বজ্রহস্ত।

ত্বাম্ ইদ্ধি হবামহে।

কলা পথের ক্ষুদ্র পথিক আমরা তাই মহাগুরু তোমাকে আবাহন করি। আমাদিগকে দীক্ষা দাও, মহৎ কর।

অব্যক্ত গায়ত্রী ছন্দ।
ছন্দাংসি ভো অনুব্রূহি॥

গায়ত্রীতেও ব্যক্ত হয় নাই যে মহাছন্দ তাহা রূপ পাইয়াছে তোমার শিল্পে।

বিশ্বশিল্পের যেই মূলছন্দ তুমি আমাদিগকে শুনাও, সেই ছন্দ শুনাইয়া

আত্মানং নো নবং কৃধি।
আত্মানম্ অভয়ং কৃধি।
আত্মানম্ অমৃতং কৃধি।

আমাদের আত্মার সর্ব ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া নূতন করিয়া দাও। সংশয় ও ভয়াকুল আমাদিগকে অভয় করিয়া দাও। নীরস ম্রিয়মাণ আমাদের আত্মাকে অমৃত করিয়া দাও।

কাহিনী খবর

সব জলে বরফ হবে!

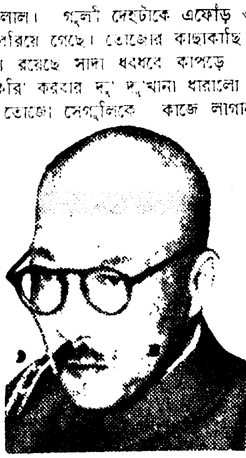
লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ যে, সম্প্রতি মেলবোর্ণ বেতারে রাবাউল বন্দীশালার ফেরৎ এক ব্যক্তির কথার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, একজন জাপানী অফিসার বলেছেন যে,—জাপানীরা 'ভেঙ' বলে এমন এক গোপন অস্ত্র আবিষ্কার করেছে—যেটি কোনও যায়গায় ফেললে—তার আশপাশের কয়েক মাইলের মধ্যে যা কিছু থাকবে—সমস্ত বরফ হয়ে জমে যাবে।

খবরটা শুনে অবাক্ হবেন না—কারণ এরপর বিজ্ঞানের কৌশলের কৃতিত্ব নিয়ে লড়াই যে হবেই—এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

মারবার জন্যই বাঁচানো?

জাপানের ৬১ বছর বয়সের বৃদ্ধ—ভূতপূর্ব জাপ প্রধান মন্ত্রী জীবিত কি মৃত—এই নিয়ে অনেকদিন অনেক রকম উল্টোপাল্টা কথা শোনা গেছল—হঠাৎ খবর পাওয়া গেছে যে—মাত্র কয়েক দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা বিভাগের লোক ও সশস্ত্র সৈন্যরা জেনারেল ম্যাক আর্থারের হুকুমে টোকিওর কাছাকাছি 'ইয়োনাগাচী' বলে জায়গাটিতে তাঁর প্রাসাদটি ঘেরাও করে জেনারেল তোজোকে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করেন। জেনারেল ম্যাক আর্থারের দলবল ও যুদ্ধ সাংবাদিকরা যখন তাঁর বাড়ির সদর দরজার দিকে এগুচ্ছিলেন জেনারেল তোজো তখন দুতলার একটা জানলা দিয়ে মুখ বার করে চীৎকার করে বলেন—'আমিই তোজো'। বলেই জানলা বন্ধ করে দিলেন।

তাঁর বাড়িতে পাকড়াও করনেওয়ালারা ঢোকবার আগেই বাইরে থেকে একটা গুলী ছোঁড়ার শব্দ পান। বাড়ির দরজা তখন বন্ধ, কাজেই তাঁরা সদর দরজা ভেঙে তোজোর বাড়ির ভেতরের হলঘরে ঢুকলেন সেখানেও আর একটা দরজা ভেঙে তাঁরা তোজোর ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকে দেখেন, জেনারেল তোজো একটা চেয়ারে হুমড়ী খেয়ে পড়ে আছেন—তাঁর বুকে গুলী বিঁধে রক্ত ঝরছে, পোষাকপরিচ্ছদ লালে লাল। গুলী দেহটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে বেরিয়ে গেছে। তোজোর কাছাকাছি একটা টেবিলে রয়েছে সাদা ধবধবে কাপড়ে মোড়া 'হারাকিরি' করবার দু' দুখানা ধারালো ছোরা, কিন্তু তোজো সেগুলিকে কাজে লাগান নি।



ব্যাপার দেখে সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তেন জনসন বলে এক আমেরিকান ডাক্তারকে ডাকানো হলো—তিনি এসে তখনই জেনারেল তোজোর দেহে রক্ত ইনজেক্‌শান করে দিলেন এবং বুলেটের ক্ষতটি সেলাই করে দিলেন। জেনারেল তোজো তখন গোঙাতে গোঙাতে বললেন, "আমি মরতে চাই—আমাকে মরতে দাও।"

তোজোর দেহে রক্ত প্রয়োগ কাজে লাগলো যখন, তখন ডাক্তার 'মরফিয়া' ইনজেক্‌শান দিয়ে বললেন—বিপদ কেটে গেছে—তোজোকে বাঁচানো যাবে।

তোজোকে মরতে না দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হলো মারবার জন্যেই; কারণ তিনি যুদ্ধাপরাধী—যুদ্ধাপরাধীদের নিজেকে মারবার অধিকার নেই—মৃত্যু সেও দেবে বিজয়ীরা যেমন খুশি তেমন করে। এ ব্যাপারে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা বলেছেন—তোজোকে যিনি বাঁচিয়েছেন—সেই ডাক্তার কাপ্তেন জনসনের শ্বশুর, ওহিয়োর গবর্ণর ভিক্ ডোনাহি—তিনি বলেন, "আমার একমাত্র আশা যে জামাই বুড়ো তোজোকে বাঁচাতে পেরেছে—যাতে করে আমরা এবার তাকে ভাল করে ফাঁসি দিতে পারি।" পরাজিত জাতির যুদ্ধাপরাধ—নৃশংস বর্বর হত্যাপরাধের চেয়েও যে ঢের বড় অপরাধ একথা গণতান্ত্রিক আমেরিকাই পৃথিবীকে শেখালে।

গান্ধী...মহাত্মা নয় কিষাণ!

সম্প্রতি এক খবরে প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী পুণার ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে গেছলেন। সেখানে দর্শকদের মন্তব্য পুস্তকে তাঁকে নাম স্বাক্ষর করার অনুরোধ জানানো হয়। মহাত্মা গান্ধী একটু হেসে জানান যে হরিজন সাহায্য ভাণ্ডারে কিছু অর্থ না পেলে তিনি নাম সই করেন না। এই কথা শুনে ইনস্টিটিউটের সভাপতি সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে কয়েকখানা নোট বার করে মহাত্মাজীর হাতে দেন। মহাত্মাজী খাতায় সই করলেন—"এম কে গান্ধী"। কিন্তু পেশা কি কি তা না লেখায়—ঐ সভাপতি খাতা দেখিয়ে বললেন—এখানে লিখুন 'মহাত্মা'। মহাত্মা গান্ধী পেশার ঘরে—লিখলেন 'কিষাণ'। ভারতের কিষাণ সমাজই এতে করে 'মহাত্মা' হওয়ার গৌরব অলক্ষ্যে পেয়ে গেল—তাই নয় কি।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন পরিষদে জনগণের তরফ থেকে সভ্য নির্বাচন করার দিন এগিয়ে আসচে। ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সঙ্কল্প ক'রেচে। প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক আছে, সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হয়তো ব্রিটিশ সরকারই হ'য়ে দাঁড়াবে—তাই কংগ্রেসের মত সর্বজনীন প্রতিষ্ঠানকেও তার মনোনীত প্রার্থীদের সাফল্যের জন্য যথেষ্ট প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে হবে। এতকাল সংবাদপত্রই প্রচারের সবচেয়ে বড় উপাদান হ'য়েছিল, কিন্তু এখন এ বিষয়ে তারও বড় প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে বেতার ও সিনেমা। ইউরোপ ও আমেরিকায় গণ-প্রতিনিধি নির্বাচনে এ দু'টি অস্ত্রের ব্যাপক প্রচলন আছে। লণ্ডনের বি-বি-সি সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং রাজনীতিক দ্বন্দ্বে নিরপেক্ষ থেকে এলেও ব্রিটেনের গত নির্বাচনে প্রচারকার্যে সব দলকেই বেতারের সাহায্য গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছিল। এখানকার রাজনীতিক দলগুলিও কি আগামী নির্বাচনে সে সুযোগ পাবে না? বিদেশী শাসকদের মর্জিতেই যখন সব চলছে, তখন জাতীয়তাবাদীদের অভ্যুদয়ে বিদেশী সেই শাসক নিয়ন্ত্রিত বেতারের সহায়তা পাবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। কিন্তু একটা কথা, বেতারের গ্রাহকরা তো সবাই এদেশেরই লোক, তারাই বা কেন তাদের প্রিয় ও আরাধ্য নেতাদের ভাষণ বেতার মারফৎ শোনবার দাবী জানানো থেকে বিরত থাকবে?

চলচ্চিত্রকেও প্রচারকার্যে অনেকখানি খাটানো যেতে পারে। কেবল সংবাদ-চিত্রের দ্বারাই নয়, ছবির কাহিনীর মধ্যেও সূক্ষ্মভাবে কংগ্রেসের আদর্শ প্রচার ক'রে কংগ্রেসপ্রার্থীদের পথ অনেকখানি প্রশস্ত ক'রে তোলা যায়। ছোট ও বড় দু-ধরণের ছবিই এ-কাজে নিয়োজিত করা যায়। চলচ্চিত্র শিল্পের কর্ণধাররা জাতীয়তার প্রসারের খাতিরে এ বিষয়ে অবহিত হবেন না কি? এছাড়া অন্যান্য প্রমোদ উপাদানকেও সমানভাবে কংগ্রেসের সেবায় তথা স্বাধীনতা-অর্জনের কাজে নিয়োগ করা যায়! নাট্যাভিনয় ও নানা বিচিত্র অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দিয়ে জনগণের মনে জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে তোলা অতি সহজ হবে। বহু পেশাদার ও সৌখীন সম্প্রদায় ও শিল্পী আছেন, যাঁদের দেশানুরাগ কোন কংগ্রেসকর্মীর চেয়ে কম নয়, তাঁরা উদ্যোগী হ'য়ে এইসব নিয়ে মেতে উঠলে একটা মস্তবড় কাজ করা হবে। যতই প্রতিক্রিয়াশীল ও শক্তিশালী বিপক্ষ দল হোক, সর্বত্রই কংগ্রেসের জয়কে সুনিশ্চিত ক'রতে গেলে শুধু কংগ্রেস-কর্মীরাই নয়, জাতীয়ভাবাপন্ন সকলজনের যার যেটুকু ক্ষমতা, সেইটুকুই যেন নিয়োগ করেন।



স্টুডিও সংবাদ

বড়ুয়া পরিচালিত এসোসিয়েটেড পিকচার্সের 'আমীরী'র হিন্দী সংস্করণ তোলা সমাপ্তপ্রায়। সাধনা বসুর 'অজন্তা'র মহলা চলেছে এবং কালী ফিল্মসে নতুন শব্দমণ্ডটি তৈরী না হওয়ায় চিত্রগ্রহণ হ'তে পারছে না। শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'গাঁয়ের মেয়ে' তোলা শেষ হ'য়ে এসেচে এবং সঙ্গে সঙ্গেই 'রাজপথ' তোলা আরম্ভ হয়ে যাবে। রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে পরিচালক হীরেন বসু তাঁর পরবর্তী হিন্দী ছবি 'কাজরী'র মহরৎ কার্য সম্প্রতি সুসম্পন্ন ক'রেছেন। অরোরার 'পথের সাথী' সম্পাদকের হাতে, মুক্তিও আসন্ন। পরিচালক মনোজ ভঞ্জ 'মৌচাকে ঢিল' প্রায় সমাপ্ত ক'রে এনেছেন।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

পুজো আসচে। কিন্তু আগে থেকে প্রমোদ-গৃহগুলি খুব ভরে থাকলেও বছরের এই সেরা উৎসবটা প্রমোদের দিক থেকে খুব জমাটই হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এতাবৎকাল পুজো আর বড়দিনটাই হয়ে এসেচে প্রমোদ-বাজারের মরসুম এবং এবারেও তার ব্যতিক্রম হবে না। ছবির দিক থেকে বাঙলা ছবি 'শ্রীদুর্গা', 'কলঙ্কিনী', 'ভাবীকাল' ও 'গৃহলক্ষ্মী'র মধ্যে খান দুই মুক্তিলাভ ক'রবেই। হিন্দী ছবির মধ্যে ঠনঠনের নতুন চিত্রগৃহ বীণা টকীজের উদ্বোধন হবে 'ঘর' নিয়ে, তালতলার নতুন চিত্রগৃহ ক্রাউন টকীজের উদ্বোধন হবে 'ইসমৎ' নিয়ে; এছাড়া 'এতীম' (সেণ্ট্রাল স্টুডিও), 'প্রতিমা' (বম্বে টকীজ), 'মাই সিস্টার' (নিউ থিয়েটার্স), 'লাখারাণী' (প্রভাত), 'তারামতী' (রামনিক), 'শুনো শুনোতা হুঁ' (অরোরা) এবং আরও খান তিনেক ছবি পুজোতে বা পুজোর অব্যবহিত পূর্বে মুক্তিলাভ ক'রবেই। মঞ্চেতে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' এবং শরৎচন্দ্রের 'অনুপমার প্রেম' আসরে পড়বেই—এছাড়া আরও তিনখানি নূতন নাটকও মঞ্চস্থ হবার ষোল আনা আশা আছে। তারপর চ্যারিটি শো'র নজীরে জলসার যে হিড়িক লেগেচে, পুজোয় তা আরও জোরালো হ'য়ে ওঠারই সম্ভব।

বিবিধ

দেবীকারাণীর পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে বম্বে টকীজের প্রযোজক অমিয় চক্রবর্তী গত ৭ই ডিসেম্বর বম্বেতে শান্তিনিকেতন-ফেরৎ নর্তকী সরস্বতী শাস্ত্রীকে বিবাহ ক'রে নিয়েছেন।

*　　*　　*　　*

বম্বে টকীজ খ্যাত প্রযোজক আর আচার্য বম্বেতে যে স্টুডিও তৈরী ক'রছেন তার নাম ঠিক হয়েছে রূপনগর।

*　　*　　*　　*

হালে প্রকাশিত হিসেব থেকে জানা গেল যে, ভারতীয় জনসাধারণ চলচ্চিত্রের জন্যে ১১ কোটি ৫৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৬১১ টাকা ব্যয় করেছে; যার মধ্যে প্রযোজক, পরিবেশক ও প্রদর্শকের অংশ হচ্ছে যথাক্রমে ২ কোটি ৯৪ লক্ষ ৭ হাজার ৯৫২, ৬৪ লক্ষ ৮৭ হাজার ৬৫ ও ৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৪৭ হাজার ১০৪ টাকা—প্রমোদ-কর দিতে হ'য়েছে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩১ হাজার ৪০২ এবং বিলিতী ছবিতে গেছে ৭৩ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৮ টাকা।

*　　*　　*　　*

এখানকার ইউনিটি ফিল্মসের হ'য়ে ওরা পিছু ষাট হাজার টাকার কড়ারে বেগম পারার সঙ্গে তিনখানি ছবির চুক্তি হয়েছিল, কিন্তু এদের আগামী ছবি 'যাত্রা'তে এখন অভিনয় ক'রতে পারবে না জানানোয় বোধ হয় চুক্তি কে'চে গেল।

*　　*　　*　　*

এই সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই ফিল্মের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ উঠে যাবে, এমন একটা আভাষ পাওয়া যাচ্ছে।

*　　*　　*　　*

বিলেতে ইস্ট এণ্ড ওয়েস্ট ফিল্ম কোম্পানী নামে আধা ভারতীয় ও আধা বিলিতী মূলধনে স্থাপিত একটি নতুন প্রতিষ্ঠান 'তাজমহল' নামে তাঁদের প্রথম ছবির জন্যে ৪০ লক্ষ টাকা খরচ ক'রতে মনস্থ ক'রেছে। এ'দের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিশু সেন এক বিবৃতিতে জানান যে, এ ছবিখানির অর্ধেক তোলা হবে ভারতে, অর্ধেক বিলেতে এবং তাজমহল গড়তে ২০ হাজার লোক লেগেছিল ব'লে যে জনশ্রুতি আছে, তার অনুসরণে ছবিতে ২০ হাজার ফালতু লোক নিয়োগ করা হবে।

*　　*　　*　　*

প্রতিমা দাশগুপ্ত স্ব-প্রযোজিত ছবি ছাড়া আর কোথাও অভিনয় ক'রবেন না ব'লে ঘোষণা ক'রেছেন।

*　　*　　*　　*

শোনা গেল, 'হামরাহী' ছবিখানি বম্বেতে প্রথম দিন দেখাবার পর পরিচালক বিমল রায় বেরিয়ে আসবার সময় পরিচালক ও

গুরু নীতিন বসু তাঁকে জড়িয়ে ধরে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করেন।

*   *   *   *

সুশীল মজুমদার পরিচালিত তাজমহল পিকচার্সের 'বেগম' চিত্রের কাজ ফিল্মিস্তান স্টুডিওর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ সময়ে শেষ না হওয়ায় বাকী অংশ জ্যোতি স্টুডিওতে তোলা হচ্ছে।

*   *   *   *

কলকাতায় সম্প্রতি প্রযোজকদের নিজেদের দ্বারাই পরিচালিত দুখানি ছবির মহরৎ কার্য সম্পন্ন হ'য়েছে—প্রথমখানি হচ্ছে প্রতিভা শাসমল প্রযোজিত ও পরিচালিত চিত্রবাণী লিমিটেডের 'সৌভাগ্যবতী' আর দ্বিতীয়খানি হচ্ছে সুরেন সরকার প্রযোজিত ও পরিচালিত ইস্টার্ন টকীজের 'নতুন বৌ'।

*   *   *   *

একখানি ছবি তৈরী আরম্ভ না হ'তেই সাধনা বসু আর একখানা ছবি তোলার লাইসেন্স পেয়েছেন; অবশ্য, এ লাইসেন্সের দামই বা কি!

*   *   *   *

কলকাতায় রূপসীতে 'কিসমৎ' শত সপ্তাহের পরও সদম্ভে চ'লে পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘকাল চলার রেকর্ডই শুধু ক'রে যাচ্ছে না, সেই সঙ্গে ঐ শত সপ্তাহে মাত্র রূপসীতেই সাড়ে এগার লক্ষ টাকার ওপর টিকিট বিক্রী ক'রে একই চিত্রগৃহে একই ছবি থেকে এত টাকা আমদানীরও একটা পৃথিবীর রেকর্ড ক'রে যাচ্ছে।

*   *   *   *

গত রবিবার সেণ্ট্রাল সিনেমায় প্রভাত ফিল্মসের 'চাঁদ'এর রজত-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হ'য়েছে—প্রভাত যখন দেশের গৌরব ছিল, তখন কিন্তু তার যুগান্তকারী ছবিগুলির মধ্যেও কোনখানিই এ গৌরব পায় নি।

*   *   *   *

গত ১৫ই জুলাইয়ের সমগ্র বাঙলা কেন্দ্রের যাবতীয় চিত্রগৃহের বিক্রয়লব্ধ অর্থ রবীন্দ্র স্মৃতিভাণ্ডারে দেবার কথা ঘোষণা করা হ'য়েছিল, কিন্তু তারপর দু-মাস কেটে গেলেও সে বিষয়ে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সংঘ আর উচ্চবাচ্য করছে না কেন?

প্রদর্শন জগতে জনপ্রিয়তার
আর এক রেকর্ড সৃষ্টি করলো



ফুল

পৃথ্বিরাজ · বীণা · সুরাইয়া
দুর্গা খোটে · সিতারা · ইয়াকুব
মজহর খাঁ · ওয়াস্তি ও অন্যান্য

৩য় সপ্তাহ **প্যারাডাইস**

প্রত্যহ: ২-৩০, ৫-৩০, ৮-১৫

দ্বারোদ্ঘাটন প্রতীক্ষায়!

নব-রূপশ্রীমণ্ডিত — নব চিত্রগৃহ



বীণা ২১৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
(কালীতলার নিকট)

ওয়েষ্টার্ণ ইলেকট্রিক সাউণ্ড সিষ্টেম সহ

উদ্বোধন চিত্র! সানরাইজের সমাজসার্থক চিত্র

ঘর

রূপায়ণে:
মলিনা — ইয়াকুব
নবাব — যমুনা

—বাসন্তী রিলিজ—

অরোরা প্রডাকসন্সের
=গীত-মধুর চিত্র অবদান=
বনমালা ও উলহাস
রূপায়িত



সহ ভূমিকায়
কে, সি, দে — আনসারি — মেঘমালা

শুভ উদ্বোধন — ৫ই অক্টোবর

সিটি, ছায়া, পার্ক শো হাউস

(বাসন্তী রিলিজ)

৭-ম সপ্তাহ

"হলের ফলকে লক্ষ্মী উঠিলে করিয়া দান
লক্ষ্মীমানের ঘরে
দুর্ভিক্ষের ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া প্রাণ
দেয় যারা নিজ করে।"
তাদের অশ্রুমথিত হৃদয়কাহিনী

এস, আর, হেমাদের
নিবেদন!
নিউ সেঞ্চুরীর ছবি



শৈলজানন্দের **মানে না মানা**

পরিবেশক—এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রিবিউটার্স

উত্তরা পূরবী পূর্ণ

প্রত্যহ: ৩টা, ৬টা ও ৯টায়
রবিবার সকাল সাড়ে ১১: অতিরিক্ত প্রদর্শনী

—নিউ টকীজের প্রথম হিন্দী চিত্র—

পহ্‌চান

পরিচালক:
প্রমথেশ বড়ুয়া

সঙ্গীত পরিচালনা:
কমল দাশগুপ্ত

—শ্রেষ্ঠাংশে—
বড়ুয়া — যমুনা — মায়া ব্যানার্জি
ইন্দু মুখার্জি — শৈলেন চৌধুরী
অঞ্জলি রায় — রবীন মজুমদার
শ্যাম লাহা — ফণি রায়

আংশিক স্বত্বের জন্য সর্বস্বত্ব সংরক্ষক

কপুরচাঁদ পি শেঠ,
৩৪নং এজরা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
আবেদন করুন।

—জ্যোতি—

প্রত্যহ—২-৩০, ৫-৩০, ৮-৩০

চতুর্থ সপ্তাহে

নবীন পিকচার্সের সর্বজনবন্দিত চিত্র

ভর্তৃহরি

শ্রেষ্ঠাংশে:—মমতাজ শান্তি—সুরেন্দ্র
অরুণ — কজ্জন
—মানসাতা রিলিজ—

সিলেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল
ব্যাঙ্ক লিঃ

রেজিঃ অফিস: সিলেট
কলিকাতা অফিঃ ৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কার্যকরী মূলধন
এক কোটী টাকার উর্দ্ধে

জেনারেল ম্যানেজার—জে, এম, দাস

প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত
ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর বাড়িয়াছে।
প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য। মূল্য দেড় টাকা।

কয়েকখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাস

ভ্রষ্টলগ্ন—১৷৹	অনাগত—১৷৷৹
বিদ্যুৎলেখা—২,	লোকারণ্য—২৷৷৹

শ্রীগৌরাঙ্গ (জীবনী)—১৷৷৹

কলিকাতার সমস্ত প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

দেশের কথা

২৫শে ভাদ্র—৩১শে ভাদ্র

শরৎচন্দ্রের আগমন—দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা—অবনীন্দ্রনাথ—কংগ্রেসের কথা।

শরৎচন্দ্রের আগমন—মুক্তিলাভ করিয়া শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু গত ৩১শে ভাদ্র কলিকাতায় উপনীত হইয়াছেন। মাদ্রাজ হইতে আগমন পথে বহুস্থানে রেল স্টেশনে তাঁহার রাজোচিত সম্বর্ধনার পরে তিনি ৩১শে ভাদ্র কলিকাতায় উপনীত হ'ন। তাঁহার অসুস্থতা প্রভৃতি হেতু তাঁহাকে হাওড়ায় না আনিয়া সাঁতরাগাছি স্টেশনে তাঁহাকে ট্রেন হইতে অবতরণ করাইয়া মোটরে হাওড়া ময়দানে আনিয়া তথায় সম্বর্ধিত করা হয়। সাঁতরাগাছিতে ও হাওড়ায় তিনি বলেন—দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে বাঙলা নেতৃত্ব করিয়াছে—যে বাঙলার সাধনা-গোমুখীমুখে দেশাত্মবোধের পাবনীধারা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে নবভাবে সঞ্জীবিত করিয়াছে—সেই বাঙলাকে আবার সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নবোদ্যমে তাহার আরব্ধ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সিমলা বৈঠক যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে, সেজন্য তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন, কারণ, ক্রীপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পরে আর আপাতকার্যকরী কোন প্রস্তাবের সমর্থনের প্রয়োজন থাকিতে পারে না।—যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। এখন আমরা আর স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনরূপ দৌর্বল্য প্রকাশ করিব না। তিনি পাকিস্থান প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। রুশিয়া নানা জাতিতে বিভক্ত—তথায় যে ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে; ভারতবর্ষে তাহার প্রয়োজন থাকিতে পারে না। এ দেশের মুসলমানদিগের অধিকাংশই হিন্দু পূর্বপুরুষের সন্তান এবং ভারতীয় সংস্কৃতির অনুগামী। কাজেই ভারতে হিন্দু ও মুসলমান একই জাতি। ব্যবস্থা পরিষদে আসন্ন নির্বাচনে যাহাতে আমরা যাঁহারা লাঞ্ছনা বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অধিকার বিস্মৃত না হই সেজন্য তিনি লোককে সতর্ক করিয়া দেন।

শরৎচন্দ্র কংগ্রেসের অন্য নেতৃগণের অনুরোধে তাঁহাদিগের সহিত বর্তমান অবস্থার আলোচনা করিবার জন্য ৩রা আশ্বিন বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

তাঁহার এক পুত্র ও দুই ভ্রাতুষ্পুত্রও বিনা বিচারে বন্দী ছিলেন। তাঁহারাও মুক্তি পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীমান দ্বিজেন্দ্রনাথ অসুস্থতা হেতু চিকিৎসিত হইতেছেন।

শরৎচন্দ্রের আগমনে যে বাঙলার রাজনীতিক্ষেত্রে নূতন ব্যবস্থা হইবে, অনেকেই তাহা মনে করিতেছেন। তাঁহাকে যে অনেক বিষয়ে কাজ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।

ইতোমধ্যেই বাঙলা হইতে বিচ্ছিন্ন যে সকল জিলা বাঙালীপ্রধান সে সকল হইতে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে—সেই সকল জিলা যেন আবার বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শরৎবাবু বলিয়াছেন, বাঙলার দুর্ভিক্ষের যে সংবাদ তিনি সংবাদপত্রে পাইয়াছেন, সে সকল যথেষ্ট নহে। তিনি সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত হইবেন।

বাঙলায় বস্ত্রসংকট—বোম্বাইএ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় পুনরায় বাঙলার বস্ত্রসংকটের আলোচনা করিয়া এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তিনি তাহাতে (১০ই সেপ্টেম্বর) বলিয়াছেন—কেবল ব্যবস্থার ত্রুটিতে বোম্বাইএ সঞ্চিত কাপড় বাঙলায় উপযুক্তরূপে বণ্টন করা হইতেছে না।

বোম্বাইএ প্রাদেশিক বস্ত্র "কমিশনারদিগের" বৈঠকে স্থির হইয়াছে, বাঙলাকে জনপ্রতি ১০ গজের স্থানে ১২ গজ কাপড় দেওয়া হইবে। বাঙলার পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে।

বাঙলায় বস্ত্র বিষয়ে যে নূতন সমিতি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙালীর সংখ্যা যে উপযুক্তরূপ হয় নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় থাকিতে পারে না।

ব্রহ্মে ভারতীয়গণ—বোম্বাইএর 'জন্মভূমি' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শেঠ ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ পরিদর্শন করিয়া আসিয়া গত ১০ই সেপ্টেম্বর যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, যে সকল ভারতীয় যুদ্ধের সময় ব্রহ্মে থাকায় বহুদিন স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন—তাঁহাদিগকে স্বদেশে আনিবার ব্যবস্থা সন্তোষজনক নহে। তাঁহাদিগকে অল্প বিলম্ব না করিয়া স্বদেশে আনিবার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। কিন্তু ভারত সরকার সে বিষয়ে আবশ্যক মনোযোগ দিতেছেন না। তিনি শুনিয়াছেন, ব্রহ্মে রাজকর্মচারীরা যে ৪ শত ভারতবাসীকে ভারতে পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়া জাহাজে তাঁহাদিগের স্থানও স্থির করিয়াছিলেন—ভারত সরকারের উপেক্ষায় ও অবজ্ঞায় তাঁহাদিগকেও আনা হইতেছে না! একজন দুরন্ত কর্কটরোগে ভুগিতেছেন এবং ব্রহ্মের সামরিক ও বেসামরিক রাজকর্মচারীরা তাঁহাকে চিকিৎসার্থ বিমানে ভারতে পাঠাইতে বলিলেও ভারত সরকার সে বিষয়ে কিছুই করেন নাই।

বাঙলায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা—কেন্দ্রী খাদ্য পরামর্শ কাউন্সিলে গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের খাদ্য সদস্য স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব বলিয়াছেন, এবার উত্তর-পূর্ব ভারতে বৃষ্টি আবশ্যক পরিমাণ হয় নাই। কাজেই ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে যদি খাদ্যদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়, তবে আবার বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে।

এই বিষয়ে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের নির্ধারণ যে এখনও প্রকাশ করা হইতেছে না—তাহার সহিত সরকারের অবলম্বিত নীতির কি কোন সম্বন্ধ আছে?

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বিলাতের 'টাইমস' পত্র লিখিয়াছেন—এবার ভারতে উৎপন্ন চাউলে আর ভারতের লোকের অভাব মিটান যাইবে না। "গত বৎসরের আমন ধান্যের যাহা অবশিষ্ট আছে, এবার আশুধান্যে যে ফলন হইবে এবং বাঙলা সরকারের যে শস্য মজুদ আছে (৪ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ টন) তাহাতে বাঙলার আগামী আমন ধান্য সংগ্রহ পর্যন্ত চলিয়া যাইবে। কিন্তু এবার আমন ধান্যের ফসল যেরূপ হইবার সম্ভাবনা, তাহাতে আগামী শীতকাল হইতেই অভাব প্রকট হইবে। যদি ধরা যায় সাধারণত বাঙলায় আমন ধান্যের পরিমাণ ৭০ লক্ষ টন হয়, তবে শতকরা ২০ ভাগ ঘাটতিতে ১৫ লক্ষ টন কম পড়িবে। যে বৎসর দুর্ভিক্ষে বাঙলায় লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মরিয়াছে, সে বৎসর বাঙলা সরকারের ঘাটতির পরিমাণ ১৯ লক্ষ টন ছিল।" কাজেই ১৫ লক্ষ টন কম হইলে আবার দুর্ভিক্ষ অনিবার্য হইবে।

কিন্তু যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে অনায়াসে বলা যায়, এবার অনাবৃষ্টিতে ও বন্যায় যে শস্যহানি হইয়াছে, তাহাতে শতকরা ২০ ভাগ মাত্র ফলন কম হইবে না—ঘাটতি, বোধ হয়, শতকরা ৪০ ভাগ হইবে।

ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৭ই সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে বাঙলার গভর্নরের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রত্যেক জিলায় ফসলের অবস্থা সম্বন্ধে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য সংবাদ গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় খাদ্য পরামর্শ কাউন্সিল নিম্নলিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন:—

"এদেশে যে পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয়,

তাহাতে দেশের চাউলের প্রয়োজন মিটিতে আরও ১৫ লক্ষ টন চাউল আমদানী করিতে হয়। সে অবস্থায় বণ্টনের ও নিয়ন্ত্রণের যে ব্যবস্থাই কেন করা হউক, শস্যহানি হইলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ও বহু লোকের মৃত্যু নিবারণ করা যায় না।

"১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে যে অবস্থার উদ্ভব হইবার সম্ভাবনা তাহাতে শঙ্কিত হইতে হয়। কাজেই ভারত সরকারের পক্ষে এখনই বিলাতের সরকারকে তাঁহাদিগের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা কর্তব্য। সে কর্তব্য পালন করিতে হইলে ভারতবর্ষকে সর্বাগ্রে পৃথিবীর অতিরিক্ত চাউল সরবরাহ করিতে হইবে।"

এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সময় ডক্টর হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় দুর্ভিক্ষে লোকের দুর্দশার বিষয় বিবৃত করেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

ঐ অধিবেশনে সরকারের "অধিক খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন কর" আন্দোলনের আলোচনাও হইয়াছিল। সেই আন্দোলনে বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে বটে, কিন্তু ফল কি হইয়াছে, তাহা কি জিজ্ঞাসা করা যায়?

মুন্সীগঞ্জ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে—গত ১৩ই সেপ্টেম্বর একজন দরিদ্র মুসলমান দুর্গত খাদ্যের সন্ধানে মুন্সীগঞ্জে আসিয়াছিল। সে অনাহারে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় কোন গৃহের বারান্দায় আশ্রয় লইয়াছিল। তথায় শৃগাল তাহাকে আক্রমণ করে এবং সেই আক্রমণফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

চুঁচুড়া হইতে হুগলী জিলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান জানাইয়াছেন, চাঁপাডাঙ্গা, চণ্ডীতলা প্রভৃতি স্থানে চাউল পাওয়া যাইতেছে না।

বাঁকুড়া হইতে ইতোমধ্যেই অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

অথচ এ সম্বন্ধে যে কোন উপায় অবলম্বিত হইতেছে, এমন সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না।

অবনীন্দ্রনাথ—শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁহার পঞ্চসপ্ততিতম জন্মতিথি উপলক্ষে সম্বর্ধিত করা হইয়াছে। সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি বলেনঃ—

"আজ আমার পক্ষে সুপ্রভাত মনে করি। কেননা, নিজে যখন বালক ছিলাম, তখন সমবয়সী যারা বালক-বালিকা ছিল, তাদের জন্য বহু গল্প-কাহিনী লিখেছিলাম—তাদের মন ভোলাবার জন্য। তখন তো ভাবিনি দেশে তার স্থান হবে। পাণ্ডিত্য দিয়ে সেসব গল্প নয়। সে গল্পের জন্য এতদিন পরে যে তোমরা মনে রাখলে সেজন্য তোমাদের ধন্যবাদ। চিত্রকলার জন্য আজ তোমরা আমাকে যে আদর করেছ তা করেছিলাম বড়দের জন্য। বড়রা তখন নেয়নি। অনেক দুঃখ এজন্য সেদিন পেয়েছি। আজ নতুনরা আমায় পুরস্কার দিলে, যা আমি সেদিন পাইনি।......তোমাদের কাছে সুখ ও আদর পাবো তা কখনো ভাবিনি। মনে করেছিলাম, এমনি করেই দিন কেটে যাবে।"

পরলোকে চারুচন্দ্র ঘোষ—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্যতম কংগ্রেস-নেতা ডক্টর চারুচন্দ্র ঘোষ কিছুদিন রোগভোগের পর গত ১৩ই সেপ্টেম্বর পেশোয়ারে পরলোকগত হইয়াছেন। এই বাঙালী চিকিৎসক বহুবর্ষ পূর্বে পেশোয়ারে চিকিৎসকের কাজে গিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। তিনি যে বাঙালী হইয়াও পেশোয়ার সাধারণ নির্বাচনকেন্দ্র হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন, তাহাতেই বুঝা যায়, তিনি ঐ প্রদেশে সর্বজনের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেসের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতে বহু ত্যাগস্বীকার ও লাঞ্ছনা বরণ করিয়াছিলেন। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তাঁহার অভাব সমগ্র দেশের জাতীয়তাবাদীরা বিশেষভাবেই অনুভব করিবেন।

কংগ্রেসের কথা—কংগ্রেসের প্রধানগণ দেশের বর্তমান রাজনীতিক সমস্যাসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বোধ হয়, যথাসম্ভব শীঘ্র কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনের ব্যবস্থা হইবে। রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছেন—কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি এ বিষয়ে অবহিত যে, পাঁচ বৎসর পূর্বে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির ও প্রাদেশিক সমিতি-সমূহের সদস্য নির্বাচন হইয়াছিল। কাজেই নূতন নির্বাচন প্রয়োজন। কিন্তু আগামী ৩।৪ মাস কংগ্রেসকে ব্যবস্থা পরিষদসমূহের সদস্য নির্বাচনেই বিশেষ ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। কংগ্রেস ব্যবস্থা পরিষদসমূহের সদস্য নির্বাচন ব্যবস্থা করিবেন।

যে ভাবে প্রদেশসমূহে নির্বাচন তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে বহু ত্রুটি রহিয়াছে—সে সকলের কতকাংশ হয়ত ইচ্ছাকৃত। এ সম্বন্ধে মাদারীপুর হইতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী এক বিবৃতিতে বলিয়াছেনঃ—

"ভোটার তালিকাভুক্ত হইতে হইলে যে সকল সর্ত পূর্ণ করিতে হইবে, সে সকলের অনেকগুলি পূর্ণ করা অসম্ভব। নির্বাচনে যিনি ভোটাধিকার পাইতে চাহেন, তাহাকে তিনি যে স্কুলে পড়িয়াছেন, সে স্কুলের হেড মাস্টারের কাছ হইতে সার্টিফিকেট আনিতে হইবে। কোথায় ফরম পাওয়া যায় এবং কোথায় সেগুলি জমা দিতে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাও জনসাধারণকে জানান হয় নাই। তাহা ছাড়া যাতায়াতের অসুবিধাও রহিয়াছে। স্ত্রীলোকদের পক্ষে উহা বিশেষভাবেই সত্য।

একথা বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে এবং পূর্ণ দায়িত্ব লইয়াই আমি একথা বলিতেছি যে, জনসাধারণের এক প্রভাবশালী অংশকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সজ্ঞানে চেষ্টা করিতেছেন এবং সে উদ্দেশ্যে একটি গোপন সার্কুলারও প্রেরণ করিয়াছেন, মনে হয়।

ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে যে, লেখাপড়া জানা স্ত্রীলোকদের অন্যূন শতকরা ৯০ জন, শিক্ষার দিক হইতে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শতকরা ৮০ জন এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা দ্বারা ভোটাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোক ভোটার তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছেন।"

প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে ভোটার-তালিকার যথাসম্ভব সংশোধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

বাঙ্গলায় যাহা হইয়াছে, তাহা যে অন্যান্য প্রদেশেও হইয়াছে, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। কংগ্রেসের চেষ্টা ব্যতীত যে সেই সকল ত্রুটি দূর করা যাইবে তাহা বোধ হয় না।

তাহার পরে—লর্ড ওয়াভেল বিলাত হইতে কি নূতন প্রস্তাব লইয়া আসিতেছেন, তাহাও কংগ্রেসকেই বিবেচনা করিতে হইবে।

বৈদেশিকী

গত ১১ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার লণ্ডনে পঞ্চ বৃহৎ শক্তির পররাষ্ট্র সচিবের বৈঠক আরম্ভ হয়েছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব, যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ বার্ণস, ফরাসী পররাষ্ট্রসচিব মঃ বিদল, চীন পররাষ্ট্রসচিব ডাঃ ওয়াঙ শিহ্ চিয়েহ্ ও রুশ পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটোভ তাঁদের পরামর্শদাতা ও সহযোগীদের নিয়ে লণ্ডনে এসেছেন।

পররাষ্ট্রসচিবদের এই বৈঠক নানা কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভবিষ্যতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের যে শান্তি বৈঠক হবে, এই বৈঠককে তার প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে। এই বৈঠকের আলোচনার পূর্ণ বিবরণ জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করা হবে কি-না জানি না। যতটুকুই প্রকাশ করা হক তা থেকে ভবিষ্যৎ শান্তি বৈঠকের গতিপ্রকৃতির কতকটা আঁচ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যে সব ব্যাপার থাকবে তার মধ্যে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলিও বিশেষ স্থান অধিকার করবে বলে মনে হয়—(১) ইতালী ও তার উপনিবেশ সমূহের সমস্যা, (২) গ্রীস সমস্যা (৩) পারস্য ও সোভিয়েট-রুশ (৪) রুশ ও তুরস্ক ও (৫) বল্কান সমস্যা। এগুলি ছাড়া জার্মানীর রুর ও সার অঞ্চলের বিলি ব্যবস্থা, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে ডাচ ও বেলজিয়ম গভর্নমেণ্টের জার্মানীর অংশ বিশেষ রাজ্যান্তর্ভুক্ত করার দাবী; রাইন, দানিয়ুব, জার্মানীর কীল ক্যানাল, দার্দানালেস প্রভৃতির সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হবে বলে মনে হয়।

একটি একটি করে সমস্যাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। ইতালী সম্পর্কে প্রথম সমস্যা হল তার উপনিবেশ সমূহের অবস্থা কি হবে। জানা গেছে ইতালীর বিরুদ্ধে যে সব জাতি যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল সম্মেলন থেকে ও সম্বন্ধে তাদের মতামত আহ্বান করা হয়েছে। তবে ইতালীর উপনিবেশ সম্পর্কিত ব্যাপারে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও রুশিয়া তিনজনের মধ্যেই মতভেদ দেখা দিয়াছে বলে জানা গেছে। ইতালীয় উপনিবেশ-গুলো ইতালীয় নিয়ন্ত্রণে থাকবে না এ সম্বন্ধে বোধ হয় সকলেই একমত, মতভেদ যা কিছু তা হল ঐগুলো নিয়ন্ত্রণের কিরূপ ব্যবস্থা হবে তাই নিয়ে। ব্রিটেনের নাকি দাবী লেমডুসা ও পন্তুলারিয়া দ্বীপ দুটো তাকে দেওয়া হোক আর বাদবাকী উপনিবেশগুলো ইংগ-মার্কিন অছিগিরির অধীন থাক। কিন্তু মার্কিন মহলের এই দুটো দ্বীপকে ব্রিটেনের কর্তৃত্বাধীনে দিতে ঘোর আপত্তি; কারণ এ দুটো ব্রিটিশের হাতে থাকলে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত হবে। তা ছাড়া আমেরিকা নাকি উপনিবেশগুলোর ভার সম্মিলিত রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক অছিগিরি পরিষদ গঠন করে তার হাতে দিতে ইচ্ছুক। এই পরিষদই উপনিবেশ পরিচালক কে হবে তা ঠিক করে দেবে। ইতালীর সীমা নির্ধারণ নিয়েও জটিলতার অন্ত নেই। যুগোশ্লাভিয়া ভেনেজুয়েলা-গিলিয়া, ত্রিয়েস্ত ও ইস্ত্রিয়া দাবী করে বসেছে। যুগোশ্লাভিয়ার দাবীর পিছনে রুশিয়ার সমর্থন আছে বলে মনে হয়। কিন্তু ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স ত্রিয়েস্ত ইতালীর মধ্যেই থাকা চাহেন। তবে তাহার বন্দর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে থাকবে এই নাকি তাদের অভিমত। ইতালী সম্পর্কে গ্রীস ও আবিসিনিয়ারও দাবী আছে। বস্তুত ইতালীর সমস্যা যেরূপ জটিল এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন স্বার্থ এরূপভাবে জড়িত যে ওর সমাধান এই বৈঠকেই হবে বলে মনে হয় না, তার জন্য আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে।

পারশ্য গভর্নমেণ্ট ও রুশ গভর্নমেণ্টের মধ্যে যে মন কষাকষি চলছে তাও এই বৈঠকের আলোচ্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মনান্তরের কারণ সোভিয়েট রুশিয়া নাকি পারসিক সৈন্যের চলাচলে বাধার সৃষ্টি করে। তা ছাড়া রুশ, ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্য পারস্যের বুকের উপরে বসে রয়েছে এও পারস্য গভর্নমেণ্ট পছন্দ করছেন না। গভর্নমেণ্ট এ সম্পর্কে প্রতিবাদও জানিয়েছেন। পূর্বোক্ত ত্রিরাষ্ট্র সৈন্যদের যদি পারস্য থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় তা হলেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার যতদিন একটা সুরাহা না হবে ততদিন পারস্যের প্রতিবাদ কি এদের বিচলিত করতে পারবে?

রুশ ও তুরস্কের মধ্যেও কোন মীমাংসা বা মতৈক্য হয়েছে বলে এখনও জানা যায়নি। তবে যতদূর জানা গেছে তাতে তুরস্ক দার্দনেলিসে শুধু সোভিয়েট ঘাঁটি দিতে ইচ্ছুক নয়, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রুশিয়া ও ব্রিটেন সমান শক্তি নিয়ে ঘাঁটি স্থাপন করুক এতে বোধ হয় তার খুব আপত্তি নেই। তবে সোভিয়েট রুশকে কার্জ ও আর্দস্থান অঞ্চল ছেড়ে দিতে বা আর্মানিয়ার সীমান্ত পরিবর্তন করতে তুরস্ক এখনও নারাজ। এ সমস্যাও পঞ্চ-রাষ্ট্রের আলোচ্য হওয়া উচিত এবং হবে বলেই মনে করা যেতে পারে।

ইউরোপের সর্বাপেক্ষা জটিল সমস্যা হল বল্কান সমস্যা। বল্কান অঞ্চলে রুশিয়ার প্রভাব ইংগ-মার্কিণ গভর্নমেণ্ট মোটেই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারছেন না। এখন গোলমাল বেধেছে 'গণতান্ত্রিক' কথাটা নিয়ে। বল্কান রাষ্ট্রসমূহে যেরূপ গভর্নমেণ্ট বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত আছে রুশিয়ার মতে তা গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ইংগ-মার্কিন মতে ঐসব রাষ্ট্রে রুশিয়ার তাঁবেদারী ডিক্টেটরী শাসন প্রচলিত। ইংগ-মার্কিণ গভর্নমেণ্টের বক্তব্য ঐ সমস্ত রাষ্ট্রে প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হলে ঐ সব দেশের সঙ্গে কোন শান্তিমূলক ব্যবস্থায় আসতে তাঁরা পারেন না। এই ব্যাপার নিয়ে রুশ ও ইংগ-মার্কিন শক্তির কূট-নীতিক প্যাঁচের বোঝাপড়া হবে বলে মনে হয়। শোনা যাচ্ছে চীন বল্কান সমস্যা সম্পর্কে সোভিয়েট রুশিয়াকে সমর্থন করছে। অবশ্য এ কোন সরকারী সংবাদ নয়। কাজেই নির্ভরযোগ্য নাও হতে পারে, তবে বল্কান সমস্যা যে এই বৈঠকের জটিলতম সমস্যা হবে তা সহজেই বোঝা যায়। তবে সেই জটিলতার গ্রন্থিচ্ছেদ কিভাবে হবে আগে থেকে তা অনুমান করা শক্ত।

এ ছাড়া দ্যগল দাবী জানিয়েছেন যে, রুঢ় অঞ্চল আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকুক। কারণ রুঢ় অঞ্চলের কয়লার উপর ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিল্পপতিকে নির্ভর করতে হয়। ঐ অঞ্চল যদি জার্মানীর নিয়ন্ত্রণে থাকে তা হলে তা প্রায় সমগ্র ইউরোপেরই অসুবিধার কারণ হবে। তিনি বলেন যে, এই পশ্চিম ইউরোপের কল্যাণের জন্য রাইন নদীও আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া উচিত।

এখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভূখণ্ডেই যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রণক্লান্ত দেশগুলো স্বভাবতই একটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া নির্ভর করে যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলোর দ্রুত ও ন্যায়সঙ্গত সমাধানের ওপর। এবারকার যুদ্ধ পূর্ব মহাযুদ্ধ অপেক্ষা যেমন দীর্ঘতরকাল স্থায়ী ও ব্যাপকতর অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে যুদ্ধোত্তর সমস্যাগুলোও তেমনি হয়ে উঠেছে জটিলতর। এই সব জটিলতার সুমীমাংসার উপরই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি ও নিরাপত্তা প্রধানতঃ নির্ভর করে। বিজয়ী শক্তিসমূহ এই সব সমস্যার আলোচনাকালে সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়ে বৃহত্তর কল্যাণমুখী উদার দৃষ্টি নিয়ে সমস্যাগুলির বিচার করবেন এই আশাই করবো। এবং এ আশাও করবো সমস্যাকে এড়ানোর জন্য তারা ক্রমাগত সময়ের অপচয় না করে সাহসিকতার সঙ্গে সমস্যার সম্মুখীন হবেন। —বিষ্ণুগুপ্ত

খেলাধূলা

ফুটবল

আন্তঃপ্রাদেশিক সন্তোষ মেমোরিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতা আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর হইতে বোম্বাইতে আরম্ভ হইবে। এই প্রতিযোগিতায় মোট ১২টি প্রাদেশিক দল যোগদান করিয়াছে। এই ১২টি দলের মধ্যে বাঙলা, দিল্লী, মহীশূর ও বোম্বাই এই চারিটি দলকে শক্তিশালী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। খেলার তালিকা দেখিলেই উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে উক্ত প্রতিযোগিতার পরিচালকগণও উহা ধারণা করিয়াই তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। বাঙলা দলকে প্রথমেই রাজপুতানা দলের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে। এই খেলায় বাঙলার জয়লাভ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পরবর্তী রাউণ্ডে এন, ডবলিউ, এফ, পি, দলের সহিত মিলিত হইবে এবং সেই খেলাতেও বিজয়ী হইবে আশা করা যায়। ইহার পরবর্তী রাউণ্ডে অন্যান্য সেমি-ফাইনালে মহীশূর দলের সহিত মিলিত হইবে এবং এই খেলায় বিজয়ী হইতে পারিলেই ফাইনালে খেলিবার যোগ্যতা লাভ করিবে। বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণ বাঙলা দলকে রীতিমত শক্তিশালী করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছেন জানি না। তবে যতদূর কার্যকলাপ দেখিয়া মনে হয় তাহারা এই বিষয় একটু দৃষ্টি দিয়াছেন। ইহারা নীরবতা ভংগ করিয়া দল গঠনের জন্য যে তৎপর হইয়াছেন, ইহাতে আমরা সুখী হইয়াছি। উপযুক্ত খেলোয়াড়গণকে লইয়া প্রকৃত শক্তিশালী দল গঠন করিতে দেখিলে আমরা আরও আনন্দিত হইব।

বোম্বাই রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় বাঙলা হইতে ইস্টবেঙ্গল ও এলবার্ট ডেভিড—এই দুইটি দল যোগদান করিয়াছেন। শীল্ড ও লীগ বিজয়ী ইস্ট বেঙ্গল দল এই বৎসর যে সকল খেলোয়াড়কে লইয়া উক্ত দুইটি প্রতিযোগিতায় সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন, তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই বোম্বাই যাইতেছেন। কিন্তু এলবার্ট ডেভিড দলের পরিচালকগণ এই রীতি অনুসরণ করেন নাই। ইহারা যে সকল খেলোয়াড়-গণকে লইয়া বোম্বাইতে খেলিতে গিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই দলের নিয়মিত খেলোয়াড় নহেন। ইহার ফলে এলবার্ট ডেভিড দল রোভার্স কাপ বিজয়ী হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু সাধারণ ক্রীড়ামোদিগণ ইহাদের দল গঠন ব্যবস্থা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন নাই, ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। তাঁহারা এখন হইতেই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আই এফ এ'র পরিচালকগই কিরূপে ইহা বরদাস্ত করিলেন, একটা অফিস দলকে এই-ভাবে দল গঠন করিতে সুবিধা দিলে ভবিষ্যতে যদি সকল দল, অফিস দল এইভাবে বিভিন্ন ক্লাবের বিশিষ্ট খেলোয়াড়গণকে একত্র করিয়া দল গঠন করিতে আরম্ভ করিয়া দেন, তবে সাধারণ ক্লাবসমূহের কি অবস্থা হইবে? খেলোয়াড় অভাবে দল গঠন করাই অসম্ভব হইবে। এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত লোপ পাইবে। ইহা আই এফ এ'র পরিচালকগণের নিশ্চয়ই কাম্য নহে। যদি তাহাই না হয়, পরিচালকগণের উচিত এখন হইতেই এই রীতির মূলে কুঠারাঘাত করা। বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণের কি সেই সৎসাহস আছে?

যুদ্ধ বিরতি ও মিত্রপক্ষের সাফল্যে উল্লসিত হইয়া স্থানীয় সৈন্য পরিচালকগণ 'ভিক্টরী কাপ' প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করেন। এই প্রতি-যোগিতায় কয়েকটি সামরিক দল অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করা সত্ত্বেও মোহনবাগান ও ক্যালকাটা দল ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকার লাভ করে। ফাইন্যালের খেলাটি খুব তীব্র প্রতিযোগিতামূলক হইবে বলিয়া সকলেই আশা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। মোহন-বাগান দল সহজেই ৪—১ গোলে ক্যালকাটা দলকে পরাজিত করিয়া বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছে। মোহনবাগান দলের এই সাফল্যে অনেকেই আশ্চর্যান্বিত হইবেন, কিন্তু আমরা হই নাই। আমরা জানিতাম মোহনবাগান বিজয়ী হইবেই। কারণ এই বৎসরে কি লীগ, কি শীল্ড প্রতিযোগিতায় যতবার ক্যালকাটা দল মোহন-বাগান দলের সহিত মিলিত হইয়াছে, ততবারই পরাজিত হইয়াছে। সুতরাং সেই দল মোহন-বাগান দলকে পরাজিত করিবে ইহা আমাদের কল্পনাতীত ছিল। তাহা হইলেও সামরিক পরি-চালকগণের প্রথম প্রবর্তিত ফুটবল প্রতিযোগি-তায় মোহনবাগান দল নিজ গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে, ইহা খুবই আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই।

গত বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও ফুটবল মরসুম শেষ হইবার পর বৈদেশিক পেশাদার খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত সার্ভিসেস দল কলি-কাতায় খেলিতে আসিয়াছিল। এই দল গত বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছে। এই দল মাত্র দুইটি খেলায় যোগদান করে। প্রথম খেলায় আই এফ এ দলকে শোচনীয়ভাবে ৫—০ গোলে ও দ্বিতীয় খেলায় স্থানীয় সার্ভিসেস দলকে ১১—১ গোলে পরাজিত করে। ইহাদের খেলিবার রীতিনীতি খুবই চমকপ্রদ। ফুটবল খেলা দেখিয়া শিক্ষা করিবার মত অনেক কিছুই ছিল। আমাদের বাঙলাদেশের বহু প্রশংসিত খেলোয়াড়গণ কি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন? আমাদের যতদূর ধারণা তাঁহারা ইহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই।

সন্তরণ

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত ওয়াটারপোলো লীগ প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। প্রথম ডিভিসনের সকল খেলা শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় ডিভিসনের কয়েকটি মাত্র খেলা অবশিষ্ট আছে। প্রথম ডিভিসনে বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি দল কোন খেলায় পরাজিত না হইয়া চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করিয়াছে। বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির দলের এই কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।

লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিসনের অনেকগুলি খেলাই আমাদের দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে। সেইজন্য খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে কিছু না বলিয়া একেবারে নীরব থাকা আমাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড প্রকৃতই এত নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে যে, আশংকা হয়, বাঙলার খেলোয়াড়-গণ গত ৩০ বৎসর ধরিয়া যে গৌরবের অধি-কারী হইয়া আছেন, তাহা বোধ হয় বোম্বাইর সাঁতারুদের হাতে বিসর্জন দিতে বাধ্য হইবেন। কি আক্রমণভাগ, কি রক্ষণভাগ, কোন বিভাগেই কোন দলে একটি খেলোয়াড়কে দেখিতে পাওয়া গেল না, যাহার খেলা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। তাহা ছাড়া সর্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয় হইতেছে, সকল বিশিষ্ট সন্তরণ ক্লাবই অধিকাংশ প্রবীণ খেলোয়াড়দের লইয়া দল গঠন করিয়াছেন। এই সকল প্রবীণ খেলোয়াড়গণ পূর্বখ্যাতি অনুযায়ী আর খেলিতে পারেন না। দ্বিতীয় ডিভিসনে অনেক তরুণ ও নবাগত খেলোয়াড়দের খেলিতে দেখা গেলেও তাঁহারা দুই এক বৎসরের মধ্যে খুব উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইবেন, তাহার কোনই পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইহাদের মধ্যে কোন কোন খেলোয়াড়ের ভবিষ্যতে উন্নতি করিবার যে একে-বারেই আশা নাই ইহা বলিলে অন্যায় হইবে, তবে প্রয়োজন নিয়মিত শিক্ষা দিবার। বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ অথবা বিভিন্ন ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ এই ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। যদি করিতেন, তাহা হইলে খেলার স্ট্যাণ্ডার্ডের এইরূপ শোচনীয় পরিণতি হইত না— দলের সম্মান রক্ষার জন্য প্রবীণ খেলোয়াড়দের সাহায্য গ্রহণ করিবারও প্রয়োজন হইত না।



ওয়াটারপোলো লীগ চ্যাম্পিয়ান বৌবাজার ব্যায়াম সমিতির খেলোয়াড়গণ। (বাম দিক হইতে দণ্ডায়মান)—প্রফুল্ল মল্লিক, শিশির সাহা, আশু দত্ত, শম্ভু নাগ ও লক্ষ্মী পাত্র। (উপবিষ্ট)—দ্বিজেন বসু, গৌরহরি দাস ও জহর আহির।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১২ই সেপ্টেম্বর—ভারত গভর্নমেণ্ট এক প্রেসনোটে ঘোষণা করিয়াছেন, "সিঙ্গাপুরে জাপানীরা আত্মসমর্পণ করায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ও তাঁহার পরিবারের কতিপয় লোককে আর আটক রাখার প্রয়োজন নাই।" তদনুযায়ী ভারত গভর্নমেণ্ট মাদ্রাজ প্রদেশে কুনুর স্পেশাল জেল হইতে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে মুক্তি দিবার জন্য মাদ্রাজ গভর্নমেণ্টকে নির্দেশ প্রদান করেন।

বাঙ্গলা সফরকালে মহাত্মা গান্ধীকে সরকারী আতিথ্য গ্রহণের জন্য লর্ড ওয়াভেল অনুরোধ করিয়াছিলেন। গান্ধীজী উহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। মহাত্মাজীর বাঙ্গলায় অবস্থান-কালে যাহাতে তাঁহাকে যথাসম্ভব সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তজ্জন্য লর্ড ওয়াভেল বাঙ্গলা সরকারকে জানাইয়াছেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর—পুণায় ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে পরামর্শ দেন।

প্রকাশ যে, পুনার কংগ্রেস শিবিরে লণ্ডন হইতে এই মর্মে একটি তার পাওয়া গিয়াছে যে, নির্বাচন শেষ এবং তাহার ফলাফল না জানা পর্যন্ত বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কোন কিছু করিবেন না। ইহার পূর্বে গভর্নমেণ্টের কোন পরিবর্তন হইবে না এবং ৯৩ ধারা শাসিত প্রদেশসমূহে সরকারী পরামর্শদাতাদের শাসনই চলিতে থাকিবে।

কেন্দ্রীয় খাদ্য উপদেষ্টা কাউন্সিলের সভায় স্যার শ্রীবাস্তব প্রকাশ করেন যে, আশানুরূপ বৃষ্টি না হওয়ায় এ বৎসর উত্তর পূর্ব অঞ্চলে বিশেষত পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বিহার ও উড়িষ্যার কয়েকটি জেলায় ধানের উৎপাদন স্বাভাবিক উৎপাদন অপেক্ষা অল্প হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৪৬ সালের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক হইতে হইবে।

সীমান্ত ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য ডাঃ চারুচন্দ্র ঘোষ দীর্ঘকাল রোগ ভোগের পর পরলোকগমন করিয়াছেন। ডাঃ ঘোষ চিকিৎসা ব্যবসায়ী ছিলেন এবং বহু বৎসর পূর্বে পেশোয়ারে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন।

বাঙ্গলার গভর্নর মিঃ আর জি কেসী লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। স্যার হেনরী টোয়াইনাম অস্থায়ীভাবে বাঙলার কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বস্ত্র বিতরণকালে এক হাঙ্গামা বাধায় শিকারপুরের নিকটবর্তী এক স্থানে একজন পুলিশ নিহত ও তিন জন আহত হইয়াছে।

১৪ই সেপ্টেম্বর—শুক্রবার বেলা ১১ ঘটিকার সময় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে কুনুর বন্দিনিবাস হইতে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

পাঞ্জাব সরকার শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র শ্রীযুত শিশির বসু এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্র বসু ও শ্রীযুত অরবিন্দ বসুকে মুক্তি দিয়াছেন।

নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারী শ্রীযুত হরিবিষ্ণু কামাথ সিউনি জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

ফরোয়ার্ড ব্লকের ভাইস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত শীলভদ্র যাজী হাজারীবাগ সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইবে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই সম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি সাব কমিটি নিয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

১৫ই সেপ্টেম্বর—শনিবার সকালে ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে ১৯৪২ সালে ব্রহ্ম ও মালয়ে গঠিত ভারতীয় বাহিনীর বহু অফিসার ও সৈন্যসামন্তের ভাগ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। আর একটি প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয় গভর্নমেণ্ট বর্তমান গভর্নমেণ্টের কোন চুক্তি মানিতে বাধ্য থাকিবে না।

তিন সপ্তাহ বিলাতে অবস্থানের পর ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল আজ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন

১৬ই সেপ্টেম্বর—বিখ্যাত নাগা মহিলা রাণী গুইদালোকে কয়েকটি সর্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। দশ বৎসরেরও বেশী সময় তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং বহু দিন ধরিয়া তাঁহার মুক্তির জন্য দাবী জানানো হইতেছিল।

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৫তম জন্মতিথি উপলক্ষে বাঙলার বিভিন্ন জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

১৭ই সেপ্টেম্বর—পুনায় পণ্ডিত নেহরু বলেন, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রতি শাস্তি-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইলে, উহা দ্বারা সমস্ত জাতিকেই শাস্তি দেওয়া হইবে।

আগামী ১লা অক্টোবর হইতে আসাম ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে।

১৮ই সেপ্টেম্বর—সুদীর্ঘ চারি বৎসরের বন্ধনদশার পর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু অদ্য মধ্যাহ্নে বাঙলায় প্রত্যাবর্তন করেন। বাঙলার জনসমাজ তাঁহাকে রাজোচিত সম্বর্ধনায় বিপুল অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। হাওড়ার ময়দানে লক্ষাধিক নরনারী সমবেত হইয়া তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করে। সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি বলেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই কংগ্রেসের রণভেরী বাজিয়া উঠিবে এবং প্রাণ বিসর্জনের জন্য রাজী থাকিলে, এই ত্যাগের মধ্য দিয়া অবশ্যই দেশের স্বাধীনতা আসিবে। শ্রীযুত বসু বাঙলার জনসাধারণের প্রতি এই বাণী প্রদান করেন—'মেকি বীরত্বের অভিনয় করিও না; সংগ্রামে প্রকৃত বীর হও।'

বিদেশী সংবাদ

১২ই সেপ্টেম্বর—জাপ আর্মির সুপ্রীম কম্যাণ্ডের প্রধান কর্মকর্তা ও ভূতপূর্ব সমর-সচিব ফিল্ড মার্শাল সুগিয়ামা আত্মহত্যা করিয়াছেন।

১৩ই সেপ্টেম্বর—অদ্য আনুষ্ঠানিকভাবে জাপ ইম্পিরিয়াল হেডকোয়ার্টারের বিলোপ সাধন করা হইয়াছে। অদ্য বৃটিশ দ্বাদশ আর্মির নিকট ব্রহ্ম সমর্পণের চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

সিঙ্গাপুরস্থ ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সেনাপতি মেজর জেনারেল কিয়ানী গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

১৪ই সেপ্টেম্বর—মিত্রপক্ষের নিকট সমগ্র মালয় সমর্পণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে।

১৫ই সেপ্টেম্বর—জাপ গভর্নমেণ্ট 'আর্য আর্মি'র প্রেসিডেণ্ট রাজা মহেন্দ্র প্রতাপকে মার্কিন অষ্টম আর্মির হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

আমেরিকার 'ইণ্ডিয়া লীগের' মুখপত্র 'দি ইণ্ডিয়া টুডে' সংবাদপত্রে বলা হইয়াছে যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু জাপানীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন—ইহা সত্ত্বেও তিনি ভারতের বহু জনার নিকট তিনি একজন বীর বলিয়া গণ্য।

১৬ই সেপ্টেম্বর—আমেরিকার ডেট্রয়েটে শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে দুই লক্ষ শ্রমিক কাজ বন্ধ করিয়াছে।

১৭ই সেপ্টেম্বর—বার্লিনে 'ডেলী টেলিগ্রাফ' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—জার্মানীতে কতক কতক রুশ সৈন্য রাত্রিকালে বৃটিশ, মার্কিন ও ফরাসী অধিকৃত অঞ্চলে যাইয়া নানা রকমের গুণ্ডামি, পাশবিক অত্যাচার ও মারধর করিতেছে।

ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর তিনজন অফিসার ক্যাপ্টেন পি কে সায়গল, পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্যার আব্দুল কাদিরের পুত্র ক্যাপ্টেন শাহনওয়াজ এবং ক্যাপ্টেন জি এস ডিলনকে সামরিক ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হইবে। আগামী ৮ই অক্টোবর দিল্লীতে বিচার আরম্ভ হইবে।

বুধবার হইতে কলিকাতার ট্রাম ধর্মঘট শুরু করা হইয়াছে। মঙ্গলবার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভায় কলিকাতা ট্রামওয়ে শ্রমিকরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মুক্তিলাভের পর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে বোম্বাই-এ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। তদনুযায়ী তিনি বুধবার বোম্বাই যাত্রা করেন।

গত সংখ্যায় (২৯শে ভাদ্র, ১৩৫২) শ্রীসুধীর-কুমার মিত্র লিখিত "কাশ্মীর ইতিবৃত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধের সহিত যে ছয়খানি আলোক-চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, উক্ত চিত্রগুলি বঙ্গের প্রসিদ্ধ আর্টিষ্ট শ্রীযুক্ত বিষ্ণুপদ কর কর্তৃক গৃহীত।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ। শনিবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৩৫২ সাল। Saturday, 6th October, 1945. ৪৮শ সংখ্যা

সাম্রাজ্যবাদের ক্ষুধা—

[illegible] খসিয়া পড়িতেছে। যুদ্ধ শেষ [illegible] না হইতেই সাম্রাজ্যবাদের রাক্ষসী [illegible] এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল জুড়িয়া [illegible] লোলিহান জিহ্বা বিস্তার করিতে [illegible]ছে। সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্ব-[illegible] মত [illegible] সব মিথ্যা প্রচারণা [illegible] হইতে চালাইতেছে। পাশ্চাত্য [illegible]বাদের স্বরূপ আমরা জানি; [illegible] জানি, বাঘ একবার যদি শোণিতের [illegible] পায়, তবে তাহার হিংস্রতা [illegible]ের বাড়িয়াই চলে। এক্ষেত্রে ধর্ম [illegible] [illegible]নীতির কোন বালাই নাই। সেই সত্যই [illegible] প্রতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দো-চীন, [illegible], যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশ জাপানের [illegible] হইতে মুক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই [illegible]বাদী বৃটিশ, ওলন্দাজ এবং ফরাসী [illegible] দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে পুনরায় [illegible] করিবার জন্য পশুশক্তি লইয়া [illegible] হইয়াছে। ইন্দো-চীন, ইন্দো-[illegible]শিয়া অর্থাৎ যবদ্বীপ সুমাত্রা প্রভৃতি [illegible] দেশের স্বাধীনতাকামী সন্তানগণ [illegible]তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন [illegible]ছেন। ইহাদিগকে পিষ্ট করিবার জন্য [illegible]বাদী দল জোট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। [illegible] এইসব দেশ শোষণ সম্পর্কে ইহাদের [illegible]স্পরের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত [illegible]হিয়াছে। কারণ, জাপ অধিকার [illegible] মুক্ত হইয়া এই সব দেশ যদি [illegible]নতা লাভ করে, তবে সাম্রাজ্য-[illegible]দের শোষণস্বার্থ বিনষ্ট হইবে। [illegible]. ব্রিটিশ কিংবা প্রশান্ত মহাসাগরে [illegible] সাম্রাজ্য বিস্তার প্রয়াসী আমেরিকা, [illegible] কেহই তাহা কামনা করে না। ব্রিটিশ [illegible] দলের গভর্নমেন্টের দৃষ্টি যে, এই [illegible]স্বার্থ রক্ষার দিকে সংরক্ষণশীল [illegible] মতই পিপাসা লইয়া জাগিয়া আছে, [illegible] পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিনের [illegible]ইয়াছিলাম। ইন্দোনেশিয়ান মালয়, ব্রহ্ম এবং ভারতে আজ ব্রিটিশের সেই সাম্রাজ্যবাদ হিংস্রমূর্তি ধরিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীর দল যাহাই মনে করুক না কেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবজাগ্রত জাতীয় আন্দোলনকে তাহারা দমিত করিতে সমর্থ হইবে না। ভারতবাসীরাও নিজেদের মুক্তির পথ নিজেরা দেখিয়াই লইবে। এই প্রসঙ্গে আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্বাধীনতাকামী বীর সন্তানদিগের বন্ধনপাশ দৃঢ় করিবার জন্য ভারতের সেনাদিগকে যেন নিযুক্ত করা না হয়। ভারতবাসীরা অন্য দেশে স্বাধীনতা হরণের পাপ ব্যবসায়ের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতে চাহে না। বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহারা সাম্রাজ্যবাদীদের বজ্রবল বুক পাতিয়া লইবার জন্য দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহাদের সহিতই ভারতবর্ষ সহানুভূতিসম্পন্ন। ভারতবাসীরা ঐ সব দেশের স্বাধীনতাকামীদের মৈত্রীই কামনা করে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতেও পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের চেয়ে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতর প্রাণের সম্পর্ক রহিয়াছে।

সেনাদলের জুলুম

সৈনাদলের সম্বন্ধে সসম্ভ্রমে কথা বলিতে হইবে, এদেশের সরকারের এই নির্দেশ; এজন্য বহুদিন পর্যন্ত সেনাদলের গাড়ি চাপা পড়িয়া মানুষ মারা গেলেও মুখ ফুটিয়া সে কথা বলিবার উপায় ছিল না; সেনাদলের নাম না করিয়া বিশেষ শ্রেণীর গাড়ি, লিখিতে হইত; এখন অবশ্য এই ক্ষেত্রে, সেনাদলের নাম করা চলে, কিন্তু নামের মর্যাদার প্রতি সেনাদের সেজন্য দৃষ্টি যে কিছু বাড়িয়াছে, আমরা ইহা দেখিতেছি না। ঢাকা, খুলনা, ডায়মণ্ড-হইতে বিদেশী সেনাদের রাত্রিতে [illegible] বাড়িতে প্রবেশ করিয়া উপদ্রব, নারীহরণ, স্ত্রীলোকদের প্রতি অসঙ্গত ব্যবহার, এই ধরণের বহু গুরুতর অভিযোগ পাওয়া যাইতেছে। ঢাকার পিপলস্ এসোসিয়েশন সেদিন এই মর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, শহরের নানা স্থানে সৈনিকেরা ঘৃণ্য ব্যবহার করিতেছে; ইহার ফলে শহরে আতঙ্কের উদ্ভব হইয়াছে—এমন কি স্ত্রীলোকেরা ঘরের বাহিরে যাওয়া নিরাপদ বোধ করিতেছেন না। ২৪ পরগণার অন্তর্গত ইছাপুর নবাবগঞ্জের হিন্দুসভার সম্পাদক সংবাদপত্রে এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, সম্প্রতি সেখানে সৈনিকেরা দলবদ্ধভাবে ছাত্রীদের উপর অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে এবং তিন চারটি ছাত্রীর চুল ধরিয়া টানে। বিলাতে কিংবা মার্কিনে সেনাদের এই ধরণের উপদ্রব ঘটে কিনা, এবং দেশের লোক তাহা নীরবে হজম করিয়া লয় কিনা আমরা জানি না। তবে এই শ্রেণীর অপরাধ যে দণ্ডার্হ এবং এসব ক্ষেত্রে অপরাধীদের আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত করা যে উচিত, মানুষ মাত্রেই এই দাবী করিবে। আমরা ইহাও বুঝি যে, সেইরূপ দণ্ডের ভয় যদি ইহাদের থাকিত, তবে এদেশের লোকের উপর, বিশেষভাবে নারীদের প্রতি অসংগত আচরণ করিতে গিয়া ইহারা কম্পিত হইত। দেখা যাইতেছে, পরাধীন দেশের নরনারীর প্রতি সেরূপ সমীহ বোধ এসব বিদেশী সেনার অন্তরে নাই। এরূপক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন এই সব শান্তির দূতদিগকে এদেশে রাখিয়া সংকার [illegible]রিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। তাঁহারা যদি ইহাদিগকে অবিলম্বে দেশে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন, তবেই একান্ত অসহায় আমরা নিঃশ্বাস,

রাজনীতিক বন্দীদের প্রতি অত্যাচার

পরাধীন এই দেশে রাজনীতিক অভিযোগ অতি গুরুতর অপরাধ। এই দেশের আইন ও শান্তিরক্ষকদের মতে রাজনীতিক সম্পর্কে যাহারা অভিযুক্ত হয়, তাহারা ডাকাতের অপেক্ষাও অধম এবং তাহাদের জীবনের কোন মূল্যই নাই। সম্প্রতি জওহরলাল নেহরু বেনারসের তিনজন রাজনীতিক অভিযোগে অভিযুক্ত বন্দীর উপর পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের একটি কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। এই তিন জন বন্দীকে বিচারের জন্য এক মাইল দূরে একটি আদালতে লইয়া যাইবার কথা হয়। তাহাদের হস্তপদ শৃঙ্খলিত ছিল। সেই অবস্থাতেই তাহাদিগকে এতটা দূর হাঁটিয়া যাইতে বলা হয়। তাহারা বলে যে, শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাহাদের পক্ষে হাঁটিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই যাইতে হইলে তাহাদিগের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু গাড়ি দেওয়া হয় না। অতঃপর তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে হাত-পা ধরিয়া টানিয়া সমস্ত পথ পশুর মত লইয়া যাওয়া হয়। তাহাদের কাপড় চোপড় ছিঁড়িয়া যায় এবং শরীরের নানা স্থানে কাটিয়া যায়। পথে তাহারা জল চায়; কিন্তু তৎপরিবর্তে নির্যাতন ভোগ করে। পণ্ডিতজী তীব্র ভাষায় এই বর্বরোচিত আচরণের নিন্দা করিয়াছেন এবং যাহারা অসহায় বন্দীদের উপর এইভাবে নির্যাতন করিয়াছে, তাহাদের বিচারের দাবী করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, পণ্ডিতজীর দাবী যুক্তিযুক্ত, কিন্তু যুক্তির শক্তি সব ক্ষেত্রে নাই। এদেশের সমগ্র শাসনপদ্ধতি নীতিহীন এবং যুক্তিহীন। এরূপ অবস্থা বিদ্যমান থাকিতে শুধু যুক্তির দোহাইতে রাজনীতিক ব্যাপার সম্পর্কিত এইরূপ অত্যাচারের ও নির্যাতনের প্রতীকার ঘটিবার কোন আশাই আমরা অন্তরে পোষণ করি না এবং এ সম্বন্ধে অতীতের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা আমাদের রহিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ এবং ডক্টর রামমনোহর লোহিয়া পাঞ্জাবের পুলিশ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এই শ্রেণীর উৎপীড়নের অভিযোগ করিয়াছিলেন; সম্প্রতি লাহোর দুর্গে রাজনীতিক বন্দীদের উপর কিরূপ অত্যাচার করা হয়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু তৎসম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই দুর্গে সর্দার লাভ সিংহের দাড়িগুলি একে একে উৎপাটিত করা হয়। গোয়েন্দা বিভাগীয় উচ্চ কর্মচারীদের নির্দেশে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুত দেবের পুত্র শ্রীযুত ইন্দু দেবের মাথায় লাঠি দিয়া এরূপ গুরুতর প্রহার করা হয় যে, তাঁহার, শ্রীযুত শিশিরবাবুকে তিন মাস স্নান করিতে দেওয়া হয় নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর উপর লাহোর দুর্গে কিরূপ অত্যাচার করা হইত, ইতিপূর্বে দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখে সকলে তাহা অবগত হইয়াছেন। দেশের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানদের উপর এই ধরণের অমানুষিক অত্যাচার দেশের লোকে আর বরদাস্ত করিয়া লইতে প্রস্তুত নহে। বস্তুত, যাহারা এই ধরণের অত্যাচার করে, তাহারাই শুধু এজন্য দায়ী নহে, যে শাসন-পদ্ধতিতে এই সব সম্ভব হয়, তাহার নিয়ামকগণও এতৎসম্পর্কিত দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না। আজই হউক, আর দুই দিন পরেই হউক দেশের লোকের নিকট এজন্য তাঁহাদিগকে জবাবদিহি হইতে হইবে; তাঁহারা যেন এ কথাটা বর্তমানের পদগর্বে বিস্মৃত না হন।

খাদ্য ব্যবস্থার সাফাই

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় খাদ্য উপদেষ্টা সমিতির সভায় গৃহীত প্রস্তাবে এবং আলোচনায় ইহাই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাঙলা দেশে ১৯৪৬ সালে পুনরায় খাদ্যাভাব ঘটিতে পারে; সুতরাং কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। স্যার উইলিয়াম স্ট্যাম্প ভারত গবর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগের উপদেষ্টা। সম্প্রতি তিনি লণ্ডনের নিউ ইণ্ডিয়া এসো-সিয়েশনের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, ভারতের জনসংখ্যা যে হারে বাড়িতেছে, তাহার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া ভারতবর্ষের খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে না পারিলে বাঙলায় দুর্ভিক্ষ আবার ভয়াবহ আকারে দেখা দিবে। স্যার উইলিয়াম হিসাব নিকাশ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সুস্থ জীবন যাপনের পক্ষে যে পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন ভারতের অন্তত ১৫ কোটি লোক তাহা পায় না। এই সকল নরনারী প্রয়োজনীয় খাদ্যের দুই-তৃতীয়াংশ হইতেও কম খাদ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। এক পক্ষে এই ধরণের সতর্কবাণী উচ্চারিত হইতেছে, অন্য পক্ষ হইতে আমরা একান্ত মামুলী রকমের আশ্বাসবাণী শুনিতে পাইতেছি। ভারত গভর্নমেণ্টের ফুড সেক্রেটারী মিঃ বি আর সেনের মতে বাঙলার অবস্থার জন্য উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। ভারত গভর্ন-মেণ্ট এবং প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট উভয়ে মিলিয়া সব ব্যবস্থাই ঠিক করিয়া ফেলিয়া-ছেন; এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে কেন্দ্রীয় সরবরাহের ভার লইতে প্রস্তুত আছেন। মিঃ কারবী ভারত গভর্নমেণ্টের রেশনিং বিভাগের উপদেষ্টা। তিনিও সেদিন আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, পুনরায় যাহাতে বাঙলা দেশে খাদ্যসংকট উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট এবং বাঙলা গভর্নমেণ্ট যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মিঃ কারবী এবং মিঃ বি আর সেনের অভিমত অনুসারে বাঙলা দেশের লোকে আর অনাহারে মরিবে না এবং বিগত দুর্ভিক্ষের সময় ৩০ লক্ষ নরনারীর উপর দিয়াই এই ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাদের নিকট আমাদের জিজ্ঞাসা শুধু এই যে, বাঙলা দেশে বর্তমানে খাদ্যের প্রাচুর্য তাঁহারা কোন দিক হইতে দেখিতে পাইতে-ছেন যে, শুধু ভবিষ্যতের আশঙ্কা এড়াইবার ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়াই আমাদিগকে তুষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। বাঙলা দেশে চাউলের দাম এখনও মোটামুটি প্রতি মণ ১৫, টাকাই রহিয়াছে এবং স্বাভাবিক মূল্যের অপেক্ষা দর অন্তত তিন গুণ বেশী; ইহা ছাড়া দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, তরিতরকারী এমন কি, সরিষার তেলটুকু পর্যন্ত যে সকল খাদ্য না হইলে শরীর রক্ষা করা চলে না, তাহা সবই দুর্মূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য। সরকারী রেশনিংয়ের ব্যবস্থার ফলে কলিকাতা শহরে সরিষার তেলের সংকট অধিকতর জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। মাথা পিছু যে তেল বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাতে কোন বাঙালী পরিবারেরই চলে না। ফলে ইহার মধ্যেই সরিষার তেলের ক্ষেত্রে চোরাবাজারী কারবার বেশ একটু জোর পাইয়াছে। খাদ্য সম্বন্ধে এই ধরণের সরকারী অব্যবস্থা এবং কুব্যবস্থার জন্য বাঙলার অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের সর্বজনীন অবনতি শোচনীয় আকারে দেখা দিয়াছে। বাঙলা দেশে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের তাণ্ডব চলিতেছে। চোখের উপর এই অবস্থা দেখিয়াও যাঁহারা সরকারী খাদ্য ব্যবস্থার সাফাই কীর্তন করেন, তাঁহাদের লজ্জাবোধ হয় না, ইহাই আশ্চর্য।

দান ব্রতের মহিমা

দানের সমান ধর্ম নাই। ধর্মভূমি এই ভারতবর্ষ, এ দেশের শাসকেরা অন্তত ধর্মের এই মর্ম সার বুঝিয়া লইয়াছেন। ভারত-বর্ষের লোকের শোচনীয় দারিদ্র্য, অথচ ভারত গভর্নমেণ্ট সম্মিলিত জাতিবৃন্দের পুনর্গঠন ও সাহায্য ভাণ্ডারে আট কোটি টাকা চাঁদা দিয়াছেন। বাঙলার লক্ষ লক্ষ

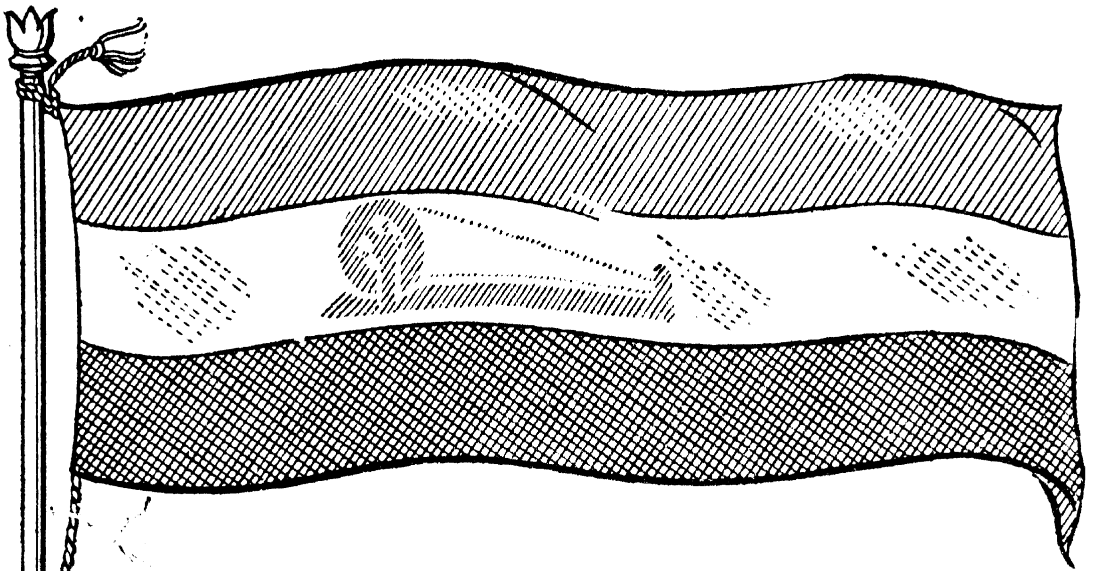
মহাশয় বাঙলা সরকার সিংহল দ্বীপে চাউল সরবরাহ করিয়াছেন। বাঙলা দেশের সর্বত্র আজ বস্ত্রের অভাব মর্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে এবং লজ্জা নিবারণ করিতে না পারিয়া বাঙলার নারী আত্মহত্যা করিতেছে, এমন সংবাদও আমরা শুনিতে পাইতেছি। সম্প্রতি এই মর্মে একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, হাওড়া জুট মিলের একজন নারী শ্রমিক এক খণ্ড বস্ত্র সংগ্রহের জন্য তাহার শিশু সন্তানটিকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে; অথচ এদিকে জাপ-কবলমুক্ত মালয়ের অধিবাসীদের বস্ত্রাভাব নিবারণের উদার ব্রতে ভারত সরকার অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং মালয়ে কোটি কোটি গজ কাপড় পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে—সর্বাগ্রে তাহাই প্রয়োজন। ভারতবাসীদের স্বার্থ ভারতের বর্তমান শাসন নীতিতে পরোক্ষ এসব সরকারী ব্যবস্থায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। এমন অবস্থাতেও যাঁহারা ভারতের সম্বন্ধে ব্রিটিশ শ্রমিক গভর্নমেণ্টের সদিচ্ছায় নিশ্চিন্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাদিগকে ধিক্কার দিতে হয়।

ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ

স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন এদেশের অনেকের নিকট সুপরিচিত। তিনি 'স্টেটসম্যান' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে স্বদেশে থাকিয়া ভারত হিতৈষণার ব্যবসা চালাইতে থাকেন। সম্প্রতি 'গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড দি ইস্ট' নামক সাময়িক পত্রে তিনি ব্রিটিশ শ্রমিক গভর্নমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত নীতির আলোচনা করিয়া আমাদিগকে এই কথা জানাইয়া দিয়াছেন যে, বিলাতে শ্রমিক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ভারতের ব্যাপারে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স ভারতবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন পুরুষ সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহার চিন্তাধারা বৈপ্লবিক নয়। তাঁহাকে ভারতসচিবের পদে নিয়োগ করাতে ইহাই মনে হয় যে, প্রধানমন্ত্রী মিঃ এটলী ভারতের সম্পর্কে তাড়াতাড়ি কিছু না করিয়া উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে চাহেন। বলা বাহুল্য, স্যার আলফ্রেডের উক্তির তাৎপর্য আমরা বহু পূর্বেই বুঝিয়া লইয়াছি। ব্রিটিশ জনসাধারণের জীবনযাত্রা উন্নয়নের দায়ই শ্রমিক দলের কাছে মুখ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং সেজন্য ভারতকে শোষণের ক্ষেত্ররূপে হাতে রাখাও তাঁহাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সম্প্রতি 'পেলাব' একটি বিবৃতিতে ব্রিটিশ স্বার্থসেবীদের এই মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। বিবৃতিটি বিলাতের কোন প্রধান ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মতের অনৈক্য সমানভাবেই চলিতেছে; এমন অবস্থায় মিঃ গান্ধী যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের নিয়ামক থাকিবেন, ততদিন পর্যন্ত আপোষ-নিষ্পত্তির কোন সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং ভারতের সম্পর্কে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের ভয়ের কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের কারবার পরিচালনা করিবার পক্ষে এখনও প্রশস্ত ক্ষেত্রস্বরূপেই থাকিবে। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের ব্রিটিশ-বিরোধী মতিগতি শঙ্কার উদ্রেক করিতে পারে বটে; কিন্তু কার্যত তাহা ব্রিটিশ স্বার্থের হানি ঘটাইতে পারিবে না। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভবিষ্যৎ কর্মনীতির আভাষ এই বিবৃতি হইতে পাওয়া যাইতেছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা একদিন যেরূপভাবে তাহাদের দেশের শিল্পবাণিজ্যকে উজ্জীবিত করিয়াছিল, যুদ্ধকালীন বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত ব্রিটিশ বাণিজ্যস্বার্থকে তেমনভাবেই তাহারা ভারতকে শোষণ করিয়া বাঁচাইয়া তুলিবে এবং ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের জোরে নিজেদের আর্থিক অবস্থাকে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দৃঢ় রাখিবে, তাহারা এই আশা অন্তরে পোষণ করিয়াই চলিতেছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয় আন্দোলন দমনে ব্রিটিশের বর্তমান নীতি তাঁহার এই অভিসন্ধির পরিপোষকস্বরূপেই কার্য করিতেছে। এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে আমাদের যেন কোন ভ্রান্তি না ঘটে।

নির্বাচনের নীতি

আগামী নির্বাচনের জন্য কংগ্রেস প্রস্তুত হইতেছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সেদিন বলিয়াছেন, 'ভারত ত্যাগ কর' এই নীতির উপর ভিত্তি করিয়া কংগ্রেস হইতে নির্বাচন-সংগ্রাম পরিচালিত হইবে। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। পরাধীনতার গ্লানি এবং বেদনা ভারতের হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। বিগত ভীষণ দুর্ভিক্ষে এই বেদনা বাঙালীর অন্তরে সমধিক তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে এই নীতি বিঘোষিত হইবার পর ত্যাগকুণ্ঠ, সংকীর্ণ, স্বার্থসেবী মুসলিম লীগের দল ভীত হইয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। তাহারা অন্তরে অন্তরে ইহা একান্তভাবে উপলব্ধি করিতেছে যে, সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িকতার উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদের নীতি মধ্যযুগে চলিলেও চলিতে পারিত; কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তাহা অচল। স্বাধীনতার জন্য বেদনা আজ মনুষ্যত্বের সর্বত্র একান্ত হইয়া উঠিয়াছে, পরাধীনতার অর্থনৈতিক শোষণ সহ্য করিয়া কোন দেশ, কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায়ই বাঁচিতে পারে না। আধুনিক প্রগতিপন্থী চিন্তাধারা এই সত্যে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; এরূপ অবস্থায় মুসলিম লীগের নীতি স্বভাবতই মনস্তত্ত্বের বিরোধী হইবে এবং জনসাধারণের চিত্তকে তাহা আকৃষ্ট করিতে পারিবে না। এই সত্য অন্তরে উপলব্ধি করিয়া বাঙলার লীগওয়ালার দল লীগ পরিচালকদের বৈপ্লবিক কর্মপন্থার ফাঁকা কথা আওড়াইতে শুরু করিয়াছেন। সমাজে বৈপ্লবিক প্রেরণা জাগাইতে হইলে প্রাণধর্মের পরিচয় দিতে হয় এবং সেজন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। পরোক্ষভাবে বিদেশীয় স্বার্থের সেবা করিয়া সমাজে বিপ্লব আনয়ন করা যায় না। লীগওয়ালার দল জনগণের স্বার্থের জন্য এ পর্যন্ত কোথায়ও কোন ত্যাগ স্বীকারের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। পক্ষান্তরে জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিয়া তাঁহারা নিজেদের পদ, মান এবং প্রতিষ্ঠারই সেবা করিয়াছেন। ধামাধরা নবাব নাইটের দলই লীগওয়ালাদের নীতির ধারক, বাহক এবং পৃষ্ঠপোষক। শস্তা সাম্প্রদায়িকতার ধুয়া তুলিয়া এবং বৈপ্লবিক প্রেরণার নামে অভদ্র গুণ্ডামির ভাব জাগাইয়া লীগনীতির অন্তর্নিহিত স্বার্থগৃধ্নু, ভীরুতা এবং নীচতাকে চাপা দেওয়া চলিবে না। স্বাধীনতার জন্য আত্মদাতাগণের ত্যাগের প্রদীপ্ত সূর্যদীপ্তির কাছে দিবাভীত পেচকের দল পুচ্ছ গুটাইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে।



মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী গত ২রা অক্টোবর ৭৬ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৭৭ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। মহাপুরুষের জন্ম জগতের পক্ষে এক যুগ-বিপর্যয়কর ব্যাপার। জগতের বহু শতাব্দীর সঞ্চিত সাধনার ফল তাঁহাদের আবির্ভাবের ভিতর দিয়া মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকে। মহাত্মাজী এমনই একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। এমন লোকোত্তর-চরিত্র মহামানবের আবির্ভাব জগতে খুব কমই ঘটিয়াছে। বিশ্বমৈত্রীর যে বেদনা যুগে যুগে ভারতের সর্বত্র অধ্যাত্ম সাধনাকে মন্থন করিয়া প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত হইতে চাহিয়াছে, মহাত্মাজী সেই প্রাণরসে প্রোজ্জ্বল অমল ধবল কমলস্বরূপ। দীর্ঘ দিনের পরাধীন অবস্থাজনিত শোষণে এবং পীড়নে ভারতের প্রাণরস শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছিল এবং মানবতার মহিমা বিমলিন হইয়াছিল। মহাত্মাজী তাঁহার জীবনব্যাপী দুঃখের তপস্যার রাজনীতিক সাধনার ভিতর দিয়া ভারতের প্রাণ রসকে প্রচুর করিয়া তুলিয়াছেন এবং সেই প্রাণধারার বৈপ্লবিক তরঙ্গ সঞ্চার করিয়াছেন। নির্যাতিত এবং নিপীড়িত মানবের মুক্তির বেদনা লইয়া তিনি দাঁড়াইয়াছেন। প্রাণ বলে প্রদীপ্ত ভারতের এই শীর্ণকায় অর্ধনগ্ন তপস্বীর তপোবলের প্রভাবে সাম্রাজ্যবাদের রাক্ষসী এবং আসুরী-শক্তি প্রভূত বলবাহনে সজ্জিত হইয়াও সত্যের সূর্য-দীপ্তির কাছে বিমলিন হইয়া পড়িতেছে; সহস্রশীর্ষ পুরুষ সমুদ্র-মেখলা ভারতভূমির বেলাভূমিতে প্রাণবলের দৃপ্তলীলায় আজ জাগিয়া উঠিতেছেন। 'ভারত ত্যাগ কর' এই বাণীর ভিতর দিয়া নরনারায়ণের সাধনা ধ্বনিত হইয়াছে। সে ধ্বনি আসমুদ্রহিমাচলকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। সমগ্র ভারতে নির্যাতিত



মানবের বিজয়াভিযান আরম্ভ হইয়াছে। আমরা জানি, এ পথ কুসুমে আস্তীর্ণ নহে, ইহা রুধিরে আপ্লুত। সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া জাতি এই শোণিতাক্ত পথে অগ্রসর হইয়াছে, পশুশক্তির কোন প্রতিরোধ মানে নাই। কিন্তু অভীষ্ট এখনও সিদ্ধ হয় নাই; মানব মুক্তির বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীর দল নূতন বল সংগ্রহ করিতে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং ভারতের স্বাধীনতা, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বমানবের স্বাধীনতার জন্য এই সংগ্রাম এখনও চলিবে; সেজন্য ভারতের প্রাণবলও উচ্ছলতর হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ পরাধীনতার প্রভাবে আধ্যাত্মিকতার নামে তামসিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভারতে যিনি এইরূপ প্রচুর প্রাণবলের এই তারুণ্য সঞ্চার করিয়াছেন এবং সুদৃঢ় পদবিক্ষেপে জাতিকে দুরধিগম্য লক্ষ্যপথে দুরন্ত-বিক্রমে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষে আমরা ভারতের সেই দিগ্বিজয়ী মহামানবের পায়ে আমাদের অশেষ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

মানুষ গান্ধী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখিত এই প্রবন্ধটি ("GANDHI THE MAN") ১৯৩৮ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখের "সান্‌ডে স্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসরের জানুয়ারী মাসে এই প্রবন্ধটি লিখিত হয়। বিরাট প্রতিভার অলোকসাধারণ দৃষ্টিভংগী দিয়া মহাত্মাজীকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া কবি তাঁহাকে বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্টের সহিত উপমা করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তদতিরিক্ত আর কোন ভাষায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করা যায় না। মহাকবির এই ভাষাই সমগ্র জাতির প্রাণের ভাষা। তাই গান্ধীজীর সপ্তসপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে কবিগুরুর উল্লিখিত প্রবন্ধটির অনুবাদ প্রকাশ করিয়া আমরা তাঁহার উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

সম্পাদক—'দেশ']

পাশ্চাত্য দেশে কয়েকমাস ভ্রমণের পর ভারতে ফিরে এসে দেখ্‌তে পেলাম, সারাটা দেশ আশু স্বাধীনতা-লাভের আশায় অধীর হয়ে উঠেছে। গান্ধীজী এমন একটি প্রণালীর সাহায্যে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ-লাভের কথা বলেছেন, যার প্রয়োগ-ক্ষেত্র স্পষ্টত সংকীর্ণ এবং আচরণটা বাহ্য।

একজন বিরাট্ ব্যক্তিত্বশালী ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া এই আশ্বাস, এমন কি যাঁরা সাংসারিক লাভের বিচার সম্পর্কে বিবেচনাশীল, তাঁদের মধ্যেও আশার উন্মাদনা সৃষ্টি করল এবং তাঁরা আমাকে ক্রুদ্ধভাবে এই বলে যুক্তি দেখাতে লাগ্‌লেন যে, এই বিশেষ বিষয়টিতে তর্কের কোন প্রশ্ন নেই; পরন্তু এটা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার, যার একটা অদ্ভুত প্রভাব ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির অলৌকিক শক্তি আছে। এর ফলে আমাদের চরিত্রের মজ্জাগত যে দুর্বলতা আমাদের যুগযুগ-ব্যাপী রাজনৈতিক জীবনের ব্যর্থতার কারণ, তার সুযোগ নিয়ে একটা বিরাট্ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মহাত্মাজী যে পথ বেছে নিয়েছেন, তার সমীচীনতা সম্বন্ধে আমার মনে প্রবল সন্দেহ জাগ্‌ল।

আমাদের মধ্যে যাঁরা যুক্তিকে উপেক্ষা করতে তার জায়গায় অন্ধ বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করে' তাকে আধ্যাত্মিক ব্যাপার বলে চালিয়ে সচরাচর প্রবৃত্তিটাকেই মহনীয় করে' তোলেন, তাঁরা তার মূল্য-স্বরূপ আমাদের মন ও ভাগ্যকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেন। আমাদের দেশের লোকের মনে যে অবিবেচনাপ্রসূত সহজ বিশ্বাসপ্রবণতা আছে, তার সুযোগ নেওয়ার জন্য আমি মহাত্মাজীকে দোষারোপ করে-ছিলাম; এর ফলে তাড়াতাড়ি বিশাল কিছু গঠন করা গেলেও তার ভিত্তি দুর্বল হ'য়ে পড়বে। এই রকমে জাতির নেতা হিসাবে মহাত্মাজীর সম্বন্ধে আমার ধারণার সৃষ্টি হল। সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণার পরিসমাপ্তি সেখানেই হয়নি।

যাঁরা প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তাঁদের মতো গান্ধীজীরও তাঁর সৃজনী ইচ্ছার উপযুক্ত ও সুসংগত বিকাশের জন্য একটা বিপুল মাধ্যমের প্রয়োজন হয়েছিল। অসংখ্য সামাজিক বাধা-বিপত্তি ও নীরস রাজনীতির অপরিসীম অনাকর্ষণীয়তার ভিতর দিয়ে সমগ্র দেশকে স্বাধীনতার পথে পরিচালিত করবার গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করে' তিনি নিজে সেই মাধ্যম সৃষ্টি করলেন। এই প্রচেষ্টায় তাঁর ব্যক্তিত্ব আরও বিরাট্ ও পূর্ণতর হয়ে উঠল এবং তাঁর প্রতিভার মধ্যে যা প্রকৃত বিশেষত্ব, তা বিকশিত হ'ল। যে শিল্পরূপ শিল্পীর মনের অতুলনীয়তার পরিচয় প্রদান করে, তার দ্বারা আমি যেমন শিল্পীকে বুঝি, তাঁর মতবাদ বা ধর্ম-বিশ্বাসের উৎকট ভাবের দ্বারা নয়, ঠিক তেমনিভাবে আমি তাঁকে বুঝতে শিখেছি। কেবল এই প্রকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে আমি যতই তাঁকে লক্ষ্য করি, ততই তাঁর মনুষ্যোচিত গুণের সার্থকতার জন্য বিস্মিত হই।

তিনি নিজে একজন সন্ন্যাসী, তিনি অন্যের আনন্দ দেখে ভ্রূকুটি করেন না, পরন্তু তাদের অস্তিত্ব যাতে প্রাণময় হয়ে ওঠে, সেজন্য দিনরাত কাজ করেন। তিনি তাঁর নিজের জীবনে দারিদ্র্যকে মহনীয় করে তুলেছেন, কিন্তু জনগণের প্রকৃত উন্নতির জন্য তাঁর মতো এত ঐকান্তিকভাবে ভারতে আর কেউ চেষ্টা করেন নি। বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন সংস্কারকরূপে, তিনি যে মতবাদ প্রচার করেন, তার উপর তিনি কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তিনি যেন কতকটা মূর্তিপূজক, কতকটা তার বিপরীত, এই রূপ ভাব নিয়ে তিনি ধূলিসমাকীর্ণ পবিত্র কুলুঙ্গীর মধ্যে দেবতাকে রেখে দিয়েছেন এবং তিনি প্রাচীন পদ্ধতিতে পূজা করেন আরও উৎকৃষ্টতর মানবোচিত উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে। তিনি জাতিভেদ প্রথা মেনে চলেন, অথচ যেখানে জাতিভেদপ্রথা কঠোর, সেখানে তিনি প্রচণ্ডতম অঘাত হেনেছেন, অথচ তাঁর চেয়ে অল্পশক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে তার শক্তির অল্পতার জন্য তার উদ্যমে বিফল হওয়ার জন্য যেরূপ লোকের বিরাগভাজন হওয়া উচিত ছিল, তিনি সেরূপ হন নি।

মানুষের নৈতিক উন্নতির সঙ্গে, তিনি বলেন, যৌনজীবন সামঞ্জস্যহীন এবং "দি ক্রুট্‌জার সোনাটা"র ("The Kretzer Sonata") লেখকের মতো তাঁরও যৌন বিষয়ে অত্যন্ত আতঙ্ক আছে। কিন্তু তিনি টলস্টয়ের মতো, যে যৌন জীবন পুরুষদের প্রলুব্ধ করে, তার সম্বন্ধে ঘৃণা পোষণ করেন না। নারীজাতির প্রতি তাঁর মমতা বাস্তবিকপক্ষে তাঁর চরিত্রের মহত্তম গুণাবলীর অন্যতম এবং তিনি যে বিরাট্ আন্দোলন পরিচালন করছেন, তাতে সর্ব-শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অকপট সহকর্মিগণের মধ্যে তাঁর দেশের কতিপয় মহিলাও আছেন।

তিনি তাঁর অনুবর্তিগণকে বলেন, অন্যায়কে ঘৃণা করতে, যে অন্যায় করে, তাকে ঘৃণা করতে বলেন না। এটা একটা অসম্ভব উপদেশের মত শোনায়, কিন্তু এটা তাঁর নিজের জীবনে যেমন সত্য হ'তে পারে, তেমনি এটাকে সত্য করে তুলেছেন। একবার একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক, যিনি সরকারী কংগ্রেস কর্তৃক দলত্যাগকারী বলে নিন্দিত হয়েছিলেন, তাঁকে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেন। সেই সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। অন্য কোন কংগ্রেস-নেতা হ'লে তাঁর সঙ্গে তিনি বিরূপ আচরণ করতেন, কিন্তু তিনি (মহাত্মাজী) তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করলেন এবং তিনি যাতে নিজেকে ছোট বলে মনে করেন, তেমন কোন সুযোগ না দিয়ে তিনি অত্যন্ত সদয় ব্যবহার করলেন এবং তাঁর কথা ধৈর্য ও সহানুভূতির সঙ্গে শুনলেন। তখন আমার মনে হ'ল, তিনি সত্যিই মহান্ ব্যক্তি, কারণ তিনি যে দলের অন্তর্ভুক্ত, সেই দলের চেয়েও তিনি বড়ো, এমন কি তাঁর যে মতবাদ তার চেয়েও তিনি বড়ো।

এটা গান্ধীজী সম্পর্কে একটা বিশেষত্ব ব্যাপার বলে মনে হয়। রাজনীতিক হিসাবে, সংগঠনকারী হিসাবে, জনগণের নেতা হিসাবে, নৈতিক সংস্কারক হিসাবে তিনি যেমন মহান্, তিনি এসবের চেয়ে মানুষ হিসাবে আরও মহত্তর, কারণ এই সমস্ত

বিষয় ও কার্যকলাপের কোনটিই তাঁর মনুষ্যত্বকে সীমাবদ্ধ করে দেয় নি, বরং তাকে আরও উজ্জ্বল ও পুষ্ট করে তুলেছে। তিনি অটল অধ্যাত্মবাদী হ'লেও এবং সমস্ত আচরণই তাঁর কয়েকটি প্রিয় বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা বিচার করলেও তিনি প্রকৃতই মানুষকে ভালবাসেন কেবল ভাবধারাকেই ভালবাসেন না। এইজন্যই তিনি তাঁর বৈপ্লবিক পরিকল্পনায় এত সতর্ক ও রক্ষণশীল। যদি সমাজের জন্যে কোন পরীক্ষামূলক কাজ করতে চান, তবে তার কঠোর পরীক্ষা তিনি নিজের উপর যাচাই করে নেন। যদি কখনও ত্যাগের জন্য আহবান জানান, তবে তিনি নিজে আগে তার মূল্য দান করেন। অনেক সমাজতন্ত্রবাদী আগে নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ না করে' অন্য সকলের ত্যাগের জন্য অপেক্ষা করেন, কিন্তু এই ব্যক্তি অপর সকলকে ত্যাগের দাবী জানাবার আগে নিজেই ত্যাগের জন্য অগ্রণী হ'ন।

ভারতে স্বদেশ-প্রেমিকগণ আছেন, অবিশ্যি সকল জাতির মধ্যেই এমন স্বদেশ-প্রেমিক আছেন যাঁরা গান্ধীজী যেমন ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তেমনি তাঁরাও করেছেন, এবং এমনও কেউ কেউ আছেন, যাঁদের, তাঁকে যে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে, তার চেয়েও বেশি তাঁদের করতে হয়েছে; এমন কি ধর্মের ক্ষেত্রে এদেশে সন্ন্যাসীরা আছেন, যাঁদের কৃচ্ছ্র সাধনার তুলনায় গান্ধীজীর জীবন মসৃণ বলে মনে হ'তে পারে। কিন্তু এই সমস্ত স্বদেশ-প্রেমিক, কেবল স্বদেশপ্রেমিকই, তার চেয়ে বেশি কিছু ন'ন এবং এই সমস্ত সন্ন্যাসী কেবল আধ্যাত্মিকতার কসরৎ করেন, এবং মানুষের মতোই তাঁরা তাঁদের গুণাবলী দ্বারা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই ব্যক্তিকে তাঁর মহৎ গুণাবলীর চেয়েও বড়ো বলে মনে হয়।

যে সমস্ত সংস্কারের সঙ্গে তাঁর নাম সংযুক্ত, তার কোনটিরই তিনি উদ্ভাবক ন'ন। তার প্রায় সবগুলিই তাঁর পূর্ববর্তী অথবা সমসাময়িক ব্যক্তিগণ প্রস্তাব ও প্রচার করেছিলেন। এই সব সংস্কারমূলক কর্মপন্থা কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হওয়ার বহু আগে ভারতে পল্লী সংগঠন, আমাদের শিশুদের শিক্ষার আবশ্যক উপায়স্বরূপ শিল্পবিদ্যার শিক্ষাদান, হিন্দুধর্মকে অস্পৃশ্যতার দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্ত করার আবশ্যকতা ইত্যাদি গঠনমূলক পরিকল্পনার কথা আমি নিজে প্রচার করেছিলাম এবং লিখেছিলাম। তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে, এই সমস্ত পরিকল্পনার শক্তি সঞ্চয় করার ক্ষমতা কখনও ছিল না, যে ক্ষমতার আবির্ভাব হ'ল তিনি সেই সমস্ত পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করার পর। যিনি তাঁর ভাবধারার সঙ্গে অভিন্ন যাঁর কল্পনা তাঁর সমস্ত জীবনের সঙ্গে জড়িত, তাঁর প্রাণশক্তিতে তারা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল।

যে সমস্ত উপায় থেকে তিনি তাঁর অহিংস-নীতি উদ্ভাবন করেছেন তার সত্যতা ও পবিত্রতার উপর গুরুত্ব আরোপ তাঁর মহৎ একনিষ্ঠ চরিত্রের আর একটি দিক। কারণ, অধিকার লাভের সংগ্রামে, মানুষ, তার অধিকার, ব্যক্তিগতভাবেই হোক, অথবা দলবদ্ধভাবেই হোক, মানুষ এমন দৃঢ়ভাবে দাবী করবে, যাতে, মানুষের প্রতি মানুষের যে মৌলিক কর্তব্য, অর্থাৎ প্রাণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার কর্তব্য, তা যেন কখনও ক্ষুণ্ণ না হয়। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, বর্তমান যে বিশেষ শ্রেণীর অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা হিংসামূলক উপায়েই অর্জিত হয়েছিল এবং হিংসার দ্বারাই এখন পর্যন্তও যা সংরক্ষিত হচ্ছে তা হিংসামূলক কার্যের দ্বারাই ধ্বংস করা যেতে পারে; এইরূপভাবে অন্যায় কার্যের এমন একটি বৃত্ত রচনা করা হয় যার কখনও শেষ নেই। কারণ সমাজের প্রচলিত শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে এমন মানুষ সর্বদাই থাকবে, যাদের কোন না কোন অভিযোগ আছে, তা প্রকৃতই হোক, অথবা কাল্পনিকই হোক,—যারা নৈতিক বাধ্যকতা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার এবং হত্যার পথে তাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সেই একই অধিকার দাবী করবে। এই বৃত্তের কোন অংশ ভাঙতে হবে এবং তাঁর দেশের লোক এই বৃত্ত প্রথম ভাঙার গৌরব অর্জন করে, গান্ধীজী তা-ই চান।

অন্যায় থেকে মানুষকে মুক্ত করতে যেমন বুদ্ধ সফল হননি, যীশুখৃষ্ট সফল হননি, তিনিও হয়ত তেমনি সফল হবেন না, কিন্তু লোকে তাঁকে এই বলে স্মরণ করবে যে, তিনি তাঁর জীবনকে ভবিষ্যৎ সকল যুগের শিক্ষণীয় আদর্শরূপে গঠন করেছিলেন।

বাপুজী নমস্তে

অরুণ সরকার

বিশ্বের বিবেক-বাণী শুনি তব কণ্ঠস্বরে আজি
বজ্রের নির্ঘোষে ওঠে বাজি'।

সে বাণী রৌদ্রের মত সংশয়ের অন্ধকার হ'তে
মুক্তির আশ্বাস দিল আনি',
সে বাণী বুদ্ধের মত রাত্রিদিন ফেরে পথে পথে
ছিটাইয়া অহিংসার বাণী,
সে বাণী খৃষ্টের মত অসজ্ঞান শত্রুরে দিবারাত্র
কহিতেছে, ক্ষমা কর সবে,
সে বাণী সন্ধ্যার মত চিরন্তন চির-ধ্রুবতারা
মৃত্যুহীন আপন গৌরবে।

সে যেন আকাশ-বাণী আকাশের কোনায় কোনায়
অন্তরাল হতে ডাকি' মানুষের অন্তরে শোনায়
স্বর্গের প্রথম লিপি। সে লিপির প্রতি ছত্র ভরি'
শ্বাশ্বত শান্তির বাণী আশীর্বাদ সম পড়ে ঝরি
শ্রান্ত ধরণীর বুকে। সে লিপির প্রতিটি লিখায়
আশার প্রদীপ জ্বলে অনির্বাণ শিখায় শিখায়।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহ কি বিশ্বশান্তির অন্তরায় ?

[আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সবুজ সঙ্ঘ কর্তৃক বেতারে প্রচারিত বিতর্ক। "রীডার্স ডাইজেস্ট"এর অধিনায়কতায় বর্তমান বর্ষের ১লা মার্চ তারিখে নিউইয়র্ক নগরীর টাউন হলে এই বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিতর্কে যোগদানকারী ব্যক্তিগণঃ—

১। মিঃ জর্জ ভি ডেনী—টাউন হলের সভাপতি ও সভার নিয়ামক (Moderator)।

২। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

৩। রবার্ট জন গ্রেহাম বুথবি—ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট মহাসভার সভ্য। তিনি এক সময়ে মিঃ উইনষ্টন চার্চিলের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন এবং বিলাতের বিগত মন্ত্রিসভার খাদ্য বিভাগীয় মন্ত্রীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ছিলেন।

৪। ওয়েন ল্যাটিমুর—ওয়াশিংটনের অধিবাসী, এশিয়া সম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থের প্রণেতা, প্যাসিফিক এ্যাফেয়ার্স নামক ত্রৈমাসিক সাময়িক পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক এবং বিখ্যাত সাংবাদিক। ইনি ইতিপূর্বে চীনা চিয়াং কাইশেক মহোদয়ের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন।

৫। জন উরিউ ওয়াণ্ডারকুক—লণ্ডনের অধিবাসী, লেখক ও বেতার সমালোচক। ইনি ডাচ গিনি, লাইবেরিয়া, পাপুয়া এবং সলোমন দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিয়া বহু তথ্য ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। বহু গ্রন্থের রচয়িতা ও প্রসিদ্ধ লেখক।]

"রীডার্স ডাইজেস্ট" পত্রিকার পক্ষ হইতে ঘোষণাকারীর আহ্বানে টাউন সভার নিয়ামক মিঃ ডেনী আগন্তুক ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলাগণকে অভিবাদনান্তে রাত্রিকালীন অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া বলেন,—গত বৃহস্পতিবার 'চীন দেশীয় ঘটনাবলী' সংক্রান্ত বিতর্ক সভায় যেরূপ জনসমাগম হইয়াছিল এবং উক্ত সভা যেরূপ বিভিন্ন মত-ধারার প্রতিনিধিমূলক হইয়াছিল, অদ্যকার সভাও তদপেক্ষা কম বিশেষত্বপূর্ণ নহে। আমি জানিনা সম্মানিত অতিথি-বর্গের মধ্যে কতজন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন; কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, বিতর্ক সমাপ্তির শেষ দিকে এমন এক-জনের কথা আপনারা শুনিতে পাইবেন যিনি আমেরিকা ও ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও উজ্জ্বল তারকা। তিনি হচ্ছেন মিস্ জারট্রুড লরেন্স। নমস্কার, মিস্ লরেন্স। আজ আমরা "সাম্রাজ্যের জাল গুটাইতে অনিচ্ছা"—চার্চিলের—অথবা "প্রজাতন্ত্রবাদের নীতি-সমূহ সমগ্র ঔপনিবেশিক মতবাদের কতটা পরিপন্থী", অথবা "প্রজাতন্ত্র সাম্রাজ্য-সমূহের বিজয়ী বাহুর আশ্রয় ভিন্ন উপনিবেশসমূহের জনগণের আজ কি দশা হইত" ইত্যাদি বাজে বিষয় লইয়া আলোচনা করিব না। কারণ, তাহাতে আমাদের অদ্যকার প্রশ্নের কোনও মীমাংসা হইবে না। আমাদের আজকার বিষয় হইতেছে "ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য সকল কি বিশ্বশান্তির পরিপন্থী?" আমাদের অদ্য-কার আলোচনায় ভাবাবেগ দ্বারা পরি-চালিত না হইয়া পারস্পরিক শুভেচ্ছা ও বিশ্বস্ততার ভিত্তিতেই পরিচালিত হওয়া অধিকতর কাম্য। আমরা আশা করি, এই সকল অধিবেশনে সত্যই জয়ী হইবে এবং আমরা সকলেই উপকৃত হইব।

অদ্যকার অধিবেশনে নেহরুর ভগিনী মিসেস পণ্ডিত এবং মিঃ ওয়েন ল্যাটিমুর প্রশ্নের স্বপক্ষে এবং মিঃ রবার্ট বুথবি (যিনি এ সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা পোষণ করেন) বিপক্ষে বলিবেন। চলুন আমরা প্রথমে ভারতের জাতীয়তাবাদী দলের বিশিষ্ট সভ্যা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত মহোদয়ার ভাষণই শ্রবণ করি। পণ্ডিত মহোদয়া আসুন।

শ্রীযুক্তা পণ্ডিত:—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ষষ্ঠ বৎসরে আজকার এই সান্ধ্য সম্মেলনে এ প্রকার বিষয়ে বিতর্কের অবতারণা একটু অসাধারণ মনে হয় না কি? বর্তমান যুদ্ধের কারণ হইল জার্মানীর আত্মপ্রসারণ ও সাম্রাজ্যিক প্রভুত্বের দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা। যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব থাকিবে, ততক্ষণ প্রতিপক্ষের অবশ্যম্ভাবী আক্রমণ ও যুদ্ধ হইতে উদ্ভূত পীড়ন এবং অবিচারকে নিন্দা করিবার ন্যায়সঙ্গত কোন হেতু আমাদের থাকিতে পারে না।

প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে জাপান যখন প্রথম মাঞ্চুরিয়া দখল করিয়াছিল, তখন ঔপনিবেশিক মন্ত্রী মিঃ আমেরি (যিনি বর্তমানে ভারতের ভাগ্য-বিধাতা) পার্লা-মেন্টের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"আজ যদি আমরা জাপানকে নিন্দা করি, তবে মিশর ও ভারতবর্ষে প্রযুক্ত আমাদের বর্তমান নীতি স্বতঃই নিন্দিত হইবে।"

এ বিষয়ে ভারতের মত অতি স্বচ্ছ। আপনাদের মধ্যে অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন যে, ভারতবর্ষে ১৯৪২ এর আগষ্ট মাসে নেহরুসহ কয়েক সহস্র পুরুষ ও মহিলা কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিলেন; আর তাহার একমাত্র কারণ ছিল ঐ বৎসরের ৮ই আগষ্ট তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক একটি প্রস্তাব গ্রহণ। ঐ প্রস্তাবের কিয়দংশ আপনারা শুনুন, "বৃটিশ শাসন ভারতকে অবনমিত ও হীনবীর্য করিয়াছে এবং তাহাকে ক্রমশ আত্মরক্ষায় অক্ষম করিয়া বিশ্ব-স্বাধীনতা যজ্ঞে তাহার দান-শক্তিকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং, স্বাধীনতা ও সাধারণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যে এই বৈদেশিক শক্তির উচ্ছেদ সাধনই আমাদের বর্তমানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। এই সমস্যার সমাধান হইলে পৃথিবীর যাবতীয় পরাধীন ও নির্যাতিত জনসমষ্টি মিত্রশক্তির প্রতি আকৃষ্ট হইবে এবং মিত্রশক্তিও ভারতবর্ষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব দ্বারা উপকৃত হইবে।"

ঐ একই প্রস্তাবে আমরা ব্রহ্ম, মালয় এবং পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের দ্বারা অধিকৃত অপরাপর উপনিবেশসমূহেরও স্বাধীনতা দাবী করিয়াছিলাম। কিন্তু ফলে কি দাঁড়াইয়াছে? সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের কোন কথা এখন আর শুনা যায় না। বরং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি এখন তাহাদের অর্জিত অধিকারগুলিকে সংহত করিয়া পুরাতন প্রথায়ই প্রভুত্ব কায়েম করার কথা চিন্তা করিতেছে। ব্যক্তি-গত অথবা সমষ্টিগতভাবে যতদিন সাম্রাজ্যবাদের রথ ঘর্ঘর শব্দায়িত হইবে, ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজও ততদিন পর্যন্তই অঙ্কুরিত হইতে থাকিবে। পরবর্তী বিশ্ব-যুদ্ধের আহ্বান হয়ত ঔপনিবেশিক অধিবাস বঞ্চিত কোনও পাশ্চাত্য শক্তির নিকট হইতে আসিবে না। আভ্যন্তরিক বিষ বাষ্পের উত্তেজনায় ইহা স্বতঃই জন্ম-লাভ করিবে।

বিগত ২৫ বৎসরের মধ্যে দুইবার আমেরিকা ইউরোপের সাম্রাজ্যিক শক্তিবর্গের উদ্ধারে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। আমেরিকার জনসাধারণ কি পুনরায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৬০ কোটি লোকের উপর প্রভুত্ব রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির স্বপক্ষে দণ্ডায়মান হইবে? জগতের সমস্ত পরাধীন জাতিগুলি আজ স্বাধীনতার প্রয়োজন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ। এই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শক্তি সমূহের উপনিবেশগুলি শত্রু কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে এবং শাসক-শ্রেণী যে রকম তাড়াহুড়া করিয়া হাস্যকর ভাবে ঐ উপনিবেশগুলি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে সমগ্র এশিয়াতেই সম্মান ও প্রতিপত্তির ক্ষেত্রে শ্বেতজাতির প্রাধান্য বিলুপ্তির কারণ ঘটিয়াছে।

অধিকৃত অঞ্চলসমূহে পুনরায় ঔপ-নিবেশিক শাসন পদ্ধতি প্রচলনের চেষ্টা করা হইলে যে সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠিবে, তাহাতে পৃথিবীর শান্তি বিপর্যস্ত হইবে। এশিয়ার জনগণ তত্ত্বাবধায়কতার

(Trusteeship) ধারণায় সন্ত্রস্ত ও ভারবহনে ক্লান্ত। তাহারা ভারতে বৃটিশ শাসনের রূপ অথবা প্রথম যুদ্ধের ফলে ম্যাণ্ডেটরী শাসনের প্রভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। জাতি সঙ্ঘের অধীন স্থায়ী ম্যাণ্ডেট কমিশন ম্যাণ্ডেটরী অঞ্চলসমূহে জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষার কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অপারগ হইয়াছে, কারণ জাতিসংঘ ও তাহার যাবতীয় শক্তি স্বার্থলিপ্সু শক্তিসমূহের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিল।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবী এই প্রকার পুরাতন, জীর্ণ ভিত্তির উপর নির্ভর করিতে পারে না। নূতন ভাব ও প্রেরণা লইয়া পৃথিবীকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে, যাহাতে সকলেই তাহাতে সম্মানজনক স্থান লাভ করিতে পারে। নিরাপত্তার সামরিক মান স্থায়ী শান্তির প্রতিপোষক নহে। রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। মিত্রশক্তি সমূহের স্বীকৃতি ও আশ্বাস বাক্য সমূহ এশিয়ার ক্ষেত্রেই পরীক্ষিত হইবে। মানব-সমাজের অগ্রগতি ও বিশ্বশান্তির পক্ষে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহ এক পরম বিঘ্ন। (উল্লাস ধ্বনি)

মিঃ ডেনীঃ—শ্রীযুক্তা পণ্ডিত, আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আপনার অকপট ভাষণ আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়াছি। এখন ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলভুক্ত উইনষ্টন চার্চিলের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী অনারেবল মিঃ রবার্ট বুথবির ভাষণ চাই। ইনিও পণ্ডিত মহোদয়ার ন্যায়ই সরল স্পষ্ট ভাষী। আসুন, মিঃ বুথবি।

মিঃ বুথবিঃ—শ্রীযুক্তা পণ্ডিত আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, বর্তমান যুদ্ধ জার্মাণীর আত্মপ্রসারণ ও সাম্রাজ্যিক প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা হইতে উদ্ভূত। হাঁ, আত্মপ্রসারণ অবশ্যই। কিন্তু সাম্রাজ্যিক প্রভুত্ব কিছুতেই নহে। জার্মাণী যাহা চাহিয়াছিল, তাহা উপনিবেশ নহে। জার্মানী চাহিয়াছিল, সমগ্র ইউরোপ ও ইউক্রেনের দাসত্ব। কাজেই এই দুইয়ের ভিতরে মতবাদ তীব্র ও সুস্পষ্ট। অতএব আমি শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। কারণ, আজিকার প্রশ্ন স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ আদৌ বৃটিশ উপনিবেশ ছিল না বা এখনও নহে। ইহা একটি জাতিও নহে। ইহা একটি মহাদেশ।

রাজ্ঞী এলিজাবেথ স্যার ওয়াল্টার র‍্যালেকে ভার্জিনিয়াতে পাঠাইবার কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি লণ্ডনের কয়েকজন বণিককে আহ্বান করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করিতে বলেন। এই কোম্পানী ওলন্দাজ, স্পেনিয়ার্ড ও পর্তুগীজদিগের জাহাজ ডুবাইয়া দিয়া রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজদিগের প্রতি তাহাদের ব্যবহার বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। আপনারা মনে রাখিবেন, ইহার মাত্র ৮৪ বৎসর পরে গ্রেট বৃটেন কতকটা অনিচ্ছার সহিতই দেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহারও মাত্র দশ বৎসরের মধ্যে ঐ দেশ ভারত-সাম্রাজ্যে পরিণত হয়,—আর ভারতবর্ষ এখন বৃটিশ জাতি সঙ্ঘের (British Commonwealth of Nations) একটি অংশ। আজ আমি এখানে এই কথা বলিয়া গর্ব বোধ করিতেছি যে, গ্রেট বৃটেন ভারতবর্ষকে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রদান করিয়াছে এবং আমি আশা করি যুদ্ধ শেষ হইলেই ভারতবর্ষ ঔপনিবেশিক মর্যাদা (Dominion Status) অর্থাৎ আপনারা যাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলিয়া অভিহিত করেন, তাহাই লাভ করিবে। হিন্দু, মুসলমান এবং দেশীয় নৃপতিবৃন্দ মিলিয়া যদি সকলের গ্রহণযোগ্য কোনও শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারে, তবে এখনই উহারা কাম্য স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে। এতদ্বিপরীত যাহাই বলা হউক না কেন, আমরা বিশ্বাস করি ভারতবর্ষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব এড়ান অসম্ভব। যদিও আমাদের অনেকেই এ দায় হইতে মুক্তি পাইলে আনন্দিত হইবেন। আমরা আরও জানি যে, ভারতের সমস্যা রাজনৈতিক নহে, ধর্ম সম্বন্ধীয় সমস্যাই হইল ভারতবর্ষের প্রকৃত সমস্যা। তা যাহাই হউক, একথা আজ অস্বীকার করা চলে না যে, ইংলণ্ডের উত্তমর্ণ হিসাবে আজ আমেরিকার পরেই ভারতের স্থান। ঐ ঋণ আমরা স্বীকার করি এবং উহা পরিশোধের ব্যবস্থাও আমরা করিতেছি। কাজেই, আত্মসাৎ ও শোষণ করিবার অপরাধে আমরা দোষী নই বলিয়াই আমি মনে করি।

অতীতে সৃষ্ট ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলি কখনও পৃথিবীর শান্তির বিঘ্ন ঘটাইয়াছে, ইহা ধরিয়া লওয়া একটা অপসিদ্ধান্ত মাত্র। জাতীয় চেতনা ও দুঃসাহসিকতাই উপনিবেশগুলির জন্মের একমাত্র কারণ নহে; ইউরোপের জাতিতে জাতিতে ঈর্ষা ও ক্ষমতামদমত্ততাই ইহার মূলীভূত কারণ। বৃটিশ সাম্রাজ্য ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল প্রাচীন জগতের প্রভুত্বলোভী ফ্রান্স ও স্পেনের পতনের পর। আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও ইংলণ্ডের সাম্রাজ্য পরিশেষে আবিষ্কারক ও বণিকগণের দ্বারা আয়তন ও সমৃদ্ধিতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আমার ধারণা, কতগুলি নির্দিষ্ট সর্তে বর্তমান উপনিবেশ সাম্রাজ্যগুলি পৃথিবীর স্থৈর্য ও শান্তির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। রোম সাম্রাজ্য যখন ভূমধ্যসাগরে একাধিপত্য করিত এবং প্রভাব—পুরাতন ও নূতন পৃথিবীর এই দুই যুগেই মানব জাতি পার্থিব উন্নতির চরম সুযোগ লাভ করিয়াছে এবং ইহাকে কিছুতেই ছোট করিয়া দেখা চলে না। প্রথম যুদ্ধের অবসানে বিজয়ী মিত্রপক্ষ নিরস্ত্রীকরণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-নীতি-প্রচলনের যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফলে আজ পৃথিবীর এই বিপর্যয়। বিশ বৎসরের মধ্যেই আমাদের জয়, পরাজয়ের পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিল। জার্মান সমরশক্তির পৃষ্ঠপোষিত এক দল দস্যু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কেন্দ্র শক্তিচ্যুত ইয়োরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির পতন ঘটাইতে সক্ষম হইল। কিন্তু ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, যদি আজ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভাঙিগয়া পড়িত, তবে হিটলারই ইয়োরোপ ও সমগ্র পৃথিবীতে স্বকীয় নীতি ও শাসন প্রয়োগ করিত। কারণ ফ্রান্সের পতনের পর ব্রিটেনে আমরা কিছুতেই একক জার্মাণ শক্তির নিকট দাঁড়াইতে পারিতাম না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সর্বশক্তি দ্বারা মানুষের সভ্যতা ও আদর্শকে অপর একটা অন্ধকার যুগের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। যাঁহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জাল গুটান চাহেন, এবার তাহারা পুনরায় চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন।

আইন ও ন্যায়সংগতভাবে যাহাতে সাম্রাজ্যগুলি বাঁচিয়া থাকিতে পারে, সেই সম্বন্ধে আমি এই মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। ইহার মর্মার্থ আমি দুইটি বাক্যে আপনাদের নিকট ব্যাখ্যা করিব। আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর পুনর্গঠন ও শৃঙ্খলা রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হইল সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাধারণ স্বার্থবিশিষ্ট জাতিবৃন্দের সমন্বয়ে কতগুলি আঞ্চলিকমণ্ডলীর সৃষ্টি করা। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডকে নিয়া এইরূপ একটি আঞ্চলিকমণ্ডলী পশ্চিম ইয়োরোপে বর্তমান আছে। আমার মনে হয়, এই আঞ্চলিক নীতি উপনিবেশগুলিতেও এরূপভাবে প্রয়োগ করা উচিত, যাহাতে তত্রস্থানের দেশীয় অধিবাসিবৃন্দও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অর্থ ও সমাজ সংক্রান্ত সাধারণ উন্নতি বিষয়ক ব্যাপারগুলিতে শক্তিশালী সহযোগিতা করিতে পারে। অতএব আমি নিশ্চয়ই দৃঢ় প্রত্যয়ের সহিত সুস্পষ্টভাবে এই বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব যে, বিকেন্দ্রীকরণ অপেক্ষা একীভূতকরণ এবং ধ্বংস অপেক্ষা সংগঠনই শান্তি ও মুক্তির একমাত্র পথ। (উল্লাসধ্বনি)।

নিয়ামক মিঃ ডেনীঃ—ধন্যবাদ মিঃ বুথবি। আপনি ও পণ্ডিত প্রধানত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য নিয়াই আলোচনা করিয়াছেন, এখন আমরা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং দূর প্রাচ্য ও প্রশান্ত-

ল্যাটিমুর মহোদয়ের ভাষণ শুনিব। আসুন মিঃ ল্যাটিমুর।

মিঃ ল্যাটিমুরঃ—প্রথমেই আমি বলিতে চাই যে, আমি শ্রীযুক্তা পণ্ডিতের বিবৃতি দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি (উল্লাসধ্বনি) ঔপনিবেশিক অধিকারসমূহ, চিরকালই পৃথিবীতে ঈর্ষার ইন্ধন যোগাইয়া আসিয়াছে। আমাদের প্রকৃত সমস্যা হইতেছে পৃথিবীর জনগণ যাহাতে স্বাধীন ও নিরাপদ থাকিতে পারে সেই প্রকার শাসন পদ্ধতি গঠন ও স্থাপন করা। এখন ইহার বিপরীত যে, মূর্খতাসূচক পদ্ধতি, যাহার বিরুদ্ধে কোটী কোটী নির্যাতিত পরাধীন মানব যুদ্ধ করিবার জন্য সমুৎসুক, তাহা পরিহার করিবার পন্থা কি? সাম্রাজ্যবাদ ইতিহাসের একটা অবস্থা বিশেষ এবং যে কোনও জাতিই এই অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাই ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছে। অতীত ইতিহাস পাঠ করিলে কখনও ঘৃণা কখনও বা প্রশংসার ভাব আমাদের মনে উদ্রিক্ত হইবে। তা যাহাই হোক, অতীতকে পরিবর্তন এখন আর আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। অপর পক্ষে, ইহা গণতান্ত্রিক জনগণের নিশ্চিত বিশ্বাস যে পৃথিবীর বর্তমান অধিবাসীরাই ভবিষ্যৎ জগতের ভাগ্য বহুলপরিমাণে নির্ধারণ করিবে। আগামী দিনের ফল, আমাদের কার্য ও অভিমত দ্বারাই যখন সৃষ্ট হইবে, তখন আমাদের সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক সমস্যার স্বরূপ এখনই জানা প্রয়োজন যেন ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা আমরা পশ্চাতে সরিয়া না পড়ি।

বিজয়ী জাতির সম্মতি, অসম্মতি ও অনুগ্রহ, নিগ্রহের উপর যখন বিজিত জাতির নির্ভর করিতে হয়, তখনই সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব সম্ভব হয়। এই সংজ্ঞা অনুযায়ীই আমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মিঃ বুথবির যুক্তি খণ্ডন করিব। ভারতীয়েরা অবশ্যই একটি পরাধীন ঔপনিবেশিক জাতি। বস্তুতঃপক্ষে ঔপনিবেশিক ব্যাপারে ভারতবর্ষ একটি বিরাট সমস্যা। আর এই সমস্যা এত জরুরী যে, ভারতবর্ষ যদি আজ স্বাধীন হয়, তবে অন্যান্য উপনিবেশের প্রশ্নও অতি সহজেই সমাধান হইতে পারে। ভারত যতদিন না স্বাধীন হয়, ততদিন পর্যন্ত সমগ্র জগতের ঔপনিবেশিক সমস্যারই আমরা খুব নিকটে পেঁছিতে পারিব না। এই সমস্যা সমাধানের পক্ষে অদ্যকার পৃথিবীর এক পরম সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অবশ্য ইহা এক দিনেই করণীয় কোনও ঐন্দ্রজালিক সমাধান নহে। পরন্তু সম্ভবপর সময়ের মধ্যে সাধ্য, কার্যকরী সমাধান।

বর্তমান যুদ্ধ ঔপনিবেশিক পদ্ধতির প্রয়োগকে বহুল পরিমাণে সংযত করিয়াছে। পুরাতন পদ্ধতি অথবা মহত্তর নূতন কিছু এতদুভয়ের একতরকে এখন আমাদের বাছিয়া লইতে হইবে। অভিরুচি আমাদের যে দিকেই হউক না কেন, আমেরিকাকে উহাতে জড়াইয়া পড়িতে হইবে। আমেরিকার সাহায্য ব্যতিরেকে জাপানের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে রক্ষা করা ইংলণ্ডের পক্ষে অসম্ভব। আমেরিকাকে মিত্ররূপে লাভ করিয়াই আজ ব্রিটেন, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তাহাদের এশিয়ার উপনিবেশগুলি পুনরুদ্ধার করিতে যাইতেছে। সুতরাং আজ যদি ঐসব উপনিবেশের দেশীয় অধিবাসিগণ ধারণা করে যে, তাহারা পুনরায় ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক বিজিত হইতে যাইতেছে, তবে তাহারা আমেরিকাকেই সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া মনে করিবে। যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে, জাপানের পরাজয় তাহাদের পরাধীনতা মুক্তিরই সূচনা করিতেছে, তবে আমেরিকার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও নির্ভরতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। আর যদি ভারতবর্ষসহ সকল উপনিবেশের অধিবাসিগণই বুঝিতে পারে যে, সাম্রাজ্যবাদ পুনঃস্থাপিত হইয়া চিরদিনের জন্য তাহাদের উপর চাপিয়া বসিতেছে, তবে যে দুরূহ সমস্যার উদ্ভব হইবে, তাহা সমাধানের নিমিত্ত আপনাদিগকে হয় গুলী চালনা অথবা সাত্যকার প্রতিকারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

ঔপনিবেশিক সমস্যার সমাধান করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত। আমি এখানে তাহার পথ নির্দেশ করিতেছি। ফিলিপাইন নীতি সম্প্রসারণ দ্বারা আমরা কার্য আরম্ভ করিতে পারি। উক্ত নীতি অনুযায়ী শাসকশক্তি কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শাসনভার ত্যাগ করিতে বাধ্য। (উল্লাসধ্বনি) এই পদ্ধতিতে শাসকশক্তির একমাত্র লক্ষ্য ও কর্তব্য হইবে জনসাধারণকে যথাসময়ে শাসনভার গ্রহণের যোগ্য করিয়া তোলা। অধীন জাতিগুলি ভাল ছেলে হওয়ার অপেক্ষায় কোনও অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট সময় নির্দেশ করা নিরর্থক। কারণ, ভাল ছেলে হওয়ার কোন সাধারণ মান (Standard) আজ পর্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। অবশ্য, ঔপনিবেশিক প্রথা হঠাৎ উঠাইয়া দেওয়ার কোনও প্রশ্ন আমি উত্থাপন করিতেছি না। কিন্তু যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, যাহাতে অধীন জাতিসমূহ বুঝিতে পারে যে, তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার সময় সন্নিকট,—ইহাতে আর কোন জটিলতা বা অনিশ্চয়তা নাই। দ্রুততম গতিতে চলা অপেক্ষা মন্দগতি অধিকতর ভয়াবহ। অতি ধীরগতিতে যাঁহারা এতকাল চলিয়াছেন, তাঁহারাই ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অধীন রাজ্যসমূহে স্তূপীকৃত প্রচণ্ড বারুদাগারের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন।

ডাম্বার্টন ওক পরিকল্পনা অনুযায়ী অধীন জাতিসমূহের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক পরামর্শ সভা থাকা প্রয়োজন। এই উপায়ে স্বার্থদুষ্ট পক্ষসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইবার জন্য উহারা একটি নিরপেক্ষ সর্বোচ্চ বিচারালয়ের সুযোগ পাইবে। ব্রেটন উড্স প্ল্যান অনুযায়ী—উপনিবেশ অঞ্চলসমূহে জীবনযাত্রার মান উন্নত করা ও উক্ত দেশসমূহকে শিল্পপ্রধান করিয়া গড়িয়া তোলার জন্য একটি আর্থিক পরিকল্পনা আছে। আমেরিকা ও ব্রিটেনের ন্যায় অগ্রসর সাধারণতন্ত্রগুলির পক্ষে অধিক উপার্জনশীল ও সক্ষম ক্রয়েচ্ছুগণের জন্য পণ্য বিপণি সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। ঔপনিবেশিক পৌর শাসকগণের জন্য আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে আবশ্য এমন একটি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থাকা প্রয়োজন, যেখানে উহারা নিশ্চয়তার সহিত বেতন ও পেন্সন দাবী করিতে পারিবে। এই প্রকার একটি আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের পরম প্রয়োজনীয়তা এইখানেই যে, ঔপনিবেশিক শাসকগণ বিশ্বস্ততার ও সদিচ্ছার সহিত অধীন জাতিগুলির ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার জন্য কার্য করিতে পারিবেন এবং সময়-অন্তে চাকুরী গেলেও তাঁহাদিগকে অন্ন সমস্যায় বিব্রত হইতে হইবে না বলিয়া স্বস্তিতেকাল যাপন করিতে পারিবেন। চীন, বহির্মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, ফিলিপাইন ও থাইল্যাণ্ড-এর ন্যায় যে সকল দেশ স্বাধীন, অথবা শীঘ্রই স্বাধীন হইবার প্রতীক্ষায় আছে, সেই সমস্ত দেশের শক্তিশালী স্বাধীনতাকামী দলগুলিকে ঔপনিবেশিক প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে আনয়ন করিতে হইবে। উপনিবেশ অধিকারভোগী জাতিগুলি এইরূপে উক্ত দেশসমূহের অধিবাসীদিগের সৌহার্দ্য লাভ করিবে। তাহাদের বন্ধুত্বলাভ আজ আমাদের পক্ষে অপরিহার্য; আর তাহার একমাত্র পন্থাই হইল যে অভিভাবকত্ব করা অপেক্ষা, তাহাদের পরাধীনতামুক্তিই আমাদের অধিকতর কাম্য, এই বোধ তাহাদিগের মনে জাগ্রত করা (উল্লাসধ্বনি)।

নিয়ামক মিঃ ডেনিঃ—ধন্যবাদ ল্যাটিমুর মহোদয়। আপনাদের সকলের বক্তৃতাই যদিও বিশেষ মর্মস্পর্শী হইয়াছে, তথাপি এখনও আমরা লক্ষ্যস্থলে পেঁছিতে পারি নাই। তাই, আজ বিশেষ আনন্দের সহিত আমি বক্তার আসনে এমন একজনকে আহ্বান করিতেছি, যাঁহার নাম ও কণ্ঠস্বর বেতারশ্রবণকারী লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসীর নিকট সুপরিচিত এবং যিনি আট বৎসরকাল বহু উপনিবেশের অধীন জাতিগুলির মধ্যে বাস করিয়াছেন এবং যাঁহার এই বিষয়ে মূল্যবান

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। তিনি আমাদের সুপ্রসিদ্ধ বেতার সমালোচক ও সংবাদ পরিবেশক মিঃ জন ডবলিউ ভাণ্ডারকুক। আসুন মিঃ ভাণ্ডারকুক।

মিঃ ভাণ্ডারকুক:—সাম্রাজ্য আখ্যায় অভিহিত বিভিন্ন উপায়ে গঠিত এই সমস্ত উপনিবেশ দখলকারী কোম্পানীগুলিকে না জানিয়া যে সকল আমেরিকান বিরূপ সমালোচনা করেন, তাঁহারা আত্মাভিমান ও কপটতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইবার যোগ্য। অবশ্য, একথা বলাই বাহুল্য যে, মিঃ ল্যাটিমুরের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ চলে না। ঊনবিংশশতকেই সর্বাপেক্ষা দ্রুত সাম্রাজ্য বিস্তৃতি ঘটে। আমরা ভুলিয়া যাই যে, আমেরিকা যুক্তরাজ্যও ঠিক অনুরূপ উপায় ও দ্রুতগতিতেই সর্বোত্তম প্রদেশসমূহের সমন্বয়ে স্বীয় বিস্তার সাধন করিয়াছে। সাগরীয় দ্বীপমালা পরিশোভিত, মহাদেশ সেতুবন্ধনী যে পূর্ণ ও বিরাট আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আজ আপনাদের নিকট দীপ্যমান তাহাও সাম্রাজ্যিক-বিস্তৃতিসম্ভূত অতলান্তিক মহাসমুদ্রের তীরবর্তী ত্রয়োদশটি রাজ্য নিয়াই প্রথম গঠিত হয়। বিশ্বশক্তির একই কার্য ও কারণ উভয়স্থলেই স্বপ্রকাশ। খাদ্যোৎপাদন, জনরক্ষা, শিশুপালন ও ভৈষজ্য ব্যবস্থার উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি আবিষ্কার দ্বারা পাশ্চাত্য আক্রমণশীল জাতিসমূহ জনসংখ্যা অভূতপূর্বরূপে বৃদ্ধি করিয়াছে। আর ঠিক একই সময়ে যন্ত্রশিল্পের বিস্ময়কর উন্নতিবশতঃ জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ কর্মহীন হইয়া নিজেদের স্বদেশেই অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এই অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পৃথিবীর শূন্যস্থানগুলি পূরণ করিয়া আসিতেছে। অধিকতর অস্থিরচিত্ত, কৌশলী ও যন্ত্রদক্ষ জনগণ (মানবতার দিক হইতে বিচার করিলে যাহাদের হয়ত তেমন উৎকর্ষ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না) এইরূপে পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত কম জনাকীর্ণ অঞ্চলসমূহে ছড়াইয়া পড়িয়া উপনিবেশ গঠন করিয়া চলিল। যুক্তরাষ্ট্র ও রুশিয়াতে তদুৎ মহাদেশের সংযুক্ত অঞ্চলসমূহকে লইয়া সেই একই ঔপনিবেশিক বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। আর সুস্পষ্ট ভৌগোলিক কারণেই ব্রিটেন, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্স তাহাদের ক্রমবর্ধমান অতিরিক্ত জনসমষ্টি দ্বারা ঐ একই পদ্ধতিতে দূরবর্তী সাগরপারের দেশসমূহে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যে ইহাই একমাত্র প্রভেদ।

মিঃ বুথাব পূর্বেই আমাদিগকে বলিয়াছেন, আবিষ্কার, দেশান্তরে বসতি স্থাপন, বিনিব্যবস্থা, যুদ্ধ, ক্রয়, আলাপ-আলোচনা প্রভৃতি একই প্রকার কারণসমূহ বর্তমানের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির বৃদ্ধির মূলে নির্দেশ করিতেছে। উদার অথচ চঞ্চলচিত্ত লক্ষ লক্ষ আমেরিকান আজ হয় ত মাদাগাস্কার মাদাগাস্কারের অধিবাসীদিগকেই ফিরাইয়া দিতে জেদ করিবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্যালিফোর্ণিয়া ও টেক্সাস মেক্সিকোকে ফিরাইয়া দিবার পক্ষে আপনারা কতজন সম্মতি দিবেন? আমরা এই সকল অঞ্চল কিম্বা হাওয়াই পুয়েের্তো, রিকো এবং পানামা খালের অধিকার কোনও শাঠ্য ক্রীড়া দ্বারা লাভ করি নাই। তথাপি স্থিরমস্তিষ্ক এমন কোনও ব্যক্তি কি আছেন, যিনি বলিতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রকার নীতি দোষদুষ্ট বিবৃদ্ধিও আমাদের ঐ সকল সাম্রাজ্যিক অঞ্চলসমূহে শান্তির সহায়ক হয় নাই? এমন কি কল্পনার অত্যুগ্র বিচ্ছেদপন্থীরাও এখন পর্যন্ত এই যুক্তিতে বিশ্বাসবান যে, আমাদের বিস্তার সবেমাত্র সুরু হইয়াছে। অবশ্য আমরা উপনিবেশ চাহি না একথা সত্য, কারণ বিদেশীয় সাম্রাজ্যবাদীরাই উপনিবেশের ভক্ত ও মালিক। আমরা শান্তি ও আত্মরক্ষার খাতিরে অত্যন্ত সদিচ্ছার সহিতই কেবলমাত্র কয়েকটি ঘাঁটি চাই। কেহ কেহ এই সম্পর্কে হয়ত বলিবেন ঠিক এই একই কারণে ইংরেজরা জিব্রাল্টার, এডেন ও সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়াছে এবং বেশ ন্যায়পরতার সহিতই হয়ত স্মরণ করিবেন যে, দীর্ঘ শতবর্ষব্যাপী বিশ্বশান্তিতে ব্রিটিশের এই সমস্ত অধিকার ও ঘাঁটির অবদান সামান্য নহে। আর এডেন ও জিব্রাল্টার তো আমাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধ জয়ে সাহায্যই করিয়াছে। এই সাহায্য দ্বারা উক্ত ঘাঁটি দুইটি সমগ্র বিশ্বমানবকে সাহায্য করিয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদের সমালোচকগণকে প্রধানত দুইটি দলে ভাগ করা যায়। একদল হইলেন কোনও বিশেষ অঞ্চল সম্বন্ধে ব্যক্তিগত পুঞ্জীভূত তিক্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, অকপট উত্তেজনা-পরবশ, যাঁহারা ঐ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সব কিছু বিচার করেন, আমার ধারণা শ্রীযুক্তা পণ্ডিতও তাঁহাদের মধ্যে একজন; আর বৃহত্তর দলের অন্তর্ভুক্ত হইলেন তাঁহারা, যাঁহারা প্রকৃত বিষয় সম্পর্কে যৎসামান্য জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও হৃদয়াবেগে সহজেই উদ্বেলিত হইয়া পড়েন। প্রথমোক্ত দলের বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নাই—মনুষ্য চরিত্রের দোষ-ত্রুটির ন্যায় সাম্রাজ্যও বহু দোষত্রুটিতে পূর্ণ। সাম্রাজ্যের ত্রুটি ও অপরাধ অমার্জনীয়। নিঃসংশয়ে ইহার সংশোধন প্রয়োজনীয়। কোনও কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদের কার্যকারিতা নিঃশেষিত হইয়াছে। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যগুলিতে শান্তিপূর্ণভাবে যে উন্নততর পরিবর্তন সম্ভব হইয়াছে, অন্যান্য অঞ্চলেও রাজনৈতিক সংগঠনের অনুরূপ পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু উত্তেজনার আতিশয্যে স্নানের জল সহ শিশুটিকেও আমাদের দূরে নিক্ষেপ করা সঙ্গত হইবে না। কমপক্ষেও পৃথিবীর জনসংখ্যার অন্তত শতকরা পনের ভাগ, যাহারা গ্রীষ্মমণ্ডলের অধিবাসী এখন পর্যন্ত সংস্কৃতি ও সভ্যতার সাধারণ স্তরে আসিয়া পৌঁছায় নাই। আমাদের উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগ সত্ত্বেও ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে, নিউগিনি, সোলোমন এবং আফ্রিকার বহু স্থান, যেখানে প্রতিটি নদীর পরপারের ভাষা পৃথক এবং প্রত্যেক পর্বতের অপর পৃষ্ঠেই জনগণের অভ্যাস ও রীতিনীতির অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, সেই সকল অঞ্চলে আজও কোন সাধারণ জাতীয়তার উন্মেষ, সাম্প্রদায়িক উচ্চাকাঙ্ক্ষা অথবা স্বাধীন রাজ্য সম্বন্ধে কোনও ধারণা গড়িয়া উঠে নাই। ঐ সকল স্থানে বর্তমান সাম্রাজ্য নীতির হঠাৎ ধ্বংস স্থানীয় অধিবাসিগণের মন্থর উন্নতিকে ব্যাহত করিবে যদিও হয়ত তাহাতে পাশ্চাত্য জনগণের সহিত রাজনীতি ও শিল্পসাম্যে যথাসম্ভব গতি বিশেষ ব্যাহত হইবে না। কিন্তু ইহাতে তাহাদের স্বাধীনতা আসিবে না। বরং তৎপরিবর্তে উহারা বর্তমান ঔপনিবেশিক শাসন কর্তৃপক্ষের দ্বারা যতটা না হইয়াছে পৃথিবীর রক্তপিপাসু কুচক্রীদের দ্বারা তদপেক্ষাও অধিক মাত্রায় শোষিত, অত্যাচারিত ও শৃঙ্খলিত হইবে।

প্রত্যেকটি পদ্ধতিকেই তাহার অন্যতর বিকল্প দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বৃহৎ অঞ্চলসমূহে সাম্রাজ্য নীতির অপহ্নব ঘটিলে অরাজকতার সৃষ্টি হইবে। জনাকীর্ণ রাজপথে নিক্ষিপ্ত স্বর্ণমুষ্টির যে পরিণাম, বৃহৎ শক্তিসমূহের প্রভাব-বিমুক্ত অধিকাংশ উপনিবেশগুলির পরিণামও তাহাই,—অর্থাৎ পুনরায় অর্ধশতাব্দীর জন্য সমস্ত শান্তি বিসর্জন দিয়া দাঙ্গাহাঙ্গামা, যুদ্ধবিগ্রহ ও অরাজকতার মধ্যে ডুবিয়া থাকা (উল্লাসধ্বনি)।

(ক্রমশ

অনুবাদক—**শ্রীবিভূতিভূষণ বসু**

দেশের কথা

৮ই আশ্বিন—১৪ই আশ্বিন

সৈনিকদিগের অত্যাচার—খাদ্যদ্রব্য অপচয়—দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা—বাঙলার গভর্নর—সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

সৈনিকদিগের অত্যাচার—মেদিনীপুরে সাঙ্গা-বাজার হইতে মিস্টার এস এস রহমান জানাইয়াছেন যে তাঁহাদিগের গৃহে সৈনিক-দিগের প্রহারের ফলে ৩ বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা আহত হয় এবং সে জ্বরভোগ করিতেছে; ৮ ও ১২ বৎসর বয়স্ক বালক-দ্বয়েরও অবস্থা ঐরূপ। ঐ গৃহে সৈয়দ মহম্মদ সালাম, সৈয়দ আজিজুর রহমান ও সৈয়দ লুৎফর রহমান—সকলেই প্রহৃত হন।

খুলনা হইতে গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ৯ই সেপ্টেম্বর রামপাল থানার এলাকাস্থ চিলাহাটে সংঘটিত একটি ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ৯ই তারিখ কতকগুলি বন্দুক ও ছোরাধারী সৈনিক চিলাহাটে যাইয়া দোকানদারদিগের জিনিস লইয়া মূল্য দিতে অস্বীকার করে। তাহারা রতিকান্ত বিশ্বাসের নিকট হইতে ১০।১২টি ইলিশ মাছ লইয়া মূল্য দিতে অস্বীকার করে এবং রতিকান্ত ও আর একজন তাহাদিগের ব্যবহারের প্রতিবাদ করিলে একজন সৈনিক গুলী ছোড়ে ও তাহাতে রতিকান্ত ও আর একজন আহত হন। তাহারা আর এক ব্যক্তিকে ধরিয়া বলপূর্বক তাহাদিগের নৌকায় লইয়া যাইয়া এমন প্রহার করে যে, তাহাকে ও গুলীতে আহত ব্যক্তিদ্বয়কে সদর হাসপাতালে চিকিৎসার্থ লইতে হইয়াছে।

ঢাকা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তথায় পিপলস্ এসোসিয়েশন এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, শহরের নানা-স্থানে সৈনিকরা যে ঘৃণ্য ব্যবহার করিয়াছে, তাহাতে শহরে আতঙ্কের উদ্ভব হইয়াছে—এমন কি স্ত্রীলোকেরা ইতস্ততঃ গমনাগমন নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছেন না। বিরূপ অবস্থা না ঘটিলে এসোসিয়েশন ঐরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

খাদ্যদ্রব্য অপচয়—নোয়াখালীর 'দেশের বাণী' **সংবাদ দিয়াছেন**—ব্যবহারের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত প্রায় একশত ত্রিরিশ মণ জমাট দুগ্ধ সরকারী গুদাম হইতে নদীতে ফেলিয়া দেওয়া **হইয়াছে**। ঐ দুগ্ধ বড় বড় পিপায় **ছিল**। বলা বাহুল্য, এদেশে সামরিক ও অন্যান্য কারণে গো-দুগ্ধের একান্ত অভাব ঘটায় রোগী, শিশু এবং আসন্নপ্রসবা ও সন্তানকে স্তন্যদানকারিণী স্ত্রীলোকদিগকে প্রদান করিবার জন্য বিদেশ হইতে জমাট দুগ্ধ আমদানী করা হইতেছে এবং অনেক স্থানে তাহা বিনামূল্যে প্রদান করা হইতেছে। যে খাদ্যদ্রব্য নিতান্ত প্রয়োজনহেতু অর্থব্যয়ে বিদেশ হইতে আনিয়া লোকের জীবনরক্ষার চেষ্টা হয়, যাঁহাদিগের অব্যবস্থায় তাহা লোককে না দিয়া বিকৃত করা হয়, তাহাদিগকে কি দণ্ড-দানের কোন ব্যবস্থা নাই? এই সংবাদ গত ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রেরিত হইয়াছে। এ বিষয়ে কি বাঙলা ও ভারত সরকারের বলিবার কিছুই নাই?

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের সংবাদদাতা কিশোরগঞ্জ হইতে সংবাদ পাঠাইয়াছেন—

সরকারী গুদামে ২ বৎসরের অধিককাল পড়িয়া থাকায় যে এক হাজার চারশত মণ আটা বিকৃত হইয়াছিল, তাহা মানুষের অখাদ্য বলিয়া স্থানীয় হাসপাতালের নিকটস্থ জলায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ বিকৃত আটার দুর্গন্ধে সমগ্র পল্লীর স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ন হইয়াছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে বোটানিক্যাল গার্ডেনে উন্মুক্ত স্থানে ফেলিয়া রাখিয়া বহু টাকার চাউল পচাইয়া, দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন কলিকাতায় আসিলে জলায় ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিশোরগঞ্জে আটা সরকারী গুদামে সযত্নে ২ বৎসরেরও অধিককাল সঞ্চিত রাখিয়া **বিকৃত হইবার পরে জলায় ফেলিয়া** দেওয়া **হইয়াছে**।

বাঙলার গভর্নর—বাঙলার গভর্নর মিস্টার কেসী বিলাতে গিয়াছেন। তিনি আর বাঙলায় গভর্নর থাকিবেন কি না, তাহা লইয়া অনেক **জল্পনা-কল্পনা হইয়াছে। সিডনী হইতে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে**, তিনি বাঙলার গভর্নরের পদ ত্যাগ করিতেছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন, তিনি বাঙলায় বিশেষ সুখে নাই। তিনি নাকি বাঙলায় গভর্নরের পদ কায়েমীভাবে গ্রহণ করিতে চাহেন নাই; সামরিক প্রয়োজনে বাঙলার গভর্নর হইয়া আসিয়া-ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। তবে তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবেন এবং বর্তমান বৎসরের শেষ পর্যন্ত গভর্নর থাকিয়া স্বদেশে (অস্ট্রেলিয়া) ফিরিয়া যাইবেন। তাঁহার পরে কে বাঙলার গভর্নর হইয়া আসিবেন, তাহা এখনও বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডলের বিবেচনার বিষয়। তবে **বাঙলায় নাকি বর্তমান রাজনীতিক অবস্থায়—সাম্প্রদায়িক বিরোধহেতু কোন ভারতীয়কে গভর্নর করা হইবে না।**

ধর্মঘট—দীর্ঘ **৯** দিন পরে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা ট্রামের কর্মীদিগের ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে। এই ধর্মঘটে ৮ হাজার লোক লিপ্ত থাকিলেও কোনরূপ অশান্তির উদ্ভব হয় নাই। ট্রাম কোম্পানীর সহিত যে সকল বিষয় লইয়া কর্মীদিগের মতভেদ হইয়াছিল, সে সকলের মীমাংসার জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। উভয়-পক্ষের সম্মতিক্রমে সমিতির গঠন হইয়াছে। যাহারা "বোনাস" পাইতেছে, তাহারা ব্যতীত আর কাহারা তাহা পাইবে; ১৬৪নং কণ্ডাক্টরকে চাকুরীতে আবার বহাল করা হইবে কি না এবং বহাল করা হইলে কি সর্তে তাহা হইবে; রামকমল ঘোষকেও আবার বহাল করা হইবে কি না; ৭৯৬নং কণ্ডাক্টরের সম্বন্ধে শৃঙ্খলারক্ষার্থ অবলম্বিত অভিযোগ প্রত্যাহার করা হইবে কি না—মীমাংসা সমিতি এই সব স্থির করিবেন।

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর কাশীপুর গান অ্যাণ্ড সেল ফ্যাক্টরীর বহু কর্মী ধর্মঘট করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ফ্যাক্টরীর শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক জানাইয়াছেন—যুদ্ধ শেষ হওয়ায় ইতোমধ্যেই প্রায় ২ হাজার ৫ শত শ্রমিককে বিদায় দেওয়া **হইয়াছে। সেইজন্য** শ্রমিকরা নিম্নলিখিত দাবী জানাইয়াছেন:—

(১) যাহাদিগকে বিদায় দেওয়া হইবে, তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে সার্টিফিকেট, প্রাপ্য বেতন ও **প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের প্রাপ্য** টাকা দিতে হইবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে প্রতিশ্রুত সঙ্কটকালীন বোনাস **এবং জয়ের বোনাস অবিলম্বে দিতে হইবে।**

(৩) যাহাদিগকে বিদায় দেওয়া **হইবে**, তাহাদিগের প্রত্যেককে **৩** মাসের **বেতন** দিতে **হইবে**।

(৪) **ফ্যাক্টরীতে সমর-সরঞ্জাম প্রস্তুত বন্ধ** করিয়া শান্তিকালীন পণ্য **উৎপাদনের** ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরিচালকগণ এই বিষয়ে অবহিত না হওয়ায় ধর্মঘট **হইয়াছে। প্রকাশ, তাঁহারা শেষে প্রথম ২ দফায় সম্মত ও শেষ ২ দফায়** অসম্মত হইয়াছেন।

সিপাহী নিয়োগ—বিহারের কোন সংবাদ-পত্রে প্রকাশ, বিহার হইতে সেনাদলে যোগদানকারী ৬।৭ হাজার লোক **সমরান্তে** কৃষিকার্য শিক্ষাদান করিতে ইচ্ছা **জ্ঞাপন** করিয়াছেন। বিহারের প্রাদেশিক সরকার তাঁহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন **কৃষিক্ষেত্রে** তাঁহাদিগকে কৃষি-বিষয়ে **শিক্ষা-দানের পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাহারা**

৬ মাস শিক্ষালাভ করিবে— সে সময়ে উপযুক্ত ভাতা পাইবে এবং তাহার পরে সরকারের বিস্তারপ্রাপ্ত কৃষিবিভাগে কামদার অর্থাৎ শ্রমিক হইবে।

বিহার সরকার ও দামোদর উপত্যকা—বন্যা-নিবারণ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতির জন্য দামোদর নদ সম্বন্ধে যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, বিহার সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ নাকি তাহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন—সেই পরিকল্পনানুযায়ী কাজ হইলে—ম্যালেরিয়া বিস্তারলাভ করিবে এবং বন্যায় অনেক স্থানে লোক বিপন্ন হইবে।

সরকারের নীতির নিন্দা—পুণার সংবাদে প্রকাশ, (২৫শে সেপ্টেম্বর) মিস্টার জয়াকর, কুমার স্যার জগদীশপ্রসাদ ও স্যার গোপাল স্বামী আয়ার এক যৌথ বিবৃতিতে ভারত-সচিবের ও বড়লাটের নূতন প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন ঃ—

"মনে করা অসংগত নহে—বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য—ভারতের অত্যাবশ্যক সমস্যার সমাধান সাধনে অন্তত আরও ৭।৮ মাস বিলম্ব করিয়া পরে আবার অচল অবস্থার উদ্ভব হইলে আপনাদিগকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য বলা—তাঁহারা ভারতীয়দিগকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিয়া প্রদানের জন্যই আগ্রহান্বিত; কিন্তু ভারতীয় নেতাদিগের মতভেদের জন্যই তাঁহাদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হইল।"

ব্যবস্থা পরিষদসমূহের সদস্য নির্বাচনের কয়মাস পূর্বেই পরিষদের অবসান ঘটাইয়া কেবল সকল প্রদেশে স্বৈরশাসন অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। সিমলায় যে বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে, তাহার ফলে যে বৃটিশ সরকারের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। বৃটিশ সরকারের ভাব দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা আবার মিস্টার জিন্নাকে তাঁহার পাকিস্থানের দাবী উপস্থাপিত করিবার সুযোগ প্রদান করিবেন।

পণ্ডিত জওহরলালের পরিকল্পনা—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর বোম্বাই নগরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার স্বাধীন ভারতের ব্যবস্থা-পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান কথা—রাষ্ট্রের পক্ষে সরকার দেশে সকল বৃহৎ শিল্পের ও খনিজ সম্পদের অধিকারী হইবেন; বৃহৎ না হইলেও যে সকল শিল্পের প্রয়োজন অধিক, সে সকল সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইবে; জমিদারী প্রথার উচ্ছেদসাধন করিয়া সমবায় নীতিতে সুসংবদ্ধভাবে ভূমি চাষের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে হইলে দেশে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত উটজ শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই—দেশের উভয়প্রকার শিল্পেরই স্থান আছে। গ্রামে শিল্পের উন্নতিসাধনের সুযোগ যথেষ্ট আছে। তিনি বলিয়াছেন, সাম্প্রদায়িক বিরোধ যে বৃটিশের সৃষ্ট তাহা নহে, তবে বৃটিশের শাসন-নীতির ফলে তাহা বর্ধিত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ৪টি উপায় আছে—(১) সকল সম্প্রদায়কে কোন ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করা, (২) আপনাদিগের মধ্যে যুদ্ধ, (৩) সকল সম্প্রদায়ের সম্মতি অনুসারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ, (৪) কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা মীমাংসা। তিনি বলেন, এখন ভারতীয় সমস্যা কেবল বৃটেনের সহিত ভারতের সম্বন্ধে নিবদ্ধ নহে। এখন পৃথিবীর দেশসমূহ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘে বিভক্ত হইতেছে; যে সংঘ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করিবে, ভারতবর্ষ যে সেই সংঘের পক্ষপাতী হইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ভারতবর্ষ যে পক্ষ অবলম্বন করিবে, সেই পক্ষেরই বল বৃদ্ধি হইবে।

সামরিক বন্দীশালায় হাঙ্গামা—গত ২৫শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার নিকটে কোন সামরিক বন্দিশালায় হাঙ্গামায় রক্ষীরা গুলী চালাইতে বাধ্য হয়—ফলে ৫ জন নিহত ও ৯ জন আহত হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণে লোককে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষের আশংকা—স্যার উইলিয়ম ষ্টাম্প—ভারত সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের সেচ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। তিনি বিলাতে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—যদি অবিলম্বে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার অনুপাতে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা না হয়, তবে শীঘ্রই বাঙলায় আবার দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। তিনি বলিয়াছেন, হিসাবে দেখা যায়—লোকের যে পরিমাণ খাদ্য প্রয়োজন, ভারতে ১৫ কোটি লোক তাহার দুই-তৃতীয় ভাগ মাত্র খাদ্য খাইতে পায়। তিনি ভারতের সলিল সম্পদের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিয়া এই অবস্থার প্রতিকার করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

মিস্টার কার্বি ভারত সরকারের খাদ্যদ্রব্য বণ্টন বিষয়ে পরামর্শদাতা। তিনি গত ২৮শে সেপ্টেম্বর করাচীতে বলিয়াছেন, তিনি বাঙলায় খাদ্যদ্রব্যের বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতে পারেন, যাহাতে বাঙলায় আবার দুর্ভিক্ষ না হয়, ভারত সরকার ও বাঙলা সরকার সেজন্য আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করিয়াছেন, ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্যন্ত "রেশনিং" থাকিবে এবং প্রয়োজন হইলে তাহা আরও অধিককাল চালানো হইবে।

যখন চাউলের সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্য ১৫, টাকা মণ, তখনও যদি দুর্ভিক্ষ বলা না যায়, তবে মিস্টার কার্বির মতে দুর্ভিক্ষ কাহাকে বলে?

বোম্বাইএ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—গত ২৫শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে বোম্বাই শহরের মুসলমানপ্রধান জাম্ভানী মহল্লায় অতর্কিত-ভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হইয়া নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে ব্যাপ্তিলাভ করে। দাঙ্গার প্রকৃত কারণ জানা যায় নাই। ২৯শে সেপ্টেম্বরের সংবাদ—দাঙ্গা আয়ত্তে আসিয়াছে। ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিসাব—৩০ জন লোক নিহত ও একশত চল্লিশ জন আহত হইয়াছে।

দাঙ্গা সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, "যদি পুলিস কমিশনার ও পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টদিগকে বলা হয়, দাঙ্গা হইলে তাঁহাদিগের চাকুরী যাইবে; তবে দাঙ্গা হয় না। যদি গুণ্ডা শ্রেণীর লোকরা যথেচ্ছা কাজ করিতে পারে, তবে বড় শহরে দাঙ্গা বাধান সহজসাধ্য।"

ওদিকে বিলাতের সংবাদপত্রে দাঙ্গার জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করিয়া যে হীন প্রচারকার্য পরিচালিত হইতেছে তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বলা হইয়াছে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতি মুসলিম লীগ সম্বন্ধে যে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতেই এই দাঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে। এইরূপ প্রচারকার্য দ্বারা বৃটিশ জনগণকে বুঝাইবার চেষ্টা হইতে পারে যে, সাম্প্রদায়িক বিরোধহেতু ভারতবর্ষে শাসন-সংস্কার বাধা পাইবে।

শরৎচন্দ্র বসু—শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু গত ১লা অক্টোবর বোম্বাই হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বোম্বাই শহরে এসিয়ার স্বাধীন দেশসমূহের সঙ্ঘ গঠনের প্রয়োজন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি প্রতীচীর দেশ-সমূহের ঘোষণায় আস্থা স্থাপন করেন না। মুক্তির জন্য আরব্ধ বলিয়া যে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহা প্রাচীর জাতিসমূহকে অধীন রাখিবার উপায়। তিনি বলিয়াছেন—(১) ভারতবর্ষ স্বাধীনতা ব্যতীত সন্তুষ্ট হইবে না; (২) যে যে দেশ প্রাচীতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাকে দণ্ডদান করা চলিবে না।

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

যদিও সরকারের মতে বাঙলায় আর দুর্ভিক্ষ নাই, তথাপি দেশের লোক যে অনুভব করিতেছে—দুর্ভিক্ষের অবস্থা হইতে তাহারা অব্যাহতি লাভ করে নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কারণ, খাদ্যদ্রব্য—দুর্মূল্যতাহেতু—দুষ্প্রাপ্য। পুনর্গঠনের কার্য উল্লেখযোগ্য নহে। বাঙালীর প্রধান খাদ্য চাউলের মূল্য সরকারের ব্যবস্থাহেতুই দুর্মূল্য। তাহার উপর যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যা যটিল ও প্রবল ভাবেই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। সরকার যে বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি করিয়াছেন, বাঙলার লোক তাহাতে আপত্তি করিয়াছে ও করিতেছে।

এই অবস্থায় বিলাতে ভারতে সেচ সম্বন্ধে সরকারের পরামর্শদাতা স্যার উইলিয়ম ষ্ট্যাম্পে বিলাতে "ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের" এক সভায় মত প্রকাশ করিয়াছেন—"যদি অবিলম্বে জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা না হয়, তবে বাঙলার দুর্ভিক্ষের ভীষণ অবস্থা আবার দেখা দিবে।" তিনি বলিয়াছেন, জনসংখ্যার অনুপাতে খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা না থাকায় লোকের জীবনযাত্রা নির্বাহের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এবং ভারতবর্ষে ১৫ কোটি লোক আবশ্যক খাদ্যদ্রব্য পায় না। একথা স্যার চার্লস এলিয়ট বহুদিন পূর্বে বলিয়াছেন, বিদেশ হইতে বহু পরিমাণে শস্য আমদানি দুর্ভিক্ষ দমনের স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে চলিতে পারে না—ভারতের সলিল-সম্পদের সদ্ব্যবহার করিয়া খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন-বৃদ্ধি ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান হইবে না। তিনি বলেন, অবিলম্বে আরও এক কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে চাষের ব্যবস্থা করিয়া প্রতি বৎসর অতিরিক্ত ২০ লক্ষ একর "পতিত" জমি "উঠিত" করা প্রয়োজন।

কিন্তু স্যার উইলিয়ম একটি কথা বলেন নাই। তিনি সেচের সুব্যবস্থার যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ করিলে জমিতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বর্ধিত হইবে এবং সেই কারণে অপেক্ষাকৃত অল্প জমিতে অধিক শস্য উৎপন্ন হইবে। উৎকৃষ্ট বীজ ও সার ব্যবহার করিলে ফল যে ভাল হয়, তাহা বলা বাহুল্য। আর আমেরিকায় টেনেসি উপত্যকায়ও তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। তথায় উৎপন্ন তুলা প্রতি একরে ২৭৫ পাউণ্ড হইতে ৪০০ পাউণ্ড এবং শস্য ২০ বুশেল হইতে ৩০ বুশেলে দাঁড়াইয়াছে—ইত্যাদি।

কিন্তু স্যার উইলিয়ম যে আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যে ভিত্তিহীন তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারত সরকারের খাদ্য সেক্রেটারী মিঃ বিনয়রঞ্জন সেন হইতে আরম্ভ করিয়া "রেশনিং" পরামর্শদাতা মিঃ কার্বি পর্যন্ত উৎসাহী হইয়াছেন।

মিঃ কার্বি বলিয়াছেন, কেন্দ্রীয় সরকার ও বাঙলা সরকার—যাহাতে বাঙলায় আর ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পুনরাবির্ভাব না হয়, সেজন্য "তোড়জোড়" করিয়াছেন: সে বৎসর খাদ্যদ্রব্য বণ্টনের ও শস্য সঞ্চয়ের যে সুব্যবস্থা ছিল না, এখন তাহা হইয়াছে।

খাদ্য বণ্টনের যে ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি—বিদেশী—ভারত সরকারের পরামর্শদাতৃরূপে ভারত হইতে অনেক টাকা বেতন পাইয়াছেন, তাহার সুফলে চাউলের মূল্য হ্রাস পাইয়াও ১৫ টাকা মণে স্থির থাকিয়া দরিদ্র বাঙালীকে যেন উপহাস করিতেছে—গুদামে চাউল মজুদ আছে—কিন্তু দাম ১৫ টাকা মণ। সে মূল্য দিবার ক্ষমতা যাহার নাই সে ত "বেঁচে মরে" আছে—তাহার মৃত্যুতে বিস্ময়ের কি থাকিতে পারে। এ যেন সেই—

"Water, water everywhere,
Not a drop to drink."

যেদিন সংবাদপত্রে মিঃ কার্বির "অভয় বাণী" প্রকাশিত হইয়াছে, সেইদিনই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে হাওড়া চেঙ্গাইল পাট-কলে কোন শ্রমিক নারী একখানি বস্ত্র ক্রয়ার্থ তাহার সন্তান বিক্রয় করিয়াছে এবং বাগনান গ্রামে চিকিৎসকগণ কোন গৃহে রোগীর চিকিৎসার জন্য গমন করিলে তাহাদিগকে পূর্বে সংবাদ দিয়া যাইতে হয়; কারণ, গৃহস্থরা বস্ত্রাভাবে প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় বাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন। যে স্থানের বস্ত্রের অভাব এইরূপ তথায় অন্নের অভাব সহজেই অনুমেয়।

মিঃ কার্বি য়ুরোপীয়, মিঃ সেন ভারতীয়। মিঃ সেন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন-

(১) এবার বাঙলায় আশু ধান্যের ফসল শতকরা ৭০ ভাগ ও হৈমন্তিক ধান্যের ফসল শতকরা ৮০ ভাগ পাওয়া যাইবে। কিন্তু যে ধান্য ও চাউল উৎপাদনকারীদিগের ঘরে মজুদ আছে ও সরকারী গুদামে আছে—তাহার ফলে শস্য সঞ্চয়ের ও প্রেরণের ব্যবস্থার উন্নতি বিবেচনা করিলে বলা যায়—ভয় নাই। বিশেষ ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশ হইতে চাউল আমদানীও হইবে।

(২) যাহাতে সঞ্চিত চাউল বিনষ্ট না হয়, কেবল সেই জন্যই বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি করা হইয়াছে। তাহার স্থানে নূতন চাউল পাওয়া যাইতেছে।

(৩) প্রয়োজন হইলেই ভারত সরকার শস্য দিয়া বাঙলাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন।

নানাস্থান হইতে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে মনে করা অসঙ্গত নহে যে, আশু ধান্যের ও হৈমন্তিক ধান্যের ফলনের যে হিসাব মিঃ সেন দিয়াছেন, তাহা নির্ভরযোগ্য কি না সন্দেহ। তিনি অবশ্যই সরকারী হিসাবে নির্ভর করিয়া ঐ কথা বলিয়াছেন। কিন্তু সরকারই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের হিসাবের অনেক ত্রুটি আছে। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনও তাহা বলিয়াছেন এবং ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের পূর্বে যে ভারত সরকারের তৎকালীন খাদ্যসদস্য বলিয়াছিলেন——বাঙলায় এত অধিক ধান্য উৎপন্ন হইবে যে "দেশ বিদেশে" বাঙলা অন্ন বিতরণ করিতে পারিবে, তাহাতেও সরকারী হিসাবের নির্ভরযোগ্যতায় সন্দেহ ঘটে।

ভারত সভার সভাপতি ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-সচিবকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছেন—এবার পূর্ববঙ্গে যেমন পশ্চিম বঙ্গেও তেমনই অবস্থা আশংকা-জনক। গত ১৬ই সেপ্টেম্বর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, বাঁকুড়া জিলার কয়েকখানি গ্রাম হইতে প্রায় ৫ হাজার নরনারী অন্নাভাবে পীড়িত হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অবস্থা জানাইতে আসিয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, তিনি পূর্বেই সরকারকে অবস্থা জানাইয়া অধিক চাউল পাঠাইতে লিখিয়াছেন। অনেক গ্রামে অধিক মূল্য দিয়াও চাউল পাওয়া যায় না।

ডক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারকে "ফেমিন কোডের" ব্যবস্থাবলম্বন জন্য প্রস্তুত থাকিতে বলিয়াছেন।

কলিকাতার মেয়র বাঁকুড়ায় সাহায্য প্রদান-ব্যবস্থার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় ম্যাজিস্ট্রেটের সহিতও আলোচনা করিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—যদি আশ্বিন মাসে বৃষ্টি হয়, তবে ১৯টি থানার ১৫টিতে স্বাভাবিক ফসলের শতকরা ৮০ ভাগ ফলিতে পারে। অবশিষ্ট ৪টি থানার এলাকায় বোধ হয়, রোগ "শিবের অসাধ্য"। ম্যাজিস্ট্রেট বলিয়াছেন—সাহায্যদান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা না করার কারণ—

(১) চাউলের অভাব হইলে মূল্য দ্রুত বাড়িত হইত।

(২) পারিশ্রমিকের হার হ্রাস পায় নাই।

তিনি যে অবস্থা ঘটিলে তবে সাহায্যদান-ব্যবস্থা করা প্রয়োজন মনে করেন সে অবস্থা ঘটিলে কত লোক অনাহারে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে, তাহা কি তিনি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন?

মেয়র মহাশয় ম্যাজিস্ট্রেটের যুক্তি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

(১) ৪টি থানার এলাকার অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে।

(২) বাঁকুড়া হইতে চাউল রপ্তানি বন্ধ করা ও তথায় পীড়িত অঞ্চলে চাউল আমদানী করা কর্তব্য।

মিস্টার সেন ফসল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত স্থানীয় সংবাদের সামঞ্জস্য সাধিত হইতেছে না।

তিনি একমুখে বলিয়াছেন শস্য সঞ্চয়ের ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়াছে, আর একমুখে বলিয়াছেন, বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি করিবার কারণ—অনেক চাউল ব্যবহার করিয়া ফেলিতে না পারিলে বিকৃত হইবে। যদি সঞ্চয়ের বহু ব্যয়সাধ্য ব্যবস্থাও বিকৃতি নিবারণ করিতে না পারে, তবে সঞ্চয়-ব্যবস্থার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় কি অপব্যয়-পর্যায়ভুক্ত করা যায় না? মিস্টার সেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া হইলেও ভারতীয়। তিনি কি জানেন না, এদেশে কৃষকগণ দীর্ঘকাল শস্য অবিকৃত রাখিবার উপায় অবগত আছে? যদি এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বিদেশী বিশেষজ্ঞ আনিয়া বহু ব্যয় করিবার পূর্বে এদেশের লোকের শস্যসংরক্ষণ ব্যবস্থার বিষয় জানিবার চেষ্টা করা হইত, তবে কি ভাল হইত না? মিস্টার সেন নিশ্চয়ই বাঙলায় ধান্য রক্ষার গোলা বা মরাই দেখিয়াছেন—সে সকলে কিভাবে ধান্য মজুদ রাখা হয়, তাহা কি জিজ্ঞাস্য নহে? সরকারী গুদামে উপরে টীনের তাপে ও নিম্নে ভূমির আর্দ্রতায় চাউল অতি অল্পকাল মধ্যেই বিকৃত হয়। গোলায় তাহা হয় না। রাঢ়ে কোন কোন জমীদারের ও মহাজনের গৃহে শতাধিক গোলাও দেখা যায়। সে সকলে বৎসরের পর বৎসর ধান্য সঞ্চিত থাকে। সেজন্য বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনিতে হয় না। কেন দেশের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই, তাহা কি বাঙলার লোক জিজ্ঞাসা করিতে পারে না?

যদি ইহাই সত্য হয় যে,

(১) শস্যের অভাবে দুর্ভিক্ষের আশংকা নাই; এবং

(২) বাঙলায় এত চাউল মজুদ হইয়াছে যে, রপ্তানি না করিলে অনেক চাউল বিকৃত হইবে—

তবে কেন—বাঙলার চাউলে বাঙলায় নিঃস্ব ও দুর্দশাগ্রস্ত অধিবাসিগণের অধিকারই সর্বাপেক্ষা অধিক—ইহা স্বীকার করিয়া—চাউলের মূল্য হ্রাস করা হয় নাই?

বাস্তবিক বাঙলার বহু লোক এক বেলা পূর্ণাহার সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না। এবার যে ইতিমধ্যেই নানাস্থানে ম্যালেরিয়া ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, লোকের দৌর্বল্য কি তাহার অন্যতম প্রধান কারণ নহে। দুর্ভিক্ষ হেতু দুর্বল লোক যে ম্যালেরিয়ার কোপে পতিত হয়, তাহা বিবেচনা করিয়াই ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষকালে বড়লাট লর্ড নর্থব্রুকের সরকার পূর্ব হইতেই চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন; কিন্তু লোক অন্নাভাবে দুর্বল হয় নাই বলিয়াই রোগ বিস্তৃত হইতে পারে নাই। সেবার সরকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরাও সফরে যাইয়া গ্রামের নরনারী শিশুদিগকে একত্রিত করিয়া—তাহারা শীর্ণকায় হইয়াছে কিনা তাহা দেখিবেন এবং দেখিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিবেন। আর এবার? এবার অনাহারে মৃতদিগের শব অপসারিত করিবার লোকের অভাব ছিল এবং যখন পরবর্তী ফসল হয়, তখনও ক্ষেত্রে কংকাল দেখা গিয়াছিল।

আর সরকারের যে "অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন কর" আন্দোলনে মেঘের জলের মত অর্থ ব্যয়িত হইয়া অনেকের উন্নতির কারণ হইয়াছে, তাহার ফল কি হইয়াছে? দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনও বলিয়াছেন—সেচের ব্যবস্থার ও সারের অভাবে সেই আন্দোলনের ফল উল্লেখের যোগ্যও হয় নাই। কিন্তু তাহাতে কত টাকা ব্যয় হইয়াছে?

কয় বৎসর সেই আন্দোলনে অর্থ ব্যয়ের পরেও যে মিস্টার সেনকে বলিতে হইয়াছে—ব্রহ্ম ও সুদূর প্রাচীর দেশসমূহ হইতে চাউল আমদানী হইলে, বাঙলায় আর অভাব থাকিবে না, তাহাতেই কি বুঝিতে পারা যায় না—সে আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে? যদি তাহাই হয় তবে কি তাহার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে?

মিস্টার কার্বি ও মিস্টার সেনের অভয়-বাণী যদি নির্ভরযোগ্য হয়, তথাপি কি লোক তাহাতে নির্ভর করিতে দ্বিধানুভব করিতে পারে না? ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের অভিজ্ঞতা—তিক্ত অভিজ্ঞতা কি বাঙলার লোক ভুলিতে পারিয়াছে? দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন বলিয়াছেন, যখন সকলেই অনুভব করিতেছিল, খাদ্যদ্রব্যের অভাব তখনও যে সরকার অভাব নাই বলিয়া প্রচারকার্য পরিচালিত করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই তাহা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

"We consider that this propaganda of sufficiency was quite ill-adviced."

তাহাতে যেমন—সর্বদলীয় সচিব সঙ্ঘের অভাবে তেমনই লোকের আস্থা নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এবার সর্বদলীয় সচিবসংঘ গঠনের কোন কথাই নাই—বাঙলার গভর্নর স্বৈরশাসন পরিচালিত করিতেছেন; ব্যবস্থা পরিষদ নাই—তথায় অবস্থার আলোচনা হইতে পারে না।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন স্বীকার করিয়াছিলেন—অভাব নাই একথা যে তাঁহারা বলিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁহারা জ্ঞানপাপী। ভারত সরকারের খাদ্য-সদস্য স্যার মহম্মদ আজিজুল হক তাহা স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি, দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের উক্তির মধ্যে পড়িবেন।

সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া—যে প্রদেশে অনশনে ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে, সেই প্রদেশের লোক যদি জিজ্ঞাসা করে—মিস্টার কার্বির ও মিস্টার সেনের উক্তি এবং ইতঃপূর্বে বাঙলার গভর্নর মিস্টার কেসী যে বলিয়াছেন—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ আবার উদ্ভূত হইবে না তাহাও—সরকারের প্রচারকার্য নহে ত, তবে কি লোককে দোষ দেওয়া সম্ভব হইতে পারে?

লোকের মনে আস্থা সৃষ্টি করিতে হইলে সর্বাগ্রে দেখাইতে হইবে—চাউলের মূল্যহ্রাস হইয়াছে এবং বণ্টনের ব্যবস্থার যে প্রশংসা মিস্টার সেন করিয়াছেন তাহার জন্য বাঁকুড়ার মত স্থানে আর নিরন্নের অভিযান সম্ভব নহে। আমরা এখনও সংবাদ পাইতেছি, অন্নাভাবে দুর্বল মানুষ শৃগাল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহার আহারের উপকরণ হইয়াছে—আমরা এখনও দেখিতেছি, চাউলের মূল্য এত অধিক যে সাধারণ লোক পূর্ণাহারের উপায় করিতে পারিতেছে না। কাজেই আমরা ভয়ই পাইতেছি। যে সকল উপায় অবলম্বিত হইলে লোকের আশংকার স্থান আস্থা গ্রহণ করিতে পারে, সে সকল উপায় কি সরকার অবলম্বন করিয়া লোককে নিশ্চিন্ত করিতে পারিবেন?

বাঙলায় দুর্ভিক্ষের অবসান হয় নাই; তাহার তীব্রতার অবসান হইয়াছে—এই পর্যন্ত। সে তীব্রতা যে আবার দেখা দিবে না, তাহা কিরূপে বুঝিব?

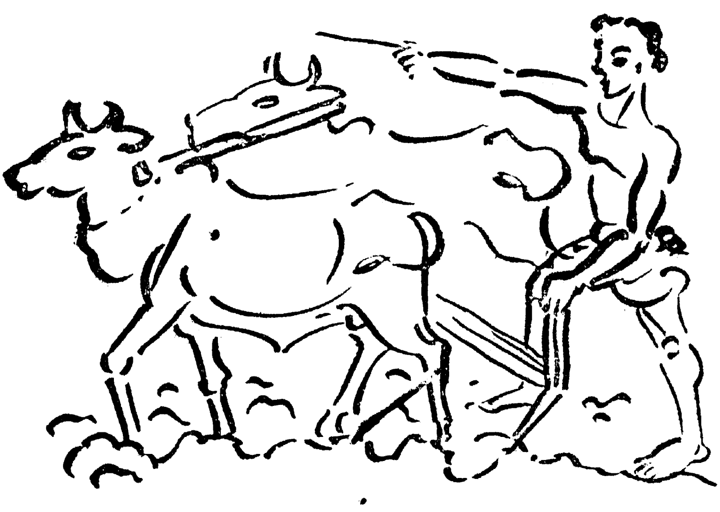
চাষী, ছুতার, কামার ও তাঁতী

শ্রীনিশাপতি মাজি

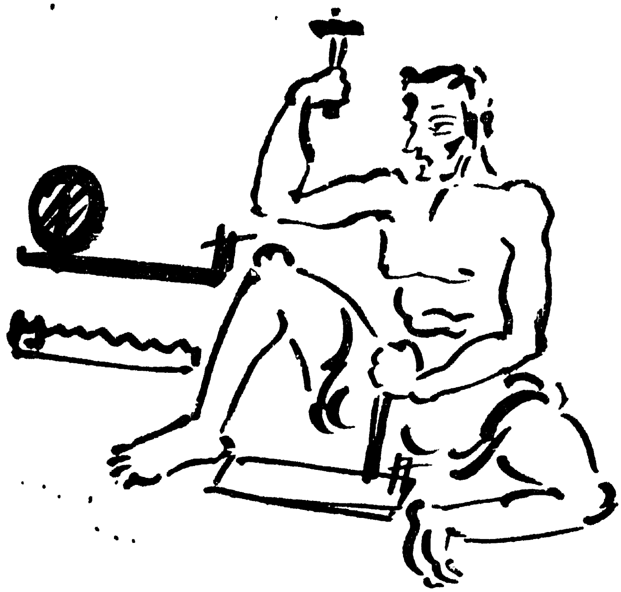
আজও বস্ত্রের হাহাকার দূর করবার জন্য বাঙলার কৃষক, তাঁতী, ছুতার ও কামার গভীরভাবে কাজে মনোনিবেশ করতে নারাজ। আবার বুদ্ধিজীবীরাও শ্রমজীবীদের সহায়তা করতে পরাঙ্মুখ। এজন্য সামাজিক শ্রম ও বিশেষ শ্রমের অভাবে পল্লীসমাজের পুনর্গঠনের কাজ হয়ে উঠছে না। সকলেই যেন অধিকতর-ভাবে সাধারণ পরিশ্রমের দ্বারাই বাড়তি আয়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। কিন্তু প্রকৃত বাড়তি আয় নিপুণ ও বিশেষ শ্রম ব্যতীত স্থায়ী হয় না। গ্রামের কৃষক ও শিল্পীদের এই কারণেই ব্যক্তিগত শ্রমকে অধিকতর উন্নত করবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কৃষকরা যদি নিজের ইচ্ছামত কেবল খাদ্য-ফসল উৎপন্ন করে চলেন তাহলে শিল্পীদের সাথে ব্যক্তিগত বিশেষ শ্রমের অভাবে প্রকৃত যোগাযোগ স্থাপন হবে না। কৃষকদেরও ভাবতে হবে বাঙলায় কেন এখন কাজের দ্বারা বস্ত্রের অভাব দূর হচ্ছে না? দুঃখের বিষয়, আজও ৬ কোটি বাঙালীর মধ্যে ৬ লক্ষ জনও চরকায় সূতা কাটেন না। খাদি সংঘের শেষ রিপোর্ট (১৯৪০) দেখা যায়, ভারতবর্ষে ৭ লক্ষ গ্রামের মধ্যে মাত্র ১৩ হাজার ৫৭১টি গ্রামে খাদির কাজ হয়েছিল। তন্মধ্যে মাত্র ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ১১৬জন খাদির কাজে চরকায় সূতা কেটেছেন। বাঙলাদেশের ৮৫ হাজার গ্রামের একজন করেও খাদির কাজ করেন নাই। এজন্য দায়ী শুধু শহর নয়, গ্রামও দায়ী। গ্রামের কৃষক তুলো চাষ করে', গৃহী চরকায় সূতা কেটে, তাঁতি কাপড় বুনে' দেশের বস্ত্রের অভাব মিটাবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই। খাদিশিল্প ও পল্লীর অন্যান্য শিল্পগুলি ক্রমে ক্রমে ধ্বংস হওয়ায় পল্লীর শ্রী ও আনন্দ অন্তর্ধান করছে। গান্ধীজী গভীর দুঃখে এই গঠনমূলক কর্মপন্থা নির্দেশকালে লিখেছেন—'বুদ্ধিহীন নিরানন্দ পল্লীবাসী তাদের অযত্নরক্ষিত গরু বাছুরের অবস্থায় প্রায় এসে পৌঁছেছে।"

বাঙলার কৃষকগণ সচেষ্ট হয়ে সূতা তৈরীর জন্য কাঁচামাল, কাগজের ও বাঁশের কাজের জন্য নানাদ্রব্য চাষ কাঠের কাজের জন্য নানা রকমের প্রয়োজনীয় গাছ এবং অন্যান্য শিল্পের জন্য নানা প্রকারের চাষ করতে ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগতভাবে বিশেষ শ্রম অনায়াসেই করতে পারেন। আরও বহু-বিধ শিল্পদ্রব্যের কাঁচা মাল নির্বাচন করে কৃষকগণ শ্রমের মধ্য দিয়েই সমাজ জীবনকে সজীব করে তুলতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে, এই যে বাঙলার কৃষক নিজ নিজ জমিতে যদি আবশ্যক মত তুলো চাষ করেন, তাহলে গ্রামের ছুতার, কামার, চামার ও তাঁতীদের প্রাণ নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বর্তমানে অধিক পরিমাণে তুলো চাষ করে কৃষক বাড়তি আয়ের কথা ভাবলে এই উদ্দেশ্য সাধন হবে না গ্রামের এবং পাশের গ্রামের জন্যই তুলো চাষ করা বর্তমান দুর্দিনে চাষীর প্রধান কর্তব্য। কেননা অবিলম্বে যদি বিগত যুদ্ধের ন্যায় সকল জিনিষের দাম পড়তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে কৃষকদের আয়ের চেয়ে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশী। অবশ্য কোন কোন জিনিসের জন্য একটি জেলা অপর জেলার বাড়তি দ্রব্যের উপর অনেক নির্ভর করে। সে দিক দিয়ে তুলো ও অন্যান্য ফসল চাষ কৃষকরা করলে ক্ষতির সম্ভাবনা বিশেষ নাই বরং তাতে লাভই হবে বেশী। তাছাড়া প্রত্যেক গৃহী যদি আশেপাশের জায়গায় গাছকাপাস জাতীয় কয়েকটি কাপাস চারা রোপণ করেন তাহলে গ্রামগুলি সত্যই নিত্যশ্রী হতে পারে। অফেলো জায়গায় দিন সহজেই গাছকাপাস সহজে হয়ে উঠে। গৃহস্থ লোক তুলো থেকে অনায়াসে বীজ ছাড়াতে পারেন। একটা 'কেরকী' নিয়ে বীজ ছাড়ানো ও ছোট ধনুক নিয়ে তুলো ধোনার কাজও চলতে পারে। ছোট তক্তার উপর সরু কাটি নিয়ে তুলো পাঁজ করা অসম্ভব কাজ নয়। এইভাবে প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক গৃহী তুলো চাষ, তুলো আহরণ, বীজ ছাড়ানো, পরিষ্কার করা, ধোনা, পাঁজ করা খুব অল্প-দিনেই শিখে নিতে পারেন। দেখা গিয়েছে এই কাজে কর্মী অপেক্ষা গৃহের ছেলেমেয়ে শিক্ষার্থীরাই বেশী আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় একাজে কৃষকের কোন আগ্রহ নাই। কৃষকেরা অনেকেই বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। কেহ কেহ বচন মুখস্থ করে বলে থাকেন, খাদি প্রবর্তন হলে বাতাসের বিপরীত দিকে নৌকা চালানো হবে, গান্ধীজী বর্বর যুগে দেশকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। কিন্তু সুখের বিষয়, ১৯৪৪–৪৫ সালে দেশের কৃষকদের অনেকটা চেতনাশক্তি জাগতে হয়েছে। গর্বের সঙ্গে অনেকে বলছেন সূতা কেটে মোটা কাপড়ের অভাব আর নেই। বস্ত্রের যতই দুর্ভিক্ষ হোক না—কোনরূপেই আর পরিবারের বস্ত্রের অভাব হবে না। এমন কি বিদেশী কাপড় অভাবের তাড়নায় স্পর্শও করব না।

অনেক দিন আগেকার কথা। রবীন্দ্রনাথ গ্রামের সাধনা ও সেবার উদ্যোগের অভাব দেখে জাতিকে আহ্বান করে বলেছিলেন—"রোজ বাজে অনেক তুচ্ছ বিষয়ে আমরা বিদেশীর নকল করেছি, আজ দেশের প্রাণান্তিক দৈন্যের দিনে একটা বড় বিষয়ে তাদের অনুবর্তন করতে হবে—কোমর বেঁধে বলা চাই, কিছু সহিবো ক্ষতি, কিছু



কৃষকের তুলো চাষ।



ছুতারের চরখা তৈরী।

আরামের ব্যাঘাত হলেও নিজের দ্রব্য নিজে ব্যবহার করব।—এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে আপন করে উপলব্ধি করবার এ একটি প্রকৃষ্ট সাধনা।"

আজকে প্রকৃষ্ট সাধনায় শুধু শিক্ষিত ব্যক্তি ও কৃষকেরা নিমগ্ন হলেও সিদ্ধিলাভ হবে না। দেশের ছুতারদেরও চরকা তৈরীর জন্য নিপুণ কারিকর হতে হবে। পূর্বে তৈরী চরকা বিভিন্ন সঙ্ঘ সরবরাহ করতেন। বর্তমানে চাহিদা অনুপাতে তার সরবরাহ হচ্ছে না। গ্রামের ছুতার চরকা তৈরী করতে সহজে রাজি হচ্ছেন না। বেশী আয়ের আশায় ছুটাছুটি করছেন। অথবা নিপুণ পরিশ্রমের দিকে আকৃষ্ট না হয়ে "কাঠ নাই" "সামর্থ্য নাই" প্রভৃতি অজুহাত দেখিয়ে চরকা তৈরীতে ইস্তফা দিচ্ছেন। অথচ খাদি প্রতিষ্ঠানের নির্মিত একটা চরকা দেখেই গ্রামের ছুতার চরকা প্রস্তুত করে দিতে পারেন। চরকা তৈরি হতে পারে, এমন গাছ আজও গ্রাম থেকে নির্মূল হয়ে যায় নি। ধনুষ—তকলী তৈরী করা আরও সহজ। কিন্তু ছুতারের ক্ষতির আশংকা কোন প্রকারেই দূর হচ্ছে না। এজন্য পূর্বেই বলেছি, চাষীর দরদ শিল্পীর প্রতি নাই—শিল্পীরও দরদ চাষীর প্রতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পল্লী সংগঠনের দ্বারা সর্বাগ্রে তাই পারস্পরিক শ্রমের যোগসূত্রের বন্ধনকে দৃঢ় করতে হবে। নতুবা চাষীর সাথে ছুতার, ছুতারের সাথে কামার, কামারের সাথে তাঁতী সহজে একত্র কাজ করতে পারবে না। এইরূপ একতাবদ্ধ কাজে ছুতার কামার তাঁতী প্রভৃতিকে নিযুক্ত করাই বাঙলার বর্তমান সমস্যা-সমাধানের একটি বিশেষ কাজ।

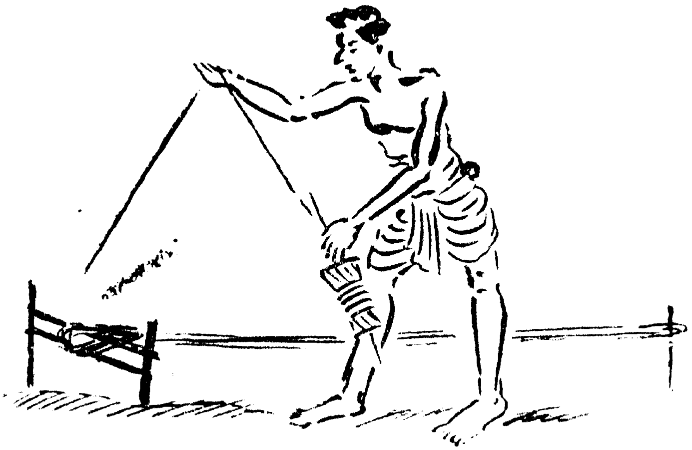
বর্তমানে গান্ধীজী দেশবাসীকে অবসর সময়টুকু অর্থাৎ প্রতিদিন একঘণ্টা চরকায় সূতা কাটবার জন্য ডাক দিয়েছেন। কিন্তু গ্রামের চাষীর ও ছুতারের ন্যায়ই কামারের বিরোধী মনোবৃত্তি তীব্র হয়ে উঠেছে। কামার লোহা ও ইস্পাতের নানা অজুহাত দেখিয়ে কুলগত বৃত্তিকে বিনাবাক্যে ত্যাগ করছেন। কামারের কাজ শুধু খাদির সহায়ক নয়—কৃষকের ও ছুতারের যন্ত্রপাতি কামারই গড়ে দেন। কামার না থাকলে এ'দের হাত অচল হয়ে থাকত। হয়ত চালানী যন্ত্রপাতিতে অনেকটা অভাব দূর হয়েছে, কিন্তু আজও কৃষিযন্ত্র ও শিল্পীর হাতিয়ার মেরামতির জন্যও কামারের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এখনও গ্রামের শতকরা ৯৫জন লোক গ্রামের কামারের তৈরী জিনিসই ব্যবহার করেন। লোহা পিতল কাঁসা প্রভৃতি ধাতুর বহুবিধ জিনিস গ্রামের লোক প্রয়োজনের তাগিদে ক্রয় করে। এতে শুধু টাকা পয়সার দ্বারা দ্রব্যের বিনিময় হয় না। শিল্পী নূতন কিছু তৈরী করে গ্রামবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধা লাভ করে থাকেন। কোন কোন গ্রামে ছুতারগণ তাঁত ও চরকা তৈরী করে লোহার ও ইস্পাতের দ্রব্যগুলি আজকাল কামারদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন। যদি আবার পল্লীবাসী পূর্বেকার মত লাঙল প্রতি উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ ছুতার ও কামারদের প্রদান করেন, তা হলে অতি সহজেই গ্রামের শ্রী ফিরে আসতে পারে। তবে আবার গ্রামে গ্রামে ছুতারপল্লী ও কামারপল্লীতে কর্মের কোলাহল জেগে উঠবে। এমন কি বৃহৎ বৃহৎ যন্ত্রশিল্পগুলিও রাক্ষসের ন্যায় এই সব শিল্পীদের সহজে গ্রাস করতে পারবে না। কেননা, এ'দের অভাবে পল্লীর গৃহস্থালীর রূপ সম্পূর্ণরূপে বদলে যাবে। পল্লীমুখী জাতি গ্রামের জিনিস গ্রামে সংগ্রহ করতে পারলে সহজে



কামারের টাকু তৈরী।

মিলের তৈরী জিনিস গ্রহণ করবেন না। জাতির রুচি যখন স্বদেশী হয়ে উঠছে এবং নূতনভাবে দেশকে গড়ে তোলবার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত মনোভাব জেগে উঠছে, তখন কামাররা যে নিজেদের সুযোগ গ্রহণ করবেন না, একথা বলা অন্যায়। কামারগণও একাজে ধীরে ধীরে নিযুক্ত হচ্ছেন। বাঙলার দারিদ্র্য, অনাহার এবং আলস্যই সব কাজের প্রধান বাধা। এজন্য শহরের সাথে গ্রামের এবং গ্রামের সাথে চাষী, ছুতার, কামার ও তাঁতীর যোগসূত্র নাই। গ্রামের টাকা পয়সা গ্রামের

তাঁতীর কাজ সুতায় মাড় দেওয়া, সুতা রঙ করা, টানা ও পড়েন তৈরী করা ধোলাই করা এবং কাপড় বোনা। এখানে প্রশ্ন এই কাপড়ের মালিক ও বিক্রেতা কে? কাটুনীই কাপড়ের মালিক। অতএব কাটুনীরা এক জোড়া কাপড়ের যখন মজুরী দিবেন তখন পড়পড়তা হিসাব নিখুঁতভাবে করতে হবে। যেন তাঁতী কোনক্রমেই অন্নবস্ত্রে এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষালাভে বঞ্চিত না হয়। তাছাড়া তাঁত চালানোর দ্বারা যে ক্রমশ ক্ষতি সাধিত হচ্ছে, তার খরচ, তাঁতের জায়গাকে



তাঁতির সুতার টানা।

বাইরে চলে যাচ্ছে। গ্রামের তাঁতীরা পূর্বের মত এখনও জীবনযাপন করতে চান না। এ'রা রাতারাতি টাকাওয়ালা হবার নানা প্রকারের কৌশল করতে শিখছেন। গ্রামের সাধারণ তাঁতী মিলের সুতা সংগ্রহ করে আশাতীত মজুরির জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছেন। ফলে চরকায় কাটা সুতার নানাপ্রকার দোষ ব্যাখ্যা করে তাঁতী চরকার প্রতি জাতীয় দরদকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। কোন কোন তাঁতী নিপুণভাবে খদ্দর বয়ন শিক্ষা না করেই চরকা কাটা সুতার ক্ষতি সাধন করছেন। জগতব্যাপী এই পরিস্থিতির সৃষ্টি অবশ্য বর্তমানে হয়েছে। আজ তাই খুব ভালভাবে সব দেশই বিশেষ সতর্ক হয়ে সরল বিনিময় ব্যবস্থার পনঃ প্রবর্তন করছেন। মূলধন দ্বারা অতিরিক্ত আয়ের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে কেহ আর কোন পরিকল্পনাকে খাড়া করছেন না; শিল্পীদের অধিক আয়ের পথ সুগম করে দিয়েই শ্রম বিভাগকে উন্নত করে তুলছেন। এইরূপ উন্নত ব্যবস্থার দ্বারা শুধু পল্লী শিল্পের উন্নয়ন সাধিত হবে না—গ্রামের মৃত প্রাণও সজীব হয়ে উঠবে। গ্রামের লোক শিল্পীদের উপর নির্ভর করবেন—শিল্পীরাও গ্রামবাসীদের আপন করে তুলবেন।

উপলক্ষে বাৎসরিক খরচও তাঁতীদের বুঝে হিসাব করতে হবে। এই সব খরচের হিসাব বার করা খুব কঠিন নয়। মাত্র কয়েকটি প্রশ্নের দ্বারাই বাৎসরিক হিসাব ও ছুতার কামারের সাথে দুঃখের খতিয়ান তাঁতীর কাছে লাভ করা যায়। যথা—(১) কতগুলি কাপড় তৈরীর পর ছুতারের তাঁত অকেজো হয়? (২) মেরামতি খরচ বাবদ বছরে গড়ে কত ব্যয় হয়? (৩) তাঁতের ঘরটি কত বছর পর পর মেরামতি করতে হয়? ঘর তৈরিতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে? (৪) প্রতিদিন কত সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের জন্য অতিবাহিত হয়? স্বাস্থ্যরক্ষার খরচ, শিক্ষা বিষয়ে খরচ, খাওয়া-দাওয়ার খরচ ইত্যাদি তথ্য এইরূপ প্রশ্নের দ্বারা সংগৃহীত হতে পারে।

যন্ত্রযুগের বহু পূর্বেকার বাঙলার বিগত দিনের কথা আজ হয়ত অনেকে সময়ে সময়ে স্মরণ করছেন। সেদিন বাঙলা স্বহস্তে সকলকে অন্নবস্ত্র পরিবেশন করত। বাঙলার স্বাস্থ্যও বাঙলার আনন্দ ছিল। বাঙলার হাট ও মাঠ ফলে ফুলে পরিপূর্ণ হয়ে থাকত। বাঙালী নির্লজ্জভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে হুটোপুটি ও হানাহানি করতেন না। বাড়তি আয়ের জন্য অন্ধ হয়ে বাঙলার ছুতার কামার ও তাঁতী নির্বিচারে কুশ্রী লোলুপতার ফলে নিজের ধ্বংসস্তূপ নিজে রচনা করতেন না। গ্রামের সকলেই শিল্পকে শ্রীর বাহন বলে স্বীকার করতেন। আজও দেখা যায়, যে কাজে শ্রী নাই, সেকাজ মনকে স্ফূর্তি দেয় না। তার কারণ মনের স্ফূর্তির জন্য নিত্য নূতন সমাজে যে অভাব দেখা দিয়েছে, শিল্পী তার সমাধানে তৎপর। তার বিনিময়ে শিল্পীর অন্নবস্ত্রের জন্য নানা নিয়ম পল্লীতে বিনা বাধায় প্রতিপালিত হয়েছে। ধর্ম ব্যবস্থায়ও ছুতার কামার ও তাঁতীদের একটা নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। বিবাহে, শ্রাদ্ধে, নানা উৎসবে লোহার, কাঠের ও তাঁতের সর্জিনি আজও সর্বাগ্রে আবশ্যক হয়। গরীবের স্ত্রীও বিবাহ উপলক্ষে একখানা শাড়ী পেয়ে থাকেন। এসব বিধি ব্যবস্থা নিয়মাদি কি বাঙলাদেশে নিখুঁত, পরিকল্পনা ব্যতীত হয়েছিল? উৎপাদিত দ্রব্যের প্রচার কাজ ও গৃহে গৃহে শিল্পের বিকাশলাভও বোধ হয় সহজে হয় নাই। নিশ্চয়ই এই সব কাজের মধ্যে আর্থিক স্বাতন্ত্র্য এবং সামঞ্জস্য প্রচারিত হয়েছিল। আবার জাতির মনোভাবকে জাগ্রত করবার অবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। বুদ্ধিকে ও পরিশ্রমকে তাই অনেকেই সহায় করে তুলেছেন। রুচির আমূল পরিবর্তনও হচ্ছে। আরো কৃষি ও শিল্পীদের মধ্যে সম্পর্ক গভীর হয়ে উঠুক। প্রত্যেক গ্রামবাসী গর্বের সঙ্গে অনুভব করুক, আমরা এক এবং অভিন্ন। ছুতার, কামার, তাঁতীও বুঝুক আমরা গ্রামের, গ্রাম আমাদের।

আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(১১)

আহারাদি শেষ হইতে রাত্রি এগারোটা বাজিয়া গেল। সে রাত্রে মালতী ত' গৃহে ফিরিলই না। অধিকন্তু পরদিন সমস্ত দিনের জন্য শক্তিকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া লইল। শক্তি এবং অশোক এ প্রস্তাবে সামান্য আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু মালতীর প্রবল যুক্তির বিরুদ্ধে তাহাদের সে আপত্তি টিঁকিল না। শক্তিকে মালতী বলিল, "আমি যদি তোমাদের বাড়ি এসে একটা রাত কাটাতে পারি, তা হলে তুমি আমাদের বাড়ি গিয়ে একটা দিন কাটালে বিশেষ অন্যায় হয় না। পাল্টা শোধের একটা ভদ্রতাও ত' আছে?" 'নাই' বলা কঠিন, সুতরাং শক্তি সুবিধা মতো কোনও উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। অশোককে বলিল, "শক্তির অভাবে এতদিন যদি আপনাদের অনায়াসে চ'লে থাকে, তা হ'লে একটা বেলা সে না থাকলে কি ক্ষতি হবে তা আমাকে বুঝিয়ে দিন।" বুঝাইতে হইলে এমন কথা প্রকাশ করিতে হয় যাহা গোপন রাখাই সমীচীন। সুতরাং অশোককেও চুপ করিয়া যাইতে হইল।

মালতীর ইচ্ছা ছিল অতি প্রত্যুষেই শক্তিকে লইয়া প্রস্থান করে, কিন্তু পরদিন প্রভাতে নবগোপাল হরিপুর রওনা হইবে বলিয়া, স্থির হইল বেলা নয়টার সময়ে প্রণব গাড়ি পাঠাইবে।

সারাদিনের পথ শ্রম, এবং রাত্রি দুইটা পর্যন্ত জাগিয়া মালতীর সহিত গল্প করিয়া কাটানোর নিদ্রালসতা সত্ত্বেও প্রত্যুষে শক্তিরই প্রথমে ঘুম ভাঙিল। শান্ত অনুজ্জ্বল আলোকে সমস্ত ঘর ভরিয়া গিয়াছিল, ধীরে ধীরে সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

শয্যার অপর প্রান্তে মালতী চিৎ হইয়া বাম পাশে মাথা হেলাইয়া ঘুমাইতেছে। তাহার শিথিল সুন্দর দেহ দেখিয়া শক্তির মনে হইল যেন একটি শুভ্র মালতীমালা অলস আবেশে শয্যার উপর এলোমেলো হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে না জাগাইয়া ধীরে ধীরে পালঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া দ্বার খুলিয়া সে বারান্দায় বাহির হইয়া গেল।

বারান্দার অপর প্রান্তে বিনোদের সহিত অশোক কথা কহিতেছিল, শক্তিকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "শরীর ভাল আছে ত' শক্তি?"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "আছে।"

"ঘুম হয়েছিল?"

"হয়েছিল।"

"মালতী উঠেছে?"

"না, ঘুমচ্ছে।"

"আচ্ছা, আপাতত গোটা পানের টাকা বিনোদকে এনে দাও।"

"আমার টাকা থেকে?"

কৌতুকোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অশোক বলিল, "হ্যাঁ গো, হ্যাঁ, আমার টাকা থেকে।"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "তা দিচ্ছি। কিন্তু মালতীদের বাড়ি যাবার সময়ে চাবিটা চেয়ে নিতে ভুলোনা।"

"কেন?"

"চাবি না থাকলে তোমার অসুবিধে হবে।"

মাথা নাড়িয়া অশোক বলিল, "কিচ্ছু না।—চাবি তোমার কাছে থাকবে। অসুবিধে হচ্ছে ভেবে যদি মালতীকে তাড়া দিয়ে আধ ঘণ্টাও আগে আস, সেইটেই হবে চাবি না থাকার লাভ।" তাহার পর কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া লইয়া ঈষৎ কাতর ভাবে কহিল, "আজকের দিনটা মালতী কিন্তু একেবারে মাটি করে দিলে!"

কিছু না বলিয়া শক্তি একটু হাসিল,—কিন্তু সে হাসির অসংশয়িত অর্থ, 'শুধু তোমারই ক'রে দেয়নি।' অনুচ্চকণ্ঠে বলিল, "নবগোপালদা উঠেছেন?"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "কোনো রকমে। অনেক ঠেলাঠেলি ক'রে আধ ঘণ্টাটাক আগে তাঁকে তুলেছি। গোসলখানায় স্নান করতে গেছেন। মালতী উঠলে তোমরা মুখ-হাত ধুয়ে নাও। তারপর চায়ের জল চড়াতে ব'লে দিয়ো।"

টাকা আনিতে শক্তি কক্ষে ফিরিয়া গেল।

বেলা সাড়ে আটটার সময়ে নবগোপাল একতলার খাইবার ঘরে ভাত খাইতে বসিয়াছিল। চায়ের সহিত যথেষ্ট খাবার খাইয়াছিল বলিয়া প্রথমে সে ক্ষুধাহীনতার আপত্তি তুলিয়াছিল। কিন্তু পাতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া খাদ্যবস্তুর উৎকৃষ্টতা দেখিয়া জঠরের কোনো গুপ্ত প্রদেশ হইতে একরাশ ক্ষুধা ছিদ্রপথ দিয়া জলস্রোতের ন্যায় হু হু করিয়া বাহির হইয়া আসিল। গব্যঘৃত, আলুভাতে, মুগের ডাল, রুইমাছ ভাজা, কইমাছের ঝাল, হাঁসের ডিমের বড়া এবং আনারসের অম্বল দিয়া উৎকৃষ্ট কাটারি ভোগ চালের তপ্ত অন্নের চৌদ্দ আনা অংশ দেখিতে দেখিতে উড়িয়া গেল, —তাহার পর আহার পর্বের চরম অবস্থায় দধি সন্দেশ এবং আম্ররসের সংযোগে যখন একটা সাতিশয় মুখরোচক পদার্থ উৎপন্ন হইল তখন আরও কিছু অন্ন না লইয়া কিছুতেই চলিল না।

অশোক এবং শক্তি নিকটে বসিয়া গল্প করিতেছিল। নির্দয়ভাবে একটা আমের আঁটি চুষিতে চুষিতে নবগোপাল বলিল, "আজব শহর এই কলির রাজা কলকাতা! শেরাবোন মাসেও আম খাওয়া চলেছে!"

শক্তি বলিল, "আর একটা আম দিতে বলব নবগোপালদা?"

মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "আরে ভাই, না। আর একটা আম খেলে পেট ফেটে যাবে। তাই কি সহজ আম! যেন এক একটা পেঁপে!" তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু নিচু করিয়া শক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "এই সংসার যখন তোমার নিজের সংসার হবে তখন কিন্তু খেতে বললে পেট ফাটাতেও পেছপা হব না।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

অশোক বলিল, "কিন্তু এ সংসার শক্তির সংসার হ'তে বাকি নেই নবগোপালবাবু। এ সংসার এখনও শক্তিরই সংসার।"

কুঞ্চিত চক্ষে সহাস্যমুখে নবগোপাল বলিল, "ও-সব ভাঁওতায় আমি ভুলিনে যে ভাই! ধাঁ ক'রে বিয়ে ক'রে ফেলে কেচ্ছা খতম কর,—তা হ'লে বলব য়োঁ.....হু—"

কথা শেষ না করিয়া সহসা নবগোপাল য়োঁ...হু করিয়া থামিয়া যাওয়ায় বিস্মিত হইয়া অশোক বলিল, "কি হ'ল নবগোপালবাবু?"

কোনো কথা না বলিয়া নবগোপাল পুনরায় আর একবার য়োঁ হু করিয়া দ্বারের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল। সেই সংকেতের অনুসরণে অশোক এবং শক্তি পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল গোবিন্দ ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

নবগোপাল বলিল, "কি বলছ ঠাকুর?"

"আর কিছু কি চাই বাবু?"

মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "না, না, কিছু না,—জল পর্যন্ত না। এখন আমরা একটু প্রাইভেটে থাকতে চাই—তোমরা কেউ এখানে এসো না। কিছু মনে

কোরো না ঠাকুর, এর মানে আছে। বুঝলে?—মানে আছে।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বাবু, নিশ্চয় আছে। আমরা কেউ আসব না।" বলিয়া গোবিন্দ প্রস্থান করিল।

যে 'মানে আছে'র রহস্য লইয়া গতকাল হইতে সে বিব্রত হইয়া আছে, গোবিন্দর উপর তাহা প্রয়োগ করিতে পারিয়া নবগোপাল আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

নবগোপালের ভঙ্গি দেখিয়া এবং কথা শুনিয়া অশোক এবং শক্তির অতিশয় হাসি পাইয়াছিল। কোনোরূপে হাসি রোধ করিয়া অশোক বলিল, "'মানে আছে'র কি মানে, তা যেন গোবিন্দদের কাছে তাই ব'লে বলবেন না নবগোপালবাবু।"

মাথা নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "ক্ষেপেছ! তা-ই কখনো বলি?" তাহার পর কণ্ঠস্বর সহসা গাঢ় করিয়া লইয়া বলিল, "শোনো ভায়া, বেশিদিন ঝুলিয়ে রেখে মেয়েটাকে অযথা কষ্ট দিয়ো না, এই শেরাবোন মাসেই বিয়ের ব্যবস্থা কর। আর দেখ, বিয়ে স্থির হ'লেই আমাকে খবর দিয়ো। আমার ঠিকানা—নবগোপাল চাটুজ্যে, গ্রাম হরিপুর, পোস্ট খলসেখালি, জেলা খুলনা।"

অশোক বলিল, "এ ঠিকানা আমার জানাই আছে।"

"তোমার চিঠি পেলেই আমি এসে শক্তিকে নিয়ে যাব।"

"কোথায় নিয়ে যাবেন?"

"কেন, হরিপুরে।"

"সেই কুমীরের দেশে?"

অশোকের কথা শুনিয়া নবগোপাল উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "মনে আছে? ভোলোনি দেখছি!"

"কুমীরকে কি সহজে ভোলা যায়।"

"না গো, না। কুমীর তখন আর কুমীর থাকবে না, একেবারে কচ্ছপ হ'য়ে যাবে!"

"তা না-হয় যাবে, কিন্তু হরিপুরে নিয়ে যাবেন কেন?"

অশোকের প্রশ্ন শুনিয়া নবগোপালের মুখ বিস্ময়ে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; বলিল, "কেন মানে? তা হ'লে তোমার এই কলকেতার বাসা থেকে শক্তির বিয়ে হবে না-কি?"

নবগোপালের কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে অশোক বলিল, "না, না, তা কেন হবে। হরিপুর থেকেই হবে। হরিপুরে গিয়ে আমরা শক্তিকে বাজিৎপুরে নিয়ে আসব!"

উৎসাহিত হইয়া নবগোপাল বলিল "সাতক্ষীরে থেকে মদন চক্কোত্তী আর তার বউকে একেবারে কনট্র্যাক্টো করে হরিপুরে নিয়ে যাব। মদনের বউ চা আর খাবার তৈরী করবে, আর মদন তোমাকে গান শোনাবে। মদনের গান ত' তোমার খুব ভাল লাগে?"

প্রসন্নমুখে অশোক বলিল, "খুব ভাল লাগে। মদন থাকলে বিয়ে বাড়ি জ'মে যাবে নবগোপালবাবু। কনে সম্প্রদান করবে কে? আপনি?"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া নবগোপাল বলিল, "আমি? কেন, সগোত্তোর ভবতারা মাসি থাকতে আমি করতে যাব কেন?"

"তিনি তো বিরুদ্ধদলের লোক, তিনি হরিপুরে কেন আসবেন?"

নবগোপালের মুখে বীরত্বের একটা কঠোর ভাব ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "তিনি না আসেন, তাঁর ঘাড় আসবে! বেশি চালাকি করলে পাঁজাকোলা ক'রে গরুর গাড়িতে ফেলে চালিয়ে নিয়ে আসব। তবে হ্যাঁ,—শিবানীপুর থেকে বিয়ে হবার উপায় নেই ঐ শয়তান অজু চাটুজ্যে থাকতে। শোলোকে যে লেখে চট্টো হারামজাদা, সে কি আর মিথ্যে লেখে? পয়লা নম্বরের হারামজাদা ঐ অজু চাটুজ্যে।"

সহাস্যমুখে অশোক বলিল "এ কথা কিন্তু আপনার মুখে সাজে না নবগোপালবাবু।"

"কেন?"

"আপনি নিজেও ত' চাটুজ্যে।"

আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নবগোপাল বলিল, "হলামই বা চাটুজ্যে, তাই ব'লে হক কথা বলতে ভয় পাব না-কি?"

"কিন্তু ঐ শোলোকের কথা যে ঠিক নয়, ভুল,—তা আপনার মতো চাটুজ্যেরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে।"

অশোকের কথার অর্থোপলব্ধির জন্য এক মুহূর্ত চুপ করিয়া ভাবিয়া শক্তির দিকে চাহিয়া হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া নবগোপাল বলিল, "শোনো কথা বোনাইয়ের! যাবার সময়ে খুসি ক'রে বিদেয় করতে চায়।"

মৃদু স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "আপনার বোনেরও কিন্তু ঐ এক কথা দাদা।"

"বোনেরও ঐ এক কথা? তবে আর কি বলব বল!" বলিয়া প্রসন্নমুখে নবগোপাল ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

অশোকের আদেশ অনুযায়ী বিনোদ একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া আনিয়াছে। সঙ্গে লইয়া গিয়া অশোক নবগোপালকে ইটিণ্ডাঘাটের বাসে তুলিয়া দিয়া আসিবে।

সিঁড়ি দিয়া একতলার বারান্দায় নামিয়া আসিয়া নবগোপাল অশোককে বলিল "তুমি গাড়িতে গিয়ে বোসো ভায়া, শক্তির সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।"

"প্রাইভেট?"

স্মিতমুখে নবগোপাল বলিল, "হ্যাঁ, প্রাইভেট?"

"মানে আছে বুঝি?"

এবার নবগোপাল চিৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "নিশ্চয় আছে।" তারপর কণ্ঠস্বর বেশ খানিকটা নিচ করিয়া লইয়া বলিল, "তোমার মানে থাকতে পারে, আর আমার পারে না?"

"নিশ্চয় পারে।" বলিয়া হাসিমুখে অশোক গৃহের বাহিরে প্রস্থান করিল।

কিছু পূর্বে গোবিন্দের উপর 'মানে আছে'র অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া নবগোপাল যে পরিমাণে পরিতুষ্ট হইয়াছিল তাহার অনেক বেশি হইল অশোকের উপর প্রয়োগ করিয়া।

শক্তিকে একটু একান্তে লইয়া গিয়া সে বলিল, "চিঠি-পত্তোর দিয়ো।"

ঘাড় নাড়িয়া শক্তি বলিল "দোবো।"

"সাবধানে থেকো।" পুনরায় শক্তি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, থাকিবে।

"আর দেখ, যাতে এই শেরাবোন মাসের মধ্যে বিয়েটা হ'য়ে যায় সে জন্যে অশোকের ওপর সব্বোদা চাপ রেখো। সোমোখো ছেলে-মেয়ে বিয়ে না ক'রে বেশি দিন এক সঙ্গে থাকতে নেই।"

নবগোপালের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া নতনেত্রে শক্তি বলিল, "তিন চার দিনের মধ্যে আমি স্কুলে ভর্তি হ'য়ে মেয়েদের হোস্টেলে চ'লে যাব নবগোপাল দাদা।"

শক্তির কথা শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নবগোপাল বলিল "'বল কি! হোটেলে চ'লে যাবে? তা হ'লে অশোক যে আমাকে হোটেলের কথা বলেছিল, তা দেখেছি এক্তোক বাক্যি নয়,—সত্যি। কিন্তু বিয়ের সময়ে আসবে কি ক'রে শক্তি?—ছাড়বে ত' ওরা?"

আরক্তমুখে শক্তি বলিল, "তা ছাড়বে।"

"সে হোটেল ত' শুধু মেয়েদের হোটেল? পুরুষের নেভুড় নেই ত' সেখানে?"

"একেবারে নেই।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া নবগোপাল বলিল, "তা হ'লে না-হয় হোটেলেই যেয়ো,—তবু সে মন্দের ভাল হবে। আর দেখ, যে রকমই হোক না কেন, কোনো-কিছু অসুবিধে হ'লেই আমাকে জানাবে।"

"নিশ্চয় জানাবো।"

ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া কতকটা যেন নিজেকেই সম্বোধন করিয়া মৃদুকণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "যা-ই হোক না কেন, এ নিশ্চয়, শেষ পর্যন্ত আমি আছি-ই।"

এই স্বগতোক্তিকে শক্তি কিন্তু উপেক্ষা না করিয়া ব্যগ্রতার সহিত বলিল, "তা আমি জানি নবগোপাল দাদা!"

কোনো একটা কথা সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইবার চেষ্টায় নবগোপালের মনের মধ্যে আলোড়িত হইতেছিল। এ পর্যন্ত যতটুকু বলিয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে মনে করিয়া, বোধ করি শক্তিকে পরিপূর্ণ আশ্বাস দিবার অভিপ্রায়েই সে বলিল, "আরও একটা কথা তোমার জেনে রাখা দরকার।"

আগ্রহ সহকারে শক্তি বলিল "কি বলুন।"

"শিবানীপুর থেকে কাল গরুর গাড়িতে আসতে আসতে আমার যে সম্বন্ধের কথা তোমাকে বলেছিলাম, হরিপুরে গিয়েই সেটা ভেঙে দেওয়াবো।"

বিস্মিত হইয়া শক্তি বলিল "কেন বলুন ত'? আপনি ত' বলছিলেন, শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে বিয়ে হবার কথা একরকম পাকা হ'য়েই আছে।"

নবগোপাল বলিল, "তা ত' আছেই। হ'লে একরকম মন্দও হ'ত না,—মেয়েও নিতান্ত নিন্দের নয়, দেওয়া-থোওয়াও ভালই ক'রত।—"

"তবে?"

"অশোক যদি তোমাকে শেরাবোন মাসে বিয়ে করত, তা হ'লে ত' নিশ্চিন্ত হয়েই করা যেত। কিন্তু সে যে-রকম কথা বলে তাতে শেরাবোন মাসে ত' নয়ই, তারপর কবে কতদিনে যে করবে তার কোনো ঠিকানা নেই।"

"কিন্তু তার জন্যে আপনার বিয়ে কেন বন্ধ হবে? আপনি শ্রাবণ মাসে নিশ্চয় বিয়ে করবেন।"

শক্তির কথা শুনিয়া নবগোপালের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল, বলিল, "দূর! তাই কখনো কেউ করে! তারপর যদি ইয়ে হ'ল,—তখন? লোকে কথায় বলে 'জন্ম মিত্যু বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে'—কিচ্ছু বলা যায় কি? যতক্ষণ দুহাত এক না হচ্ছে কিচ্ছুই বলা যায় না। এই যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল,—কিন্তু হ'ল কি শেষ পর্যন্ত? আমি নিজেই চেষ্টা ক'রে ভেঙে দিলাম,—অথচ তোমার মতন অমন সোন্দোর পাত্তোরী।" এক মুহূর্তে চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তাছাড়া, এত তাড়াই বা কিসের? হ'য়ে যাক-না আগে তোমাদের;—তারপর দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যা-হয় একটা করলেই হবে। পাত্তোর যদি বেঁচে থাকে, পাত্তোরীর অভাব হবে না।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "এ কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না!"

বিস্মিত কণ্ঠে নবগোপাল বলিল, "একটুও ভাল লাগছে না মানে? ধর, ভগমান না করুন, তেমনই যদি কিছু হয়,—তখন?"

"তখন আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে আপনাকে চিঠি লিখব।"

শক্তির কথায় খুশি হইয়া নবগোপাল বলিল, "তা হ'লে আমার কথাই ত' দাঁড়াল শক্তি। সেইজন্যেই ত' আমি বলছিলাম তোমাকে নিয়ে যাবার পথ খোলসা রাখা উচিত।" কিন্তু সে যাই হ'ক তোমার কোনো ভয় নেই,—আমি মন খুলে, আশীর্বাদ করছি, সে দুঃখু তোমাকে যেন পেতে না হয়।"

"কোন্ দুঃখু?"

হাসিয়া নবগোপাল বলিল, "কি আশ্চয্যো! তাও খুলে বলতে হবে না-কি? হরিপুরের চাটুজ্যে বাড়ির বড় বউ হওয়ার দুঃখু।"

হাসিমুখে নবগোপাল একথা বলিল, কিন্তু শুনিয়া শক্তির দুই চক্ষু সিক্ত হইয়া আসিল। ইহার প্রতিবাদ না করিয়া সে থাকিতে পারিল না; আর্ত কণ্ঠে বলিল, "সে তখন যা হবার হবে; কিন্তু দুঃখুর কথা ব'লে আমাকে অপরাধী করবেন না দাদা!"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া নবগোপাল বলিল, "আচ্ছা, চলি এখন, দেরি হ'য়ে গেছে।"

নত হইয়া শক্তি নবগোপালের পদধূলি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শক্তির মাথায় দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া নবগোপাল বলিল, "যা বললাম মনে রেখো ভাই। সাবধানে থেকো চিঠিপত্তোর দিয়ো, আর শীগ্‌গির যাতে বিয়ে হয়, তার জন্যে অশোকের ওপর চাপ রেখে যেয়ো।"

"দাদা!"

"কি বল।"

নবগোপালের হস্তে শক্তি গোটা দশেক রুপার টাকা প্রদান করিল।

বিস্মিত হইয়া নবগোপাল বলিল, "কি হবে এ টাকায়?

"মেসোমশায় মাসিমা আর ছেলেমেয়েদের জন্যে ইনি এক হাঁড়ি মিষ্টি আপনার গাড়িতে দিয়েছেন। কুটুম্বিতায় আপনিই বা হার মানবেন কেন। দুটো ক'রে টাকা এ-বাড়ির চাকর-বামুনের হাতে দেবেন।"

"আর বাকি টাকা?"

"বাকি টাকা আপনার পথ-খরচ।"

"হুস্!" শব্দের দ্বারা শক্তির প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া নবগোপাল শক্তির হাতে সমস্ত টাকা ফিরাইয়া দিল।

মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে শক্তি বলিল, "এ কিন্তু অন্য কারো টাকা নয়,—আপনার বোনের টাকা।"

হাসিমুখে নবগোপাল বলিল, "টাকা আমার সঙ্গে গোটা কুড়িক আছে শক্তি; বোনের টাকার দরকার হবে না।" তাহার পর বিনোদ এবং গোবিন্দকে ডাকিয়া তাহাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও জোর করিয়া তাহাদিগকে দুই টাকা করিয়া বকশিশ্ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

নবগোপালের সহিত কথাবার্তার পর একটা অস্পষ্ট অস্বস্তির তাড়নায় শক্তির মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। মনে হইল সরল নিষ্কলুষচিত্ত নবগোপালের উদ্বেগ এবং হিতৈষণা শুধু অলীক এবং অবাস্তব কল্পনা হইতেই হয়ত জন্মগ্রহণ করে নাই,—নির্মম অদৃষ্টের অশুভ সত্যের হয়ত বা একটা ইঙ্গিত ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তাই, মালতীদের বাড়ি যাইবার জন্য যে সামান্য-একটু স্পৃহা তাহার মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল, এখন আর তাহার বিন্দুবিসর্গও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। মনের ভারকেন্দ্র হইতে বিশ্বাসের যে আসন অল্প একটু সরিয়া গিয়াছে, মনে হইল, নবগোপালকে বাসে তুলিয়া দিয়া ল ক্লাস সারিয়া অশোক বাড়ি ফিরিলে তাহার সহিত কথোপকথনের প্রভাবে হয়ত তাহা পুনরায় যথাস্থানে ফিরিয়া আসিতে পারে। সেইজন্য, মালতীদের বাড়ি না গিয়া অশোকের জন্য অপেক্ষা করা অনেক বেশি স্পৃহনীয় বলিয়া তাহার মনে হইল।

কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরে পরিচিত হর্নের শব্দ শুনিয়া মালতী যখন বলিল, "চল।" তখন শক্তিও বলিল, "চল।" তাহার শান্ত মনে যাওয়া-না-যাওয়া লইয়া বাদানুবাদ করিবার মত যথেষ্ট ধৈর্যের অভাব ছিল; বিশেষত, বাদানুবাদের দ্বারা অবুঝ এবং অনমনীয় মালতীর নিকট হইতে ফললাভের যখন বিশেষ কোনো প্রত্যাশা ছিল না।

মালতী বলিল, "চটপট তৈরি হ'য়ে নাও শক্তি।"

শক্তি বলিল, "চটপটের দরকার নেই, তৈরিই আছি।"

"কাপড়টা বদলে নাও।"

পরিচ্ছদের দিকে নতনেত্রে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া শক্তি বলিল, "কেন এই ত বেশ আছি।"

"তুমি যাতে থাক, তাতেই বেশ থাক; কিন্তু আমি আরো একটু বেশি চাচ্ছি।" বলিয়া কবজটা জোর করিয়া শক্তিকে অশোকের শয়নকক্ষে টানিয়া লইয়া গিয়া আলমারি খোলাইল; তাহার পর একটা সুশ্রী ঢাকাই শাড়ি এবং তাহার সহিত মানানসই একটা ব্লাউস বাহির করিয়া বলিল, "নাও, প'রে ফেল।"

শক্তি বস্ত্র পরিবর্তন করিলে ঘাড় বাঁকাইয়া সপ্রশংস নেত্রে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মালতী বলিল, "দেখ দেখি কি সুন্দর দেখাচ্ছে! এবার এস, তোমার মুখে একটু পাউডার মাখিয়ে দিই।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "না-না পাউডার মাখাবার দরকার নেই।"

"পাউডার দিয়ে তোমার গায়ের রঙ বাড়াবার দরকার নেই তা জানি, কিন্তু মুখের তেলটা ত মারতে হবে।" বলিয়া মালতী একটা পাউডারের কোটা খুলিয়া

তুলিতে ঘন করিয়া পাউডার লাগাইয়া লইয়া শক্তির মুখে-চোখে ভাল করিয়া মাখাইয়া দিল।

চোখ বুজিয়া কুঞ্চিত মুখে শক্তি বলিল, "একেবারে অন্ধ ক'রে দিলে ভাই?"

মালতী বলিল, "অন্ধ হ'য়ে কিন্তু কোঁচ-কানো চোখ-মুখের কি চমৎকার শোভা হয়েছে একবার যদি দেখতে!"

মালতীর কথা শুনিয়া শক্তির কুঞ্চিত মুখের উপর চাপা হাসির একটা মৃদু আমেজ ফুটিয়া উঠিল। মুদিতনেত্রে সে বলিল, "একটা হাত-আর্সি দাওনা দেখি।"

এই অসাধনীয় প্রস্তাবের তরল কৌতুকা-বহতায় তরুণীদ্বয়ের, বিশেষত মালতীর কলহাস্যে কক্ষ চকিত হইয়া উঠিল।

একটা নরম বস্ত্র দিয়া শক্তির কপালের পাউডার মুছিতে মুছিতে মালতী বলিল, "একটা কথার উত্তর দেবে শক্তি? কিন্তু সত্যি উত্তর দিয়ো। জান ত, চোখ বুজে মিথ্যে কথা বলতে নেই।"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল, "চোখ বুজেই ত মিথ্যে কথা বলার সুবিধে, চক্ষুলজ্জার বালাই থাকে না।"

মালতী বলিল, "কি আশ্চর্য! অন্ধকারে চুরি করতে সুবিধে বলে, অন্ধকারে চুরি করবেই না-কি তুমি? না চোখ বুজে মিথ্যে কথা বলতে নেই।" বলিয়া মালতীর দুটি চক্ষে আর এক এক পোঁচ পাউডার লাগাইয়া দিল।

চক্ষু কুঞ্চিততর করিয়া শক্তি বলিল, "রক্ষে কর ভাই! আর বেশি অন্ধ করতে হবে না,—কি তোমার কথা বল।"

"অশোকবাবু তোমার মাসতুত ভাইয়ের বন্ধু?"

শক্তি বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

"তার বেশি কিছু নন ত?"

"না, বন্ধুর বেশি কিছু নন।"

"তোমার মাসতুত ভাইয়ের কথা বলছিনে, তোমার কথা বলছি।"

"ও! আমার কথা বলছ?" এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করিয়া শক্তি বলিল, "আর, আমি যদি জিজ্ঞাসা করি, অশোকদাদা তোমার দাদার বন্ধু ত? তা হ'লে কি বলবে?"

মৃদু হাসিয়া মালতী বলিল, "বলব হ্যাঁ।"

"তারপর যদি জিজ্ঞাসা করি তার বেশি কিছু নন ত? তা হ'লে কি বলবে? সত্যি কথা বোলো। মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে চুরি করতে নেই, আর পাউডার দিয়ে মিথ্যে বলতে নেই।" বলিয়া শক্তি হাসিয়া উঠিল।

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করিয়া মালতী বলিল, "তা হ'লে বলব আমার কথার তুমি উত্তর দিলে না।"

শক্তি বলিল, "তা হ'লে আমিও বলব, আমার কথারও তুমি উত্তর দিলে না।"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া মালতী বলিল, "তা হলে ভালই হ'ল। তোমার উত্তর না দেওয়ায় আর আমার উত্তর না দেওয়ায় কাটকুট হ'য়ে দাঁড়াল যে, অশোকবাবু তোমার মাসতুত ভাইয়ের বন্ধুর বেশি আর-কিছু নন।"

নিমীলিত চক্ষে শক্তি বলিল, "এতে তুমি খুসি হ'লে মালতী?"

শক্তির চিবুকের উপরকার পাউডার ঘষা শেষ করিতে করিতে মালতী বলিল, "নিশ্চয় হলাম।"

"সুবিধে হ'ল তোমার?"

"হ'ল বৈ কি।"

"পথ বোধ হয় নিষ্কণ্টক হ'ল?"

"খুব নিষ্কণ্টক হ'ল! মস্ত-বড় বাবলা টা পথ থেকে স'রে গেল।"

শক্তির একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, বাবলা কাঁটা বলিতে মালতী কি বুঝাইতে চাহে। কিন্তু সে কথা আপাতত না জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "কিসের পথ?"

শক্তির দুই চক্ষের পাউডার ঝাড়িয়া মুছিয়া দিয়া মালতী বলিল "বাবে! পথের কথা তুমিই ত তুললে,—তুমি বল কিসের পথ।"

মালতীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া শক্তি বলিল "সৌভাগ্যের?"

সজোরে ঘাড় নাড়িয়া মালতী বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সৌভাগ্যের নিশ্চয়ই। সৌভাগ্যের তাতে আর কি সন্দেহ আছে!"

"কার সৌভাগ্যের?"

"আমাদের।"

"তোমাদের? তোমাদের মধ্যে প্রথম কে? তুমি?"

মাঝের ঘরে ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল।

ব্যস্ত হইয়া মালতী বলিল, "আমি, না আর কেউ, বাড়ি গিয়ে সে সব কথার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। দশটা বেজে গেল, আর দেরি করা নয়,—দাদার অফিস যাবার সময় হোল। আমরা গিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিলে দাদা অফিস যাবেন।"

"কোন্ অফিসে যান তোমার দাদা?"

"চৌধুরী-সেনের আটর্নির অফিসে। দাদা সে অফিসে articled কি-না।"

বাকি প্রসাধনটুকু তাড়াতাড়ি সমাপ্ত করিয়া মালতী জুতার বাণ্ডিল খুলিল। দুই জোড়া জুতার মধ্যে যে জোড়া শক্তির পরিচ্ছদের সহিত বেশি খাপ খায় সেই জোড়া শক্তিকে পরাইয়া শক্তিকে লইয়া নিচে নামিয়া আসিল।

রান্নাঘরের সম্মুখে বারান্দায় বসিয়া বিনোদ বাটনা বাটিতেছিল শক্তি ও মালতীকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শক্তি বলিল, "আমি মালতীদের বাড়ি চললাম বিনোদ,—এ বেলা এখানে খাব না তা জান ত?"

বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ দাদাবাবুর মুখে শুনেছি।" তাহার পর ঈষৎ সংকোচের সহিত ইতস্তত করিয়া বলিল, "দাদাবাবুর খাবার সময়ে আপনি থাকবেন না দিদিমণি?"

এ কথার উত্তর দিল মালতী; বলিল, "তোমার দাদাবাবু ত' এগারটা সাড়ে এগারটার সময়ে আসবেন?"

মালতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এগারটা সাড়ে এগারটা হবে বই কি?"

"তা হ'লে সেই পর্যন্ত আমাদের আটকে রাখতে চাও না-কি?"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে না, তা আর কেমন ক'রে হয়।"

"তবে?"

ঈষৎ অপ্রসন্ন সুরে বিনোদ বলিল, "তা হ'লে নিয়েই যান।"

তাহার পর শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "চায়ের আগে নিশ্চয় আসবেন দিদি-মণি। আপনি এলে তারপর দাদাবাবু চা খাবেন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মালতী বলিল "সে কথাও তোমার দাদাবাবু তোমাকে বলে গেছেন না-কি?"

ঈষৎ অপ্রতিভ কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে না, আমি নিজেই বলছি।"

এবার হাসিয়া ফেলিয়া মালতী বলিল, "তোমার ভাবনা নেই, চায়ের আগেই তোমার দিদিমণিকে আমি নিয়ে আসব। আজ বিকেলে এখানে চা খাবার জন্যে আমাকেও তোমার দাদাবাবু নিমন্ত্রণ করেছেন।"

"যে আজ্ঞে।" বলিয়া বিনোদ নত হইয়া করযোড়ে অভিবাদন করিল।

গাড়িতে উঠিয়া শক্তির কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুস্বরে মালতী বলিল, "বাপ রে! বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো যে বলে, এ দেখছি তাই! মনিবের যদিও বা কোনো রকমে হুকুম হোল ত' চাকর-মহারাজ ছাড়তে চান না। তোমার পাল্লায় যে পড়ে তার আর রক্ষে থাকে না দেখছি। বুড়ো বিনোদও তোমার অদর্শন সহ্য করতে নারাজ।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়া শক্তি স্মিতমুখে মালতীর ওষ্ঠাধরে অঙ্গুলির মৃদু আঘাত করিল।

মূল্যবান বৃহৎ মোটরকার নিঃশব্দ মসৃণ গতিতে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়া দক্ষিণ দিকে ছুটিয়া চলিয়াছিল। প্রণবরা ধনশালী, সে কথা শক্তি কথায়-বার্তায় ইঙ্গিতে-অনুমানে কতকটা ধারণা করিয়াছিল, উপস্থিত মোটরকারের আভিজাত্য এবং

শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া সে ধারণা বর্ধিতও হইয়াছিল। কিন্তু মিনিট পনের ষোল পরে পার্ক সার্কাস অঞ্চলের একটা বৃহৎ কম্পাউন্ডওয়ালা অট্টালিকার মূল্যবান লোহ গেট অতিক্রম করিয়া গাড়ি যখন ভিতরে প্রবেশ করিল তখন তাহাদের বৈভবের আরো অনেকটা পরিচয় পাইয়া সবিস্ময়ে সে বলিল, এই তোমাদের বাড়ি মালতী?"

স্মিতমুখে মালতী বলিল, "এই। ভাল লাগ্‌ল তোমার?"

প্রসন্নমুখে শক্তি বলিল, "চমৎকার!"

দেখিতে দেখিতে মোটরকার গাড়ি-বারান্দায় আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। উর্দিপরা এক নেপালী বালক-ভৃত্য বারান্দা হইতে নামিয়া আসিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল।

গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া মালতী বলিল, "হ্যাঁরে টেকবাহাদুর, দাদাবাবু কোথায়?"

দক্ষিণ দিকের একটা কক্ষ দেখাইয়া টেকবাহাদুর বলিল, "অফিস ঘরে কাজ করছেন।"

কাজ করিতে করিতে প্রণব মোটর আসার শব্দ, এবং মালতী ও টেকবাহাদুরের কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিল। বারান্দায় বাহির হইয়া আসিয়া নূতন করিয়া শক্তির এই তৃতীয় বারের সজ্জিত সুন্দর কমনীয় মূর্তি দেখিয়া সবিস্ময়ে আনন্দে মুহূর্তের জন্য সে নির্বাক হইয়া গেল; তাহার পর সহাস্য মুখে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "আসুন, আসুন, মিস্ মুখার্জি, শুভাগমন হোক্!"

সিঁড়ি দিয়া বারান্দায় উঠিতে উঠিতে শক্তি প্রণবের দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে নমস্কার করিল।

শক্তি বারান্দায় আরোহণ করিলে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রণব বলিল "এখন মালতীর জেলখানায় সমস্ত দিন বন্দী ত?"

উত্তর দিল মালতী; বলিল, "সমস্ত দিন আর কোথায়? সাড়ে দশটা বাজল, আর বিনোদ মহারাজের হুকুম বিকেলে চায়ের আগে পৌঁছে দিতে হবে। তা হলে ক ঘণ্টাই বা বল?"

প্রণব বলিল, "বেশ ত, ছ মাস জেল হলে, পরে আঠারো মাস যে হতে নেই, এমন তো নয়। আবার কোনো সময়ে আঠারো মাসের মেয়াদে গ্রেপ্তার করে আনলেই চলবে।"

হাসি মুখে মালতী বলিল, "এমন কি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের মেয়াদে গ্রেপ্তার করে আনাও চলতে পারে।"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া স্মিতমুখে প্রণব বলিল, "না, তা চলবে না। আমাদের এ বাড়িকে আন্দামান দ্বীপ বলে স্বীকার করতে আসামী কিছুতেই রাজি হবেন না।"

তাহার পর শক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আচ্ছা, ওপরে গিয়ে ততক্ষণ মার সঙ্গে দেখা করুন, হাতের কাজটুকু সেরে এখনি আমি আসছি।"

বারান্দার বাম দিক দিয়া কাঠের প্রশস্ত সিঁড়ি বার দুই বাঁক ফিরিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। তাহার দুই দিকে হাতখানেক করিয়া বাদ দিয়া মধ্যস্থল ভেদ করিয়া ঘন নীল বর্ডার দেওয়া সবুজ বর্ণের পরিচ্ছন্ন কার্পেট। সিঁড়ির বাম দিকে দেওয়ালের গায়ে মাঝে মাঝে টাঙানো কয়েকজন দেশপূজ্য ভারতবাসীর প্রতিকৃতি। সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে সুদৃশ্য কর্ণারপীসের উপর স্থাপিত মর্মর নির্মিত সুগঠিত নারী মূর্তি; তাহাদের সম্মুখানত দেহের দক্ষিণ হস্তে বিজলী বাতি: রাত্রে সেইগুলি হইতে উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইয়া সিঁড়ির পথ আলোকিত করে। দক্ষিণ দিকে কাঠের রেলিং; তাহার আধুনিক-রুচিসম্মত হাল্কা কাজের উপর এমন মসৃণ পালিশ যে, মাছি বসিলে পিছলাইয়া পড়ে।

অংশের দ্বারা সমগ্রের পরিচয়ের ন্যায়, এই সিঁড়ি হইতে সমস্ত গৃহের সমৃদ্ধির একটা সুস্পষ্ট ধারণা শক্তির মনে জাগ্রত হইল।

দ্বিতলে সিঁড়ির প্রান্তে দাঁড়াইয়া মালতীর বিধবা জননী যোগমায়া প্রসন্নমুখে শক্তি এবং মালতীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

দুই তিনটা সিঁড়ি বাকি থাকিতে যোগমায়ার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিমুখে মালতী বলিল, "মা দেখ, কি চমৎকার।"

স্মিতমুখে যোগমায়া বলিল, "সত্যিই চমৎকার।" উপরে উঠিয়া শক্তি নত হইয়া যোগমায়ার পদধূলি গ্রহণ করিলে যোগমায়া শক্তিকে দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া সস্নেহে চিবুক চুম্বন করিল।

(ক্রমশ)

ভীমলী

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

একদা এই ছোট ধীবর পল্লীটি দুর্ধর্ষ অন্ধ্ররাজাদের প্রধান বন্দর ছিল। বঙ্গ, কলিঙ্গ, মাসুলিপট্টনম, সিংহল এমন কি জাভা সুমাত্রা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বাণিজ্য দ্রব্যের আদানপ্রদানের ক্ষেত্র এবং এখনও সাবেকি শ্রেষ্ঠীদের লুপ্ত সম্পদের আভাস পাওয়া যায়। বহু শতাব্দী পুরাতন পরিখা, প্রাকার আর অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখন জঙ্গলী গাছের ঘন পল্লবে অবগুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে আর তারই মধ্যে দিয়ে খোয়াই-র একটি রক্তশাখা চলে গেছে। অদূরে একটি সু-উচ্চ পাহাড়ের গায় নরসিংহদেবের মন্দিরের শীর্ষে যে বিশাল শিলাখণ্ড আছে তার উপরে উঠলে সাবেকি সুসজ্জিত উদ্যানের অস্পষ্ট রেখা, বিরাট স্তূপ, সরোবর পরিত্যক্ত রাজপথের চিহ্ন এখনও চোখে পড়ে।

বন্দরটি ওলন্দাজ দস্যু আসবার পূর্বেই কোন নদী উত্তর-পূর্বে সরে গেছে। ওলন্দাজ কবরগুলি সাজাহানের সমসাময়িক, সেগুলির ওপর প্রস্তর খোদিত নাম ধাম, তারিখ ও মৃত্যু অভি-চিহ্ন এখনও সুস্পষ্ট। যেন কালই সেদিনের ব্যাপার। সাবেকি বন্দর ও বর্তমান শহরতলীর মাঝে অনেকখানি জুড়ে আছে শৃগাল ও সর্পসংকুল ঝাউ ও কেয়া জঙ্গল—তারপর খোয়াই। স্থানীয় কিংবদন্তী হচ্ছে যে খোয়াই—এরপর থেকে গোদাবরী পর্যন্ত যে অবিরল পর্বত শ্রেণী আছে তারই অন্তরাল হতে এসে মধ্যম পাণ্ডব ভীমচন্দ্র এই অঞ্চলের একটি শিলাখণ্ডের উপর কোন অতিকায় রাক্ষসীকে বধ করেছিলেন এবং খোয়াইটি নাকি তারই উষ্ণ রক্তধারায় রচিত হয়েছিল। খোয়াইর খাতগুলিকে মাঝে মাঝে যথার্থই শোণিতরঞ্জিত মনে হয়। সমুদ্র, উদ্ভিদ, আকাশ, বালু ও মাটি কোনটির পর কিভাবে সূর্যালোকে পড়ে সে বর্ণসংকর ঘটাতো বলা কঠিন, কিন্তু অনেক সময় পাহাড়ের মাথায় ভাঙ্গা ওলন্দাজ কুঠি থেকে মনে হতো যে ওপর হতে নির্ঝরের মত পড়ে শতধা হয়ে গেছে তপ্ত রক্ত।

অজয় বিজয়নগরে পদার্পণ করেই শুনলো যে ভীমলী রাক্ষসীর প্রেতাত্মা নাকি বহু সহস্র বৎসর নরক যাপন করে পূর্বতন লীলাক্ষেত্রে ফিরে এসেছে এবং বর্তমানে দেহের অভাবে নর মাংস ভোজনের ব্যবস্থা করে উঠতে না পারলেও পর পর চম্পড়, পালু, বিমলী, উপ্পল ইত্যাদি গ্রামবাসীদের আতঙ্কে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

ব্যাপারখানা আরও বিশদভাবে বুঝিয়ে দিল বিজয়নগর রাজকলেজের এক অন্ধ্র সহকর্মী। প্রায় বছর দুই পূর্বে ধীবরদের মধ্যে আতঙ্কের সূত্রপাত হয়, কিন্তু সপ্তাহ দুই পূর্বে পূর্ণিমা রাত্রে অনেকে সমুদ্র-তীরে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখেছে। এক শুভ্রবেশী এলোকেশী নারী মূর্তিকে অনুসরণ করে একটি অতিকায় ঋষিমূর্তিকে উড়ে গিয়ে খোয়াইর মধ্যে মিলিয়ে যেতে দেখেছে তারা। তার পূর্বে মাঝে মাঝে শুনেছে দূরাগত কলহ নারী ও পুরুষ কণ্ঠে। পুলিসের রিপোর্ট হচ্ছে যে, ধীবর পল্লীর কোন দুষ্ট লোকের কণ্ঠস্বর কোন উপায়ে খোয়াই-এর মধ্যে প্রবেশ করায় প্রতিধ্বনির ঘাতপ্রতিঘাতে অপরূপ শব্দের সৃষ্টি হয়।

অজয় বিজয়নগর রাজ কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়ে পর্যন্ত প্রথম ছুটি পেয়েছে আর তার অর্ধেক কাটিয়ে এসেছে দেশে। বাকিটা ওয়াল্টেয়ারে কাটাবে মনস্থ করেছিল, কিন্তু ভেঙ্কটারাও বলে বসলো, "জেলেরা মূর্খ হতে পারে, কিন্তু তারা মিথ্যা কথা বলে না।"—অজয় বলতে যাচ্ছিল যে কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাস অনেক সময় চক্ষু কর্ণকে বিভ্রান্ত করে দেয়—তাকে বাধা দিয়ে রাও উত্তপ্ত হয়ে বললে, "অথচ তাদেরই সাক্ষ্যের জোরে তোমাদের আইন লোককে ফাঁসী দেয়—তার চেয়ে নিজেই দেখে এসো না—আমার মামা লক্ষ্মীনারায়ণের বাড়িতে উঠতে পারো।"

রেলপথ হতে দূরে বিক্ষিপ্ত এই ক্ষুদ্র শহরতলীটির অনেক প্রশংসা শুনেছে অজয়, কিন্তু সেখানে যাবার সুযোগ পায় নি। ভাবলো ঘুরে এলে মন্দ কি হয়।

তারপরের সপ্তাহের কথা। অজয় যখন বাস থেকে নামলো তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। শহরতলীর বিজলীবাতিগুলি জ্বলে উঠলো অথচ তখনও পূর্ব আকাশে এক-খণ্ড মেঘ সূর্যালোকে রঞ্জিত হয়ে রয়েছে। ক্লকটাওয়ারের কাছে অন্ধকার গাঢ়তর হলো তৎক্ষণ আকাশের গায়ে অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড মেঘ জমায়েত হয়ে সপ্তমীর চাঁদকে ঢেকে ফেলেছে। আবছা আলোয় কুলির মাথায় বোঝা চাপিয়ে অজয় উচ্চতম বাড়ি লক্ষ্য করে অগ্রসর হলো। বাস এসেছিলো সেই পথে। এমন অদ্ভুত জনবিরল পথ সে কখনও দেখে নি।

মোড়ের কফীখানা পর্যন্ত মূহ্যমান। অজয় কাছে এসে দেখলো যে বাড়িটির প্রবেশ পথ স্খলিত ইঁট আর ঘন জঙ্গলে দুর্গম। একতলাটি উচ্চ প্রাকার ও বৃক্ষপল্লবে ঢাকা। দোতলার প্রশস্ত বারান্দার অনেকগুলি স্তম্ভ ভেঙ্গে পড়েছে আর একটি কপাট-শূন্য গবাক্ষ পথে ছাদের দীর্ণ অংশ দিয়ে কালো মেঘের সোনালী পাড় দেখা যায়। অবোধ্য ভাষায় ও আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে লাগলো যে সে আর একপদও অগ্রসর হবে না। • •

রাও বলেছিল যে শহরের মধ্যে একমাত্র তিন তলা বাড়িটি হচ্ছে ওর মাতুলালয় এবং এ বাড়িটি যে তিনতলা অনেকদূর থেকে তা দেখা যায় অথচ সেই অন্ধকারপুরীতে মানুষ থাকতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। সে আর কোন প্রবেশপথ দেখতে পেলো না—ভাবলো কফীখানায় রাত্রিবাস করে পুনরায় দিনের আলোতে আসবে—কুলিটিও যেন বেঁচে গেলো, কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যেতে হলো—নারীকণ্ঠে ক্ষীণ অথচ তীব্র কাতরোক্তি কর্ণে গেলো এবং মনে হলো যে শব্দটি যেন ভাঙ্গা বাড়ি হতে আসছে। কুলিটি মাল নামিয়ে রেখে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। অজয় অণুমাত্রও আতঙ্কিত হয় নি, কিন্তু যারপরনাই বিরক্ত হলো কুলিটির ওপর। কাছেই কফীখানা, স্বত্বাধিকারী ইংরাজী জানে বললে, "লক্ষ্মীনারায়ণের বাড়ি তো প্যাগোডা স্ট্রীটে মশাই, এদিকে এলেন কেন—সোজা এই রাস্তা দিয়ে গিয়ে হাসপাতালের কাছে বাঁ দিকে—এখানে ঐ একটা মাত্র তিনতলা বাড়ি"—

"তবে ঐ যে ওখানে"—

দু তিনটি তন্দ্রাচ্ছন্ন ব্যক্তি, হোটেলের কর্মচারী হবে, চক্ষু বিস্ফারিত করে উঠে বসলো। উত্তর দিল স্বত্বাধিকারী "রাত্রে ও দিকে যাবেন না।"

অজয় তার মোট দুটি নিজেই তুলে নিলো। চাঁদের আলোতে চওড়া রাস্তার অনেকখানি আলোকিত হয়েছে তৎক্ষণ, কিন্তু পথ জনশূন্য। বাজারের মধ্যে কয়েকগুলি দোকান তখনও বন্ধ হয় নি। মাঝে মাঝে সোডা খোলার আওয়াজ আর সমুদ্রের অবিশ্রান্ত বিস্ময়কর গর্জন কোথাও কোন

সাড়া শব্দ নাই। কিছুদূরে গিয়েই অজয় তার গন্তব্যস্থান চিনতে পারলো।

দ্বারে আঘাত দিতেই গৃহস্বামী বেরিয়ে এলেন—দীর্ঘকায় প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ, নগ্ন অঙ্গে যজ্ঞোপবীত, ললাটে রক্তটিকা—বললেন, "আপনি মিস্টার রায়—চলুন ওপরে আপনার ঘর পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে—মাল এখানে রাখুন আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

একটি সংকীর্ণ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কতকগুলি অপ্রশস্ত ও নিচু দরজা পার হয়ে অজয় এক অত্যাশ্চর্য জগতে উপস্থিত হলো। ঘরটি চিলাকোঠার নামান্তর মাত্র, কিন্তু সংলগ্ন ছাদ হতে মুক্ত আকাশ, বিপুল সমুদ্র, সু-উচ্চ পাহাড় ও পদতলের কুটীর বৃক্ষপল্লব ও রাজপথ আনন্দে অভিভূত করে ফেললো তাকে। তখন কালো কালো মেঘগুলি যেন চাঁদকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। বাতাস উত্তাল উন্মত্ত হয়ে উঠেছে আর সমুদ্রের গর্জনও যেন বেড়েছে।

রাত্রের আহার্য সঙ্গেই ছিল। গৃহস্বামীকে বিদায় দিয়ে অজয় একটি কেদারার ওপর বসলো। পাশের পাহাড় ও পাহাড় গাত্রের মন্দিরটি মনে হলো যেন হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করা যায়—এত কাছে। বাকি তিন দিকই প্রায় সমুদ্র। ঘোর কৃষ্ণপটের ওপর যেন স্তবকে স্তবকে শ্বেত পুষ্পমালা কোন ক্রুদ্ধা দেবকন্যার পদদলিত হচ্ছে। বাতাস সারা রাত্রি বিক্ষুব্ধ থেকে শান্ত হলো ভোরের দিকে।

পরদিন অজয় আনন্দ বিস্ময়ে দেখলো প্রকৃতির বর্ণ ভাণ্ডার যেন উজাড় করে ফেলা হয়েছে তার চার দিকে। নারিকেল, তাল, কদলী, বট, আম, সফেদা, মনসা, শজিনা, চাঁপা ইত্যাদি ফল ও ফুল বৃক্ষ ও পল্লব লাল টালির ছাদ ও গেরুয়া রঙের রাজপথগুলিকে বেষ্টন করে নানা স্তরের হলুদ ও হলুদ বর্ণ বিস্তার করেছে। অদূরে সমুদ্র ও আকাশের গাঢ় আর ফিকে নীলের ওপর ভাসমান দুগ্ধ শ্বেত ফেনা ও মেঘ।

অজয় বেরিয়ে পড়লো। ভেবেছিলো বেড়িয়ে ফেরবার সময় সেই হোটেলটাতে কফী খেয়ে নেবে কিন্তু লাইট হাউসের কাছে এক দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গেরুয়া বসনধারী ব্যক্তি অনাহূত ভাবে পাশে এসে বসে ইংরাজিতে বললে, "আপনি দেখছি নূতন এসেছেন, বাঙালী বলে মনে হচ্ছে। কদিন থাকা হবে, কোথায় উঠেছেন, এখানে হোটেলে কিছু খাবেন না, নির্ঘাত অসুখ করবে, তার চেয়ে ডাক বাংলায় ব্যবস্থা করুন—চলুন আমি বলে দিচ্ছি—আর বেড়াবার এত সুন্দর সুন্দর জায়গা থাকতে সমুদ্রের ধারে বসে সময় নষ্ট করবেন না—এ দেশের লোকগুলো বড় নোংরা।"—

একসঙ্গে এতগুলি প্রশ্নবাণ ও উপদেশ অজয়কে কিঞ্চিৎ বিহ্বল করে দিল—সে যন্ত্রচালিতের মত ডাক বাংলা পর্যন্ত গেলো—কাছেই, বেশি দূরে যেতে হলো না এবং আগন্তুকের নাম ধাম জানবার পূর্বেই একটি নিম কাটির দাঁতন, জল ও এক কাপ গরম চা জুটে গেলো। অজয় দেখলো যে ডাক বাংলাটিতে সত্যই থাকবার খুব সুবিধে ও স্থানটিও অতিশয় শোভামণ্ডিত; একপাশে সমুদ্রতট ও আর এক পাশে এক সুরম্য অট্টালিকা সংলগ্ন উদ্যান, পিছনে ফলভারে অবনত আম্রকানন। আগন্তুক তার প্রসন্নতা লক্ষ্য করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে বলে মনে হলো অজয়ের। পরস্পরের মধ্যে এবার পরিচয়ের বিনিময় হলো। আগন্তুক সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন বহুদিন। গোদাবরী তীরে তাঁর সাবেকি গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে এবং এখানে এসেছেন সম্প্রতি। উদ্দেশ্য তন্ত্রসাধনা। স্থানটি নাকি তন্ত্রসাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র।

অজয়কে সঙ্গে নিয়ে সন্ন্যাসীটি রাওর মাতুলালয় উপস্থিত হলেন এবং নিজেই উপযাচক হয়ে একটি বিশ্বাসী ভৃত্যের ব্যবস্থা করে দিলেন। ভৃত্যটির নাম আপ্পানা, কিছু কিছু হিন্দুস্থানী ভাষা আয়ত্ত আছে। জল আনবে, জল তুলবে ডাক বাংলা হতে খাবার এনে দেবে, ইত্যাদি কাজ করবার লোক ত প্রয়োজন হবেই তা ছাড়া এখানে বেড়াতে গেলে সঙ্গে একটি পথপ্রদর্শক থাকা বিশেষ দরকার নতুবা সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলি দেখাই হবে না।

গৃহস্বামী লক্ষ্মীনারায়ণবাবু আগন্তুকের এ বদান্যতায় প্রসন্ন হন নি সে কথা অজয়ের বুঝতে বাকি ছিল না, কিন্তু তন্ত্রসাধকের বাঙালী প্রীতি স্বাভাবিক বলেই মনে হলো, বিশেষ করে তিনি যখন বার বার তন্ত্রসাধনার পীঠস্থানগুলির কথা উল্লেখ করছিলেন। স্বজাতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান না থাকায় অজয় নিজেকে অপরাধী বোধ করছিল এবং পূর্বপুরুষদের ঐশ্বর্যময় ইতিবৃত্তের ভূয়সী পরিচয় পেয়ে যথার্থ গৌরব বোধ করতে শুরু করলো। সন্ন্যাসীপ্রবরের বাগ্মিতা সত্যই অসাধারণ। শেষ পর্যন্ত পরম বৈষ্ণব লক্ষ্মীনারায়ণ পর্যন্ত কৌতূহলে আবিষ্ট হয়ে গেলেন।

সেই ব্যবস্থাই হলো। অজয় ডাক বাংলার খানসামা প্রেরিত খানা খেয়ে পরম তৃপ্তিতে দিবা নিদ্রা দিয়ে যখন উঠলো, তখন বেলা অপরাহ্ন। পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের অনন্ত তরঙ্গরাশিচুম্বিত বাতাস গাছপালা দলে চলেছে। রৌদ্রোজ্জ্বল সৈকতের উপর ফেনিল-বলয়গুলো ধরবার জন্য দুর্দান্ত তরঙ্গগুলো যেন ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ছুটে আসছে মত্ত গতিতে। মন্দিরের বিসর্পিত সোপানের উপর কয়েকটি শকুনি জটলা করছে। মাথার উপর দুটি অতিকায় চিল একটি জীবিত কেউটে সাপ নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়েছে। ভৃত্য আপ্পানা অণুমাত্রও বিচলিত না হয়ে তাদের প্রতিযোগিতায় সোল্লাসে উৎসাহ জ্ঞাপন করছে।

দেখতে দেখতে সূর্য ঢলে পড়লো মন্দিরের পেছনে। রৌদ্র পড়ে এলো, বাতাসের বেগ কমে এলো। সমুদ্রের বর্ণ হল অনুজ্জ্বল। জেলেপাড়ার তালপাতা ছাউনি বস্তির অন্তরাল হতে ক্ষীণ শিশু-কলধ্বনি ভেসে এলো। অজয় নীচে নামতে আপ্পানা সঙ্গে সঙ্গে নেমে এলো—বললে, "কফী প্রস্তুত ডাক বাংলায়, নিয়ে আসবো, না আপনি যাবেন।" অজয় কফী খেয়ে সমুদ্রতীরের এক প্রান্তে বালুশয্যায় শুয়ে পড়লো। স্থানটি অদ্ভুতভাবে জনবিরল ও শান্তিপূর্ণ। ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলো। অজয় বিস্মিত হয়ে দেখলো যে, আপ্পানা তার সঙ্গ ছাড়ে নি—বিরক্ত হয়ে বললে, "ডাক বাংলায় খাবার ঠিক রাখতে বলগে যাও আমি যাচ্ছি।"

"আপনি যদি পথ না চিনতে পারেন?"

"ঐ তো ডাক বাংলা—যাও।"

ভৃত্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও গেলো। অজয় ভাবলো খানিকটা হেঁটে আসবে। সোজা পশ্চিম দিকে হন হন করে হেঁটে গেলো ভিজে বালির ওপর দিয়ে। সমুদ্রতীরে কোথাও জনপ্রাণী নাই। এক জায়গায় কতকগুলি বড় বড় প্রস্তরখণ্ড দেখে একটু বসলো। পায়ে ঠেকলো একটি শঙ্খ। অত্যন্ত চমকপ্রদ তার গঠন দেখলো স্বপ্নালোকে। সেই স্থানটিতে আরও কতকগুলি শঙ্খ পাওয়া গেলো। কতক্ষণ ছিলো স্মরণ ছিল না—একবার মাথা তুলে স্তম্ভিত হয়ে গেলো—স্পষ্ট দেখলো যে দূরে বালু স্তূপের ওপর দিয়ে এক এলোকেশী নিঃসঙ্গ নারী মূর্তি স্বপ্নাবিষ্টের মত চলেছে আরও পশ্চিমে জঙ্গলের মধ্যে।

পশ্চাদ্ধাবন করতে সাহস হলো না। কিছুক্ষণ পরে যখন ফিরছে দেখলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে ভৃত্য আপ্পানা। সে হাঁফাতে হাঁফাতে অত্যন্ত বিচলিতভাবে বললে যে খানা প্রস্তুত।

রাত্রে ছাদের ওপর বিছানা করে শুয়ে পড়লো এবং আপ্পানা শুলো সিঁড়ির পথ আগলে। অজয় ভাবছিলো দৃষ্টিভ্রম হয় নি তো? মনে হলো বাঙালী মেয়ে—অথচ গত বছর দুই কোন বাঙালী পদার্পণ করে নি নাকি এদেশে লক্ষ্মীনারায়ণ বলছিলেন—আর দু বছর আগে একটি বাঙালী মেয়ে নাকি ডুবে মরে। বেশিক্ষণ অবশ্য গল্প হয় নি। ভদ্রলোক স্ত্রী বিয়োগের পর থেকে নিয়মিত ভাবে ছেলেদের খাইয়ে, সুর করে তেলেগু ভাষায় গীতা পাঠ করে, তবে শুতে যান। অত্যন্ত নরম প্রকৃতির মানুষ। ছাদের ওপর থেকে নীচের অন্দর মহলের অনেকখানি দেখা যায়। হাসপাতাল খুবই নিকটে। বারান্দার খাটগুলিতে রোগী ভর্তি। পাশে

কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নিমগাছ ও তার পিছনে পাহাড়ের পাদদেশে একটি বঙ্কিম পথরেখা চলে গেছে কবরস্থান ও শ্মশানের দিকে।

দুপুরে অজয় একটি রীতিমত ভয়াবহ দৃশ্য দেখেছিল। একটি অল্প বয়সী স্ত্রীলোকের শবদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল আসন পিঁড়ি করে বসিয়ে।

সমাধিস্থ তপস্বিনীর মত সৌম্য মূর্তিটির সম্মুখে কলার নৈবেদ্য। ডুলির মাথায় তাল ছবের ওপর একটি ধাতু পাত্র। বাহকদের গতি শ্লথ করে দিচ্ছে শবের প্রতি দৃষ্টি বদ্ধ শোকাকুলা আত্মীয়া ও বান্ধবীর দল। প্রধান শোকাবিষ্টা এক বৃদ্ধা, বোধ করি মা হবে, চলেছিলো স্বপ্নাবিষ্ট সৈনিকের মত তালে তালে পা ফেলে। চক্ষু নিমিলিত, বস্ত্র সিক্ত। এক ব্যক্তি ক্রমাগত তার মস্তকে ঢালছে হলুদ জল, আর এক ব্যক্তি মোটা একখণ্ড কাঠি নিয়ে পথের দুই পার্শ্বে শূন্যের মধ্যে আঘাত করতে করতে চলেছে—উদ্দেশ্য প্রেতাত্মাগুলিকে দূরে রাখা। দুই পার্শ্বে জেলে পল্লীর বাসিন্দার তৈলচিক্কণ বলিষ্ঠ দেহগুলি মদ্যপানে অথবা বাদ্যভাণ্ডের উন্মাদনায় উত্তেজিত।

অজয় উপবিষ্ট শব মূর্তিটিকে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। শুনলো এরা দাহ করে না, শুষ্ক ও হাল্কা বালুর ঢিবির মধ্যে পুঁতে দেয় আর তার পর রৌদ্রতাপে ও বাতাসে দেহের অস্থি পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়।

লক্ষ্মীনারায়ণ বালু ঢিবিগুলিকে দেখিয়ে ছিলেন যে দিকে সেই দিক থেকেই নাকি ভীমলী রাক্ষসীর কাতরোক্তি বাতাসে ভেসে আসে। অনেক সময় একাধিক কণ্ঠধ্বনি একসঙ্গে শুনেছেন লক্ষ্মীনারায়ণ নিজের কানে।

আপ্পানা ভয়ে জড়সড় হয়ে শুনছিল সেই সকল কথা, অথচ একা সিঁড়ির কাছে শুয়ে থাকতে তার ভয় নাই।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেলো অজয়ের। চাঁদ অনেকক্ষণ অস্তমিত তবু পূর্ণ সূর্য গ্রহণের মত একটা মরা আলো যেন চারিদিক আলোকিত করে আছে। প্রখর বাতাসে মশারি একপ্রান্ত হতে উড়ে গিছলো। অজয় চোখ খুলেই দেখলো আপ্পানা চেয়ে আছে তার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে। অজয়ের গায়ের লোমগুলি অকস্মাৎ খাড়া হয়ে উঠলো—

বহুদূর হতে নারী কণ্ঠস্বরে ক্ষীণ অথচ তীব্র আর্তনাদ ভেসে আসছিল—অজয় ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াতে আপ্পানা ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বললে "ভীমলী"—অজয়ের কর্ণে প্রবেশ করলো আর একটি কণ্ঠধ্বনি—কর্কশ পুরুষ কণ্ঠে অস্ফুট তিরস্কারের মত। আপ্পানা সে ধ্বনি আবৃত করে আপন ভগ্নকণ্ঠে বললে, "ঐ দেখুন"—অজয় দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলো সমস্ত সমুদ্র ফসফেরাসের প্রভায় উদ্ভাসিত। ঐ দৃশ্য অজয়ের কাছে সত্যই অভূতপূর্ব, কিন্তু আপ্পানার আতঙ্কের কারণ সে নির্ণয় করতে পারলো না। অশিক্ষিত ব্যক্তির কুসংস্কার পোষণ করা অনিবার্য কিন্তু সমুদ্রের অনুপ্রভা নিশ্চয় আকস্মিক ব্যাপার নয়—কিছু বিরক্ত ও বিস্মিত হয়ে ভৃত্যকে ছাদের ওপর এক কোণায় শয়ন করবার অনুমতি দিয়ে সে পুনর্বার শোবার ব্যবস্থা করলো। ঘুম আর এলো না। কিন্তু অবিশ্রান্ত সমুদ্র গর্জন ও আপ্পানার নাসিকাধ্বনি ব্যতীত আর কোন শব্দ সে শুনতে পেলো না। এতখানি আতঙ্কিত ব্যক্তি এত শীঘ্র ঘুমিয়ে পড়তে পারে কেমন করে সে ভেবে পেলো না।

পূর্বাকাশ আলোকিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অজয়ের অদম্য ইচ্ছা হলো যে পূর্বদিনের সান্ধ্যভ্রমণের স্থানটি দেখে আসবে দিনের আলোতে। আপ্পানার সুপ্তদেহ লঙ্ঘন করে দরজা খুলে নিঃশব্দে নেমে গেলো সে। ঊষার আলোক তখনও অর্ধস্ফুট। রাজপথগুলি জনবিরল। দোকানপাট বন্ধ। পূর্বরাত্রের জোয়ারে কাঠকুটা ও জাল নিক্ষিপ্ত হয়েছে অনেক ঊর্ধ্বে। পশ্চিম দিকের তটরেখা কালো বালু ও শিলারাশিতে অস্পষ্ট। সেখানটা উপকূলে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরে গেছে সেখানে এসে অজয় তার পরিচিত শিলাখণ্ডটিকে দেখতে পেলো। অদূরে কেয়া ও ঝাউ জঙ্গল, তারপর উঁচু উঁচু বালু ঢিবি। ওপরে উঠে অনেকগুলি পদচিহ্ন দেখতে পেলো। নিকটে লোকালয় আছে বলে মনে হলো না। অবিরল বালুর ঢিবি ও তারপর খোয়াইর রক্তরেখা। ততক্ষণ সূর্যোদয় হয়ে গেছে।

"সুন্দর দৃশ্য কি বলেন? আপনাদের দেশের তাম্রলিপ্ত ঠিক এমনি ছিল।" অজয় বিস্মিত হয়ে দেখলো পিছনেই সেই তন্ত্রসাধক। নমস্কার করে বললে "খুব সুন্দর—কিন্তু তাম্রলিপ্তের কথা কেমন করে জানলেন?"

অজয়ের বিস্ময় লক্ষ্য করে সন্ন্যাসী বললেন, "আমাদের মত ভিখারী লোকেরা শ্মশানে-মশানে ছাড়া আর কোথায় থাকতে পায় বলুন—তা ছাড়া সাধনার পক্ষে সুবিধে—আর তাম্রলিপ্তের কত কথা যে এখানকার পুরাতন শ্রেষ্ঠীদের পুঁথিগত আছে তার ঠিকানা নেই—তবে খুঁজে বার করতে হয়। সে সব কি লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়?

অজয় ভাবলো সে ইতিহাসের অধ্যাপক বলে সাধু নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেবার চেষ্টায় আছে। এ দুর্বলতার জন্য তার হাসি পেলো—বললে "বাঙলাদেশের ইতিহাস নদীর মাটিতে গড়া তার তারই জলে ধুয়ে যাওয়া"—

সাধু উঁচু ঢিবি হতে তার মুখের প্রতি ক্ষণিকের জন্য তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পাত করে হো হো করে হেসে বললো, "ঠিক বলেছেন জগৎ অনিত্য—চলুন আপনাকে এগিয়ে দিই—ঐ যে আপনার চাকরটিও আসছে। ওর মত প্রভুভক্ত লোক হয় না।

অদূরে অপরাধীর কণ্ঠে আপ্পানা বললে, "কফি প্রস্তুত হয়েছে।"

(ক্রমশ)

অনুবাদসাহিত্য

ছাগলে পাগল করে

প্রেমচন্দ্

আজকাল দুধের বড় কষ্ট। কয়েকটা ডেয়ারি ফারমের দুধ পরীক্ষা করা গেল। কিন্তু কোন ফল পাওয়া গেল না। দু'চার দিন দুধ বেশ ভালই থাকে। কিন্তু তারপরই রীতিমত গোলমাল আরম্ভ হয়। কোথাও ভাল দুধ পাওয়া গেল না। অবশেষে একদিন এক বন্ধুকে দুধের কথা বললাম। তাঁর নিকট প্রস্তাব করলাম, "এস ভাই, দু'জনে একসঙ্গে মিলে সাজাতে একটা গাই খরিদ করা যাক। তা হলে তোমার ও আমার দু'জনেরই দুধের আরাম হ'বে। রাখালের খরচা আমরা আধাআধি দিব। দুধও আধাআধি বখরা হ'বে।" আমার বন্ধুটি তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন। আমার ঘরে গাই রাখবার তেমন কোন জায়গা ছিল না। তাছাড়া গরুর মলমূত্র ইত্যাদিকেও আমি বড় ঘৃণা করি। আমার বন্ধুর বাড়িতে প্রচুর জায়গা আছে। ঠিক হ'ল যে গাই বাছুর তাঁরই বাড়িতে থাকবে। তার বদলে গোবর টোবর আর কোন বখরা হ'বে না। সবই তিনি পাবেন।

দৈনিক দুধ আসতে লাগল। মনে করলাম, বাঁচা গেল। রোজ রোজ অভিযোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। এক সপ্তাহ বেশ চলল। কোন অসুবিধা হ'ল না। না অভিযোগ এল না। রোজ গরম গরম খাঁটি দুধ খাই, আর খুশি মনে গান গাই।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আবার সেই পুরাতন অভিযোগ আরম্ভ হ'ল। এমন কথাও শোনা গেল যে এ দুধ নামেই দুধ। না আছে এতে মাখনের অংশ না আছে এতে মিষ্টিস্বাদ। পূর্বে দুধের জন্যে কত অভিযোগ করতাম। বকাবকি ক'রে মনের রাগ বেশ করে মিটিয়ে নিতাম। যখন অভিযোগ করেও কোন ফল হ'ত না তখন দুধ কেনা বন্ধ ক'রতাম। কিন্তু আর অভিযোগ ক'রবার সুযোগ নাই। দুধ বন্ধ ক'রবার কথাই উঠতে পারে না। দুধ খাও, অথবা নর্দমাতে ফেলে দাও, তাতে কা'রও কিছু যায় আসে না। ছেলে তবু দুধ মুখেই দিতে পারত না। পান করা ত দূরের কথা। আধেক দুধে আধেক চিনি ঢেলে কিছুদিন কোনওরকমে চলল। ইতিমধ্যে ঘরে বাইরে প্রত্যহ কথা কাটাকাটি আরম্ভ হ'ল। আমার গিন্নি ত ক্রোধে অগ্নিশর্মা। তিনি চাকরটিকে প্রায় বলতেন, "দুধ নিয়ে যা, আর তার সামনে ফেলে দে।" কিন্তু আমি তাকে নিষেধ করতাম। গিন্নি রাগ ক'রে বলতেন "তোমার বন্ধুটির লজ্জা হয় না? তিনি কি এত বোকা যে এইটুকু বোঝেন না যে আমরা এই দুধ দেখে কি মনে ক'রব? নাঃ, এবার গাই বাছুর আমাদের ঘরে আনিয়ে রাখব। তা হ'লে দুধ ত ভাল পাওয়া যাবে।" কিন্তু আমি বন্ধুকে এসব কথা বলতে পারলাম না। তবে আমাকে কিছু ব'লতে হ'ল না। তৃতীয় মাসে বন্ধুটি গাই রাখতে সম্মত হলেন না। আর আমিও একলা গাই রাখতে পারব না। আমাদের আধা-আধি ব্যবস্থা ভেঙে গেল। গাইটিকে বেশি দামে বেচে দিলাম। সেদিন আমি আরামের নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর পেয়ে বাঁচলাম।

অবশেষে এই পরামর্শ হ'ল যে একটা ছাগল কেনা যাক। ছাগলটি আঙিনার এক কোণে পড়ে থাকবে। তার দুধ দুইবার জন্যে গোয়ালার দরকার হবে না তার গোবর উঠাতে হ'বে না। নাদ ধোয়া আর দানাভুষি খাওয়াবার জন্যে একটা রাখাল রাখলেই যথেষ্ট। ছাগল সহজেই দুধ দেবে। তার খাবারের জন্যে সামান্য কিছু চোকড় ফেলে দিয়ে চলে যাও, বাস আর কোন চিন্তা নেই। তাছাড়া, ছাগলের দুধ গরুর দুধের চেয়ে অনেক ভাল। ছেলেরা সহজেই হজম ক'রতে পারবে। এ দুধ বেশ স্বাস্থ্যপ্রদ। আমার পরিচিত যে পণ্ডিত আমার মুসাবেদা নকল করতে এসেছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে জানা গেল যে তিনি এ ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞ। তাঁকে বলাতে তিনি একটি বকরীর এমন সুনাম করতে আরম্ভ করলেন যে, আমি না দেখেই সেটাকে পছন্দ করে ফেললাম। সে নাকি খুব ভাল বংশের বকরী। তার বড় বড় স্তন, একেবারে মাটিতে ঠেকে। সে খায়ও খুব কম। আর দুধ দেবার বেলায় খুব বেশি দুধ দেয়। এক সময়েই দুসের থেকে আড়াই সের দুধ পেতে পারি। এই প্রথম বার তার সন্তান হয়েছে। সব দিকেই লোভনীয় আকর্ষণ। দাম মাত্র ২৫, টাকা। দামটা আমার নিকট কিছু বেশিই বোধ হ'ল। কিন্তু যাকগে। পণ্ডিতের কথার উপর আমার বিশ্বাস ছিল। তাঁকে বকরীটা আনতে বলে দিলাম। তৃতীয় দিনে বকরী এসে উপস্থিত হ'ল। আমি ত দেখে লাফিয়ে উঠলাম। তার যেসব গুণ শুনেছিলাম, এখন যেন তার চেয়েও আর বেশি গুণ দেখলাম।

সন্ধ্যার পর আমার চাকর দুধ দুইল। সত্যই আড়াই সেরের কম নয়। আমার ছোট পাতিলটি ভরে গেল। বুঝলাম আরও বড়পাত্রের দরকার। আহা, একথা কেন এতদিন ভাবিনি! যদি প্রথম থেকেই একথাটা ভাবতাম তাহলে এত দুর্ভোগ পোহাতে হ'ত না। পণ্ডিতজীকে ধন্যবাদ দিলাম। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় আমাকে বকরীর শিং ধরতে হ'ত, তবে দুধ পাওয়া যেত। কিন্তু ভাল দুধের বিনিময়ে এ কষ্টটা কিছুই নয়। বকরী ত নয়, ঠিক যেন কামধেনু। এর উপর যাতে কারুর নজর না লাগে সেইজন্যে গিন্নিজী তার স্তনের উপর এক জোড়া গেলাফ লাগিয়ে রাখতেন। গলায় পরিয়ে দিলেন একটি নীল রং-এর মালা। ঘরে ঝুটো উচ্ছিষ্ট যা কিছু বাঁচত দেবীজী নিজে তা ছাগলটিকে খাওয়াতেন।

কিন্তু এক সপ্তাহ পরে দেখা গেল দুধের মাত্রা কমতে লেগেছে। নিশ্চয় কারুর দৃষ্টি লেগেছে। ব্যাপার কি পণ্ডিতজীকে জিজ্ঞাসা করলাম "ব্যাপারখানা কি?" তিনি বললেন "মশায়, গ্রামাঞ্চলের ছাগল। জমিদারদের বাড়িতে বিস্তর আনাজটানাজ খেত। সারাদিন বাগানে চরে বেড়াত। এখানে হরদম বেঁধে রাখার জন্য দুধ কম হয়েছে। ছাগলকে একটু এখানে ওখানে নিয়ে গিয়ে ঘাসটাসের মুখ দেখান।"

কিন্তু থাকি শহরে। ছাগলকে কোথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াব? ঠিক করলাম একটু দূরে গিয়ে বাসা নিলে মন্দ হয় না। বসতি হ'তে একটু দূরে গেলেই ছাগল ক্ষেত ও বাগান পাবে। প্রত্যহ চাকর একঘণ্টা দু-ঘণ্টা চরিয়ে নিয়ে আসবে—তাড়াতাড়ি বাড়ি বদল করা গেল। কিন্তু আমার একটু অসুবিধা হ'ল। আফিস যাওয়া আসার পথ আরও তিন মাইল দীর্ঘ হয়ে গেল। তা যাক। ভাল দুধ পাওয়া গেলে আমি আরও দ্বিগুণ রাস্তা হাঁটতে রাজি আছি। এখানকার বাড়িটা বেশ প্রশস্ত। বাড়ির সামনে বাঁধন জায়গা। নিকটে মহুয়া ইত্যাদি গাছের বাগান। বাগান থেকে বাহির হলেই ক্ষেত। কোথায় আলুর ক্ষেত, কোথায় কপির ক্ষেত। আরও কত কি!

একজন কৃষাণের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা গেল যে সে রোজ কিছু শাকসব্জী দিয়ে যাবে। কিন্তু এত চেষ্টা ও সাধ্যসাধনার পরও ছাগলের দুধের পরিমাণ বিশেষ বা'ড়ল না। আড়াই সেরের বদলে কোনক্রমে দু' সের দুধ পাওয়া গেল। কিন্তু এই ভেবে নিশ্চিন্ত হলাম যে দুধটুকু খাঁটি। এ কি কম লাভ!

আমি একথা মানতে প্রস্তুত নই যে, চাকরীর তুলনায় ছাগল চরান কোন অংশে নীচ কাজ! দুনিয়ার বড় বড় সাধু ব্যক্তি ছাগল চরিয়েছেন। কিন্তু আমার চাকর সে ছাগল চরানকে খুব দোষের কাজ মনে করতে লাগল। সে ছাগলটিকে ঘর থেকে নিয়ে যেত। তারপর বাগানে তাকে ছেড়ে দিয়ে নিজে কোন গাছের নীচে ছায়ার তলে শুয়ে থাকত, ছাগল আপন মনে চরে যেত। কিন্তু একদিন তার মনে কি খেয়াল হ'ল তা সেই জানে, সে বাগান থেকে বাইরে গিয়ে একেবারে ক্ষেতে উপস্থিত। বাগানে আর শস্যক্ষেত্রে একই ধরণের স্বাধীনতা নাই। কিন্তু সে ভাবল সবই সমান। একদিন একজনের ক্ষেতে ঢুকে পড়ল। আর অনায়াসে কপির কয়েকটি কেয়ারী খেয়ে ফেলল। কিন্তু ক্ষেত্র পালকের দৃষ্টি এড়াল না। সে ছাগলটির কানে ধরে আমার নিকট এনে বললে,—"বাবু এইভাবে আপনার ছাগল যদি ক্ষেতের চারা খায়, তবে আমি ধ্বংস হয়ে যাব। আপনার চাকর রাখবার যদি শক্তি না থাকে, তবে বেঁধে ছাগল পুষুন।" আজ আমি চক্ষুলজ্জায় আপনাকে কিছু বললাম না। কিন্তু ও যদি আবার আমার ক্ষেতে যায়, তবে আমি ওর পা ভেঙ্গে দিব। অথবা খোয়াড়ে পাঠিয়ে দিব। তার কথা শেষ হ'তে না হ'তে তার স্ত্রী এসে পড়ল। তাকে দেখে সে আরও কড়া সুরে বলতে লাগল,—"আপনার ছাগল হাঁ, হাঁ করে আমার ক্ষেতে প্রবেশ করে ক্ষেতকে বিলকুল নষ্ট করে দিয়েছে। আপনি হাকিম মানুষ। ছাগল পালতে হয়ত বেঁধে পালুন। তা না হলে গলা টিপে দেব।" আমি যেন চোরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। আজ যে সব কথা শুনতে হল জীবনে কখনও কারুরও নিকট সে সব কথা শুনিনি। খুব বিনয়ের সঙ্গে চুপ করে থাকলাম। যদি অন্য কোন সময় এইরূপ বিনয়ী হ'তে পারতাম, তা হ'লে আমি একজন সাধুপুরুষ হয়ে যেতাম। আমার কোন উত্তরই এল না। কেবল এই মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে ছাগলটির গলা টিপে মেরে ফেলব, আর চাকরটাকে দেড়শ' চাবুক মারব। আমাকে নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার স্ত্রী যেন বাঘিনীর মূর্তি ধরে গর্জে উঠল। গোলমাল শুনে আমার স্ত্রী দুয়ারের ধারে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগতভাবে বললেন, "তোরা এক ঘণ্টা থেকে বকবক করছিস কেন। ও ত একটা পশু মাত্র। একদিন খুলে গেছল বলে তুই কি ওর প্রাণনাশ করবি! খবরদার আর একটি কথাও বলবি না। ক্ষেতের চারি দিক ঘিরে দাও না কেন! কাঁটা দিয়ে বেড়া দাও না কেন! নিজের দোষ ত মানবে না, আবার গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে আসা হয়েছে! এখনই পুলিশে দেব! তা হলে বেশ হবে।" আমার স্ত্রীর এই হাকিমি চালের জবাব শুনে তারা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। কিন্তু তাদের চলে যাবার পর স্ত্রীকে বললাম, "বেশ ত বটে, গরীবদের ক্ষতি করবে, আর উপর থেকে রোয়াব জমাবে! এ কেমন ধারা ব্যবহার!" উত্তরে দেবীজী বললেন, "আমার কথা ত শুনবে না। শয়তানদেরকে যতই সুবিধা দাও তারা পাল্টা ততই দাঁত দেখাবে। গোঁয়ারদেরকে ঠিক রাস্তায় আনতে গেলে শক্ত পথ ছাড়া অন্য পথ নাই। তাদের সঙ্গে আবার ভদ্রতা করে? ভদ্রতাকে ওরা দুর্বলতা বলে বোঝে! আর দুর্বলতাকে কে দাবাতে চায় না?"

চাকর বাড়ি ফিরলে কৈফিয়ৎ চাইলাম। সে স্পষ্ট জবাব দিল, "সাহেব ছাগল চরান আমার কাজ নয়!" আমি বললাম, "তোমাকে কে ছাগল চরাতে বলেছে? আমি কেবল বলছি ওকে এমনভাবে দেখবে যেন ও কারুর ক্ষেতে গিয়ে না পড়ে; তোমার নিকট এই এতটুকু কাজ পাওয়া যাবে না?" চাকরটি বলে উঠল, "সাহেব, আমি চাকরী করতে পারব না, অন্য লোক রাখুন।" আমি আর কি করব? শেষে ঠিক করলাম রোজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে নিজেই ওকে একবার চরিয়ে নিয়ে আসব। সামান্য এইটুকু কাজের জন্য নূতন চাকর রাখা আমার সাধ্যাতীত। আমার এই চাকরটিকেও ইস্তফা দেওয়া ঠিক মনে হ'ল না। সে কয়েক বৎসর ধরে খুব বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কাজকর্ম করে আসছে! পরের দিন আফিস থেকে একটু আগেই বাড়ি ফিরলাম। চট্‌পট্ ছাগলটিকে সঙ্গে ক'রে বাগানে গেলাম। তখন শীতকাল, বেশ কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। গাছের নীচে অজস্র শুকনো পাতা চারি দিকে ছড়িয়ে আছে। ছাগলটি মনের সুখে পাতা খেতে লাগল। দেখে মনে হ'ল যেন এক মাস ধরে কিছু খায় নি। এক্ষুনি একটি গাছের নীচে গলগল করে পাতা খাচ্ছে। পরক্ষণেই দেখা গেল অন্য গাছের নীচে গিয়ে তেমনি ব্যস্তভাবে পাতা খেতে মন দিয়েছে। তার পিছনে পিছনে দৌড়তে লাগলাম। আগে আফিস থেকে [illegible]ড়ি এসে একটু আরাম করতাম। আর আজ কোথায় গেল সে আরাম ও আয়াস। ছাগলের পিছনে পিছনে দৌড়াদৌড়ি করে হয়রান হ'তে হচ্ছে। তবে এত পরিশ্রমের ফল পাওয়া গেল। ছাগলটি আজ দুধ একটু বেশী পরিমাণে দিয়েছে।

আমার মনে হ'ল যদি শুকনো পাতা খাওয়ার ফলে দুধের মাত্রা একটু বেশী হয়, তা হলে কাঁচা সবুজ পাতা খাওয়ালে নিশ্চয় দুধ বেশী পাওয়া যাবে। কিন্তু রোজ রোজ সবুজ পাতা কোথায় পাওয়া যাবে গাছে অবশ্য পাতা আছে। কিন্তু বাগানের মালি তা ভাঙ্গতে দিবে না। দাম দিয়েও কাঁচা পাতা পাওয়া যাবে না। মনে হল, বাঁশ দিয়ে চারটি পাতা ভেঙ্গে দেখাই যাক না কেন! বাগানের মালি যদি চীৎকার করে ওঠে, তবে তার কাছে না হয় একটু নতি স্বীকার করব। সে যদি সম্মত হয় ত ভালই হবে। আর যদি সম্মত না হয়, তখন দেখা যাবে। সামান্য কিছু পাতা ভাঙ্গলে গাছের কি এমন ক্ষতি হবে? একজন প্রতিবেশীর কাছ থেকে একটা লম্বা বাঁশ চেয়ে নিলাম। সে বাঁশে একটা আঁকড়শি বেঁধে দিল। সেই ভরা সন্ধ্যায় ছাগলটিকে সঙ্গে নিয়ে পাতা ভাঙ্গতে লাগলাম। এক একবার তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, কোন লোক আসছে কিনা। হঠাৎ দেখি সেই আগেকার লোকটি আমার সামনে এসে পড়ল। আমাকে পাতা ভাঙ্গতে দেখে বলল, "বাবুজি, এ কি করছেন! আপনি নিজ হাতে পাতা ভাঙ্গছেন, এ কাজ ত ভাল দেখায় না। ছাগল পালন করা আমাদের মত গৃহস্থ লোকের কাজ। আপনারা ভদ্রলোক।"—তার কথা শুনে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে কোন উত্তর এল না। ভাবলাম, কি অন্যায় করেছি? নিজের কাজ নিজের হাতে ক'রব, এতে লজ্জার কি আছে? এই উত্তর খুব হাল্কা মনে হ'ল। কিন্তু আমার পোষাকপরিচ্ছদ আমার মুখ বন্ধ করে দিল। সে নিজে এসে আমার হাত থেকে বাঁশটি চেয়ে নিল। এবং একগাদা সবুজ পাতা ভেঙ্গে দিল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "পাতা কোথায় রেখে দিব।" আমি সংকুচিত হয়ে বললাম, রেখে দাও, আমি নিজেই নিয়ে যাব। সে কিছু পাতা উঠিয়ে নিল। এবং বলল, আপনি কেন পাতা বইতে যাবেন, আসুন আমি রেখে দেব। বারাণ্ডা দেখিয়ে দিলাম। যেখানে সে পাতা রেখে দিল সেই গাছের নীচে চারিগুণ পাতা পড়ে ছিল। সেই লোকটা সেগুলি নিয়ে চলে গেল। এখন আমার মনে হ'ল লোকটা ত আচ্ছা চালাক! হায়, দুনিয়াতে মতলব ভিন্ন কেউ কোন কাজ করে না।

কিন্তু দ্বিতীয় দিন বাগানে ছাগলটিকে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হ'ল সেই লোকটা আবার দেখবে! আর না জানি কি কথাই না বলবে। তার দৃষ্টিতে

ছোট হওয়া কম লজ্জার কথা নয়! সাধারণ লোক আমার সম্মান ও মর্যাদা সম্বন্ধে যে একটা ধারণা করেছে তা রক্ষা করা আমার পক্ষে একান্ত দরকার। কিন্তু ছাগলটি এত সহজে তার স্বাধীনতা ত্যাগ করতে মোটেই রাজী হ'ল না। সন্ধ্যা হ'তে সে এত জোরে চেঁচামেচি আরম্ভ ক'রল যে ঘরে বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল। তার অহরহ ম্যা ম্যা শব্দ কানের পরদা ফাটিয়ে দেবার উপক্রম করল। হায় এ বিপদ থেকে কোথায় পালিয়ে যাব? গিন্নীদেবী ত রাগে ছাগলটাকে গালাগালি করতে লাগলেন। আমিও ক্রুদ্ধভাবে লাঠি দিয়ে মারতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু সে তার ডাক ছাড়ল না। আমরা এক কঠিন বিপদের মধ্যে পড়ে গেলাম। এমন নিরুপায় বোধ হয় আমি জীবনে কখনও হইনি। শীতকালে রাত্রি আটটার পর ঘরের বার হওয়া বড়ই কষ্টকর। কিন্তু এই শীতেই আমাকে ছাগল নিয়ে বাগানে যেতে হ'ল। কিছুক্ষণ তাকে এখানে ওখানে নিয়ে বেড়ালাম। আর আমার ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। অন্ধকার রাত্রি। পথ চলতে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। অনেক দিন আগে একবার সামনে থেকে একটা সাপ সরে গেছল। যদি তারই উপর পা পড়ত, তবে ত নির্ঘাত মৃত্যু হ'ত। সেই দিন থেকে আর কখনও আঁধারে বাইরে যেতাম না। কিন্তু আজ এই হতভাগা ছাগলটির জন্যে আমাকে আবার সেই বাইরে বেরোতে হ'ল! একটু বাতাস উঠলে কি পাতার খর খর্ শব্দ হলে ভয়ে শরীর কেঁপে উঠতে লাগল। পা থর্থর্ করে কাঁপতে লাগল। মনে হ'ল, হয়ত আমি পূর্বজন্মে ছাগল ছিলাম। আর এই ছাগলই আমার প্রভু ছিল। এই মানব জীবনে আজ সেই প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হচ্ছে। যে পণ্ডিত আমার ঘাড়ে এই বিপদের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর উপর ভয়ানক রাগ হ'ল। ঘরকন্নায় ধিক্কার! যদি ছেলেপুলে না থাকত, তবে কি এই হতভাগা জানোয়ারটির জন্যে এত খোসামোদী করতাম? আর এই সব ছেলেপুলেরা যখন বড় হবে, তখন কেউ আমার কথা শুনবে না। তারা তখন বলবে: "আপনি আমাদের কি করেছেন? কি সম্পত্তি রেখে গেছেন!" এই দণ্ড ভোগ করার পর রাত্রি নয়টার সময় ঘরে ফিরলাম। এই রাতে ছাগলটি যদি মরে যেত, তাহলেও আমার একটুকু দুঃখ হ'ত না।

পরের দিন সকাল বেলাতেই আমার শুধু এই খেয়াল হ'ল কেমন ক'রে গত রাত্রের বিপদ থেকে বাঁচা যাবে। আজ অফিস ছুটি ছিল। একটা লম্বা দড়ি যোগাড় করলাম! সন্ধ্যার সময় ছাগলের গলায় বেশ করে দড়ি বাঁধা গেল। তারপর ওকে একটা গাছের শিকড়ে বেঁধে দিলাম। এখন যত ইচ্ছা চরুক। সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই খুলে নিয়ে এলেই চলবে। ছুটির জন্য সেদিন একবার সিনেমা দেখতে যাবার ইচ্ছা হ'ল। সেদিনকার চিত্রটি নাকি খুব ভাল ছিল। সঙ্গে চাকরকেও নিলাম। নতুবা কোলের ছেলেকে সামলান দায় হয়ে উঠবে। রাত্রি নয়টার সময় বাড়ি ফিরেই আমি সটান ছাগলটাকে দেখতে গেলাম। কিন্তু এ কি? সে গলার দড়িটাকে দুই তিনটি গাছের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে দিয়েছে যে তার পক্ষে এক পা এদিক ওদিক করা অসম্ভব। মনে এত দুঃখ হ'ল যে হতভাগীকে এই-খানেই এই অবস্থাতেই ফেলে রাখি। হতভাগী মরে যাক। এত রাত্রে ঘর থেকে লণ্ঠন আনিয়ে কে তার দড়ির বাঁধন খুলতে বসবে! কিন্তু মন মানল না, প্রথমে তার গলার বন্ধন খুলে দিলাম। পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ত দড়ি খুলে নিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা সময় লেগে গেল। শীতের রাতে ঠাণ্ডায় হাত পা কাঁপতে লাগল। আমি ঠাণ্ডায় মরি, আর হতভাগীটা আরামে জাবর কাটতে কাটতে ঘরে চলুক।

আবার ভাবনা হ'ল, এখন কি করা যাবে! ঘটে কোন বুদ্ধি জুটল না। দুধের চিন্তা না থাকলে এতদিন কাউকে বিনামূল্যে বিলিয়ে দিতাম। হায় কি অপরাধই না করেছি! সন্ধ্যা হতে না হতেই ছাগলটি আবার চীৎকার শুরু করবে। তখন ঘরে থাকা মুস্কিল হবে। তার চীৎকার ধ্বনি এখন আমার নিকট ঘৃণাজনক ও বিরক্তিকর! শাস্ত্রে নাকি লেখা আছে যে যতদূর ছাগলের আওয়াজ শোনা যাবে, ততদূরের মধ্যে দেবতা থাকেন না, দেবতাগণ যে ছাগলের এই কর্কশ কণ্ঠকে ঘৃণা করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? বাস্তবিকই তার কর্কশ কণ্ঠ আমার এত বিস্বাদ লাগল যে পরদিন অফিস থেকে ঘরে এসে আর থাকতে পারলাম না। বাইরে চলে গেলাম। কিন্তু এক মাইল যাওয়ার পর আমার মনে হ'ল যেন তার গলার শব্দ আমার পশ্চাতে ভেসে আসছে। তখন আমার লজ্জা হ'ল। একটি ছাগল পুষবার ক্ষমতা আমার নেই! এত নরম ও নুয়েপড়া মন হলে চলবে কেন? তাছাড়া সারা রাত ত আর ঘরের বাইরে থাকব না। আটটার সময় বাড়িতে ফিরতেই হবে। তখন কি ছাগলটা তার অপরূপ সংগীত ধ্বনি করবে না?

নীচের দিকে একটি ডালওয়ালা গাছ দেখতে পেলাম। তাতে চড়তে ইচ্ছা হ'ল। গাছে চড়া আমার পক্ষে খুব কষ্টকর বোধ হ'ল। দেখলাম সবুজ পাতায় সমস্ত গাছটি ভরে আছে। ডুমুরের গাছও নিকটে ছিল। ছাগলে ডুমুরের পাতা আনন্দের সঙ্গেই খায়। কিন্তু আমি গত ত্রিশ বছরের মধ্যে কোনও উঁচু জায়গায় চড়িনি। বহুদিন সে অভ্যাস চলে গেছে, সেজন্য গাছে ওঠার কথা চিন্তামাত্র আমার পা কাঁপতে লাগল। কিন্তু তবুও সাহস হারালাম না। গাছে চড়লাম এবং পাতা ভেঙ্গে নীচে ফেলতে লাগলাম। আমি একলা গাছে চড়ে পাতা ভাঙ্গছি, তা কে দেখতে পাবে? ক্রমেই অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল। এবার পাতা নিয়ে ঘরে যাব। এর পরেও ছাগলটি যদি নিশ্চিত না হয় তবে,—

আমি গাছের উপরেই ছিলাম। কোথা হ'তে ছাগল ও ভেড়ার শব্দ আসতে লাগল। নীচের দিকে দেখি একদল ছাগল ভেড়া তাড়াতাড়ি এসেই পাতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি উপর থেকে চীৎকার করতে লাগলাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে? ছাগলের রাখালদের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। কেউ দেখলে গাল দেবে, এই ভয়ে হয়ত কোথায় লুকিয়ে আছে। প্রতি পলকে পাতা অদৃশ্য হ'তে লাগল। একবার গাছ থেকে নামতে দাও। নেমেই এক এক করে সকলের পা ভেঙ্গে দেব।

কিন্তু হঠাৎ পা ফসকে গেল, আর আমি দশ ফুট উঁচু থেকে পড়ে গেলাম। কোমরে এত জোর আঘাত লাগল যে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত দু'চোখে আঁধার দেখতে লাগলাম। আশ্চর্য হ'লাম এই ভেবে যে, আরও উপর থেকে পড়িনি। তাহলে বোধ হয় এইখানেই শহীদ হয়ে যেতাম। আমার পতনের সঙ্গে সঙ্গে পশুগুলি যে কোথায় পালিয়ে গেল! সামান্য কিছু পাতা পড়ে ছিল। একটু প্রকৃতিস্থ হলে এই পাতাগুলি সংগ্রহ ক'রে একটা বোঝা করলাম এবং অসহায় নিরুপায়ের মত সেটাকে কাঁধে নিয়ে লজ্জিতের ন্যায় লুকিয়ে ঘরের দিকে চললাম। পথে অবশ্য কোন বিপদের সম্মুখীন হতে হ'ল না। বাড়ি পৌঁছতে সামান্য একটু বাকী আছে। পাছে কেউ দেখে ফেলে এই ভয়ে আরও দ্রুত চলতে লাগলাম। ইতিমধ্যে দেখি সেই প্রথম দিনের লোকটি এদিক দিয়ে আসছে। এ সময় আমার মনের অবস্থা যে কি রকম হয়েছিল তা বলা সহজ নয়। রাস্তার দুদিকে ক্ষেতের বাঁধ ছিল। তার উপর নাগ ফণের কাঁটা জন্মে ছিল। আমি যদি ধীরে ধীরে চলি, তা হ'লে সেই হতভাগা লোকটি আমার পাশ কেটে চলে যাবে। সে তখন কি বলবে, তা ভগবান জানেন। কোথাও মোড় ফেরবার রাস্তা ছিল না। আর সে লোকটি ক্রমেই চলে আসছে। আমি পরনের ধুতি উপরের দিকে গুটিয়ে নিলাম। আমার সমস্ত চালচলনটি একেবারেই বদলিয়ে দিলাম। সামান্য শ্রম-জীবীর মত মাথা নীচু করে চলতে লাগলাম। শ্বাস রুদ্ধ হবার উপক্রম হ'ল। সেই লোকটিকে কোন রক্তপিপাসু বাঘ বলে মনে

হ'ল। বারবার ঈশ্বরকে স্মরণ করতে লাগলাম। হে ভগবান! তুমি বিপন্নের সহায় ও রক্ষক! ঐ নরাধমের মুখ বন্ধ করে দাও। এক মুহূর্তের জন্য তার চোখের জ্যোতি কমিয়ে দাও—আঃ! যখন আমি তার নিকট থেকে মাত্র এক গজের ব্যবধানের মধ্যে, তখন আমার এক এক পা যেন তালোয়ারের ধারের উপর পড়ছিল। এই বুঝি কেটে দুখানা হ'য়ে যাই—সেই সময় সেই শয়তানটির আওয়াজ আমার কানে এল—"কে রে! কোথা থেকে পাতা ভেঙ্গে আনলি!" আমার মনে হ'ল যেন নীচের মাটি ফেটে গেল, আর আমি তার গভীর উদরে ঢুকে গেলাম।

কোন উত্তর দেবার মত জ্ঞান আমার ছিল না। বেজের সঙ্গে দু'তিন পা এগিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু সে খপ্ করে আমার হাত ধরে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বোঝাটি হাত থেকে পড়ে গেল। তারপর যে কি 'হল তা আমার মনে নাই। যখন জ্ঞান হ'ল, দেখলাম আমি গৃহের দরজার নিকট ঘর্মাক্ত কলেবরে দাঁড়িয়ে আছি। যেন মৃগী রোগের পর জেগে উঠলাম। ঠিক এই সময় সেই ছাগলটির ঘৃণ্য আওয়াজ—সেই হৃদয় বিদারক আওয়াজ—সেই ভীতিপ্রদ সাহস ভাঙ্গা আওয়াজ—পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট সেই আওয়াজ—দুনিয়ার সবচেয়ে ভীষণ অভিশাপস্বরূপ সেই আওয়াজ আমার কানে বাজতে লাগল।

গিন্নী জিজ্ঞেস করলেন : "কোথায় গিয়েছিলে? এই জীবকে একটু বাগানে নিয়ে গেলে না! একে নিয়ে তো প্রাণরক্ষা দায় হয়ে পড়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে কোন দিকে চলে যাব।" আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিলাম। আজ ওকে চেঁচাতে দাও। কাল প্রভাতে আমার প্রথম কাজ হবে ওকে ঘর থেকে বের ক'রে দেওয়া। যদি কাউকে এমনি দিতে হয়, তবুও! জানি না, অন্য লোকে কেমন ক'রে ছাগল পালে! পালতে হলে কুকুরের বুদ্ধি চাই।

সকালে বিছানা থেকে উঠেই এই ফিকিরে ছিলাম যে, কেমন করে ওর হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। সেই সময় এক রাখালকে এক পাল ছাগল চরাতে দেখলাম। আমি তাকে ডেকে আনলাম এবং আমার ছাগলটি চরাবার প্রস্তাব করলাম। সে সম্মত হ'ল। কারণ এই তার পেশা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কত নিবে?" সে বলল "হুজুর বকরী প্রতি আট আনা!" আমি বললাম "আমি এক টাকা দেব, কিন্তু বকরী আমার সামনে আনতে পাবে না।" সে একটু অবাক্ হয়ে গেল। বলল : "ছাগলটি কি খুব দুষ্ট, বাবুজী?" আমি বললাম "না, না, সে খুব সোজা, ছাগল কি মারতে পারে? কিন্তু আমি ওর চেহারা দেখতে চাই না।"

"এখনও দুধ দেয়?"

"হাঁ, এক সের সওয়া সের দেয়।"

"দুধ কি আপনার ঘরে পেঁৗছিয়ে দেব?"

"তোমার দয়া।"

যে সময় ঘর থেকে ছাগলটি বের হয়ে গেল, তখন আমার মনে হল যেন একটা আপদ কেটে গেল। বন্দীজীবন থেকে মুক্তি পেল বলে ছাগলটিও বোধ হয় সুখীই হবে। সেই লোকটি সেই সময়ই দুধ দুইয়ে দিল এবং ঘরে রেখে দিয়ে চলে গেল। এত নিঃস্বার্থ গ্রাহক বোধ হয় সে নিজের জীবনে এই প্রথম দেখল! এক সপ্তাহ পর্যন্ত বেশি হোক, কম হোক, দুধ আসতে লাগল। তারপর রীতিমতভাবে দুধের পরিমাণ কমতে লাগল। অবশেষে এক মাস হতে না হতে দুধ একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। বোঝা গেল যে ছাগলটি সন্তানসম্ভবা। কিন্তু আমি একবারও ছাগলটির কোন অনুসন্ধান করিনি। অন্য গোয়ালাদের নিকট গাই ছিল, তাদের কাছ থেকে দুধ নিতে আরম্ভ করলাম। রাখালটি একবার করে এসে বেতন নিয়ে যেত। আমি কখনও তাকে ছাগলটির সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতাম না। তার কথা চিন্তা করা মাত্র আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। একদিন দুয়ারের ধারে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দেখি সেই রাখালটি ছাগলের পাল সঙ্গে করে বের হ'ল। আমি তার বেতনের টাকা আনতে ভিতরে গেলাম। বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে দেখি যে আমার সেই ছাগলটি দুইটি বাচ্চা সঙ্গে করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে। যেখানে বাঁধা থাকত সেইখানে গিয়ে হাজির হল। পরে সেখান থেকে ঘরের অঙ্গনে এল। বোধ হয় আমার স্ত্রীকে চিনতে পেরে তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তিনি দৌড়ে গিয়ে একটি বাচ্চাকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর ঘরের ভিতর থেকে এক মাসের জমা করা সমস্ত চোকড় বের করে ছাগলকে খেতে দিলেন। কত আদর ও স্নেহ ভরে ছাগলটিকে খাওয়াতে লাগলেন। কখন বাচ্চাকে কোলে তুলে চুমো দিতে লাগলেন, কখন ছাগলটির গায়ে আদর করে হাত বুলাতে লাগলেন। আর ছাগলটি ডাকগাড়ির তেজে চোকড় খেতে লাগল।

গিন্নীজী আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন : "কি সুন্দর বাচ্চা!" আমি শ্লেষের সঙ্গে বল্লাম, "হাঁ খুব সুন্দর! আমারও মনে হচ্ছে একটি পালব।" তিনি শ্লেষ বুঝতে পেরে বল্লেন "তোমার মেজাজ এখনও ঠিক হয়নি। তুমি বড় নির্দয়!" চোকড় খাওয়া শেষ হ'ল। ছাগলটি বেশ আরামের সঙ্গে বিদায় নিল। দুটি বাচ্চা তার পেছনে চলে গেল। দেবীজী অশ্রু ভারাক্রান্ত চোখে এই দৃশ্য দেখতে লাগলেন! একটু পরে রাখাল তামাক খাবার জন্য আগুন চাইতে ফিরে এল। যাবার সময় বল্ল : "কাল থেকে দুধ পঁহুছিয়ে দেব, মালেক।" দেবীজী বল্লেন : "তাহলে দুটো বাচ্চা কি খাবে?" সে বল্লে "বহুজী, বাচ্চা আর কত খাবে? দু সের দুধ দেয়। এখনও দুধ ভাল হয়নি, তাই সঙ্গে আনিনি।"

আমার সেই নিদারুণ রাত্রে অন্তরাত্মা কাঁপান ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। আমি তীব্রকণ্ঠে বললাম : "দুধ আন আর না আন, সে তোমার খুসী! কিন্তু ছাগলটিকে এদিকে আনতে পাবে না।"

সে দিন থেকে আর কারুর পাত্তা পাওয়া গেল না, না সেই রাখালটির না সেই ছাগলটির। আমিও সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের চেষ্টা করিনি।

কিন্তু দেবীজী সেই বাচ্চার কথা স্মরণ ক'রে কখন কখন অশ্রুপাত ক'রতেন।

উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত কথাশিল্পী প্রেমচন্দের একটি উর্দু গল্পের অনুবাদ।

অনুবাদক : রেজাউল করীম

ট্রামে-বাসে

কালিফোর্নিয়ার প্যাসাডোনা অঞ্চলের রেভারেণ্ড লঙ্ নামক জনৈক পাদ্রী ইতিমধ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ২১শে সেপ্টেম্বর পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে। পৃথিবী অবশ্য ধ্বংস হয় নাই—Long live Rev. Long! কিন্তু তিনি তাঁর এই ঘোষণার পূর্বে মার্শাল স্ট্যালিন, মন্ত্রী এটলী এবং জেনারেল দ্য গলকে মহাপ্রলয়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাঁর এই মহতী সতর্কবাণী তিনি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানকে প্রেরণ করেন নাই। কারণটা জিজ্ঞাসা করিলে বিশুখুড়ো বলিলেন—"কাশীতে ভূমিকম্প হয় না। যুদ্ধোত্তর যুগে আমেরিকা এখন কাশী মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে।" ব্যাস কাশীটার অবস্থান সম্বন্ধেও আমরা প্রশ্ন করিয়াছিলাম। খুড়ো নিরুত্তর।

* * *

লণ্ডনে অনুষ্ঠিত পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে মিঃ বেভিন আর মলোটভের মধ্যে বাক্-যুদ্ধ নাকি প্রায় বাহু যুদ্ধে পরিণত হওয়ার



উপক্রম হইয়াছিল। অবশ্য ব্যাপারটা এতদূরে গড়ায় নাই। তবু "ভালুক জানে বাসতে ভাল" কথাটা যে সিংহ মহাশয় বিশ্বাস করেন নাই তা তাঁর কেশর নাড়া দেখিয়াই বোঝা গিয়াছে।

* * *

ভারত সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের নূতন ঘোষণায়—ভারতীয়দের সমালোচনায়—লর্ড পেথিক লরেন্স নিরাশ হন নাই। তিনি বলেন এই ঘোষণায় ভারতীয় সমস্যা সমাধানের চেষ্টা নাই বটে, তবে ইহা দ্বারা একটি নূতন পথ উন্মুক্ত করা হইয়াছে। এই পথ দিয়া পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দিকে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। বিশুখুড়ো বলেন—"স্বায়ত্তশাসন নয় হে, আমড়াতলার মোড়ে যাওয়া যেতে পারে। পথটা কি জান?" এই বলিয়াই তিনি স্বর্গত সুকুমার রায়ের কবিতাটি আওড়াইয়া গেলেন :—

"চলবে সিধে নাক বরাবর
ডান দিকে চোখ রেখে
চলতে চলতে দেখবে শেষে
রাস্তা গেছে বেঁকে।
দেখবে সেথায় ডাইনে বাঁয়ে
পথ গিয়েছে কত
তারি ভেতর ঘুরবে খানিক
গোলক ধাঁধার মত।
তারপরেতে হঠাৎ বেঁকে
ডাইনে মোচড় মেরে
ফিরবে আবার বাঁয়ের দিকে
তিনটে গলি ছেড়ে।
তবেই আবার পড়বে এসে
আমড়াতলার মোড়ে
তারপরে যাও যেথায় খুশী
জ্বালিওনাকো মোরে"—

অর্থাৎ আবার সেই আমড়াতলা অর্থাৎ শুধু আমড়াগাছি!

* * *

কলিকাতায় একটি স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য আবার নূতন করিয়া তোড়জোড় চলিতেছে। ভারতের স্বাধীনতা আগে হয় কিম্বা স্টেডিয়াম আগে হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

* * *

রেলওয়ে দলকে এগারো গোলে হারাইবার পর ইস্ট বেঙ্গল এলবার্ট ডেভিডের কাছে দুই গোলে হারিয়া গিয়াছেন। এদিকে কলিকাতার বাজারে ইলিশ মাছটা খুবই সস্তা যাইতেছে, অথচ ঠিক এই সময় মৃতাশৌচের খবর আসিল! দুর্দৈব আর কাহাকে বলে?

* * *

জাপ সম্রাট হিরোহিতোর ধনদৌলত কোথায় কি পরিমাণ আছে তার একটা নির্ভুল হিসাব দাখিল করার জন্য জেনারেল ম্যাক্আর্থার একটি আদেশ জারি করিয়াছেন। সম্রাটকে অতঃপর কি পরিমাণ মাগ্গি ভাতা দেওয়া যায়—তার একটা হিসাবের জন্যই নাকি এই আদেশ জারি করা হইয়াছে। টীকাটা অবশ্য বিশুখুড়োর।



* * *

ইরাণের তেলের খনির দিকে নাকি বৃটিশ আর রাশিয়া লুব্ধ দৃষ্টি দিয়া আছেন। কিন্তু তেলের সমস্যা মুখের কথায় সমাধান হইবার নয়। আমরা তো অনুরূপ ব্যবস্থায় কলিকাতায় খুবই ফল পাইয়াছি—যদিও এ তেল সে তেল নহে!

* * *

একটি জন্মতালিকা প্রস্তুত করিবার জন্য বৃটেনে বিবাহিতা মেয়েদের কতকগুলি প্রশ্ন করা হইতেছে। প্রশ্নগুলি এই—(১) আপনি কবে বিবাহ করিয়াছেন, (২) আপনার প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সন্তান কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, (৩) সন্তান না হইয়া থাকিলে—সন্তানের মা না হইয়া থাকিবার



উদ্দেশ্য কি? কবে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিবাহ করিয়াছেন এই ধরণের প্রশ্ন না হইলে প্রথম প্রশ্নের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তৃতীয় সন্তানের পর অন্য কোন সন্তান সম্বন্ধে কৌতূহল না থাকার কারণ বুঝিলাম না। সন্তানের মা না হইয়া থাকার কারণ অনেক কিছুই হইতে পারে। যাহা হউক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, উত্তর দেওয়া না-দেওয়া উত্তরদায়িনীর ইচ্ছাধীন। তবু রক্ষা!

* * *

বিশ্বে প্রকৃত স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আমেরিকানদের অবিলম্বে জাপান ত্যাগ করিয়া আসা উচিত। কথাটা বলিয়াছেন বার্নার্ড শ'। কিন্তু আমেরিকা বলিতেছেন যে শান্তির জন্যই তাঁরা জাপানে আছেন। কোনটা তবে সত্য? ছোটদের মাসিকে এই ধাঁধাটি ছাপা হইলে ভাল হয়।

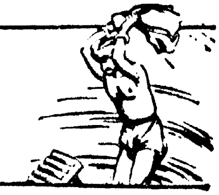
কেন লোকে বেশী পরে

ঢাকেশ্বরীর কাপড়



৬ সুনিপুন কারিকরী ও আধুনিক যন্ত্রপাতি

—ভাল তুলা ভাল মালমসলা থাকলেও যে সব কর্ম্মীরা ঐ সব জিনিষ নিয়ে কাজ করে তাদের শিক্ষা ও দক্ষতা না থাকলে ভাল কাপড় তৈরী হয় না। সবাই জানেন যে ঢাকেশ্বরীর কর্ম্মীদের জীবন-যাত্রার আদর্শ অনেক উন্নত। তাই তাদের কর্ম্মদক্ষতাও অসামান্য। বস্ত্র বয়ন সম্বন্ধে তাদের যে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে তারা দেশের শ্রেষ্ঠ বস্ত্রশিল্পী হয়ে উঠে। আর তারা ঢাকেশ্বরী মিলে আধুনিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করবার সুযোগ পায়। এটা কম কথা নয়। কেননা সুদক্ষ কর্ম্মীও পুরানো যন্ত্র নিয়ে কাজ করতে গেলে প্রতিযোগীতায় হঠে যায়। এই ভাবে প্রত্যেক জিনিষই ঢাকেশ্বরীর তৈরী কাপড়ের পরমায়ু বাড়িয়ে তোলে। তাই বলি—



৭ অনেক বেশী ধোপ সইতে পারে

—ঢাকেশ্বরীর কাপড় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তুলা থেকে তৈরী হয়; সূতাগুলির টান সইবার ক্ষমতাও অসাধারণ; কাপড়গুলির প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে অন্য কাপড়ের চাইতে বেশী সূতা থাকে; বেশী ধোলাই আর ইস্ত্রিতে কাপড়ের চাকচিক্য বাড়লেও তার পরমায়ু কমে বলে যতটুকু না করলে নয় ততটুকু করা হয়। কাপড়গুলি তৈরী করে বিশেষভাবে শিক্ষিত, সুদক্ষ সব কর্ম্মীরা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে। এসবের মোট ফল হয় এই যে ঢাকেশ্বরীর কাপড় সাধারণ কাপড়ের চাইতে অনেক বেশীবার কাচানো চলে। তাই বলি—

শতকরা ২৫ ভাগ বেশী পরতে হলে কিনুন

ঢাকেশ্বরী

শাড়ী · · · ধুতি

ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

DCB—29

কাহিনী নয় খবর
ভবঘুরে

রাজকন্যার প্রেমাস্পদ কেউ নয়!

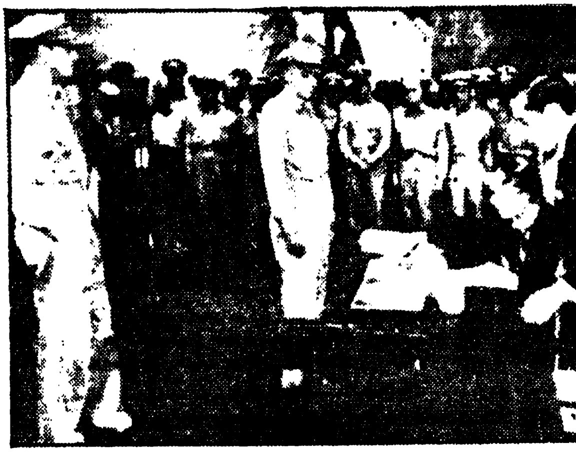
কিছুদিন আগে বেলজিয়ামে জোর গুজব রটেছিল যে, ইংলণ্ডের সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের দুহিতা রাজকন্যা এলিজাবেথ বেলজিয়ামের ৪১ বছর বয়সী রিজেণ্ট প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ—ওদিকে গ্রীসেও জোর গুজব যে রাজকন্যা এলিজাবেথ গ্রীসের ২৪ বছর বয়সী প্রিন্স ফিলিপকেই বিয়ে করবেন। দুই দেশেই এই খবর নিয়ে বেশ হৈ চৈ কিন্তু ব্যাপারটাকে একেবারে কাঁচিয়ে দিয়েছে বাকিংহাম প্রাসাদের এক ঘোষণা। রাজকন্যা এলিজাবেথ চার্লসকে অথবা ফিলিপকে বিয়ে করার জন্য ব্যাকুল—একথা অস্বীকার করা হয়েছে ঐ ঘোষণায়। কিন্তু তাতো হলো,—ভাবুন তো রাজপুত্রদ্বয়ের অবস্থা কি?

শান্তি এলো পৃথিবীতে?

মিসৌরী' জাহাজে জাপানের আত্মসমর্পণ চুক্তি স্বাক্ষরের খবর আগেই পেয়েছেন।—তাহলেও এটুকু জেনে রাখুন। আমেরিকান এক সংবাদদাতা বলেছেন—'এই আত্মসমর্পণ পর্বটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারে ম্যাক আর্থারের খেলা বলে মনে হলো। সর্বপ্রথমে জাপানের বৈদেশিক মন্ত্রী মামরু শিগেমিৎসু—নিঃশব্দে তাঁর কাঠের পা আর বেতের লাঠিতে ভর করে এলেন।......তার পিছু পিছু এলেন রাজকীয় প্রধান প্রতিনিধি জেনারেল উমেজু—কোনো কথা, মুখে নেই। সবাই নিস্তব্ধ, গম্ভীর। ম্যাক আর্থারের শুরু, গোড়াতেই এক বক্তৃতা শুনিয়ে দিলেন তিনি সকলকে—বক্তৃতার শেষে জাপানীদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ নয়নে বললেন—'আমি ঘোষণা করছি যে এই আমার দৃঢ়সংকল্প যে, আত্মসমর্পণের চুক্তি যাতে সর্বতোভাবে বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়, তার দায়িত্ব গ্রহণ করা।' বক্তৃতার শেষে শিগেমিৎসু তাঁর মাথা থেকে সিল্কের টুপিটি নামিয়ে তার হাতের দস্তানা খুলে ফেললেন। আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্য তিনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে ধরে একটি চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হলো। উদাস ভাবহীন চোখে তিনি নীরবে আত্মসমর্পণ পত্রে সই করলেন। তারপরেই সই করলেন 'উমেজু'। এরপরেই ম্যাক আর্থার তাঁর পকেট থেকে মুঠো ভর্তি কতকগুলি ফাউণ্টেন পেন বার করলেন। তিনি কলমগুলি নিয়ে অন্যান্য প্রতিনিধিরা যাঁরা এই আত্মসমর্পণ পত্রে সই করবেন তাঁদের দিলেন। তারপর ম্যাক আর্থার প্রথমে ও পরে অন্যান্য প্রতিনিধিরা সই করলেন। সবাইকার সই করা শেষ হয়ে গেলে, তিনি মুহূর্তের জন্য একটু বিচলিত হয়ে পড়েই—ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে নীচু গলায় বললেন—'আসুন আমরা এই প্রার্থনা করি যে, শান্তি এখন আবার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং ভগবান তা সব সময়ে রক্ষা করবেন। অ্যাটম বোমা আবিষ্কৃত হওয়ার পরেও ভগবান যে পৃথিবীর শান্তি রক্ষা করতে পারবেন—এ কথাটা মুখে বললেও বিজয়গর্বী ম্যাক আর্থার ও মিত্রপক্ষের প্রধানরা অন্তরে তা স্বীকার করেন কি?

একেই বলে কূটবুদ্ধি

ফ্রান্সের হুঁসিয়ার বৃটিশ রাজদূত রাইট অনারেবল আলফ্রেড ডাফ কুপার সম্প্রতি রিভেয়েরার এক বেহুঁস সরাইওয়ালাকে দেখিয়ে দিয়েছেন—কূটনৈতিক হুঁসিয়ারী কাকে বলে? রাজদূত, তার পত্নী আর তাঁর মোটরে অনুগামী দু'জন বন্ধু মিলে ঐ সরাইওয়ালার সরাইয়ে মধ্যাহ্ন ভোজন করেন এবং ভোজনের শেষে ষোলশো ফ্রাঙ্কের একটি বিল পান, অর্থাৎ যার পরিমাণ এদেশের হাজার টাকারও বেশী। বিলটি পেয়েই কুপার সাহেব তার ওপর তাঁর নাম সই করে একটি খামে ঐ এলাকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের ঠিকানা লিখে তার ভিতর চিঠিটি ভরে ফেললেন। সরাইখানার প্রধান 'ওয়েটার'কে (চাকর) ডেকে তার হাতে চিঠিটি দিয়ে বললেন—"এই, চিঠিটি দয়া করে হয়তো যথাস্থানে পৌঁছেই দেবেন।" ব্যাস এরপর রাগে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে দলবল সহ তিনি সরাই থেকে বেরিয়ে গেলেন। এদেশের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখে আপনারা যে ফল পান—সে ফল বৃটিশ রাজদূত যে পাবেন না সে বিষয়ে আমি গ্যারাণ্টি দিতে পারি।



জেনারেল শিগেমিৎসু আত্মসমর্পণ পত্রে সই করছেন—ম্যাক আর্থার দাঁড়িয়ে।



মিসৌরী জাহাজের পাটাতনে জাপ প্রতিনিধিরা এসে পৌঁছলেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনা, ভাব-রসের সাধনা। পরকীয়া ভাবের উপাসনা। একদিন দেখিয়াছিলাম সাহিত্য—বৈষ্ণব-সাহিত্য ছিল তাঁহাদের সাধন, ভাব ছিল তাঁহাদের সাধ্য। বৈষ্ণব সাহিত্যের মাধ্যমেই তাঁহারা মহাভাব-স্বরূপিনীর আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন; রস-স্বরূপের আস্বাদনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই সাধনার প্রবর্তক এবং পথপ্রদর্শক। আপনি আচরণপূর্বক এই পথে পদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া তিনি মানবকে পথ দেখাইয়াছেন। মানবের অবশ্য গন্তব্য আনন্দ-নিকেতন শ্রীবৃন্দাবনের সন্ধান দান করিয়াছেন। জন-সাধারণের মধ্যে এই সাধন রহস্য বিতরণই তাঁহার চির-অনর্পিত পরম বস্তু। ভাবুক ও রসিক না হইলে এ বস্তুর মর্ম উপলব্ধি হইবে না, এ সাধনের রহস্য বুঝিবার সামর্থ্য জন্মিবে না।

ভাব ও রসের সাধনা ভিন্ন জাতি গঠন এক-রূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে কোন ভাবে হউক, যে কোন রসে হউক, জাতিকে মাতাইয়া মজাইয়া, জাতিকে একপ্রাণ, একভাবের ভাবুক, একই রসের রসিক করিতে পারিলে আপনা হইতেই জাতীয়তার অভ্যুদয় ঘটে। চারিশত বৎসর পূর্বে বৈষ্ণবের সাধনাই বাঙলায় প্রথম দেখাইয়াছিল জাতি ও সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে গড়িয়া উঠিতেছে। জাতি সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছে, সাহিত্য জাতি গঠন করিতেছে। তে হি নো দিবসা গতাঃ। সে দিনের কথা আজ কাহিনী হইয়াছে। প্রকৃত বৈষ্ণবের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে, সাধনপন্থা লোপ পাইতে বসিয়াছে, সুতরাং আজিকার দিনে একথা আলোচনার প্রয়োজন হইয়াছে। আপনারা ভাগ্যবান, সেই সাধনা পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন, সাধক সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। আপনারা আমার নমস্য। আমি ক্ষুদ্র হইলেও, মন্দবুদ্ধি হইলেও আপনাদের ভাবধারা অনুসরণের যথাসাধ্য প্রয়াসে, আচার্যগণের মুখে যেমন শুনিয়াছি, এই পথের কথা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

বৈষ্ণব সাধনার কথা বলিতে হইলে রসের কথা বলিতে হয়, ভাবের কথা বলিতে হয়; পরকীয়া ভাবের কথাই বলিতে হয়। জগতে ঘটনা প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, জীবনে নিত্য নূতন পরিবর্তন ঘটিতেছে। ইহার সমস্তটা সত্য নহে। ইহা নশ্বর, মুহূর্ত মাত্র স্থায়ী। ইহার সত্য-স্বরূপের সন্ধান করিতে হইলে পরকীয়া ভাবের আশ্রয় লইতে হইবে। এই ক্ষণ-বিধ্বংসী ঘটনাবলী এবং জীবনস্রোত, এক কথায় জগতের সমস্ত বস্তুর মূলে যে শাশ্বত সনাতন সত্য বর্তমান রহিয়াছে, সেই অনির্বচনীয় অবিনশ্বর সত্তাই ভাব এবং রসের মিলিত স্বরূপ। পরকীয়া ভাবেই তাহার উপলব্ধি সহজ ও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইয়াছে। কথাটা হেঁয়ালীর মত শুনাইতেছে, সাধ্যমত পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। রস এবং ভাবের কথা বলিতেছি। প্রসঙ্গত বৈষ্ণব-সাহিত্যের কথাও বলিতেছি। দেশে দেশে কালে কালে সাহিত্যের একই রূপ। রস যাহার আত্মা, ভাব যাহার শক্তি, শব্দ যাহার আকার এবং অবয়ব, অর্থ যাহার প্রাণ, অলঙ্কার যাহার অঙ্গসৌষ্ঠব, ছন্দ যাহার গতি, তাহাই বৈষ্ণব-সাহিত্য। সত্যকার সকল সাহিত্য সম্বন্ধেই এই সংজ্ঞা প্রয়োগ করিতে পারি।

রস শক্তিমান্, ভাব শক্তি। রস ধর্মী, ভাব ধর্ম। "রস্যতে ইতি রসঃ"। যাহা আস্বাদনীয়, যাহা আস্বাদন-যোগ্য তাহাই রস। লৌকিক জগতে যেমন তিক্ত কষায়াদি, সাহিত্য জগতেও তেমনই আদি, বীর প্রভৃতি রসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ভূ ধাতুর অর্থ হওয়া। 'ভবতীতি ভাবঃ'। একটা কিছু হওয়া, একটা সৃষ্টি একটা নির্দিষ্ট আকার পাওয়াই ভাব। সৃষ্টি অর্থে ভব, ভবের প্রকাশ ভাব। ভাবের আবির্ভাব ভিন্ন সৃষ্টি হয় না। ঋষি বলিলেন ব্রহ্মরসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ।' তিনি অনাদি, কিন্তু তিনিই সকলের আদি তাই তিনিই আদিরস। রসস্বরূপে ঈক্ষণ করিলেন, কামনা করিলেন—'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' (ছান্দোগ্য) 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়' (তৈত্তিরীয়) এই যে ঈক্ষণ, এই যে কামনা, ইহাই ভাব। এই ভাবই শক্তি, ব্রহ্মের ইচ্ছা শক্তি, মূলশক্তি। শক্তি যেমন ব্রহ্মকে উদ্বুদ্ধ করেন, জগৎরূপে পরিণত করেন। সাহিত্য জগতেও তেমনই ভাবই রসকে রূপায়িত করেন, প্রকাশ করেন।

রস সত্ত্বোদ্রেককারী, অখণ্ড, স্বপ্রকাশ, আনন্দচিন্ময়, বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য এবং ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর। এই স্বপ্রকাশ অর্থে স্ব-শক্তিতে প্রকাশিত। ভাবই সেই শক্তি, রসের স্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গাশক্তি, যে শক্তিতে রস স্বপ্রকাশ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—'আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান,' প্রেম ভাবেরই অঙ্কুর, আবার প্রেম রসেরও অঙ্কুর, সুতরাং ভাব ও চিন্ময়। 'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথম বিক্রিয়া।' ইহাও সেই ঈক্ষণের কথা, সেই কামনার কথা। বহু হইবার ইচ্ছায় আপনাকে বিলাইবার কামনায় ব্রহ্মের চাঞ্চল্যই ভাব। বাস্তবিক ভাব এবং রসে কোন প্রভেদ নাই। আবার ভাব রস অভেদও নহে। এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

রস অখণ্ড, রস বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য। রস ভাবের বশীভূত, ভাবের ঘরে অপর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। মিলনই ইহার প্রকৃতি, একাত্মতাই ইহার ধর্ম। মাথুর বিরহ কীর্তন হইতেছে, অধ্যাপক, ব্যবহারাজীব, কৃষক, বণিক, শিল্পী সকলে মিলিয়া শুনিতেছি। তন্ময় হইয়া গিয়াছি। গোপীবিরহ সিন্ধুতে আপনা হারাইয়াছি। স্ব স্ব স্বভাব ভুলিয়াছি—বেদ্যান্তর স্পর্শ শূন্য হইয়াছি। বিশ্বনাথ কবিরাজ ইহার নাম দিয়াছেন 'সাধারণীকৃতি'। ইহাই সাহিত্য। সাহিত্যের ভাব।

সাধারণকে সম্মিলিত করিবার জন্য, তাহাদের সাহিত্য সৃষ্টির জন্য, এই সাধারণীকৃতি সাধনের জন্যই বৈষ্ণবগণ সাধারণের মধ্যে ভাবরসময়ী ভগবানের নাম-গুণ লীলা কীর্তনের প্রবর্তন ও প্রচার করিয়াছিলেন। এই অবস্থায়—

যাহা পরস্ব হইয়াও পরের নয়, নিজস্ব হইয়াও আমার নয়। অথচ বিভাবাদি সহযোগে আস্বাদনে যাহার কোন পরিচ্ছেদও নাই। তাহাই আনন্দ। ইহাই চমৎকৃতি। ইহাই রস এবং ভাবের স্বভাব। রস ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর। এই-জন্যই বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি, সাহিত্যের রস যোগী, জ্ঞানী ও ভক্ত সম্প্রদায়ের অন্বেষণীয় বেদান্ত প্রতিপাদিত রস মূলে এক। আনন্দই ইহার স্বরূপ। রসহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।

প্রাচীন আলঙ্কারিক ভরতমুনি বলিয়াছেন বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সহযোগে রস-নিষ্পত্তি হয়। অর্থাৎ এই তিনের সম্মিলিত

রূপ স্থায়ীভাবেই রসকে আকার দান করে, রস আস্বাদনের সহায়ক হয়। অন্তরকে বিভাবিত করে, রসকে উদ্দিপ্ত করে, তাই নাম হইয়াছে বিভাব। বিভাবের পশ্চাৎ উদিত হয় বলিয়াই পাণ্ডিতগণ নাম দিয়াছেন অনুভাব। আর যাহা বিশেষরূপে অভিমুখে বিচরণশীল, ভাবের সেই অংশের নাম ব্যভিচারী ভাব। বিভাবের দুইটি রূপ, আলম্বন ও উদ্দীপন। এই জগত, এই বিশ্ব প্রকৃতিই উদ্দীপন বিভাব।

পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, জায়া, কন্যা সকলেই উদ্দীপন বিভাব, আলম্বন সেই রস স্বরূপ।

জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মের যেমন তিন শক্তি ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি। অর্থাৎ হ্লাদিনী, সম্বিৎ ও সন্ধিনী, অথবা অনুভূতি, বোধ এবং কর্মশক্তি। সাহিত্য সৃষ্টি ব্যাপারে ভাবেরও তেমনই তিন রূপ, ব্যঞ্জনা, লক্ষণা এবং অভিধা। সুবিধার জন্য অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা এই ক্রম-পর্যায় গ্রহণ করিতেছি। শব্দের উচ্চারণ মাত্র যাহা সহজে প্রতীত হয়, সেই মুখ্যার্থবোধক বৃত্তিই অভিধা। যাহা পরম্পরাগত অভিধানের প্রকাশক, তাহাই অভিধা। মুখ্যার্থের বাধা ঘটিলে যাহার দ্বারা বাচ্য সম্বন্ধযুক্ত অন্য পদার্থবিষয়িনী প্রতীতি জন্মে তাহাই লক্ষণা। অথবা শব্দার্থের অন্তর্ভূত অর্থাৎ অসাধারণ সম্বন্ধবিশেষযুক্ত পদার্থের প্রতীতির নামই লক্ষণা। আর অভিধা, লক্ষণা, আক্ষেপ ও তাৎপর্যজনিত বোধ সমাপ্ত হওয়ার পর ধ্বন্যর্থ বোধের কারণীভূত যে ব্যাপার প্রতীয়মান হয় তাহারই নাম ব্যঞ্জনা। এ বিষয়ের একটি পরিচিত উদাহরণ 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'। ঘোষ গঙ্গাবাস করিতেছে। অভিধা বৃত্তিতে গঙ্গা বলিতে সুপ্রসিদ্ধা স্রোতস্বিনী বুঝায়। লক্ষণা বৃত্তিতে তাহার তীরভূমি বুঝিতে হয়, কারণ গঙ্গার জলে মানুষ বাস করে না। গঙ্গা-তীরে বাস করার কারণ তাহার শৈত্যাদিগুণ, তাহার পাবনীশক্তি ইত্যাদি। যে বৃত্তিতে এই গুণ ও শক্তি বুঝাইতেছে, ঘোষের গঙ্গাবাসের কারণ জানাইয়া দিতেছে, তাহাই ব্যঞ্জনাবৃত্তি।

ভাবের স্বকীয়া পরকীয়া ভেদ আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে পরকীয়া ভাবের স্থান অতি উচ্চে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলিয়াছেন—পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস। পরকীয়া একটি ভাব, এইভাবেই রসোল্লাসের চরম ও পরম উৎকর্ষ সাধিত হয়। কিন্তু ব্রজ ভিন্ন অন্যত্র ইহার অবস্থিতি নাই। সাহিত্যে রসরূপের "ব্যঞ্জনাই" পরকীয়া ভাব। বৈষ্ণব সাহিত্য বুঝিতে হইলে ব্যঞ্জনার আশ্রিত হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। জগতের যে কোন রস-রহস্যের মর্মগ্রহণ করিতে হইলে ব্যঞ্জনার শরণ লইতে হইবে। বৈষ্ণব সাহিত্যের আকর রহস্যগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যঞ্জনাই প্রধান। বৈষ্ণবের সাধনা এই ব্যঞ্জনার সাধনা। ব্যঞ্জনার একটা উদাহরণ দিতেছি। নীলাচলে রথযাত্রা। প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেব রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে গান করিতেছেন—

যিনি আমার কৌমার হরণ করিয়াছেন, সেই আমার অভিমত বর। সেই চৈত্রমাসের রাত্রি। সেই উন্মীলিত মালতী সুরভি-প্রৌঢ় কদম্ব বনবায়ু। সখি, তথাপি আমাদের সুরত ব্যাপারে রেবা নদীর তীরস্থিত বেতসী তরু-তলের জন্য আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে। কবিতাটির ইহাই অর্থ। লক্ষণা স্মরণ করাইয়া দিতেছে—কৈশোরের গত দিনের স্মৃতি। সেই চারি চক্ষের সহসা মিলনে সঞ্জাত প্রেম। নর্মদার বেতসীতরুকুঞ্জে সেই বহু প্রতীক্ষিত ঈপ্সিত প্রথম সমাগম। তাহার পর দীর্ঘদিনের অদর্শন, বহুদিন পরে পুনরায় এই মিলন, ইত্যাদি। সাধারণের সন্দেহ হইল শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মুখে এই সামান্যা নায়িকার কথা এই আদিরসের শ্লোক! একমাত্র শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদরই এই শ্লোকের অর্থ জানিতেন। দৈবাৎ সে বৎসর শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর কৃপায় শ্লোকের ব্যঞ্জনা বুঝিলেন, বুঝিয়া তালপত্রে ভাবানুরূপ একটি শ্লোক লিখিলেন। তাল-পত্রখানি ব্রহ্ম হরিদাসের কুটীরের চালে বাঁধিয়া শ্রীরূপ সমুদ্র স্নানে গিয়াছেন, এমন সময় শ্রীজগন্নাথ দেবের উপল ভোগ দর্শনান্তে মহাপ্রভু ব্রহ্ম হরিদাসের কুটিরে আসিয়া ইতি উতি চাহিতে তালপত্রখানি দেখিতে

পাইলেন। তালপত্রে শ্রীরূপ লিখিত শ্লোক-পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলেন। পাঠ করিলেন—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণ সহচরি কুরুক্ষেত্রে মিলিত—
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃসঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

বহুদিনের অদর্শন। বৃন্দাবন হইতে মথুরা, তথা হইতে দ্বারকা, মনে হয় যেন কত যুগ, কত যুগান্তর বহিয়া গিয়াছে। তাহার পর এই কুরুক্ষেত্রে মিলন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে সূর্যগ্রহণে তীর্থস্নান উপলক্ষ্যে কুরুক্ষেত্রে আসিয়াছেন। সঙ্গে অগণিত যাদব সেনা উগ্রসেন, বসুদেব, বলদেব, সাত্যকী প্রদ্যুম্ন প্রমুখ যাদব প্রধানগণ। জননী দেবকী ও মহিষী রুক্মিণী আদি পুরমহিলাগণও সঙ্গে আছেন। অশ্ব, হস্তী ও রথের সংখ্যা নাই। ভারতের রাজন্যমণ্ডলীও তীর্থস্নানে এবং কৃষ্ণদর্শনে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গেও মর্যাদানুরূপ সেনাবাহিনী। সংবাদ পাইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে আসিয়াছেন পিতা নন্দ, জননী যশোদা ও শ্রীদামাদি ব্রজরাখালগণ এবং অপরাপর গোপ গোপীবৃন্দ। আর আসিয়াছেন সখীযূথ পরিবৃতা শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেন, কৃষ্ণের সঙ্গে বহুবাঞ্ছিত মিলনে সম্মিলিতা হইলেন। কিন্তু কোথায় যেন ব্যবধান থাকিয়া গেল। দর্শনে সে তৃপ্তি নাই মিলনে সে আনন্দ নাই। ইহা রাজবেশ, হাতী ঘোড়া, মনুষ্য, এখানে তিনি বৃন্দাবনের জন্য উতলা হইয়া উঠিলেন। বলিলেন— সহচরি সেই আমার প্রিয় দয়িত কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছি, সেই আমি রাধা। সেই আমাদের সঙ্গম সুখ তথাপি মুরলীর মধুর পঞ্চমে লীলায়িত অন্তঃপ্রদেশ, কালিন্দীর পুলিন বিপিনে ব্রজকুঞ্জের জন্য আমার মনে স্পৃহা জাগিতেছে। ইহাই মহাপ্রভুর মনোভাব। মহাপ্রভুর পরিণতি। শ্লোকের ইহাই ব্যঞ্জনা। ইহাই রসের পরকীয়া ভাব। বৈষ্ণবগণ এই পরকীয়া ভাবেরই সাধনা করেন। রসজ্ঞ কবি কবিকর্ণপূর এই জন্যই অলঙ্কার-কৌস্তুভের মঙ্গলাচরণে ব্যঞ্জনাকে বন্দনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যেই আমার কথিত রহস্যের ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে।

স জয়তি যেন প্রভবতি দৃশি সুদৃশাং
ব্যঞ্জনা বৃত্তিঃ।
অতিশায়িতপদপদার্থো ধ্বনিরিব মুরলী-
ধ্বনির্মুরারাতেঃ।

পদ পদার্থের অতিরিক্ত যে ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা, —তিনি যেমন কাব্যজগতের অধীশ্বরী, তেমনই সকল ধ্বনির সমাদৃত মুরারির যে মুরলীধ্বনি,—ব্রজবিলাসিনী ধনীগণের নয়নে উদ্বেলিত আনন্দাশ্রুধারা অঞ্জনরেখা বিলোপ-হেতু ব্যঞ্জনা অর্থাৎ বিগতাঞ্জনা বৃত্তি সম্পাদিত করে, বৈকুণ্ঠাদি পদ এবং ব্রহ্মানন্দাদি পদার্থ হইতে উৎকর্ষশালী সেই মুরলীধ্বনির জয় হউক।

পূর্বেই বলিয়াছি বৈষ্ণবের সাধনা ভাব-রসের সাধনা, পরকীয়া ভাবের উপাসনা, এক কথায় ভাগবত-ধর্মের সাধনা। শ্রীমদ্ভাগবতই এই সাধনপথের আলোকস্তম্ভ। একাধারে সাধনা ও সিদ্ধির রহস্যগ্রন্থ। অত্যন্ত দুর্দিনেই আমরা সম্মিলিত হইয়াছি। অতীতের এমনই এক দুর্দিনেই শ্রীমদ্ভাগবত অভ্যুদিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে সপ্তম অধ্যায়ে যেখানে শ্রীমদ্ভাগবত কথার সূচনা হইয়াছে, সেই উপক্রমের পটভূমিকায় যে ভয়াবহ চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহার সঙ্গে আজিকার দিনের পার্থক্য—মাত্র দেশ কালেরই পার্থক্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। অনলোদ্গারী অস্ত্র সংঘাত, বীরেন্দ্রবৃন্দের আস্ফালন, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহন, সৈন্যগণের কোলাহল, আহতের আর্তনাদ সমস্ত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। ভারতের পরাক্রান্ত রাজন্যগণ কৌরব পাণ্ডব কোন না কোন পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন, সকলেই নিহত হইয়াছেন। দূরে বিস্তৃত প্রান্তর ব্যাপিয়া এখন শুধু শুনিতে পাইতেছি—শৃগাল কুক্কুরের কোলাহল এবং শোকার্তগণের বিলাপধ্বনি। এই মহাশ্মশানের অদূরে দ্বৈপায়ন হ্রদতীরে বৃকোদরাবিদ্ধ গদাভিমর্ষে ভগ্নোরুদণ্ড ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ভারত সম্রাট দুর্যোধন ভূমি শয়নে শায়িত রহিয়াছেন। একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য নাই, শত ভ্রাতা সহায় নাই, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ শল্য সেনাপতি নাই। পুত্র লক্ষ্মণ নাই। সে বিশাল সাম্রাজ্যও স্বপ্নরাজ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। কুসুমাস্তৃত পর্যঙ্কে দুগ্ধফেনানিভ শয্যায় দিব্যস্ত্রীগণের চারুকরধৃত চামরবীজনে যিনি বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেন, আজ পূতিগন্ধময় শবরাশি মধ্যে রক্তাক্ত রণক্ষেত্রের কঙ্কারাকীর্ণ প্রান্তরে ভূতলশয়নে তিনি একক। নয়নে নিদ্রা নাই, জীবন্তে ভক্ষণাভিলাষী আক্রমণোদ্যত সমীপবর্তী শৃগাল কুক্কুরকে প্রতিহত করিবারও তাঁহার সামর্থ্য নাই। কি শোচনীয় পরিনাম!

অতঃপর নিস্তব্ধ নিশীথে পাণ্ডবশিবিরে উপাংশু হত্যা, পাণ্ডববংশ নির্বংশ করিবার জন্য অশ্বত্থামা কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ, পৈশাচিক প্রতিহিংসায় ভ্রূণহত্যার প্রয়াস। সমস্ত বিপদ বিদূরিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উত্তরা-গর্ভস্থ শিশুর পুনরুজ্জীবন, বিষ্ণুরাত

পরীক্ষিতের প্রাণপ্রাপ্তি। ইহাই বাসুদেব কথার —শ্রীমদ্ভাগবতের অধিষ্ঠান ভূমি। এই ভীষণ শ্মশানে—এই শোকাবহ ধ্বংসস্তূপে দাঁড়াইয়া স্বতঃই প্রশ্ন জাগে "ততঃ কিম"? পার্থিব ঐশ্বর্যের এই পরিণাম। বল-বীর্য-মদোদ্ধত মাৎসর্যের এই পরিণতি। মানব, সারা জীবন ধরিয়া তুমি কি এই মহতী বিনষ্টির আরাধনা করিয়াছ? অমৃতের সন্তান তুমি, এই রুধির-দুগ্ধ ভোজ্য লইয়াই কি চিরতৃপ্ত থাকিবে? শ্রীমদ্ভাগবত এই জিজ্ঞাসারই উত্তর দান করিয়াছেন।

ভাগবত ধর্ম যুদ্ধ বিগ্রহকে অস্বীকার করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বহুবার যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রেমের রাজ্য বৃন্দাবনে বিনা অস্ত্রে মাত্র বাহু প্রহরণেই তিনি বহু দৈত্য দানবকে বধ করিয়াছিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণই বীর-বাঞ্ছিত যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। আবার মথুরা দ্বারকায় তিনি কোন দিনই কোন যুদ্ধেই পরাঙমুখ হন নাই, এমন কি যুদ্ধের সাহায্যেই তিনি নিজ বংশের ধ্বংস সাধন করিয়াছেন। নিন্দুক-গণ এই সমস্ত কথার আলোচনা করেন না, এই রহস্যের মর্মোদ্ঘাটনের চেষ্টা করেন না। অথচ বংশীধারীকে ইহারা দেখিতে পারেন না হয়তো দেখিতে জানেন না বলিয়াই পারেন না।

যুদ্ধ-বিগ্রহের উপদেশ না দিয়া রাজনীতি প্রচার না করিয়া মহাপ্রভু যে কোনরূপ অন্যায় করিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। মানব-জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে একটা আদর্শ আছে। মানুষ পশু নহে। নখ দন্ত লইয়া অথবা তাহারই সর্বোত্তম সংস্করণ আণবিক বোমা হাতে করিয়া নির্বিচারে নর-নারী হত্যা, পুর-গ্রামের ধ্বংস সাধনই মানবের চরম ও পরম লক্ষ্য নহে। ইহা পুরুষার্থ নহে, ইহা শ্রেয়ঃ লাভেরও পন্থা নহে। অথচ শ্রেয়ঃ লাভই পুরুষার্থ, শ্রেয়ঃ লাভই মনুষ্যত্ব, শ্রেয়ঃ লাভই মানবের একমাত্র কাম্য। মহাপ্রভু মানবকে এই শ্রেয়ঃ লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, নিশ্চিত পন্থা, অবশ্য অবলম্বনীয় পন্থারই সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

মহাপ্রভুর অনুবর্তী আচার্যগণ অত্যন্ত কুশলতার সহিত বৈষ্ণব সাধনার প্রস্থানত্রয় নির্ণয় করিয়াছেন। প্রথম দুই প্রস্থানের তাঁহারা ইঙ্গিত মাত্র দিয়াছেন, কয়েকটি মাত্র কথা সংকেতে বলিয়াছেন। তাঁহারা এই প্রস্থানত্রয়ের নাম দিয়াছেন—সাধরণী, সামঞ্জস্যা ও সমর্থা। সংকেতে বলিতে পারি অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। এই তিন পথের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম ভূ, শ্রী ও লীলা।

বৈষ্ণবের সাধন পথের,—সে যে পথই হোক না, অন্যতম পাথেয় হইল ত্যাগ। সর্বস্ব ত্যাগ না করিলে এই পথে প্রথম পদক্ষেপেরও অধিকার পাওয়া যায় না। দেশের জন্যই হোক, আর জাতির জন্যই হোক অভীষ্টলাভের "নান্যা পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" আনন্দই মানুষকে সর্বত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। সমর্থাই এই আনন্দরাজ্যের রাজরাজেশ্বরী।

নির্মৎসর সৎ প্রকৃতি, বলিষ্ঠ একনিষ্ঠ মতি, প্রসন্ন-উজ্জ্বল চিত্ত এবং প্রোজ্ঝিত-কৈতব প্রাণ ভিন্ন বৈষ্ণবধর্ম সাধনের যোগ্যতা অর্জিত হয় না। এদেশে একটা কথা আছে, বেদ প্রভু, পুরাণ ও তন্ত্র মিত্র, কাব্য প্রেয়সী। শ্রীমদ্ভাগবতে এই তিন ভাবেরই সমন্বয় ঘটিয়াছে। বেদের কর্মকাণ্ডের পর বুদ্ধদেব নীতি ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। অতঃপর শঙ্করের জ্ঞানবাদ এবং আচার্য রামানুজাদি প্রবর্তিত ভক্তিবাদ প্রচারের পর মহাপ্রভু মানবতার কথা প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত কর্ম নীতি, জ্ঞান ভক্তি ও মানবতার শাস্ত্রগ্রন্থ। মহাপ্রভুই শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীবিগ্রহ, মহাপ্রভুই মানবতার পরিপূর্ণ প্রতিরূপ। মহাপ্রভুর প্রবর্তিত সাধনা—মানবতার সাধনা। এই সাধনাকে জীবনে সত্য করিতে হইবে, সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। এই জীবনকে ভাগবত জীবনে রূপান্তরিত করিতে পারিলেই সিদ্ধি করতলগত হইবে। 'তোমার যে অন্য মন আমার মন বৃন্দাবন'—এই মনে বনের ঐক্যসাধনই সর্বার্থ-সিদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। এইজন্যই মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া-ছিলেন। বিশ্বমানবের একমাত্র গন্তব্য স্থান মধুভূমি শ্রীবৃন্দাবন। ভূমি সেখানে চিন্তা-মণিময়, জল অমৃত। বৃক্ষ কল্পবৃক্ষ লতা কল্পলতা। ধেনু কামধেনু, কথা গান, গমনই নৃত্য। ভূমি চিন্তামণিময়, বৃক্ষ কল্পবৃক্ষ, কিন্তু এখানে কাহারো কোন প্রার্থনা নাই। কামনা আছে, একমাত্র কৃষ্ণ-সুখের কামনা।

এই মধুর বৃন্দাবনের নায়ক রসস্বরূপ তিনি ভুবনসুন্দর, তিনি চিরকিশোর, বংশী তাঁহার প্রিয়সখী। এই প্রেমরাজ্যের যিনি সর্বেশ্বরী, যিনি নায়িকা, ন মহাভাবময়ী তিনি সর্ব-সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী; তিনি চিরকিশোরী, বিভাবাদি তাঁহার প্রিয় সখী। বৈষ্ণব-সাধক এই রসস্বরূপ ও মহাভাবময়ীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, রসভাবের অপরোক্ষানুভূতি লাভে ধন্য হইয়াছিলেন।

একাধিক ছবিতে একই সময়ে অভিনয় করা নিয়ে বম্বের চিত্র-প্রযোজকদের একটা নির্ধারণের কথা গত সপ্তাহে দিয়েছি। একদিক থেকে এটা ভালই হ'লো যদিও অভিনেতা এতে বেশ ক্ষুণ্ণই হবেন। কারণ, এক একজন একসঙ্গে পাঁচ ছটা ছবিতে অভিনয় ক'রে প্রচুর পয়সা যে উপায় ক'রে নিচ্ছিলেন তার সুযোগ এর দ্বারা চলে গেল। কিন্তু তারা যে ছবিতে কাজ করছেন আজকাল তা দেখলে তাকে কি কেউ কোন শিল্পীর অভিনয় প্রতিভার পরিচায়ক ব'লে মনে ক'রতে পারে? এখনকার ছবিতে ভাল অভিনয় দেখাটা একরকম দুর্লভ হ'য়েই উঠেছে আর তা হবেই না বা কেন? একই ব্যক্তিকে যদি একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটা ভূমিকায় অভিনয় ক'রতে হয় তাহ'লে তার দ্বারা কোন একটা ভূমিকারও মর্যাদা রক্ষা করা কি ক'রে সম্ভব হ'তে পারে; যত বড় শিল্পীই তিনি হোন এ কিছুতেই হ'তে পারে না। তাই আমাদের ছবিতে অভিনয় বলতে কিছুই পাই না আমরা। তার ওপর প্রযোজকদেরও বড় কম বিপদে পড়তে হয় না। একজন পাঁচটা ছবিতে নিযুক্ত থাকায় সকলকেই সেই অভিনেতা বা অভিনেত্রীর ফুরসতের ওপরে নির্ভর করে থাকতে হয়, চিত্রগ্রহণকালও তাতে অনেক বেড়ে যায়, অর্থাৎ নিতান্তই বেহিসেবী লোকসান। অভিনয় একটা মস্ত বড় আর্ট, একটা সাধনার জিনিস, এসব কথা আমরা শুনেই এসেছি, কিন্তু সাক্ষাৎ পরিচয় বড় একটা ঘটেনি; আজকাল অভিনয় শিল্পীর অভিনয়-ক্ষমতা লোককে মুগ্ধ ক'রতে অপারগ হয় ব'লেই অন্যান্য দিকের গুণকীর্তি প্রচার ক'রে সেই কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা লোককে তাদের প্রতি আকর্ষিত করার চেষ্টা হয়। একথা শিল্পীরা নিজেরাও স্বীকার ক'রবেন যে বহু চরিত্র একসঙ্গে অভিনয় করার জন্যই তারা কোন চরিত্রই ফুটিয়ে তুলতে পারেন না। আগে একই প্রতিষ্ঠানে মাস মাইনের থেকে এক-খানার বেশি ছবিতে একসঙ্গে কাজ ক'রতে হলে 'বেশি খাটিয়ে নেওয়া হ'চ্ছে,' 'প্রযোজকরা অভিনয় কলার মর্যাদা দেন না' ইত্যাদি নানা কথাই নটনটীদের মুখ থেকে শোনা যেতো। এখন নিজেরা ইচ্ছে ক'রে সেই অপরাধ ক'রে চলেছেন তারা অবাধে। লাভ লোকসানের ব্যাপারটা কলাক্ষেত্র সম্পর্কে একেবারে চিন্তার বাইরে রেখে কাজ না করলে কোনমতেই সাফল্যলাভ করা যায় না। এইভাবে পয়সার পিছনে দৌড়ে আজ দশ বছরের মধ্যে একজনও স্মরণ করে রাখবার মত বড় অভিনয়শিল্পীর দর্শন আমরা যে পাইনি এটা কি কম লজ্জার কথা।

এ সপ্তাহের সেরা আকর্ষণ রূপবাণীতে প্রতিমহল থিয়েটার্সে'র পৌরাণিক ছবি



নূতন ও আগামী আকর্ষণ

'শ্রীদুর্গা' যার পরিচালক হ'লেন শৈলজা-নন্দ। ছবিখানির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় ক'রেছেন অহীন্দ্র, ছবি বিশ্বাস, নির্মলেন্দু, ছায়া দেবী, সরযু, রেণুকা প্রভৃতি জনপ্রিয় বহু শিল্পী এবং সঙ্গীত পরিচালনা ক'রেছেন সুবল দাশগুপ্ত।

* * *

এ সপ্তাহের অপর নতুন ছবি হ'চ্ছে দীপক ও শ্রীতে লক্ষ্মী পিকচার্সে'র সামাজিক অবদান 'ভাগ্যলক্ষ্মী' যার প্রধান ভূমিকায় আছেন শান্তা আপ্তে ও প্রেম অদীব।

* * *

ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর 'কলঙ্কিনী' আসছে সপ্তাহে মুক্তিলাভ ক'রবে মিনার, ছবিঘর ও বিজলীতে একসঙ্গে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় রয়েছে অহীন্দ্র, ধীরাজ, জহর, রেণুকা সবিত্রী প্রভৃতি।

* * *

'বীণা টকীজ' ও 'ক্রাউন সিনেমা'-র দ্বারোদ্ঘাটনের তারিখ এখনও ঠিক নেই। পুজোর আগেই হতে পারবে এমন কথাও নিশ্চয় ক'রে আর বলা যাচ্ছে না।

* * *

নিউ স্টেজ কমিউনিয়ান কর্তৃক ইবসেন প্রণীত 'A Doll's House'এর বাঙলা তর্জমা 'পুতুলের সংসার' মঞ্চে অভিনয় উপযোগী কিঞ্চিৎ অদলবদল করে আগামী ৯ই অক্টোবর 'কালিকায়' অভিনীত হবে।

বিবিধ

ফিল্ম গুদামে সম্প্রতিকার দুটো ভীষণ আগুন লাগার পর আরও আগুন লাগার খবরের মধ্যে রয়েছে বম্বের আকোলা অঞ্চলে ভারত পিকচার্স লিমিটেডের গুদামে অগ্নিকাণ্ড যার ফলে শতখানেক বাক্স ফিল্ম পুড়ে গেলেও নিহত বা আহত কেউ হয়নি আর অপরটিও অনুরূপই অগ্নিকাণ্ড, লেগেছিল নেলোরের নিউ পিকচার্সে'র গুদামে।

* * *

নজীর ও সুবর্ণলতা 'ওয়ামক এজরা'-তে অভিনয় করার পর সুবর্ণলতা পর্দা থেকে বিদায় নিয়ে শ্রীমতী নজীর হবেন ব'লে কোন কোন কাগজে সংবাদ বেরিয়েছে।

গত নিখিল ভারত কংগ্রেস অধিবেশনের সজ্জা ভার পরিচালক শান্তারাম গ্রহণ ক'রে-ছিলেন।

* * *

অমিয় চক্রবর্তীর চুক্তি গত ২২শে সেপ্টেম্বর শেষ হ'য়ে যাওয়ায় নতুন পরি-চালক শিরাজ আলি আর পুনঃচুক্তি না করায় চক্রবর্তীকে বম্বে টকীজ ছাড়তে হ'লো। চারশো টাকা মাইনেতে গল্প-বিভাগে নিযুক্ত হ'য়ে দু'বছরে তিন হাজার টাকা মাইনেতে প্রযোজক-পরিচালক পদে তিনি বৃত ছিলেন। এবং লোকে বলে বম্বে টকীজের যত সব গোলমালের তিনিই ছিলেন জড়। সেই মত নতুন প্রযোজক ধরমশীর ওপরেও নোটিশ পড়েছে আর জয়রাজ তো পরিচালক হিসেবে ইস্তফাই দিয়েছে। বম্বে টকীজে এব্যার প্রযোজক ব'লে কেউ থাকবে না।

* * *

মাদ্রাজের ইউনাইটেড ফিল্ম আর্টিস্টের মালিক এই ব'লে চিত্রজগত থেকে বিদায় গ্রহণ ক'রছেন যে এতকাল ছবি তুলেও তিনি জনসেবা ক'রতে পারলেন না কিছুতেই।

* * *

লীলা চীৎনীশ রাজা মুভিটোনের জহরে রাজার ওপরে এই বলে মামলা এনেছেন যে 'গজল' ছবিতে কাজ করিয়ে তার মাইনে দেড় হাজার টাকা বাকি রাখা হ'য়েছে।

* * *

শোনা গেল খ্যাতনামা বালক-নট সুরেশ রাজকমল পিকচার্সে'র শান্তারামের প্রেমে পড়েছে এবং পরিণামে পরিণয়ও সম্ভব।

* * *

বম্বের প্রফুল্ল পিকচার্সে'র আগামী ছবি পরিচালনা ক'রবেন নট ইয়াকুব—ছবিখানা হবে হাসির এবং ভারতের খ্যাত-নামা হাস্যরসিকদের তাতে নেওয়া হবে।

* * *

ফিল্মিস্তান থেকে গীতকার প্রদীপকে ছাড়িয়ে সন্তোষীকে গ্রহণ করা হ'য়েছে।

* * *

নর্তক রফীক আনোয়ার তার লাইসেন্সে এখানে নয়, বম্বের রামনীক স্টুডিওতে ছবি তুলবে।

* * *

নিতীন বসু আবার নিউ থিয়েটার্সে ফিরে আসছেন ব'লে একটা খবর রটেছে অথচ বম্বেতে শুনেছি আরও একখানা ছবি তোলার চুক্তি রয়েছে, এদিকে তিনি এসে হাজির হচ্ছেন ক'লকাতায়—ঝামেলার ব্যাপার!

* * *

দেবীকারাণী অতঃপর একটি নাট্যশিক্ষা-কেন্দ্র খোলবার উদ্যোগ ক'রেছেন।

* * *

বম্বের একটি খবরে প্রকাশ যে, কলকাতায় সম্প্রতি আগত কোন তারকার ওপরে গত দু'বছর তার সঙ্গে বিভিন্ন ছবিতে নায়ক হবার সৌভাগ্যবান এতকাল সাধু ব'লে কোন নট নজর রেখে আসছিল এবং হঠাৎ গত সপ্তাহে মত্তাবস্থায় উক্ত তারকার গৃহে হাজির হ'য়ে মহাগন্ডগোলের সৃষ্টি করে, যার উত্তরে উক্ত তারকার পিতা নটটীকে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়ে বিতাড়িত করেন। ক'লকাতায় এসেছে তো কৌশল্যা—তবে নটটী কি ঈশ্বরলাল না কি? অনেক বিষয়ে মিল রয়েছে কি-না!

* * *

নবীন বসুর ফিল্মিস্তানে তোলা ছবি 'মজদুর' ট্রায়াল দেখার পর অশোককুমার রায়বাহাদুর চুনীলালের ওপর এই ব'লে রাগ প্রকাশ ক'রেছেন যে, ভাল ভূমিকা দেওয়া হ'লো অন্য লোককে (নোসীর নামে এক নবাগত এই ছবির নায়ক এবং রায়-বাহাদুরই অশোককুমারকে এ ভূমিকা দেননি), আর আমি যার কথায় বম্বে টকীজ ছেড়ে এলুম সে-ই আমাকে অমন সুন্দর একটা ভূমিকা থেকে বঞ্চিত ক'রলে।

* * *

রাশিয়ার ৩৫ বছর বয়সের বৈজ্ঞানিক সেমিয়ন আইভানভ্ এমন এক পর্দা আবিষ্কার ক'রেছেন যার সাহায্যে বিনা বিশেষ-চশমাতেই ছবির Three dimensional effect পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে রাশিয়া আমেরিকার ওপরে টেক্কা মেরে গেল। আর নতুন এই পদ্ধতিতে এর জন্যে আলাদা কোন কায়দায় ছবি তুলতেও হবে না, যেমন এখন তোলা হয় সেই রকমই থাকবে, যা কিছু মারপ্যাঁচ ঐ পর্দার ওপরেই। রাশিয়ায় এখন ব্যাপকভাবে এই পদ্ধতিটি কাজে লাগাবার ব্যবস্থা হ'য়েছে।

* * *

পরিচালক ফণী মজুমদার দীর্ঘকাল পর কলকাতায় এসেছেন তাঁর কোম্পানীর যে একখানি ছবি কালি ফিল্মসে তোলা হবে তার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ক'রতে।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের শারদোৎসব

গত ১৩ই আশ্বিন, রবিবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ভবনে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের শারদোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার প্রধান নাগরিক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিচারপতি শ্রীযুক্ত বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, অধ্যক্ষ ডাঃ অনন্তপ্রসাদ ব্যানার্জি শাস্ত্রী, মঃ মঃ শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, মঃ মঃ শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মঃ মঃ শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য, ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, শ্রীবঙ্কিম ভট্টাচার্য, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, অধ্যাপক শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত অমলানন্দ ঘোষাল কর্তৃক 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের পর কার্য আরম্ভ হয়। মঃ মঃ শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও ডাঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে মেয়র মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ তাঁহাকে মাল্যদান করেন। ইহার পর মঃ মঃ শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য মহাশয় স্বরচিত শরৎ-ষোড়শী পাঠ করেন। সভাপতি মহাশয় স্বীয় অভিভাষণে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের এতাবৎকাল কার্যের প্রশংসা করিয়া সকলের নিকট পরিষৎকে সমর্থন ও পরিপোষণের জন্য আবেদন করেন। দেশে যাহাতে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার হয়, বিশ্ববিদ্যালয় যাহাতে সংস্কৃত শিক্ষার উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করে, তজ্জন্য তিনি বিশেষভাবে সকলকে মনোযোগী হইতে বলেন। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় সভাপতিকে ধন্যবাদ দিলে সভার কার্য শেষ হয়।

সভার পর পরিষৎ-সদস্যগণ প্রাচীন কবি ভাসের "প্রতিমা নাটক" এবং পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ রচিত "পুরুষরমণীয়ম্" প্রহসনের অভিনয় করেন। অভিনয় এবং সঙ্গীত খুব উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "জর্জরোৎসব" করেন। ভূমিকাগুলির মধ্যে ভরত, রাম, রাবণ, দশরথ, সীতা পদক প্রাপ্ত হয়।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৬শে সেপ্টেম্বর—মহাত্মা গান্ধী ২রা নভেম্বর বাঙলায় আসিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর—গত ২৫শে সেপ্টেম্বর কলিকাতার নিকটে একটি মিলিটারি ক্যাম্পে এক হাঙ্গামার কালে ক্যাম্পের গার্ডকে গুলী চালাইতে হয়। উহার ফলে ৫ জন বন্দী নিহত ও ৯ জন আহত হইয়াছে। সামরিক আদালতে ব্যাপারটির তদন্ত চলিতেছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোম্বাইতে একদল ভারতীয় ও বৈদেশিক সংবাদপত্র সম্পাদকের বৈঠকে তাঁহার পরিকল্পিত স্বাধীন ভারতের অর্থনৈতিক গঠনের বর্ণনা করেন। তাঁহার পরিকল্পনায় প্রধান প্রধান শিল্পগুলি রাষ্ট্রের অধীন হইবে, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে; জমিদারী ব্যবস্থার অবসান হইবে এবং সমস্ত জমি বড় বড় সমবায় প্রতিষ্ঠানের হাতে যাইবে।

বোম্বাই-এর এক জনসভায় শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, ১৯৪২ সালের আগস্ট প্রস্তাব গৃহীত হইবার অব্যবহিত পরে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয় কম্যুনিস্টরা তাহা বানচাল করিতে চেষ্টা করে। ইহারা মহাত্মা গান্ধীর অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া 'জনযুদ্ধের' বুলি আওড়াইতে থাকে।

প্রকাশ যে, আগামী মাসে জনৈক স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণের বিচার হইবে।

ট্রাম-শ্রমিক ও ট্রাম কোম্পানীর মধ্যে বৃহস্পতিবার এক মীমাংসা হওয়ার ফলে শুক্রবার হইতে কলিকাতায় ট্রাম চলাচল শুরু হয়।

২৮শে সেপ্টেম্বর—পাটনায় সদাকত আশ্রমে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, ১৯৪২ সাল ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়রূপে পরিগণিত। কংগ্রেস উক্ত সালের আগস্ট মাসে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অপরিবর্তিত থাকিবে।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু অদ্য পুনাতে মহাত্মা গান্ধী ও সর্দার প্যাটেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহাদের সহিত বাঙলার অবস্থা ও আগামী সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

প্রকাশ, গত শুক্রবার উত্তরপাড়াতে মিলিটারি লরী চাপায় দুইজন নিহত ও একজন গুরুতর আহত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মনোনয়নের জন্য নিম্নলিখিত তারিখে বিভিন্ন প্রদেশে ভোট গ্রহণ হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে:—আসামে ২১শে নভেম্বর, মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে ২২শে নভেম্বর, পাঞ্জাবে ২৩শে নভেম্বর, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, আজমীর, মাড়োয়ারে ২৬শে নভেম্বর, উড়িষ্যায় ২৯শে নভেম্বর, মাদ্রাজ ও সিন্ধুতে ১লা ডিসেম্বর এবং বাঙলাদেশে ১৬ই ডিসেম্বর। ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম দিকে নূতন কেন্দ্রীয় আইনসভার অধিবেশন আহূত হইবে।

২৯শে সেপ্টেম্বর—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এক বিবৃতিতে জানান যে, বেনারস জেলের তিনজন বিচারাধীন বন্দীকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত অবস্থায় এক মাইল দূরবর্তী বিচারালয়ে হাঁটিয়া যাইতে বলা হয়; উহাতে বন্দিগণ তাহাদের অসামর্থ্য জানাইলে তাহাদিগকে হাত-পা ধরিয়া টানিয়া মৃত পশুর ন্যায় সমস্ত পথ লইয়া যাওয়া হয়। পথিমধ্যে পিপাসার্ত হইয়া জল চাহিলেও তাহাদিগকে অপমানিত করা হয়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর দেখা যায় যে, তাহাদের কাপড়-চোপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে এবং শরীরের নানাস্থান কাটিয়া গিয়াছে এবং পৃষ্ঠদেশ রক্তাপ্লুত হইয়া গিয়াছে।

কাজের চাপে পণ্ডিত নেহরু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমলা লেকচার দিতে পারিবেন না বলিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে জানাইয়াছেন।

বোম্বাই শহরে সহসা এক দাঙ্গার উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহাতে এ পর্যন্ত ২৬ জন নিহত ও ১২১ জন আহত হইয়াছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর—সাময়িক বিরতির পর অদ্য সন্ধ্যায় বোম্বাই-এর দাঙ্গা পুনরায় আরম্ভ হয়। এ পর্যন্ত ৩০ জনের মৃত্যু এবং ১৪০ জন আহত হইয়াছে। ৪৬০ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

১লা অক্টোবর—গৌহাটি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এক সংক্ষিপ্ত অধিবেশন আহ্বান করিবেন, এ সম্ভাবনা রহিয়াছে। যদি এ অধিবেশন আহ্বান করা স্থির হয়, তবে উহা কলিকাতাতেই মহাত্মা গান্ধীর বাঙলা সফরের কালে অনুষ্ঠিত হইবে।

বোম্বাইয়ের দাঙ্গাতে এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৩২ এবং আহতের সংখ্যা ১৬৭ জনে দাঁড়াইয়াছে।

২রা অক্টোবর—মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস উপলক্ষে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু গান্ধীজীর নিকট নিম্নোক্ত মর্মে এক তারবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন—"আপনার জন্মদিবসে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। ভারত ও জগতের সেবার জন্য ভগবান আপনাকে আরো দীর্ঘকাল জীবিত রাখুন—ইহাই প্রার্থনা।"

বোম্বাই-এর দাঙ্গাতে অদ্য পর্যন্ত ৩৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

দুমকার খবরে প্রকাশ, হাটিয়া বা হাটী তোলার খরচ আদায় উপলক্ষে গোদ্দা থানার দোরী গ্রামে এক সংঘর্ষের ফলে ৬ ব্যক্তি নিহত ও কতিপয় আহত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে সেপ্টেম্বর—ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সেনাপতি মেজর জেনারেল ভোঁসলাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টের পাঁচজন মন্ত্রীকেও বন্দী করা হইয়াছে। ব্যাঙ্ককে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর প্রায় দুই হাজার সৈন্য আটক রহিয়াছেন। ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া যে দুইটি ডিভিশন শ্যামদেশে পশ্চাদপসরণ করিয়াছে, উহারা তাহাদেরই অবশিষ্ট সৈন্য। উহারা নিরস্ত্রীকৃত অবস্থায় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দেশের প্রতীক্ষা করিতেছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর—লণ্ডনে ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারত সরকারের সেচ সংক্রান্ত উপদেষ্টা স্যার উইলিয়াম স্ট্যাম্প ঘোষণা করেন যে, বাঙলার মন্বন্তরের ভয়াবহ চিত্র স্মরণ করিয়া ভারতের আসন্ন দুর্বিপাকে জগদ্বাসী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বিত না হইলে শীঘ্র আবার সর্বনাশকরূপে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইবে।

সরকারী কার্যব্যপদেশে সাইগনে প্রেরিত লোকেরা জানাইয়াছেন যে, বাঙলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের ভূতপূর্ব ডিরেক্টর ও ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর নেতারূপে ব্রহ্মদেশে সুপরিচিত কর্নেল চাটার্জি বর্তমানে ফরাসী ইন্দোচীনের হানয়ে রহিয়াছেন।

২৮শে সেপ্টেম্বর—সাইগনে মিত্রবাহিনীর সহিত আনামী সৈনাদের লড়াই চলিতেছে। ইন্দোনেশিয়ান আন্দোলনের সমর্থনে অস্ট্রেলিয়ার ডক শ্রমিকরা ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।

সাম্রাজ্যবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকল্পে দক্ষিণ-এশিয়ায় মুক্তি আন্দোলন দমনে ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুত কৃষ্ণ মেনন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর নিকট এক পত্র প্রেরণ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

"কলিয়ার্স ম্যাগাজিনের" প্রতিনিধির কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইশেক বলেন যে, চীনকে সম্পূর্ণরূপে ঐক্যবদ্ধ করার পথে একমাত্র অন্তরায় হইতেছে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টি।

একটি বে-সরকারী সংবাদে প্রকাশ, রুশ ইংলণ্ড আলোচনায় মার্কিন প্রতিনিধি ব্রিটেনকে অল্প সুদে ১২৫ কোটি পাউণ্ড ঋণ দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

আমেরিকার শ্রমিক সমস্যা অধিকতর ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র আমেরিকা জুড়িয়া আড়াই লক্ষ শ্রমিক বিক্ষোভ করিতেছে এবং ধর্মঘটের ফলে নিউইয়র্ক শহরের কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

৩০শে সেপ্টেম্বর—প্রকাশ, ইন্দোচীনে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈন্য ও ২০ হাজার ইউরোপীয় নরনারীকে আনামীরা পরিবেষ্টন করিয়াছে। আরও প্রকাশ, ৭ হাজার সশস্ত্র আনামী এবং তৎসহ আরও হাজার হাজার আনামী ছোরা, বর্শা, দেশী বোমা ইত্যাদিতে সজ্জিত হইয়া আমরণ সংগ্রামে প্রস্তুত রহিয়াছে।

কায়রোর খবরে প্রকাশ, পাঁচ শতাধিক গ্রীক শরণাগতকে স্বদেশে প্রেরণের কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে ব্রিটিশ জাহাজ "এম্পায়ার পেট্রেল" আগুনে লাগিয়া যায়, ফলে ৭০ জন লোক নিখোঁজ বা নিহত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

১লা অক্টোবর—ব্রিটিশ, ফরাসী ও আনামী-দের মধ্যে যে সংঘর্ষ চলিতেছে উহার দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হইয়াছে।

২রা অক্টোবর—আজ অপরাহ্নে কোনরূপ নিষ্পত্তিতে না পৌঁছাইতেই পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনের পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

ফরাসী ইন্দোচীনে সংঘর্ষ বিরতির চুক্তি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সরকারী ঘোষণা করা হইয়াছে। সাইগন হইতে প্রাপ্ত পূর্ব সংবাদে জানা গিয়াছিল যে, আনামীরা স্বাধীনতা লাভ না করা পর্যন্ত লড়াই চালাইতে কৃতসংকল্প। তাহাদের ৫০ হাজার যোদ্ধা রহিয়াছে এবং আরও ৫০ লক্ষ লোক দেশের সর্বত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত।

দেশ

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] ২৬শে আশ্বিন, শনিবার, ১৩৫২ সাল। Saturday, 13th October, 1945. [৪৯শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে এটলী

ব্রিটিশ শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলের পরিচালক মিঃ এটলী বিশ্বমানবের স্বাধীনতার একজন বড় সমর্থক বলিয়া অনেকে জাহির করিয়া থাকেন। কিন্তু মিঃ এটলী এবং তাঁহার দলবলের মুখোস ক্রমেই খুলিয়া পড়িতেছে এবং ভিতর হইতে সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র-দংষ্ট্রা বাহির হইতেছে। যবদ্বীপ এবং তাঁহাদের স্বাধীনতাকামী স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সেনা নিয়োগের প্রতিবাদ করিয়া মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে মিঃ এটলীর নিকট একখানা চিঠি দেন। মিঃ এটলী এই চিঠির যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চিরন্তন কূট কৌশলসম্মত। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী জবাবে মোলায়েম ভাষায় বলিয়াছেন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলিয়া দাবী করিলেই, যে কোন আন্দোলন গণতান্ত্রিক প্রতিপন্ন হয় না। এ কথার সোজা অর্থ এই যে, হিন্দুচীন এবং যবদ্বীপের স্বাধীনতাকামীরা বলিতেছে বটে যে, তাহাদের আন্দোলন গণতান্ত্রিক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, অর্থাৎ তাহারা সত্য কথা বলিতেছে না। মিঃ এটলীর এই যুক্তি মানিয়া লইতে হইলে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী দলের মতে যে আন্দোলন গণতান্ত্রিক বলিয়া গণ্য হইবে না, তাহা গণতান্ত্রিক নয়; সুতরাং তেমন আন্দোলন দমনে সাম্রাজ্যবাদীরা যদি পশুবল প্রয়োগ করে, তাহা নীতিবিরুদ্ধ বলা ঠিক হইবে না। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অন্যতম শ্রমিক সদস্য মিঃ কোভের এতৎসম্পর্কিত একটি মন্তব্যে মিঃ এটলীর যুক্তির মূলীভূত মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ পাওয়া যাইবে। মিঃ কোভ বলেন, ইংরেজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ এই তিন শক্তি তাহাদের সাম্রাজ্যবাদকে সুদৃঢ় করিবার জন্য সর্বপ্রযত্নে প্রবৃত্ত [illegible]। ইহাদের পরস্পরের অর্থ-নীতি [illegible] আজ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় [illegible] পারে। ক্ষেত্রে ইহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে। স্বার্থের দায় এমনই দায়; কিন্তু পাশ্চাত্যের এই সাম্রাজ্যবাদীরা আজ স্বার্থের তাড়নায় অন্ধ হইয়া আগুন লইয়া খেলা করিতে উদ্যত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। যদি অবিলম্বে তাহাদের এই পশু পিপাসা সংযত না হয়, তবে হিন্দুচীন ও যবদ্বীপে যে আগুন বর্তমানে স্ফুলিঙ্গের আকারে দেখা দিয়াছে, অনতিবিলম্বে সমগ্র এশিয়ায় তাহা ছড়াইয়া পড়িবে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের রাক্ষসী বৃত্তি হইতে এশিয়ার নিপীড়িত মানবসমাজকে রক্ষা করিবার পবিত্র ব্রতে পরাধীন ভারতও তখন আত্মদানে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইবে না।

এশিয়ার জাগরণ—

আণবিক বোমার ভয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানবাত্মার বিদ্রোহের বৈপ্লবিক প্রবৃত্তিকে দমিত করিতে পারে নাই। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের আসুরিক বলকে প্রতিরোধ করিবার জন্য আজ সমগ্র এশিয়া সঙ্ঘবদ্ধভাবে জাগিয়া উঠিতেছে এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বহুদিন পূর্বে এশিয়াবাসী সঙ্ঘের যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বিশ্বব্যাপী বিগ্রহের পর এতদিনে তাহা সত্য হইতে চলিয়াছে। হিন্দুচীনের স্বদেশপ্রেমিক সন্তানগণ ঘোষণা করিয়াছেন, "সাইগনকে ভস্মস্তূপে এবং সমগ্র হিন্দুচীনকে মরুভূমিতে পরিণত না করিয়া শ্বেতাঙ্গগণ এ দেশ দখল করিতে পারিবে না।' কিন্তু সাম্রাজ্যবাদিগণের রক্তপিপাসা সহজে নিবৃত্ত হইবে বলিয়া মনে হয় না; হিন্দুচীনের স্বদেশপ্রেমিক আনামী-দিগকে দমন করিবার জন্য ফরাসী ও ইংরেজের সৈন্যবাহিনী সেখানে নূতন নূতন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সন্নিবিষ্ট হইতেছে; এবং সমগ্র ভারতের প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারতীয় সৈন্যদিগকে সাম্রাজ্যবাদীদের এই স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিযুক্ত করা হইতেছে। তথাকার বৃটিশ সেনাপতি মেজর জেনারেল গ্রেসী আনামীদের বিরুদ্ধে বোমাবর্ষী বিমান ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এদিকে ইন্দোনেশিয়ানের দ্বীপ রাজ্যে ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের ঘাঁটি পাকা করিবার চেষ্টায় আছে। তাহারা জানাইয়া দিয়াছে যে, তথাকার জাতীয়তাবাদী দলের নেতা ডক্টর সুকর্ণের সঙ্গে তাহারা কোনরূপ আপোষ-মীমাংসার প্রস্তাব চালাইবে না। এবং ইহা সত্য যে, ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দানের ইচ্ছা তাহাদের নাই। বৃটিশের সঙ্গে এই অঞ্চলের শোষণ স্বার্থে ওলন্দাজদের দস্তুরমত যোগ রহিয়াছে। ডক্টর সুকর্ন, মাদাম চিয়াং কাইসেক, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং অষ্ট্রেলিয়ার ডক্টর এভাট ও ফিলিপাইনের মেজর জেনারেল কার্লোস, রোমূলুকে তথাকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য বেতারবার্তাযোগে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ডক্টর এভাট অষ্ট্রেলিয়ার শ্রমিক দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি। আমরা জানি, সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে গিয়া তিনি বিশ্বমানবের স্বাধীনতার বড় বড় কথা বলিয়াছেন; কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের বাস্তব স্বার্থের সংঘাত ক্ষেত্রে তাঁহার সেই সব উক্তির মূল্য শেষ পর্যন্ত কতটা বর্তিবে এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে; তবে এই সূত্রে সমগ্র এশিয়ায় জাতীয়তাবাদী নেতৃগণের মধ্যে যে একটা মিলনক্ষেত্র গড়িয়া উঠিতেছে, ইহা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অন্য দিকে মিশরের স্বাধীনতাকামী সন্তানগণ বিশেষভাবে তথাকার তরুণের দল স্বদেশের স্বাধীনতার

জন্য অন্তরে রুদ্রবল লইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ সেনাদিগকে অপসারিত করিবার জন্য সমগ্র মিশর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাবী করিতেছে। মিশর অবশ্য এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু মিশরের এই আন্দোলনকে আরব জাতির আন্দোলন বলা চলে এবং সেই হিসাবে মিশরবাসীদের এই আন্দোলনকে এশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনেরই অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই আন্দোলন পশ্চিম এশিয়ার আরব অধ্যুষিত অঞ্চলের উপর প্রভাব বিস্তার করিবে এবং ইরাক, ইরাণ, সিরিয়া, প্যালেস্টাইনে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধের শক্তিকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিবে। সুতরাং যুগপৎ এশিয়ার পূর্ব এবং পশ্চিম, এই দুই দিক হইতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জন-আন্দোলনের দুইটি ধারা প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির সম্পর্ক আছে। অপর দিকে পশ্চিম দিকে আরব জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে মোস্লেম সংস্কৃতির সম্পর্ক বিদ্যমান; এশিয়ায় পূর্ব ও পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের এই দুইটি ধারা হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির মিলনভূমি ভারতের জাতীয়তাবাদের সংহতিকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিবে, ইহা সুস্পষ্টভাবেই বোঝা যাইতেছে। ৪০ কোটী নরনারী অধ্যুষিত এই ভারতবর্ষের উপর এই দিক হইতে সমগ্র এশিয়ার ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। ভারতের দ্বারে আজ বিশ্ব মানবতার আহ্বান আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ভারত এ আহ্বানে উপযুক্তভাবেই সাড়া দিবে এবং মানবমুক্তির এই প্রয়াসকে সার্থক করিতে কোনরূপ ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হইবে না, আমাদের অন্তরে এমন বিশ্বাস দৃঢ় আছে।

ব্রিটিশ শাসনের লোহার কাঠামো

ভারতের কেন্দ্রে এবং প্রাদেশিক শাসন ক্ষেত্রে কয়েকটি বিশিষ্ট পদে বড় রকমের রদবদল হইয়া গেল। উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বিহার এই পাঁচটি প্রদেশে নূতন গভর্নর নিযুক্ত হইলেন। ইহা ছাড়া ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিবের পদেও নূতন নিয়োগ হইয়াছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে, শুধু উড়িষ্যার গভর্নরের পদ ছাড়া অন্য সব পদেই যথারীতি শ্বেতাঙ্গদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ভারত গভর্নমেণ্টের সমর বিভাগের সেক্রেটারী স্যার চন্দুলাল ত্রিবেদীকে উড়িষ্যার গভর্নর নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু তিনিও ঝুনা সিভিলিয়ান; সুতরাং দেখা যাইতেছে ব্রিটিশ শ্রমিক দলের গভর্নমেণ্টও সংরক্ষণশীলদের মতই সিভিলিয়ানী তন্ত্রের লোহার কাঠামোতে ভারতে তাঁহাদের শাসননীতি কায়েম রাখিতে তৎপর আছেন। বে-সরকারী ভারতবাসীদের মধ্যে কয়েকজনকে গভর্নরের পদে বসাইয়া শ্রমিক গভর্নমেণ্ট আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের রথে চড়াইয়া দিবেন বলিয়া যাহারা এতদিন দিন গণনা করিতেছিলেন, তাঁহারা হতাশ হইলেন সন্দেহ নাই। আমাদের কথা বলিতে গেলে আমরা এমন ধরণের নিয়োগের মধ্যে বড় কিছুই দেখিতে পাই না। ভারতবাসীরা স্বাধীনতা কামনা করে। কয়েকটি বড় চাকুরীতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত শোষণ স্বার্থ পুষ্ট করিবার জন্য কয়েকজন ভারতবাসী নিযুক্ত হইলে তাহাদের কৃতার্থ বোধ করিবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ যখন বিহারের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন একদল এদেশের মডারেট উহাতে উল্লাস বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের জনসাধারণ তাহাতে কোন আগ্রহই প্রকাশ করে নাই। ভারতের মডারেট সম্প্রদায়ের সে মনোভাবও আজ আর নাই। দেখিতেছি, স্যার চন্দুলালের এই নিয়োগে লর্ড অরুণচন্দ্র সিংহ উল্লাস বোধ করিয়াছেন; কিন্তু ভারতের মডারেট দলের যাঁহারা প্রধান ব্যক্তি, তাঁহারা কেহ একটি কথাও বলেন নাই। সুতরাং স্যার চন্দুলালকে গভর্নরের পদে নিযুক্ত করিয়া শ্রমিক গভর্নমেণ্ট ভারতের জনমতের উপর যে ধাপ্পাবাজী খেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহা একান্তভাবেই ব্যর্থ হইবে।

পরাধীনের বেদনা—

কলিকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নাগরিকদের সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু বর্তমান বাঙলার মর্মবেদনা তীব্র ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য গত কয়েক বৎসর ধরিয়া বাঙলার উপর দিয়া সরকারী অব্যবস্থা এবং কুব্যবস্থার ফলে যে দুঃখকষ্টের ঝড় বহিয়া গিয়াছে, জগতের কোন সভ্য দেশেই আধুনিককালে তাহার তুলনা মিলিবে না। কিন্তু শাসন এবং শোষণ স্বার্থের জন্য এতৎসম্পর্কিত সত্যকে সকল রকমে গোপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। শরৎচন্দ্র বন্দিশালা হইতে বাঙলার তৎকালীন দুরবস্থার কারণ নির্দেশ করিয়া মিঃ কেসীর নিকট একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন; কিন্তু সে চিঠি চাপা দেওয়া হয়। কর্পোরেশনের সভায় শরৎচন্দ্র তাঁহার লিখিত উক্তির কতকটা অংশ উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছিলেন। চিঠিতে তিনি লিখিয়াছিলেন—"১৯৪১ সনের ১১ই ডিসেম্বর হইতে বাঙলা দেশে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে ও এখনও ঘটিতেছে, কারাগার ও বন্দিশালা হইতে তৎসমস্তই আমি খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে ঘৃণার সহিত পদদলিত করা হইয়াছে। তাহাদের নেতাদিগকে অবিশ্বাস করা হইয়াছে। তৎকালীন মন্ত্রিবর্গের উপদেশক্রমে গভর্নর ও আমলাতন্ত্র ১৯৪২-৪৩ সালে এমন নীতি ও কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন যে, তাঁহাদের অবলম্বিত নীতির ফলে অনাহারক্লিষ্ট ও অর্ধমৃত জনগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রকোপ সমগ্র দেশে দেখা দেয় এবং সহস্র সহস্র নহে, লক্ষ লক্ষ নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" শরৎচন্দ্র স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন বাঙলার দুর্ভিক্ষ মানুষেরই সৃষ্ট; সে দুর্ভিক্ষে শুধু লোকক্ষয় হয় নাই। দুর্গত স্বদেশবাসীর রক্তে অতিলোভী এক শ্রেণীর লোক স্ফীত হইয়াছে; চোরা বাজারের প্রকাশ্য রাজত্ব সমগ্র দেশ শ্মশানে পরিণত করিয়াছে। কাহারা এই অবস্থার জন্য দায়ী, এ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা হইয়াছে; কিন্তু আমরা তেমন গবেষণার কোন কারণই খুঁজিয়া পাই না। সোজা সত্য এই যে, ভারতবর্ষ যদি পরাধীন না থাকিত তবে এমন দৌরাত্ম্য, এরূপে অনাচার কিছুতে চলিতে পারিত না। দেশের পরাধীনতাই এজন্য দায়ী, অন্য কথায়, যাহারা এদেশের শাসননীতি নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে তাহারাই এ সম্পর্কে অপরাধী। শাসকদের শাসননীতি সুনিয়ন্ত্রিত হয় নাই এবং তাহার ফলে দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ের একটি জনসভায় এ সম্পর্কে শাসকবর্গের উপর দৃঢ়তার সহিত অভিযোগ আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলেন ভারতে উৎকোচ-গ্রহণের দুর্নীতি যেরূপভাবে চলে জগতে তাহার তুলনা নাই। তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যদিগকেও এতৎসম্পর্কিত দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, গত ৫ বৎসর ধরিয়া আমলাতন্ত্রের যে সব ধুরন্ধরগণ এবং চোরাবাজারীরা দেশের লোকের উপর উৎপীড়ন করিয়াছে তাহাদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে। ভারতবাসীরা দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক এবং ভারতের স্বাধীনতার শত্রুদিগের সঙ্গে কিছুতেই আপোষ-নিষ্পত্তি করিবে না। দেশের লোকের মনের কোণে এতদিন যে জ্বালা তুষের আগুনের মত জ্বলিতেছিল, পণ্ডিতজীর কথায় তাহাই উন্মুক্ত হইয়াছে। তাঁহার এই নির্ভীক উক্তি জাতির অন্তরে অন্যায়ের

সংগ্রাম করিবার আগ্রহকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে।

বাঙলায় দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা—

মিঃ কেসি বিলাতে গিয়া বাঙলার খাদ্য শস্যের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডলের প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন রয়টারের মারফতে আমরা এই সংবাদ অবগত হইয়াছি। বাঙলার খাদ্য শস্যের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ এ সম্বন্ধে বিলাতের সংবাদপত্র মহলে অনেক রকম গবেষণাও ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই ধরণের গবেষণার মধ্যে বাঙলা দেশের নরনারীর জন্য প্রকৃত দরদ কতখানি আছে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে; কারণ, এতৎসম্পর্কিত আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভারতের স্বাধীনতাকামী নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করা হইতেছে এবং বিদেশী শাসকবৃন্দের মধ্যে প্রচারকার্য চালানো হইতেছে। বিলাতের 'অবজারভার' পত্র বাঙলার অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, 'বিদেশী শাসকদের উপর লগুড়াঘাত করিতে সদা প্রস্তুত উগ্র জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলি ১৯৪৩ সালের পূর্বে যে রকম আতঙ্ককর অবস্থা ছিল, তাহা সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।' এস্থলে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বিগত দুর্ভিক্ষে বাঙলা দেশে যে লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে পোকা মাকড়ের মত মৃত্যুমুখে পতিত হইল, তাহা কি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে প্রচারকার্যেরই ফলে? বিদেশী শাসকদের কীর্তি সত্ত্বেও শুধু সংবাদপত্রগুলির কড়া লেখার জন্যই এত লোকে প্রাণে মারা গিয়াছে; বলা বাহুল্য, এমন ধরণের যুক্তির কোন মূল্যই নাই এবং প্রকৃত সত্য এই যে, বিদেশী শাসকদের অব্যবস্থা এবং কুব্যবস্থার দোষেই বিগত দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ এই সত্যকে উপেক্ষা করিতে পারে না; কারণ বাঙলা দেশে খাদ্য সংকটের প্রকৃত কারণ যেমন রহিয়াছে, সেইরূপ শাসন-বিভাগের অব্যবস্থা ও কুব্যবস্থা পুনরায় দেখা দিবার মূলীভূত কারণ, জনসাধারণের সহিত একান্ত সম্পর্কশূন্য বিদেশীর শাসনও ৯৩ ধারার জোরে আরও বেশী জবরদস্ত রকমে কায়েম হইয়াছে। মিঃ কেসির আলোচনা এ দেশের অর্থনৈতিক সংকটের মূলীভূত সেই কারণ দূর করিতে সমর্থ হইবে, এমন বিশ্বাস আমাদের নাই; কারণ একমাত্র কেন্দ্রে জাতীয় গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা এবং তেমন গভর্নমেন্টের পরিকল্পিত জনগণের স্বার্থ রক্ষায় অবহিত ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মোদ্যমের সাহায্যেই স্থায়িভাবে এই সংকটের সমাধান হইতে পারে।

দেশদ্রোহিতার ফন্দী

সমগ্র ভারত যখন হৃদয়হীন আমলাতন্ত্রের নির্যাতন এবং নিপীড়নের বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিল, সেই সময় 'জনযুদ্ধে'র ধুয়া তুলিয়া এ দেশের কমিউনিস্টরা সাম্রাজ্যবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন, এখন যুদ্ধ শেষ হইয়াছে এবং ইঁহাদের প্রচারিত 'জনযুদ্ধে'র স্বরূপ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইলেও, কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধ অর্থাৎ ভারতের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিরতি ঘটে নাই; তাঁহারা রণনীতি পরিবর্তন করিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ সমর্থনের জন্য অভিনব উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে তাঁহারা মুসলিম লীগের প্রার্থীদিগকে সমর্থন করিবেন ও জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের বিরুদ্ধতা করিবেন; এবং সেজন্য প্রয়োজন হইলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া প্রচার করিবেন। ইঁহারা নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সব কিছুই করিতে পারেন, আমরা জানি; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শেষ সম্বল লীগকে পেলা দিয়াও তাঁহারা কতটা সুবিধা করিতে পারিবেন, এ বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। সিন্ধু এবং পাঞ্জাব এই দুই প্রদেশেই লীগের ঘাঁটি এলাইয়া পড়িতেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে লীগের দল ভারতীয় শাসন পরিষদের নির্বাচন বর্জন করিবার জন্য পরোয়ানা জারী করিয়া ইতিমধ্যেই সুকৌশলে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশসমূহেও লীগের সুবিধা লাভের কোন সম্ভাবনা নাই, লীগ নেতাদের মনে এজন্য আশঙ্কাও দেখা দিয়াছে। লীগ নেতা নবাবজাদা লিয়াকৎ আলী খান নির্বাচনী ইস্তাহারে এই সঙ্কটের ইঙ্গিত জানাইয়া বলিয়াছেন যে, যে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করাই আমাদের এখন প্রথম কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার জন্য যে কোন পন্থা, তাহা যে রকমেরই হউক না কেন, সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত; কিন্তু এতদূর গিয়াও লীগের উপর ভিতর ও বাহির হইতে যে সব ধাক্কা আসিয়া পড়িতেছে, লীগ তাহা সামলাইয়া উঠিতে পারিবে না। লীগের এই দুর্দিনে একমাত্র কমিউনিস্ট দলই তাহাদের সহায়। কিন্তু মুসলিম নবাব-নাইটদের সঙ্গে তথাকথিত সর্বহারা কমিউনিস্টদের এই মিলনের বাঁধ জাতির স্বাধীনতার প্রবল আগ্রহের চাপে বিচূর্ণ হইবে, সে দিনের অধিক বিলম্ব নাই।

ঝান্সী নারী বাহিনী

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বা ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর সেনা এবং সেনানীদিগকে অবিলম্বে বিনাসর্তে মুক্তিদান করিবার জন্য দেশের সর্বত্র তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। ভারতের এই সব বীর সন্তানদের প্রতি সমগ্র দেশের এমন সহানুভূতি সত্যই জীবন্ত জাতির পরিপূর্ণ প্রাণবলেরই সূচনা করে। এই বাহিনীর সঙ্গে ভারতীয় নারীদিগকে লইয়া গঠিত একটি নারী সেনাদলও ছিল। এই সেনাদলের নাম ঝান্সীর নারী বাহিনী'। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় সংবাদপত্রে একটি বিবৃতিতে এ সম্পর্কে দেশবাসীর, বিশেষভাবে ভারতের নারী সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। এই বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—"এ দেশের নারীদের নিকট আজাদ হিন্দ ফৌজের নির্যাতি বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। এই সব বীর যুবক স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব বিপন্ন করিয়াছে এবং এই হেতু তাহারা আমাদেরই সর্বপ্রকার সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভের অধিকারী। ইহা ছাড়াও এই জাতীয় বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একটি নারী বাহিনী আছে। ঝান্সীর নারী বাহিনীর সহিত আমাদের ভাগ্য সংশ্লিষ্ট; হয়ত তাহাদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করা হইবে না; কিন্তু তাহাদের উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ জারী করা হইতেছে। সর্বোপরি এই সব বীর নারীকে বিনা বাধায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করিতে দেওয়া উচিত। যে সব নারী ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের সর্বস্ব বিপন্ন করিয়াছিল, তাহাদের সম্বন্ধে ভারতের নারী সমাজের কর্তব্য রহিয়াছে। জনসভার অনুষ্ঠানের দ্বারা এই সব নারীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হইবে।" দীর্ঘ পরাধীনতায় অবসন্ন ভারতের স্বাধীনতার জন্য ঝান্সীর নারী বাহিনীর মহিলাগণ যে বীরোচিত আদর্শকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন, সেজন্য সমগ্র জাতি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিবে, এবিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

রাজনৈতিক বন্দী ও বাঙলা সরকার

সম্প্রতি কলিকাতার একটি জনসভায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু এই মর্মে একটি বাণী প্রেরণ করেন,—"যুদ্ধ এখন শেষ হইয়াছে; সুতরাং এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা প্রতিশোধমূলক ব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এইরূপ একটি জনরব শোনা যাইতেছে যে, বাঙলা সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য এই সব বন্দীর মধ্যে প্রায় একশতজনকে আটক রাখার প্রস্তাব করিয়াছেন।" সরকারের এইরূপ হীন অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া বাঙলার স্বদেশপ্রেমিক সন্তানদের সকলকে মুক্ত করিবার জন্য সমগ্র বাঙলা জাগিয়া উঠুক আমরা ইহাই চাই।



"দিগন্তে ঐ বৃষ্টিহারা মেঘের দলে জুটি
লিখে দিল—আজ ভুবনে আকাশভরা ছুটি।"

ফটোশিল্পী : শ্রীনীরদ রায়

দেশের কথা

১৫ই আশ্বিন—২১শে আশ্বিন

কংগ্রেস—সৈনিকদিগের অত্যাচার—কুচবিহার কলেজে অনাচার—গান্ধী-জয়ন্তী—ভারতীয়ের অপমান

কংগ্রেস—কংগ্রেসের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবার সূচনা পরিলক্ষিত হইতেছে। চার আনা চাঁদা দিয়া কংগ্রেসের সদস্য হইবার ব্যবস্থা, বোধ হয়, পরিবর্তিত হইবে। গত ৬ই অক্টোবর নাগপুর হইতে প্রকাশিত সংবাদে মনে হয়—ভারতীয়-মাত্রকেই কংগ্রেসের সদস্য মনে করা হইবে এবং কংগ্রেসের কর্মীরাই প্রকৃত কংগ্রেসের কার্য করিবার অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

এদেশে কম্যুনিস্ট দলের একাংশের দলপতি মিস্টার পি সি যোশী ফতোয়া দিয়াছেন, কম্যুনিস্ট দলের লোকমাত্রেই কংগ্রেস ত্যাগ করিবেন; কেবল তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য, তাঁহারা পদত্যাগ না করিয়া কম্যুনিস্টদিগের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত অভিযোগ অসার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন। মিস্টার যোশী বলেন—(১) মুসলিম লীগের সহিত মিলনে অসম্মত হইয়া কংগ্রেস ঐক্যের পথ বিঘ্নবহুল করিতেছেন এবং (২) ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের অগস্ট মাসের আন্দোলনে যোগদান না করায় কম্যুনিস্টদিগকে দোষ দিতেছেন। মিস্টার যোশীর মতে, কংগ্রেসের লোকদিগের মতের স্থিরতা নাই এবং তাঁহারা সুবিধাবাদী।

কিন্তু কম্যুনিস্টদিগের মধ্যেও কোন কোন দল কংগ্রেসের নেতৃত্ব স্বীকার করিতে চাহিয়াছেন।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহে সভ্য নির্বাচনের আয়োজন হইতেছে।

গত ৫ই অক্টোবর পাটনায় ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেস পক্ষের প্রথম নির্বাচনী বক্তৃতায় বলিয়াছেন—নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি বলেন, সমগ্র দেশ কংগ্রেসকে সমর্থন করিতেছে।

বাঙলার কর্মভার শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাঙলায় সাম্প্রদায়িক সমস্যা যে অবস্থা জটিল করিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য।

সৈনিকদিগের অত্যাচার—গত ৫ই অক্টোবর প্রাতে একজন সৈনিক কর্মচারীর (মেজর) সঙ্গে একদল বৃটিশ সৈনিক করাচীতে 'ডেলী গেজেট' পত্রের কার্যালয়ে প্রবেশ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যে বলিয়াছেন—বৃটেন এখন নৌবহরবলে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, সেই সংবাদ প্রকাশে আপত্তি করে ও বলে, ভবিষ্যতে সৈনিকদিগের প্রীতিপ্রদ সংবাদ মাত্র ঐ পত্রে প্রকাশ করিতে হইবে। তাহারা 'টেলিপ্রিণ্টার' হইতে সংবাদ 'কাপী' লইয়া চলিয়া যায়। প্রকাশ, সামরিক পুলিশের নিকট অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং তাহারা দুষ্কৃতকারীদিগের সন্ধান পাইয়াছে।

স্থানীয় সেনানায়ক নাকি সংবাদপত্রের সম্পাদকের নিকট সৈনিকদিগের কাজের জন্য দুঃখ প্রকাশার্থ কোন কর্মচারীকে পাঠাইয়াছিলেন।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ঢাকা ২৮নং মিণ্টো রোডবাসী ডক্টর এ তালুকদার লালবাগ পুলিশে এই মর্মে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, পূর্বদিন শেষ রাত্রিতে (প্রায় তিনটার সময়) একজন আমেরিকান সৈনিক "জীপ" মোটরযানে আসিয়া যান রাজপথে রাখিয়া তাঁহার গৃহের পশ্চাদ্দিকে কতকগুলি দ্বার ও জানালা ভাঙ্গে। ডক্টর তালুকদার দ্বিতলে নিদ্রিত ছিলেন। শব্দ শুনিয়া তিনি নিম্নে আসেন এবং তাঁহার ভৃত্য সৈনিকের দিকে অগ্রসর হইলে প্রহৃত হয়। সৈনিকটি তাঁহাকেও আক্রমণ করিতে আসে। অল্পক্ষণের মধ্যেই অল্প দূরবর্তী আমেরিকান হাসপাতাল হইতে কতকগুলি লোক আসিয়া তাঁহার গৃহ হইতে ঐ সৈনিকটিকে লইয়া যায়। ডক্টর তালুকদার ঢাকার স্বাস্থ্যবিভাগের সহকারী ডিরেক্টর।

কোচবিহার কলেজের ঘটনা—

কোচবিহার সামন্ত রাজ্যের সৈনিক ও সেনানায়কগণ স্থানীয় কলেজে প্রবেশ করিয়া যে অনাচার অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহাতে দেশবাসী বিক্ষুব্ধ হইয়াছেন। এতদিন যে সে সম্বন্ধে কোচবিহার দরবার কিছুই করেন নাই, তাহাতে বিক্ষোভ আরও বর্ধিত হইতেছিল। কোচবিহারের মহারাজা সামরিক কার্যে বিদেশে ছিলেন। সম্প্রতি তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহার নির্দেশে ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বিচার জন্য এক "স্পেশ্যাল" আদালত গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা বিচারকের কাজ করিবেন,—কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব জজ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গুহ (প্রধান বিচারক), কোচবিহার হাইকোর্টের প্রধান জজ মিস্টার এস সি দত্ত, কোচবিহার হাইকোর্টের অন্যতম জজ মিস্টার টি পি মুখোপাধ্যায়। ঘটনাটি ২১শে আগস্ট ঘটিয়াছিল।

ভারতীয় গভর্নর—

স্যার চণ্ডুলাল মাধবলাল ত্রিবেদী উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন। বর্তমান গভর্নর স্যার হথর্ন লুইস আগামী বর্ষে ৩১শে মার্চ অবসর গ্রহণ করিলে স্যার চণ্ডুলাল গভর্নর হইবেন। ইনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ২রা জুলাই জন্মগ্রহণ করেন এবং বোম্বাই-এ শিক্ষালাভান্তে বিলাতে গমন করেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া ইনি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে মধ্য প্রদেশে চাকুরী আরম্ভ করেন এবং নানা স্থানে কাজ করিয়া ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারী হন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে মধ্য প্রদেশের সরকারের চীফ সেক্রেটারীর কাজ করিয়া স্যার চণ্ডুলাল ভারত সরকারের সমর বিভাগের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। ইঁনি এদেশে প্রথম কায়েমী প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত হইবেন।

মালয়ে ভারতীয়—

মিস্টার এস বি আদিত্যন মালয় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি। তিনি বিবৃতি দিয়াছেন—যে সকল ভারতীয় যুদ্ধের পূর্বে জীবিকার্জনের জন্য সুদূর প্রাচীতে গিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে মালয়ে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ভারতীয় ছিল। বৃটিশ চিকিৎসকদিগের বিশ্বাস, জাপানীরা তাহাদিগের মধ্যে বহু লোককে ব্রহ্ম-থাইল্যাণ্ড (শ্যাম) রেলপথ নির্মাণের কার্যে প্রযুক্ত করিয়াছিল এবং তাহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ এক লক্ষ ৫০ হাজার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এই সংবাদ যদি সত্য হয়, তবে মালয়ে ভারতীয়দিগের এক-পঞ্চমাংশ শেষ হইয়াছে। জাপানীরা চলিয়া যাইবার পরে ইহাদিগের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদিগকে অবিলম্বে সাহায্যদানের কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল কিনা, তাহা জানা যায় নাই। যাহারা মরিয়াছে তাহাদিগের পরিজনগণকে এবং যাহারা এখনও জীবিত আছে, তাহাদিগকে সাহায্যদানের কি ব্যবস্থা হইয়াছে?

ভারতীয়ের অপমান—

'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের সংবাদদাতা বোম্বাই হইতে সংবাদ দিয়াছেন, বোম্বাই হইতে যে ৩ শত ছাত্র অধ্যয়নের জন্য বিলাত যাত্রা করিতেছে, গত ৫ই অক্টোবর তাহাদিগের মধ্যে ২৫ জনকে বোম্বাই বন্দর হইতে যাত্রা করিতে দেওয়া হয় নাই। জাহাজের ক্যাপ্টেন তাহাদিগকে জাহাজে ভৃত্যের এমন কি সৈনিকদিগের ব্যবহার্য মলত্যাগ-স্থান পরিষ্কার করিতে হইবে বলায় ছাত্রগণ যাইতে অস্বীকার করিয়াছে। তাহারা আপনাদিগের ব্যবহার্য মলমূত্র ত্যাগ স্থান পরিষ্কার করিতে স্বীকৃত হইলেও তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ছাত্রদিগের মধ্যে রায়জাদা হংসরাজের পুত্র অন্যতম—রায়জাদাও বন্দরে উপস্থিত

ছিলেন। ছাত্রদিগের মধ্যে কয়জন সরকারের বৃত্তি পাইয়া বিলাত যাত্রা করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে কয়জন চীনা ছাত্রও আছেন ছাত্রগণ এ বিষয় ভারত সরকারকে জানাইয়াছেন।

গান্ধী জয়ন্তী—

গান্ধীজীর জন্মদিনে ভারতবর্ষের দিকে দিকে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর কাথিবাড়ে (পোরবন্দরে) তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। তিনি যে অহিংস অসহযোগ নীতির দ্বারা ভারতবর্ষের রাজনীতিক পরপশ্যতা দূরীকরণের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, এই জড়বাদজর্জরিত যুগে ইহা ইহকালসর্বস্ব জাতিসমূহের উপর তাহা বিস্ময়কর প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছে। যে সময় পৃথিবীর তথাকথিত সভ্যতা-গর্বিত জাতিরা বিজ্ঞানকে মারণাস্ত্র উদ্ভাবনে নিযুক্ত করিয়া ধ্বংসের পথ সুগম করিতেছেন, সেই সময় যে আধ্যাত্মিকতা-পূত ভারতবর্ষের সংস্কৃতি অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণায় এইরূপ প্রেরণা দিয়াছে, তাহা বিশ্বের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছে। তিনি স্বদেশের জন্য যে লাঞ্ছনা বরণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার দেশবাসীর জয়মাল্য হইয়াছে।

সাংবাদিকের মৃত্যু—

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সংবাদে জানা যায়—প্রবীণ সাংবাদিক চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ৯২ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বগ্রাম লাসিয়ারায় (থানা বনাজ) লোকান্তরিত হইয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কলিকাতায় শিক্ষকের কার্য করিবার সময় সংবাদপত্র সেবায় আকৃষ্ট হন। তিনি বহুদিন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সম্পাদিত 'হিতবাদী' পত্রের সহযোগী সম্পাদক ছিলেন এবং সম্পাদকের অনুপস্থিতিকালে সম্পাদকের কার্য করিয়াছিলেন। বহুদিন পূর্বে 'ইংলিশম্যান' যখন কলিকাতায় 'সুপ্রভাত' নাম দিয়া বাঙলা দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন, তখন বিদ্যাবিনোদ মহাশয়কে তাহার সম্পাদনার ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। তাঁহার রচনায় গাম্ভীর্যের ও উগ্রতার সমাবেশ লক্ষিত হইত।

হিংসার ভীতি প্রদর্শন—

'ডন' মুসলিম লীগের মুখপত্র। সেই পত্রে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আজাদের সম্বন্ধে (২৭শে সেপ্টেম্বর) লিখিত হয়—

"মৌলানার সম্বন্ধে মুসলিম লীগের নেতৃবর্গের যে ব্যবহারের অভিযোগ উপস্থাপিত করা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বলা যায়, যাঁহারা পুত্তলিকা ও দেখাইবার জিনিস ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন, তাঁহাদিগের জন্য ফুলের তোড়া থাকে না—ইষ্টকই থাকে।"

এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া গত ১লা অক্টোবর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলেন, যাঁহারা খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে মুসলিম লীগের বক্তাদিগের মুখে ইহা অপেক্ষাও হিংসার উত্তেজক উক্তি শুনা গিয়াছে। মাত্র কয়দিন পূর্বে এলাহাবাদে এক সভায় কয়জন লোকের সম্বন্ধে কুৎসিৎ নিন্দা করা হয় ও হিংসার ভয় দেখান হয়। ইষ্টক, দাঙ্গা ও হিংসাই কি তবে মুসলিম লীগের অস্ত্র? এই সকল উপায়েই কি লীগ নির্বাচনে জয়ী হইবার চেষ্টা করিবে? মুসলিম লীগের— পাকিস্থান পরিকল্পনাও যেন অন্তর্হিত হইতেছে। কাজেই গালি ও হিংসার ভীতি প্রদর্শন ব্যতীত আর কি অবশিষ্ট থাকিতে পারে? পণ্ডিতজীর বিবৃতির উত্তরে 'ডন' বলিয়াছেন—পণ্ডিতজী ইষ্টক শব্দ তাহার সাধারণ ও প্রকৃত অর্থে বুঝিয়াছেন। কিন্তু ইংরেজীতে উহা অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'ডনের' সম্পাদকের পক্ষে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মত লোকের ইংরেজী ভাষায় অজ্ঞতার কথা বলা ধৃষ্টতা ব্যতীত আর কিছুই নহে? তবে কি বুঝিতে হইবে, 'ডন' সম্পাদক এই কথা "In a Pickwickian sense"এ ব্যবহার করিয়াছিলেন? রাষ্ট্রপতির মত ত্যাগীকে কংগ্রেসের নেতৃগণের পুত্তলমাত্র বলা যে হীন মনের পরিচায়ক তাহা 'ডন' সম্পাদকের নিজস্ব থাকুক—যেন তাহা ব্যাপ্তিলাভ না করে।

"ভারতীয় জাতীয় বাহিনী"

সুভাষচন্দ্রের গঠিত যে ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধে বৃটিশের বিরোধিতা করিয়াছিল—সেই বাহিনীর সৈনিক ও নেতাদিগের বিচার হইবে। গত ৩রা অক্টোবর দিল্লী হইতে প্রেরিত সংবাদ—৫ই নবেম্বর বিচার আরম্ভ হইবে। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, পণ্ডিত জওহরলাল প্রমুখ ব্যক্তিরা মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারা "শত্রু" বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। গত ২২শে সেপ্টেম্বর ঐ দলের একজন মুসলমান সিপাহীকে বোম্বাইতে আনা হইয়াছিল। তাহাকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার সময় সে ভুসাওয়াল ষ্টেশনে কোন যাত্রীকে উর্দুতে লিখিত একখানি পত্র দিয়া তাহা স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিকে দিতে বলিয়াছিল। ভুসাওয়ালের কোন কংগ্রেসকর্মী এক সভায় পত্রখানি পাঠ করেন। তাহাতে লিখিত ছিল—"এখন আমাদিগকে জাপানের সহিত একযোগে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেছে। সুভাষবাবু আমাদিগের 'নেতাজী' ছিলেন এবং আমরা কেবল আমাদিগের স্বদেশের মুক্তির জন্য প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছিলাম। যদি আমরা নিষ্কৃতি পাই, তবে জীবনের অবশিষ্ট কাল স্বদেশের কার্যে অতিবাহিত করিব। 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ', 'কংগ্রেস জিন্দাবাদ', 'গান্ধীজী জিন্দাবাদ'।"

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু—

স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু গত ৮ই অক্টোবর কার্শিয়াং যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন তাঁহাকে গত ৪ঠা অক্টোবর কলিকাতার নাগরিকদিগের পক্ষ হইতে পৌর অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন। সেই উপলক্ষে তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনকে অগ্রণী হইয়া গত কয় বৎসর বাঙলায় যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে সে সকল সম্বন্ধে তদন্ত কমিটি গঠিত করিয়া কাজ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। অন্য কোন কোন প্রদেশ ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসের পরবর্তী ঘটনাসমূহের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

সুভাষচন্দ্র—শ্রীযুক্ত নরনারায়ণ ঘোষ যুক্তপ্রদেশের 'রয়াল সার্ভিসে' চাকরীয়া ছিলেন এবং সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে সিঙ্গাপুর হইতে স্বদেশে আসিতে পারিয়াছেন। তিনি লক্ষ্ণৌ শহরে বলিয়াছেন, বিমান দুর্ঘটনার পরে সাইগনে হাসপাতালে সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ সত্য—বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

রাজকর্মচারীদিগের দুর্নীতি—বাঙলা সরকার যে রোল্যান্ড কমিটিকে বাঙলার শাসন বিষয়ে তদন্ত করিতে দিয়াছিলেন, সেই কমিটি মত প্রকাশ করিয়াছেন—সরকারী চাকরীয়াদিগের মধ্যে দুর্নীতি এত ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে এবং তাহা নির্মূল করা এত অসম্ভব বলিয়া মনে করা হইতেছে যে, সে সম্বন্ধে কঠোর উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। গত ৫ই অক্টোবর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, দুর্নীতির অভিযোগে জড়িত সরকারী কর্মচারীদিগের সম্বন্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। তাঁহাদিগকে কর্মচ্যুত করা হইবে এবং দুর্নীতির অপরাধে পদচ্যুত কাহাকেও দয়াদত্ত বৃত্তিও প্রদান করা হইবে না।

সরকারী দপ্তরের পুনর্গঠন—ভারত সরকার তাঁহাদিগের দপ্তরের ব্যবস্থা যে অবস্থার উপযোগী নহে এতদিনে তাহা বুঝিয়াছেন। তাঁহারা পুরাতন ব্যবস্থা বাতিল করিয়া নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন জন্য উপদেষ্টারূপে আমেরিকা হইতে একজন বাণিজ্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞ আমদানী করিবেন, স্থির করিয়াছেন। ইতিপূর্বে লোয়েডিন কমিটি কি বলিয়াছিলেন ভারত সরকারের দপ্তরে বাঙালীর সংখ্যাহ্রাস তাহার ত্রুটির অন্যতম প্রধান কারণ?

আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২০

ইটিণ্ডাঘাটের বাসে নবগোপালকে তুলিয়া দিয়া অশোক ল কলেজে আসিল, তৎপরে সেখান হইতে ছুটি হইলে বহুবাজার ষ্ট্রীটে এক ফার্নিচারের দোকানে উপস্থিত হইল।

দীর্ঘকাল হইতে এই দোকান বাজিতপুরের জমিদার গৃহে আসবাব পত্র যোগাইয়া আসিতেছে। অশোককে দেখিয়া দোকানের ম্যানেজার সসম্ভ্রমে আসন ত্যাগ করিয়া আগাইয়া আসিল।

একজনের ব্যবহারের উপযোগী একটা পালঙ্ক, একটা টেবিল এবং পাঁচখানা চেয়ার পছন্দ করিয়া বাছিয়া অশোক বেলা দুইটা আড়াইটার মধ্যে সেগুলো তাহার গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার অর্ডার দিল। আলমারির চাবি শক্তির নিকট আছে স্মরণ করিয়া বলিল, বিলটা অনুগ্রহ করে কাল বৈকালে পাঠাবেন।

ম্যানেজার বলিল, "মালের সঙ্গে কখনই ত' আপনাদের বিল পাঠানো হয় না স্যার। আসছে মাসের মাঝামাঝি কোনো সময়ে পাঠিয়ে দেবো।"

"না, তার দরকার নেই, কালই পাঠাবেন।" বলিয়া অশোক গৃহে ফিরিল। পথে কলেজ স্ট্রীট মার্কেট হইতে নূতন কেনা খাটের জন্য কিছু শয্যা-দ্রব্য খরিদ করিয়া আনিল।

আসবাবগুলো পৌঁছাইলে খাটখানা দ্বিতলের মাঝের ঘরে স্থাপিত করাইয়া অশোক টেবিল এবং চেয়ারগুলো একতলার একটা ঘরে সাজাইয়া রাখাইল। হিসাবমতো এই ঘরটা গৃহের বৈঠকখানাঘররূপে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য; কিন্তু স্ত্রীলোকবর্জিত গৃহে প্রয়োজনের অভাবে সাধারণত উহা পড়িয়াই থাকে। শুধু একটা বড় তক্তাপোষ একদিকে পাতা আছে, দেশ হইতে নায়েব-গোমস্তাদের মধ্যে কেহও আসিলে তাহার উপর শয়ন করে। অশোকের বন্ধুবর্গের দ্বিতলের মাঝের ঘরে আছে অবাধ গতি। কিন্তু এখন, শক্তি আসিবার পরে, পূর্বের ন্যায় ইচ্ছামত তাহাদের ভিতরে যাওয়া-আসা কোন কোন সময়ে অসুবিধাজনক হইতে পারে মনে করিয়া একতলায় এই বসিবার ঘরের ব্যবস্থা।

ব্যবস্থাটা বিনোদের বিশেষ মনঃপূত হইয়াছিল। ঘরটা ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া প্রসন্নমুখে সে বলিল, "এবার বাড়িটা ঠিক মানালো।"

অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে মানালো রে?"

"এই সদর-অন্দর হয়ে।" তাহার পর বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার দ্বারটা দেখাইয়া বিনোদ বলিল, "ওই দোরে একটা পর্দা দিলে ভাল হয়।"

অশোক বুঝিল, বিনোদ তাহার বন্ধুদের পক্ষে গৃহাভ্যন্তর যতটা সম্ভব দুর্গম করিতে চাহে; কহিল, "কি ভাল হয়।"

"আব্রু হয়!"

"কার জন্যে আব্রু?"

অনাবশ্যক প্রশ্ন শুনিয়া বিনোদ ঈষৎ বিরক্তি বোধ করিয়া বলিল, "কেন দিদিমণির জন্যে!"

"দিদিমণি ত' দুই-তিন দিন পরে ইস্কুলের বোর্ডিংয়ে চলে যাবে, তাহলে কদিনের জন্যে পর্দা টাঙিয়ে কি হবে?"

দিদিমণির বোর্ডিংয়ে যাইবার কথা শুনিয়া বিনোদ বিশেষ খুসি হইল বলিয়া মনে হইল না; বলিল, "তবে যে একতলায় বৈঠকখানা সাজানো হল?"

অশোক বলিল, "সে কি দিদিমণির জন্যে?"

"আর, দোতলায় মাঝের ঘরে খাট পড়ল যে?"

"সে ত' আমার জন্যে।"

ইহার পর আর কথা চালাইতে হইলে ন্যায় এবং যুক্তির জোরে তর্ক করিতে হয়, সুতরাং আপাতত বিনোদ চুপ করিয়া গেল। একতলার বৈঠকখানা ঘর সাজানো এবং দোতলার খাট-পাতা যে সম্পূর্ণরূপে দিদিমণি-নিরপেক্ষ ব্যাপার; একথা সে ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না।

সকাল বেলায় নানা প্রকার ব্যস্ততাপ্রযুক্ত অশোক ইংরেজি ও বাঙলা খবরের কাগজের মধ্যে একটাও ভাল করিয়া পড়িবার সময় পায় নাই। দোতলার পড়িবার ঘরে বসিয়া সে ইংরেজি কাগজটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পড়িতেছিল, এমন সময়ে তথায় বিনোদ আসিয়া দাঁড়াইল।

চাহিয়া দেখিয়া অশোক বলিল, "কি বলছিস?"

"পাঁচটা যে বেজে গেল।"

ঘড়ির দিকে চাহিয়া অশোক দেখিল, পাঁচটা বাজিয়া মিনিট তিনেক হইয়াছে। পাঠে অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া শুনিতে পায় নাই; বলিল, "তা ত' গেল।"

"দিদিমণি এখনো ত' এলেন না।"

"কই এলেন।"

"তবে?"

"তবে আর কি?"

"চায়ের কথা জিজ্ঞাসা করছি।"

অশোক বলিল, "শুধু আমাদের দিদিমণিই ত' নয়, মালতী দিদিমণিও চা খাবেন। এ অবস্থায় তাঁদের ফেলে রেখে আমার চা খাওয়া উচিত হবে কি বিনোদ?"

এমন প্রস্তাব বিনোদেরও ছিল না। হয়ত তাহার অভিপ্রায় ছিল, কোন একটা কথার ছলে কোন প্রকারে শক্তির প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া খানিকটা খুসি হওয়া। কাল শক্তির আগমনের পর হইতে এই পুরুষ-অধ্যুষিত নীরস নিষ্প্রভ গৃহ তাহার প্রৌঢ় চিত্তেও এমন একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার প্রভাব হইতে সে সহজে মুক্তি পাইতেছিল না। তাই অশোকের কথার উত্তরে সে মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাই কখনো হয়ে থাকে? মালতী দিদিমণি কেন, শুধু আমাদের দিদিমণিকে ফেলে রেখেও আপনার চা খাওয়া উচিত হয় না।"

শক্তির বিষয়ে বিনোদ যে মনে মনে বিশেষ একটু উৎসাহশীল হইয়াছে, সে কথা উপলব্ধি করিতে অশোকের ভুল হয় নাই। পুলকিত চিত্তে সে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণিকে তোর কেমন লাগছে বিনোদ?"

এক মুখ হাসি লইয়া বিনোদ বলিল, "খাসা লাগছে।"

বিনোদ এবং অশোকের অন্তরকে যুক্ত করিয়া এমন একটা নিগূঢ় তন্ত্রী আছে, যাহা আহত হইলে ঠিক প্রভু-ভৃত্যের নীরস সুরই নির্গত হয় না। নীরবে নিঃশব্দেই সাধারণত সে তন্ত্রী থাকে, কিন্তু কচিৎ কখনো আহত হইলে, এখন যেমন নির্গত হইতেছে, তেমনি সরস সুরই নির্গত হইতে থাকে।

সেই সুরের রেশ ধরিয়া অশোক স্মিত মুখে বলিল, "কি রকম খাসা শুনি?"

উৎসাহের উত্তেজনায় অশোকের সম্মুখে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বিনোদ বলিল, "যেমন পিরতিমের মতো দেখতে, তেমনি

মিষ্টি কথা, আর তেমনি বুদ্ধি! তা হলে ধাঁধা লাগবার আর বাকি রইল কোথায় বলুন!"

প্রসন্ন মুখে অশোক বলিল, "বুদ্ধির আবার এর মধ্যে কি দেখলি বিনোদ?"

বিনোদ কহিল, "বুদ্ধির ত' দেখতে হয় না কিছু দাদাবাবু। একবার তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় চোখ দুটোর মধ্যে বুদ্ধি যেন কই-মাগুর মাছের মতো খল্‌বল্‌ করছে।"

একেবারে নিরক্ষর না হইলেও অশিক্ষিত বিনোদের মুখে এই উপমার উচ্ছ্বাস শুনিয়া খুসি হইয়া অশোক বলিল, "বলিস কি রে! একেবারে কই-মাগুর মাছের মতো খল্‌বল্‌ করছে? কই-মাগুর মাছের মতো কাঁটা ছাড়চেও না ত?"

বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে বিনোদ বলিল, "কাঁটা! কাঁটা ছাড়ছে কি গো—" কথাটা কিন্তু ভাল করিয়া শেষ করিবার সময় হইল না, পথে মোটারের হর্ণ এবং এঞ্জিন থামার শব্দ শুনা গেল। "ঐ দিদিমণিরা এলেন!" বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

উপরে আসিয়া মালতী এবং শক্তি সিঁড়ির সম্মুখেই অশোকের সাক্ষাৎ পাইল।

সহাস্য মুখে তাহাদিগকে অভ্যর্থিত করিয়া অশোক বলিল, "দুই সখী ত' হাজির, কিন্তু আমার বন্ধুটি কখন আসছেন?—অফিস থেকে সোজা এখানে,—না, বাড়ি হয়ে ঘুরে ফিরে দেরি করে?"

মালতী হাসিয়া বলিল "সোজাও নয়, দেরি করেও নয়। অফিস থেকে তিনি কমিশনে না কিসে যাবেন বরানগরে, ফিরতে রাত দশটা হবে। আজ আপনার অদৃষ্টে বন্ধু-সঙ্গ নেই।"

অদৃষ্টের এই বিরূপতার জন্য অশোক সামান্য দুঃখ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্য হইতে সে বিষয়ে বিশেষ কোনো সমর্থন না পাইয়া একটু আশ্চর্যান্বিত হইল। তাহার পর মালতী যখন বলিল, "আমিও বেশীক্ষণ থাকতে পারব না অশোকবাবু, আমাকে এখনি চলে যেতে হবে।" তখন মনের মধ্যে একটা অকরুণ উৎসাহ বোধ করার অপরাধে মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া সে বলিল, "কেন?"

"বাড়ি ফিরে গিয়ে আমি গাড়ি ছেড়ে দলে দাদার অফিসে গাড়ি যাবে।"

"কেন, তোমাদের ছোট গাড়িখানা কি হ'ল?"

"সেদিনকার অ্যাক্সিডেণ্টের পর থেকে মা আর দাদাকে গাড়িতে হাত দিতে দেন না।"

"কটার মধ্যে গাড়ি অফিসে পৌঁছানো চাই?"

"পৌণে সাতটার মধ্যে।"

শক্তির দিকে চাহিয়া অশোক বলিল, তা হলে আর দেরি নয়! শক্তি, শীগ্‌গির চা আনতে হুকুম দাও।"

শক্তি বলিল, 'আমাকে পেঁছে দিয়ে নিচে থেকেই মালতী সরে পড়বার মতলব করছিল বলে বিনোদকে তাড়াতাড়ি চা দিতে বলে এসেছি।"

"বেশ করেছ।" বলিয়া, অশোক মালতী এবং শক্তিকে লইয়া মাঝের ঘরের দিকে অগ্রসর হইল।

ঘরে প্রবেশ করিয়া নূতন খাটের উপর ধপধপে শয্যা পাতা দেখিয়া শক্তির মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। নিমেষের জন্য নিঃশব্দ কৌতুকে অশোকের চক্ষুর সহিত তাহার চক্ষু মিলিত হইল।

মালতী বলিল, "এ খাট ত আগে দেখিনি,—আজ কিনলেন বুঝি?"

তরুণী দুজন দুইটি চেয়ার অধিকার করিয়া বসিলে খাটের উপর বসিয়া অশোক বলিল, "হ্যাঁ।"

"কে শোবে এখানে?"

"হয় শক্তি, নয় আমি। আচ্ছা, বল ত মালতী, আমাদের দুজনের মধ্যে এখানে কার শোওয়া উচিত।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া মালতী বলিল, "আপনার।"

স্মিত মুখে অশোক বলিল "ঠিক বলেছ। এক রাত্রি ও ঘরের খাটে শক্তিকে শুইয়ে আজ এ ঘরের খাটে শোওয়ালে, ও ঘরের খাট থেকে তাকে বেদখল করার মতো দেখতে হবে। কেমন ঠিক কি না?"

এবারও এক মুহূর্ত ভাবিয়া দেখিয়া মালতী বলিল, "কতকটা।"

এবার কথা কহিল শক্তি; বলিল "না, তা নয়। কাল রাত্রে নিজের জায়গা থেকে বেদখল হয়ে আজ যদি নতুন খাট কিনে এনে এঘরে শোও, তা হলে তোমার বেদখল হওয়া একেবারে পাকা হয়ে যাবে।"

অশোক বলিল, "কিন্তু কদিনের জন্যে সে বেদখল তা বল? চার-পাঁচ দিন পরে তোমাকে যখন হোস্টেলে নির্বাসন দিয়ে আবার সমস্ত অধিকার করে জাঁকিয়ে বসব, তখন সোমবারে শোব এ ঘরের খাটে ত' মঙ্গলবারে শোব ও ঘরে।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

সকাল বেলার দ্বীপান্তর কথার প্রতিধ্বনির মতো নির্বাসন শব্দের উল্লেখে মালতীর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সহাস্য মুখে বলিল, "নির্বাসনই যদি দেন ত' হোস্টেলে না দিয়ে আমাদের বাড়ি দিন না অশোকবাবু!"

কৌতূহল সহকারে স্মিতমুখে অশোক বলিল, "তোমাদের বাড়ি নির্বাসন কি রকম?"

"কেন, যাবজ্জীবন নির্বাসন—চির-দিনের জন্যে।"

এবার নির্বাসন কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিয়া ওঃ বলিয়া অশোক এক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর হাসি মুখে বলিল, "সে ত' খুবই ভাল হয়,—তার চেয়ে ভাল কি আর হতে পারে;—কিন্তু তোমাদের সকলের মত আছে ত?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মালতী বলিল, "মত? পেলে বেঁচে যাই আর জিজ্ঞাসা করছেন মত আছে ত? মা ত' বিশেষভাবে আপনাকে তাঁর অনুরোধ জানাতে বলেছেন।"

"তোমার দাদার মত আছে?"

"দাদার কথা ছেড়ে দিন। বলে, সেধো, ভাত খাবি? না, হাত ধোবো কোথা?"

"হাত ধোবো কোথা বলেছে না-কি সে?"

"সে এক রকম বলাই বই কি!"

"কি রকম তবু?"

"স্পষ্ট কথা ত কিছু হয়নি। গাড়ি থেকে নেমেই একটু ইঙ্গিত দিয়েছিলাম; তাতে দাদা বলেছিল, আমাদের বাড়িকে আন্দামান দ্বীপ বলে স্বীকার করে নির্বাসিত হতে শক্তি কখনই রাজি হবে না। এ এক রকম 'হাত ধোবো কোথা'ই হল না কি?"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "তা হল বই কি। শক্তি রাজী হয়েছে?"

এ কথার উত্তর দিল স্বয়ং শক্তি; বলিল, "হয়েছি। কি করি বল,—রাজী হবার পীড়াপীড়ি থেকে রক্ষে পাবার আশায় মালতীকে যে সর্ত দিলাম তাতে ও এমন চট করে রাজী হয়ে গেল যে, আমারও রাজী না হবার উপায় রইল না। জিজ্ঞাসা করনা মালতীকে কি সে সর্ত, আর সে সর্তে ও রাজী হয়েছে কি-না।"

জিজ্ঞাসা করিবার সময় পাইল না অশোক। শক্তির প্রস্তাব শুনিয়া প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বাগ্রকণ্ঠে মালতী বলিল, "খবরদার শক্তি, খবরদার! খবরদার ও-সব কথা বলতে পাবে না তুমি!"

শক্তি বলিল, "রাজী হয়েছি সে কথা বলব, অথচ যে সর্তে রাজী হয়েছি সে-কথা বলতে পাবনা, এ কিন্তু তোমার অন্যায় আবদার মালতী!"

উচ্ছ্বাসের সহিত আরক্তমুখে মালতী বলিল, "না, না, একটুও অন্যায় আবদার নয়। মিছামিছি বাজে কথা বোলো না ভাই!"

সর্তের কথা প্রকাশ করার বিষয়ে মালতীর আপত্তির এই অস্বাভাবিক প্রবলতা দেখিয়া প্রথমটা অশোক বিস্মিত হইল; কিন্তু পর-মুহূর্তেই ইহার একটা সম্ভবপর অর্থ মনের মধ্যে খেয়াল হওয়ায় তাহার সত্যতা পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে মালতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "কেন বল ত' মালতী? এতই কি বাজে সে কথা?"

অশোকের প্রশ্ন শুনিয়া মালতীর মুখ

আরক্তর হইয়া উঠিল। অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে বলিল, "তা আমি জানিনে অশোকবাবু।"

"খুব হীনতাজনক কি সে সর্তে রাজি হওয়া?"

"তা আমি বলতে পারিনে।"

"কি বলতে পার না? সে সর্তকে হীনতাজনক বলতে পার না; না, সে সর্ত হীনতাজনক কি-না, তাই বলতে পার না?"

একথার কোনো উত্তর না দিয়া মালতী চুপ করিয়া রহিল।

এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া স্মিতমুখে অশোক বলিল, "তা হলে বুঝেছি শক্তির সর্তে কি রকম তোমার রাজী হওয়া। জিন্না সাহেবকে কোনো বিষয়ে রাজী করাবার আগ্রহে মহাত্মা গান্ধী যেমন মাঝে মাঝে আত্মবিসর্জনকারী সর্তে রাজী হবার জোগাড় করেন, এ তোমার তেমনি রাজি হওয়া। অর্থাৎ, এ তোমার অন্তরের চাল নয়, কূটনৈতিক চাল।"

পরীক্ষা শুধু অশোকের দিক হইতেই চলিতেছিল না, শক্তির দিক দিয়াও চলিতেছিল। তীক্ষ্ম নেত্রে অশোকের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সে বলিল, "কূটনৈতিক চাল হলেও অন্তরের চাল হতে পারে, কারণ মহাত্মা গান্ধী ত' অন্তর ছাড়া কোনো চাল দিতে জানেন না।"

সন্দেহ নিরসনের যেটুকু বাকি ছিল, শক্তির কথা শুনিয়া এবং ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া আর তাহার কিছুই অবশেষ রহিল না। নিজ অন্তরের একটা দুরপসারণীয় সংশয়কে পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে রহস্যছলে শক্তি মালতীর উপর যেটুকু ছুরি চালাইয়াছে, তাহার বেদনার সমবেদনায় অশোকের মন আর্দ্র হইয়া উঠিল।

দুইটা বৃহৎ আকারের ট্রের উপর চায়ের উপকরণ, নানাপ্রকার খাদ্যবস্তু, ফলমূলে এবং পানীয় জল লইয়া বিনোদ এবং গোবিন্দ প্রবেশ করিল। ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে একটা শ্বেত পাথরের গোল টেবিল ছিল, সাধারণত আহারের উদ্দেশ্যেই সেটা ব্যবহৃত হয়। তাহার উপর খাদ্যদ্রব্যগুলি সাজাইয়া রাখিয়া গোবিন্দ প্রস্থান করিল। টেবিলের তিন দিকে তিনটা হাতলহীন চেয়ার স্থাপিত করিয়া বিনোদ বলিল, "দাদাবাবু, চা কি তৈরী করে দেবো?"

অশোক বলিল, "না, আমি করে নেব অখন, তুই যা।" তাহার পর মালতী ও শক্তিকে আহবান করিয়া বলিল, "এখন কিন্তু তোমাদের ও হেঁয়ালিভরা কথাবার্তা চালিয়ে চা খাওয়ার আনন্দটুকু নষ্ট করা হবে না। এখন শুধু চলবে সমস্যাবিহীন হাল্কা গল্প। চা খাওয়ার পর যদি ইচ্ছে কর, তখন না-হয় ওসব কথা আবার আরম্ভ করা যাবে।"

এই সদয় বিধানের জন্য মনে মনে অশোকের প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া মালতী চা খাইতে উপবেশন করিল; কিন্তু চা-পান শেষ হইলে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "চললাম ভাই শক্তি, আর না গেলে সত্যিই দেরি হয়ে যাবে।" তাহার পর অশোকের দিকে চাহিয়া বলিল, "আর হেঁয়ালির ভাষায় নয় অশোকবাবু, সাদা কথায় আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, দাদার সঙ্গে শক্তির বিয়ে দিতে আপনার মত আছে কি-না বলুন। যদি মত থাকে তা হলে যাবার পথে এখনি পাকা দেখার সন্দেশের অর্ডার দিয়ে যাই।"

মৃদু স্মিত মুখে অশোক বলিল, "একান্তই যদি অর্ডার দাও, তা হলে কড়া পাকেরই না-হয় দিয়ো; কিন্তু এবিষয়ে আমার মতামতের কি মূল্য আছে তা ত' জানিনে।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মালতী বলিল, "বারে! আপনি ত' শক্তির কলকাতার অভিভাবক। নবগোপাল বাবু আপনার হাতে তাকে দিয়ে গেছেন।"

হাস্যমুখে অশোক বলিল, "কিন্তু সে কি শ্রীমতী মালতীর দাদার হাতে সঁপে দেবার জন্যে দিয়ে গেছেন?"

"তবে কার দাদার হাতে সঁপে দেবার জন্যে দিয়ে গেছেন?"

কপট গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া অশোক বলিল, "ভারি কঠিন প্রশ্ন! সেই অজ্ঞাত ভদ্রলোকের বোনের নাম আমি যদিই বা কোনো রকমে বলি, তা হ'লে সেটা অনুমানই হবে। পাকা খবর যদি চাও ত' আসল জায়গায় চেষ্টা কোরো।"

নিষ্প্রভ মুখে মালতী বলিল, "আচ্ছা।"

"কিন্তু সাবধান! তোমার বন্ধুটি চতুর মানুষ, শেষ পর্যন্ত তোমাকে ঠকিয়ে না দেন।" বলিয়া অশোক হাসিতে লাগিল।

কোনো কথা না বলিয়া করজোড়ে অশোককে নমস্কার করিয়া নিঃশব্দে মালতী কক্ষ ত্যাগ করিল।

মালতীকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া শক্তি বলিল, "আবার শীঘ্র এসো।"

সে কথার উত্তর না দিয়া মালতী বলিল, "যেভাবে অশোকবাবু কথা কইলেন তাতে মনে হল অজ্ঞাত ভদ্রলোক তিনি নিজেই।"

শক্তি বলিল, "হ্যাঁ, কথা কওয়ার ধরণ থেকে সেরকম মনে হওয়া আশ্চর্য নয়।"

"একথা তুমি আগে বলনি কেন শক্তি?"

"এখনো ত' ও-কথা বলছিনে।"

"বলছ না?"

"নিশ্চয় না।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া মালতী গাড়ি ছাড়িতে আদেশ করিল।

গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিলে শক্তি বলিল, "শীঘ্র আবার এসো।"

এবারও মালতী একথার উত্তর দিল না।

শক্তি ফিরিয়া আসিলে অশোক বলিল, "মালতী-রসায়নে ফেলে নেড়ে-চেড়ে আমাকে পরীক্ষা করে কি দেখলে শক্তি?—খাঁটি সোনা, না পেতল?"

স্মিতমুখে শক্তি বলিল, "এখনো ঠিক বুঝতে পারছিনে।"

"এখনো সন্দেহ?"

মৃদু ভাবে ঘাড় নাড়িয়া শক্তি বলিল, "হ্যাঁ, এখনো!"

"তার মানে?"

একটু ইতস্তত করিয়া সলজ্জস্মিত মুখে শক্তি বলিল, "তার মানে, সহজে সন্দেহ যাবার মতো আমার ভালবাসা বোধ হয় সামান্য নয়।" এক মুহূর্ত নির্বাক থাকিয়া ঈষৎ গভীর স্বরে বলিল, "আচ্ছা, তোমার মতামতের কিছু মূল্য আছে কি-না তা তুমি জানো না—একথা তখন তুমি মালতীকে কি করে বললে?"

অশোক হাসিয়া বলিল, "তুমি যদি মালতীর সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব করে আসতে পার নিজে, তা হলে ওকথা ছাড়া আর কি বলতে পারি বল? আচ্ছা, আমি যদি হঠাৎ মালতীর সঙ্গে বিয়েতে রাজি হয়ে যাই, তখন তুমি কি কর শুনি?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সহাস্যমুখে শক্তি বলিল, "তখন? তখন তোমার কানে কানে বলি, তবে, তুমি যারে চাও তারে যেন পাও, আমি যত দুঃখ পাই গো!"

অশোক বলিল, "আর, প্রণবের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমি কি বলি জানো?"

"আমি জানতে চাইনে।"

"আমি বলি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন
তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী,
দীর্ঘ বরষ মাস।

বিশ্বাস না হয়, প্রণবকে বিয়ে করে দেখ, প্রমাণ দিতে পারি কি-না।"

শক্তি বলিল, "ভারি চালাক! তারপর, প্রমাণ না দিয়ে টপ করে যদি মালতীকে বিয়ে করে ফেল, তখন আমি কি করব?"

"তখন তুমি শালাজ হয়ে আমার কান মলে দিয়ো।" বলিয়া অশোক হাসিয়া উঠিল। তাহার পর সহসা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, "তখন কিন্তু ভারি একটা করুণ অবস্থার উদ্ভব হবে। কি রকম জানো?—

তুমি হবে শালাজ এবং
আমি হব নন্দাই,
জীবন-স্রোত দুজনেরি
বইবে নেহাৎ মন্দাই।"

প্রয়োজন মত কথার মাথায় দুই-চার লাইন ছন্দ মিলাইয়া দিবার ক্ষমতা অশোকের আছে ঃ

শক্তি বলিল, "জীবন-স্রোত মন্দা বইবে না।"

"কেন?"

"তোমার শালাজ হওয়ার পথে আমার প্রবল বাধা আছে।"

"কি বাধা?"

"শালাজ না হয়ে আমার অন্য কিছু হওয়া।"

"কি অন্য কিছু?"

"সেটা আমার মুখে শুনে কি লাভ হবে তোমার?"

"কানটাকে একটু খুসি করা হবে।"

"শুধু কানটাকে? প্রাণটাকে নয়?"

"হ্যাঁ, প্রাণটাকেও।"

খুসি করার পথে কিন্তু বাধা উপস্থিত হইল—কক্ষে প্রবেশ করিল বিনোদ। কিন্তু সে একেবারে অরসিক ব্যক্তি, নহে বলিয়া ছন্দের যতিপাত ঘটিল না। বলিল, "চা আনব?"

বিস্মিত হইয়া অশোক বলিল, "এই ত চা খেলাম। আবার এরই মধ্যে খেলে [illegible] নষ্ট হবে না?"

"না, বৃষ্টি ঝরিয়েছে কি-না তাই বলছিলাম।"

জানালার দিকে চাহিয়া অশোক দেখিল, [illegible] বাহিরে নবশ্রাবণের ঘন বর্ষণ [illegible] হইয়াছে। বলিল, "তা মন্দ নয়, নিয়ে আস।"

চা আনিবার জন্য বিনোদ প্রস্থান করিল।

অশোক বলিল, "রবীন্দ্রনাথের 'বরষায়' কবিতা পড়েছ শক্তি?"

শক্তি বলিল, "পড়েছি।"

"ভারি চমৎকার, না?"

"খুব চমৎকার।"

"মনে থাকে ত' আবৃত্তি কর না?"

"না, তেমন মনে নেই।"

অশোক বলিল, "আমারও সবটা মনে নেই, তবে মাঝখানের একটা জায়গা মনে পড়ছে।" বলিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল,—

"সমাজ-সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব!
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে,
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব!
আঁধারে মিশে গেছে আর সব!"

সহসা থামিয়া গিয়া বলিল, "তারপর?"

শক্তি বলিল, "আমার ত' মনে পড়ছে না।"

"ও রকম করে হবে না, রোসো বইটা বার করি।" বলিয়া অশোক উঠিয়া গিয়া আলমারি খুলিয়া 'বরষায়' কবিতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

কিন্তু কবিতা বাহির হইবার [illegible] ট্রে করিয়া চায়ের গরম [illegible] এবং অন্যান্য উপকরণ লইয়া বিনোদ প্রবেশ করিয়া বলিল, "চা তৈরি করে দোবো [illegible]?"

শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অশোক বলিল, "তুমি কর না শক্তি!"

শক্তি বলিল, "না, না, বিনোদই করুক। বিনোদ ত' চমৎকার চা তৈরি করে।"

শক্তির কথায় খুশি হইয়া বিনোদ চা তৈয়ারি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সেদিন রাত্রে নৈশ আহারের পর গল্প-গুজবে কৌতুক-পরিহাসে দীর্ঘকাল একত্রে কাটাইয়া শক্তি যখন নিজ কক্ষে গিয়া দরজা লাগাইল তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে।

(ক্রমশ)

ভীমলী

শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ

সারাদিন কাটলো শুয়ে-বসে সমুদ্র-স্নান ও গল্প করে লক্ষ্মীনারায়ণের সঙ্গে। সেই বাঙালী ভদ্রলোকটি নেহাৎ ছেলেমানুষ ছিল। সবেমাত্র বিয়ে করে এসেছিল এক শিক্ষিতা মেয়েকে—কোন মেয়ে কলেজের এক প্রফেসর নাকি। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে কি একটা গবেষণা করছিল মেয়েটি। সুন্দর দেখতে। কতদিন বুদ্ধ তাদের দেখেছে। একদিন তারা এক বাসে সীমাচলম গিছলো—মেয়েটি বললে কৃষ্ণদেব রায়ের তাম্রফলক দেখতে চলেছে। ভারি মিষ্টি গলা, আর তেমনি মধুর হাসি। তারপর একদিন তাদের সখ হলো প্রবল জল-ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রের রূপ দেখতে যাবে। বুদ্ধ সেদিন সেই সময়ে ক্লাব-বাড়িতে সংবাদপত্র পড়তে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন। বেশ মনে আছে, সেদিন ছিল অমানিশা। সে রাত্রিতে জলের প্রচণ্ড প্রবাহ সমস্ত দিগন্তকে আলোকিত করে ফেলেছিল, মনে হচ্ছিল, রুদ্রমণ্ডের পাদপ্রদীপের অসংখ্য প্রচ্ছন্ন আলোক-উত্তাপ রুদ্ধ অগ্নিকাণ্ড ও উত্তাল তরঙ্গগুলিকে প্রজ্বলিত করে দিচ্ছে ভয়াবহ-ভাবে, আর সেই সঙ্গে খেলেছিল বিদ্যুৎমালা চিত্রবিচিত্র হয়ে। সমুদ্রকে এতখানি উঠে আসতে দেখা যায় না বড় একটা। নীচের বেঞ্চগুলোর তলায় উঠে এসেছিল জল। সন্ধ্যার সময় যে বিদ্যুৎ বেগুনে দেখাচ্ছিল, সেগুলো হয়ে উঠলো লাল আগুনের মত। তারই মধ্যে তোমাদের সেই বাঙালী দম্পতি হাত ধরাধরি করে ভিজতে গেলো।

কেউ জানে না ঠিক কি হয়েছিল। বৃষ্টির প্রকোপ থামতে বাড়ি ফিরছি দেখলাম ডাক-বাংলোর কাছে মস্ত এক জটলা। ধীবরেরা বাঙালী ছোকরাকে জল থেকে তুলেছে। ঐ আপ্পানা চাকরটা নাকি দেখতে পেয়েছিল আর ঐ টেনে তুলেছিল একজনকে বেহুঁস অবস্থায় আর একজন গেলো তলিয়ে। যুবকের মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয় শোকে দুঃখে—সে বলে যে তাকে নাকি সেই দুর্যোগের মধ্যে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। বেচারীর একেবারে মাথা খারাপ; সে রকম কোন উদ্দেশ্য থাকলে এরা টেনে তুলে আনবেই বা কেন আর তা ছাড়া পকেটে টাকাকড়ি সবই মজুদ ছিল। আসলে অমাবস্যার দিন ভূত-প্রেতের রাজ্যে ও-রকম গোঁয়ারতুমি করতে যাওয়াই অন্যায় হয়েছিল।'

অজয়ের সে কাহিনী শুনে ভাল লাগেনি কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণের সারলো ওর হাসি পেলো। বাঙলা দেশ এত প্রকাণ্ড সেখানে কত শত সহস্র লোক আছে তার ইয়ত্তা নেই আর এই বৃদ্ধটি দু বছরের পুরাতন এক ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে চলেছে যেন কতই তার আত্মীয়ের কথা বলছে।

অজয় ভাবছিল যে, পাহাড়ের শীর্ষে উঠে সমস্ত শহরের ছবিটি মোটামুটি দেখে নেবে। মন্দির পর্যন্ত বাঁধানো সোপানের দুদিকে বড় বড় পুষ্পশোভিত গোলোক চাঁপা গাছ। মন্দিরের উপরভাগে অনাবৃত শিলাখণ্ডের উপর দিয়ে পথটি নাকি সর্পসংকুল, তবে লক্ষ্মীনারায়ণ কখনও উঠেন নি।

শহরের লোকসংখ্যা বড় কম নয়, কিন্তু পাহাড়ে ওঠবার মত উদ্যম খুব কম লোকেরই আছে। এ মন্দিরে পুরোহিত মন্দিরে পূজো হয় সপ্তাহে মাত্র একদিন। প্রতি শনিবার বেলা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে পুরোহিত নেমে আসে শহরের বাঁদিকে। শিবের মন্দিরের মহাদেব হতে কিছু দক্ষিণে নিদিষ্ট আছে।

আপ্পানাকে এড়ানো কঠিন হলো না কারণ পুরোহিতের উপস্থিতির বিড়ম্বনা সবলে ছিল অবারিত। অজয় পায়খানা যাবার নাম করে দ্রুত উঠে গেলো মন্দিরের উপরে। উচ্চভূমি হতে সমুদ্রের আর একরূপ উদ্ঘাটিত হলো। চক্রবাল সরে গেলো বহু দূরে ও নাতি উচ্চ তরঙ্গগুলির স্থানে দেখা দিল ছায়াময় ফেনার লীলা। শহরটি পাহাড়টিকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে ছড়িয়ে পড়েছে বিজয়নগরের পথে। অজানা সুদৃশ্য লাগলো ঘন বৃক্ষ পল্লবে ঘেরা বাড়ি ও রাজপথগুলিকে। অজয় বিস্মিত হয়ে দেখলো সে প্রথম রাতের সেই পড়ো বাড়িটিতে মানুষের বাস অসম্ভব। চতুর্দিকে ভাঙা প্রাকার ও ঘন পরিবৃত ইঁটের স্তূপ এবং মধ্যভাগে ছাদটি বিদীর্ণ হয়ে পড়ে গেছে। গীর্জা, কবর ও বড় বড় গুদাম বাড়িগুলি ওলন্দাজ রাজত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। আর একটু উঠে সানন্দ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলো অজয়। বহুবর্ণের সবুজে আচ্ছাদিত ধরণীর জঠর বিদীর্ণ করে অনেকগুলি রক্তরেখা চলে গেছে দিগন্তে। কোন পথ না থাকলেও অজয় সোজা সে দৃশ্য লক্ষ্য করে নামতে লাগলো। কাঁটা ঝোপে চামড়া ছিঁড়ে গেলো পায়ের, কতক-গুলো ভীতিবিহ্বল খরগোস গেলো পালিয়ে, অনেকগুলি আলগা শিলাখণ্ড গেলো খসে তবু সে নেমে গেলো। পাহাড়ের পাদদেশে একটি শুষ্ক বালুপূর্ণ নদীর ওপর দিয়ে গিয়ে সে খোয়াইর প্রান্তে এসে পড়লো। একদল শৃগাল তারই মত বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গিছলো। পাতালস্পর্শী গভীর খাদ অসংখ্য ও বিচিত্র মৃত্তিকা স্তম্ভে পরিপূর্ণ। একটির পর আর একটি খাদের মধ্যে প্রবেশ পথ খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলো। কোথাও তলা দেখতে পায়না অজয় অথচ কিছু দূরে কাশের গুচ্ছ দেখা যায়। শেষ খাদটির এক প্রান্তে সে বসে পড়লো ক্লান্ত হয়ে। সেখান থেকে সমুদ্রের এক প্রান্ত দেখা যায়, কিন্তু গর্জন অত্যন্ত অস্পষ্ট। গম্ভীর ও অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা ভেঙে উত্থিত হলো শৃগালের রব, তারপর নিঃশব্দতা যেন গাঢ়তর হলো। অজয়ের হাতে টর্চ আর একটা মোটা লাঠি ছিল। ভূতের অলক্ষ্যে সে বলে এসেছিল ডাকবাংলোর খানসামাকে, যে রাতে আহার করবে না। নারী কণ্ঠধ্বনির কোন বিশ্বাস-যোগ্য কারণ আবিষ্কার না করে সে ফিরবে না ঠিক করেছে। দেখবে ভীমলী দেবীর লীলাক্ষেত্রটিকে।

একখানি মেঘখণ্ড সরে যেতে নবমীর চন্দ্রমায় অনেকখানি পর্যন্ত আলোকিত হয়ে গেলো এবং দূরের বৃক্ষছায়ায় শৃগালের অস্পষ্ট দৃষ্টি পর্যন্ত সে আলোকে নিষ্প্রভ হয়ে উঠলো। তারপর বাতাসে ভেসে এলো মানুষের কণ্ঠ। ক্রোশ দূরের মধ্যে লোকালয় নাই, সেই সাধুবাবার বিরাগক্ষেত্র শ্মশানভূমি পর্যন্ত যেখান হতে এক মাইলেরও অধিক দূরে সেখানে ইংরাজি কণ্ঠস্বর অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বলে প্রতীয়মান হলো তার কাছে। একটা বাতিটি জেলে অজয় দেখলো যে, খাদের যে স্তরটি অগভীর তার মধ্যে নামা সংকীর্ণ হলেও অসম্ভব নয়। এদিকে ওপর দিয়ে ঘুরে সমুদ্রের তীরে যেতে গেলে শ্মশান অতিক্রম করতে হয়। সে লাঠিটিকে নামিয়ে দিয়ে লাফ দিল। নীচের জমি সমতল হলেও কঠিন। প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল অজয়। তার পুনর্বার কানে এলো সেই পুরুষ কণ্ঠের চাপা ইংরাজি কণ্ঠস্বর। কথাগুলি অস্পষ্ট হলেও ছন্দোময় আবৃত্তির মত। কে যেন একটা কি পাঠ করছে। শব্দ লক্ষ্য করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো অজয়। খাদের তলদেশ ক্রমশঃ নীচু হয়ে নেমে গেছে ও পাশের স্তম্ভগুলি ক্রমশঃ অভ্রস্পর্শী হয়ে উঠলো। অপূর্ব তার কারুকার্য অনেকগুলিকে অবগুণ্ঠিত নারী মূর্তি বলে ভ্রম হয়, কোন কোন মৃত্তিকা

স্তম্ভ দেখে মনে হয় ঋষির দল পর্যটনে বেরিয়ে স্বর্গারোহণ করছে। উভয় পার্শ্বের দেওয়াল যেন গগন-স্পর্শী। অজয় সহসা একটি শুষ্ক নদীবক্ষে এসে পড়লো. কঠিন মৃত্তিকা ছেড়ে পা পড়লো বালুকারাশিতে ও তারপর দেখলো যে উভয় পার্শ্বের স্তম্ভগুলি যেন বিরাট হর্ম্যমালায় পরিণত হয়েছে—তিন চার পাঁচতলা উঁচু।

অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ যেন রাজপথের উভয় পার্শ্ব অলংকৃত করে আছে এবং তারই একটির মধ্যে থেকে ইংরাজি আবৃত্তি বাহির হচ্ছে। কাছে এসে স্পর্শ করে বুঝলো চক্ষের ভ্রম। সেগুলি মাটিরই দেওয়াল। বর্ষার জলে গলে গলে বিচিত্র রূপ ধারণ করছে। আবৃত্তি থামতে অজয়ও থামলো। তারপর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর অস্পষ্ট নারী কণ্ঠ কাণে এলো। অজয় কাঠ হয়ে পড়ে রইলো সেখানে, কারণ সেই সংগে এগিয়ে এলো পদশব্দ। সে চন্দ্রলোকে স্পষ্ট দেখতে পেলো সেই এলোকেশী রমণী মূর্তি। তারই দিকে এগিয়ে আসছে স্বপ্নাবিষ্টের মত। হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হবার যোগাড় হলো যখন সে দেখলো সে মেয়েটি তারই সহপাঠিনী "সন্ধ্যা"। এক সংগে ইউনিভার্সিটিতে পড়েছে দুজনে তারপর সে বিয়ে করেছে সেইটুকু সংবাদ শুধু পেয়েছিল—কাকে, কবে সে খবর পায়নি। উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু পরমুহূর্তে আর একটি মূর্তি নেমে এলো—সেই তন্ত্রসাধক। সে ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললে "সম্রাজ্ঞী, শত্রুর গুপ্তচরে দেশ ছেয়ে গেলো, কালকের সেই মেয়েটির কাছে শুনলাম, ওদের প্রধান সেনাপতি ভাস্করদেও পর্যটকের ছদ্মবেশে আমাদের এ দুর্গের নক্সা করতে এসেছে—আমরা অবশ্য সতর্ক আছি!"

"কে মেয়ে—নিয়ে এসো—আমার কাছে।" অজয়ের বিস্ময়ের অবধি রইলো না। গ্রীবাদেশ সগর্বে হেলিয়ে তার সেই বহুপরিচিত সন্ধ্যা, সেই অত্যধিক লজ্জাশীলা, স্বল্পভাষিণী সহপাঠিনী—কর্কশকণ্ঠে বললে, "গুপ্তচরকেও আনতে বল আমি তাকেও প্রশ্ন করবো।"

সাধু অদৃশ্য হয়ে গেলো একটি মৃণ্ময় স্তম্ভের পিছনে। অজয় একবার ভাবলো এবার আত্মপ্রকাশ করবে কিন্তু, মেয়েটির চোখে মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ সুস্পষ্ট তা ছাড়া ব্যাপারটিকে আর একটু তলিয়ে বুঝতে চাইলো সে।

ধীরে ধীরে যন্ত্রচালিত পুতুলের মত এগিয়ে এল একটি রমণী মূর্তি। অজয়ের হৃদযন্ত্র থেমে গেলো আতঙ্কে। ধাতস্থ আছে কিনা দেখবার জন্য নিজে নিজের মুখে চোখে হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখলো। এ যে সেই ধীবর কন্যার শব তাতে তার কোন সন্দেহ রইলো না।

সম্রাজ্ঞী ক্রুদ্ধ ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, "ভাস্করদেও কোথায়? —তাকে চিনলি কেমন করে?"

ইংরাজি ভাষা জানে না বলেই হোক অথবা প্রশ্নের এক বর্ণও তার কর্ণে প্রবেশ করে নি বলে মূর্তিটি নিঃসাড় মৃতের মত নির্বাক ও নিষ্কম্প হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সম্রাজ্ঞী তার প্রশ্ন আরও তীব্র ও উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করে অধৈর্য হয়ে আজ্ঞা দিল "একে ডালকুত্তার মুখে দাও মন্ত্রী"—

সাধু মুখে এক অদ্ভুত আওয়াজ করতে নিমেষের মধ্যে পাঁচ ছয়টি বড় বড় শৃগাল উপর থেকে লাফিয়ে পড়লো দেহটির ওপর। নারী কণ্ঠের তীব্র আর্তনাদে ছেয়ে গেলো দিক্‌বিদিক্‌ এক মুহূর্তের মধ্যে, পরমুহূর্তে দেহটি হিংস্র অভুক্ত শৃগালের দল ছিন্ন ছিন্ন করে ফেললো। অজয় মাটির ঢিবির আড়ালে মিশে গিয়েও নিজেকে নিরাপদ মনে করলো না, কিন্তু নড়বার উপায় নাই। শোণিতের ধারা আর সাদা হাড় গোড় ফেলে শৃগালের দল চলে গেলো, তবু নড়তে পারলো না সে। আরও ভীতিপ্রদ ও অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়লো তার। সাধু সমাধিস্থ হয়ে বসেছে কখন তা সে লক্ষ্য করে নি, তার অংকে সম্রাজ্ঞী—উভয়ে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন।

অজয় ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠে পড়লো সেই ঢিবির ওপর এবং সেখান হতে গড়িয়ে নামলো পিছনের এক খাতের মধ্যে—তারপর ছুটলো সমুদ্রের দিকে প্রাণপণে। কিছুদূর গিয়ে একটি ধীবর নৌকার মধ্যে সে লুকিয়ে রইলো। বহুক্ষণ পরে বক্ষের রক্তস্রোত যখন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এলো, তখন পূর্বাকাশ ফর্সা হয়ে এসেছে।

ধীরে ধীরে সম্বিৎ ও সাহস ফিরে এলো। সে যখন সহরে প্রবেশ করলো তখন তরুণ অরুণে রাজপথগুলি রাঙিয়ে উঠেছে, কিন্তু অজয়ের মত প্রকৃতির সৌন্দর্য উপাসকও তাই দেখে বিতৃষ্ণায় শিউরে উঠলো।

ভৃত্য আপ্পানা দ্বারদেশে বসে ছিল। উঠে দাঁড়াতে অজয় বললে যে সীমাচলম গিছলো, ফিরলো পদব্রজে। কফী আনবার হুকুম দিয়ে সে সোজা লক্ষ্মীনারায়ণের শয়নকক্ষে উপস্থিত হলো। ভদ্রলোকের ভোরে উঠে আহ্নিকে বসা অভ্যাস কিন্তু অজয় তার আগেই ধরলো। গতকাল দুপুরে যে শব দেখেছিল, সেটি কোন গ্রাম থেকে এসেছে কি জাতি তার জানবার দরকার—বললে, নৃ-বিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণার জন্য আরও কিছু তথ্যের প্রয়োজন। আর সেই তন্ত্রসাধক ব্যক্তিটির সম্বন্ধে প্রশ্ন করে জানলো যে, সাধুটি প্রায় তিন বছর হলো এসেছে এ অঞ্চলে। তার সংগে সেই বাঙালী দম্পতির আলাপ হয়েছিল কি? সে কথা বৃদ্ধের স্মরণে নাই, তবে পরিচয় হবারই কথা, কারণ এবারে বাঙালী এসেছে সংবাদ পাওয়া মাত্র সাধু যে রকম উৎসাহভরে খবর করতে এসেছিল তাতে মনে হয়, বাঙালীদের প্রতি তার প্রীতি অত্যন্ত নিবিড়।

অজয় ভৃত্যের অলক্ষ্যে কফী ফেলে দিল। সাহস হলো না কিছু মুখে দিতে। পূর্ব দিবসের মত খিড়কি দরজা দিয়ে বার হয়ে সে হাসপাতালের ডাক্তারের কাছে উপস্থিত হলো। তিনি বললেন যে, ধীবর কন্যার মৃতদেহ দেখে সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন বৈকি—হয়েছিল মেনিনজাইটিস্‌ রোগটি মাঝে মাঝে হচ্ছে এ অঞ্চলে। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু ঘটছে। অজয় যখন অবান্তর প্রশ্ন করলো, যে কোনপ্রকার বিষের প্রতিক্রিয়ার ঐরূপ লক্ষণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা তখন তিনি না হেসে পারলেন না। বললেন, "এই সব গরীব লোকদের মধ্যে সে সৌখিনতা এখনও ঢোকেনি।"

অজয় কালবিলম্ব না করে হোটেলটিতে উপস্থিত হলো ও কফী, ইডলী খাওয়ার সংগে সংগে আরও অনেক সংবাদ গ্রহণ করলো। ঐ ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার সাবেক মালিক ছিল এক কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত রাজা। তার উপরাণীরা এক রাত্রিতে এক সংগে তার কণ্ঠনালী টিপে হত্যা করে তাকে তারপর বহু শত বৎসরের পর বাড়িটি নূতন করে বাসোপযোগী করে সংস্কার করে নেয় আর এক দেশের জমিদার। তার লোকলস্কর সেপাইসান্ত্রী এক রাত্রির বেশি টিকতে পারে নি সে বাড়িতে প্রেতাত্মার উপদ্রবে, তারপর বাড়িটি আরও এক পুরুষ পরে এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী কিনে নেয়। সে লোকটির অজস্র টাকা খাটছিল এই বন্দরে, ফলাও ব্যবসা। কিন্তু তাকেও রাতারাতি সব ফেলে পালাতে হলো সেই প্রেতাত্মার অত্যাচারে। সেই বুড়োর ছেলেরা এখন কোকনাদাতে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। খুব সস্তায় বিক্রী করবে মালমসলাগুলো কিন্তু কার সাধ্য এর একটিও ইঁট স্পর্শ করে—

লোকটি গলা নামিয়ে বললে, "স্বয়ং ভীমলী দেবী এখন ওখানকার অধিষ্ঠাত্রী—আমি দেখেছি একদিন তাঁর মোহিনী মূর্তি।"

আর বাক্যস্ফুট হলো না লোকটির। স্থানীয় দারোগা বাবুটি হচ্ছেন একটি বিশাল দেহ যুবা পুরুষ। অজয়ের সমস্ত সংবাদই রাখেন। মায় বিজয়নগরের ইতিবৃত্ত পর্যন্ত। এই পান্ডববর্জিত দেশে বাঙালীর আবির্ভাবে একটু বিরক্ত। কি বা আছে? তার চেয়ে ভিজাগাপট্টম গেলে মানুষের মুখ দেখা যায়। যত সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন অসভ্য জেলের দল—রাতদিন পরস্পর পরস্পরকে ভয় দেখাচ্ছে। পোড়া দেশে খুন খারাপি বা চুরি ডাকাতি পর্যন্ত

নই যে, একটু কেরামতি দেখিয়ে নাম করে। শেয়ালের ডাক শুনে বলে—ভীমলী রাক্ষসী গোঙাচ্ছে, গাছের ছায়া দেখে বলে ভীমলীর মোহিনী মূর্তি।

অজয়ের বুঝতে বাকি রইলো না যে, পুলিশের সাহায্য চাওয়া বৃথা। সে ফেরবার পথে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার চতুর্দিক ভাল করে দেখে নিল। প্রবেশ পথ নাই, তবে পিছনের দিকে উদ্ভিদ ও ধ্বংসাবশেষ অপেক্ষাকৃত কম। পাশের একটি খালি বাড়ির সংলগ্ন এক বৃক্ষ হতে উদ্যানের এক অংশ দেখা যায়। ভাঙ্গা পাঁচিলের যে অংশ দিয়ে লাফালে হাত পা ভাঙবার আশঙ্কা কম সেদিকে গিয়ে অজয় সেই গাছের একটি ডাল ধরে নেমে পড়লো। বহু শত বৎসর পরে মানুষের অতর্কিত আগমনে বহু সংখ্যক পোকামাকড়, সাপ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে সরে গেলো। এত অজস্র বাদুড় এক স্থানে এক সঙ্গে এখনও দেখেনি অজয়। একদিকে একটি বাঁদরের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহের উপর গাছের ফাঁক দিয়ে খানিকটা সূর্যরশ্মি এসে পড়েছিল। অজয়ের মনে হলো বাঁদরটির মুখের ভাবটি অবিকল মানুষের মত। মানুষের সঙ্গে এতখানি সাদৃশ্য সে বানরের মধ্যেও দেখেনি। একটু সাবধানে অগ্রসর হতে হলো। অজস্র কাঁকড়া বিছা ও কয়েকটি করাত সাপ দেখলো প্রথম কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। দু তলার থামগুলি নীচে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু পুরাতন স্তূপ ও শিলাস্তম্ভগুলি এখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। সাবেক উদ্যানের কিছু কিছু এখনও বিদ্যমান। অট্টালিকার মধ্যে প্রবেশ পথগুলি ছাদ হতে স্খলিত পাথর ও ইট পাটকেলে প্রায় অবরুদ্ধ। যেটুকু অংশ খালি আছে, তাও উর্ণজালে আবৃত। দিবালোক প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ। অজয় আর এক প্রান্তে গিয়ে আর এক প্রকারের প্রবেশ পথ আবিষ্কার করলো। এক বিরাট কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষ হতে লাল ফুলে আচ্ছাদিত একটি শাখা দু'তলার গবাক্ষ পথ পর্যন্ত পৌঁছেছে। বাহিরের বড় রাস্তা হতে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও অজয় সেই পথে প্রবেশ করলো। ঘরটি আবর্জনা ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ। পাশের ঘরটি অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন এবং তার পাশের ঘরটি আসবাবশূন্য হলেও রীতিমত বাসোপযোগী ভাবে পরিষ্কার। অজয় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। এখানে মানুষ প্রবেশ করে তাতে তার কোন সন্দেহ রইল না। তিনতলার সিঁড়িটি কাঠের। উপরে উঠে স্তম্ভিত হয়ে গেলো অজয়। সাধু ও সন্ধ্যা উভয়েই তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, অনুমাত্রও বিস্ময় বা চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে তাকে উপেক্ষা করেই বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হলো!

অজয় ইতস্তত করে ঘরেরই এক প্রান্তে বসলো। কথা হচ্ছিল ইংরাজিতে। কথার বিষয়বস্তু হচ্ছে ষড়যন্ত্র। কৃষ্ণদেব রায়ের অবর্তমানে তাঁর নিযুক্ত শাসকবৃন্দের অত্যাচারে পারিষদবর্গ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। রাণী সৌদামিনী বিদ্রোহিনী। অবরুদ্ধ দুর্গ প্রাকারের মধ্যে থেকে প্রতিবেশী রাজন্যবর্গের সহানুভূতি আকর্ষণ করছেন। একমাত্র সহায় বৃদ্ধ মন্ত্রী ঢোগাদেব ও দেহরক্ষী সৈনিকদল।

অজয় বিস্মিত হয়ে শুনলো যে সে হচ্ছে উৎকলের ভীমরাজ শ্রেষ্ঠীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রিবংকুর আর সে যে প্রস্তাব এনেছে যে দশরথ দেবের অনুগত সেনাপতিবর্গকে টাকার জোরে কিনে নেবে সেজন্যে অবশ্য মহারাজ্ঞী কৃতজ্ঞ কিন্তু শত্রু পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত পুরস্কার বিতরণ স্থগিত থাকবে।

অজয় এবার রমণীর চক্ষে উন্মাদের লক্ষণ দেখতে পেলো না। বরং দেখলো অবসন্নতার ভাব। দৃষ্টি বহু দূরের শূন্যলোকে নিবদ্ধ। শ্রেষ্ঠীপুত্র ত্রিবংকুর যেন মোটেই লক্ষ্য করবার পাত্র নয়, যেন অজস্র ও অবিশ্রান্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে ক্ষণিকের অবলম্বন বিশেষ। মন্ত্রীবর তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পররাষ্ট্র সচিবদের বার্তা পাঠ করতে সুরু করলেন।

মুলতান, দিল্লী, মালোয়া, গুজরাট, খান্দেশ, বাগলানা, অহমেদনগর, বেরার, গোলকোণ্ডা, বিদার, বিজাপুর, গোন্দওয়ানা—সর্বত্র যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

ইতিহাসের অধ্যাপক অজয় বিস্মিত হয়ে গেলো ঐতিহাসিক চিত্রের বর্ণবৈচিত্রে। রাজন্যবর্গের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, জাঁকজমক, পরিবার ও অমাত্যবর্গের সমস্যা থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকটি রাজ্যের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে এতখানি পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য ও ভৌগোলিক পরিস্থিতির এমন নিবিড় বর্ণনা অজয়কে বিহ্বল করে দিল। তার মানস লোকে কৃষ্ণদেব রায়ের সমসাময়িক ভারতবর্ষের এক অপূর্ব বর্ণ-বহুল চিত্র উদ্ঘাটিত হলো। ক্রমে ক্রমে তার বিচার স্পৃহা পর্যন্ত লুপ্ত হয়ে এল। নিজের অনবধানে অজয়ের সেই যুগে ফিরে গিয়ে ত্রিবংকুরের ভূমিকায় অংশ নেবার ইচ্ছা তীব্র হতে তীব্রতর হয়ে এল। ভীমরাজ শ্রেষ্ঠীর বিস্তৃত ও ব্যাপক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ যে-ব্যবস্থাগুলির উপর নির্ভর করছে, তার সবগুলিই পরিবর্তনশীল এবং অত্যন্ত তৎপরতায় সেই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের বাণিজ্য কৌশল চালনা না করলে প্রতিযোগিতায় পরাজয় অপরিহার্য্য। অজয় উত্তেজিত হয়ে উঠলো। মন্ত্রীর শীর্ণ ও দীর্ঘ অংগুলীগুলি দ্রুত সঞ্চালিত হয়ে তার চোখের কাছে এগিয়ে আসতেই ক্রমশঃ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর প্রতীয়মান হতে লাগলো। সহসা বজ্র নির্ঘোষের মত উচ্চারিত হলো "বিশ্বাসঘাতক, গুপ্তচর—"

লৌহ শলাকার মত কঠিন ও শীতল মুষ্টি অজয়ের কণ্ঠনালীতে বসে যাচ্ছিল এমন সময় তার সম্বিত ফিরে এল আচম্বিতে। সাধকের সম্মোহন জাল ছিন্ন করে প্রবেশ করলো একটি তীক্ষ্ম, তীব্র কণ্ঠস্বর। সেই পরিচিত ধ্বনি। মাথায় হাত দিয়ে মহারাজ্ঞী বসে পড়েছেন। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে অজয়ের কণ্ঠ হতে হস্ত শিথিল হয়ে গেলো। সাধক তাকে ছেড়ে এক নিমেষে ঝোলা হতে কি একটা শিকড় বাহির করে শুঁখিয়ে দিতে সন্ধ্যা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লো। স্তব্ধ হলো সে ধ্বনি। (আগামীবারে সমাপ্য)

ট্রামে-বাসে

জেনারেল ম্যাক্‌আর্থার জাপান সম্রাটকে দর্শনদান করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছেন। যাঁহারা ভাবিয়াছিলেন সম্রাট "রাজার প্রতি" রাজার আচরণের" দাবী উত্থাপন করিবেন তাঁহারা নিরাশ হইবেন। কেননা, সাম্প্রতিক সংবাদে সম্রাট সেনাপতি সাক্ষাৎকারের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা গেল সম্রাট বলিয়াছেন:— "আপনার জাপানে পদার্পণ বিনা রক্তপাতে সুসম্পন্ন হইয়াছে, সেজন্য আমরা কৃত-কৃতার্থ"। সেনাপতি উত্তর দিয়াছেন— "আপনার নেতৃত্বের জনাই বিনা রক্তপাতে জাপানে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, এই কৃতিত্ব আপনারই প্রাপ্য, সম্রাট মহানুভব"। অর্থাৎ দুইজনই দুইজনের গুণ কীর্তন করিলেন। সম্রাট পরম সন্তোষ লাভ করিলেন। এইবারে সেনাপতি সম্রাট ভবনে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। আশা করিতেছি সম্রাট তাঁহাকে ভুরিভোজনে আপ্যায়িত করিবেন। অবশ্য স্কচ্‌ হুইস্কির বদলে "সাকুরাতে"ই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, কেননা আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারে ইতিমধ্যেই বিধিনিষেধের আদেশ ঘোষণা হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, সেনাপতি সম্রাটের মনে "গভীর রেখাপাত" করিতে সমর্থ হইয়াছেন রেখাটি কবে গভীরতর হইবে, আমরা সেই সংবাদের জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

* * *

পররাষ্ট্র সম্মেলন নাকি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। পরের ধনে পোদ্দারীর নীতি লইয়া যাঁরা পররাষ্ট্র সম্মেলনে যোগদান করেন, তাঁহাদের নিকট সাফল্যের আশা করাই বৃথা।

* * *

ফুড সেক্রেটারী মিঃ বি আর সেন বলিয়াছেন যে, অক্টোবরে যদি আশানুরূপ বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ৭০ ভাগ আউশ এবং ৮০ ভাগ আমন ধানের ফলন হইবে। সুতরাং বৃষ্টির জন্য অতঃপর



মেঘমল্লার রাগিনীটা শিক্ষা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নাই।

* * *

শ্রীযুক্ত হরিদাস মজুমদার মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে লর্ড পেথিক লরেন্স জানাইয়াছেন যে, ভারতের খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন আছেন। শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ভারত খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে—মৃতের সংখ্যার হিসাব দাখিল করিবার জন্য তবু একটা লোক সচেতন রইল। অবশ্য অঙ্কে তিনি কতটা পাকা সে কথাও বিচার করিতে হইবে। আমেরী সাহেব তো এ সম্বন্ধে আমাদিগকে একেবারেই নিরাশ করিয়াছেন।

* * *

পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তির জন্য জার্মানীকে আবার নূতন করিয়া লেখাপড়া শিখাইয়া শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। সময়সাপেক্ষ হইলেও যথাসময়ে ইঁহাদের



বর্ণপরিচয় হইবে বলিয়া ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারি আশা পোষণ করেন। তবে এই লেখাপড়ার কাজটা "কিণ্ডার গার্টেনী" প্রথায় হইবে কিম্বা আমাদের পাঠশালার গুরুমশাইদের সাবেকী "নাড়ু গোপালী" প্রথায় হইবে সে সম্বন্ধে কোন খবর পাওয়া যায় নাই।

* * *

প্রসংগত উত্তরপাড়ার কথা মনে পড়িল। সেখানে হেডমাস্টার মহাশয় নাকি আটজন ছেলেকে বেত্রের-প্রহারে জর্জরিত করিয়াছেন। তার মধ্যে একজনের অবস্থা উদ্বেগজনক। উত্তর দিতে পারে নাই বলিয়াই কি উত্তরপাড়ার শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের প্রতি দাক্ষিণ্য প্রদর্শনে কার্পণ্য করিলেন?

* * *

দুনিয়ার এক সংবাদে প্রকাশ যে, দ্বারভাঙ্গা রাজ এস্টেটের অধীন দাউদীগ্রামে এক দাঙ্গায় ছয়জন নিহত এবং বহুলোক আহত হইয়াছে। প্রজাদের নিকট হইতে "হাতীয়া" অর্থাৎ হাতী পুষিবার চাঁদা আদায় লইয়াই নাকি এই হাতাহাতির উদ্ভব। কিন্তু প্রজারা নিশ্চয় অন্যায় করিয়াছেন। তাঁহারা কি জানেন না যে, হাতী যাঁহারা চড়েন, হাতী পুষিবার দায়িত্ব তাঁহাদের নয়? হাতীর সওয়ারদের "বার্থরাইট" নিয়া গোল করিলে চলিবে কেন? দাউদীর লোকেরা মিছামিছি দাউদ্‌ চুলকাইয়া ঘা করিলেন।

* * *

"আপনার পরম-সুহৃৎ আলু"—একটি বিজ্ঞাপন। তা জানি এবং জানি বলিয়াই সুহৃৎ-এর প্রতারণা বুকে শেলের মত লাগিতেছে।

* * *

ট্রাম-ধর্মঘটের অবসান হইয়াছে। ধার্মিকরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। শুধু অধার্মিকদের বাদুড় ঝোলা হইয়া ট্রামে ভ্রমণ করিতে করিতে হাঁফ ধরিয়া যাইতেছে। সালিশী বোর্ডের কাছে নিশ্চয়ই এই হাঁফানীর ঔষধ নাই।

* * *

"জয় লর্ড ওয়াভেলের জয়" বলিয়া বিশু-খুড়ো বুঝি প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন। স্বভাবতই আমরা ভাবিলাম লর্ড ওয়াভেল হয়ত ভারতের জন্য তাঁর কোন নূতন পরিকল্পনা মঞ্জুর করাইয়া আনিয়াছেন এবং বিশুখুড়ো কোন সূত্রে সেই সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত হওয়ার আগেই সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু ওঃ হরি! খুড়োর মুখে শুনিলাম এই লর্ড ওয়াভেল একটি ঘোড়া মাত্র। পুণাতে



ঘোড়দৌড়ে যে ঘোড়াটি গভর্নরস কাপ জিতিয়াছে, তার নাম "লর্ড ওয়াভেল";— আমাদের আশার স্বপন অতঃপর অশ্বডিম্বে মিলাইয়া গেল।

ভবশংকরের প্রত্যাবর্তন



শ্রীঅনীতা বসু

পত্র আসিয়াছে ভবশংকরবাবু কালই বাড়ী আসিতেছেন। বাড়ীর সকলের মুখ শুকাইয়া আমসী হইয়া গেল। বিন্দুর পিঠে কনুই দিয়া ধাক্কা মারিয়া সনু বলিল—এইবার তোমার মজা। [illegible] ঢাল খুব করে মেজেয় কালি।

বিন্দু বিহ্বলভাবে দাদার দিকে তাকাইয়া বলিল—কি হবে ভাই দাদা!



—ঢাল খুব করে মেজেয় কালি!

বিনুর অবস্থায় [illegible] দেখিয়া [illegible] বলিল—যাক গে, তুই [illegible] ও আমি জেনে নিয়ে [illegible] তুলে দেব।

রান্নাঘরে হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে রান্না বন্ধ। ঠাকুর ঝাড়ন ঝাঁটা লইয়া রান্না-ঘরের ঝুল ঝাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। চাকর কয়লার ঝাঁকড়া ও ঝাঁটা লইয়া বাহিরের ঘর, উঠান প্রভৃতি পরিষ্কার করিতেছে। ছেলেমেয়েরা বইয়ের তাক আলমারী টেবিলের উপর নীচ সব ঝাড়িতে ও গুছাইতে ব্যস্ত। গিন্নী হন্তদন্ত হইয়া ভাঁড়ার ঘর ও খাওয়ার ঘর পরিষ্কার করিতেছেন। সারা দুপুর এই-ভাবে চলিবার পর বিকাল নাগাদ সকলে একটু বিশ্রাম করিবার অবসর পাইল। মেজ ছেলে মণ্টুর একটু সৌন্দর্যজ্ঞান আছে বলিয়া প্রকাশ, তাই প্রত্যেকে একবার করিয়া তাহাকে নিজের এলাকায় ডাকিয়া নিজের কাজটা যাচাই করিয়া লইল।

পরদিন ভবশংকরবাবু আসিলেন। বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া কটমট করিয়া চারি-দিকে দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুর চাকর, ছেলেমেয়ে, গিন্নী সকলের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। ভবশংকরবাবুর তীক্ষ্ণ চোখ দুটি ক্ষুধার্ত শার্দুলের মত প্রত্যেকটি চেয়ার ও টেবিলের পিছনে পিছনে ফিরিতে লাগিল। হঠাৎ ভবশংকরবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—এ কি! এ টিপয়টা এখানে কোথা থেকে এলো?

মণ্টুর মুখ শুকাইয়া গেল। সারা দুপুর খাটিয়া এমন নিখুঁত করিয়া ঘর সাজাইয়াছে, তবু কি করিয়া এই হতভাগা টেবিলটা তাহার হতভাগ্যের সূচনা করিতে এখানে রহিয়া গেল! হায়, হায়! কেন ওটাকে সরাইবার কথা তাহার মনে হইল না! আমতা আমতা করিয়া সে উত্তর দিবার চেষ্টা করিল—'টিপয়, মানে টিপয়'—বাবার মুখের দিকে তাকাইয়া মণ্টুর অসমাপ্ত কথা অসমাপ্তই রহিয়া গেল। মণ্টু, সনুদের 'মা, অর্থাৎ ভবশংকরবাবুর স্ত্রী' তৎক্ষণাৎ আগাইয়া আসিয়া বলিলেন,—তাই ত! এ টেবিলটা এখানে এলো কেমন করে! এ ত বড় আশ্চর্য কথা! এটা ত এখানে থাকার কথা নয় এটা এখানে থাকতেই পারে না। যাও ত দীননাথ এটা রেখে এসো ওপরের বারান্দায়। ভবশংকর-বাবু চুপ করিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে ঈষৎ মুখব্যাদান করিয়া রহিলেন। ভৃত্য দীন আসিয়া টেবিলটা উপরে লইয়া গেল।

ভবশংকরবাবু চারিদিকে কড়া নজর রাখিতে রাখিতে উপরে উঠিতে লাগিলেন। না সিঁড়িতেও কিছু পাওয়া গেল না।

সামনের ঘরে ঢুকিতেই নজর পড়িল সনুর উপর। বেচারী [illegible] দিয়া কালির



ভবশংকর-গৃহিণী.....কোমরে কাপড় জড়াইয়া দ্বিগুণ জোরে হাঁকিলেন—

দাগ তুলিতে গিয়া ঘরের মেঝের খানিকটা একেবারে সাদা করিয়া ফেলিয়াছে। বাবার অতর্কিত আক্রমণে হন্তদন্ত হইয়া সেই দাগটা গোপন করিবার উদ্দেশ্যে তাহার উপর আলগোছে গায়ের সার্টটা খুলিয়া ফেলিয়া সবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। ভবশংকরবাবু আগাইয়া আসিয়া ফুটবল 'সট' করিবার কায়দায় জামাটাকে লাথি মারিয়া উড়াইয়া দিতে দিতে বলিলেন,—জামা! জামা এখানে থাকে কেন? একি! একি! সাদা দাগ কিসের? সর্বনাশ হয়েছে। এমন সুন্দর লাল মেজে, কে করলে এই দাগ।—ভবশংকরবাবুর কণ্ঠস্বর ক্রমশ খাদে নামিতে লাগিল। ভদ্রলোক হঠাৎ যেন রৌদ্ররস হইতে করুণ রসে নামিয়া আসিলেন। কিন্তু সে আরও ভয়াবহ, কারণ সকলেই জানে এটা কেবল হঠাৎ এক লাফে উপরে উঠিবার পূর্বে দম লইবার একটা অবসর মাত্র। ভবশংকরবাবু এইবার ক্ষেপিয়া উঠিলেন,—যত্ত ছিঁচকে সব হারামজাদা হারামজাদীদের, ঘরের মেজেয় কেমন করে কালি পড়ে রে হতভাগারা!

ভবশংকরবাবু আগাইয়া গিয়া ধরিলেন সুন্দর কান,—পাজী, হতভাগা; লাল মেজের ওপর কালির দোয়াত নিয়ে বসিস কোন সাহসে?

—'আমি না', সুনু ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে উত্তর দিল।

মুখ ভ্যাংচাইয়া, স্বর বিকৃত করিয়া ভবশংকরবাবু বলিলেন,—আমি নাঃ। তুই না ত কে? হতভাগা ছেলে, মারতে না মারতেই কান্না।

তেড়ে ফুঁড়ে এগিয়ে গেলেন বিনুর দিকে—"সত্যি করে বল্, কে ফেলেছিস্ কালি?"

বিনু ত অবাক! মেজের দাগটা সাদা, অথচ বাবা কেমন করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন যে ওখানটায় কালি পড়িয়াছিল!

একটা ব্যাপারেই এতখানি সময় লাগিতেছে দেখিয়া ভবশংকর-গৃহিণী কোমরে কাপড় জড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নামিলেন। 'আর্ট অফ্ ডিফেন্স' তাঁহার এই কুড়ি বৎসরে ভাল রকম চোস্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি কখনও নরম, কখনও গরম হইয়া প্রচুর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকেন। তিনি আসিয়াই ভবশংকরবাবুর দ্বিগুণ জোরে হাঁকিলেন,—খবরদার! দ্বিতীয় দিন যেন আর কালি না পড়ে।" অল্প কথায় তিনি জের টানিতে চাহিলেন।

ছেলেদের সঙ্গে ভবশংকরবাবুও চমকাইয়া উঠিলেন। রণে ভঙ্গ দিয়া তিনি এবার পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। ভবশংকরবাবু জামা কাপড় ছাড়িতেছেন। সকলে ভাবিল এ যাত্রা বোধ হয় ফাঁড়া কাটিল।

ভবশংকরবাবু বাথরুমে ঢুকিলেন। গৃহিণী খাবার জোগাড় করিতে চলিয়া গেলেন। হঠাৎ হুংকার উঠিল—"বাথরুমে বালতি কেন? যদি মেজেয় বালতির দাগ হয়ে যায়! আশ্চর্য এদের কি কিছুতেই শেখান যাবে না।"

চীৎকার শুনিয়া গৃহিণী ছেলেমেয়ে, চাকর সকলেই বাথরুমের সামনে গিয়া হাজির হইল। সকলেই মনে মনে স্বীকার করিল যে, শিখিতে তাহারা কিছুতেই পারিবে না। নহিলে প্রাণপণ চেষ্টা



—তা' বাবা ছুইলে গিইছি।

করিয়াও এতগুলি ত্রুটী থাকে কেন? সুরু হইল অনুসন্ধানের পালা। এবার আর ছাড়াছাড়ি নেই।

—দীনু তুমি রেখেছ এখানে বালতি?

—আজ্ঞে না বাবু, ভাল মেজে, উহার পরে কিছু রাখতে নেই সে আমি জানি বাবু।

—ভামিনী তুমি বালতি এনেছিলে?

ঝি ভামিনী তাড়াতাড়ি বড় করিয়া ঘোমটা দিয়া জিভ কাটিয়া বলিল—আজ্ঞে তা কি কখন হয়! এমন সময় চার বছরের মুখ-ফোঁড় খুকু বলিয়া উঠিল,—আমি জানি কে বালতি ওখানে রেখেছে, সকাল বেলা ঠাকুমা বালতি নিয়ে কাপড় কাচছিলেন।

খুকুর কথার কিছুটা কানে যাইতে ঠাকুরমা কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিলেন। বেচারী ৮০ বৎসরের বৃদ্ধা! চিরকাল সুদূর পল্লীগ্রামে থাকিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পরও কেহ তাঁহাকে শ্বশুরের ভিটা ছাড়াইতে পারে নাই। সম্প্রতি অসুস্থ হইয়া পড়াতে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছেলের বালিগঞ্জের নতুন বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছেন। এখানকার সাহেবীয়ানা, সর্বোপরি ভদ্রের রকম সকম দেখিয়া বৃদ্ধা তাহাকে আর নিজের পুত্র বলিয়া দাবী করিতে সাহস পান না।

কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া জিভ ও তালু দিয়া একরকম শব্দ করিতে করিতে ঠাকুমা বলিলেন,—আমি ত জানিনে বাবা যে বাত-রোমে বালতি নিতি নেই। কাপড়খান কাচবার সুমায় নিইলাম, ভাবিলাম কাচা হলি বাইরি থুয়ে দিবানে, তা বাবা ভুইলে গিইছি।

ভবশংকরবাবুর মেজাজ চড়িয়াই ছিল, কারণ কিছুক্ষণ অনুপস্থিতির পর বাড়ী ঢুকিলেই তাঁহার মেজাজ চড়িয়া যায়, আর এবার ত বেশ কিছুদিন পরে বাড়ী আসিয়াছেন।

হুংকার দিয়া ভবশংকরবাবু বলিলেন,—দেখে যাও মেজের অবস্থা। বালতির দাগ প্রায় পড়েছিল আর কি! সর্বনাশ যা হবার তা ত হয়েই গেল এখন দীনু বাথরুম পরিষ্কার করা বুরুশটা নিয়ে এস।

দীনু বুরুষ রাখার নির্দিষ্ট স্থানে খুঁজিয়া দেখিল সেটা সেখানে নাই। সর্বনাশ! বিপদের উপর বিপদ! দীনু যে কাউকে জিজ্ঞাসা করিবে সে সাহস নাই। আর সকলেই ত বাবুর সামনে দাঁড়াইয়া। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দীনু সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। না পারে নড়তে, না বাবুর সামনে সে যাইতে পারিল না খালি হাতে।

এদিকে দেরী দেখিয়া ভবশংকর হাঁকিলেন—এরা হয়েছেন নবাবপুত্র! বুরুষ আনতে গিয়ে মরলি নাকি। বুরুষ বুঝি খুঁজে পাচ্ছিস না। এ বাড়ীতে কোন একটা জিনিষ ঠিক থাকে না। যত সব নবাবপুত্র শকুন-খোরের দল এসে জুটেছে!

ভবশংকরবাবু দাঁত কিড়মিড় করিয়া বাথরুম হইতে ছুটিয়া বাহির হইলেন। ছেলেমেয়ের দল বেগতিক দেখিয়া এক এক-দিকে সরিয়া পড়িল। গৃহিণীও নিরাপদ ব্যবধানে যাওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। ভবশংকরবাবু প্রতিপক্ষের পশ্চাৎ গমনে নিরুৎসাহ হইলেন না—"এই সব উনপাঁজুরে শকুনখোরের দলকে আমি মজা দেখাব! বিনু, মণ্টু, সুনু।" কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না। কেউ টেবিলের নীচে, কেউ আলমারীর পিছনে, কেউ পড়ার ঘরে, যে যেখানে পারিয়াছে আত্মগোপন করিয়াছে।

বাবা তাহাদের অনেকদিন পরে বিদেশ হইতে ফিরিয়াছেন।

সারমেয় দর্শন

শ্রী কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

ক্রন্দনসহযুক্ত একটা হুটোপাটির শব্দে রবিবার সকালের মধুর ঘুমটুকু ভাঙিয়া গেল। অত্যন্ত বিরক্তিভরে চাহিয়া দেখিলাম, আমার চার বছরের [illegible] এবং তাহার সমবয়সী [illegible] মধ্যে একটি একপদহীন [illegible] ঘোড়ার দখল লইয়া শুম্ভ নিশুম্ভের [illegible] বাধিয়া গিয়াছে। এই বয়সেই [illegible] ভবিষ্যৎ জীবনের [illegible] হইতে হইবে তো। [illegible] করিয়া অপ্রসন্ন মনে [illegible]।

গৃহকর্মরতা [illegible] নিষ্ক্রমণের [illegible] নিক্ষেপণ করিয়া [illegible] আমার নিষ্ক্রিয়তার [illegible] না দেখিয়া [illegible] নামাইয়া [illegible] করিতে করিতে [illegible] আটটা বাজিতে [illegible] হইল, কয়েক দিন [illegible] যে, রবিবার [illegible] আসিয়া দিল। [illegible]

তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া [illegible] জুতা পরিয়া প্রস্তুত হইলাম। এক কাপ চায়ের [illegible] গৃহিণীর [illegible] ঝনঝন্ শব্দে [illegible] হইয়া পড়িলেন। আজকেই [illegible] সকালে দুধ দেয় না [illegible] মতো বিস্মৃতি কি [illegible] হইল জানি না। [illegible] স্মরণ করাইয়া [illegible] কণ্ঠ প্রয়োগ করিলেও তাঁহার [illegible] সিদ্ধির কিছুমাত্র [illegible] না।

মনের [illegible] তাহারই [illegible] এবং স্টেশনের দিকে চলিলাম। পথে দেখিলাম গোর [illegible] নিতাই চাষি [illegible] গোর [illegible] গিয়াছে। নিতাই আমাকে [illegible] নিবৃত্ত করিয়া [illegible] প্রশংসা [illegible], গাড়ি ধরিতে হইবে জানাইয়া [illegible] করিলাম।

আরো কিছুদূর যাইতে পাড়ার ক্লাবের নাট্যামোদী অভিনয়কুশল সম্পাদক পথ আগলাইয়া আক্রমণাত্মক প্রশ্ন করিলেন, তাঁহাদের প্রতি আমার অবজ্ঞা কেন — কেন আমি বারংবার সাদর আমন্ত্রণ পাইয়াও তাঁহাদের [illegible] অভিনেতা নাটকের [illegible] ভূমিকা গ্রহণ করিতেছি না?

আমার যে সময় একেবারেই নাই, দিবা-রাত্রির মধ্যে রাতের শেষ ছয়টি ঘণ্টা ঘুমাইতে হয় বলিয়া আমি যে নিজেই নিজের কাছে সংকুচিত, সে কথা সবিনয়ে করুণ করিয়া বলিয়াও রেহাই পাইলাম না। তিনি তাহাতে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া খামোকা আমাকে [illegible] কটুকথা শুনাইতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠের, দেহের এবং অর্থের জোর আমার চেয়ে অনেক বেশি,—সভয়ে তাঁহার দিকে চাহিতে চাহিতে একপদ, দুইপদ, তিন পদ করিয়া সরিয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিলাম। [illegible] সে-বেয়াদপির [illegible] করিয়া গেলাম যে, আমাকে গাড়ি ধরিতে হইবে।

চায়ের দোকানের সামনে আসিয়া দেখি, ভিতরে কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গিয়াছে। আগের দিন মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দলের ফুটবল খেলায় কোন পক্ষই জয়লাভ করিতে পারে নাই, সেই ক্ষোভে উভয় দলের পৃষ্ঠপোষকগণ এখানে চায়ের দোকানে বাকযুদ্ধ হইতে হাতাহাতি বাধাইয়া জয়লাভ করার চেষ্টা করিতেছেন। ঘুসোঘুসি আর গালাগালির অবিশ্রাম বর্ষণের মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালা-পিরিচ ভাঙিবার শব্দ উঠিতেছে। বাহিরে নিরুপায় দোকানী আর তার সহকারী পুত্র তারস্বরে আর্তনাদ করিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া চায়ের তৃষ্ণা [illegible] আমার জন্মের তৃষ্ণা পাইয়া গেল।

স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলাম, শহরগামী একখানি ট্রেনের সময় হইয়াছে। ভালোই হইল, মাত্র [illegible] সাড়ে নটার [illegible] চলিবে। গাড়ির [illegible] প্ল্যাটফর্ম [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। তাহারও মধ্যে একখানি বেঞ্চিতে একটু জায়গা [illegible] পাইয়া তৎক্ষণাৎ [illegible] সেখানে বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গে সঙ্গেই এক রক্তচক্ষু [illegible] মানব আসিয়া কৈফিয়ত তলব করিল, তাহার জায়গায় আমি বসিয়াছি কেন?

বলিলাম, জায়গা খালি পাইয়াছি বসিয়াছি; তাহার জায়গা হইল কিরূপে?

জায়গাটিতে না-কি সে-ই বসিয়াছিল, দেহ প্রকৃতির তাগিদে দুই মিনিটের জন্য উঠিয়া গিয়াছিল। লোকটার সঙ্গে একটা বচসা বাধিবার আশঙ্কায় জায়গা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার উদ্যম প্রকাশ করিতেই পাশে উপবিষ্ট বলিষ্ঠকায় যুবকটি হাত ধরিয়া আমাকে বসাইয়া রাখিল এবং আমার হইয়া লোকটার সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে হাতাহাতির উপক্রম পাকিয়া উঠিল। এমন সময় গাড়ি আসিয়া পড়ায় ব্যাপারটা অমীমাংসিত অবস্থাতেই সমাপ্ত হইল।

গাড়িতে ভিড় অবর্ণনীয়। প্রত্যেক দরজার বাহিরে অন্ততঃ চার-পাঁচটি করিয়া লোক পা-দানিতে পা ঠেকাইয়া হাতল ধরিয়া ঝুলিয়া চলিয়াছে। একটি দরজায় মাত্র তিনটি লোক ঝুলিতেছে, সেখানে চতুর্থ ব্যক্তির স্থান অধিকার করিতে পাইয়া নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিলাম। গাড়ি চলিতে লাগিল। দুই বেঞ্চির একটি কামরার দরজায় দাঁড়াইয়াছি; ভিতরে চাহিয়া দেখিলাম, পাঁচজনের জন্য নির্দিষ্ট প্রতি বেঞ্চিতে আট জন করিয়া বসিয়াছে, দুইজন লোক দাঁড়াইয়াও আছে, তবু দুই বেঞ্চির মাঝখানের ফাঁকে এখনও অনায়াসে আরো চারজন লোক দাঁড়াইতে পারে; কিন্তু ভিতরে যাহারা আছে তাহারা কিছুতেই বাহিরের আমাদিগকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবে না। শহরতলীর লোক আমরা চাকরির প্রয়োজনে ট্রেনের নিত্যযাত্রী। আজ যাহারা ভিতরে বসিয়া যাইতেছে, তাহাদের অনেককেই হয়তো গতকালও বাহিরে পাদানিতে ঝুলিয়া যাইতে হইয়াছে; সেই হাতলধরা ঝুলন্ত অবস্থায় চলার বিপদ কতখানি তাহা তাহারা ভালো করিয়াই জানে, তথাপি নিজেদের একটুখানি আরামচ্যুতির আশঙ্কায় বাহিরের বিপন্নপ্রাণ লোকগুলিকে কিছুতেই তাহারা ভিতরে ঢুকিতে দিবে না। গাড়ির ভিতরের লোকে আর বাহিরের লোকে সারাপথ ঝগড়া চলিল। ভিতরে ইহার মধ্যে আবার দুইজন লোকের রণ-নৈতিক বিতর্ক হাতাহাতির সূচনায় পৌঁছিয়া গিয়াছে।

শহরের স্টেশনে গাড়ি হইতে নামিয়া [illegible] পার হইয়াই দেখি, আমাদের অফিসের বড়বাবু দুই হাতে দুইটি [illegible] থলি বহিয়া [illegible] চলিয়াছেন। তাঁহার সহিত আমার চোখাচোখি হওয়া গেল, [illegible] আগাইয়া গিয়া

সবিনয়ে তাঁহাকে ভারমুক্ত করিলাম। 'আহা-হা না-না-না থাক্ থাক্ আবার কেন...' প্রভৃতি ভদ্রতাসুলভ গুঞ্জন করিতে করিতে তিনি দুইটি থলিই আমার হাতে ছাড়িয়া দিলেন, একটিও নিজের হাতে রাখিলেন না। আমার বিনয়প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল, তিনি তাঁহার কন্যার শ্বশুর গৃহে বেড়াইতে যাইতেছেন, বুঝিতে পারিলাম, থলি দুইটিতে তাহারই দর্শনী। একটিতে আম, অন্যটিতে নানান রকমের জিনিস।

গাড়ির হাতল ধরিয়া আধঘণ্টা ঝুলিয়া আসার ফলে আমার হাত টন টন্ করিতেছিল, তাহার উপরে ওই ভার একান্তই দুর্বহ মনে হইল; কিন্তু তখন আর উপায় নাই। ভাবিলাম, ট্রাম থামিবার জায়গা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াই অব্যাহতি পাইব; কিন্তু তিনি ট্রাম রাস্তা পার হইয়া গলিপথ ধরিলেন। জানিলাম তাঁহার মেয়ের বাড়ি সেই দেড় মাইল দূরে খাঁদু মুদি লেনে, ট্রাম বা বাসের অবলম্বনে সেখানে যাওয়া চলে না এবং [illegible] ক্ষেত্রে রিক্‌শার প্রশ্ন উঠে না। তিনি অনুরোধের ভঙ্গিতেই কহিলেন, 'চলুন না, দুজনে গল্প করতে করতে যাওয়া যাক; না-কি—আপনার আবার কাজ আছে নাকি কিছু?'

সন্ত্রস্ত বিনয়ে বলিলাম, 'না না, আমিও তো সেদিকেই যাচ্ছি।'

কপালে করাঘাত করিবার পর্যন্ত উপায় রহিল না। কিছুমাত্র কষ্ট না হইবার অভিনয়ে মুখে হাসি ফুটাইয়া ওই দুর্বহ ভার টানিয়া চলিলাম।

আশা করিতে করিতে চলিয়াছি, কন্যার গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া অবশ্যই তিনি আমাকে বিশ্রাম করিতে বলিবেন এবং আমি তাঁহার অনুরোধ ঠেলিতে পারিব না। তদুপলক্ষে এক কাপ চা কি আর পাওয়া যাইবে না? হয়তো চায়ের সঙ্গে......।

কন্যালয়ের দ্বারে পদার্পণ করিয়াই তিনি আমার হাত হইতে থলি দুইটি লইয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইলেন; তৎসঙ্গে, আমাকে কষ্ট দিয়াছেন এমন সংকোচও জ্ঞাপন করিলেন। আমি বিগলিত-হাস্যে 'কিছু না—কিছু না' বলিতে বলিতে বিদায় লইলাম।

বাজার তো সেই স্টেশনের গায়েই। সেদিকে ফিরিয়া চলিলাম। সরু এক গলি-পথ দিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে চলিয়াছি। এত সরু যে, সে পথে ভাসুর ভাদ্রবধূর কিংবা পুরোহিত আর মেথরের পাশ কাটাইবার উপায় নাই। বিপরীত দিক হইতে কিঞ্চিৎ স্থূলদেহ একজন হন্‌হনাইয়া আসিতেছেন। পাশ কাটাইতে গিয়া পরস্পরের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া গেল। তিনি থামিয়া উগ্রকণ্ঠে জানিতে চাহিলেন, আমি চোখ চাহিয়া পথ চলিতেছি কিনা। একই প্রশ্ন তাঁহাকেও করিতে উদ্যত হইয়াই তাঁহার রক্তচক্ষুর দিকে দৃষ্টি পড়িতে নিরস্ত হইলাম।

বড় রাস্তায় পড়িয়া প্রথমেই যে চায়ের দোকান পাইলাম, তাহাতেই না ঢুকিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। অত বেলায় দোকানে তখন কিছুমাত্র ভিড় নাই। খবরের কাগজখানা টেবিলের উপর পড়িয়াছিল, বিশ্রাম করিতে করিতে তাহাতে একবার চোখ বুলাইতে লাগিলাম। কিন্তু কি পড়িব! সারা পৃথিবী ব্যাপিয়াই চলিয়াছে সেই মনান্তর—মতান্তর কলহ, সেই হাতা-হাতি মারামারি মহারণ। পুরুষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারীর আর নারীর স্বেচ্ছাচারের বিপক্ষে পুরুষের অগ্নিবর্ষী আলোচনা, একজনের লিখিত পুস্তকের সমালোচনার ছলে অন্য জনের গালিগালাজ, এক দলের ইটপাটকেল নিক্ষেপে অন্য দলের সভাভঙ্গ, রাজনৈতিক দলাদলি এক দলীয় নেতার বিরুদ্ধে অন্য দলীয় নেতার

বিবোম্গার, এক প্রদেশের বিরুদ্ধে অন্য প্রদেশীয় মুখপাত্রের জঘন্য উক্তি, মামলা-মোকদ্দমা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সর্বোপরি যুদ্ধ—এইসবেরই তো খবর। সম্পাদকীয় প্রথম প্রবন্ধে অন্য এক পত্রিকার জঘন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতি আক্রমণ দ্বিতীয় প্রবন্ধে যুদ্ধরত জাপান ও মিত্রশক্তির হাল পরিস্থিতির বর্ণনা। খেলাধুলোর পাতায় খেলার নামে মারামারির কাহিনী—খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে ঠ্যাং ভাঙাভাঙির আর চোরা-ঘুসির ফাউলখেলা এবং দর্শকে দর্শকে হাতাহাতি লাঠালাঠি।

বাজারে যখন প্রবেশ করিলাম, বেলা তখন সাড়ে দশটা। এ যুদ্ধের বাজারে মাছ আমার জন্য বসিয়া থাকিবে কেন? তিন-চারিটি দোকানে অতি বৃহৎ আয়তনের কয়েকটি রুইকাতলা শায়িত রহিয়াছে; তাহার পাশ কাটাইয়া গেলাম। ওদিকে একটি মাত্র দোকানে দুইটি ইলিশ মাছ আর কয়েকটা গলদাচিংড়ি পড়িয়া আছে। আশান্বিত হইয়া দাম জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনটাকা সের দর হাঁকিয়া দোকানের অধীশ্বরী গরবিনীর মতো বসিয়া রহিল। কিছু কম দামে দেওয়ার প্রস্তাব করার উপক্রমমাত্র করিতেই সে আমার দিকে এমন এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে, বাকশক্তি রহিত হইয়া আমি তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলাম।

বাজারের বাহিরে আসিয়া নূতন করিয়া বিশ্বরূপটা অসার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। ওদিকে বেলা তখন প্রায় এগারটা, বারোটা বাজিবার আগে আর ফিরিবার গতি নাই। ফিরিবার কোনো প্রেরণাও বোধ করিলাম না। কন্ট্রোলের চাউলের আপাসা গন্ধের গলিত অন্ন, চরম তরলাবস্থার মশুরে ডাল আর নিজের কৃষির গৌরববর্জিত নটে ডাঁটার রকমফের তো নিত্য আবর্তনে অন্ন-রোগের ঔষধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঔষধ মনে পড়িলেই রোগ সন্দীভূত মনে হয়। ইহারই অনুষঙ্গে গৃহিণীর সানুরোধ মুখখানির স্মৃতি সারামনে পেরেক ছোপাইয়া দিল। থাক এখন আর বাড়ি গিয়া কাজ নাই। বিকালের বাজার হইতে মাছ কিনিয়া তখন ফিরিলেই চলিবে।

চার পয়সার চিনে বাদাম কিনিলাম এবং তাহার পরিমাণের তুচ্ছতায় অসন্তুষ্ট চিত্তে বিক্রেতাকে মনে মনে অভিশাপ দিতে দিতে এক পার্কের বিরামশালার একটি খালি বেনচি অধিকার করিলাম। ওদিকের বেনচিতে একটি লোক অকাতরে নাক ডাকাইতেছে। সিঁড়িতে একটি কুকুর স্বচ্ছন্দ আরামে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। আমি অর্ধশায়িত অবস্থায় চিনেবাদাম ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া খাইতে লাগিলাম আর অর্ধনিমীলিত উদাস নেত্রে সম্মুখের দুনিয়া দেখিতে লাগিলাম।

হঠাৎ দেখিলাম, কুকুরটি আরামশয়ন ছাড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার দূরনিবদ্ধ দৃষ্টি হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে মুখে ঘ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—করিয়া একটানা একটা মৃদু আওয়াজ করিতে লাগিল। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, অনুরূপ ভঙ্গিতে এবং শব্দে আর একটি কুকুর এদিকে অগ্রসর হইতেছে। সে কাছাকাছি আসিলে এ ছুটিয়া গিয়া তাহার সম্মুখীন হইল। উভয়ে পরস্পরকে একবার শুঁকিবার চেষ্টা করিল, বিপক্ষের সেই প্রচেষ্টায় উভয়েই সশব্দ আপত্তি জানাইল, তাহার পরই গর্জনশব্দে একটি আর একটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তুমুল কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল।

জয়পরাজয় নিষ্পত্তি হইয়া গেলে দুই বিপরীত দিকে ধাবমান জীব দুইটির দিকে চাহিয়া একটু হাসিলাম—কী যে জীব গড়িয়াছেন ভগবান, একেবারে মূর্তিমান কলহ। মনে মনে কুকুর চরিত্রের আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ আমার জ্ঞানদৃষ্টি খুলিয়া গেল। নিন্দা করিতেছি কুকুরের? আমরা মনুষ্য নামে খ্যাত জীবেরা কি করিতেছি? অবিরত একজন আর একজনের পায়ে পা দিয়া ঝগড়া বাধাইতেছি। কাহারও দ্বারা আমার তুচ্ছতম স্বার্থের তিলমাত্র হানি হইবে এমন সন্দেহ মনে উদিত হওয়া-মাত্র দেহে মনে হিংস্র হইয়া উঠিতেছি। এই যে চলিতেছে মানুষের সারা দুনিয়া জুড়িয়া প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে। ঘরে-বাড়িতে রাস্তায়ঘাটে স্বদেশে বিদেশে আজ অনুক্ষণ চলিয়াছে এই কুক্কুরীয় সাধনা। সর্ব-সাধনাতেই পাশ্চাত্য জাতি আজ আমাদের অগ্রণী। মত আমরা চোখে দেখিয়াও আমাদের চোখ ফোটে না। এমন সাহেব কে দেখিয়াছে যাহার বাড়িতে প্রত্যহ ষোড়শো-পচারে কুকুর পূজা হইতেছে না? জ্ঞানহীন আমরা তাহাদের সাধনার সেই জীবন্ত দেবতার পূজা দেখিয়া নাক সিঁটকাই; যাহার আদর্শকে ধ্রুবতারা করিয়া জীবন-তরণীর দাঁড় টানিয়া চলিয়াছি, সেই দেবতাকে ঘৃণা করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়া আমরা কি না পুতুল আর শামুক পূজা করিয়া মরিতেছি! ইহাকেই বলে আত্মবিস্মৃত জাতি।

কুকুরের স্বভাবের সঙ্গে আজিকার মানুষের অভ্যাস মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম স্বকন্দের প্রক্রিয়ায় আমরা কুকুরকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছি। কুকুরের কলহ শুধু দাঁতে দাঁতে নখে-নখে গায়ে-গায়ে তর্জনে-গর্জনে, আর আমাদের ঝগড়া হাতে-দাঁতে-গায়ে-মুখে তো আছেই তাহার উপরেও আছে অবিন্যস্ত কুবিন্যস্ত-সুবিন্যস্ত বাক্যে মগজে অস্ত্রে-শস্ত্রে। কিন্তু কুকুরের একটা গুণ আমাদের মধ্যে নাই—প্রভু ভক্তির গুণটা। কথাটি ভাবিয়া খুশি হওয়ার চেষ্টা করিতেছি, ছারপোকার কামড়ের চেয়েও তীক্ষ্ণ একটা মানসিক দংশনে অন্তর খাড়া হইয়া উঠিল। কে বলে সে গুণ আমাদের নাই? না থাকিলে কিসের বশে আজই সকালে আমি বড়বাবুর গুরুভার থলি দুইটি বহিয়া মরিয়াছি?

না, অমিল কোথাও নাই। জ্যামিতির চতুর্থ উপপাদ্যের মতো উপরিপাত প্রণালীতে আমি একের স্বভাব আর অন্যের সাধনা মিলাইয়া মিলাইয়া দেখিতে লাগিলাম,—সর্বতোভাবে মিলিয়া যাইতে লাগিল।



অনুবাদসাহিত্য

গোধূলি

সাকি

(H. H. Munro কর্তৃক লিখিত 'Dusk' নামক গল্পের ভাবানুবাদ)'

নরম্যান গর্টসবাই পার্কের একটি বেঞ্চে বসেছিলো। তার পেছনে পার্কের রেলিং দিয়ে ঘেরা তৃণগুচ্ছ আচ্ছাদিত ঝোপ-ঝাপপূর্ণ এক ফালি জমি—আর তার সম্মুখের দিকে ছিল ঘোড়ার গাড়ীর লম্বা সারি। হাইড পার্কের কোণ—যেখানে যানবাহনের বিরামহীন ঘর্ঘর শব্দ আর চীৎকার লেগেই আছে—সেটা তার দক্ষিণ দিকে।

সময়টা মার্চ মাসের সন্ধ্যা—প্রায় সাড়ে ছয়টা। গোধূলির অন্ধকার চারিদিক ছেয়ে ফেলেছে—যদিও সে অন্ধকার চাঁদের আলোয় এবং রাস্তায় জ্বালা দীপের আভায় ফিকে দেখাচ্ছে। পার্কের রাস্তায় এবং পাশের গলিতে অসীম শূণ্যতা বিরাজ করছে। তবুও অনেকগুলি বৈচিত্র্যহীন মানুষকে আলো-ছায়ার মধ্যে নিস্তব্ধে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে—আবার কেউ কেউ-বা বেঞ্চ অথবা চেয়ারে নির্বিকারভাবে বসে আছে। তাদের দেখাচ্ছে অস্পষ্ট রেখার মত—ছায়াময় ম্লানিমার মধ্যে এদের অস্তিত্ব যেন ছায়া থেকে পৃথকভাবে অনুভব করা শক্ত।

চারিদিকের পরিবেশ গর্টসবাইকে আনন্দ দিল—আর এটা তার বর্তমান মনের অবস্থার সঙ্গে ঠিক খাপ খেয়ে গেল। তার মনে হলো সন্ধ্যাকালটাই পরাজিতের নিজস্ব সময়। যে সব নরনারী সংসার ক্ষেত্রে যুদ্ধ করে সর্বস্ব হারিয়েছে—যারা তাদের দুর্ভাগ্যকে অন্যের তীক্ষ্ণদৃষ্টির কাছ থেকে গোপন করে রাখতে চায়—তারা ঠিক এই সময়ে বেরিয়ে পড়ে যাতে তাদের ছিন্নমলিন বস্ত্র, নুয়ে পড়া কাঁধ এবং বিষাদমাখা চোখের চাহনি অন্যের দৃষ্টিপথে না পড়ে—অন্ততপক্ষে তাদের পরিচয় যেন অজ্ঞাত থাকে।

গোধূলি সময়ে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা মোটেই ইচ্ছা করে না দিনের আলোতে সন্ধানী দৃষ্টি তাদের উপর নিক্ষিপ্ত হোক। সেজন্য তারা বাদুড়ের অভ্যাসের মত এই সময়ে বেরিয়ে আসে। যে আনন্দের ক্ষেত্র তার ন্যায্য অধিকারীরা ত্যাগ করে গেল—সেইখানে তারা দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে কিছুক্ষণ বসে নিরালার আনন্দ ভোগ করতে চায়। ঝোপঝাপের ছায়াময় পর্দার বাহিরে উজ্জ্বল আলোর রাজ্য আর কোলাহলময় গতিশীল জনতা। দূরে বিচিত্র আলোর আভায় দীপ্ত জানালার সারি সন্ধ্যার ম্লান আলোর মধ্যে জ্বলজ্বল করছে এবং গোধূলির অন্ধকারকে প্রায় হটিয়ে দিয়েছে। এই উজ্জ্বল আলোকিত স্থানে আর একদল লোকের বসতি যারা জীবনযুদ্ধে নিজেদের সত্তা বজায় রেখেছে—অন্ততঃপক্ষে হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়নি।

গর্টসবাই প্রায় জনশূন্য পার্কের একখানি বেঞ্চে বসে এইভাবে কল্পনার চিত্র আঁকতে লাগলো।—তার মনের ভাব তখন এই যে সে নিজেকে পরাজিতের দলের মধ্যে একজন বলে মনে করতে চায়। আর্থিক কষ্ট তাকে পীড়া দেয় নি। যদি সে ইচ্ছা করতো তাহলে সে অনায়াসে সদর রাস্তার আলো ও কোলাহলের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারতো এবং যে সব লোক সমৃদ্ধ হয়েছে অথবা সমৃদ্ধি লাভের জন্য পরিশ্রম করছে তাদের শব্দায়মান দলে সে ভিড়তে পারতো। কিন্তু সে তা চায় না। কোনও সূক্ষ্ম আকাঙ্খার অপূর্ণতায় সে ক্লিষ্ট এবং বর্তমান মুহূর্তে তার চিত্ত ব্যথিত এবং মন আশাশূণ্য। আলোর ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকার ছায়াময় স্থানে তারই মত যারা নড়াচড়া করছে তাদের নিরীক্ষণ এবং শ্রেণী বিভাগ করে কিছুটা মানব বিদ্বেষীর মানসিক বিলাসিতা ভোগ করার মত মনের অবস্থা তার।

বেঞ্চে তারই পাশে একজন বয়স্থ ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হয় যেন তিনি কিছুই গ্রাহ্য করেন না। এই ভাবটাই মানুষের আত্মসম্মান রক্ষার শেষ চিহ্ন—যখন সে দেখে কোনও লোক বা বস্তুকে সক্রিয়ভাবে আর তুচ্ছ করবার তার ক্ষমতা নাই। তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ যে ঠিক অপরিচ্ছন্ন তা বলা যায় না—অন্ততপক্ষে এই আধা আলো আধা অন্ধকারে এই পরিচ্ছদে একরকম চলে যায়—কিন্তু এমন কল্পনা করা যায় না যে এই পরিচ্ছদে সজ্জিত ব্যক্তিটি আধ ক্রাউন দিয়ে চকোলেটের বাক্স অথবা নয় পেনি দিয়ে কার্নেসনগুচ্ছ কিনতে পারে। তাঁকে দেখে এই কথাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তিনি সেই অবজ্ঞাত বাদক দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের বাজনার তালে কেউ আর নৃত্য করে না। তিনি পৃথিবীতে শোকার্তদের মধ্যে এমন একজন যার দুঃখে আর কেউ চোখের জল ফেলে না তিনি যাওয়ার জন্য বেঞ্চ থেকে উঠলে গর্টসবাই কল্পনা করতে লাগলো যে ইনি এমন গৃহে চলেছেন যেখানে তাঁকে গঞ্জনা শুনতে হয় এবং তাঁকে কেউ আমলের মধ্যেই আনে না অথবা তিনি এমন একটি নোংরা হোটেলে যাচ্ছেন যেখানে তার সাপ্তাহিক বিল পরিশোধ করার সামর্থ্য আছে কিনা এইটা দেখা ছাড়া তাঁর অন্য কিছু ব্যাপারের দিকে কারও কৌতূহল নাই। তাঁর বিদায় মানে দেহযষ্টি ছায়ার অন্ধকারে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিত্যক্ত স্থান একজন যুবক অধিকার করে বসলো। নবাগতের পরিচ্ছদে পারিপাট্য আছে কিন্তু তার মনের ভাব তার পূর্বগামীর চেয়ে কিছুমাত্র ভাল ছিল তা মনে হচ্ছিল না। এই সংসার যে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করেছে না এই কথাটা প্রকাশ করবার জন্যই যেন এই নবাগত গভীর বিরক্তিব্যঞ্জক শব্দ উচ্চারণ করে বেঞ্চের উপর নিজেকে নিক্ষেপ করলো।

'আপনার মানসিক অবস্থা খুব ভাল চলছে না বোধ হচ্ছে।'—গর্টসবাই তাকে এই কথা বল্লো—কারণ নবাগতের ভাবখানাই এই যে তার ভাবের অভিব্যক্তিতে অন্যে যেন সাড়া দেয়।

যুবকটি তার দিকে ফিরে চাইলো এমনভাবে যেন তার কাছে সব কথা স্বীকার করবে সে। তার ভাব দেখে গর্টসবাই সতর্ক হ'লো।

'আমি যে ঝঞ্ঝাটে পড়েছি সে রকম ঝঞ্ঝাটে আপনি পড়লেও খুব সুখী হতেন না বোধ হয়'—সেই যুবক জবাব দিল—'কারণ এমন বেকুবির কাজ করেছি যা জীবনে কোনওদিন করিনি।'

'তাই নাকি'।—কোনওরূপ কৌতূহল না দেখিয়ে গতানুগতিকভাবে গর্টসবাই বললো।

'আজ বৈকালে এখানে এসেছি,—বারকসায়ার স্কোয়ারে 'প্যাটাগোনিয়ান' হোটেলে থাকবো মনে করে।'—যুবকটি বলতে লাগলো—'কিন্তু পৌঁছে দেখি সে হোটেলের ঘরবাড়ি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে আর সেখানে সিনেমা থিয়েটার চলছে। ট্যাক্সি ড্রাইভার একটু দূরে একটা ভাল হোটেল সম্বন্ধে সুপারিশ করতে আমি সেখানেই উঠেছিলাম। হোটেলে পৌঁছিয়েই বাড়িতে চিঠি লিখে দিলাম আমার নতুন ঠিকানা দিয়ে—তারপর বেরিয়ে পড়লাম একখানা সাবান কিনতে, কারণ ওটা সঙ্গে আনতে আমার ভুল হয়েছিল আর হোটেলের সাবান মাখতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। হোটেল থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ এধার ওধার ঘুরলাম এবং পরে 'বারে' গিয়ে বসলাম। তারপর এদিক ওদিক কিছুক্ষণ বেড়িয়ে হোটেলে ফিরবো মনে

হঠাৎই খেয়াল হলো যে হোটেলের নাম এমন কি কোন রাস্তার ওপর সেই হোটেল —তা' বেমালুম ভুলে গেছি। যে লোকের লণ্ডনে কোনও আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নাই— তার অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে ভাবুন দেখি। অবশ্য বাড়িতে 'তার' পাঠাতে পারি হোটেলের ঠিকানা জানবার জন্য—কিন্তু তারা কালকের আগে আমার চিঠি পাবে না যাতে আমার ঠিকানা দেওয়া আছে। এখন আমার অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে হাতে প্রায় কিছুই নাই। এক শিলিং পকেটে করে বেরিয়েছিলাম— তার সাবান কিনতে কিছুটা আর কিছুটা 'বারেই' খরচ হয়ে গেলো। এখন আমি দুই পেনি পকেটে করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।—এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে রাতে মাথা গুঁজবার স্থান নাই।'

যুবকটি তাঁর গল্প শেষ করে সহসা থেমে গেলেন। 'আপনি বোধ হয় মনে করছেন আমি একটা অসম্ভব গল্প রচনা করে আপনাকে শোনাচ্ছি।'—যুবকটি আবার বললো। এই কথাগুলির মধ্যে সে যেন অসন্তোষ প্রকাশের ভাব ফুটিয়ে তুলতে চাচ্ছিল।

গর্টসবাই [illegible] করে বললো—'মোটেই অসম্ভব মনে করছি না আমি। মনে পড়ে আমিও একবার বিদেশে [illegible] ঠিক এমনি অবস্থাতেই পড়েছিলাম [illegible] সেবার। [illegible] এই যে, সেই [illegible] ছিলাম। [illegible] এইটুকু মনে ছিল যে [illegible] হোটেলটি [illegible] খালের পাড়ে এবং [illegible] খুঁজতে খুঁজতে খাল আবিষ্কার করলাম [illegible] হোটেলের রাস্তা খুঁজে পেতেও দেরী হলো না।'

যুবকটি এই কথা শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলো। সে বল্লো—'বিদেশী শহরে আমি ভাবতাম না বিশেষ কিছু—কারণ তাহলে নিজেদের দেশের 'কনসালের' কাছে গিয়ে সাহায্য নেওয়া চলে। কিন্তু এখানে নিজেদের দেশে এমনি ঝঞ্ঝাটে পড়লে উদ্ধার পাওয়াই কষ্টকর। যদি না কোনও সহানুভূতিশীল ভদ্রলোককে আমার গল্পটি বিশ্বাস করাতে পারি এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু ধার না করতে পারি—তাহলে আমাকে সারারাত রাস্তায় কাটাতে হবে।—আমি এই ভেবে আনন্দ পাচ্ছি যে আপনি হয়তো আমার কথা একেবারে তাহা মিথ্যে এবং অসম্ভব বলে বিবেচনা করছেন না।'

যুবকটি শেষের মন্তব্যটির মধ্যে বেশ একটু উষ্ণ আন্তরিকতার ভাব ছড়িয়ে দিল হয়তো তার এই আশাটাই প্রকাশ করবার জন্য যে গর্টসবাই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভদ্রতা দেখাতে ত্রুটি করবে না।

গর্টসবাই জবাব দিল—'নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনার গল্পের জোর ক্ষীণ হয়ে এসেছে— কেননা আপনি বোধ হয় আপনার কেনা সাবানটি দেখাতে পারবেন না।'

যুবকটি দ্রুত খাড়া হয়ে বসলো, তার ওভার-কোটের পকেট বারংবার খুঁজে দেখলো —তারপর এক লাফে উঠে দাঁড়ালো।

সে রাগতভাবে বিড়বিড় করে বললো— 'আমি ওটাকেও নিশ্চয়ই হারিয়েছি।'

'একই সন্ধ্যায় হোটেলের ঠিকানা ভুলে যাওয়া আর কেনা সাবান হারানোর অর্থই হচ্ছে ইচ্ছাকৃত অসাবধানতা'—গর্টসবাই বললো। কিন্তু তার মন্তব্যের সবটুকু শোনবার জন্য যুবকটি অপেক্ষা করলো না। সে মাথা উঁচু করে তার আত্মসম্মানে যে অকারণে ঘা লাগলো এই ভাব দেখিয়ে দ্রুত রাস্তা দিয়ে চলে গেল।

গর্টসবাই মনে মনে বল্লো—এই লোকটির গল্পের বিশ্বাসযোগ্য উপাদানই হচ্ছে সাবান কিনতে বাইরে বেরোনোর কথা, কিন্তু দুঃখের বিষয় গল্পের এই অংশটিই তাকে অবিশ্বাসের কারণ হলো। যদি তার মস্তিষ্কে এই চমৎকার চিন্তা আসতো যে তার গল্পকে বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণ করতে হলে একখানা কাগজে মোড়া নতুন সাবান সঙ্গে করা উচিত—তা হলে সে এই বিশেষ ব্যবসায় প্রতিভাবান ব্যক্তি বলে গণ্য হতো। এই রকমের কারবারে ছোটখাট অসংখ্য বিষয়ে যে কতদূর সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তা' এ ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ লোকদের অজানা নাই।

মনে মনে এই মন্তব্য করে গর্টসবাই যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালো। দাঁড়াতেই মুখ দিয়ে তার বিস্ময়ের ধ্বনি বেরিয়ে এলো। সে দেখলো বেঞ্চের পাশেই কাগজে জড়ানো ডিম্বাকৃতি একটা জিনিস পড়ে আছে। সেটা একখানি নতুন কেনা সাবান ছাড়া আর কিছুই নয় এবং এটা যখন যুবকটি নিজেকে সজোরে বেঞ্চের উপর নিক্ষেপ করেছিল— তখনই তার ওভার-কোটের পকেট থেকে নীচে পড়ে গিয়েছে। সেই মুহূর্তেই গর্টসবাই সন্ধ্যাছায়া পরিব্যাপ্ত রাস্তায় সেই পাতলা ওভারকোট পরা যুবকটির সন্ধানে উৎসুক পদ বাড়িয়ে দিল। প্রায় যখন সে হতাশ হয়ে পড়েছে তখন হঠাৎ তার চোখে পড়লো—তার সন্ধানের বস্তুটি গাড়ির সারির এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে—বোধ হয় এই চিন্তা করছে যে পার্কের মধ্যেই পা বাড়াবে না নাইটস ব্রিজের' কোলাহলময় রাস্তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। গর্টসবাইয়ের হাঁক শুনে যুবকটি আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে ফিরে দাঁড়ালো।

গর্টসবাই সেই কাগজে মোড়া সাবানখানি তুলে ধরে বললো—'আপনার গল্পের সত্যতার প্রধান সাক্ষীকে আবিষ্কার করা গিয়েছে। যখন আপনি বেঞ্চের উপর বসতে যাচ্ছিলেন তখনই ওটা আপনার ওভারকোটের পকেট থেকে গড়িয়ে পড়েছিল নিশ্চয়। আপনি চলে আসবার পর মাটির ওপর পড়ে আছে দেখলাম। আমি যে আপনাকে অবিশ্বাস করেছিলাম সেজন্য ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু তখন ব্যাপারটা আপনার বিরুদ্ধেই গিয়েছিল। আমি সাবানকেই যখন সাক্ষ্য মান্য করেছিলাম—তখন এর সাক্ষ্যকেই আমার বিশ্বাস করতে হবে। যদি একটি 'সভারেন' ধার পেলে আপনার কিছু উপকার হয়——।'

যুবকটি মুদ্রাটি পকেটস্থ করে দ্রুত সমস্ত সন্দেহ মন থেকে মুছে ফেললো।

'কার্ড রাখুন—এতে আমার ঠিকানা লেখা আছে।'—গর্টসবাই বললো,—'এই সপ্তাহের যে কোনও দিনে আপনার এই ঋণ শোধ করলেই চলবে। এই নিন আপনার সাবান— এটা আপনার বন্ধুর কাজ করেছে।'—

'আপনি যে এটাকে খুঁজে পেয়েছেন—এই আমার ভাগ্যের কথা।'—তার স্বরে আন্তরিকতা ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করে দুই একটা ধন্যবাদের কথা উচ্চারণ করে নাইটস ব্রিজের দিকে সোজা দৌড় দিল।

গর্টসবাই নিজের মনেই বললো—'আহা বেচারা, একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল দুর্ভাবনায়। আর এতে বিস্ময়েরও কিছু নাই। এই ঝঞ্ঝাট থেকে উদ্ধার পেয়ে ভারী খুসী হয়েছে। যাহোক আমারও বেশ শিক্ষা হলো যে ঘটনার পরিস্থিতি দিয়ে বিচার করে, নিজেকে যেন বেশী বিজ্ঞ এবং চতুর বলে মনে না করি।'

গর্টসবাই আবার পিছু ফিরে এসে যেখানে এই ক্ষুদ্র নাটকটি অভিনীত হয়েছিল সেই বসবার বেঞ্চের কাছে উপনীত হলো। সে দেখলো—একজন বয়স্থ ভদ্রলোক বেঞ্চের নীচে এবং চারপাশে কি যেন খুঁজছে। সে চিনলো—এই ভদ্রলোকটিই প্রথমে তার সঙ্গে এই বেঞ্চে বসেছিল।

গর্টসবাই জিজ্ঞাসা করলো—আপনি কি কিছু হারিয়েছেন?

—'হ্যাঁ মশায় একখানা নতুন সাবান।'

অনুবাদক: শ্রীশচীন্দ্রলাল রায়

মধু-ভেক

অ · কৃ · র

আর্ট

বন্ধু ধনপতির গান শুনিতেছিলাম ঃ

"তুমি কেমন করে খুন করো হে খুনী
আমি অবাক হয়ে শুনি!
কেমন করে চালিয়ে ছুরি
দাও ফাঁসিয়ে পরের ভুঁড়ি
চরম পথে দাও পাঠিয়ে
ওগো পরম গুণী!

কহিলাম "এ আবার কি গান হে ধনপতি ?"

ধনপতি গম্ভীরভাবে কহিল "ভেবে দেখলুম কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর ভারী খাঁটি কথা লিখে গেছে—যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকে লাঠি বাজে। তারপর কবিগুরু যা বলে গেছেন তাও অনেকটা তাই।......

তোরা কেউ পারবি নে রে
তোরা কেউ পারবিনে রে
পারবি নে ফুল ফোটাতে
যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে।

ঐ যে বলা হলো 'যে পারে সে আপনি পারে', ঐ হলো আর্টের একেবারে আসল তত্ত্ব। আর্টের গোড়ার কথাই হচ্ছে সাবলীলতা, আপনি পারার ভাব। তোমার হাতে ছুরি দিয়ে দিলেই কি তুমি ভুঁড়ি ফাঁসাতে পারবে? আমি তো অন্তত পারবো না। পরের ভুঁড়ি তো দূরের কথা, নিজের ভুঁড়ি ও না। অথচ যে পারে সে কত সহজেই পারে।"

আমি কহিলাম, "তা যা বলেছো। ফুলেই কি সবাই ফোটাতে পারে? পারে না। অথচ যে পারে সে আপনি পারে।"

ধনপতি খুশী হইয়া কহিল "তাহলেই আর্টের গোড়ার কথাটা বুঝে নিয়েছো। কি? না, যে পারে সে আপনি পারে। এর ভেতর আবার কথা আছে। কেউ কেউ হচ্ছে ইংরেজীতে যাকে বলে বরণ আরটিস্ট (bprn artist) মানে জাত-শিল্পী। আবার কেউ কেউ সাধনা করে শিল্পী হয়। যেমন ধরো কেউ কেউ প্রথমে পাঁঠা খাসির ওপর হাত মকসো করে নিয়ে তারপর মানুষ খুন করতে পারে। কিন্তু এমনও অনেক খুনী শিল্পী আছে মানুষের সমাজে, মানুষ খুন করবার আগেই যাদের পাঁঠা খাসির ওপর হাত পাকানো দরকার হয় না, এক শাফেই মানুষ।"

আমি কহিলাম "খুনের আর্ট সম্বন্ধে তোমার ও কথা সত্য হতে পারে, কিন্তু গানের বেলায় খাটে না। গীত-শিল্পী হতে হলে আর কিছু না হোক অন্তত কিছুদিন গলা সাধা দরকার। সেধে সেধে গান যখন গলা থেকে সহজে বেরিয়ে আসে, তখনই সে গান পড়ে আর্টের পর্যায়ে।"

ধনপতি কহিল, "গানের কথা যদি তুললে তো বলি শোনো। উচ্চাঙ্গের গানের সঙ্গে চাই সঙ্গত; তা নইলে গান জমে না, অর্থাৎ তার রূপটুকু সম্যকভাবে ফুটে ওঠে না। কবি বলেছেন ঃ

'দারে দারে দ্রুম দেরে দেরে'
তবলচী কহিল ওস্তাদেরে।
ওস্তাদ কহিল 'ঘেড়ে নাক
ধেটে তুম তেরে কেটে তাক'।

তার মানে গাইয়ের সঙ্গে সঙ্গতীর চাই সত্যিকারের সামঞ্জস্য—ইংরাজীতে হারমনি (harmony) বলা যায় যাকে। তাই কবি দেখিয়েছেন তবলচী যেমন ওস্তাদের তেলেনার বোল বলছে। ওস্তাদও তেমনি তবলচীর তবলার বোল বলছে। এ ওর আর্টের সমজদার, ও ওর আর্টের সমজদার। এই পারস্পরিক সমজদারীর ফলেই তাদের দুজনের আর্ট একসঙ্গে মিশে একটি চমৎকার আর্টের সৃষ্টি করেছে; শ্রোতারা দিচ্ছে বাহবা।"

আমি কহিলাম "কবিগুরু বলে গেছেন ঃ

একাকী গায়কের নহে তো গান,
গাহিতে হবে দুইজনে।
গাহিবে একজন ছাড়িয়া গলা,
আরেকজন গাবে মনে।

বাইরের গানের সঙ্গে মনের গান মিলবে, তবেই হবে গানের সার্থকতা। গানের আর্ট ফুটে উঠবে তখনই।"

ধনপতি কহিল "আর্ট কেমন? যেমন প্রদীপের আলো দেওয়া। তাকে চেষ্টা করে আলো দিতে হয় না। তাই তো আমার একটা কবিতায় আমি বলেছি ঃ

আমার এই বিজন ঘরের অন্ধকারে
নীরব সন্ধ্যে বেলায়
আনমনা এক প্রদীপ জ্বলে হেলায়,—
সে যেন কোন স্বপন দেখে
আপনাকে দেয় ভুলিয়ে রেখে
কালোর বুকে আনমনে সে
ভাসে আলোর ভেলায়।"

বিস্মিত হইলাম। শেষকালে ধনপতিও কবিতা লিখিতে শুরু করিয়াছে!

ধনপতি বলিতে লাগিল "প্রদীপ খেয়ালেই করে না সে আলো দিচ্ছে। আলো দেওয়াই তার স্বভাব। সত্যিকারের প্রতিভাবান যে আর্টিস্ট, সেও সেই রকম।"

আমি কহিলাম "প্রতিভার কথা যদি তুললে তো বলি

Genius is one part inspiration, three parts perspiration.

এ কথাটা তো শুনেছো? প্রতিভা হচ্ছে এক ভাগ প্রেরণা আর তিন ভাগ খাটুনি। তাহলে চেষ্টা জিনিসটাকে যে তুমি উড়িয়েই দিতে চাইছ সেটা কি রকম হয়?"

ধনপতি কহিল "এক ভাগ আরসেনিক আর তিন ভাগ জল—এতে জোর বেশী কার? জলের না আরসেনিকের? .....তাছাড়া চেষ্টা জিনিষটাকে উড়িয়ে তো আমি দিতে চাইনি। আমি ওড়াতে চাইলেই-বা সে উড়বে কেন? আমি বলছি চেষ্টার সীমা ছাড়িয়ে চেষ্টাতীত যে অবস্থা তাতেই হয় আর্ট। যে গাইয়ের গান শুনে মনে হয় লোকটা প্রাণপণ প্রচেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছে, তাকে খাতির করে গাইয়ে বলে তুমি যদি-বা স্বীকার করো, আর্টিস্ট বলে আমি মানবো না। আর্টিস্ট গাইয়ে কাকে বলে তা বুঝেছিলুম আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের গান শুনে। কবিগুরুর ভাষায় 'কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর, সাতটি যেন পোষা পাখী।' কণ্ঠ থেকে সুর যেন আপনি বেরিয়ে আসছে অবারিত ধারায়, বিন্দুমাত্র চেষ্টার আভাস নেই। কিন্তু এই আয়াসহীনতার পেছনে রয়ে গেছে বহু আয়াসের ইতিহাস। সেই ইতিহাসটার ওপর তুমি জোর দিচ্ছ। আমি বলি ঐ ইতিহাসের সীমানা ছাড়িয়ে এসে আর্টের জগতে পড়া গেল।"

আব্দুল করিম খাঁ সাহেবের গান শুনি নাই। মনে পড়িল কিছুদিন আগে যাদুকর পি সি সরকারের যাদু দেখিয়াছি। সব কিছুই তাঁহার ফাঁকির খেলা, কিন্তু সেগুলি এমন অবলীলাক্রমে দেখাইয়া যান যে, সত্যিকারের যাদু বলিয়া মনে হয়। আর্ট বলিতে ধনপতি কি বোঝে তাহা বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হইল।

ধনপতি যেন আমার মনের কথা বুঝিয়া নিয়াই বলিল "এক হিসেবে বলতে পারো ফাঁকিই হচ্ছে আর্টের প্রাণ। কথাটার মানে বুঝিয়ে না দিলে বুঝতে পারবে কি না জানি না, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে ফাঁকি ঢেকে রাখাই হচ্ছে আর্ট। ভেবে দেখো বুঝতে পারো কিনা। না পারো তো পরে সুবিধা মতো একদিন বুঝিয়ে দেবো'খন।"

আগমনী ও বিজয়া

মহাশ্বেতা ঘটক

আকাশে আলো, গাছের তলায় সোনার আলো, বর্ষায় নূতন গজিয়ে ওঠা কচি পাতারা খুসীতে হাসছে, গুরু মহাশয়ের হুকুমে অঙ্ক কষতে কষতে, পোড়ো ছাত্ররা হঠাৎ চোখ রাঙানি ভুলে সামনে তাকিয়ে দেখে ব্যাপারী বেসাতি নিয়ে দোকান সাজাতে চলেছে, রাঙা ঘোমটা দেয়া রাঙা ছোট্ট বৌটি হাতের কাজ ফেলে বৈরাগীর খঞ্জনী শোনে আর বাপের বাড়ীর কথা মনে করে। চোখ জলে ভ'রে যায়, সবকিছু জুড়েই কিসের আশা, কিসের আনন্দ কিসের পূর্বাভাস! এদিকে যে পুজো আসছে, মেনকারাণীর আদরিণী মেয়ে বৎসরান্তে আসছেন মায়ের কাছে। ঘরের মেয়ে ঘরে আসবেন, কোলের ঝাঁপিটি থেকে শরৎকালের দিনটিকে ছেড়ে দিয়েছেন। হাসিখুসি রঙীন ঝলমলে দিনটি যেন নিমন্ত্রণের চিঠিখানি সেই খবর দিয়ে গেল।

'দুর্গাপুজো' শাস্ত্রে বলে 'শক্তিপুজো' ভক্ত বলেন, এ মা মহামায়ার পুজো। অন্য অন্য প্রদেশে এ তো শক্তিপুজোই রইল, আমাদের বাঙলাদেশের হৃদয়ের অন্তে এ কেমন ক'রে জড়িয়ে গেল। আসলে, শরতের দিন ছুটীর দিন। কাজকর্মের দিনগুলি একরকমে কেটে যায়, কিন্তু যখন বিশ্বভুবনে ছুটীর সানাই বেজেছে তখনই তো প্রিয়জনকে কাছে আনার সময়। যে কচি মেয়েটি, এমন দিনেও দূরে রইল, তাকে কাছে না পেলে কেমন যে লাগে তাতো মায়েরাই বোঝেন। দুর্গাপুজোর সাথে কন্যা আনয়ন ও বিদায়ের এই চিরকরুণ স্মৃতি জড়িয়ে আছে তাই 'কালী' 'তারা' যতজনই থাকুন 'দুর্গা' আমাদের ঘরের মেয়ে।

শরতের আলো যখন থেকে বাংলার ধূলোমাখা কোলখানি রাঙিয়ে দিল তখন থেকে আগমনীর গান সুরু হোল। বাঙলার এমন গ্রাম নেই যেখানে শরতের দিন আগমনীর গানের সঙ্গে জড়িয়ে নেই।

সারা বৎসর দুঃখকষ্টে কেটেছে, মেনকারাণী আর পারেন না—

"গিরি প্রাণগৌরী আমার, উমা বিধুমুখ
না দেখি বারেক, এ ঘর লাগে আঁধার
আজি কালি করি দিবস যাবে, প্রাণের
উমারে আনিতে কবে
প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে,
এ কি তব অবিচার॥"

বৈরাগীর গানের এই যে সুর, এ তো মায়ের অন্তরের করুণতম স্থানটি জুড়ে র'য়েছে। গিরিরাজ পাষাণ, মেনকা তাঁকে কতবার কত রকমে ব'লছেন—

"গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, চৈতন্য-
রূপিনী কোথা লুকোল।"

কতদিনের কত মায়ের ব্যথা, গানের এই গেঁয়ো সুরে বেজে উঠেছে। কতদিন আগে বৃন্দাবনে একটি লোভী ছেলে ননী মাখন খেয়ে বেড়াত। মা তাকে কত ব'কেছেন, হাতে দড়ি দিয়ে রেখেছেন আর রাঙা ঠোঁট কান্নায় ফুলে উঠলে চূড়ো বেঁধে হলুদ ছোপানো ধুতি পরিয়ে দাদাদের সঙ্গে গোচারণে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সেই ছেলেটি রাজা হবার লোভে মায়ের কোল সঙ্গী সাথী সব ছেড়ে মথুরা চলে গেল। সারা বৎসর দুঃখিনী নন্দরাণী, মাটির কোলে কেঁদেছেন

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষে 'দেশ' পত্রিকা কার্যালয় এক সপ্তাহকাল বন্ধ থাকিবে বলিয়া আগামী ২০শে অক্টোবর পত্রিকা প্রকাশিত হইবে না। ৫০ সংখ্যা 'দেশ' আগামী ২৭শে অক্টোবর প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক—"দেশ"।

আর শরৎকালে ব্যাপারী যখন পসরা সাজিয়ে বেচতে এসেছে, তাকে মিনতি ক'রে ব'লেছেন—

শুন, এদেশে যাও ওদেশে যাও
বিদেশী বানিয়া—
একবার মথুরাতে যাইওরে তুমি, কই
মাথার দিবা দিয়া,
কৃষ্ণরে হেটিও তুমি,
আমার নাম লইয়া.

এই একটি কালো ছেলেকে ঘরে ফেরাবার জন্যে কত যুগে কতজন কাঁদল, তার মায়ের ব্যথাও তো এই শরতের রোদেই রয়েছে।

আর এক যুগে আর এক রাতে, মায়ের কোল ছেড়ে আর একটি ছেলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ঘরে অর্থ-সম্পদ, নদীয়া জুড়ে বন্ধু-বান্ধব, সবার ওপর মা ছিলেন স্নেহময়ী। সকলের হৃদয় জুড়ে, সব আলো ক'রে, সোণার মত রূপ নিয়ে তিনিই তো ছিলেন 'নদীয়ার নিমাই'।—নিশুতি রাতে পাখপাখালী অবধি ঘুমোয়, নিঃশব্দ পায়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। দুঃখের রাত অঘোর নিদ্রায় গেল, সকালে নদীয়া জুড়ে কান্নার রোল। শচীমাতা পথের ধূলায় পদচিহ্ন খুঁজছেন নিতাই নিমাইয়ের ছেলেবেলার বন্ধু, তার হাত ধ'রে কেঁদে ব'লছেন—

বল দেখি ভাই বাপরে নিতাই,—নিমাই
আমার কোথা গেল?
এক আমার নিমাই বিনে দিনে
ন'দে আঁধার হোল।—

পুজোর দিনে স্নেহের পুত্তলীর কাছে সেই মায়ের বেদনা যেখানে, সব মায়েরাই সেখানে এক। আগমনীর গানে সেই বেদনারই তো সুর। আরাধ্য দেবতা শাস্ত্রে পুরাণে কত উঁচুতে ছিলেন। যিনি শক্তিরূপিনী, বিশ্বের আদ্যে, মধ্যে ও অন্তে সব কিছুর মূলশক্তি যিনি, সেই মহাশক্তিরূপিণী মহামায়া, বাঙালী বৈরাগীর ডাকে, ঘরের মেয়ে হ'য়ে নেমে এলেন। গরীব মায়ের গরীব কোলের লোভে তুষারময় কৈলাস ছেড়ে দেবতা ঘরের মানুষটি হ'য়ে দেখা দিলেন, এ যেন আমাদের বাঙলাতেই সম্ভব হ'ল; এমনটি আর কোথাও হয়নি। কেঁদে কেঁদে বোধনের রাত গেল। মেনকারাণী আ-বাঁধা চুলে, অযত্নের আঁচল বিছিয়ে শুয়ে আছেন এমন সময় দরজায় খঞ্জনীতে ঘা পড়লো—

"গা তোলো, গা তোলো মা
বাঁধ মা কুন্তল
চেয়ে দেখ পাষাণী, মা, এল তোর
ঈশানী মাগো॥"

পাষাণীর কোলে ঈশানী এসেছেন, মায়ের সব দুঃখ দূরে গেল। সোনার মুখ বারবার দেখলেন, আনন্দে চোখের জল মুছে মুছে উমাকে কোলে নিলেন। উমার সোণার বর্ণ পথশ্রমে মলিন হয়েছে, সোনার দেহে ধূলো লেগেছে, অভিমানে, আনন্দে বারবার চোখ জলে ভরে এসেছে, মেনকা অভিমানিনীকে বারবার কতরকমে বলছেন—

"আর অভিমান করিসনে মা
ক্ষমা দেগো, ও শঙ্করী॥"

উমা অভিমানে,

"অমনি দুবাহু পসারি,
মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কাঁদি রাণীরে বলে,
কই, মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে?
তোমার পাষাণ প্রাণ, পিতাও পাষাণ,
জেনে মা এলাম, আপনি হতে॥"

মায়ের কতদিনের কত আয়োজন এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে আছে।—

"উমা, আয়গো মা, আয় করি কোলে,
পথশ্রমে স্বেদে সিক্ত কলেবর
ক্ষুধায় মলিন হয়েছে অধর—

যত্নে ক্ষীরসর রেখেছি মা ধর,
দিব বদন কমলে॥"

আনন্দের তিনদিন বড় শীঘ্র গেল। তিনদিন উমা পিতার পাষাণ পুরী আলো করে রইলেন। তিনদিন গিরিরাজ মেনকার সুখে কাটল। এদিকে বিজয়ার দিন এল। নবমীর রাত মেনকার বড় দুঃখে কাটল। যে দুঃখ দূরে হয়েছিল, তা কাল দ্বিগুণ হয়ে লাগবে, তাঁর মনে শান্তি নেই, বুকের ধন, কোলজুড়োন দুঃখের দিনের মণি উমা কাল যাবেন, তিনি বড় কষ্টে সময় গুনছেন, চোখের জলে পাথার হয়েছে। বৈরাগীর চোখে ঘুম নেই, বাজনাদাররা ঘুমোচ্ছে, পুরবাসী ঘুমোচ্ছে, শরতের হিমজ্যোৎস্নায় সমস্ত দেশ নিশুতি, নি-শাস ঘুমোচ্ছে—আর বৈরাগীর খঞ্জনে বেজে চ'লেছে—

"রজনী জননী তুমি পোহায়োনা
ধরি পায়—
তুমি না সদয় হ'লে, উমা মোরে
ছেড়ে যায়।"

নবমীর রাত্রিকে ডেকে ডেকে সমস্ত বাঙলা দেশ মিনতি ক'রছে। পূর্বদিক রাঙা হোল, ভোরের বাতাস বইল, পাখীরা বনে জাগলো, রাজপুরে পুরবাসী জাগলো, মেনকার দুঃখে বৈরাগী একতারায় আবার টান দিল—

"নবমী নিশি পোহাল,
কি করি, কি করি বল—
ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা,
দেখনা বিজয়া এল।"

কাল বিজয়া এল। সকলকে কাঁদিয়ে নিজে কেঁদে মা চ'ললেন বৎসরের জন্য। মেয়ের কপালে সিঁদুর, মুখে পান দিয়ে, মেনকা কেঁদে ব'লছেন—

"এসো মা, এসো মা উমা,
বোলোনা, মা, যাই যাই,
মায়ের কাছে হৈমবতি,
ওকথা মা বোলতে নাই।"

গিরিগৃহ শূন্য ক'রে উমা গেলেন। বিজয়ার সঙ্গে সঙ্গে কত মায়ের কত ঘর খালি হ'ল। তিনটি দিনের জন্য মেয়ে এসেছিল মায়ের কাছে, আজ বড় দুঃখে মায়ের হৃদয় খালি ক'রে, নিজে কেঁদে, মেয়ে ফিরে এল। দরজায় মা দাঁড়িয়ে আছেন জলভরা চোখে, পাড়াগাঁয়ের রাস্তায় ধূলো উড়িয়ে উড়িয়ে চারজন পাল্কী বেহারা পাল্কী নিয়ে চলেছে, পাল্কীর দরজা ফাঁক ক'রে মেয়ে ফিরে ফিরে দেখছে, চোখের জলে পরিচিত বাড়ীটি ঝাপ্‌সা হ'য়ে যাচ্ছে। ছোটো ছেলেটির কাছে বাবা এসেছিলেন পূজোর দিনে আজ তিনি ফিরে চ'লেছেন, নদীতে নৌকো তৈরী, মাঝিরা তাড়া দিচ্ছে, ছোট্ট খোকন পাড়ে দাঁড়িয়ে দেখছে—নৌকোয় তিন রঙের পাল, আকাশে সাদা রঙের মেঘ, জলের ওপর মাছরাঙা উড়ে পড়ছে। নৌকো ছেড়ে দিল। আনন্দের নৌকো যেন ভরাজোয়ারে চলে গেল বিজয়ার সঙ্গে সঙ্গে। শরতের ভরানদী যেমন পড়ে থাকে, তেমনি ভারী মন নিয়ে সকলে শূন্যঘরে ফিরল। প্রতিমা নিয়ে চলেছে বিসর্জন দিতে, দুর্গার চোখে যেন জল, ঢাকী সজোরে ঢাক বাজাচ্ছে, আর বৈরাগী গাইতে গাইতে চলেছে—

"বৎসরান্তে আসিস্ আবার,
ভুলিস্ না মায়ে ও মা আমার,
চন্দ্রাননে যেন আমার মধুর মা বোল্
শুনতে পাই॥"

আলো, নহবতের বাদ্য, হাসিমুখ, সব নিয়ে উমা চলে গেলেন বৎসরের মত। বিজয়ার রাত ভরে বাঙলাদেশ গাইল—

"আমার সপ্তমী অষ্টমী তিথি
আনন্দেতে গেল
দুরন্ত দশমী এসে উমা হরে নিল॥"

রাত্রি প্রভাতে আগমনী বিজয়ার গানের ঝুলি তুলে বৈরাগীও চলে গেল, আবার আসছে শরতে তার পুঁজি খুলবে.

"দেশ"-এর

নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩, ষাণ্মাসিক—৬৷৹

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণতঃ নিম্নলিখিতরূপ :—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে
১০০" ও তদূর্দ্ধ ... ৩, প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার
৫০"—৯৯" ... ৩৷৹ " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন
৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

সম্পাদক—"দেশ"
১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

মশা, মানুষ ও ম্যালেরিয়া

শ্রীঅমরজ্যোতি সেন

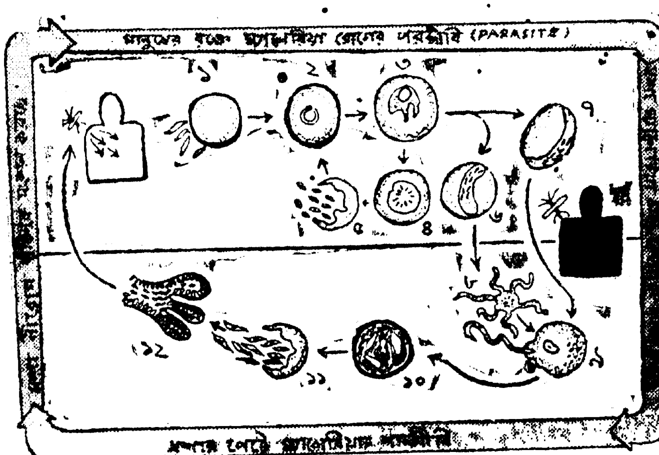
ম্যালেরিয়া এবং মশা আমাদের দেশে ডাল ভাতের সামিল। এদের নতুন করে পরিচয় দেবার কিছু নেই। ম্যালেরিয়ায় একবার না একবার ভোগেন নি এমন লোকের দেখা পাওয়া ভার। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর চার কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে এবং তাদের মধ্যে কত লক্ষ যে মারা যায় এবং কত লোক যে নিষ্কর্মা হয়ে যায়, তার কোনো সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে কি করে ম্যালেরিয়া এত দ্রুত প্রসারলাভ করল, তাও নতুন করে কিছু বলবার নেই। এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে, কিন্তু প্রতিকার কিছু হয়নি; স্বাধীন ও পরাধীন দেশের কি পার্থক্য এইখানেই স্পষ্ট বোঝা যায়। যাই হোক, আমাদের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য আলাদা।

ম্যালেরিয়া রোগের বাহক বিশেষ এক জাতীয় মশা যার নাম অ্যানোফিলিস। অ্যানোফিলিস জাতীয় মশার স্ত্রী মশাগুলিই ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দেহ থেকে নীরোগ ব্যক্তির দেহে রোগ সংক্রমণ করে। এ সমস্তই অবশ্য আমরা ছোটবেলায় স্কুলে স্বাস্থ্যতত্ত্বর বইএ পড়েছি। ম্যালেরিয়ার বাহক মশা এক প্রকার পতঙ্গ। পিঁপড়ে অথবা মৌমাছির মতো এদের দেহও তিন ভাগে বিভক্ত—মাথা, বুক আর পেট। মশার পা আছে ছয়টি। মশার মাথাটি গোল, মাথায় আছে এক জোড়া অ্যানটেনা অথবা শুঁড়। পুরুষ মশার শুঁড়ে বেশ ঘন লোম আছে, এক জোড়া গোঁফেরই মতো। মেয়ে মশার শুঁড়ের লোম অত ঘন নয়। এ ছাড়া মশার মাথায় একটি ধারালো অস্ত্র আছে, সেটি এদের শোষক যন্ত্র। এই যন্ত্রটি দিয়েই এরা আরামে আমাদের রক্ত পান করে ও সেই সময়েই আমাদের দেহে ম্যালেরিয়ার রোগ বীজাণু প্রবেশ করিয়ে দেয়। একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, স্ত্রী মশার অস্ত্রটিই ধারালো, পুরুষের অস্ত্র ভোঁতা, সেইজন্য পুরুষ বেচারীরা রক্ত পান থেকে বঞ্চিত। তারা স্রেফ নিরামিষ গাছ পাতার রস খেয়েই জীবন ধারণ করে।

মশার দেহের তুলনায় বেশ বড় এক জোড়া চোখ আছে, কিন্তু মশার চোখের বিশেষত্ব হ'ল যে সেই চোখ অসংখ্য ছোট ছোট চোখের সমষ্টি। এই রকম চোখকে বলা হয় পুঞ্জাক্ষি (Compound eye)। মশা যখন ওড়ে তখন তার এক জোড়া পাতলা ডানা এত জোরে কাঁপে যে, বিশেষ এক প্রকার অতি পরিচিত শব্দ হয় এবং আমরাও সাবধান হই। ঠিক যেন বিমান আক্রমণের পূর্বে সতর্কীকরণ সংকেতধ্বনি।

মশার জীবন চার ভাগে বিভক্ত। প্রথম ডিম অবস্থা, শূক (larva) অবস্থা, গুটি (pupa) অবস্থা এবং শেষে পূর্ণ মশক অবস্থা। মশা বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে, তবে সব মশা সব রকম জলে ডিম পাড়ে না। স্ত্রী মশা এক সঙ্গে এক শত থেকে তিন শত পর্যন্ত ডিম পাড়ে। ডিমগুলি খালি চোখে দেখা যায় না এতই ছোট, দেখতে হলে অণুবীক্ষণের দরকার। অ্যানোফিলিস মশার ডিম প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে জলে ভাসে কিন্তু কিউলেক্স মশার ডিম একত্রে বদ্ধ হয়ে জলে ভাসে। ডিমগুলির আকৃতি হাঁসের ডিমের মতো যদিও অনেক গুণ ছোট। রং প্রথমে শাদা থাকে, কিন্তু পরে রং ময়লা হয়ে যায়। গ্রীষ্ম অথবা বর্ষাকালে অনুকূল আবহাওয়ায় ২।১ দিনের মধ্যে ডিম ফুটে শূক কীট (larva) বার হয়; মশার জীবনের এ দ্বিতীয় অবস্থা। এদের খালি চোখে দেখা যায়।

শূকগুলি দেখতে লম্বা, মাথা চ্যাপ্টা, চোখ আছে আর গায়ে খুব সূক্ষ্ম লোম আছে। এরা জলের স্যাওলা অথবা খুব ক্ষুদ্র পোকা খেয়ে জীবনধারণ করে। জলে এরা ব্যস্তভাবে এধার ওধার সাঁতার কেটে বেড়ায় তখন এদের মনে হয় জলের পোকা। এদের পেটের শেষ অংশে নিশ্বাস নেবার জন্যে একটি নল থাকে। শ্বাস নেবার জন্যে এরা মাঝে মাঝে জলের ওপর ভেসে ওঠে। এই সমস্ত শূককীটগুলি বড় বড় মাছের বাচ্চার অতি প্রিয় খাদ্য। সেইজন্যই পুকুর অথবা ডোবায় মাঝে মাঝে পোনা মাছ ফেলা উচিত, তারা মশা জন্মাবার আগেই শূক কীটগুলিকে খেয়ে ফেলে। কেরাসিন অথবা অনুরূপ কোন তেল ছড়ালে জলের ওপর একটি পাতলা আবরণ পড়ে। শূককীট-গুলি সেই আবরণ ভেদ করে শ্বাস নিতে জলের ওপরে উঠতে পারে না, আর মশাও সেই আবরণ ভেদ করে ডিম পাড়তে পারে না। আরও এক উপায়ে এই লার্ভাদের ধ্বংস করা যায়, সেটি হলো জলে প্যারিস গ্রীণ (aceto arsenite of copper) ছড়িয়ে দেয়া। এই রসায়ন জলের সঙ্গে



(১) রেণু লাল রক্ত-কণিকায় প্রবেশ করছে, (২) আংটীর আকার ধারণ করেছে, (৩) আংটীর আকার মিলিয়ে যাচ্ছে ও (৪) আমিবার ন্যায় (Schizont) আকার প্রাপ্ত হয়ে লাল কণিকার সব খেয়ে নিয়েছে, (৫) কণিকাটি ফেটে যেয়ে নতুন রেণু রক্তস্রোতে ছেড়ে দিচ্ছে। একদল রেণু (৬) পুরুষ ও (৭) স্ত্রী যৌন কোষ তৈয়ারী করে। এই সময় কোনো মশা ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্থ রোগীকে দংশন যৌন কোষগুলি নিজের পেটে টেনে নেয়। (৮) পুরুষ যৌন শুঁড় বার করছে ও একটি শুঁড় (৯) বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে স্ত্রী কোষের সঙ্গে মিলে নতুন (১০) একটি গোলাকার কোষ (Cyst) তৈয়ারী করে। পরে সেটি (১১) ফেটে যেয়ে নতুন রেণু ছড়িয়ে যায় ও মশার (১২) লালাগ্রন্থির সঙ্গে মিশে রেণুগুলি নতুন শিকারের প্রতীক্ষা করে।

'মিশে লার্ভার পেটে, বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাদের মেরে ফেলে।

লার্ভার জীবন এক থেকে তিন সপ্তাহ, এর মধ্যে এরা তিন বার খোলস ছাড়ে। অ্যানোফিলিসের লার্ভা জলের উপরের স্তরের একটু নীচেই সমান্তরাল হয়ে ভাসে, কিন্তু কিউলেক্সের লার্ভা একটু বেঁকে লম্বালম্বিভাবে জলে ভাসে।

এইবার মশার জীবনের তিন নম্বর অর্থাৎ পুটি (pupa) অবস্থা। লার্ভা অবস্থায় মশা তিনবার খোলস ছাড়ে। চারবারের বার খোলস ছেড়ে পুটি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মশার পুটি একটি পাতলা আবরণের মধ্যে বাস করে ও দেহের আকার বেঁকে 'কমা' চিহ্নের মতো হয়, ঠিক যেন একটি ছোট্ট গলদা চিংড়ি। এদের মুখ থাকে না কিন্তু খাবার প্রয়োজন হয় না। লার্ভাদের মতো সাঁতারও কাটে এবং শ্বাস প্রশ্বাসও নেয়। পুটির জীবন দু'-এক দিন। পুটির খোলস ভেদ করে পূর্ণাঙ্গ মশা বেরিয়ে আসে এবং তার ডানা ও পা শুকিয়ে গেলে উড়ে যায়।

আমাদের দেশে সাধারণত দু জাতের মশা দেখা যায়, অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স অবশ্য এদের আবার নানা প্রকার শ্রেণী আছে। কিউলেক্স মশা গোদের (filaria) বীজাণু বহন করে। স্টেগোমিয়া ফ্যাসিয়েটা বলে একরকম মশা পীতজ্বরের জীবাণু বহন করে। অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশা আমাদের গায়ে বসলেই আমরা চিনতে পারি। অ্যানোফিলিস মশা বসে তার শেষ অংশ উঁচু করে' দেহকে ৪৫ কোণ করে আর কিউলেক্স বসে শরীরকে সমান্তরাল করে। মশারা নিশাচর, সাধারণত দিনের আলো ভালবাসে না। তবে যেখানে রোদ আসে না, হাওয়ার চলাচল নেই সেখানে দিনের বেলায়ও মশার উৎপাত আছে।

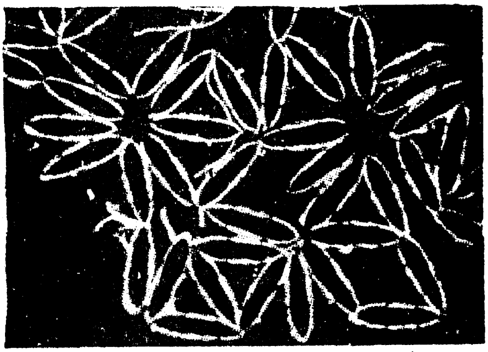
পুরুষ মশা এক মাসের বেশী বাঁচে না, কিন্তু স্ত্রী মশা চার পাঁচ মাস পর্যন্ত বাঁচে। স্ত্রী মশা তাদের ডিমের পুষ্টির জন্য রক্ত পান করে ও প্রত্যক্ষভাবে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে বেড়ায়। তাছাড়া এদের রক্ত পান করবার জন্য শুঁড় (proboscis) আছে, কিন্তু পুরুষ মশার নেই। এই হ'ল মশার ইতিকথা।

মানুষ তার থেকে বড়ো বড়ো ক্ষমতাশালী অথবা হিংস্র প্রাণীদের আয়ত্তে এনেছে, কিন্তু তাদের থেকে কতো ছোট মশা, মাছি, উকুন, ছারপোকা ইত্যাদিকে এখনও আয়ত্তে আনতে পারেনি, তবে আশার আলো দেখা দিয়েছে কয়েকটি নতুন ঔষধ এবং রসায়নের আবিষ্কারের ফলে।

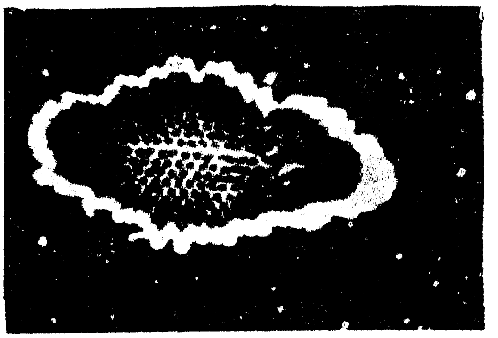
ম্যালেরিয়া যে শুধু গ্রীষ্মমণ্ডলেই দেখা যায় তা নয়, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেও এর প্রভাব বড়ো কম নয়। ইংলণ্ড এবং অ্যামেরিকার যুক্তরাজ্যে অনেক লোকই ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। ম্যালেরিয়া কথার অর্থ হ'ল দূষিত বায়ু। এই রোগ বহু প্রাচীনকালের। যীশুখৃষ্ট জন্মাবার বহু পূর্বে তখনকার গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস ম্যালেরিয়ার বিবরণ নিখুঁত-ভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কার সম্বন্ধে চারজন লোকের নাম জড়িয়ে আছে। প্রথমেই নাম করতে হয় ফরাসী চিকিৎসক অ্যালফন্সে ল্যাভেরাঁ। ইনি ১৮৮০ সালে অ্যাল-জিরিয়াতে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তে প্রথম ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু (parasite) দেখেছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর কথা সবাই হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল, কারণ তিনি সামান্য একজন মাইনে করা চাকুরে ডাক্তার ছিলেন আর তাঁর তেমন ভালো যন্ত্রপাতিও নাকি ছিল না। কিন্তু পরে আরও অনেকেই, বিশেষ করে ইটালীয় চিকিৎসক চেল্লি এবং বিগন্যামি, ল্যাভেরাঁর আবিষ্কার যে নির্ভুল তা প্রমাণ করেন। ম্যালেরিয়ার যে জীবাণু ল্যাভেরাঁ আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি তার নাম দিয়েছিলেন প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি।

কিন্তু রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেখতে পেলেই ত আর হ'ল না কি করে তা রক্তে প্রবেশ করল, এই হ'ল সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করেন ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগের স্যার রোনাল্ড রস্ এবং ইটালীয় চিকিৎসক গিওভানি ব্যাতিস্তা গ্রাস্‌সি। এঁরা পরস্পরে পরস্পরের অজ্ঞাতে এবং প্রায় একই সময়ে ম্যালেরিয়া রোগের কারণ নির্ণয় করেন। ঠিক যেমন যুক্তভাবে অথচ পরস্পরের অজ্ঞাতেই ডারুইন এবং ওয়ালেস "থিওরি অফ ইভলিউশান" অথবা অভিব্যক্তিবাদ প্রচার করেছিলেন। আরও একজন ছিলেন তিনি হলেন স্যার প্যাট্রিক ম্যানসন যিনি সুদূর ইংলণ্ড থেকে রোনাল্ড রসকে উপদেশ ও প্রেরণা দিতেন। ম্যালেরিয়ার ইতিহাসে এই চারজনের নাম অমর হয়ে থাকবে।



অ্যানোফিলিসের ডিম



কিউলেক্সের ডিম

রোনাল্ড রস জাতিতে স্কচ, তাঁর পিতা ভারতবর্ষে একজন সেনাপতি ছিলেন এবং রস্ ভারতবর্ষেই হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। রস সাহেব ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করে ভারতীয় চিকিৎসা বিভাগে (Indian Medical Service) চাকুরী গ্রহণ করেন এবং যথাক্রমে মান্দ্রাজ, সেকেন্দারাবাদ, মৌলমিন, কলিকাতা প্রভৃতি তাঁর চাকুরী-স্থল ছিল। তখন তিনি অবশ্য স্যর উপাধি পান নি, মেজর ছিলেন। রোনাল্ড রস কেবল যে চিকিৎসক ছিলেন তাই নয়, তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক নাট্যকার এবং গণিতজ্ঞ ছিলেন।

রোনাল্ড রসকে আগাগোড়া প্রেরণা যুগিয়েছিলেন চীন দেশ প্রত্যাগত চিকিৎসক স্যার প্যাট্রিক ম্যানসন। মাঝে একবার ছুটিতে বিলাতে যেয়ে রস্ ও প্যাট্রিক ম্যানসনের মধ্যে পরিচয়সূত্র স্থাপিত হয়। তবে মজার কথা এই যে, তখন রস সাহেবের মশা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণাই ছিল না অথচ প্যাট্রিক ম্যানসনের একটা ধারণা ছিল যে মশা ম্যালেরিয়া জ্বরের বাহক। কিন্তু তিনি কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি।

রোনাল্ড রস ভারতবর্ষে ফিরে এসে সেকেন্দারাবাদে প্যাট্রিক ম্যানসনের নির্দেশ অনুসারে ম্যালেরিয়া ও তার কারণ

অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। তাঁরা পরস্পর পত্র ব্যবহার আরম্ভ করলেন, তাঁদের যা কিছু ধারণা ও সমস্যা সব কিছুরই সমাধান তাঁরা করতে চাইতেন এই পত্রের মধ্য দিয়ে। তাঁরা দীর্ঘ চার বৎসর এই রকম পত্র ব্যবহার করেছিলেন এবং যে অনুসন্ধান রোনাল্ড রস্ আরম্ভ করেছিলেন সেকেন্দ্রাবাদে তার সমাপ্তি হয় কলকাতায়। আরও একজন লোক কলকাতায় এসেছিলেন গবেষণা কার্যের জন্য। তিনি হলেন যক্ষ্মার জীবাণু আবিষ্কারক নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত জার্মান জীবাণুতত্ত্ববিদ্ রবার্ট কখ। রবার্ট কখ্ও ইটালিতে যেয়ে কিছুদিন ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণা করেছিলেন।

রোনাল্ড রস্ ম্যালেরিয়াক্রান্ত রোগিগণকে সন্ধ্যায় মশারির ভেতর শোয়াতেন ও মশারির মধ্যে কিছু মশা ছেড়ে দিতেন। পরে তিনি সেই মশাগুলিকে ধরে একটা বোতলে কয়েক-দিন রেখে দিতেন, তারপর তাদের পেট চিরে দেখতেন ভেতরে ম্যালেরিয়ার জীবাণু আছে কি না। এই রকমভাবে মশার পর মশা, বিভিন্ন জাতির ও শ্রেণীর মশার পেট চিরতে তিনি পাভিয়া নামক শহরে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করেন, কিন্তু ব্যবসা করবার তাঁর মোটেই ইচ্ছা ছিল না, গবেষণার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল বেশী। উইপোকা ও তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও ইল মাছ সম্বন্ধে তিনি অনেক গবেষণা করেছিলেন।

১৮৯৮ সাল, যে বৎসর রোনাল্ড রস ম্যালেরিয়ার কারণ আবিষ্কার করেন সেই বৎসর থেকে গ্রাস্‌সি ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, তখনও রসের নাম ইটালিতে পৌঁছয়নি এবং গ্রাস্‌সিও রসের আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। তবে গ্রাস্‌সির ধারণা ছিল যে, ম্যালেরিয়া ছাড়া মশা পাওয়া যায়, কিন্তু মশা ছাড়া ম্যালেরিয়া হতে পারে না। ডিটেকটিভ যেমন খুনীর সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় গ্রাস্‌সি সেই রকম তাঁর ধারণা প্রমাণ করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন তিনি অনুসন্ধান করতে লাগলেন কোন জাতীয় মশা এবং কি করে তারা ম্যালেরিয়া জ্বর সংক্রামিত করে।

১৮৯৮ সাল। জুলাই মাস। রোম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তিনি তখন অধ্যাপক। সেবার তাঁকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল সেইজন্য তিনি কিছুদিন ছুটী নিলেন। কিন্তু ছুটী নিয়ে তিনি বেরুলেন মশা ধরতে। কত রকমেরই না মশা তিনি ধরলেন কিন্তু যে মশা তিনি চান কোনোটাই সে মশা নয়। জলা, মাঠ নানা গ্রাম ঘুরতে ঘুরতে তিনি এমন একটি শহরে এলেন যেখানে বৎসরের প্রায় সব সময়েই ম্যালেরিয়া লেগে আছে। যে বাড়িতেই তিনি ম্যালেরিয়া রোগীর সন্ধান পান সেই বাড়ির লোকদেরই তিনি নানারকম প্রশ্ন করতে থাকেন; তোমাদের বাড়িতে কি আগে ম্যালেরিয়া ছিল? এই লোকটির কতদিন জ্বর হয়েছে? আর কারুদের জ্বর হয়েছে? কার জ্বর হয়নি? তোমাদের বাড়িতে কি মশা আছে? ইত্যাদি...। এইরকম খোঁজ করতে করতে তিনি সেইসব বাড়ি থেকে এক জাতীয় মশার সন্ধান পেলেন যাকে সেই শহরের লোকেরা বলত জানজারোন (Zanzarone) যার বৈজ্ঞানিক নাম দেওয়া হয়েছিল অ্যানো-ফিলিস ক্ল্যাভিজার। যেখানেই গ্রাস্‌সি ম্যালেরিয়া জ্বরের সন্ধান পেয়েছিলেন সেখানেই তিনি এই মশা দেখতে পেয়ে-ছিলেন।

গ্রাস্‌সি গ্রামে এসে এই অ্যানোফিলিস মশা ধরে নিজের দেহকে দংশন করতে দিয়ে-ছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হোক তাঁর জ্বর হয়নি। ছুটী অন্তে সেপ্টেম্বর মাসে রোম বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসে যদিও তিনি প্রচার করলেন যে অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া জ্বরের বাহক কিন্তু তখনও তা প্রমাণ সাপেক্ষ।

অবশেষে প্রমাণ করবার সুযোগ উপস্থিত হ'ল। রোমের একটি উঁচু পাহাড়ে খৃশ্চান ধর্মযাজকদের একটি হাসপাতাল ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, সেই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া ছিল না এবং হাসপাতাল ও তার প্রাঙ্গণে মশার উৎপাত ছিল না। সেই হাসপাতালে মিঃ সোলা নামে একজন রোগী ছিলেন, তিনি ছয় বৎসর ধরে সেই হাসপাতালে বিছানা নিয়ে ছিলেন এবং ডাঃ ব্যাস্টিয়ানেলি তাঁর চিকিৎসা করতেন। মিঃ সোলার আর যাই হোক কখনও ম্যালেরিয়া হয়নি। ঠিক হ'ল যে তাঁর ওপরই পরীক্ষা চালানো হবে এবং চটৌক মিঃ সোলাও রাজি আছেন।

প্রথমে কিছুদিন ধরে মিঃ সোলার উপর কিউলেক্স মশা নিয়ে পরীক্ষা করা হলো। ঘরের সব দরজা জানলা বন্ধ করে' এবং রাতে আলো নিবিয়ে দিয়ে অনেক কিউলেক্স মশা ছেড়ে দেওয়া হ'ত। এই কাজে গ্রাস্‌সি দুইজনকে সহকারী পেয়ে-ছিলেন বিগনামি এবং ব্যাস্টিয়ানেলি। যখন কিউলেক্স মশাতে সোলার কিছুই হ'ল না তখন গ্রাস্‌সি মলেত্তা বলে একটি জায়গায় গেলেন তখন সেখানে খুব ম্যালেরিয়া হচ্ছিল। ফেরবার সময় তিনি দু'টি বোতল ভর্তি করে কতকগুলি মেয়ে অ্যানোফিলিস



অ্যানোফিলিসের লার্ভা।



কিউলেক্সের লার্ভা।

থেকে তিনি অ্যানোফিলিস জাতীয় মশার পেটে ম্যালেরিয়া জীবাণুর সন্ধান পান। যে বিশেষ দিনটিতে তিনি এই আবিষ্কার করেন সেদিন তারিখ ছিল ২০শে আগস্ট ১৮৯৫ সাল। এই তারিখটিকে "মশক-দিবস" বলে অভিহিত করা হয় এবং লণ্ডন ট্রপিকাল স্কুলে দিনটিকে স্মরণ করে বিশেষ সব অনুষ্ঠান হয়। পরে কলকাতায় রোনাল্ড রস্ চড়ুই পাখির উপর নানা প্রকার পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে, মশা ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণুর বাহক এবং মশার দংশনে ম্যালেরিয়া হয়। কিন্তু মশার দংশনে মানুষের ম্যালেরিয়া জ্বর হয় এ তথ্য রস্ আবিষ্কার করবার জন্য আর অগ্রসর হননি। সে তথ্য আবিষ্কার করলেন ইটালীর ব্যাতিস্তা গ্রাস্‌সি।

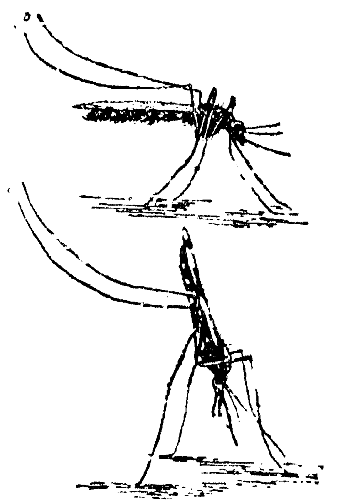
উত্তর ইটালিতে রোভেলাস্কা নামে ছোট একটি গ্রামে গ্রাস্‌সি জন্মগ্রহণ করেন।

মশা নিয়ে এলেন এবং সেই রাত্রেই সেই মশাগুলি সোলার দেহের উপর ছেড়ে দেওয়া হ'ল। ঠিক দশ দিন পরে খুব শীত করে' কম্প দিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে সোলার খুব জ্বর এলো এবং সে জ্বর ম্যালেরিয়া। রক্ত পরীক্ষা করে' তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

এরপর গ্রাস্‌সি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করেছে এই রকম মেয়ে অ্যানোফিলিস মশা ধরে এনে ম্যালেরিয়া জ্বর হয়নি এই রকম ব্যক্তিদের দেহে সেই সব মশাদের প্রয়োগ করে ম্যালেরিয়া জ্বর হয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলেন। ঠিক এই সময় রোনাল্ড রসের অনুরূপ আবিষ্কারের কথা ইটালিতে পৌঁছুল এবং গ্রাস্‌সিও নিঃসন্দেহ হলেন। কিন্তু নোবেল পুরস্কার রোনাল্ড রসের ভাগ্যে জুটেছিল তার সঙ্গে নাইট উপাধি। গ্রাস্‌সির ভাগ্যে কি জুটেছিল জানা যায় নি। তবে গ্রাস্‌সি শুধু ম্যালেরিয়ার কারণ ও বিশেষ মশাটি আবিষ্কার করে ক্ষান্ত হননি; কি করে' এই মশাটিকে দূরে রাখতে হয় এবং দূরে রাখলে ম্যালেরিয়া হয় না অথচ কামড়ালে ম্যালেরিয়া হয় এ সমস্তই তিনি হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

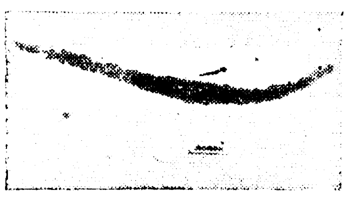
মানুষের ম্যালেরিয়া জ্বর কি করে' আসে এর সঙ্গে আমরা অতি পরিচিত। দারুণ মাথার যন্ত্রণা, ততোধিক শীত, দেহের ঘণ্টায় ঘণ্টায় উত্তাপ বৃদ্ধি তারপর জ্বর মগ্ন হওয়ার সময়ে জলস্রোতের ন্যায় ঘাম নির্গমন ও ভীষণ অবসাদ এ আর নতুন করে কিই-বা বলবার আছে! প্লাসমোডিয়াম নামক এককোষী (Protozoa) প্রাণী হ'ল ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু। চার রকম জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেছে; প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক্স, প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি, প্লাসমোডিয়াম ওভেল ও প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম। এই জীবাণুগুলি মানুষের দেহে পাওয়া যায়; অন্য জীবের ম্যালেরিয়া জীবাণুর আলাদা নাম যেমন পাখির ম্যালেরিয়া জীবাণুর নাম প্রোটিওসোমা। এই চার শ্রেণী জীবাণুর মধ্যে শেষ শ্রেণীটিই ভীষণ এবং সেইজন্যই বোধ হয় আমাদের মতো গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে এরই প্রাচুর্য বেশী। কৌতূহলের বিষয় এই যে, মানুষ এবং বাঁদরের দৈহিক, আঙ্গিক এবং আন্ত্রিক অনেক মিল থাকা সত্ত্বেও মানুষের ম্যালেরিয়া বাঁদরের দেহে সংক্রমিত করা যায় না অথচ মশা এবং মানুষের মধ্যে সব কিছুই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারই শরীরে মানুষের ম্যালেরিয়া জীবাণু বৃদ্ধিলাভ করে।

ম্যালেরিয়া জ্বর ঠিক নিয়মিত একদিন অন্তর, দু'দিন অন্তর অথবা তিনদিন অন্তর আসে যার জন্যে বিভিন্ন শ্রেণীর জীবাণুরা দায়ী। ভাইভাক্স, ওভেল ও ফ্যালসিপেরামের আক্রমণে প্রতি তৃতীয় দিনে অথবা আটচল্লিশ ঘণ্টা অন্তর জ্বর আসে, একে বলা হয় টার্শিয়ান ম্যালেরিয়া, বাঙলা করলে মানে হয় ত্র্যাহিক জ্বর যে জ্বর প্রতি তৃতীয় দিনে হয়। ওভেল এবং ভাইভাক্স এরও আক্রমণে প্রতি তৃতীয় দিনে যে জ্বর হয় তাকে বলা হয় বিনাইন



উপরে—কিউলের মশার বসবার রীতি। নীচে—অ্যানোফিলিস মশার বসবার রীতি।

টার্শিয়ান অর্থাৎ কিছু কম তেজ, কিন্তু একবার ধরলে সহজে ছাড়তে চায় না। এই জাতীয় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা যায় নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে যেমন ধরুন ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইত্যাদি। ম্যালিগন্যান্ট টার্শিয়ান হয় কেবলমাত্র ফ্যালসিপেরামের আক্রমণে এবং নাম থেকেই প্রকাশ যে, ইনি খুব তেজী এবং সব থেকে মারাত্মক। আমাদের দেশেই এঁর প্রকোপ। প্রতি চতুর্থ দিনে অর্থাৎ বাহাত্তর



ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে তোলা ম্যালেরিয়ার বীজাণুর রেণু (spore)

ঘণ্টা অন্তরও ম্যালেরিয়ার আক্রমণে জ্বর হয় তার নাম কোয়ার্টান ম্যালেরিয়া। আর অবিরাম অথচ বেশী যে জ্বর হয় তার নাম কোটিডিয়ান, হয় মিশ্রিত জীবাণুদের সংক্রমণের ফলে, এইতেই মৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষা অধিক। তবে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রারম্ভে অনেক সময় জ্বর ছাড়তে দেরী হয় কারণ তখনও জীবাণুগুলি শরীরে প্রবেশ করে তাদের নিয়মিত জীবনযাত্রা আরম্ভ করতে পারেনি। একবার তাদের শৃঙ্খলা আরম্ভ হয়ে গেলে তখন জ্বরেরও শৃঙ্খলা আরম্ভ হয় ও নিয়মিত আসা যাওয়া আরম্ভ হয়।

মানুষের রক্তে ও মশার পেটে ম্যালেরিয়ার জীবাণু জীবন অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। মশার পেটে সে কাটায় তার যৌন জীবন, যেখানে হয় তার প্রজনন আর মানুষের রক্তে তার কাটে অ-যৌন জীবন। অ্যানোফিলিস মশা আমাদের ঠিক দংশন করে না, সে তার লম্বা আর ধারালো শুঁড় আমাদের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য রক্তপান করা কিন্তু সেইসঙ্গে আমাদের রক্তের লাল কণিকার সঙ্গে মিশে যায় তার লালা, যে লালার সঙ্গে আসে ম্যালেরিয়া জীবাণুর রেণু (Shore) অবশ্য ধরে নিতে হবে যে, মশাটি পূর্বে কোনো একজন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্তপান করেছে। ম্যালেরিয়া জীবাণুর রেণুটি লাল রক্ত কণিকায় প্রবেশ করে' বেশ একটি পাথর বসানো আংটির (Signet ring) আকার ধারণ করে। ক্রমে আংটির আকার মিলিয়ে যেয়ে সব জিনিসটা খানিকটা চ্যাপ্টা পোকার মতো (অ্যামিবার ন্যায়) আকার প্রাপ্ত হয় (Schizont) কিন্তু এই আকারও বেশীক্ষণ থাকে না। এইরূপ আকার ভেঙে যেয়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে যায় ও ইতিমধ্যে তারা রক্ত কণিকার ভিতর যা থাকে সব খেয়ে ফেলে, ফলে কণিকাটি ফেটে যায় ও টুকরোগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে ও সেইসঙ্গে কিছু বিষাক্ত রসও নির্গত হয়। এই সময়েই রোগীর কাঁপুনি আরম্ভ হয়ে জ্বর আসে। ঐ ছড়িয়ে পড়া টুকরোগুলির মধ্যে কতকগুলি আবার নতুন লাল রক্তকণিকায় প্রবেশ করে এবং আগের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং রোগীরও পুনরায় জ্বর আসে। আর কতকগুলি টুকরো, স্ত্রী ও পুরুষ যৌন কোষ তৈয়ারী করে। ফ্যালসিপেরামের যৌন কোষগুলি অর্ধচন্দ্রাকার দেখতে হয়। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী কোষগুলি বেশী লম্বা হয় ও উভয় প্রান্ত বেশী ছুঁচলো হয়। মানুষের রক্তে ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবন সম্পূর্ণ হ'ল।

এইবার হয়ত কোনো একটি অ্যানোফিলিস মশা সেই ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত রোগীর রক্তপান করবার সময় ম্যালেরিয়ার জীবাণুর সঙ্গে সেই স্ত্রী ও পুরুষ যৌন-কোষও নিজের পেটে টেনে আনে। মশার পাকস্থলীতে এই যৌন কোষ দুটি ছাড়া আর সবই হজম হয়ে যায়। মশার পেটে এসে পুরুষ যৌনকোষ চারটি থেকে আটটি সরু সরু চাবুকের মতো শুঁড় বার করে' বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে এবং তাদের মধ্যে একটি শুঁড় এসে স্ত্রী-যৌন কোষের সঙ্গে মিশলেই হয়

গর্ভাধান (Fertilization)। এইবার এই নিষিক্ত কোষ মশার পাকস্থলীর প্রান্তে এসে একটি গোলাকার কোষের মধ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পূর্ণতা লাভ করে' ফেটে যায় ও পাকস্থলী ভেদ করে অনেক রেণু নির্গত হয় যারা মশার লালাগ্রন্থিতে চলে যায় ও পরবর্তী শিকারের জন্য প্রতীক্ষা করে। এই হ'ল ম্যালেরিয়া জীবাণুর পরজীবিরূপে জীবন কাহিনী।

যদি ম্যালেরিয়া জীবাণুর এই কার্য অপ্রতিহত এবং বাধাবন্ধনহীনভাবে চলতে থাকত তাহলে ত' তারা কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত লাল রক্তকণিকা খেয়ে ফেলত এবং ম্যালেরিয়া রোগীকে তার চামড়া লাগানো হাড় ক'খানা নিয়েও চলতে হ'তনা। কিন্তু এই জীবাণুদের বিরুদ্ধে কতকগুলি শ্বেত কণিকা লড়াই করে। এই কণিকাগুলি যকৃত ও প্লীহাতে থাকে, তারা ম্যালেরিয়া জীবাণুর রেণু এবং সেই সমস্ত লাল রক্ত-কণিকা যারা তখনও জীবাণুর আক্রমণে ফেটে যায়নি তাদের যকৃত ও প্লীহাতে এনে জড়ো করে এবং তাদের ধ্বংস করে। এই যুদ্ধের ফলে যকৃত ও প্লীহা ম্যালেরিয়া রোগীর এত বড়ো। শ্বেত-কণিকারা যুদ্ধে জিততে পারলে যকৃত ও প্লীহা আবার ছোট হয়ে যায়।

ম্যালেরিয়ার ঔষধ বলতে আমরা নাম জানি কুইনিন, অ্যাটেব্রিন ও প্লাসমোচিন অথবা প্লাসমোকুইনের এই তিনটির। ম্যালেরিয়ার আদর্শ ওষুধ বলতে কিছুই এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। ম্যালেরিয়া জীবাণু রক্তকণিকায় প্রবেশ করা থেকে আরম্ভ করে তার যৌন-কোষ নির্মাণ—এই অবস্থার মধ্যে কুইনিন অথবা আটেব্রিন খুব ভালো কাজ দেয় এবং যৌন-কোষ নির্মাণ হয়ে গেলে তখন প্লাসমোচিন খাওয়ালে কাজ হয় কারণ প্লাসমোচিন ঐ কোষগুলিকে ধ্বংস করতে পারে। অতএব কুইনিন অথবা আটেব্রিনের সঙ্গে প্লাস-মোচিন একত্রে খাওয়ালে সব থেকে ভালো কাজ হ'তে পারে বলে' আশা করা যায়।

যে কোনো উপায়েই হোক মশা জন্মাতে না দেওয়া এবং আমাদের দেহে দংশন করতে না দেওয়া হ'ল সর্বাপেক্ষা ভালো প্রতিরোধ। মশা ধ্বংস অপেক্ষা মশার শূক কীট (Larva) ধ্বংস করা আরও সুবিধা-জনক। এর জন্য ভালো ওষুধ হ'ল যে সব স্থানে মশা ডিম পাড়ে সে সব স্থানে কেরোসিন জাতীয় তেল ও প্যারিস গ্রীন অথবা নব আবিষ্কৃত কীটঘ্ন ডি-ডি-টির প্রয়োগ। এ ছাড়া দেখা দরকার যে জল যেন কোথাও বদ্ধ হয়ে না থাকে। এ সবই অবশ্য ব্যয়সাপেক্ষ এবং দেশের শাসক সম্প্রদায় ছাড়া জনসাধারণের পক্ষে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়; বিশেষ করে' আমাদের মত অত্যন্ত দরিদ্র দেশে।

মাত্র কয়েক বৎসর আগে ব্রেজিল সরকার কেবলমাত্র প্যারিস গ্রীন ছড়িয়ে সমস্ত দেশ থেকে অ্যানোফিলিস মশা একেবারে তাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমান মহা-যুদ্ধেও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তত্য ম্যালেরিয়াসংকুল দ্বীপগুলি থেকে ডি-ডি-টির সাহায্যে ম্যালেরিয়া তাড়ানো হয়েছে। ডিজেল তেলের সঙ্গে ডি-ডি-টি মিশিয়ে উড়োজাহাজ থেকে সেই তেল-বৃষ্টি করা হ'তো। ফলে সমস্ত মশা ও সেইসঙ্গে মাছিও সব রকমই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শোনা গেছে যে আমাদের দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ডি-ডি-টি প্রয়োগ করে' ম্যালেরিয়া তাড়ানো সম্ভব হয়েছে। প্রতিকার আছে ও সব রকম কিন্তু করে কে, করায় কে?

শোনা যায় আমাদের দেশে যুদ্ধের সুযোগে অনেক ব্যক্তি প্রচুর অর্থোপার্জন করেছেন। তাঁরা যদি তাঁদের সেই উপার্জনের এক অংশ অন্তত নিজ নিজ গ্রামের মশক-কুল ধ্বংস করতে ব্যয় করেন, তাহলে তাঁদের অর্থের শুধুই যে সদ্ব্যয় হবে তা' নয় এক সম্প্রদায়ের হয়ত প্রাণ বাঁচবে। দেখা যাক্!

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

একটি সংস্কৃত বচনে আছে পুরুষের ভাগ্য দেবতারাও জানেন না—মানুষ কোন্ ছার। মিস্টার সাইমণ্ডস "ফ্রেণ্ডস এম্বুলেন্স ইউনিটে" এদেশে আসিয়া বাঙলায় দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য-ব্যবস্থা করিয়া এখন বাঙলা সরকারের সাহায্যদান ও পুনর্গঠন কার্যে "ডেপুটি ডিরেক্টর" হইয়াছেন অর্থাৎ এখন তিনি বাঙলা সরকারের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। দপ্তরে বসিয়া তিনি কিভাবে সাহায্যদান ও পুনর্গঠন কার্য করিতেছেন, তাহা এদেশের লোক জানিবার অধিকারী নহে—তাহাদিগের অর্থে তাঁহাকে যে বেতন প্রদান করা হইতেছে, তাহা দিতে তাহারা বাধ্য।

বাঙলায় সংবাদপত্রে যে আবার দারুণ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কার কথা লিখিত হইতেছে, তাহাতে এই ভূতপূর্ব সেবাব্রতীর ধৈর্যচ্যুতি হইয়াছে এবং তিনি বলিয়াছেন, সংবাদপত্রে যে চিত্র অঙ্কিত করা হইতেছে তাহা অকারণ অধিক কালিমা কলঙ্কিত! ইহাতে আমাদিগের একটি পুরাতন ঘটনা মনে পড়িতেছে। বড়লাট লর্ড মিণ্টো যখন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহকে শাসন পরিষদের সদস্য মনোনীত করিতে চাহেন, তখন যাঁহারা সিংহ মহাশয়কে সেই পদ গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন। চাকরী লইবার পরে সিংহ মহাশয়কে যখন সংবাদপত্রের অধিকার সংকোচক আইন ব্যবস্থাপক সভায় সমর্থন করিতে হয়, তখন তিনি সেই জন্য বক্তৃতা করিতেছিলেন। তখন ভূপেন্দ্রবাবু জনান্তিকে বাঙলায় তাঁহাকে বলিলেন, "করছ কি?" সিংহ মহাশয় বাঙলায় উত্তর দিলেন, "যখন চাকরী স্বীকার করতে বলেছিলে তখন কি মনে ছিল না, চাকরী নিলে এই কাজই করতে হবে?" মিস্টার সাইমণ্ডস এখন চাকরীয়া—চাকরীতে থাকিবার সময় সরকারের নীতির সমর্থন ও পরিচালন করিতেই হইবে। তিনি সংবাদপত্রে প্রচারিত সংবাদ "অতিরঞ্জিত ও বিকৃত" বলিতেও ত্রুটি করেন নাই।

যখন ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে মরিতেছিল, তখন ভারত সরকারের একজন কর্মচারী বলিয়াছিলেন, বাঙলার দুর্ভিক্ষে অকারণ গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। তিনি "ওভার ড্রামাটাইজড" শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কাজেই মিস্টার সাইমণ্ডসের কথায় আমরা বিন্দুমাত্র বিস্ময়ানুভব করি নাই।

এ দেশের—এই পরাধীন দেশের সংবাদপত্র সম্বন্ধে তিনি হয়ত ভারতরক্ষা আইনের নিয়ম প্রযুক্ত করিয়া কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন; কিন্ত বিলাতেও যে অনুরূপ আশঙ্কার সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, সে সম্বন্ধে কি তিনি "সেন্সরের" ব্যবস্থা করিতে পারিবেন? বিলাতের 'অবজারভার' পত্র রক্ষণশীল ও সাম্রাজ্যবাদীদিগের সমর্থক। সেই পত্রের ৭ই অক্টোবরের সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার মধ্যভাগে ঐ পত্রের দিল্লীস্থ সংবাদদাতার প্রেরিত যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মর্ম—

বাঙলা ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের বাসভূমি। তথায় পুনরায় দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা। বাঙলার যে সকল অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক ধান্য উৎপন্ন হয়, সেই সকলের অনেক স্থানে এবার শস্যহানি হওয়ায় হৈমন্তিক ধান্যের ফলন কম হইবে। দুর্ভিক্ষের পূর্বে যে শস্য সঞ্চয় হয়, তাহা আরম্ভ হইয়াছে। বাংলা সরকার কি করিবেন তাহা এত গোপন রাখিতেছেন যে, লোক অধীর হইয়া উঠিতেছে। সরকার যদি দেশের লোককে বিশ্বাস করিয়া প্রকৃত অবস্থা জানান, তবে ভাল হয়। সঞ্চিত শস্যের পরিমাণ জানিতে না পারিলে—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে—লোকের পক্ষে স্বস্তি অনুভব করা দুঃসাধ্য।

এই সংবাদদাতা দেশের রাজনীতিক কর্মীদিগকে সরকারবিদ্বেষিতা হেতু উক্তি করার অভিযোগে অভিযুক্ত করিতেছেন এবং সেইজন্য আমাদিগের আশঙ্কা হয়, আবার সংবাদপত্র প্রকাশ সকলকে "সায়েস্তা" করিয়া সমালোচনা বন্ধ করিবার চেষ্টাও হইতে পারে।

কিন্তু সরকারের ভিন্ন ভিন্ন কর্মচারী যে ভাবে পরস্পর বিরোধী উক্তি করিতেছেন, তাহাতে দেশের লোকের আশঙ্কা যদি আতঙ্কে পরিণতি লাভ করে, তবে তাহাতে কি বিশেষ বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিবে?

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের তৎকালীন খাদ্য সদস্য স্যার মহম্মদ আজিজুল হক যে বলিয়াছিলেন কয় দিনেই চাউলের মূল্য হ্রাস পাইবে তাহা সত্য প্রতিপন্ন হয় নাই। হয়ত তাহা "প্রচার কার্য" ব্যতীত আর কিছুই নহে। স্যার মহম্মদ বাঙালী। এবার আর একজন বাঙালী—ভারত সরকারের খাদ্য বিভাগের সেক্রেটারী মিস্টার বিনয়রঞ্জন সেন গত ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায় বলিয়াছিলেন:—

তিনি বাঙলা সরকারের কর্মচারীদিগের সহিত আলোচনা করিয়া জানিয়াছেন, ঐ কর্মচারীদিগের বিশ্বাস—সাধারণ সময়ে ফসল যেরূপ হয়, এবার মাত্র ধান্যের ফসল তাহার শতকরা ৭০ ভাগ ও হৈমন্তিক ধান্যের ফলন শতকরা ৮০ ভাগ হইবে। তবে অক্টোবর মাসে সুবর্ষণ প্রয়োজন।

অক্টোবর মাসে যদি পর্যাপ্ত বর্ষণ না হয়, তবে কি হইবে তাহা তিনি বলেন নাই।

সে যাহাই হউক, ২৬শে সেপ্টেম্বর তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, ৭ দিন পরে বাঙলা সরকারের "ডিরেক্টর জেনারেল অব ফুড" মিস্টার হার্টলী তাহা বলিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

এবার ধান্যের ফলন সাধারণ সময়ের ফলনের সমান—এমন কি গত বৎসরের ফলনের মতও হইবে না।

যদিও মিস্টার সেন ফলনের হিসাব দিয়াছেন এবং কথায় বলে "হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না"—তথাপি মিস্টার হার্টলী বলিতেছেন—

বর্তমান সময়ে কাহারও পক্ষে (মিস্টার সেন তাঁহার লক্ষ্য কিনা জানি না) ফসলের ফলনের নির্ভরযোগ্য হিসাব দেওয়া অসম্ভব। কারণ বৃষ্টির অভাবে পশ্চিম বঙ্গে ধান্যের চারা রোপণ এক মাস বিলম্বে হইতেছে এবং বিলম্বে রোপিত এই ধানের ফলন বৃষ্টির উপর নির্ভর করিবে। যদি পর্যাপ্ত বর্ষণ হয়, তবে ফলন মন্দ হইবে না।

দেখা যাইতেছে, মিস্টার সেন হিসাব দিয়াছেন, আর মিস্টার হার্টলী বলিতেছেন, নির্ভরযোগ্য হিসাব দেওয়া অসম্ভব। অর্থাৎ মিস্টার হার্টলীর মত এই যে, এখন যাহারা হিসাব দিবে তাহাদিগের সম্বন্ধে মনে হইবে যে শ্রেণীর লোক—"rush in where angels fear to tread" তাহারা সেই শ্রেণীর।

যদি নির্ভরযোগ্য হিসাব দেওয়া অসম্ভব হয়, তবে কি অনাবৃষ্টিহেতু ও বন্যায় শস্যহানিতে লোকের আতঙ্ক অকারণ ও নিন্দনীয় বলা যায়?

এ দেশে যে বড়লাট আপনার ব্যবস্থার নৈপুণ্যে ২ কোটি লোক যে দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়াছিল, তাহাতে অনশনে প্রাণহানি হইতে দেন নাই সেই লর্ড নর্থব্রুক বাঙলায় (বিহারে ও উত্তর বঙ্গে) দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা বুঝিয়াই ভারতসচিবকে যে "ডেসপাচ" পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—

এ সত্য প্রমাণিত হইয়াছে যে সময়

থাকিতে দুর্ভিক্ষ নিবারণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

তিনি তাহাই করিয়াছিলেন এবং করিয়াছিলেন বলিয়াই অনশনে প্রাণহানি নিবারণ করিতে পারিয়াছিলেন।

আর স্যার জন হার্বার্ট ও তাঁহার মুসলিম লীগ সচিবসঙ্ঘ তাহা না করিয়া মিথ্যা প্রচারকার্য পরিচালিত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীর অনশনে মৃত্যুর কারণ হইয়াছিলেন। সে পাপের ফল কি তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে না?

এবার যদি এ দেশের সাংবাদিকগণেরা সময়ে সে বিষয়ে সরকারকে সতর্ক করিয়া কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দেন, তবে তাহার জন্য তাঁহারা কি সরকারেরও কৃতজ্ঞতার পাত্র নহেন?

মেদিনীপুর জিলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার ১০ ও ১৫নং ইউনিয়ন হইতে সংবাদ প্রেরিত হইয়াছে—

ঐ ইউনিয়নদ্বয়ের লোকসংখ্যা ৫ হাজার। সাধারণত ঐ দুইটি ইউনিয়নে ৩ হাজার একর জমিতে চাষ হয়। এই স্থানে যে নদী প্রবাহিত, তাহাতে ১২ মাসই প্রচুর পরিমাণ জল থাকে। ১৯৪২, ১৯৪৩ ও ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ এই ৩ বৎসর এই স্থানে উপযুক্তরূপ চাষ হয় নাই। এ বৎসর বৃষ্টির অপ্রাচুর্য হেতু এই স্থানে চাষ বন্ধ হইয়াছে। ইতোমধ্যেই প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে। আমরা পাম্পে জল তুলিয়া জমিতে রবি-শস্যের চাষ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। কিন্তু কিরূপ পাম্পের প্রয়োজন এবং নদীতে কোথায় পাম্প বসাইতে হইবে, তাহা না জানায় আমরা ২৭শে জুলাই মহকুমা হাকিমের নিকট, জিলা কৃষি কর্মচারীর নিকট ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করি। তাঁহারা অনুসন্ধান পর্যন্ত করিলেন না! আবেদনে আমরা এমন কথাও লিখিয়াছিলাম যে, কৃষকরা জলের জন্য কর দিতেও প্রস্তুত। আমরা কৃষি কর্মচারীর সহিত সাক্ষাতও করিয়াছিলাম। কিন্তু কেহই আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে কৃষি-কর্মচারী পর্যন্ত কিরূপে শাস্তিলাভের উপযুক্ত? তাঁহাদিগের ব্যবহারেই কি সরকারের কর্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায় না?

মিস্টার হার্টলী বলিয়াছেন, বর্ধমান জিলার কালনায় যে কিছুদিন চাউলের অভাব ঘটিয়াছে, ইহা সত্য নহে। কারণ, সরকারের গুদামে ১৬ হাজার মণ চাউল মজুদ ছিল এবং পরিবর্তিত ব্যবস্থায় চাউল বিক্রয় করাও হইতেছিল।

সরকারী গুদামে চাউল মজুদ থাকিতেও যে লোক চাউল পায় না, তাহার অনেক প্রমাণ আছে এবং নানা স্থানে যে সরকারী গুদামে ও মুক্ত স্থানে চাউল পচিয়াছে, তাহাও সরকারী ব্যবস্থার পক্ষে প্রশংসনীয় নহে।

কালনার কথাই ধরা যাউক। গত ১লা অক্টোবর তথা হইতে 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—

গত মাসের তৃতীয় সপ্তাহে কালনায় চাউলের সরবরাহ-অবস্থা আরও শোচনীয় হয় এবং লোকের বিশেষ কষ্ট হয়। সরকার গুদাম হইতে চাউল ছাড়িয়াছেন এবং পরিমাণ মাত্র তিন হাজার মণ। শহরের তিনটি ওয়ার্ডে প্রতি পরিবারে সপ্তাহে চার সের চাউল দেওয়া হইতেছে।

সপ্তাহে প্রতি পরিবারে চার সের চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা কি উপহাস মাত্র নহে? ফলে প্রায় এক সহস্র লোক মহকুমা হাকিমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অভাব জ্ঞাপন করিতে যায়। কিন্তু হাকিম দেখা দেন নাই।

মিস্টার হার্টলী বলিয়াছেন, সরকারী গুদামে ২৬ হাজার মণ চাউল মজুদ আছে। যদি তাহাই হয়, তবে তাহাতে লোকের কি উপকার হইয়াছে? ইহার পরে ঐ চাউল বিকৃতাবস্থায় জলায় ফেলিয়া দিতে হইবে নাত?

ব্যবস্থার দোষই যে অনেক স্থলে অভাবের কারণ, তাহা বিশেষভাবেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এখনও যাহা হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট সরকারী কর্মচারীরা পাঠ করিয়াছেন কি না সন্দেহ—পাঠ করিয়া ত্রুটি সংশোধন করা ত পরের কথা।

আজকাল আমরা আর "অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন" করার কথা শুনিতে পাই না। বোধ হয়, সেই বাবদে অর্থ নিঃশব্দে ব্যয়িত হইতেছে। নহে ত সরকারী কর্মচারীরাও আর সেকথা বলিতে লজ্জানুভব করেন। এখনও সরকারের গুদামে যেভাবে শস্য রক্ষিত হইতেছে, তাহাতে তাহা বিকৃত হওয়া অনিবার্য।

এখনও বাঙলা সরকার এজেন্টের মারফতে ধান ও চাউল ক্রয় করিতেছেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে আমরা জানি—দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে—বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ প্রভৃতিতে এজেন্টের মারফতে সরকারের শস্য ক্রয় অনিষ্টকর ব্যবস্থা প্রতিপন্ন হওয়ায় ত্যক্ত হইয়াছে এবং সেই রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরেও বাঙলার লীগ. সচিব সঙ্ঘ এজেন্টের মারফতেই শস্য ক্রয় করিয়াছেন। বর্ধমানেও আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি।

মিস্টার কেসী আবার—হয়ত আজকালের জন্য—গভর্নররূপে বাঙলায় আসিতেছেন; তিনি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত সেবাব্রতিগণ বাঙলায় দুর্দশার কথা বলায় "উষ্মা" প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে ডক্টর শ্রীযুত বিধানচন্দ্র রায়ের মত লোকেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল এবং তিনি বলিয়াছিলেন—গভর্নর যে সকল স্থান পরিদর্শন করিতে পান, সে সকলে সুব্যবস্থা করিয়া তাহাই দেখান হয়।

বাঙলায় সচিব সঙ্ঘ গঠনেও সরকার সম্মত হন নাই। 'অবজারভার' লিয়াছেন—লোককে প্রকৃত অবস্থা জানাইলে ভাল হয়। কিন্তু তাহা কি স্বৈরশাসনশীল সরকার করিবেন? তাঁহারা যে এ পর্যন্ত সেরূপ মনোভাব দেখান নাই, তাহা আমরা অনায়াসে বলিতে পারি। ভবিষ্যতে যে তাঁহারা তাহা করিবেন, তাহারই বা আশা কোথায়?

সরকারী ব্যবস্থার বহু ত্রুটির কারণ,—সে সকল জনগণের সহিত পরামর্শ করিয়া করা হয় নাই। লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে সচিব সঙ্ঘের ব্যবস্থার ত্রুটি লক্ষ লক্ষ নরনারীর অনাহারে মৃত্যুর কারণ, সেই সচিব সঙ্ঘকেও বাঙলার গভর্নর বিদায় দেন নাই—ব্যবস্থা পরিষদের ভোটেই তাহার পতন হইয়াছিল। অর্থাৎ সেই সচিবগণের সচিবের প্রাথমিক কর্তব্য পালনে অযোগ্যতাও সরকার অবজ্ঞা করিয়াছিলেন।

বাঙলার লোক—পূর্বাহ্নে আশঙ্কার বিষয় ব্যক্ত করার জন্য বাঙলার সাংবাদিক ও কর্মীদিগের নিকট কৃতজ্ঞ! সরকারেরও তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া সংগত।

আমরা সময় থাকিতে সরকারকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, তাঁহারা প্রস্তুত হউন। তাঁহারা যদি লোকের সাহায্য ও সহযোগ অবহেলা না করিয়া তাহা লাভ করিতে আগ্রহের পরিচয় প্রদান করেন, তবে সে সাহায্য ও সহযোগ তাঁহারা লাভ করিতে পারিবেন। লোক যাহাতে অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, তাহা যে সকল সভ্য সরকারের দেখা কর্তব্য, সে বিষয়ে দ্বিমত নাই।

পেত্যাঁর শেষ ক'টি দিন

পেঁত্যার বিচারের খবর কিছু কিছু হয়তো পড়েছেন—কিন্তু তার শেষ অধ্যায়টা কি পরিণতি লাভ করলো তা নিশ্চয় জানেন না? শুনুন তবে—গত ১৪ই আগস্ট রাত্রিতে "প্যালে দ্য জাস্তিস্" বিচারালয়ের সংলগ্ন ছোট্ট 'সেল'টিতে শ্রান্ত, ক্লান্ত মার্শাল আঁরে ফিলিপ্পে পেঁত্যা তাঁর মার্শালের বেশ পরিত্যাগ করে শয্যা নিলেন। তারপর সাত ঘণ্টা ধরে ঘুমুলেন—অচৈতন্যের মত। পেঁত্যা যখন ৭ ঘণ্টার ঘুমে নিদ্রিত—তখন ২৪ জন জুরী বিচারালয়ের অন্য প্রকোষ্ঠে রাত জেগে পেঁত্যার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তালিকা পরীক্ষায় ব্যস্ত রইলেন। ভোর চারটের সময় জুরীরা যখন এজলাসে ফিরে এলেন, তখন মাত্র আর একটি-



মার্শাল পেঁত্যা

বারের জন্য ভিসি-প্রধান পেঁত্যা মার্শালের পোষাক পরে সেখানে দেখা দিলেন। তাঁর তুষার-শুভ্র গোঁফজোড়া ও মাথার পাকা চুলগুলি তখন চক্‌চক্‌ করে উঠলো। পেঁত্যাকে ধরে নিয়ে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারটিতে বসিয়ে দেওয়া হলো। প্রধান বিচারপতি পিয়ারে 'মনজিবু'—উঁচু গলায় গড়্‌গড়িয়ে পড়ে গেলেন—পেঁত্যার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি। পেঁত্যা উদাস নয়নে সব শুনে গেলেন। শেষে 'মনজিবু'—বিচারের রায় ঘোষণা করলেন—"শত্রুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অপরাধী।" পেঁত্যা বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন—অর্ধ-ঘুমন্ত অবস্থায় ধীর পদক্ষেপে বিচারালয়ের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এরপরে ঘোষণা করা হোল- "পেঁত্যাকে সমস্ত পদমর্যাদা ও ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত করা হোল—দেওয়া হলো প্রাণদণ্ড।" কিন্তু বিচারকরা জাতীয় মনোভাবের কথা বিবেচনা করে ও পেঁত্যা কোন দয়া প্রার্থনা করবে না এই কথা ভেবেই সুপারিশ করলেন—যে মার্শালের ৮৯ বছর বয়সের জন্যই তাঁর প্রাণদণ্ডের শাস্তিকে কাজে পরিণত না করাই উচিত। যাক বিচার পর্বের শেষেই পিরেনিজের 'পোর্তালেত্' দুর্গের নির্জন কারাকক্ষে পেঁত্যাকে নিয়ে যাওয়া হলো। জেনারেল চার্ল দ্য গালের আদেশের অপেক্ষায় তিনি সেখানে দিন গুনতে লাগলেন। দু'দিন পরে খবর এল জেনারেল দ্য গাল পেঁত্যার প্রাণদণ্ড রেহাই দিয়ে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিয়েছেন। এখন থেকে তাঁকে মার্শালের পোষাক ত্যাগ করে সাধারণ পোষাক পরে নির্জন কারায় জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাতে হবে। তবে তাঁর পত্নী তাঁর সঙ্গে থাকতে পারবেন। শোনা যাচ্ছে—সম্ভবতঃ সেণ্ট মার্গারেট দ্বীপের সেই নির্জন দুর্গে বন্দী করে রাখা হবে—যেখানে "ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক"কে বন্দী করে রাখা হয়েছিল—যেখানে 'ফ্রাঁসো-প্রুশিয়ান' যুদ্ধের বিপ্লবী নায়ক মার্শাল ফাঁসোই বাজাইনকে ৭০ বছর আগে নির্বাসিত করা হয়েছিল—সেখানেই কাটবে পেঁত্যার শেষ কটি দিন।

কাহিনী খবর ভবঘুরে

জাপ সম্রাটের ঘোষণা

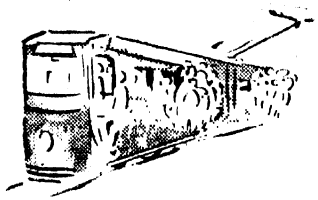
জাপানের ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা আজ কারুর অজানা নেই। কিন্তু জাপ-সম্রাট এই বিপর্যয়ের কথা ঘোষণা করে তাঁর মন্ত্রিসভা বা 'ডায়েটে' যে সব কথা বলেছেন—তা নিশ্চয়ই জানতে পারেন নি। আমেরিকার এক খবরে প্রকাশ, এই বিপর্যয়ের কথা সম্রাট হিরোহিতো যেদিন ঘোষণা করলেন সেদিন তিনি দেহরক্ষি-পরিবৃত হয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গাড়ী চড়ে ডায়েট সভায় উপস্থিত হলেন। সেখানে হাউস অব্ পীয়রসের লাল আর সোনালী রঙের সিংহাসনে বসে রাষ্ট্র পরিষদের মিলিত অধিবেশনে সকল সদস্য ও মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে এক অভিভাষণ দিলেন। তখন তাঁর দু'চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছিল—তাঁর ঠোঁট কাঁপছিল—যখন তিনি পরাজয় বা আত্মসমর্পণের কোন উল্লেখ না করে বললেন—"বিরোধীতার অবসান......যুদ্ধ বিরতির... অনন্যসাধারণ অবলম্বন।" প্রজাদের প্রতি তাঁর আদেশ হলো—"শান্ত থাকো—আত্মসংযম বজায় রাখো"—ধৈর্য ও দূরদৃষ্টির সদ্ব্যবহার করো...... পৃথিবীর লোকের আস্থা অর্জন করো...... জাপানের জাতীয় নীতির অন্তর্নিহিত গৌরবকে মূর্ত করো।" জাপ-সম্রাটের ঘোষণা—সম্রাটোচিত তাতে সন্দেহ নেই! কিন্তু গণতান্ত্রিক জাতিগুলি কি রাজতান্ত্রিক উক্তিকে গ্রাহ্য করবে?

মলোটভের বড় অন্যায়

সম্প্রতি পৃথিবীতে পাঁচটি প্রধান রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবরা লণ্ডনে এসে মিলিত হয়ে দ্বিতীয় যুদ্ধের সন্ধি সর্ত ঠিক করছিলেন। এমন সময় আমেরিকার প্রতিনিধি বার্নস, ইংলণ্ডের বেভিন আর রুশিয়ার মলোটভের মধ্যে মত-বিরোধের ফলে সব ভেস্তে গিয়েছে যে সে খবর কাগজেই পড়েছেন। কাজেই সে কথা না বলে বলি কেমন তোড়জোড়টা হয়েছিল এই সম্মেলনের। সেণ্ট জেমস্ প্যালেসের ঠিক পশ্চিম দিকে একশো বছরের জরাজীর্ণ বোমা-খাওয়া—লাংক্যাস্টার হাউসেই এই সভা বসেছিল। এই রাজপ্রাসাদেই ডিউক অব সাদারল্যাণ্ড বাস করতেন। যাই হোক সচিবদের সম্মেলনের আগেই ছুতোর আর মিস্ত্রিরা লেগে পড়ে ভাঙাচোরা রাজপ্রাসাদটাকে একেবারে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে ফেললে, গালিচা কার্পেট বিছানো হলো—পর্দা পতাকা ঝোলানো হলো—কত সাজানো হলো। এই অধিবেশনের জন্য ১৪ ফুট বেড়ের এক গোল টেবিলই তৈরী করানো হলো। খুঁটিনাটি কত কি বলবো! এক বৈদেশিক সচিবের এক এক ঘরে আরামে থাকার বন্দোবস্ত। মিষ্টার মলোটভের বরাতেই সবচেয়ে ভাল ঘর জুটলো—বড় বড় আয়নায় সে ঘরের দেওয়াল মোড়া, সোনালী রূপালী নক্সার কাজ দেওয়ালের মাথায় মাথায়—এই ঘরে সব সেরা আসবাবপত্র—এই ঘরটাই সাদারল্যাণ্ড ডিউক-পত্নীর বিলাস-কক্ষ। মলোটভের খাতিরই হলো এই সম্মেলনে বেশী! কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে সব ভেস্তে দিয়ে গেলেন—এটা কি তাঁর অন্যায় নয়?



দেহরক্ষী পরিবৃত জাপ সম্রাট হিরোহিতো

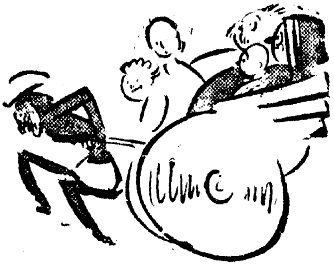


ট্রাম: ভাড়া সস্তা, ভীড় বেশী।



বাস: ভিতরে গরম—বাইরেই আরাম।

পূজায় পাঁচমিশালী



রিক্সা: সোজা চললে ভালো—উল্টোলেই বিপদ।



হাঁটাপথ: হেঁটে না গিয়ে গড়ালেই নিরাপদ

পূজার সওদা



সমস্তই কণ্ট্রোলড : শারদীয়া সংখ্যা আনকণ্ট্রোলড্



প্রতিমা দর্শনে নিরন্ন বাহিনী



লজ্জা : লজ্জাবতী এ'রাই

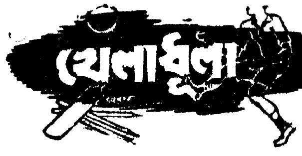


আনন্দ : এ্যাণ্টি ক্লাইম্যাক্স!

ফুটবল

বোম্বাইর রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলার এলবার্ট ডেভিড দল বিজয়ীর সম্মান লাভ করিতে পারিল না ইহা খুবেই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। তবে কি অবস্থার মধ্যে ফাইনালে পরাজয় ঘটিয়াছে তাহাও স্মরণ করা উচিত। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের খেলোয়াড়গণ ক্রীড়ানৈপুণ্য অপেক্ষা দৈহিক শক্তির অধিক প্রয়োগ করে। এমন কি অনেক সময় বাঙ্গলার খেলোয়াড়গণকে মারাত্মক ফাউল করে। কিন্তু খেলার পরিচালক তাহা উপেক্ষা করে। ইহা ছাড়া আরও আশ্চর্যের বিষয় যে, বাঙ্গলার দল গোল করিবার জন্য উপক্রম করিলেই পরিচালক অযথা অফ সাইডের নির্দেশ দেন। ইহার প্রতিবাদ করিয়া যখন কোন ফল হয় না তখন বাঙ্গলার খেলোয়াড়গণ কোনরূপে খেলিয়া পরাজয় স্বীকার করেন। বোম্বাইর মাঠে যে অভিজ্ঞতা বাঙ্গলার খেলোয়াড়গণ লাভ করিলেন আশা করি আগামী বৎসরে অথবা ভবিষ্যতে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার পূর্বে বাঙ্গলার যোগদানকারী দলসমূহের পরিচালকগণ উপযুক্ত রেফারী বা খেলা পরিচালক সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়া তবে যোগদান করিবেন। যদি তাহা না করেন ভবিষ্যতে পুনরায় এইরূপভাবে তিক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া হতাশ হৃদয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে।

আন্তঃপ্রাদেশিক সন্তোষ মেমোরিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতা এখনও শেষ হয় নাই। ইতিমধ্যে যে কয়েকটি খেলা হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলার আই এফ এ দল ভাল ফলই প্রদর্শন করিয়াছেন। তবে বাঙ্গলার দল শেষ সীমানায় পৌঁছিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না বিজয়ীর সম্মান লাভ করিতেছে ততক্ষণ আমাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত হইবে না। আই এফ এ দল যে সকল খেলোয়াড়গণ লইয়া গঠিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষা ভাল দল করা সম্ভব ছিল না। দলের খেলোয়াড় পরিবর্তন করিয়া দলের শক্তি বৃদ্ধি করিবার যদি চেষ্টা হয় খুবেই অন্যায় করা হইবে। পরবর্তী রাউন্ডে ঐ একই খেলোয়াড় দল লইয়া খেলিলে ফলাফল নৈরাশ্যজনক হইবে না। গত বৎসর এই প্রতিযোগিতার ফাইনালে দিল্লী দলের নিকট বাঙলা দল পরাজয় স্বীকার করিয়া যে গৌরব হারাইয়াছিল এই বৎসর তাহার পুনরুদ্ধার করিতেই হইবে ইহা যেন বাঙলা দলের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের স্মরণ থাকে।



ক্রিকেট

অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস ক্রিকেট দল ভারতে আসিতেছে এই সংবাদ যেদিন প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পর হইতেই দেখা যাইতেছে ভারতের প্রায় সকল প্রাদেশিক ক্রিকেট পরিচালকগণ কিরূপে এই সুযোগে নিজ প্রদেশের ক্রিকেট খেলার সুনাম বৃদ্ধি করা যায় তাহার চিন্তায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা ইতি-মধ্যেই উৎসাহী ক্রিকেট খেলোয়াড়গণকে একত্র করিয়া নিয়মিত অনুশীলনে যোগ-দান করিতে বাধ্য করিতেছেন। কেবল বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণকে এইরূপ কোন ব্যবস্থা করিতে দেখা যাইতেছে না। তাঁহারা অস্ট্রেলিয়া দল আসিলে যে দুইটি খেলা হইবে তাহা দেখিবার জন্য দর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। অনেকের ধারণা বাঙলার পরিচালকগণ এই রীতি অনুসরণ না করিয়া করিবেন কি? তাঁহারা জানেন অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে খেলিবার মত খেলোয়াড় বাঙলা দেশে নাই। অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়গণ ২৪শে অক্টোবর ভারতে পদার্পণ করিবেন এই অল্প সময়ের মধ্যে উৎসাহী খেলোয়াড়গণকে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্যের অধিকারী করা সম্ভব নহে। যদি ইহাই পরিচালকগণের চিন্তাধারা হইয়া থাকে তবে খুবেই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে খেলিবার মত বিশিষ্ট খেলোয়াড়ের বাঙলা দেশে যে অভাব হইয়াছে ইহার জন্য কি তাঁহারাই দায়ী নহেন? উৎসাহী খেলোয়াড়দিগকে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় কখনও উপযুক্ত শিক্ষার সুবিধা দান করেন নাই। যদি কোন খেলোয়াড় নিজ প্রচেষ্টায় উন্নততর নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়াছে তাহাকে দলভুক্ত করিয়া নিজেদের কর্তব্য-কর্ম শেষ করিয়াছেন। এমন কি অনেক সময় যে সকল খেলোয়াড় তাঁহাদের "খোসামোদ" করিয়া চলিয়াছে তাহাদের নামে ঢাক পিটাইয়া, বিশিষ্ট দলের বিরুদ্ধে যাহাতে খেলিতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলে হইয়াছে এই যে, উৎসাহী ক্রিকেট খেলোয়াড় যাহাকে উপযুক্ত শিক্ষার সাহায্য অথবা উৎসাহ দিলে বাঙলার সুনাম বৃদ্ধি পাইত, সে বিরক্ত হইয়া খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। ইহার ফলেই বাঙলা দেশের ক্রিকেট খেলার এই শোচনীয় পরিণাম হইয়াছে। আশা করি ভবিষ্যতে পরিচালক-গণ এই সকল দোষত্রুটি দূর করিয়া যাহাতে বাঙলার খেলোয়াড়গণ সুনাম অর্জন করে তাহার দিকে দৃষ্টি দিবেন।

সন্তরণ

ভারত হইতে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়াটারপোলো দল প্রেরণের ব্যবস্থা হইতেছে শুনিয়া আমরা খুসী হইলাম। এমন কি এখন হইতেই আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে ভারতের ওয়াটারপোলো দল অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় হকি খেলোয়াড়দের ন্যায় সুনাম অর্জন করিবে। তবে সেইজন্য প্রয়োজন হইবে ভারতীয় ওয়াটারপোলো দলটি সম্পূর্ণ বাঙালী খেলোয়াড় দ্বারা গঠন করা। কারণ ইহা ভারতের প্রত্যেক প্রদেশের সন্তরণ পরিচালকগণ একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে বাঙলার ওয়াটারপোলো ষ্ট্যান্ডার্ড ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহা যে আমরা জোর করিয়া বলিতেছি তাহা নহে ইহা এই পর্যন্ত যতবার নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে বাঙলার সাঁতারুগণ প্রমাণ করিয়াছেন। বাঙলার সাঁতারুগণ যাঁহারা পরি-চালনার দোষ ত্রুটির জন্য ওয়াটারপোলো খেলা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন আশা করি তাঁহারা সকলেই এখন হইতে পুনরায় এই খেলায় নব উৎসাহে যোগদান করিবেন। নিয়মিত অনুশীলনেরও ব্যবস্থা করাইবেন। এমন কি তাঁহারাই এখন হইতে আন্দোলন করিবেন যাহাতে ভারতীয় ওয়াটারপোলো যাহা অস্ট্রেলিয়াতে প্রেরিত হইবে তাহা সম্পূর্ণ বাঙালী খেলোয়াড় দ্বারা গঠিত হয়।

আমাদের এইরূপ উক্তির কারণ আছে। আমরা জানি এই অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের আয়োজন বোম্বাই হইতে হইতেছে এবং ইহার উদ্যোক্তা বোম্বাইর একজন পার্শী। সুতরাং তিনি বাঙলার খেলোয়াড়গণকে বাদ দিয়া ভ্রমণকারী দলটি যাহাতে বোম্বাইর পার্শী ও ইউরোপীয় খেলোয়াড়-দের দ্বারা গঠিত হয় তাহার জন্য যে বিশেষ চেষ্টা করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে আমরা আশা করি নিখিল ভারত অলিম্পিক এসোশিয়েশন অথবা ন্যাশানাল এমেচার সুইমিং এসো-শিয়েশনের পরিচালকগণ উক্ত পার্শী সন্তরণ পরিচালককে ভারতের নামে নিজ ইচ্ছা মত দল গঠন করিতে দিবেন না।

পুস্তক পরিচয়

বীভৎস—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত; প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪নং বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। ১৯২ পৃষ্ঠা, মূল্য—২, টাকা।

বীভৎস, হাড়, নীলা, প্রদীপ ও প্রজাপাত তুণ, নিশাচর ও সৈনিক—এই সাতটি গল্প গ্রন্থখানিতে গ্রথিত হইয়াছে।— প্রত্যেকটি গল্পই চমৎকার, বিশেষভাবে 'হাড়' গল্পটি আমাদের অত্যন্ত ভালো লাগিয়াছে। ভাষা, আঙ্গিক, প্লট ইত্যাদির দিক দিয়া গল্পগুলি উজ্জ্বল, জোরালো। গ্রন্থখানির অধিকাংশ গল্পেরই তীক্ষ্ণতা মনে ছাপ রাখিয়া যায়।

বাঙলার সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

এ দেশের অধ্যাত্ম-সাধনার অন্তর কথা সরল সহজ ভাষায় ব্যক্ত করিতে সুপণ্ডিত গ্রন্থকারের খ্যাতি বাঙলার বিদ্বজ্জন সমাজের সর্বত্র সুবিদিত। আলোচ্য গ্রন্থে বাঙলার অধ্যাত্ম-সাধনার মূলীভূত মানবতার আদর্শকে তিনি তাঁহার স্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি সহকারে সুমধুর-ভাবে উন্মুক্ত করিয়াছেন। বৌদ্ধ যুগ হইতে বৈষ্ণব যুগের বাঙলার সাধনার সমন্বয়ের ধারা কিভাবে বিচিত্র গতিতে উদার অনুভূতিকে সম্প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

মধ্য যুগের বাঙলা ও বাঙালী—অধ্যাপক সুকুমার সেন প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আট আনা।

ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ এই সরস আলোচনায় মধ্যযুগের বাঙলার সমাজজীবনের চিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। সকলেই এমন পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা—শ্রীমনোমোহন ঘোষ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২নং বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—আট আনা।

প্রাচীন ভারতের গৌরবময় নাট্যকলার স্বরূপ, তাহার ইতিহাস এবং তৎকালীন নাট্যকলার সর্বাঙ্গীণ প্রয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে এই পুস্তকে আলোচনা করা হইয়াছে। রসজ্ঞ সমাজে এই পুস্তকের সমাদর হইবে। আধুনিক নাট্যকলার সংগঠন, পরিপুষ্টি এবং রসোপলব্ধির পক্ষেও এমন আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে।

শারদীয় রূপ-মঞ্চ—শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। মূল্য ২, টাকা।

চলচ্চিত্র সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রবন্ধ ও বহু চিত্রভূষিত হইয়া এবার শারদীয় রূপ-মঞ্চ বাহির হইয়াছে। মুদ্রণ পারিপাট্য এবং বাঙলার বিখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পীদের রচনা সংখ্যাটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করিয়াছে।

সাম্প্রতিক সাবান সমাচার—শ্রীগৌরচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—রূপশ্রী পাবলিশার্স, ২১, ডবলু সি বানার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা।

গল্পের বই। কতকগুলি গল্প ইতিপূর্বেই বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বাহির হইয়াছিল। কাজেই লেখক পাঠকদের নিকট অপরিচিত নন। অধিকাংশ গল্পই হাস্যরসাত্মক। সাম্প্রতিক সাবান সমাচার, দাম্পত্য কলহে চৈব, প্রতিমা নিরঞ্জন সমস্যা প্রভৃতি গল্প পড়িয়া পাঠকগণ আমোদ পাইবেন। ছাপা, বাঁধাই ভাল এবং প্রচ্ছদপট চাকচিক্য বহুল।

রথের ঠাকুর—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—চলতি নাটক নভেল এজেন্সী, ২১৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১, টাকা।

রথের ঠাকুর মেয়েদের জন্য লিখিত একটি সংক্ষিপ্ত নাটিকা। সবটাই কবিতায় লিখিত। ছেলেদের জন্যও পথের ফকির নামে একটি পদ্য নাটিকা আছে। তাহা ছাড়া কয়েকটি কবিতা ও গানও এই বইয়ে দেওয়া হইয়াছে।

আশার বাণী—শ্রীমতী সরোজিনী দেবী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থ বিপনি, ২৭, একডালিয়া রোড, বালীগঞ্জ। আধ্যাত্মিক ভাবোদ্দীপক কতকগুলি গানের সমষ্টি। সহজ ও অনাড়ম্বর এই গানগুলির প্রসাদ গুণ পাঠকদের চিত্ত আকৃষ্ট করিবে। দাম আট আনা।

একটি রাত্রির কাহিনী—শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জি প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—হিন্দুস্থান লিটারেচার কোং, ৭৩, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ২, টাকা।

একটি রাত্রির কাহিনী, অ্যাক্সিডেণ্ট, প্রথম প্রেম, জন্মদিন, আনার কলি, পর্দা, ঝড়, এই সাতটি গল্প লইয়া বইটি প্রকাশিত হইয়াছে। গল্পগুলি আমাদের ভাল লাগিল।

মিলি ও মালতী—শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জি প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—হিন্দুস্থান লিটারেচার কোং, ৭৩, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

"মিলি ও মালতি" এবং "কামনা" এই দুইটি একাংক নাটিকা এই বইয়ে স্থান পাইয়াছে।

রঙ্গজগৎ

প্রমোদ ব্যাপারে বাঙলা তার লুপ্ত গৌরব আবার বোধ হয় ফিরে পেলো। সম্প্রতি বাইরেকার প্রমোদ ব্যবসায়ীরা যেভাবে বাঙলা দেশের অনুরক্ত হ'য়ে উঠছেন তাতেই এই ধারণা পোষণ করা যায়। এই অনুরাগ সৃষ্টির জন্যে কৃতিত্ব হ'চ্ছে দু'খানি ছবির—'উদয়ের পথে' (হামরাহী) ও 'শহর থেকে দূরে'। এবং আজ ভারতময় প্রায় অধিকাংশ প্রযোজকই সর্ববিষয়ে এই দু'খানি ছবিরই অনুকরণে উঠে পড়ে লেগেছে। এবারে অনেকে চেষ্টা ক'রছে বাঙলা দেশে এসে এখানকার লোককে দিয়ে ছবি তুলিয়ে নিতে, কারণ, ওখানে বাঙালীদের নিয়ে গিয়ে কেন যেন কিছুতেই সাফল্যমণ্ডিত হওয়া যায়নি। তাছাড়া, বাঙলা দেশেরও বিচক্ষণ বহু ব্যবসায়ী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি চলচ্চিত্র ব্যবসায়ে অবতরণ ক'রছেন। দেখেশুনে মনে হয় ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। বাঙলা কাহিনীর ওপরে বম্বের প্রযোজকদের অনুরাগ সম্প্রতি খুব বেড়ে গিয়েছে বলে মনে হয়। কারণ প্রতি সপ্তাহেই দু'একজন প্রযোজক বা পরিচালককে কাহিনীর খোঁজে এখানে আসতে দেখা যাচ্ছে এবং এখনকার ঝোঁক দুর্ভিক্ষ ও মড়কের ওপরে রচিত কাহিনীর ওপরেই বেশি, শুধু বম্বের প্রযোজকদেরই নয়, এখানকার প্রযোজকদেরও এই ঝোঁক—এটা হওয়া অবশ্য স্বাভাবিকই।

একটা বিষয় কিন্তু লক্ষ্য করার আছে। বড় বড় প্ল্যান নিয়ে যারা কর্মক্ষেত্রে নামছেন তাদের কার্যে অবতরণ একটা 'যদি'র ওপর নির্ভর ক'রছে, সেটা হ'চ্ছে—যদি বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি ও কাঁচা মাল আমদানী করা সম্ভব হয়! অথচ এমন একজনও দেখা গেল না যে এই 'যদি'টাকে বাগে নিয়ে আসতে কাঁচা মাল বা যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যবস্থা এখানেই ক'রতে এগিয়ে আসছে। অর্থাৎ, এখন অবস্থা যা তাতে দেখা যাচ্ছে এখানে যত বেশী প্রমোদ-ব্যবসার প্রসার হবে বিদেশী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের ব্যবসায়ীরা ততই লাল হ'তে থাকবে, অথচ চেষ্টা ক'রলে এবং উদ্যোগী হ'লে তাও তো রোধ করা যায়।

পুজোর আকর্ষণ

বাঙলা দেশের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা-পুজোর সময়টাই প্রমোদ-ব্যবসার সবচেয়ে বড় মরশুম। সকলেই এই সময়ে নতুন ফুলে ডালি সাজান। এবারে তার ব্যতিক্রম তো হয়নিই বরং বেশি জমকালোই হয়েছে। সিনেমার মধ্যে নতুন বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ ক'রছে মিনার, ছবিঘর আর বিজলীতে 'কলঙ্কিনী' আর চিত্রা-রূপালীতে 'দুই-পুরুষ', উত্তরা, পূরবী, পূর্ণতে 'মানে-না মানা' এবং রূপবাণীতে শ্রীদুর্গা'ও আনকোরা ছবির মধ্যেই পড়ে। হিন্দী ছবির মধ্যে রক্সীতে সেই 'কিসমৎ', প্যারাডাইসে 'ফুল', সেণ্ট্রালে ''এতিম'', মিনার্ভা ও গণেশে 'নল দময়ন্তী', প্রভাত ও ম্যাজেস্টিকে 'লয়লা মজনু', প্যারামাউণ্টে 'রতন', নিউ সিনেমায় 'পান্না', দীপক ও শ্রীতে 'ভাগ্যলক্ষ্মী', জ্যোতিতে 'ভর্তৃহরি', এবং সিটি-ছায়া-পার্ক শো হাউসে 'শুনো শুনাতা হুঁ'। মঞ্চের আকর্ষণও



ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর ''কলঙ্কিনী'' চিত্রে রেণুকা রায় ও অহীন্দ্র চৌধুরী

কম নয়—স্টারে এবং কালিকায় নতুন নাটক যথাক্রমে 'পলাসী' ও 'দিয়ে গেল দোল'; মিনার্ভায় 'গৈরিক পতাকা'কে নতুন সাজে উপস্থিত করা হ'চ্ছে; রঙমহলের 'অনুপমার প্রেম'কেও নতুনই বলা চলে। পুজোর বাজার মাতিয়ে রাখতে এ-ই যথেষ্ট হ'লেও সৌখীন সম্প্রদায়ের বহু অনুষ্ঠানেরও বিজ্ঞাপিত দেখা যাচ্ছে। যাই হোক খাওয়া-পরা নিয়ে খেদটা এদিক দিয়ে যদি মেটে তো ভালই।

বিবিধ

'শাজাহানে' নায়িকা হবার জন্যে মেহবুব ঐ ছবির প্রযোজক কারদারকে তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধা অভিনেত্রী বীণাকে ধার দিয়ে বদলে নিজের ছবির জন্যে সঙ্গীত পরিচালক নৌসাদ আলিকে পেয়েছেন।

* * *

অভিনেত্রী যশোধরা কাট্‌জু বম্বের এক দৈনিক পত্রের ডিরেক্টারদের একজন হ'য়েছে।

* * *

সুর সংযোজক অনিল বিশ্বাস সস্ত্রীক (আশালতা) কলকাতায় আসছেন নিজের একখানা ছবি তোলা সংক্রান্ত ব্যাপারে।

* * *

দিন তিনেকের জন্যে পরিচালক ফণি মজুমদার কলকাতা ঘুরে গেছেন। এসেছিলেন তার পরের ছবির কাহিনী এবং কালি ফিল্মসে তার যে ছবি হবে সে বিষয়ে ব্যবস্থা ক'রতে। আগামী দশমীর দিন বম্বেতে তার একখানা ছবির মহরৎ হবে।

* * *

পঁচিশ লাখ টাকা মূলধন নিয়ে নির্মল-চন্দ্র চন্দ্র ও কলকাতার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও পৌরজন নিয়ে টাইমস্‌ পিকচার্স নাম দিয়ে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান খোলার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।

* * *

ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলের কেদার শর্মা হলিউডে গিয়ে সেখানকার কোন নটকে হিন্দী ছবিতে অভিনয় করার জন্য চুক্তি করেছেন।

* * *

করণ দীবান ও অভিনেত্রী মঞ্জুলার একটি পুত্র সন্তান লাভ হ'য়েছে।

* * *

ভারতের প্রথম মহিলা প্রযোজক জদ্দনবাঈ আবার কর্মক্ষেত্রে অবতরণ ক'রছেন—সম্ভবত 'রোমিও জুলিয়েট' তুলবেন তিনি।

* * *

পাঞ্জাবের অভিনেত্রী মনোরমা তার স্বামীকে তালাক দিয়ে বেগম পারার দাদাকে বিবাহ করার সংকল্প ক'রছে ব'লে একটা খবর শোনা গেল।

* * *

উল্লাস চিত্রজগত থেকে বিদায় নেওয়াই সাব্যস্ত ক'রে ফেলেছেন।

* * *

আমেরিকার টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স ফিল্ম কর্পোরেশন বম্বের চিত্রপ্রযোজক সিরাজ আলি হাকিমকে শিখণ্ডী খাড়া ক'রে এদেশের চিত্রব্যবসায়ে অবতরণ করার উদ্যোগ ক'রেছে।

* * *

কলকাতায় মহাত্মাজীর আগমন হ'লে কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ তাদের যুগান্তকারী

নৃত্যাভিনয় 'অভ্যুদয়' মঞ্চস্থ করার আয়োজন ক'রেছে।

* * *

মেহবুবের নতুন ছবির নাম 'নাও' (নৌকা)—মেহবুব প্রডাকসন্সের পরিচিত শিল্পিরাই এতে অভিনয় ক'রবেন।

* * *

'কিসমৎ'-এর অদ্বিতীয় সাফল্যকে স্মরণীয় ক'রে রাখার জন্য কাপুরচাঁদ লিমিটেড আগামী ৩রা নভেম্বর রক্সীতে 'বিশ্ববিজয়' সপ্তাহ উদ্‌যাপন ক'রার জমকালো ব্যবস্থা ক'রছেন। ঐদিন কাপুরচাঁদের নবম বার্ষিক ও রক্সী সিনেমার চতুর্থ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবসও প্রতিপালিত হবে। এই উপলক্ষে মালিক মিঃ কাপুরচাঁদ মেটা কলকাতায় এসেছেন

* * *

সাধনা বসুর ছবি 'অজন্তা'র সংলাপ লেখার জন্য ভগবতীচরণ বর্মা কলকাতায় এসেছেন। শোনা গেল রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' কবিতা থেকে এর কাহিনীটি গড়া হ'য়েছে।

* * *

এদেশে চিত্রকাহিনীর জন্যে সবচেয়ে বেশি দাম দিতে হ'য়েছে প্রেমচাঁদের 'গোদান' নামক উপন্যাসের স্বত্ব কিনতে। ক্রেতা রাজলক্ষ্মী পিকচার্স এবং মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা।

* * *

নীতিন বসুর যদি বম্বে টকীজে যোগদান করা ঠিক হ'য়ে যায় তো তিনি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'র চিত্ররূপ দান ক'রবেন।

* * *

নীতিন বসু পরিচালিত ফিল্মিস্তানের 'মজদুর' চিত্রের নায়িকা নবাগতা বীরা অ্যাংলো-সেরিয়া অভিনেত্রী বীনার প্রাক্তন পতি মহসীন আবদুল্লাকে বিবাহ ক'রেছে।

* * *

প্রতিমা দাশগুপ্ত বম্বেতে তার নিজের স্টুডিওর জন্যে জমি কিনেছেন।

বম্বেতেও পঁচিশ লাখ টাকা মূলধন নিয়ে রডওয়ে পিকচার্স নামে একটি চিত্র প্রতিষ্ঠান গঠিত হ'য়েছে।

* * *

পুতুলের সংসার

গত বুধবার কালিকা রঙ্গমঞ্চে নিউ স্টেজ কমিউনিয়ান কর্তৃক ইবসেন প্রণীত "A Doll's House"-এর অনুবাদ "পুতুলের সংসার" অভিনীত হয়েছে। অভিনয় ও সাজসজ্জা মোটের উপর ভালই হয়েছে। মিসেস হালদারের ভূমিকাটিতে অভিনয়কারিণীর যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ১৩৫২, মীরাট

২৯শে সেপ্টেম্বর এবারকার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত সুবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে অভ্যর্থনা সমিতির এক অধিবেশন হয়। ইহাতে ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র বদলি হওয়ায় শ্রীযুত নির্মলানন্দ ঘোষ (অ্যাসিস্টেণ্ট কণ্ট্রোলার, মিলিটারী একাউণ্টস) সম্পাদক মনোনীত হন। তদনন্তর কার্য্যসৌকর্য্যার্থে নিম্নলিখিত দশটি কর্মশাখা স্থাপিত হয়।—(১) প্রচার, (২) প্রবন্ধ, (৩) চিত্ত-বিনোদন, (৪) অর্থ সংগ্রহ, (৫) খাদ্য সংগ্রহ, (৬) রন্ধন ও পরিবেশন, (৭) সভামণ্ডপ, (৮) স্বাস্থ্য, (৯) প্রতিনিধি নিবাস এবং (১০) স্বেচ্ছাসেবক। এই বিভাগগুলির মধ্যে খাদ্য সংগ্রহ বিভাগটি এবার নূতন। কণ্ট্রোল সংকটে এবার এটির জন্মলাভ হইয়াছে।

আগামী বড়দিনের বন্ধে এই সম্মেলন হইবে। প্রত্যেক সাহিত্য-সেবক ও প্রবাসী বাঙালীকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া ইহার গৌরব বৃদ্ধি করিতে অনুরোধ জানাইতেছি।

অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মহাশয় মূল-সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন ও এই দায়িত্ব গ্রহণে তিনি সম্মত হইয়াছেন।

প্রিয়কুমার গোস্বামী,
কার্য্যাধ্যক্ষ, প্রচার বিভাগ।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক কি ?

ওয়াশিংটন নগরীর 'শোরহ্যাম' হোটেল হইতে 'আমেরিকান ফোরাম অব্‌ দি এয়ার' কর্তৃক পরিচালিত বেতার-বিতর্ক।

সভাপতি থিওডোর গ্র্যানিক। এই যুদ্ধে আজও পর্যন্ত ভারতবর্ষ একটি বিরাট প্রশ্ন হইয়াই রহিয়াছে। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যতই চরম পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে আমেরিকার জনগণের মনে এ প্রশ্ন ততই বেশি করিয়া উদিত হইতেছে যে, চল্লিশ কোটী মানবের বাসভূমি এই ভারতবর্ষ এখনও তাহার সমস্ত শক্তি সহ মিত্রপক্ষে যোগ দিতেছে না কেন? যুদ্ধজয়ের পর ব্রিটেন এশিয়াতে যখন তাহার সাম্রাজ্য পুনর্গঠন করিতে চাহিবে তখন আর ভারতের সহযোগিতার প্রশ্ন উঠিবে না। হয়ত বা ভারতবর্ষের জন্যই ব্রিটেনকে পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইবে। এখন ভারতের প্রতিনিধিগণ হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, "ভারতবর্ষ কবে স্বাধীন হইবে?

প্রায় ২০০ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন রহিয়াছে। তাহার চল্লিশ কোটী অধিবাসী আয়র্লণ্ড, অষ্ট্রেলিয়ার জনসাধারণের ন্যায় স্বাধীনতা ভোগ করে না। সমগ্র পৃথিবী যখন স্বাধীনতার যুদ্ধে লিপ্ত, তখন তাহাদের কাছেও স্বাধীনতার মূল্য নিরূপিত হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তাহার স্বাধীনতার পথে আজ অন্তরায় কি? ভারতবর্ষ জাপানীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল, সুতরাং সে হয়ত বা মিত্রশক্তির প্রতি বিশ্বস্ত নাও থাকিতে পারে,—এই কি আশঙ্কা? কিম্বা স্বাধীনতা প্রদত্ত হইলে ভারতবর্ষ অন্তর্বিদ্রোহে লিপ্ত হইবে? স্মরণ রাখিতে হইবে ভারতবর্ষে বহু স্বাধীন রাজ্য আছে। এদেশে বহু ধর্মাবলম্বী লোকের বাস এবং তাহারা বিভিন্ন কৃষ্টির অনুসারী। এতদ্ব্যতীত, এই রহস্যময় ঐশ্বর্যের দেশে অর্থনৈতিক স্বার্থ ও বৈষম্যের তীব্রতাও সমধিক। তাই, আমাদের আজ রাত্রের বিতর্কের বিষয় হইল "ভারতের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করিতেছে কিসে?"

অদ্যকার বক্তাগণ,—

স্যার ফ্রেডারিক পাক্‌ল্‌—ব্রিটিশ দৌত্য-বিভাগের ভারতীয় ব্যাপারের উপদেষ্টা।

নরম্যান টমাস্‌—জাতীয় সমাজতন্ত্রী নেতা।

এস এম আমেদ—অর্থনীতি বিশারদ, ভারতীয় ব্যাঙ্কের পরামর্শদাতা এবং ভারতবর্ষের ওরিয়েণ্ট প্রেসের সংবাদদাতা।

ইম্যানুয়েল সেলার—কংগ্রেসম্যান, নিউ-ইয়র্ক।

প্রথম বক্তা স্যার ফ্রেডারিক পাক্‌ল্‌এর ভাষণ

অদ্যকার প্রশ্ন হইল,—"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ব্যাহত করিতেছে কিসে? আমার মনে হয়, ইহার অর্থ এই,—"ভারতীয়গণ স্বায়ত্তশাসনে যোগ্যতা লাভের পূর্বে ভারতবর্ষে আমাদের তার কি করণীয় আছে? ধরিয়া লউন, ভারতবর্ষ ব্যবস্থানুযায়ী যথাশীঘ্র শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে যাইতেছে। এ বিষয়ে, ব্রিটেন এত কৃতনিশ্চয় যে সম্প্রতি পার্লামেণ্টে ভারতীয় ব্যাপার লইয়া যে বিতর্ক হয়, তখন ভারতবর্ষ আদৌ স্বাধীন হইবে কিনা, এতৎসম্বন্ধে কেহ কোনও কথাই উত্থাপন করেন নাই। প্রত্যেকেই এই ধারণা করিয়া লইয়াছিলেন যে, এ প্রশ্নের চিরতরে শেষ সমাধান হইয়া গিয়াছে।

তবে আর বাকি কি রহিল? সর্বপ্রথমে আমাদিগকে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে। চল্লিশ কোটি লোকের জন্য এখন পুনরায় আমরা কোনও শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারি না,—তাহার উপর আবার পৃথিবী-ব্যাপী যুদ্ধের ঝুঁকি তো আছেই। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ শেষ হইলে ভারতীয়গণেরই স্থির করিতে হইবে যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাহারা কিভাবে গ্রহণ করিবে। অপর কেহই তাহাদের জন্য ইহা করিতে আসিবে না। ভারতীয়গণ যতক্ষণ না তাহাদের শাসনতন্ত্রের কোনও পটভূমিকা প্রস্তুত করিতেছে, ততদিন ভারতবর্ষে এমন কোনও জনপ্রিয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে না যাহার হস্তে ব্রিটিশগণ সকল ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে, নিশ্চয়ই এরূপ বিশ্বাসভাজন একটি গভর্নমেণ্টের অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে। তবেই সমস্ত প্রশ্নটা দাঁড়াইতেছে এই যে ইংরেজের নিকট হইতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কে গ্রহণ করিবে,—এবং কি সর্তে? ব্যবহারিক রাজনীতির এ সমস্যার সমাধান ভারতীয়গণের নিজেদেরই করিতে হইবে।

সভাপতি গ্র্যানিক। ধন্যবাদ স্যার ফ্রেডারিক পাক্‌ল্‌। আমাদের পরবর্তী বক্তা মিঃ নরম্যান টমাস এখন তাঁহার ভাষণ দিবেন।

নরম্যান টমাসের ভাষণ

সমগ্র পৃথিবীর ধারণা বহুকাল যাবত ভারতবর্ষই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি এবং একমাত্র নিদর্শন হইয়া আছে। এই সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র ভারতের স্বাধীনতারই অপহ্নব ঘটাইতেছে না, পরন্তু সমগ্র পৃথিবীর শান্তিই ব্যাহত করিতেছে। ডাম্বার্টন ওকস-এর যাবতীয় আলোচনার বিশ্লেষণই নিরর্থক, যতক্ষণ না ব্রিটিশ, ওলন্দাজ ও ফরাসীগণের দূর প্রাচ্যের সাম্রাজ্যসমূহের পুনরুদ্ধার পরবর্তী ব্যবস্থাটা আমেরিকার নিকট পরিষ্কার না হয়। কারণ, এই সকল রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবার সামর্থ্য ইহাদের কাহারও নাই। কারণ, একদিকে চার্চিল-রুজভেল্টের কোরিয়ার স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা অথচ ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও মালয় সম্বন্ধে ঔদাসীন্যভাব অবলম্বন দ্বারাই ইংরেজদের ঐ সমস্ত অঞ্চলে শ্বেতজাতির প্রভুত্ব কায়েম রাখার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। ইহা দ্বারাই, আরও এক পুরুষের মধ্যে অপর একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনা অনুভূত হইতেছে। কিছুকালের মধ্যেই যে সকল স্থানীয় বিদ্রোহ দেখা দিবে, রাশিয়া বা অপর কোনও শক্তির ইন্ধন প্রয়োগে তাহাই সমরাগ্নিরূপে জ্বলিয়া উঠিবে।

অপর একটি আত্মবিধ্বংসী যুদ্ধের হস্ত হইতে নিশ্চিতরূপে আমাদের বংশধরগণকে রক্ষা করিতে হইলে একটি-মাত্র নাটকীয় ব্যাপার সংসাধিত করিতে হইবে। তাহা হইতেছে যৌথ আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ভারতীয়গণ কর্তৃক প্রদত্ত সর্তে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লওয়া। ইংরেজ পক্ষের প্রচারকার্যে কল্পিত ক্রীপস্‌ প্রস্তাব এবং নেহরু প্রমুখ শত সহস্র দেশসেবককে ক্রমাগত কারাগারে প্রেরণ করিয়া শান্তির আশা দুরাশা মাত্র। বাহ্যত ভারতবর্ষকে বহু মতে বিভক্ত প্রতীয়মান হইলেও একথা সত্য যে, স্বাধীনতার দাবীতে সকল দলই একমত। ব্রহ্মদেশ অবরোধ করিতে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে প্রেরণা দানের অসাফল্য হইতেই ভারতীয়গণের প্রতি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের অবিশ্বাসের গভীরতর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আমেরিকা নিশ্চয়ই ব্রিটিশ শক্তিকে দূর প্রাচ্যে সাহায্য করিতে অস্বীকার করিবে। এতদ্ভিন্ন আত্মরক্ষার প্রয়োজনেও আমাদিগকে ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য বিশ্ব স্বাধীনতার প্রতি আমাদের স্বতঃই একটা নৈতিক সমর্থন আছে।

সভাপতি গ্র্যানিক—ধন্যবাদ মিঃ টমাস। এখন আমরা মিঃ আমেদ-এর ভাষণ শুনিব।

মিঃ এস এম আমেদ-এর ভাষণ

সর্বপ্রথমেই আমি আমেরিকান ফোরাম অব্‌ দি আয়ারকে ভারতীয় ব্যাপারে একজন

মুসলমানকেও বক্তারূপে আহ্বান করিবার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা ইংরেজ ও হিন্দুদিগের নিকট হইতে অনেক কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমেরিকার সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চগুলি মুসলমান ও অপরাপর রাজনৈতিক দলসমূহকে এযাবৎ নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করিবার অতি অল্প সুযোগই দিয়াছেন। তথাপি মুসলমান ও অন্যান্য ভারতীয় সংখ্যাল্পগণের কথা স্বাধীনতা-প্রেমিক আমেরিকানগণের বিশেষ সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। আজ, ভারতবর্ষ ও জগতের সমক্ষে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নই বড় প্রশ্ন নহে। প্রধান সমস্যাই হইল এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা ও এমন একটি গভর্নমেণ্ট স্থাপন যাহা জাতিবর্ণনির্বিশেষে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, পাশী, জৈন, খৃষ্টান, ইহুদী, অন্ত্যজ প্রভৃতি সকল জাতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইবে এবং যাহা রাজনৈতিক, ধর্ম-নৈতিক অথবা বংশগত প্রভাব বিস্তার দ্বারা জনসংখ্যার যে কোনও অংশকে অপর অংশ কর্তৃক শোষণ ও অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইবে। ভারতবর্ষের দিগন্ত বিস্তৃত মহাদেশের চল্লিশ কোটী অধিবাসীর ভাগ্য নির্ধারণে আজ চারিটি প্রধান শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। ইহারা হইল, ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান ও দেশীয় রাজন্যবৃন্দ। ইহাদের পরস্পরের প্রতি ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাসই ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের সর্বপ্রধান অন্তরায়।

এই অনৈক্য ও অবিশ্বাসের জন্য দায়ী কে? জনৈক খ্যাতনামা ভারতীয় মুসলমান ব্যারিস্টারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলা যাইতে পারে, গান্ধী-নেহরু পরিচালিত কংগ্রেসের মুসলমান ও সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে শাসন করার মতলবই ইহার মূল কারণ। হিন্দু কংগ্রেস দল যতদিন পর্যন্ত মুসলমান ও সংখ্যাল্পগণের প্রতি উদার দৃষ্টিসম্পন্ন না হইবে ভারতবর্ষ ততদিন পর্যন্ত বিভক্ত ও পদানত থাকিতে বাধ্য। হিন্দু কংগ্রেস দল, যাহা কৌশলপূর্ণ প্রচারের জোরে সেদিন পর্যন্তও সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী জাতীয় দল বলিয়া আমেরিকাতে পরিকীর্তিত হইত, দুর্ভাগ্য ইংরেজগণের ন্যায়ই আজ তাহারা ভারতবর্ষে সমর্থক ও বন্ধুশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান, প্রাচীনপন্থী হিন্দু, রাজন্যবর্গ, অন্ত্যজ, শ্রমিক, কৃষক, সমাজতন্ত্রী কমিউনিস্ট এবং অপরাপর সংখ্যালঘিষ্ঠগণ আজ গান্ধী-নেহরু প্রভাবিত কংগ্রেসী দলের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুগণ নিজেরাই এই সঙ্ঘর্ষের কারণ দূরীভূত করিতে পারে। কারণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাদেরই প্রভাব সর্বাধিক। দুর্ভাগ্যবশত গান্ধী-নেহরু পরিচালিত কংগ্রেসী দল (যাহা শুধু হিন্দুদের স্বার্থই দেখে) নিজেদের স্বার্থ চিন্তায় এমনি মসগুল যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে তাহারা মুসলমান ও অন্যান্য দলের জন্য বিন্দুমাত্র স্বার্থত্যাগ করিতেও প্রস্তুত নহে। অপর পক্ষে কিন্তু মুসলমানগণ অন্যান্যের প্রতি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে যথেষ্ট উদারতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ঐ সকল প্রদেশে অপর জাতীয়গণও মন্ত্রিত্বের দায়িত্বশীল পদে স্থান পাইয়াছে। আর হিন্দু প্রধান প্রদেশগুলিতে বর্তমানে কোনও নির্বাচিত মন্ত্রিসভারই অস্তিত্ব নাই।

বর্তমান যুদ্ধকালে ভারতবর্ষে ইংরেজের আর্থিক স্বার্থ বহুল পরিমাণে বিনষ্ট হইয়াছে; বর্তমানে উহারা ভারতের অধমর্ণে পরিণত হইয়াছে। উহাদের ভারতীয় বাণিজ্য মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট আছে। ব্রিটিশ আধিপত্য প্রকৃতপক্ষে এখন হিন্দুদের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। সুতরাং ইংরেজগণ এখন আর ভারতের রাজনৈতিক অচল অবস্থার প্রতিকারে বিশেষ মাথা ঘামাইবে না। ইংরেজদের নিকট হইতে অধিকাংশ আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা আয়ত্ত করিবার পর এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রচারের সহায়তায় স্বপক্ষে মতামত সৃষ্টি করিবার পর হিন্দুগণ এখন আর আর্থিক ও রাজনৈতিক সুবিধাগুলি অন্যান্যের সহিত ভাগ করিয়া লইতে মোটেই আগ্রহশীল নহে। ইংরেজের বেয়নেট ও আমেরিকার সহানুভূতিশীল মতের জোরেই এখন তাহারা তাহাদের অধিকারগুলি জোরে আকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে। আমি আপনাদের সমক্ষে ইহা আজ সাহসের সহিতই বলিতে পারি যে, ইংরেজের সাহায্যেই ব্রাহ্মণ ও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ ভারতের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতেছে।

সভাপতি গ্র্যানিক। ধন্যবাদ মিঃ আমেদ। এখন আমাদের চতুর্থ বক্তা কংগ্রেসম্যান ইম্যানুয়েল সেলারের বক্তৃতার পালা। আসুন মিঃ সেলার।

কংগ্রেসম্যান ইম্যানুয়েল সেলারের ভাষণ

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন,—"আমরা মিত্রপক্ষীয়গণ পৃথিবীকে অত্যাচার ও আক্রমণের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্যই যুদ্ধ করিতেছি। আমরা এমন এক আদর্শের জন্য যুদ্ধ করিতেছি, যাহা সফল হইলে, সমগ্র পৃথিবীতে জাতিবর্ণ ও ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়পরতার মর্ম উপলব্ধি করিবে।" এই কথা বলিয়াই প্রেসিডেণ্ট আমাদের সমক্ষে যুদ্ধের আদর্শ বর্ণনা করিয়াছেন। এই উক্তি ভারতবর্ষের প্রতিও প্রযুক্ত হওয়া উচিত। পৃথিবীর সর্বত্রই যখন বিরাট অভ্যুত্থানের সাড়া অনুভূত হইতেছে তখন চল্লিশ কোটি মানব অধ্যুষিত বিশাল ভারতবর্ষের বৈদেশিক শাসন ও পরাধীনতার কথা আমরা না ভাবিয়া পারি না। জাতির প্রাণকেন্দ্রে আজ আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছে। জাতীয় চৈতন্যসত্তা আজ উজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয়গণ নিজেরাই নিজের ভাগ্য নির্ধারণ করিবে। সত্য বটে, ভারতে দারিদ্র্য ও রোগের অভাব নাই, কৃষি ও শিল্প আজও সমৃদ্ধির উচ্চ সীমায় পৌঁছায় নাই, দেশে এখনও জাতিভেদ প্রথা বর্তমান। এখানে এ সমস্ত কথা আমি এইজন্যই উল্লেখ করিতেছি যে, ভারতকে পরাধীন রাখিবার জন্য এইগুলিকেই সাধারণত যুক্তিরূপে প্রচার করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ এইভাবেই সর্বত্র পরাধীনতার গ্লানি বহিয়া চলিয়াছে। জমিদার নিজে অনুপস্থিত থাকিয়া কর্মচারী দ্বারা জমিদারী পরিচালনা করেন। কর্মচারিগণও প্রজার স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া জমিদার ও নিজের স্বার্থকে সর্বাগ্রে স্থান দেন। খাজনা ও সুদ আদায় করা জীবন-যাত্রার মান নীচু রাখা এবং সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ বর্ষণ করা যে এ সমস্ত তোমাদেরই হিতের জন্য—ইহাই উক্ত কর্মচারিগণের একমাত্র কর্তব্য। এইভাবেই ভারতের জমিদারী পরিচালিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ যদি জাতি হিসাবে আজ নিজের সকল ব্যবস্থা নিজে করিবার ক্ষমতা রাখিত, যদি আজ তাহারা জাতীয় কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অর্থ নির্ধারণ করিতে পারিত, যদি স্বাধীনভাবে তাহারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সঙ্গে ব্যবসায় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিত, তবে দারিদ্র্য ও রোগ এতদিনে ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইত। বস্তুত ভারতবর্ষে অনৈক্যের এমন গভীর কোনও হেতু নাই যাহা দ্বারা সর্বকালের জন্য জনসাধারণকে বিভক্ত রাখিয়া তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অনুপযুক্ত রাখা চলে। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে আরও অধিক সংখ্যক সংখ্যালঘিষ্ঠ দল রহিয়াছে, ভাষা-সমূহও পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন, আচার ব্যবহার ও ধর্মমতের পার্থক্যও অধিকতর। তথাপি এই অনৈক্যের মধ্য হইতেই একটি শক্তিশালী জাতির উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। ভারতের একটি স্বকীয় সংস্কৃতি রহিয়াছে, যাহার ভিত্তিমূল সুদৃঢ়। বিজেতৃগণের সভ্যতার ইহার কোনও প্রয়োজন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর দিগ্বিজয়ের সমর্থনে যে "শ্বেতজাতির বোঝা" বলিয়া একটি ধুয়া উঠিয়াছিল, আমি অনেক সময়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ঐ উদ্ভট যুক্তির কথা নিবিষ্টমনে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি,—"বাস্তবিক কে কাহার বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে?"

মিত্রপক্ষীয়গণের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নহে। জয়কে নিকটবর্তী করিবার জন্য গ্রেট ব্রিটেনের জনগণের যে সুমহৎ প্রচেষ্টা তৎসম্বন্ধে আমি সম্যক অবগত আছি। এই সম্পর্কে আমি ব্রিটিশ কর্তাসচিব ব্রেণ্ডেন ব্র্যাকেন মহোদয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি, "যুদ্ধস্থিতি কালেও মিত্রপক্ষীয়গণ পরস্পরের ন্যায্য সমালোচনা করিলে প্রত্যবায়ের কোনও কারণ নাই, কারণ, ন্যায়ানুমোদিত সমালোচনাই গণতন্ত্রের প্রাণ।" মিঃ ব্র্যাকেন-এর উক্তিতে সাহসী হইয়াই আজ আমি এই ন্যায্য সমালোচনা করিতেছি। আমি বিশেষরূপেই অবহিত আছি যে, সিংহের লাঙগুলে মোচড়ান ও গুম্ফে আকর্ষণ করা কিছুমাত্র কঠিন কার্য নহে; তথাপি আজ ইহা আমি না বলিয়া পারি না যে, ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতবর্ষকে অধীন করিয়া রাখা ইংরেজ-গণের কুলমর্যাদাহানিকর। যে ইংলণ্ডের স্বগৃহে সমাজতান্ত্রিক প্রেরণার এত আধিক্য, বহির্বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদই তাহার পরিচয়।

অনুবাদক: শ্রীবিভূতিভূষণ বসু।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। গত সপ্তাহে ১৯শে আশ্বিনের সংখ্যায় "ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যসমূহ কি বিশ্ব-শান্তির অন্তরায়?" নামক যে বেতার বিতর্ক আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার ক্রমশঃ প্রকাশিতব্য অপরাংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। বর্তমান অনুবাদটির সহিত পূর্ব সংখ্যায় প্রকাশিত উপরোক্ত অনুবাদের কোনও সম্পর্ক নাই। ইহা সম্পূর্ণ নূতন এবং বক্তাগণও নূতন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৩রা অক্টোবর—বারশালের কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত সতীন্দ্রনাথ সেন প্রেসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের জনৈক মুসলমান সিপাহী তাহার এক পত্রে দেশবাসীকে জানাইয়াছেন, 'জাপানের সহযোগিতায় আমরা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছি বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে। স্বদেশের স্বাধীনতার জনাই আমরা এই সংগ্রামে যোগ দিয়াছিলাম।'

৪ঠা অক্টোবর—নয়াদিল্লীর একখানা ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে মার্চ স্যার হথর্ন লুই অবসর গ্রহণ করিলে পর তাঁহার স্থলে ভারত গভর্নমেণ্টের সমর বিভাগের সেক্রেটারী স্যার চণ্ডুলাল ত্রিবেদী উড়িষ্যার গভর্নর নিযুক্ত হইবেন। ১৯২০ সালে লর্ড সিংহ বিহারের গভর্নর নিযুক্ত হইবার পর এই প্রথমবার একজন ভারতীয় একটি প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হইলেন।

অদ্য অপরাহ্নে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুকে দীর্ঘদিনের অন্তরীণের পর মুক্তি লাভের দরুণ বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়।

খুলনার স্পেশ্যাল জজ এবং এসেসর মিঃ বি মুখার্জি মোল্লারহাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মামলার রায় দিয়াছেন। তিনি সমস্ত আসামীকেই বে-কসুর খালাস দিয়াছেন। আসামীগণকে কয়েকজন মুসলমানকে হত্যা, গৃহদাহ প্রভৃতি কতকগুলি অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

৫ই অক্টোবর—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লক্ষ্ণৌয়ে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা শীঘ্রই ভারতের জাতীয়তা-বিরোধী অপরাধীদের তালিকা তৈয়ার করিব। যাহারা আমাদের দেশপ্রেমিকদের মনোবল নিষ্করুণভাবে নিষ্পেষিত করিয়াছে, তাহাদের উপর গুলী চালাইয়াছে, ঘুষ লইয়াছে এবং দরিদ্রের শোণিত শোষণ করিয়াছে, আমরা কখনই তাহাদিগকে ক্ষমা করিব না।'

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ পি সি যোশী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ব্যতীত অপর যাবতীয় কম্যুনিষ্টকে কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

বিহার প্রাদেশিক কিষাণ সভার সভাপতি স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদের অন্ত্রঘটিত পীড়া হইয়াছে এবং তাঁহার জ্বর হইতেছে। অদ্য রঞ্জন-রশ্মি দ্বারা তাঁহাকে পরীক্ষা করা হইয়াছে।

৬ই অক্টোবর—নিখিল ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী গতকল্য সায়াহ্নে দম দম জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন। ঐদিন রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় তাঁহার কন্যা কুমারী জয়ন্তী গাঙ্গুলী যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে মারা যান। অশ্বিনীবাবু অদ্য সকাল বেলা কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া জানিতে পারেন যে, পূর্ব রাত্রিতেই তাঁহার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে।

জানা গিয়াছে যে, বাঙলার বিভিন্ন জেলায় যে সকল ব্যক্তির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া আদেশ জারী করা হইয়াছিল, সেই সকল ব্যক্তির উপর হইতে সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্ট সমস্ত জেলা অফিসারকে নির্দেশ দিয়াছেন।

ইন্দোনেশিয়া ও ইন্দোচীন স্বাধীনতা আন্দোলন দমন করিবার যে চেষ্টা চলিয়াছে, তাহার এবং বাঙলায় ক্রমবর্ধমান শ্রমিক বিক্ষোভ দমন করিবার উদ্দেশ্যে গভর্নমেণ্ট যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন, তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া অদ্য কলিকাতায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে এক জনসভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৭ই অক্টোবর—নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেস তাহার সমস্ত শাখাকে ১৫ই অক্টোবর 'এশিয়া ত্যাগ কর' দিবস পালন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

বোম্বাইয়ের সংবাদে প্রকাশ একখানি সৈন্যবাহী জাহাজে কতিপয় ভারতীয় ছাত্রের উচ্চশিক্ষালাভার্থ ইংলণ্ড যাইবার কথা ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন ছাত্রদিগকে ভৃত্য ও মেথরদের সর্ববিধ কার্য করিতে বলায় কয়েকজন ছাত্র ঐ সর্তে জাহাজে আরোহণ করিতে সম্মত হন নাই।

৮ই অক্টোবর—নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের ভূতপূর্ব সহ সভাপতি পণ্ডিত শীলভদ্র যাজী সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে দিল্লীতে লালকেল্লা বন্দিনিবাসে শ্রীযুত মুকুন্দলাল সরকার, শ্রীযুত প্রাণলাল কাপাদিয়া এবং তাহার প্রতি যে অমানুষিক ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু অদ্য রাত্রে কলিকাতা হইতে কার্সিয়াং যাত্রা করিয়াছেন।

৮ই অক্টোবর—জাভার বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য ডাঃ সুকর্ণ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন, সেই সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু বলেন, 'ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা অর্জন প্রচেষ্টায় আমার দ্বারা যদি কোন সাহায্য হয়, তাহা হইলে ভারতে জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও আমি সানন্দে জাভা যাইব; কেননা, আমি মনে করি যে, ভারত, জাভা ও অন্যান্য স্থানের স্বাধীনতা এক সূত্রে গ্রথিত।'

আগামী ৫ই নভেম্বর নয়াদিল্লীতে ভারতীয় জাতীয়বাহিনী 'আজাদ হিন্দ ফৌজের' তিনজনের বিচার আরম্ভ হইবে। উহাকে সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে ভারতবর্ষের একটি প্রসিদ্ধতম বিচাররূপে গণ্য করা যাইতে পারে। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাহারা ভারতীয়বাহিনী পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় জাতীয় বাহিনী 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' গঠনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন।

৯ই অক্টোবর—নয়াদিল্লীর এক ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, ১৫ই অক্টোবর হইতে ভারতে পুরাতন ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম পুনরায় প্রবর্তিত হইবে। ঐ দিন রাত্রি ২টায় ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা পিছাইয়া দেওয়া হইবে। প্রকাশ, বাঙলা সরকার কলিকাতায় ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম প্রবর্তনে রাজী হন নাই।

বাঙলা সরকার উহার সমগ্র উন্নয়ন বিভাগটি তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৯ই অক্টোবর সিংহলে শাসন সংস্কার সম্পর্কে সোলবারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট গৃহীত হইলে সিংহলে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ক্রমে ক্রমে ঔপনিবেশিক অধিকার প্রাপ্ত হইবে।

বিদেশী সংবাদ

৩রা অক্টোবর—মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান এক লক্ষ ইউরোপীয় ইহুদীকে প্যালেস্টাইনে প্রবেশের অনুমতি দিতে যে অনুরোধ করেন, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

সাইগনে ফরাসী প্রতিনিধি ও আনামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে গোপন আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে।

৪ঠা অক্টোবর—টোকিওর এক সংবাদে প্রকাশ, মিত্রপক্ষীয় সর্বাধিনায়ক জেনারেল ম্যাক আর্থার জাপ স্বরাষ্ট্রসচিব মিঃ যামাজাকির পদচ্যুতি দাবী করিয়া এক নির্দেশ জারী করিয়াছেন।

বাটাভিয়ায় ওলন্দাজ সরকারের প্রতিনিধি দল এবং ইন্দোনেশিয়ান নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা শুরু হইয়াছে। মিত্রপক্ষের সৈন্যাধিনায়ক মেজর জেনারেল স্যার ক্রিষ্টিসন উভয়পক্ষের সম্মিলিত বৈঠকের চেষ্টা করিতেছেন এবং ইতিমধ্যেই ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা ডাঃ সুকর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন।

সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'টাস' ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোভিয়েট বিজ্ঞান পরিষদের প্রাচ্য বিভাগ মহাভারতকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করিবেন।

৫ই অক্টোবর—জেনারেল ম্যাক আর্থার জাপ স্বরাষ্ট্রসচিবের পদচ্যুতি দাবী করায় জাপ প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স হিগাশিকুনি এবং তাঁহার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

৬ই অক্টোবর—ব্যারন সিদেহারা জাপানের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

অদ্য রাত্রে ইয়েনান কম্যুনিষ্ট বেতারে বলা হয় যে, চীনের চেকিয়াং প্রদেশে চীনা কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের (চুংকিং গভর্নমেণ্ট) সৈন্যবাহিনী এবং কম্যুনিষ্ট সৈন্য দলের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে।

৭ই অক্টোবর—হংকং প্রত্যাগত একদল ভারতীয় ব্যবসায়ী কলম্বোতে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর জন্যই জাপানীরা সিংহল আক্রমণ করে নাই বা ব্যাপকভাবে ভারত অভিযান করে নাই; সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেও ভারতবর্ষকে বিশেষত তাঁহার প্রিয় বাঙলাদেশকে তিনি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে চাহেন নাই।

বাটাভিয়ার জাতীয়বাদী ইন্দোনেশিয়ান গভর্নমেণ্টের নেতা ডাঃ সুকর্ণ আজ স্বাধীনতার চারিজন নেতাকে জাভায় গিয়া সেখানকার অবস্থা দেখিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন। এই চারিজন নেতার মধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অন্যতম।

৮ই অক্টোবর—ষ্টকহলমের এক সংবাদে প্রকাশ, সুইডিস একাডেমী জার্মান 'আণবিক বোমা' আবিষ্কারক অটো হানকে ১৯৪৪ সালের জন্য রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার দিয়াছেন।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ১২ই আশ্বিন, ১৩৫২ সাল। Saturday, 29th September, 1945. [৪৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির সিদ্ধান্ত

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে। এই অধিবেশনে বিদেশীর পশুবলকে আত্মশক্তিতে প্রতিরুদ্ধ করিয়া নবজাগ্রত ভারত স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালনায় আপনার সুদৃঢ় সংকল্প বিঘোষিত করিয়াছে। কংগ্রেস জানাইয়া দিয়াছে যে, পরানুগ্রহের উচ্ছিষ্টকণার সে প্রত্যাশা করে না; জাতির পূর্ণ স্বাধীনতাই সে কামনা করে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী এবং লর্ড ওয়াভেল সম্প্রতি ভারতের শাসনাধিকার সম্প্রসারণ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সমিতি এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন—

"বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এবং লর্ড ওয়াভেলের বেতার-ঘোষণা নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়াছেন। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস্ যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবারের এই নূতন প্রস্তাব তাহারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। ফলতঃ ক্রিপস্ প্রস্তাবের সহিত ইহার পার্থক্য অতি সামান্যই। সেবার ক্রিপস্ প্রস্তাব কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয় নাই। যুদ্ধাবস্থা কিংবা বৃটেনে গভর্নমেণ্টের পরিবর্তন দ্বারা ভারত সম্পর্কে বৃটিশ নীতির যথার্থ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। ইহাই দেখা যাইতেছে যে, প্রতি ক্ষেত্রে অগ্রগতি বিলম্বিত করা এবং নূতন নূতন সমস্যা ও জটিলতার সৃষ্টি করাই হইতেছে, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নীতি।"

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল ঘোষণায় ভারতের স্বাধীনতার কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন কিছুই কংগ্রেস বা দেশবাসীর পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির এই অভিমত যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নূতন প্রস্তাব অস্পষ্ট, সংকীর্ণ এবং অসন্তোষজনক।"

এ সম্বন্ধে আমাদের কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ব্রিটিশ শ্রমিক দলের প্রতি এদেশের ইংরেজভক্ত সমাজে যাহার যেমন আস্থাই থাকুক না কেন, আমরা জানি, তাঁহারা সমভাবেই সাম্রাজ্যবাদী। যুদ্ধোত্তর বৃটেনের আর্থিক সমস্যার সমাধান এবং তথাকার জনগণের জীবিকা সংস্থানের দায়ে তাঁহারা সমধিক সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবগ্রস্ত হইবেন এবং পরজাতি শোষণের নীতির উপর জোর দিতে বাধ্য হইবেন, ইহা স্বাভাবিক। এই অবস্থা উপলব্ধি করিয়াই আমরা তাঁহাদের ভারত সম্পর্কে এতদ্বৎকাল প্রচারিত সকল সদিচ্ছাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছি এবং এখনও সেইরূপই দেখিয়া থাকি। আমরা জানি, ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডল ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবেন না এবং অবস্থার চাপে পড়িয়া তাঁহাদের পক্ষে তাহা সম্ভবপরও নয়। ওয়াভেলের শেষ প্রস্তাবে তাঁহাদের এই মনোবৃত্তি সুস্পষ্টরূপেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। ফলত এই প্রস্তাবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতে সাম্রাজ্যবাদমূলক নীতি সম্প্রসারণের সকল সুবিধাই নিজেদের হাতে রাখিয়াছেন এবং কোন দিক হইতে তাঁহারা ধরা ছোঁয়া দেন নাই। তাঁহারা ভারতের সাধারণ নির্বাচনের উপর জোর দিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, গণতান্ত্রিকতার প্রতি তাঁহারা যেন কতই অনুরাগী; অথচ আগামী নির্বাচনে ভারতের জনমত যাহাতে স্বাচ্ছন্দগতিতে অভিব্যক্ত হইতে না পারে, তাঁহারা নানারকমে সে কৌশল প্রয়োগেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে জনমতানুযায়ী মন্ত্রিমণ্ডল প্রতিষ্ঠার সুযোগ তাঁহারা প্রদান করেন নাই। জনমতানুমোদিত নীতির মুক্ততর প্রতিবেশের মধ্যে পাছে সাধারণ নির্বাচনে তাঁহাদের স্বার্থের প্রতিকূলে জনমত সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায়, এক্ষেত্রে তাঁহারা এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন। তাঁহাদের এই স্বার্থ প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য প্রদেশসমূহে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি-প্রভাবিত শাসন পদ্ধতিই বজায় রাখা হইবে। যে শাসকদল এতদিন অন্ন এবং বস্ত্র সম্বন্ধে অশেষবিধ কুব্যবস্থা পরিচালনার দ্বারা জনসাধারণের দুর্গতির কারণ সৃষ্টি করিয়াছেন, ব্রিটিশ শ্রমিক বন্ধুদের ভারত-হিতৈষণার প্রতাপে এবং ৯৩ ধারার কৃপায় তাঁহারাই পরমানন্দে পরিপুষ্ট হইতে থাকিবেন। তারপর ভোটাধিকার সম্প্রসারণের দ্বারা কেন্দ্রীয় আইনসভায় জনমতের অভিব্যক্তির পথ যাহাতে প্রশস্ততর হইতে পারে, সময়ের অভাবের নিতান্ত যুক্তিহীন অজুহাতে তাঁহারা তেমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেও অস্বীকৃত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া সিমলার অভিজ্ঞতার পরও যে মিঃ জিন্নাকে বেশ ভাল রকমে তাঁহারা নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ক্রীড়নকস্বরূপে পরিচালিত করিবেন, তাঁহাদের প্রস্তাবের মধ্যে তেমন অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবেই রহিয়াছে। সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থরক্ষার সুবিধাবাদমূলক মামুলী যুক্তি ছাড়িয়া অতঃপর ভারতের অধিকাংশের জনমত তাঁহারা মানিয়া চলিবেন, এমন কোন কথা তাঁহারা বলেন নাই। বড়লাটের শাসন-পরিষদের নূতন গঠনের একটা ধোঁকাবাজী এই প্রস্তাবে আছে বটে; কিন্তু বড়লাটের সর্বময় কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ করিবার কোন অভিপ্রায়ই প্রকাশ করা হয় নাই। স্বাধীনতাকামী ভারত এমন প্রস্তাব ঘৃণাভরেই উপেক্ষা করে এবং সে জানে নিজের শক্তির বলেই বিদেশীর হাত হইতে তাহাকে দেশ-শাসনের অধিকার কাড়িয়া লইতে হইবে। নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতার

ভিতর দিয়া কংগ্রেসের এই সংগ্রাম-ভেরী ধ্বনিত হইবে। কংগ্রেসের সংগ্রামাত্মক কর্মপন্থা অবলম্বনে অধিক বিলম্ব ঘটিবে না; মাত্র এই কয়েক মাসের প্রতীক্ষা—কংগ্রেসের প্রস্তুত হইবার কর্মোদ্যমেই এই সময় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে।

লর্ড পেথিকের পাণ্ডিত্যগিরি

ভারত সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স মহাসলবরা নামক স্থানের বক্তৃতায় ভারত সম্বন্ধে তাঁহার প্রস্তাবের পক্ষে সাফাই গাহিয়াছেন। তাঁহার মতে নূতন প্রস্তাবে ভারতের সমস্যা সমাধান করা হয় নাই; কিন্তু ভারতবাসীদিগকে স্বায়ত্তশাসনের সোজা রাস্তা দেখানো হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া অংশীদারী উপভোগ করিলে যে কত সুবিধা তাহা কীর্তন করিয়াছেন; সম্ভবত তাঁহার প্রস্তাবে 'স্বাধীনতা' এই শব্দের পরিবর্তে 'স্বায়ত্তশাসন' এই কথাটি ব্যবহার করাতে সমগ্র ভারতে যে প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ভারতবাসীদের ভ্রান্তি নিরসন করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার এই বক্তব্য। ভারতসচিবের উক্তির উত্তরে আমরা শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, ভারতবাসীরা তাঁহাদের প্রদত্ত স্বায়ত্তশাসনও চাহে না এবং তাঁহাদিগকে সেজন্য পথ দেখাইয়া দিতেও বলে না। ব্রিটেন বহুদিন ভারতের বোঝা স্কন্ধে বহন করিয়াছে, এখন মঙ্গলমত তাঁহারা ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেই ভারতবাসীরা রক্ষা পায়। স্বাধীনতা এবং স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে কি পার্থক্য সানফ্রান্সিস্কো বৈঠকের সিদ্ধান্ত হইতে ভারতবাসীরা তাহা বুঝিয়া লইয়াছে। শিক্ষা-দীক্ষায় সম্পূর্ণ পৃথক বিদেশীর আওতায় স্বায়ত্তশাসনের অর্থ ভারতবাসীদের কাছে যে কার্যত পরাধীনতা ব্যতীত অন্য কিছুই নয় ভারতবাসীরা ইহা জানে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া স্বায়ত্তশাসনের মহিমায় দক্ষিণ আফ্রিকা মুগ্ধ নয়। কানাডাও যে সে বন্ধন হইতে মুক্তি চায়, তথাকার মণ্টরিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ কেনন লাইওনেল গ্রুল আমাদিগকে সেদিন সে কথা শুনাইয়াছেন। ভারতসচিবের কথার ফন্দী দেখিয়া মনে হয়, তিনি ভারতবাসীদের দাবী সম্বন্ধে 'স্বাধীনতা' শব্দটি উচ্চারণ করিতে নারাজ। তিনি নাকি ভারত সচিবের আসনে সমাসীন হইবার অব্যবহিতকাল পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষকে সমানাধিকার দানের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্কল্প সাধু; কিন্তু ইহাতে নূতনত্ব কিছু নাই। তাঁহার পূর্বগামী বহু ব্রিটিশ ধুরন্ধর সে সংকল্প অভিব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু কার্যত তাঁহারা ভারতের জন্য দাসত্বের শৃঙ্খল নূতন আকারেই প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তিনিও যে সেই একই চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা আমরা ইহার মধ্যেই বুঝিয়া লইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রস্তাবে গণ-পরিষদ এবং ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সন্ধি এই দুইটি গালভরা কথা আছে; কিন্তু কার্যত ঐ দুইটি কথার কোন মূল্য নাই এবং ধাপ্পাবাজী ছাড়া তাহা আর কিছুই নয়। গণের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, অথচ গণপরিষদ! ভারতবাসীদের নির্বাচনাধিকার অত্যন্তই সংকীর্ণ; এরূপ অবস্থায় জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব গণ-পরিষদে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? তাহা ছাড়া গণ-পরিষদের সিদ্ধান্ত যে চূড়ান্ত হইবে, এ সম্বন্ধে কি নিশ্চয়তা আছে? সেক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টেরই কর্তৃত্ব—তাঁহারা এত কাল উড়োজাহাজ এবং মেসিন কামান প্রয়োগ করিয়া ভারতবাসীদিগকে নিরাপদে স্বায়ত্তশাসনের পথ দেখাইয়াছেন, অতঃপর তাঁহাদের দোসর আমেরিকাকে সঙ্গে লইয়া প্রয়োজন হইলে আণবিক বোমা লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইবেন। সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে লজ্জার কিছুই নাই। এরূপ অবস্থায় ভারতবাসীদের স্বাধীনতার অধিকারকে প্রথমত স্বীকার করিয়া না লইলে গণ-পরিষদের প্রকৃত কোন অর্থই হয় না। তারপর অধীন দেশের সঙ্গে স্বাধীন জাতির সন্ধি এমন কথা লর্ড পেথিক লরেন্সের মুখেই নূতন শুনিতেছি; সম্ভবত তাঁহার বার্ধক্যই এক্ষেত্রে তাঁহার চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়াছে; কিন্তু এ সম্বন্ধে ভারতবাসীদের কোন বিভ্রম ঘটিবার কোন কারণ নাই।

মতিগতির স্বরূপ

বাস্তব অবস্থার চাপে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত নীতির অন্তর্নিহিত মনোভাবকে ভারতবাসীরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছে। এতকাল ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নাৎসী এবং জাপানী ফ্যাসিস্টরা বন্দীদের প্রতি কিরূপ নির্মমভাবে অত্যাচার করে, আমাদিগকে নানা ছলেবলে সেই কথা শুনাইয়াছেন; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী এবং শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর উপর লাহোর দুর্গে যে অত্যাচার করা হইয়াছে, জগতের কোন সভ্য দেশে তাহার তুলনা মিলিবে কি? বৃদ্ধ মৌলানা সাহেবকে আঠারো দিন দিবারাত্র হাতকড়া পরাইয়া রাখা হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের হাতে হাতকড়া আঁটিয়া গরাদের সঙ্গে তাঁহার হাত টানিয়া ঝুলাইয়া রাখা হইত, এইভাবে দেড়মাসকাল তাঁহাকে ঘুমাইতে দেওয়া হয় নাই এবং এই অবস্থায় যত রকমে সম্ভব নির্যাতন চালান হইয়াছে। এমন নির্মম অত্যাচারের কথা শুনিয়া যাহার অন্তরে কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব আছে, তাহার রক্তই গরম হইয়া উঠে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মতিগতি দেখিয়া এ অবস্থায় স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের ন্যায় পরপদলেহীই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন, অন্য কেহ নয়। আমরা জানি, ইহার উত্তরে এই কথা বলিবার আছে যে, যুদ্ধের অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে ঐ সব ব্যাপার ঘটিয়াছিল; তাহা ছাড়া, বর্তমানে বিলাতের গভর্নমেণ্টেরও পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে; কিন্তু সে পরিবর্তনের জন্য ব্রিটিশের ভারত সম্পর্কিত নীতির কোন পরিবর্তনই আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি না। বিভিন্ন প্রদেশে দমননীতি এখনও সমানভাবেই চলিতেছে এবং জনগণের প্রাথমিক অধিকার বিদলিত হইতেছে। ভারতের কারাগারসমূহে বহু দেশপ্রেমিক সন্তানগণ অদ্যাপি অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। ইঁহারা চোর নহেন, ডাকাত নহেন, দেশের স্বাধীনতাই ইঁহাদের একমাত্র কাম্য এবং সেই লক্ষ্য-সিদ্ধির উগ্র আগ্রহেই ইঁহারা বিদেশী গভর্নমেণ্টের কাছে অপরাধী হইয়াছেন। ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করাই যদি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য হইত, তবে ইঁহাদের মুক্তিতে তাঁহাদের আশঙ্কা করিবার কোন কারণই থাকিত না; প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের নাই; এরূপ অবস্থায় 'ভারত ত্যাগ কর' এই সংকল্পের সাধনাই আমাদের পক্ষে একমাত্র অবলম্বন।

মিটমাট অসম্ভব

গত তিন বৎসরকাল স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবাসীরা জীবনমরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল, এই সময় যাহারা জনযুদ্ধের বুলি আওড়াইয়া বিদেশী গভর্নমেণ্টের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে এবং কার্যত স্বৈরশাসকদের পশুশক্তিকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য নানারূপ ভ্রান্ত প্রচারকার্যের দ্বারা পুষ্ট করিয়াছে, ভারতবাসীরা তাহাদিগকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না। মুসলিম লীগের সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি অভ্রান্তভাষায় এই শ্রেণীর দেশদ্রোহীদের সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। মুসলিম লীগের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আরও চেষ্টা করা হউক, কেহ কেহ এমন প্রস্তাব

করিয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল, সর্দার বল্লভভাই প্রভৃতি নেতৃগণ এবার খোলাখুলিভাবেই বলিয়াছেন যে, তাঁহারা কোনক্রমেই অতঃপর মুসলিম লীগ কিংবা তাহার স্বৈরাচারী নেতা মিঃ জিন্নার দ্বারস্থ হইতে যাইবেন না। কংগ্রেস সুদীর্ঘকাল লীগের সঙ্গে আপোষ-রফা করিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখে নাই; কিন্তু মিঃ জিন্না ভারতের পরাধীনতাকেই দৃঢ় করিবার সঙ্কল্প লইয়া চলিতেছেন এবং কংগ্রেসের শক্তিকে খর্ব করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। মুসলিম লীগ এবং কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে কংগ্রেস এতদিন পরে নিজেদের নীতি যে অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতাকামী ভারত কংগ্রেস ব্যতীত অন্য কোন দলকে মানিয়া লইতে পারে না। যাঁহারা ভারতের স্বাধীনতাকামী, তাঁহারা কংগ্রেসকেই সমর্থন করেন এবং যাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধী, তাঁহারা কার্যত বিদেশী গভর্নমেন্টের প্রভুত্বকেই ভারতে প্রতিষ্ঠা করিয়া আছেন। এক্ষেত্রে নিরস্ত থাকিবার আর কোন অবসর নাই। সাম্রাজ্যবাদীদের মুখে যাহারা জনযুদ্ধ বলিয়া আখ্যা দেয় এবং যাহারা পাকিস্থানী দুয়া তুলিয়া দেশের সংহতি শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে, তাহারা দেশের স্বাধীনতার বিরোধী, আর এই দৃষ্টিতে তাহাদের সম্বন্ধে সমুচিত বিচার করিবার সময় আসিয়াছে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মদানে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে বিদেশীর পাদপোষক দলের কোনরূপেই আপোষ-নিষ্পত্তি সম্ভব হইতে পারে না।

পুনর্গঠনের পরিকল্পনা

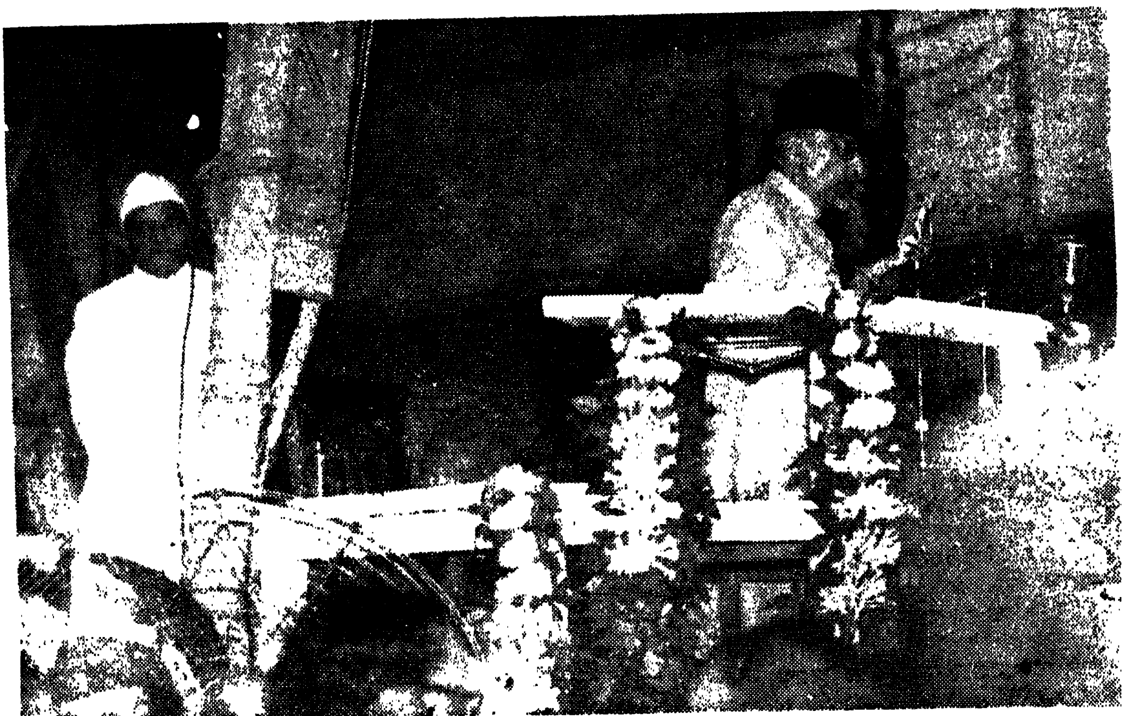
বাঙলা সরকার এতদিন পরে তাঁহাদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার মর্ম প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই পরিকল্পনা পুরাপুরি কার্যে পরিণত হইতে কুড়ি বৎসর লাগিবে, তবে পাঁচ বৎসরের মধ্যেই কিছু কিছু কাজ হইবে, তাঁহাদের এই বিশ্বাস। আপাতত শেষোক্ত এই অতিপ্রয়োজনীয় কাজগুলি তাঁহারা সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। এই পরিকল্পনায় বড় বড় কথা আছে, তাহার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ করিবার প্রস্তাবনা বিশেষভাবে বৈপ্লবিক। প্রস্তাবনা অনুসারে বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, বর্ধমান, হুগলী এবং সুন্দরবন এই কয়েকটি লইয়া প্রথমত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপের কাজ ধীরে আরম্ভ করা হইবে, পরে সমস্ত বাঙলা দেশে তাহা সম্প্রসারিত করা হইবে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সরকারকে ১৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার হইতে তাঁহারা এজন্য ৬৯ কোটি টাকা পাইবেন, তাহা ছাড়া ৫৩ কোটি টাকা ঋণ করা হইবে, অবশিষ্ট ২৩ কোটি টাকার ব্যবস্থাও সরকার কোনরকমে করিতে পারিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। পরিকল্পনা মন্দ, আমরা একথা বলিতেছি না; কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবে কাহারা? যাঁহাদের শাসনে আজও ভারতবর্ষ অন্নাভাবে ও বস্ত্রাভাবে অশেষবিধ কষ্ট পাইতেছে এবং বাঙলার বিগত দুর্ভিক্ষ যাঁহাদের শাসন-কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে, এদেশের জনসাধারণের কল্যাণসাধনে তাঁহারা একান্ত নিষ্কামভাবেই প্রণোদিত হইবেন, দেশের লোকের পক্ষে এতটা বিশ্বাস করিয়া উঠা কঠিন। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় হইবে সন্দেহ নাই এবং সেজন্য সহস্র সহস্র কর্মচারী ও কণ্ট্রাক্টরও নিযুক্ত হইবে নিশ্চিত; কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধনে এই আয়োজন, তাহা সার্থক হইবে কি? কেন্দ্রে যদি জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না থাকে, তবে এই ধরণের ব্যাপক পুনর্গঠন পরিকল্পনা কোন দেশে সার্থক হইতে পারে বলিয়া আমরা মনে করি না। রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এই সব দেশেও কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের প্রত্যক্ষ পরিচালনা ব্যতীত পুনর্গঠন পরিকল্পনা সার্থকতা লাভ করিতে পারিত না। কিন্তু বর্তমান পরিকল্পনায় তেমন জাতীয় স্বার্থ-সংরক্ষণমূলক প্রতিবেশকে স্বীকার করা হয় নাই। পক্ষান্তরে বর্তমান সিভিলিয়ানী স্বৈর শাসন-ব্যবস্থাকেই যে আরও পাকাপাকি করা হইবে, এমন অভিপ্রায়ই আলোচ্য পরিকল্পনা রচয়িতাদের মনে কাজ করিয়াছে। পুলিশ ও জেল বিভাগের শক্তিবৃদ্ধির প্রস্তাবেই তাহা সুস্পষ্ট। সরকারী বক্তব্য এই যে, যুদ্ধের পর বাঙলায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন অধিকতর অনুভূত হইবে; সুতরাং বর্তমান পরিকল্পনায় এই ব্যবস্থাও হইতেছে যে, পুলিশ বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করা হইবে এবং কারা-ব্যবস্থার প্রসার করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, পুলিশ বাহিনীকে অতি-আধুনিক মারণাস্ত্র দ্বারাও সুসজ্জিত করা হইবে। দেশের সংগঠন পরিকল্পনায় এই সব ব্যবস্থার কি প্রয়োজন, সাধারণের কাছে রহস্যবিশেষ মনে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ যে পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ না করিবে, সে পর্যন্ত কোন পুনর্গঠনের পরিকল্পনাই এখানে সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। কতকগুলি ফাঁকা কথায় দীর্ঘদিন অভাবগ্রস্ত জনগণকে ভুলাইয়া রাখা চলে না; সম্ভবত এই-জন্যই আলোচ্য এই পরিকল্পনায় আইন ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য আমলাতন্ত্রের হাতে শক্তিবৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। বস্তুত এমন পরিকল্পনায় দেশবাসীর কোন দিক হইতেই আশ্বস্তি বোধ করিবার কোন কারণ নাই।

পূজার কাপড়

বাঙলা সরকার সম্প্রতি একটি বিজ্ঞপ্তিতে জানাইয়া দিয়াছেন যে, পূজার জন্য অতিরিক্ত কাপড় সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না। কাপড়ের অভাব; অথচ আমরা শুনিতেছি যে, কতকগুলি বড় বড় মিলে বহু পরিমাণ কাপড় মজুত হইয়া পড়িয়া আছে। বাঙলা সরকারের অসামরিক সরবরাহ বিভাগ এই সব কাপড়ের দ্রুত বণ্টন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; ফলে মজুত কাপড়ে মূলধন আটক হইয়া পড়ার জন্য মিলগুলির উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইতেছে। মিলের এই অবস্থা; তথাপি দেশের লোকের পক্ষে বৎসরের মধ্যে একবার, পূজার কাপড় মিলিবে না। অনেকে মনে করিতেছিলেন, ১লা অক্টোবর হইতে পুরা-পুরি বস্ত্র রেশনিং প্রবর্তিত হইবার পর পূজার মুখে কলিকাতাবাসীদের কাপড়ের কষ্ট হয়ত কিছু দূর হইবে। কিন্তু কলিকাতা ক্লথ রেশন শপ্-এসোসিয়েশনের সম্পাদক মিঃ জি পি পাল সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে সে আশাতেও সকলকে নিরাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, লোকের ব্যবহারের উপযুক্ত ভাল কাপড় পাইবার জন্য তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাঁহাদিগের দোকানসমূহে এমন কাপড় দেওয়া হইতেছে যে, সেগুলি কলিকাতার অধিবাসীদের পক্ষে ব্যবহার করিবার পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নয়। পূজার বাজারে সে ধরণের কাপড় কোনদিনই চলে না। কর্তৃপক্ষ যদি জনসাধারণের অভাব মিটাইবার জন্য সত্যই আগ্রহপরায়ণ হইতেন, তবে এই ধরণের অভিযোগ করিবার কোন কারণ ছিল না বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কলিকাতার সম্বন্ধেই যখন তাঁহাদের এমন ঔদাসীন্য তখন মফঃস্বলের কথা না তোলাই ভাল। মফঃস্বলে বস্ত্রের অভাব সর্বত্র চলিতেছে, কতদিন চলিবে কে জানে? দেশের লোকের প্রতি সহানুভূতিহীন সিভিলিয়ানী শাসন-তন্ত্রের এমনই মহিমা; বলিবার কিছুই নাই। পরাধীন জীবনে শুধু সহ্য করিয়াই যাইতে হইবে; দুর্বলের প্রতি ভগবানেরই এই বিধান।



কারামুক্তির পর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ও মৌলানা আজাদের মধ্যে বোম্বাইয়ে প্রথম সাক্ষাৎকালে উভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন।



নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে প্রথম দিবসের অধিবেশনকালে মাইক্রোফোন খারাপ হইয়া যাওয়ায় রাষ্ট্রপতি বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করিতেছেন।

দেশের কথা

১লা আশ্বিন—৭ই আশ্বিন

বড়লাটের ঘোষণা—কংগ্রেসের কথা—দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাষ—অনাচারের অভিযোগ

বড়লাটের ঘোষণা—বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বিলাতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি গত ১৯শে সেপ্টেম্বর (২রা আশ্বিন) বেতারে যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার—স্বায়ত্ত-শাসন স্বীকারে বিলাতের সরকারের কোনরূপ আগ্রহাধিক্য প্রকাশ পায় নাই।

মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন পরিবর্তনে যে বলা হইয়াছিল, ভারতে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্তন বৃটেনের উদ্দেশ্য, তাহার স্থানে কেবল পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে, আগামী শীতকালে কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য-নির্বাচন হইবে এবং বিলাতী সরকারের আশা তাহার পরে সকল প্রদেশে রাজনীতিক নেতারা মন্ত্রীর দায়িত্ব স্বীকার করিবেন! তাহার পরে—যথাসম্ভব শীঘ্র প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদসমূহের প্রতিনিধি-দিগের সহিত আলোচনা করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিবেন—১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল সেই ক্রীপস প্রস্তাবেই তাঁহারা তুষ্ট হইবেন, কি—অন্য কোন প্রস্তাব চাহিবেন? কেবল তাহাই নহে—যে সামন্তরাজ্য শাসকদিগকে সিমলায় আলোচনাকালে বর্জন করা হইয়াছিল, তাঁহারাও কিরূপে শাসন-পদ্ধতি রচনার জন্য গঠিত সমিতিতে যোগ দিতে পারেন তাহা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে।

অর্থাৎ বর্তমানে যে সকল প্রদেশ ভারত-শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে গভর্নরের স্বৈরশাসনের অধীন সে সকল অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকিবে এবং নূতন নির্বাচন শেষ হইলে কতদিন পরে যুদ্ধ-কালের সেই পুরাতন ও পরিত্যক্ত ক্রীপস প্রস্তাবই আবার রাজনীতিকদিগকে পুষ্ট করিবে কিনা, তাহার আলোচনায় কালক্ষয় করা হইবে। আর যে সামন্ত-রাজ্য শাসকদিগকে সিমলায় আলোচনা-কালে অপ্রয়োজনীয় ও অনাবশ্যকবোধে অবজ্ঞা করা হইয়াছিল, তাঁহাদিগকেও তাঁহাদিগের আলোচনায় যোগদানের সর্ত জিজ্ঞাসা করা হইবে। অর্থাৎ অবস্থা আরও জটিল করা হইবে।

বড়লাট বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের সহিত কিরূপ সর্তে ব্যবস্থা করা হইবে বিলাতী সরকার তাহাও বিবেচনা করিতেছেন। তবে তাঁহাদিগের সে বিবেচনার আশু প্রয়োজনও বুঝা যায় না।

আর যতদিন এই সব উদ্যোগ ও আয়োজন চলিবে, ততদিন ভারত সরকারের কাজও চালাইতে হইবে—আবশ্যক অর্থ-নীতিক ও সামাজিক ব্যাপারের মীমাংসাও করিতে হইবে। আর পৃথিবীতে যে যুদ্ধান্ত ব্যবস্থা হইবে, তাহাতেও ভারতবর্ষকে তাহার কাজ করিতে হইবে। অর্থাৎ সে ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের স্বার্থ যত জড়িতই কেন থাকুক না—তাহার বিষয় দেশবাসীকে স্থির করিতে না দিয়া বর্তমান ভারত সরকারই স্থির করিবেন এবং আমলা-তান্ত্রিক সরকারের সিদ্ধান্তই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসন-পদ্ধতিকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। কেবল ব্যবস্থা পরিষদ-সমূহের সদস্য নির্বাচনের পরে বড়লাট ভারতবর্ষের সকল প্রধান রাজনীতিক দল কর্তৃক সমর্থিত শাসন-পরিষদ গঠন করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছেন।

বোধ হয়, লর্ড ওয়াভেল ও বিলাতের মন্ত্রীরা বুঝিয়াছেন, এই ঘোষণায় ভারত-বর্ষের লোকের জন্মগত অধিকার লাভের কামনা পূর্ণ হইবে না—তাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন না; সেইজন্য বড়লাট বলিয়াছেন—"ইহার অর্থ অল্প নহে। ইহাতে বুঝা যায়—বিলাতের সরকার যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনে উপনীত করিবার কার্যে অগ্রসর হইতে কৃতসংকল্প। বিলাতী সরকারের অনেক কাজ থাকিলেও কার্যভার গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা ভারতীয় সমস্যায় অবহিত হইয়াছেন। তাহাতেই ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসন লাভে সাহায্য করিতে তাঁহাদিগের আগ্রহের পরিমাণ পরিমাপ করা যাইবে।"

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট—দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন তাঁহাদিগের রিপোর্টে বাঙলার দুর্ভিক্ষের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রিপোর্টের দ্বিতীয় ভাগ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছেন, যাহাতে সকল লোক আহার্য পায়, সেজন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা সরকারের কর্তব্য। গত শত বর্ষে ভারতে সরকার দুর্ভিক্ষে বহু লোক-ক্ষয় নিবারণের কর্তব্য স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে কেবল অনশন নিবারণের ব্যবস্থা করিলেই হইবে না, পরন্তু লোক যাহাতে পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য পায়, সে ব্যবস্থা করিতে এবং লোক যাহাতে সবল ও সুস্থ হয়, তাহা করিতে হইবে। সে দায়িত্ব সরকার এখনও সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেন নাই।

অবশ্য বাঙলার দুর্ভিক্ষে সরকার যে বহু লোকক্ষয়ের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া কাজ করিয়াছিলেন, এমনও নহে। সচিবরা বলিয়াছিলেন, ভগবান যাহাদিগকে মৃত্যুমুখে পাতিত করেন—কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

কমিশন বলিয়াছেন, সরকার ১৯৪২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত "অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন কর" আন্দোলনে যে ফল লাভ করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার মতই নহে। কারণ, অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিতে যে সকল উপকরণ অনিবার্য, সে সকল—সেচের উন্নতি, অধিক সারের ব্যবস্থা—এ সকলই ছিল না।

কমিশন মত প্রকাশ করিয়াছেন, কৃষি বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট নীতির ও সেই নীতি কার্যে পরিণত করিবার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা প্রয়োজন। যতদিন ভারতে ভারতবর্ষের জন্য যে চাউল প্রয়োজন, তাহা উৎপন্ন না হয় ততদিন ব্রহ্ম হইতে চাউল আমদানী বাড়াইতে হইবে; ভারতে রেল, স্টীমার প্রভৃতিতে পূর্ববৎ মাল চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইবে; বর্তমানে পৃথিবী-ব্যাপী খাদ্যদ্রব্যের স্বল্পতা ও জাহাজের অল্পতা দূর করিতে হইবে; যথাসম্ভব শীঘ্র সেনাদল বিদায় দিতে হইবে।

অনাচারের অভিযোগ—দীর্ঘ দিন পরে বাঙলার কৃষক-প্রজাদলের সহকারী নেতা মৌলানা মহম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ, তাঁহার পুত্র শিশির ও শ্রীযুত অরুণ সেন পাঞ্জাবে মুক্তি পাইয়াছেন। মৌলানা সাহেবকে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই অক্টোবর চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার করিয়া বিমানে দিল্লীতে লওয়া হয় এবং তথা হইতে লাহোর ফোর্টে লইয়া ১৮ দিন রাখিয়া লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে পাঠান হয়। লাহোর দুর্গে ৩।৪ দিন তাঁহাকে নামাজের সময়েও হাতে হাত-কড়া দিয়া রাখা হইয়াছিল। লাহোর সেণ্ট্রাল জেলেও তাঁহাকে প্রায় নিঃসঙ্গ রাখা হইয়াছিল। গত ১৮ই আগস্ট লাহোরে বিরাট জনতা তাঁহাদিগকে সম্বর্ধিত করিয়াছিল। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ বলেন—তিনি প্রায় সাড়ে চার বৎসর পরে অত্যাচারী-দিগের কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন। তিনি বলেন, পাঞ্জাবের উচ্চপদস্থ গোয়েন্দা পুলিশের লোকরা দিবারাত্রি তাঁহাকে প্রশ্নে জর্জরিত করিতেন—"সুভাষচন্দ্র কি গান্ধীজীর পরামর্শে ভারত ত্যাগ করিয়া-ছিলেন?" —"জামনগরের শাসক কি জাপানীদিগের সহিত যোগ দিবেন?"—"পাঞ্জাবের সচিব সর্দার বলদেও সিংহ কি সুভাষচন্দ্রের বন্ধু? তিনি কি সুভাষচন্দ্রকে সাহায্য করিয়াছিলেন?" তিনি ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে তাঁহাকে প্রহার করা হইত। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, সৈনিকদিগকে দিয়া তাঁহাকে

গুলী করান হইবে। একবার—একটি ঘরের তাপ ১৬০ ডিগ্রি করিয়া তাঁহাকে সেই ঘরে লওয়া হয় এবং তিনি অজ্ঞান হইয়া না পড়া পর্যন্ত তাঁহাকে তথায় রাখা হয়।

অরবিন্দ বলেন, তাঁহাকে একাধিকবার গুলী করিয়া মারা হইবে বলিয়া ভয় দেখাইবার চেষ্টা হয়। তিনি বলেন, পাঞ্জাবের সচিব-সংঘ ইংরেজের দ্বারা সুপ্রকৃষ্ট হইয়া পুত্তলিকার মত ব্যবহার করিয়াছেন। পাঞ্জাব সরকার রাজনীতিক কারণে বন্দীদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা হীনতার পরিচায়ক।

দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাষ—ডক্টর ইন্দ্রনারায়ণ সেন মেদিনীপুরের কয়টি অংশ পরিদর্শন করিয়া আসিয়া যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন (১৯শে সেপ্টেম্বর), তাহাতে তিনি আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছেন, মেদিনীপুরে এবার আবার—১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের মত দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা আছে। মেদিনীপুর হইতে সাধারণত অন্যান্য জিলায় চাউল রপ্তানি হইত। এবার বৃষ্টির অভাবে তথায় ফসলের অবস্থা শোচনীয়। সদর ও তমলুক মহকুমাদ্বয়ে বৃষ্টির অভাবে ধান্য রোপণে এত বিলম্ব হইয়াছে যে কোন কোন স্থানে এবার আর ফসল হইবে না। তমলুক সহরের নিকটে ও সদর মহকুমার গোকুলপুর অঞ্চলে অনেক জমিতে চাষ হইতে পারে নাই—পথের পার্শ্বস্থ নালীতেও জল নাই। কাঁথি মহকুমার অবস্থা ঐরূপ শোচনীয় না হইলেও আশাপ্রদ বলা যায় না। ডক্টর যতীশচন্দ্র ঘোষ ঘাটালের কংগ্রেসকর্মী। প্রায় এক মাস পূর্বে তিনি এ বিষয় স্থানীয় রাজকর্মচারীদিগকে জানাইয়াছিলেন—এমন কি, বিলাতে প্রধান মন্ত্রীকে ও ভারতসচিবকে এবং এদেশে বড়লাটকে তার করিয়া সময় থাকিতে আবশ্যক উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। চন্দ্রকোণা নগরে পূর্বে মিউনিসিপ্যালিটিও ছিল; আজ তাহা মরুভূমির মত পরিত্যক্ত বলিয়া মনে হয়! সে অঞ্চলে শ্রমিকরা কার্যাভাবে অন্নাভাবে পীড়িত। বাজারে চাউলের অভাব—যে চাউল পাওয়া যায়, তাহার দাম ৮ আনা সের। দাসপুরের লোক বাঁধ দিয়া শিক্ষাবতী নদীর জল লইয়া সেচের জন্য ব্যবহার করিবার অনুমতি চাহিয়াছিল; কিন্তু রাজকর্মচারীরা সেজন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা জমা দিতে বলিয়াছিলেন। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি হইয়াছে। রূপনারায়ণ নদের পরপারে আরামবাগ মহকুমায়ও অবস্থা শোচনীয়। তথায় নাকি সাত শত পঁচিশটি গ্রামের মধ্যে মাত্র এক শত গ্রামে জমিতে চাষ হইয়াছে।

যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা—বাঙলা সরকার তাঁহাদিগের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার আভাস গত ২২শে সেপ্টেম্বর দিয়াছেন। ২০ বৎসরে পরিকল্পনানুযায়ী কাজ শেষ হইবে—মোট ব্যয় ২ শত ৫০ কোটি টাকা—প্রথম ৫ বৎসরের ব্যয় একশত ৪৫ কোটি টাকা। ২০ বৎসরে বাঙলার চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তের অবসান; পুলিশের ব্যবহার দৃঢ়ীকরণ; ময়মনসিংহ, ঢাকা, মেদিনীপুর, বাকরগঞ্জ—৪টি জিলার বিভাগ সম্পাদন এই পরিকল্পনার বিষয়। আর ইহা কৃষি, পণ্য-বিক্রয়, পথ, যানবাহন, সেচ, বন সমবায়-ব্যবস্থা, মৎস্যের চাষ, শিল্প, কলিকাতায় গৃহনির্মাণ, ঔষধ, শিক্ষা—সবই এই পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে। বলা হইয়াছে, যে সকল কাজ বিলম্ব না করিয়াই করা প্রয়োজন, কেবল সেই সকল কাজই করা হইবে। সেচের ব্যবস্থার মধ্যে দামোদর উপত্যকার উন্নতিসাধন সর্বপ্রধান। প্রথম ৫ বৎসরের ব্যয় ১৪৫ কোটি টাকার মধ্যে ৫৩ কোটি টাকা ঋণ করা হইবে—তাহাতে রাজস্ব নির্ভর করিয়া ঋণ গ্রহণের নিয়মভঙ্গ হইবে না। অবশিষ্ট ৯২ কোটি টাকার মধ্যে ভারত সরকার ৬৯ কোটি টাকা দিয়া সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তথাপি ২৩ কোটি টাকার কি হইবে? যদি বে-সামরিক সরবরাহ বিভাগের ব্যয়ভার হইতে অব্যাহতিলাভ ঘটে, তবে তাহাতে বার্ষিক অন্তত পাঁচ কোটি টাকা পাওয়া যাইতে পারিবে। মিস্টার এ এম মার্টিন যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন বোর্ডের সভাপতি, মিস্টার ওয়াকার সহকারী সভাপতি আর মিস্টার আজিজ আমেদ যৌথ সম্পাদক। ইঁহারা কেহই বাঙালী নহেন। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই পরিকল্পনা বাঙলার জন্য হইলেও এবং ইহার জন্য বাঙলার করদাতাদিগকে অন্তত ৫৩ কোটি টাকার সুদ দিতে হইলেও এই পরিকল্পনা রচনায় দেশের লোকের সাহায্য ও সহযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয় নাই। বাঙলার লোকের অধিকার কেবল সমালোচনাতেই সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে। ইহাই আমলাতান্ত্রিক কার্যের বৈশিষ্ট্য।

সৈনিকের উপদ্রব—'আনন্দবাজার পত্রিকা'র নিজস্ব সংবাদদাতা মেদিনীপুর হইতে সংবাদ দিয়াছেন—গত ২০শে সেপ্টেম্বর নিশীথের পরে সমরবিভাগের কতকগুলি লোক মেদিনীপুরে সংগতবাজার পল্লীতে গৃহ হইতে গৃহান্তরে কয়জন স্ত্রীলোকের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। তাহারা রাজপথে তাহাদিগের "জীপ" গাড়ি রাখিয়া গিয়াছিল। ঐ সকল লোক স্ত্রীলোকদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের গৃহে প্রবেশ করে এবং তথায় জিনিসপত্র নষ্ট করে ও কয়জন লোককে আহত করে। আহতদিগের মধ্যে কয়টি শিশুও ছিল। স্থানীয় কয়জন ভদ্রলোক ঘটনাস্থলে যাইয়া অনুসন্ধানে অবগত হইয়াছেন, দুর্বৃত্তেরা দুইজন স্ত্রীলোককে বলপূর্বক তাহাদিগের "জীপ" গাড়িতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় ট্রাম ধর্মঘট—কলিকাতার ট্রামের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের সহিত ট্রাম কোম্পানীর কর্মচারীদিগের ভাতা প্রভৃতি লইয়া মতভেদ হওয়ায় ট্রামের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা ধর্মঘট করিয়াছেন। ফলে কলিকাতার লোকের অসুবিধার অন্ত নাই। ট্রামের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা অহিংসভাবেই ধর্মঘটে অবিচলিত আছেন। বাঙলা সরকার কয়দিন ধর্মঘটের পরে মীমাংসার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। বাঙলা সরকার যদি প্রথমে দূরদৃষ্টি ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়া ট্রাম কর্মচারীদিগের দাবী বিবেচনা করিতেন, তবে যে অবস্থা জটিল হইত না, তাহা মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে।

ভারতের প্রাপ্য—যুদ্ধের সময় বৃটেনের নিকট ভারতের যে টাকা পাওনা হইয়াছে, তাহা পরিশোধ করিতে বৃটেনের আগ্রহের অভাবই পরিলক্ষিত হইতেছে। এমনও শুনা যাইতেছে, সে টাকায় ভারতকে বঞ্চিত করা হইবে। অথচ ভারতবর্ষ যুদ্ধে খাতক হইতে মহাজনে পরিণত হইয়াছে। ভারতের প্রাপ্য কি কেবল কাগজেই দেখাইয়া তাহা মুছিয়া ফেলা হইবে?

কংগ্রেসের কথা—গত ২৩শে সেপ্টেম্বর বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির অধিবেশন শেষ হইয়াছে। কংগ্রেস পুনরায় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিতে পারায় দেশের লোক কিরূপ আনন্দিত হইয়াছে, তাহা কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে ৩০ হাজার লোকের সমাবেশ হইতে বোঝা গিয়াছিল। লোকাধিক্যে বিচারবিবেচনার অসুবিধা ঘটে বলিয়া স্থির হইয়াছে, ভবিষ্যতে কার্যকরী সমিতির আর এইরূপ অধিবেশন হইবে না।

সুভাষচন্দ্র বসু যে "ভারতীয় জাতীয় সেনাদল" গঠিত করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে যদি প্রতিশোধাত্মক দণ্ড প্রদান করা হয়, তবে দেশে অসন্তোষের ব্যাপ্তি ঘটিবে—এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের রাজনীতিক অধিকার বর্ধন সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারের প্রস্তাব অসন্তোষজনক বলিয়া মত প্রকাশ করা হইয়াছে।

স্থির হইয়াছে—কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস নির্বাচনপ্রার্থী মনোনীত করিবেন। সেই জন্য মনোনয়ন বোর্ড গঠন করা হইবে এবং কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীদিগকে যে বিবৃতি প্রদান করিতে হইবে, তাহাও রচিত হইবে।

কার্যকরী সমিতির অধিবেশনের পূর্বে ও পরে এবং অধিবেশনের সময়েও বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বর্তমান সমস্যাসমূহের আলোচনা করিয়াছেন।

আশাবরী

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অশোকের শয়ন-কক্ষে মেহগিনি কাঠের একটা মূল্যবান সুদৃশ্য খর্ব আলমারি ছিল, যাহার মধ্যে টাকা-কড়ি এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থাকিত। শক্তিকে লইয়া সেই আলমারির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অশোক বলিল, "এই তোমার আলমারি যার চাবি তোমাকে এখনি দিলাম। দরজা খুললে দেখবে জিনিসপত্র রাখবার অনেক রকম সুব্যবস্থা এর মধ্যে আছে। আমার টাকাকড়ি এই আলমারিতে থাকে; তোমার অ্যাটাশি কেসের জিনিসপত্রও এর মধ্যে থাকবে।"

অশোকের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া শক্তি বলিল, "তা থাকবে,—কিন্তু চাবি তোমার কাছেই রাখো,—নইলে তোমার অসুবিধে হবে।"

স্মিতমুখে অশোক বলিল, "কিন্তু অসুবিধে ভোগ করবার জন্যেই ত' একটু লোভ হচ্ছে শক্তি। চাবি তোমার কাছেই থাক।"

"ডুপ্লিকেট্ চাবি নেই?"

অশোক কহিল, "এখানে নেই, বাজিতপুরে রেখে এসেছি। আমার লক্ষ্মীর পেটির চাবি তোমাকে দিলাম। এ দেওয়া যে কতখানি দেওয়া তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। এ দেওয়ায় এ বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্রের ভার তোমার উপর পড়ল,—এমন কি হাত-পা-ওয়ালা যে জিনিসটা এ বাড়িতে সর্বক্ষণ ন'ড়ে-চড়ে বেড়ায় তার ভার পর্যন্ত।" কথাটা একটু গভীর সুরের শুনাইল, বোধ করি তাহাই মনে করিয়া, কৌতুকের ঈষৎ আমেজ লাগাইয়া কথাটাকে একটু সহজ করিয়া লইবার অভিপ্রায়ে সে পুনরায় বলিল, "হাত-পা-ওয়ালা জিনিস বলতে চেয়ার-টেয়ারের মতো কাঠের কোনো জিনিস বোঝাতে চাচ্ছিনে, তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। যে জিনিস বোঝাতে চাচ্ছি, তার হাত-পা-ই শুধু আছে তা নয়, হৃদয় নামে একটা ব্যাপারও আছে।" বলিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। কারণ, বস্তুত যে জিনিস সামান্য নহে, তাহাকে সামান্য করিবার চেষ্টাই তাহার অসামান্যত্বকে আরও রঙিন করিয়া তুলিল। তাই, যে কথা মুখে হাসি দিবার কথা, তাহা শক্তির দুই চক্ষে অশ্রু টানিয়া আনিল; এবং সেই উৎসিক্ত অশ্রু অশোকের দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার উদ্দেশ্যেই সে যে নতনেত্রে আলমারির বৃহৎ চাবিটা লইয়া নাড়া-চাড়া আরম্ভ করিল তাহা বুঝিতে পারিয়া অশোক বলিল, "আলমারিটা খুলে কোথায় কি আছে একটু দেখে রাখ, ততক্ষণে আমি তোমার অ্যাটাশি কেসটা নিয়ে আসি।"

মিনিট পাঁচ সাত পরে অ্যাটাশি কেস লইয়া ফিরিয়া আসিয়া অশোক দেখিল তখনো শক্তি আলমারি খুলে নাই, চাবি হাতে লইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে। পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ইতস্তত করবার কারণ নেই শক্তি, খুলে ফেল।"

ইহার পর আর বিলম্ব না করিয়া শক্তি চাবি দিয়া দরজা খুলিল। আলমারির বাহিরটা যেমন সুদৃশ্য, ভিতরটাও তেমনি বিচিত্র। নানাপ্রকার দ্রব্যাদি রাখিবার উপযোগী নানা আকারের এবং গঠনের খোপ, খাপ, দেরাজ এবং টানায় পূর্ণ। ঠিক এরূপ ব্যবস্থার আলমারি সাধারণত দেখা যায় না,—নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী অর্ডার দিয়া অশোক বিশেষ যত্নপূর্বক করাইয়াছে।

একটা টানা খানিকটা খুলিয়া সে বলিল, "এইটি হচ্ছে আমার ধনভাণ্ডার। নোট, টাকা, আধুলি, সিকি—এই সব রাখবার আলাদা আলাদা খোপ এর মধ্যে আছে।" তাহার পর দুইখানা তিন অঙ্কের ও খান তিনেক দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মনিব্যাগে ভরিয়া লইয়া বলিল, "এবারও নিজেই নিলাম, কিন্তু এর পর থেকে দরকার হ'লে তোমার কাছে হাত পাতব।"

অপাঙ্গে অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শক্তি বলিল, "ভারি অসুবিধে হবে কিন্তু তোমার।"

স্মিতমুখে অশোক বলিল, "বললাম ত', সেই অসুবিধের জন্যে মনটা লোলুপতর হ'য়ে উঠেছে। ধর, বেলা তখন চারটে; তুমি স্নানঘরে স্নান ক'রছ; ঝর ঝর ক'রে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে; আমি দরজার সমুখে গিয়ে দোরে অল্প ধাক্কা মেরে বললাম, ওগো, শুনছ? কল বন্ধ ক'রে তুমি জিজ্ঞাসা করলে, কে? আমি বললাম, তোমার খাস তালুকের প্রধান প্রজা। বুঝলাম বন্ধ ঘরের মধ্যেও মিষ্টি হাসিতে তোমার মিষ্টি মুখখানি ভ'রে উঠেছে। বললে, আচ্ছা দাঁড়াও, যাচ্ছি। তারপর কলটা অল্প একটু ঝর ঝর শব্দ ক'রেই থেমে গেল। মিনিট দুই-তিন কাপড়-চোপড়ের খস্‌খসানি; তারপর খুট ক'রে ছিটকিনি খোলার শব্দ ক'রে তুমি বেরোলে। অগোছালোভাবে শাড়ি পরা; সাবান-মাখা সদ্যস্নাত দেহে ঠিক যেন টাটকা ননীর কোমলতা; চোখে কিন্তু ভারি মিষ্টি ধরণের তীক্ষ্ণ একটু ভ্রূকুটি; বললে, সকাল বেলা অতগুলো টাকা দিলাম, এরি মধ্যে সব উড়ে গেল? আমি হেসে বললাম, সব। এবার যখন টাকা দেবে পাখাগুলো কেটে দিয়ো, তা হ'লে উড়তে পারবে না। তুমি বললে, তাই করতে হবে দেখছি। আচ্ছা, বল দেখি শক্তি, এর জন্যে লোভ হয় না? নিজের হাতে টাকা রেখে যখন-তখন ইচ্ছে মতো টাকা নিতে পারা, এর চেয়ে খুব সুবিধের ব'লে মনে কর কি তুমি?"

কল্পনার এই দীর্ঘ এবং মধুর বর্ণন শুনিতে শুনিতে একটা প্রগাঢ় আবেশে শক্তির মন আচ্ছন্ন হইয়াছিল। অশোকের কথা শেষ হইলে সভীত স্মিতমুখে ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে সে বলিল, "তোমার লোভ হয়, আমার কিন্তু ভয় করে।"

বিস্মিত কণ্ঠে অশোক বলিল, "ভয় করে? কেন, কিসের ভয়?"

ভয় যাহার, তাহা শক্তির পক্ষে এমনই মর্মন্তুদ বিপদের কথা যে, সহসা সে কথা তাহার মুখ দিয়া প্রকাশ হইতে পারিল না।

উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া অশোক বলিল, "বুঝেছি কিসের তোমার ভয়। কিন্তু বাবার মত পাবার সুযোগের জন্যে আমরা যদি ধৈর্য ধ'রে কিছুকাল অপেক্ষা করি, তা হ'লে বিশেষ কিছু ভয় আছে ব'লে মনে হয় না।"

অশোকের কথা শুনিয়া শক্তির মুখে উৎকণ্ঠার ছায়াপাত হইল। চিন্তিত স্বরে বলিল, "আমার বিষয়ে বাবার কি তা হ'লে অমত আছে?"

স্মিতমুখে অশোক বলিল, "তোমার অস্তিত্বই যখন বাবার জানা নেই, তখন তোমার বিষয়ে মতামতের কোনো কথাই ত' উঠতে পারে না শক্তি।"

"তবে?"

তবে! অশোক ভাবিল, তবেই ত বিপদ! এই একটি কথার কঠিন প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিতে হইলে নিরঞ্জনপুরের জমিদার-দুহিতার প্রসঙ্গই উত্থাপিত করিতে হয়।

কিন্তু আপাতত সে কথা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা না করিয়া অশোক বলিল, "'তবে' যা, তার চিন্তার আর সমাধানের ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

"শুধু নিশ্চিন্ত থাকব? তা ছাড়া আর কিছু করবার নেই?"

"আছে। এক বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবার আছে তোমার।"

"কি বল?"

"আমি তোমার কাছে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ, সে প্রতিশ্রুতির কথা আমার সম্মতি ভিন্ন কারো কাছে কিছুতে তুমি প্রকাশ ক'রবে না। এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পার।"

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করিয়া শক্তি বলিল, "দিলাম সে প্রতিশ্রুতি। কিন্তু কেউ যদি তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা জিজ্ঞাসা করে তাহলে কি বলব তাকে?"

অশোক বলিল, "ঠিক এই কথা একটু আগে নবগোপালবাবুও আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাঁকে যা বলেছি তোমাকেও তাই বলছি। বলবে, তুমি আমার বন্ধু নবগোপালবাবুর দূর সম্পর্কের বোন, কলকাতায় আমাদের বাসায় এসে উঠেছ স্কুলে আর হোস্টেলে ভর্তি হবার জন্যে।"

অশোকের কথা শুনিয়া শক্তির মুখমণ্ডল মুহূর্তের জন্য মলিন হইয়া পুনরায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিল, "এ কথা ত সত্যি কথা নয়, কিন্তু এ কথাকে সত্যি ক'রে দিতে পার তুমি।"

"কি ক'রে?"

"আমাকে ইস্কুলে আর হোস্টেলে ভর্তি ক'রে দিয়ে? তা হ'লে কিন্তু লোকের কাছে আর মিথ্যে কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। যতদিন না বাবা আমাকে হোস্টেল থেকে ছাড়িয়ে আনবার মত করেন, আমি হোস্টেলে থাকি।" অশোকের দিকে সামনা-সামনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে শক্তি বলিল, "এ কিন্তু চমৎকার কথা! ভারি চমৎকার কথা! দেবে আমাকে হোস্টেলে ভর্তি ক'রে? বল না, দেবে?"

মৃদু হাসিয়া অশোক বলিল, "এ বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্যে এত ব্যস্ত কেন শক্তি?"

"পাকা হ'য়ে এ বাড়িতে ফিরে আসবার জন্যে।"

"এবারও কাঁচা হ'য়ে আসনি। আচ্ছা, হোস্টেলের কথা পরে হবে, আপাতত তোমার অ্যাটাসি কেসের জিনিসগুলো আলমারিতে ঠিক ক'রে গুছিয়ে রেখে স্নান ক'রে নাও। নবগোপালবাবুকে স্নান করতে পাঠিয়ে এসেছি, এতক্ষণে বোধ হয় তাঁর স্নান হ'য়ে গেল। স্নান ক'রে চা খাবার খেয়ে দুজনে একটু বিশ্রাম কোরো। প্রণবকে নিয়ে আমি একটু বেরুচ্ছি, কিন্তু সে জন্যে তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না, বিনোদ আর গোবিন্দ সব ব্যবস্থা করবে। বিনোদ আমাদের পুরোনো চাকর, আর গোবিন্দ বামুন।"

"ফিরতে তোমার কত দেরি হবে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "বেশি হবে না, বড় জোর ঘণ্টা দুই।" বলিয়া সে প্রস্থান করিল এবং যাবার পূর্বে অ্যাটাশি কেসের জিনিসগুলো আলমারিতে গুছাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া লইবার জন্য শক্তিকে আর এক দফা তাগাদা দিয়া গেল।

অশোক চলিয়া গেলে শক্তি ক্ষণকাল উন্মুক্ত আলমারির সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শিবানীপুরের ভয়াবহতা এবং ভবতারার নিগ্রহ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া সহজ হিসাবে যে পরিমাণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিবার কথা, তাহার দেখা ত পাইলই না, উপরন্তু একটা অনির্দেয় আশঙ্কা এবং উদ্বেগের চাপে সমস্ত মনটা ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বিবাহে অশোকের পিতার সম্মতি লাভের পক্ষে কি এমন অসাধারণ বাধা থাকিতে পারে যাহাতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য অশোকের উপর সমস্ত চিন্তার ভার অর্পণ করিয়া তাহাকে শুধু নিশ্চিন্ত থাকিতে হইবে, সে কথা ভাবিয়া তাহার দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। মনে হইল, এই যে অশোকের নানা প্রকারে আশ্বাস-আপ্যায়ন, এই যে অকুণ্ঠিত সোহাগ-যত্ন প্রদর্শন, এই যে আলমারির চাবি অর্পণের দ্বারা গৃহপরিধির মধ্যে তাহার মর্যাদা স্থাপন এ সকলের গর্ভে হয় ত' কোথাও এমন একটা গলদ অথবা দুর্বলতা আছে, যাহাতে এই আপাতসুদৃঢ় নিরাপত্তা যে কোনো মুহূর্তে ভাঙিয়া পড়িতে পারে। তখন পুনরায় কোথায় মিলিবে নূতন আশ্রয়? শিবানীপুর হরিপুরের পথ ত' শেষ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে। আর সে পথে প্রত্যাবর্তন নাই। তখন?

"দিদিমণি।"

শক্তি ফিরিয়া দেখিল দরজার সম্মুখে বারান্দায় এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া, অনুমানে বুঝিল বিনোদ। বলিল, "কিছু বলছ আমাকে?"

"নবগোপালবাবুর চান হয়ে গেছে, আপনি এবার চান করে নিন। সারা-দিন নাওয়া-খাওয়া নেই, দেহ একেবারে ঝামরু হয়ে গেছে।"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল, 'না, এমন কিছু কষ্ট হয় নি। তোমার নাম বুঝি বিনোদ?'

শক্তির সুমিষ্ট সুন্দর কিশোরী মূর্তি দেখিয়া বিনোদ এমনই মুগ্ধ হইয়াছিল, তদুপরি শক্তির মুখে তাহার নাম উচ্চারিত হইয়া শুনিয়া একেবারে গলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভূমিতলে মাথা ঠেকাইয়া গড় করিয়া নম্রকণ্ঠে বলিল, 'আজ্ঞে, হ্যাঁ দিদিমণি, আপনাদের শিরিচরণের দাস বিনোদ।'

দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত করিয়া প্রশান্ত মুখে শক্তি বলিল, 'কল্যাণ হোক। আচ্ছা, তুমি চল বিনোদ, আমি এই বাক্সটা আলমারিতে তুলে রেখেই আসছি।'

দুই পা আগাইয়া গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বিনোদ বলিল, 'চা-খাবার খেয়ে আপনাকে একটু বিশ্রাম নিতে বলে গেছেন দাদাবাবু। আপনি চান করতে গেলেই আমি এই ঘরে আপনার শয্যে করে দেব।'

বিনোদের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া শক্তি বলিল, 'এই ঘরে? এ ঘরে কোথায় বিনোদ?'

শক্তির কথায় বিনোদও বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কেন, ঐ পালঙ্কের ওপর।'

'আর, তোমার দাদাবাবুর শয্যে কোথায় হবে?'

'দাদাবাবুর আর নবোবাবুর শয্যে মাঝের ঘরে করতে বলে গেছেন।'

'মাঝের ঘরে?' মাঝের ঘরে ত খাট-পালঙ্ক কিছু নেই বলে মনে হচ্ছে?'

'না তা নেই,—ভুঁয়েই হবে। খাসা চমৎকার শুকনো মেঝে, কোন অসুবিধে হবে না।'

এ ব্যবস্থা শক্তির আদৌ মনঃপূত হইল না; বলিল, 'তোমার দাদাবাবুর অসুবিধে হবে বিনোদ, তুমি আমার শোবার আর কোন ব্যবস্থা কর।'

মৃদু হাসিয়া বিনোদ বলিল, 'এছাড়া আর কি ব্যবস্থা হবে দিদিমণি? দক্ষিণের ঘর কত্তা-মহারাজের জন্যে রেজাব থাকে। ও-ঘর শুধু ঝাড়া-পোঁছাই হয়।'

সকৌতূহলে শক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "রেজাব কি?"

বিস্মিত কণ্ঠে বিনোদ বলিল, "রেজাব জানেন না? রেজাব রেজাব। রেল গাড়ির কামরা রেজাব হয় না? তাই।"

এইবার বুঝিতে পারিয়া শক্তি বলিল, "ও, বুঝেছি। রিজার্ভ।"

অল্প একটু হাসিয়া বিনোদ বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, রেজাব। তা হ'লে দক্ষিণের ঘর গেল। মাঝের ঘরে দাদাবাবু রাত বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত লেখাপড়া করেন, সে ঘরে শুলে আপনার নিদ্রের অসুবিধে হবে। তা হ'লে, এ ঘর ছাড়া আর কি ব্যবস্থা হ'তে পারে তা বলুন? তা ছাড়া, আপনাকে ভুঁয়ে শুইয়ে দাদাবাবু কখনই পালঙ্কে শোবেন না।"

কেন শোবেন না, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে বিনোদ কি বলে শুনিতে একবার শক্তির ইচ্ছা হইল, কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করিয়া বলিল, "আচ্ছা, আগে তোমার দাদা-বাবু আসুন, তারপর যা করতে হয় করো।"

করজোড়ে বিনোদ বলিল, "এমন আদেশ করবেন না দিদিমণি। তাঁর হুকুম তামিল করে না রাখলে তিনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবেন। তার চেয়ে তিনি এলে যা বলবার হয় আপনি তাঁকেই বলবেন।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তাই হবে।" বলিয়া শক্তি অ্যাটাশি কেস খুলিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া না রাখিয়া একটা বড় দেরাজের ভিতরে অ্যাটাশি কেসটা স্থাপন করিয়া আলমারি বন্ধ করিয়া স্নান করিতে গেল।

১৮

রাত্রি তখন সাড়ে নয়টা। দ্রুততম বেগে ইলেকট্রিক পাখাটা চালাইয়া দিয়া নবগোপাল উপাদেয় চা এবং উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য সেবনে পরিতুষ্ট তাহার অনাবৃত ঘনকৃষ্ণ দেহ দুগ্ধশুভ্র শয্যার উপর নিক্ষেপ করিয়া নাক ডাকাইয়া পথশ্রম অপনোদন করিতেছিল এবং অদূরে অশোকের টেবিল চেয়ারে বসিয়া শক্তি একখানা বাঙলা মাসিক পত্রের উপর চোখ বুলাইতেছিল, এমন সময়ে ঘর্ঘর শব্দ করিয়া একটা ঘোড়ার গাড়ি বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইহার দুই তিন মিনিট পরে উপরে আসিল অশোক এবং তাহার পিছনে পিছনে গোটা তিন চার বাণ্ডিল লইয়া বিনোদ।

বই ছাড়িয়া শক্তি অশোকের অপেক্ষায় সিঁড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; অশোককে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত দেরি হ'ল যে?"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "এত নয়, একটু। এই জিনিসপত্তোরগুলো কিনতে সামান্য দেরী হ'য়ে গেল।" তাহার পর পিছন ফিরিয়া বিনোদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "শোবার ঘরে ওগুলো রেখে চট্ ক'রে একটু চায়ের জল চড়িয়ে দে বিনোদ।"

চায়ের জলের ফরমাস শুনিয়া বিস্মিত কণ্ঠে শক্তি বলিল, "এত রাত্রে এখন আবার চা খাবে না-কি তুমি?"

সহাস্য মুখে অশোক বলিল, "ইচ্ছে করলে তুমিও এক পেয়ালা খেতে পার।"

শক্তির কথায় বিনোদ উৎসাহ এবং সাহস পাইয়াছিল; তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো ঘরে রাখিয়া বাহির হইয়া আসিতে আসিতে বলিল, "সময় নেই অসময় নেই যখন তখন চা খেয়ে খেয়েই ত' শরীলের এই দশা হয়েছে!"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অশোক বলিল, "তুই আবার শরীলের কোন্ খানটায় দুর্দশা দেখলি শুনি?"

অশোকের কান্তিমান সুনিবদ্ধ শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিনোদ বলিল, "না, তাই বলছি, হরদম চা খেলে দেহো বিগড়োতেই বা কতক্ষণ।" তাহার পর শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "জল তা হলে চড়াবো না-কি দিদিমণি?"

এবার অশোক হো হো করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "আমি চা খাবো তা জল চড়াবি কি-না দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করছিস কেন? দিদিমণি আমার গার্জেন না-কি?"

মাথা নাড়িয়া বিনোদ বলিল, "না, না গার্জেন কেন হবে? হিতো কথা বললেই গার্জেন হয় নাকি?"

"আচ্ছা, হিতো কথাই যদি হয়, তা হ'লে তোর দিদিমণি যা হুকুম করেন তাই না হয় কর্।" বলিয়া অশোক কক্ষে প্রবেশ করিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শক্তিও ঘরে প্রবেশ করিয়া অশোকের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। অশোক তখন একটা বড় বাণ্ডিলের বাঁধন খুলিতে ব্যস্ত ছিল, আপাতত সেটা ফেলিয়া রাখিয়া শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বাপ রে! বাড়িতে পা দিয়েই একেবারে ষোল আনা শাসন নিজের হাতে নেবার উপক্রম দেখছি। কি করলে? চা মঞ্জুর করলে, না, নামঞ্জুর করলে?"

অশোকের কথা শুনিয়া শক্তির অধর-প্রান্তে নিঃশব্দ ক্ষীণ হাস্য দেখা দিল, বলিল, "মঞ্জুরই করলাম। ক্লান্ত হ'য়ে এসে চা চাইলে, প্রথম দিনেই বাদ সাধব?"

"বাদ সাধলে কিন্তু আরও বেশি খুশি হতাম।"

"কেন?"

সহাস্য মুখে অশোক বলিল, "আমার হুকুম নাকচ করবার উপযুক্ত একজন লোকের এ বাড়িতে শুভাগমন হয়েছে অনুভব ক'রে। সত্যি বলছি শক্তি, হুকুম চালিয়ে, আর হুকুম তামিল হওয়া দেখে দেখে মনটা উগ্র হ'য়ে শুকিয়ে উঠেছিল। আজ তোমার কর্তৃত্বের অধীন হবার একটু আমেজ পেয়েই কতকটা যেন সরস হয়ে এসেছে।"

অশোকের কথা শুনিয়া শক্তি একটু পরিহাস করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; মুখ টিপিয়া অল্প একটু হাসিয়া বলিল, "তা হ'লে আরও খানিকটা সরস করবার ব্যবস্থা করব না কি?"

সকৌতূহলে অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে?"

"মাঝের ঘরে তোমার বিছানা করবার যে হুকুম দিয়েছে, সে হুকুম নাকচ ক'রে?"

"তবে কোন্ ঘরে আমার বিছানা করবার হুকুম দেবে?"

"কেন, এই ঘরে।"

এবার কৌতুকের নিঃশব্দ হাস্যে অশোকের মুখ উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; বলিল, "তা হ'লে খানিকটা নয়, যথেষ্টই সরস হ'য়ে ওঠে। কিন্তু লোক-নিন্দার ভয় আছে শক্তি।"

বিস্মিত কণ্ঠে শক্তি বলিল, "কেন? লোক নিন্দার ভয় কিসে?"

তেমনি স্মিতমুখে অশোক বলিল, "তোমার আমার এক ঘরে শোওয়ার পক্ষে প্রণয়ই যথেষ্ট নয়, তার জন্যে পরিণয়ও দরকার। সুতরাং সারারাত্র তুমি পালঙ্কের ওপর, আর আমি নিচে মেঝেতে শুলেও অরসিক লোকে নিন্দা করতে ছাড়বে না। আর, সংসারে অরসিক লোকই বেশি, তা তুমি নিশ্চয়ই জানো।"

অশোকের কথা শুনিয়া শক্তির মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল; সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, সে কথা আমি বলছিনে। আমি বলছি, মাটিতে তোমার শোওয়া হবে না, তুমি পালঙ্কে শোবে।"

কপট গাম্ভীর্যে মুখ ভারি করিয়া অশোক বলিল, "নিচে না শুয়ে আমিও পালঙ্কে শুলে সরসতার অবশ্য পরাকাষ্ঠা হয়, কিন্তু তা'তে লোকনিন্দার মাত্রাও চরমে উঠবে।"

এবার শক্তি হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "দেখ, বুঝে-সুঝে চালাকি কোরো না। পালঙ্কে 'তুমিও' শোবে না, শুধু তুমি শোবে।"

"আর তুমি।"

"আমি অন্য কোনো ঘরে মেঝেতে।"

তেমনি গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া অশোক বলিল, "কিছুতে না! এ বাড়ির ভবিষ্যৎ মহিমান্বিতা কর্ত্রীর শুভাগমনের প্রথম দিনে তাঁকে মেঝেতে শুইয়ে নিজে পালঙ্কে শুলে অক্ষমনীয় অপরাধ হবে।"

সলজ্জস্মিত মুখে শক্তি বলিল, "আর এ বাড়ির বর্তমান মহিমান্বিত কর্তাকে মেঝে শুইয়ে নিজে পালঙ্কে শুলে সারা রাত আমার ঘুম হবে না।"

অশোক বলিল, "এই যদি তোমার আপত্তি হয় তা হ'লে কালই না হয় আর একখানা খাট আনা যাবে। কিন্তু আজকের মতো আমার ব্যবস্থাই বলবৎ থাক্। উপস্থিত জিনিসগুলো আলমারিতে তুলে রাখ, প্রণব আর মালতী এসে পড়লে অসুবিধে হবে।"

"আজ রাত্রে তাঁরা আসবেন না কি?"

"হ্যাঁ, একটু পরেই।"

"মালতী কে?"

"প্রণবের সহোদরা বোন।"

"বয়স কত?"

"তোমারই বয়স হবে।"

"বিয়ে হয়েছে?"

"না, এখনো হয়নি। তোমারই মত কতকটা স্থির হয়ে আছে।"

"কতকটা? কার কতকটা? তার কতকটা,—না, আমাদের দুজনেরই কতকটা?"

হাসিয়া ফেলিয়া অশোক বলিল, "এখনো যখন বাবার মত আদায় করা হয়নি তখন

দুজনেরই কতকটা বললে হিসেবে বোধ হয় খুব ভুল করা হয় না।"

অশোকের উত্তর শুনিয়া শক্তির মুখে একটা কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিল, যাহা রাত্রির অস্পষ্ট আলোকে অশোক বুঝিতে পারিল না। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া সে বলিল, "দুজনেরই কতকটা স্থির হ'য়ে আছে একই লোকের সঙ্গে নয় ত?"

এবার অশোক উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; বলিল, "হয় তুমি গত জন্মে কোনো বড় ব্যারিস্টার ছিলে, নয় কোনো বড় ব্যারিস্টারের অশরীরী আত্মা তোমার মধ্যে ভর করেছে। এমন ক'রে জেরা আরম্ভ করেছ যে, বিশেষ সতর্ক হ'য়ে উত্তর না দিলে অকারণে বিপদে প'ড়ে যেতে পারি! কিন্তু তোমার কোনো ভয় নেই, স্বপ্নেও মালতী তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।"

"তবে সে কেন আসছে?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অশোক বলিল, "তবে মানে? তা 'নইলেই সে আসতে পারত না কি?"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল, "আচ্ছা, তবে বলাটা না হয় ভুল হয়েছে। কেন আসছে বল না?"

"আজ প্রণব আর মালতী এখানে খাবে, আর রাত্রে মালতী তোমার কাছে শোবে।"

বিস্ময়ে চকিত হইয়া উঠিয়া শক্তি বলিল, "আমার কাছে শোবে? কেন, কিসের জন্যে?"

"একা শুতে তুমি হয় ত ভয় পেতে পার।"

"কিসের ভয়?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "ধর, ভূতের ভয়।"

প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "না, না,—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান,—কোনো কিছুরই ভয় আমার নেই।"

সহাস্যমুখে অশোক বলিল, "ভবিষ্যতে আমি তোমার বিবাহিত স্বামী, তাই ভবিষ্যতের বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত; কিন্তু বর্তমানে আমিত তা নই, সুতরাং বর্তমানে আমার বিষয়ে কিছু ভয় তোমার থাকতে পারে।"

কথাটা বুঝিতে পারিয়াও ইচ্ছা করিয়া উল্টাইয়া দিয়া শক্তি বলিল, "বর্তমানে তোমার বিষয়ে আমার যা ভয়, তা থেকে রক্ষা করবার সাধ্য মালতীর নেই।"

সকৌতূহলে অশোক জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল, "সে কথার আলোচনা করলে তোমার আদেশ অমান্য করা হবে। সমস্ত দুশ্চিন্তার ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিয়ে তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছ।"

শক্তির কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "ও! সেই কথা বলছ? আমি কিন্তু ঠিক সে কথা বলছিলাম না।"

শক্তি বলিল, "তুমি যা বলছিলে তা ত পরিহাস করে বলছিলে। কিন্তু পরিহাস করেও তোমার ও কথা বলা উচিত নয়। তোমার ওপর যে বিশ্বাস নিয়ে এ বাড়িতে বাস করতে এসেছি, তাতে তোমার সঙ্গে একঘরে রাত কাটাতেও দ্বিধা করিনে। মালতীকে পাহারা লাগালে সে বিশ্বাসকে অপমানিত করা হবে।"

শক্তির কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে অশোক বলিল, "না, না শক্তি, মালতীকে পাহারা লাগাবার কোনো কথা এর মধ্যে নেই। তোমার এবং আমার জন্যে দরকার না থাকলেও অপর লোকের চোখের জন্যে কোনো একজন মালতীর দরকার; সেই কথাই তোমাকে আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম। তুমি যখন বলছ তার দরকার নেই, তখন খাইয়ে-দাইয়ে মালতীকে ফেরৎ পাঠিও।"

মনে মনে শক্তি কি ভাবিতেছিল;—বলিল, "তবে যদি কালই তুমি আমাকে হোস্টেলে ভর্তি করে দাও তাহলে আজ রাত্রে মালতী না হয় থাকুক। অপর লোকের চোখ তা হলে আর মিছামিছি কষ্ট পায় না।"

সহাস্যমুখে মাথা নাড়িয়া অশোক বলিল, "না, আর তা হয় না। কাল তোমাকে হোস্টেলে ভর্তি করলেও দশ রাত্রি তোমাকে এ বাড়িতে মালতীহীন অবস্থায় রেখে তোমার বিশ্বাসের প্রতি সম্মান দেখাব। কিন্তু কাল সকাল থেকে প্রণবদের পুরোণো ঝি'র ভাইঝি সারদা কাজ করতে আসবে। মালতীর আপত্তি সারদার বিষয়ে খাটবে না, তা কিন্তু বলে রাখছি।"

সবিস্ময়ে শক্তি বলিল, "কেন, সারদা কিসের জন্যে আসবে?"

"তোমার জন্যে।"

"আমার কি কাজ করবে সে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "তোমার জামা-কাপড় কাচবে, চুল বেঁধে দেবে, ফাই-ফরমাস খাটবে।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "না, না, এ সব কাজের জন্যে সারদার আসবার কোনো দরকার নেই। চার বছর যদি এসব কাজ আমি নিজে করে থাকতে পারি, তাহ'লে আরও কিছুদিন নিশ্চয় পারব।" তাহার পর পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অশোকের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার ওপর দুশ্চিন্তার ভার ছেড়ে নিশ্চিন্ত থাকবার পালা যেদিন শেষ হবে, সেদিন সারদাকে ডেকো, কোনো আপত্তি করব না।"

শ..র কথা শুনিয়া অশোকের মুখ বিরস হইয়া উঠিল। ম্লান হাসি হাসিয়া সে বলিল, "এ কথাটা তোমাকে খুব বেশি আঘাত করেছে দেখছি।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া পূর্ব-কথিত সেই বড় বাণ্ডিলটা খুলিতে খুলিতে শক্তি বলিল, "আঘাত করেছে কি না, বলতে পারিনে; কিন্তু নিশ্চিন্ত করেনি।" অশোকের দিকে চাহিয়া দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তুমি কিছু মনে কোরো না, দুশ্চিন্তা এমন হাল্কা জিনিস নয়, যার ভার অপরের উপর ছেড়ে সত্যিসত্যিই নিশ্চিন্ত থাকা যায়।"

এ কথার উত্তরে কি বলিবে হয়ত অশোক তাহাই ভাবিতেছিল—এমন সময়ে বাণ্ডিলটা খুলিয়া বিস্মিতকণ্ঠে শক্তি বলিল, "এ কি! এত শাড়ি, ব্লাউস, সায়া—এসব কার জন্যে?"

চিন্তা এবং দুশ্চিন্তার প্রসঙ্গ চাপা পড়ায় খুসি হইয়া অশোক বলিল, "গোবিন্দ কিংবা বিনোদের জন্যে নিশ্চয় নয়।"

"তাহলে আমার জন্যে?"

সহাস্যমুখে অশোক বলিল, "গোবিন্দ কিংবা বিনোদের জন্যে না হ'লে তোমার জন্যে হবে। এর মধ্যে বিশেষ কিছু জোরালো যুক্তি নেই। কিন্তু তবুও কথাটা এক্ষেত্রে খেটেছে।"

ঈষৎ অপ্রসন্ন সুরে শক্তি বলিল, "এত কাপড়-চোপড় উপস্থিত না কিনলেও চল্‌ত।"

"ঐ দুইখানা শাড়ি আর দুটো শায়া অবলম্বন করে?"

"দু-চার দিন ত' চল্‌ত। তারপরে হোস্টেলে যাবার সময়ে দরকার-মতো সামান্য কিছু কিনে নিলেই হোত। এত বেশি, আর এত দামী জিনিসের দরকার ছিল না।" হাত দিয়া আর একটা বাণ্ডিল টিপিয়া দেখিয়া শক্তি বলিল, "এটাতে কি আছে?"

"কিছু প্রসাধন-সামগ্রী।"

"আমার জন্যে?"

"গোবিন্দর জন্যে নয়।"

"আর এটাতে?"

"শ্রীচরণেষুর সামান্য ব্যবস্থা। একজোড়া লেডিস্ সু আর একজোড়া স্লিপার।"

"বিনোদের জন্যে বোধ হয় নয়?"

শক্তির কথায় হাসিয়া উঠিয়া অশোক বলিল, "নিশ্চয় নয়। তোমার বোধশক্তির উন্নতি হচ্ছে শক্তি।"

"জুতো ত' কিনলে, কিন্তু মাপ পেলে কোথায়?"

"কেন, বারান্দায়-ছাড়া তোমার জুতোর তলায়।"

"ছি, ছি! ব্যবহার করা ময়লা জুতোয় হাত দিলে তুমি!"

"কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, তোমার ব্যবহারে ময়লা।"

এত বড় কথার উত্তরে কিছু বলিবার মতো

হসা খুঁজিয়া না পাইয়া শক্তি বলিল, "এ ব ধকনতে কত খরচ পড়ল শুনি?"

"কেন, কি হবে তাতে?"

সুমিষ্ট হাসিয়া শক্তি বলিল, "দাম দিতে হবে না?"

"দাম ত দেওয়া হয়েছে।"

"সে ত' দোকানদারকে তুমি দিয়েছ,—আমি তোমাকে দোব না?"

"তুমি?—তুমি টাকা পাবে কোথায়?"

"কেন, আমার অ্যাটাশি কেসে।"

"ক্ষেপেছ! ও টাকায় আমি একেবারে হাত দিতে দিচ্ছি নে। বিয়ের সময়ে ও-টাকা তুমি আমাকে যৌতুক দেবে। এমন পয়লা নম্বরের পাত্র বিনা পণে পাবে মনে করেছ না-কি?"

পুনরায় সুমিষ্ট হাসিতে শক্তির মুখ ভরিয়া উঠিল; বলিল, "বিনা পণে কোথায়? পয়লা নম্বরের পাত্রের জন্যে ত' প্রাণ-পণ করছি।"

অশোক হাসিয়া বলিল, "ও কথা বলে ফাঁকি দিলে চলবে না। প্রাণ-পণ করে হয়ত প্রাণ পেতে পার, কিন্তু দেহ পেতে হ'লে পয়সা খরচ করা চাই।"

শক্তি বলিল, "প্রাণ পেলে দেহও সঙ্গে সঙ্গে আসবে।"

"কান টানলে যেমন মাথা আসে? অত সাহস করো না। ভুলো না, এটা বাঙলা দেশ। বীণাপাণি ব্যাঙ্কে প্রাণ জমা থাকতেও লক্ষ্মী ব্যাঙ্কে দেহ জমা পড়ে,—এমন দৃষ্টান্ত এ দেশে কম নয়। দেহ আর প্রাণের সঙ্গে এ দেশে খুব বেশি যোগ নেই।"

মনে মনে এক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া শক্তি বলিল, "শক্তি ব্যাঙ্কে যে প্রাণ জমা পড়েছে, তার দেহ সম্বন্ধেও একথা বলা চলে না ত? অবশ্য মালতী-ব্যাঙ্কের কথা মনে ক'রে একথা বলছিনে; কিন্তু শুধু মালতী-ব্যাঙ্কই ত নয়, মল্লিকা-ব্যাঙ্কও ত থাকতে পারে।"

স্বভাবত শক্তি রহস্যপ্রিয় এবং বাক্-চাতুরীতে পটু, সে কথা অশোকের অবিদিত ছিল না। পিতার মৃত্যু, আর্থিক অবস্থার শোচনীয় অবনতি, শিবানীপুরের পরিবর্তিত জীবনযাত্রার দুঃখ এবং মলিনতা, মাতার কঠিন ব্যাধি এবং পরিণামে মৃত্যু, উপর্যুপরি এই সকল দুর্ঘটনার জন্য মেঘান্তরালে চন্দ্রের মতো তাহার প্রকৃতির সেই অংশটা অদৃশ্য হইয়াছিল, কিন্তু লুপ্ত হয় নাই। তাহার সান্নিধ্যের প্রভাবে পুনরায় তাহা নির্মুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া অশোক খুসিই হইল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, মল্লিকা-ব্যাঙ্কের কথা মনে ক'রেও এ কথা বলা চলে না।"

উত্তরে শক্তি কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহার সুবিধা হইল না, একটা ট্রের উপর দুই পেয়ালা চা লইয়া প্রবেশ করিল বিনোদ।

দুই পেয়ালা চা দেখিয়া অশোক বলিল, "দেখেছ, এক পেয়ালা আনতে বললে ওজর-আপত্তি করবে। অথচ আনবার সময়ে আনবে দু-পেয়ালা! দু-পেয়ালা চা খেলে দেহ কেমন করে ভাল থাকে শুনি?"

ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিনোদ বলিল, "দু পেয়ালা আপনার জন্যে না-কি? এক পেয়ালা ত দিদিমণির জন্যে।"

"দিদিমণি খাবেন কে তোকে বললে?"

তেমনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিনোদ বলিল, "আপনিই ত বললেন, দিদিমণি ইচ্ছে করলে এক পেয়ালা খেতে পারেন। হঠাৎ যদি ইচ্ছে করেন, তাহলে তৈরি না থাকলে কেমন করে দিই তা বলুন?"

এ কথার উত্তর দিল শক্তি; বলিল, "না বিনোদ, আমি খাব না; —ও তুমি নিয়ে যাও।"

অশোক বলিল, "নিয়ে আর কোথায় যাবে, দু পেয়ালাই আমাকে দিয়ে যা।"

বিপন্নভাবে শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিনোদ বলিল, "শোন কথা! বলে, দু পেয়ালাই আমাকে দিয়ে যা।"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল, "না, না, এত রাত্রে দু পেয়ালা চা খেলে রাত্রের খাবার খেতে পারবে না। এক পেয়ালা তুমি নিয়ে যাও বিনোদ।"

খুসি হইয়া বিনোদ এক পেয়ালা চা রাখিয়া অপর পেয়ালা লইয়া প্রস্থান করিল।

কাপড়-জামাগুলো আলমারিতে গুছাইয়া তুলিতে তুলিতে পিছন ফিরিয়াই এক সময়ে শক্তি বলিল, "শুনছ!"

স্বল্পপীত চায়ের পেয়ালা একটা টিপয়ের উপর নামাইয়া রাখিয়া অশোক বলিল, "বল।"

"একটা সমস্যার সমাধান করে দেবে?"

শক্তির কথা শুনিয়া চকিতকণ্ঠে অশোক বলিল, "সমস্যার সমাধান! আমি! সর্বনাশ, ও বিষয়ে আমি একেবারে অপটু! হেঁয়ালি আমার কাছে চিরদিনই হেঁয়ালি থেকেছে।"

"এ হেঁয়ালি নয়, পরামর্শ।"

"পরামর্শ? সু-পরামর্শ দিতে পারি বলেও ত আমার সুনাম নেই! তবু কি কথা বল, চেষ্টা করে দেখি।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া শক্তি বলিল, "কি বলে তোমাকে ডাকব?"

"এতদিন কি বলে ডাকতে?"

"অশোক দাদা বলে।"

"এখন কি ওটা অচল হয়েছে?"

"হ্যাঁ। তোমার শিবানীপুর যাওয়ার দিন থেকে ওর দাদা অংশটা অচল হয়েছে।"

"তাহলে দাদা অংশটা বাদ দিয়ে শুধু অশোক বলে ডেকো।"

"না, অতটা আধুনিক হতে পারব না।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া অশোক বলিল, "তা হলেই ত সমস্যা হ'ল। এখন দাদার জায়গায় কোন্ কথা বসানো যায়! স্বামী বসিয়ে অশোকস্বামী করা যায় না, কারণ এখনো সপ্তপদী হয়নি। তা নইলে রামস্বামী, তৈলঙ্গস্বামীর মতো অশোক-স্বামী একরকম চলতে পারত।"

সহাস্যমুখে শক্তি বলিল, "সপ্তপদীর পরও অমন চমৎকার নামটি চলবে না।"

"তাও চলবে না?" ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কপট উৎসাহের ভঙ্গীতে অশোক বলিল, "হয়েছে, এবার ঠিক হয়েছে। অশোক দাদার জায়গায় অশোকনাথই রাখা যাক। অতি চলিত অশোকনাথ নামের মধ্যে নাথ শব্দটি নিরীহভাবে লুকিয়ে থাকবে, কেউ ধরতে পারবে না; একান্তে যখন আমাকে সম্বোধন করবে, তখন অশোক শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু নাথ বলে ডেকো।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া শক্তি বলিল, "নাথ বলে ডাকাও চলবে না। নাথ শুনলেই আমার গোঁফ-দাড়ি কামানো সীতার কথা মনে হয়। ভারি যাত্রা-যাত্রা গন্ধ।"

একটু ভাবিয়া অশোক বলিল, "তবে তোমাদের সনাতন ডাক ভিন্ন আর কোন উপায় নেই দেখছি।"

"কি সনাতন ডাক?"

"আমাকে যখন ডাকবে, তখন 'ওগো,' 'হ্যাঁগো' বলে ডাকবে; আর অপর লোকের কাছে যখন আমার কথা বলবে, তখন 'ও', 'সে'—এই দুটি শব্দ ব্যবহার করবে।"

শক্তি বলিল, "'ও', 'সে' অবিশ্যি খুব মিষ্টি, কিন্তু তা-ও সপ্তপদীর আগে চলবে না।"

হতাশভাবে অশোক বলিল, "চলবে না? তা হ'লে আমি ত' তোমার পক্ষে অনির্বচনীয় হয়েছি দেখছি শক্তি!"

সুমিষ্ট হাসিয়া শক্তি বলিল, "সে ত' আজ হওনি, পাঁচ বছর হয়েছে।"

প্রসন্নমুখে অশোক বলিল, "বল কি! পাঁচ বছর? আচ্ছা, এই পাঁচ বছর আমাকে মনে মনে কি ব'লে ডেকেছ বলত'? স্বপ্নে আমাকে কি ব'লে সম্বোধন করেছ?"

অশোকের কথার উপর কান পাতিয়া রাখিয়া শক্তি ব্লাউসের সংখ্যা নিরূপণ করিতেছিল; বলিল, "বলছি। কিন্তু তার আগে তুমি বল, বারোটা ব্লাউসে কি হবে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভাবিয়া সহাস্যমুখে অশোক বলিল, "তোমার শ্রীঅঙ্গে স্থান পেয়ে তাদের ব্লাউস-জন্ম সার্থক হবে।"

এই রসগভীর অথচ কৌতুকাত্মক সোহাগ বচনের উত্তর দেওয়া কঠিন। সুতরাং ব্লাউসগুলো গুছাইয়া তুলিয়া প্রসাধন-দ্রব্যের বাণ্ডিলটা খুলিয়া শক্তি বিস্মিত হইল। নানা আকারের এবং প্রকারের যে-পরিমাণ

সামগ্রী শিথিল-বন্ধন হইয়া ছড়াইয়া পড়িল, সুনিবদ্ধ বাণ্ডিলের আয়তন হইতে তাহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বিস্ময়-চকিত কণ্ঠে শক্তি বলিল, "কি আশ্চর্য! একটা পুরো স্টেশনারি দোকান উজাড় ক'রে এনেছ দেখছি!"

প্রসন্নমুখে অশোক বলিল, "আমার ত' মনে হয় চারটে আনিনি, তাই আশ্চর্য।"

জিনিসগুলো একে একে তুলিয়া দেখিতে দেখিতে অশোকের দিকে স্নিগ্ধ-তরল চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া শক্তি বলিল, "এই সামান্য প্রাণীর পিছনে এত খরচ-পত্র করছ কেন?"

প্রগাঢ়নেত্রে শক্তির মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া অশোক বলিল. "সাধ হয় না?"

"কিসের সাধ?"

"আকাশের পাখী জোর ক'রে ধ'রে এনে কত আদর যত্ন ক'রে মানুষ পোষে; সোনার খাঁচায় তাকে রাখে; কিংখাপ দিয়ে তার ঢাকা তৈরী করে; কত দুর্মূল্য ফলমূল তাকে খাওয়ায়। আর, আমার সোনার পাখী নিজের ইচ্ছায় আমার লোহার খাঁচায় এসে ধরা দিয়েছে,—আমার সাধ হয় না?"

একটা কার্ডবোর্ডের সাদা বাক্স খুলিতে খুলিতে শক্তি বলিল, "যে পাখী নিজের ইচ্ছায় এসে ধরা দিয়েছে, কষ্ট ক'রে যে পাখীকে আকাশ থেকে ধ'রে আনতে হয় নি, সে পাখী ত' সস্তা পাখী,—তার জন্যে এত—।" বিস্ময়ের তাড়নায় কিন্তু কথাটা শেষ হইতে পারিল না। উল্লিখিত কার্ড-বোর্ডের বাক্স হইতে বাহির হইল উজ্জ্বল পালিশ করা একটা চতুষ্কোণ সুদৃশ্য রূপার কৌটা, যাহার ঢাকনির উপরে প্লেন বলিষ্ঠ মীনার লাল অক্ষরে লিখিত,—সিন্দুর। এবং সেই সিন্দুর কৌটা খুলিয়া বাহির হইল এক অতীব কৌতুকাবহ বস্তু, অবিবাহিতা নারীর পক্ষে নিতান্ত অধিকার-বিগর্হিত উপহার, এক কৌটা লাল টুকটুকে চীনা সিন্দুর। ঢাকনি খুলিতে গিয়া খানিকটা সিন্দুর শক্তির হাতের উপর ঝরিয়া পড়িল।

সিন্দুর দেখিয়া শক্তির মুখও কতকটা সিন্দুরেরই মতো লাল হইয়া উঠিয়াছিল,—সম্ভবত শুধু লজ্জাতেই নহে। মনে মনে এক মুহূর্ত কি চিন্তা করিয়া একবার সে সিন্দুর কৌটাটা মাথায় ঠেকাইল, তাহার পর অশোকের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে কহিল, "কাঁঠাল কিন্তু এখনো গাছে।"

মৃদু হাসিয়া অশোক বলিল, "তেল কিন্তু নিজের জোরেই এসেছে শক্তি। কোনো বিবাহিতা স্ত্রীলোকের জন্য জিনিসগুলো কিনছি মনে করেই বোধ হয় দোকানদার আমাকে সিন্দুর কৌটাটা দেখিয়েছিল। খালি কৌটা হ'লে সম্ভবত ফিরিয়েই দিতাম। কিন্তু কৌটার মধ্যে এক কৌটা টুকটুকে সিন্দুর দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। মনে হ'ল দোকানদারের হাত দিয়ে এ বিধাতারই দান। তুমি বলছ কাঁঠাল এখনো গাছে। কিন্তু সত্যিসত্যিই ঠিক যে গাছে নেই, বল ত' তার সামান্য একটু প্রমাণ দিই।"

"কি প্রমাণ দেবে?"

"তোমার মাথায় সিন্দুর পরিয়ে দিই।"

অশোকের প্রস্তাব শুনিয়া শক্তির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তখনি প্রস্তুত হইয়া সামনা-সামনি অশোকের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া শান্ত মুখে বলিল, "দাও।"

শক্তির এই নির্বিকল্প সাহস অথবা দুঃসাহসের তৎপরতা দেখিয়া অশোক কিন্তু ভয় পাইয়া গেল। মনে হইল, সীমন্তে জটিলতার রক্তবর্ণ ছাপ লইয়া ক্ষণকাল পরে শক্তি যখন প্রণব-মালতী-নবগোপাল-দলের সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তখন সিন্দুর এবং অনূঢ়ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের কোনো পথই খুঁজিয়া পাইবে না। কৌতুকের ক্ষণিক ছেলেখেলা মনে করিয়া শক্তি যে পর মুহূর্তেই তাহার ললাট হইতে সিন্দুরের রেখা মুছিয়া ফেলিবে, অশোক নিঃসংশয়ে জানিত সে ধাতু শক্তির একেবারেই নহে। সুতরাং সে আশ্বাসের স্থান নাই। প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাশভারি পিতার গভীর মুখ মনে পড়িয়া গেল। অন্তরের গহন কোণে সুবুদ্ধি মাথা নাড়িয়া বলিল, সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং। দুর্বল অশোক তাহার ক্ষীণশক্তি ভাবপ্রবণতাকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা, ও কাজটা না-হয় যথাকালের অপেক্ষাতেই থাক। আজ মাঝামাঝি একটা কিছু করি। তোমার কাছে এসেও সিন্দুর অব্যবহারে কৌটোর মধ্যে পড়ে থাকবে, এ কিন্তু আমার ভাল লাগছে না। 'মাঝামাঝি'র কথায় শক্তির মুখ খানিকটা নিস্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। মাঝামাঝির প্রতি কোনোদিনই তাহার শ্রদ্ধা নাই। বলিল, "কি মাঝামাঝি?"

"তোমার কপালে একটা টিপ পরিয়ে দিই।"

"তা-ই দাও।"

"সদ্যক্রীত জিনিসপত্রের মধ্য হইতে একটি মোটা পেনহোল্ডার লইয়া তাহার এক প্রান্তে অশোক ভাল করিয়া সিন্দুর লাগাইয়া লইল। তাহার পর বাম হস্ত দিয়া শক্তির মাথার পিছন দিক চাপিয়া ধরিয়া সযত্নে দুই ভ্রূর মধ্যস্থলে একটি নাতিবৃহৎ গোল টিপ রচিত করিল। তৎপরে দক্ষিণ হস্ত দিয়া শক্তির চিবুক একবার অল্প একটু তুলিয়া ধরিয়া প্রসন্ননেত্রে বলিল, "চমৎকার হয়েছে। মনে হচ্ছে, ঠিক যেন পূর্ব আকাশের প্রভাত-তারা।"

শুনিয়া শক্তির মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; বলিল, "প্রভাত-তারা? তা হলে নিস্প্রভ মনে হচ্ছে বল!"

হাসিমুখে অশোক বলিল, "না, না, ভুল হয়েছে বলতে। ঠিক যেন পশ্চিম-আকাশের সন্ধ্যা-তারা।"

"সন্ধ্যা-তারা? তা হলে ত' মুখখানা সন্ধ্যার মতো—।"

শক্তিকে কথা শেষ করিতে না দিয়া অশোক বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, মুখখানা সন্ধ্যারই মতো শান্ত, মধুর সরস। সন্ধ্যারই মতো উদাস, গভীর, রহস্যময়। সন্ধ্যা কি সহজ ব্যাপার মনে কর তুমি? শোনো শক্তি!"

জিজ্ঞাসু নেত্রে শক্তি অশোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

"শুক্লপক্ষের নবমীর সন্ধ্যা মনে পড়ে? সেই সন্ধ্যার মতো আজ আমার বাড়ি রঙীন হয়ে উঠেছে। ঠিক তেমনি অস্পষ্ট, সুন্দর, শান্ত। কেন, জান?"

এবারও শক্তি কথা না কহিয়া অশোকের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল।

অশোক বলিল, "আমার বাড়িতে চাঁদ উঠেছে বলে।"

মৃদু হাসিয়া শক্তি বলিল. "নবমীর ভাঙা চাঁদ?"

"হ্যাঁ গো, নবমীর ভাঙা চাঁদ,—শীঘ্রই পূর্ণিমার পুরো চাঁদ হবার অপেক্ষায়।"

এ কথার উত্তর না দিয়া শক্তি শুধু একবার মৃদু স্মিত মুখে অশোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

এইরূপে প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে উত্তীর্ণ হইয়া হইয়া দুইটি প্রণয়চকিত হৃদয়ের আবেগধারা মিলিত প্রবাহে বহিয়া চলিল কখনো সুগভীর কথোপকথনের মৃদু কলধ্বনি তুলিয়া, কখনো বা গভীরতর নিঃশব্দতার প্রশান্ত ব্যঞ্জনায়। কথার অভিব্যক্তিকে অপার্থিব করিবার জন্য নীরবতা আসিয়া মাঝে মাঝে ছেদ দেয় এবং নীরবতা হইতে নূতন আবেগের সূত্র ধরিয়া কথা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে।

প্রসাধনের সামগ্রী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া রহিল; জুতার বাক্স এবং রুমাল-গামছা-তোয়ালের বাণ্ডিল খোলাই হইল না; এবং টিপয়ের উপর ঈষদল্প এক পেয়ালা উষ্ণ চা ধীরে ধীরে শীতল হইয়া গেল। দুইটি আত্মবিস্মৃত তরুণ-তরুণী কল্পনার সন্নিবেশ হইতে সুতা টানিয়া টানিয়া আনন্দের রূপালি জাল বুনিয়া চলিল। এই আনন্দের উপলব্ধির মধ্যে উদ্বেগের মিশাল যে একেবারে ছিল না, তাহা নহে; কিন্তু সোনার মধ্যে তামার মিশাল যেমন খাঁটি সোনার রঙকে গাঢ়তর করিয়া তুলে, তেমনি আনন্দের মধ্যে এই উদ্বেগের অস্তিত্ব আনন্দের তীব্রতাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

মাঝের ঘরে মূল্যবান চাইমিং ক্লকে কোয়ার্টারের ঘণ্টা চারবার বাজিয়া গভীর স্বরে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিল, উভয়ের

মধ্যে কেহ তাহা খেয়াল করিল না; এবং তাহার মিনিট পাঁচেক পরে একটা মোটরকার হর্ন বাজাইতে বাজাইতে সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া এঞ্জিন থামাইবার যে বিকট গর্জন করিল, তাহার শব্দও উভয়ের শ্রুতি-পথ অতিক্রম করিয়া গেল। চমক ভাঙ্গিল পশ্চাতে মৃদু পদশব্দ এবং হাস্যধ্বনি শুনিয়া। চমকিত হইয়া ভয়ে ফিরিয়া দেখিল দ্বারপ্রান্তে বারান্দায় কৌতুকোদ্দীপ্ত মুখে প্রণব এবং মালতী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

তাহাদের দেখিয়া খুসি হইয়া প্রসন্নমুখে অশোক বলিল, "এস, এস। এস মালতী, ভেতরে এস।"

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রণব বলিল, "ও ঘরে দেখলাম, নবগোপালবাবু গভীর ঘুমের ডিমনস্ট্রেশন দিচ্ছেন,—অনেক ডাকাডাকি করেও জাগাতে পারলাম না। এঘরে এসে দেখি তোমরা দিচ্ছ গভীরতর অন্য-কিছুর।"

স্মিতমুখে অশোক বলিল, "কেন বল দেখি।"

"কারণ, তোমাদের সচেতন করবার জন্যে বেশ একটু জুতো ঘষবার দরকার হয়েছিল!"

প্রণবের কথা শুনিয়া অশোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "সে অন্য কিছু হচ্ছে গল্প। সব চেয়ে বেশি গল্প করে সব চেয়ে কম কাজ কি করে করা যায়, আমরা তারই ডিমনস্ট্রেশন দিচ্ছিলাম।"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া প্রণব বলিল, "না ঠিক তা নয়। গল্পই যদি হয় তা হলে সবচেয়ে কম গল্প করে সবচেয়ে কম কাজ কি করে করা যায়, সেই কঠিন ব্যাপারের ডিমনস্ট্রেশন দিচ্ছিলে তোমরা, যার ফলে এখনো এতগুলো জিনিস আলমারিতে স্থান না পেয়ে বাইরে পড়ে রয়েছে।"

মালতীর সম্মুখে প্রণবের পরিহাসের এরূপ অবাধ অভিব্যক্তি দেখিয়া অশোক চিন্তিত হইল। শক্তির এবং তাহার মধ্যে যে বিশেষ রহস্যটুকু বর্তমান, একমাত্র প্রণব ভিন্ন অপর কেহই তাহা অবগত নহে। কিন্তু এই পথে প্রণবের পরিহাস আর কিছু দূরে অগ্রসর হইলে মালতীর নিকট সেই অজ্ঞাত রহস্য সুস্পষ্ট না হইলেও অস্পষ্ট হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া এই প্রসঙ্গে পূর্ণচ্ছেদ দিবার অভিপ্রায়ে অশোক বলিল, "তা হলে কয়েক মিনিট সব চেয়ে কম গল্প আর সব চেয়ে বেশি কাজ করে জিনিসগুলো আলমারিতে তুলে ফেলা যাক্।"

এ কথার উত্তর দিল মালতী; বলিল, "সে কাজের ভার আমাদের দুই বন্ধুর উপর দিয়ে আপনারা দুই বন্ধু ওঘরে গিয়ে নবগোপাল-বাবুকে জাগাবার চেষ্টা দেখুন।"

"অতি উত্তম প্রস্তাব।" বলিয়া প্রণবকে লইয়া অশোক প্রস্থান করিল।

(ক্রমশ)

ভগ্নাংশ

শ্রীআরতি রায়

পশ্চিমের ছোট শহরে রাত্রি শেষ হয়ে আসে, পাখীর ডাকে অনুভার ঘুম ভেঙেগ যায়; বিছানায় শুয়ে ও দেখে দিব্‌দিব করে ঐ শুকতারা। আর একটা দিনের জন্ম হ'ল, ওর বন্দী জীবন থেকে একটা দিনের আয়ু খসে পড়ল। চারিদিকে জেলের উঁচু প্রাচীর বন্দীত্বের প্রথম বেড়া কিন্তু দোতালা মেয়ে ওয়ার্ডের স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ থেকে অনুভা বাহিরকে দেখে। সম্প্রতি ওকে এই ঘরখানিতে আনা হয়েছে, শোনা যাচ্ছে শীগ্গিরই কোন এক হাসপাতালে ওকে স্থানান্তরিত করা হবে হয়ত বা মুক্তি আসন্ন; কিন্তু কিছুই আর রোগিণীকে বিচলিত করে না কেমন একটা আত্মসমাহিত ভাব, মনে হয় প্রসন্নতার ওর বুঝি সীমা পরিসীমা নাই।

জেলখানার প্রশস্ত কম্পাউণ্ড কৃষ্ণচূড়ায় রাঙা হয়ে উঠেছে, রক্তে রাঙা কৃষ্ণচূড়া কি অসহ্য সুন্দর। সবুজ ঘাসের ওপর ঝরে যাওয়া কৃষ্ণচূড়ার ভগ্নাংশ অনুভাকে প্রলুব্ধ করে তোলে। বুকের সমস্ত উত্তাপকে ঘনীভূত করে একান্ত ক্ষুধার্তের মত ও চেয়ে থাকে; আরও দূরে কাঁটাবনের বেড়া ডিঙিয়ে ঝাউগাছের ফাঁক দিয়ে চকচক করে কি একটা নদী। পাথর ও বালিতে ভরা ছোট নদী, সেদিকে কত লোকের আনাগোনা। ওপার থেকে রঙ-বেরঙের খাট সাড়ী পরা মেয়েরা মাথায় ঝুড়ি নিয়ে এপারে আসে সপ্তাহের বিশেষ কোনও দিনে। আবার এদিকে দেখা যায় ছোট বড় মাঝ-বয়সী কত রকমের মেয়ে বন্দী। এরা সবাই বিচিত্র, বেলা যত বাড়তে থাকবে ততই স্পষ্ট শোনা যাবে নীচে দুটি বুড়ির ঝগড়া। তারা দুজনেই মিলিত ভাবে কোন এক অন্যায় কাজে অভিযুক্তা তাই পরস্পরকে প্রতিদিন তারা একই ভাবে গালাগালি দিয়ে আসছে। পুনরাবৃত্তি, প্রতিদিনের একঘেয়েমি অনুভাকে বিপর্যস্ত করে তোলে, কিন্তু পরক্ষণেই শান্ত হয়ে যায়। দেহের ও মনের সক্রিয়তার বেপরোয়ামি কিছুই অবশিষ্ট নাই, এখনও শুধু ব্যথিত জড়িমার শিশু মাত্র। একপাল উড়োজাহাজ সারা আকাশে বিপ্লব তুলে যায়, অনুভার বুকটা কেমন করে ওঠে। আজকাল ওর বুকটা বড় কম-জোরাল হয়ে উঠেছে; একটুকুতেই মনে হয় সব বুঝি বন্ধ হয়ে যাবে। চোখ বুজে ও কল্পনা করে নিতে পারে নিজের নিষ্প্রাণ দেহ, মৃত চোখ আর ওর বিবর্ণ ঠোঁট; সে দেহে উত্তাপের লেশমাত্র নাই, আছে কেবল মেরুদেশের এক বীভৎস শীতলতা। আর একপাল বিমানের গোঙানি মিলিয়ে যায়—অনুভা শিউরে ওঠে; চোখ বন্ধ করে ক্লান্তভাবে শুয়ে থাকে—মৃত্যু, চারিদিকে কেবল নির্মম মৃত্যুর স্তব।

ভীড় করে আসে কতজনের পরিচিত মুখ—ওদের নির্ভীক দৃষ্টি আর আত্মতৃপ্তির হাসি এখনও অনুভাকে শক্তি দেয়। কোথায় গেল ওরা, সে খবর অনুভা আর রাখে না। শুধু জানে ও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। বছর দুই আগে একটি মেয়ে কয়েদী ওকে আকর্ষণ করেছিল, নিজের ছেলেকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করবার অপরাধে মেয়েটি অভিযুক্তা—কিন্তু কি নিবিড় কালো তার চোখ আর কি অতল গভীরতা। প্রায়ই ও কাঁদতে শুরু ক'রত—তারপর একদিন প্রমাণিত হয়ে গেল মেয়েটি উন্মাদিনী; উন্মাদিনীকে কর্তৃপক্ষ কোথায় সরিয়ে দিল, কিন্তু অনুভা ভুলতে পারেনি সেই নিবিড় কালো মৃত্যুহীন চোখ।

স্মৃতি আরও তীব্র হয়ে ওঠে। স্বচ্ছভাবে দেখা যায়, কচুরিপানা মোড়া পুকুরের ধারে আমবাগান আর পোড়ো নারকেল-বনের ধারে নন্দীদের দালান। সেই দালানের আভিজাত্য একদিন টলে উঠলো—দলে দলে ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এল—বিপ্লবের চেতনাচৈতন্যে তাদের পিছনে চাইবার অবসর হ'ল না। কতজন এল, কিন্তু বিজয়দা—তাকে অনুভা অনুপ্রাণিত করতে পারল না। পুরুষ হয়েও বিজয়দা ছিল নেহাৎ দুর্বল। তবু অনুভার ভালো লাগত, শ্রদ্ধা করত ওর শিল্পী-মনকে; কিন্তু শিল্পী বিজয়দা এপথে এল না। এ পরাজয়ে অনুভার ছিল অপরিসীম লজ্জা; গ্রাম ছাড়বার আগের সেই রাত, অনুভা স্পষ্ট দেখতে পায়, বিজয়দার কাতর মুখ। সেদিন ওর শাণিত দৃষ্টি দিয়ে অনুভা দেখেছিল বিজয়দা চায় ওকে, ওর পথকে নয়। সেদিন নিজের সেই নির্মম উপেক্ষা স্মরণ করে ক্ষণিক উত্তেজনা ওর শীর্ণ মুখে ছড়িয়ে যায়। এখনও মনে হয় এ-দেহে প্রাণ আছে প্রচুর, শুধুমাত্র হৃৎপিণ্ডের গোঙানি নয়। নিজের বিবর্ণ দেহের দিকে চেয়ে ওর করুণা হয়। কি কুৎসিত ও হয়ে গেছে; আর কি কোনদিন এই বিকল দেহযন্ত্র সক্রিয় হয়ে উঠবে? বাহির ওকে প্রলুব্ধ করে, কিন্তু সে যে একান্ত অপরিচিত; সেখানে খ্যাতি মিলবে বিস্তর, ওকে শুধুমাত্র দেখবার জন্য হয়ত জনতা উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে; কিন্তু সত্যি কি ও ভালবাসা পাবে—বন্ধুত্ব পাবে শুধু-মাত্র মনুষ্যত্বের খাতিরে?

জেলখানার প্রশস্ত কম্পাউণ্ডের রাঙা রাস্তা ধরে কতজন যায় আসে। এদের সবাই ওর চেনা হয়ে গেছে। একটু পরে আসবে জেলের সেই বাঙালী ডাক্তার ওর সেই বিনীত হাসি আর পুরোন বাইকের আশ্রয় নিয়ে। জেলের ঘড়িতে সাতটা বাজবে—একজন ওয়ার্ডার সেই সংবাদ ঘোষণা করে দেবে বিরাট ঘণ্টায় আর্তনাদ তুলে। দূরে ঐ জোলো জায়গায় কয়েকটা মহিষ কাদা মাখছে—বিরাট দেহ, শান্ত চোখ, কোনও আবেদন যেন নাই কারও কাছে।

কত অগণিত সকাল, কত যন্ত্রণাদায়ক সকাল শেষ হয়ে গেছে—নিষ্ক্রিয়তার প্রাত্যহিক পুনরাবৃত্তি, স্তব্ধ ঘনীভূত অনুভা মৌনতার প্রতীক। কোন প্রাচীন যুগের মিশরের মমি ওর দেহমনে স্থায়িত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠ, ও শুধু ইতিহাসের উপাদান মাত্র; কিন্তু অনাগত কালের উৎসঙ্গে সেই ঐতিহাসিক উপাদান বিলীন হয়ে যাবে—সেদিন অমেয় প্রাণশক্তিতে গড়া মানুষের জন্ম হবে তাদের কলকণ্ঠ শোনা যাবে উত্তরের ঐ গগনস্পর্শী পাহাড়ের চূড়া থেকে দক্ষিণের ঊর্মিমুখর সাগর পর্যন্ত।

তিন সঙ্গী

শ্রীবিমল চন্দ্র সিংহ

[৩]

এই সব লক্ষণগুলি 'রবিবার' বা 'শেষ-কথা' গল্পের চেয়েও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'ল্যাবরেটরি' গল্পে। সব কটী গল্পের মধ্যে এই গল্পটিই সব চেয়ে বড়,—ঘটনার ভীড়, ভাষার কারুকার্য, বর্ণনার সমারোহ, চোখ-ঝলসানো চরিত্র সৃষ্টি এই গল্পটিতেই খুব বেশী। কিন্তু তবু নানা দুর্বলতা এই গল্পটির পদে পদে। নন্দকিশোর ছিলেন ব্রিলিয়াণ্ট অর্থাৎ দেদীপ্যমান ছাত্র, তাঁর বুদ্ধি ছিল ফলাও, তাঁর প্রয়োজন ছিল দরাজ, কিন্তু তাঁর অর্থসম্বল ছিল আঁটমাপের। বাঙালী বলেই তাঁর উপযুক্ত পারিশ্রমিক জোটেনি। এর ফল হয়েছিল এই যে নিজের প্রাপ্য টাকার একটা প্রাইভেট হিসেব ওঁর মনের মধ্যে ছিল, সেটা পুষিয়ে নেবার জন্য তিনি ডান হাত বাঁ হাত দুই হাতই জোরের সঙ্গে চালনা করতেন। অথচ এই পাওনা এবং অপাওনার টাকা নিয়ে তিনি কোনোদিন বাবুগিরি করেন নি। তাঁর শখ ছিল বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ ও পরীক্ষায়। বিজ্ঞানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত এখানেও স্পষ্ট। নন্দকিশোর এক বড় বাড়ি করেছিলেন বিজ্ঞানের পরীক্ষার জন্য সেইটাই ছিল তাঁর পাগলামি। সেই সঙ্গে ব্যবসা করে তাঁর পয়সার অভাবও ঘুচলো, যদিও তিনি ভালবাসতেন সব সময়েই মজুর মহারাজের তকমা পরা সাজে থাকতে। এই নন্দকিশোর একবার ব্যবসা উপলক্ষে পাঞ্জাবে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁর এক সঙ্গিনী জুটে গেল। সোহিনী বলে একটি বিশ বছরের মেয়ে, ঘাঘরা দুলিয়ে এসে নিঃসংকোচে নন্দকিশোরের কাছে তার আইমার জন্য চাইল সাতহাজার টাকা, তার বদলে দিতে চাইল নিজেকে। "অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু—তাহলে তুমি ঠকবে।" সংস্কারের বালাই তার এতটুকু নেই, এমন কি দেহগত সংস্কারেরও নয়। যে দশা থেকে নন্দকিশোর তাকে নিয়ে এলেন সেটা "খুব নির্মল নয় এবং নিভৃত নয়।" কিন্তু তবু "মেয়েটির ভিতর থেকে ঝকঝক করছে ক্যারেক্টরের তেজ, বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে, তাতে একটুমাত্র সংশয় নেই।" এরকম ঘটনা যে বাস্তব জীবনেও ঘটে না বা গল্পেও ঘটে না তা নয়, এরকম ঘটনা উভয় ক্ষেত্রেই ঘটতে পারে। কিন্তু সেটা ঘটা চাই। সোহিনীর পূর্ব-জীবনের যেরকম সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাতে ওরকম ঘটনা ঘটবার জমি প্রস্তুত হতে পারে নি। নন্দকিশোর পাঞ্জাবে গেলেন, রূপমুগ্ধ হয়ে একটি মেয়েকে হঠাৎ ধরে নিয়ে এলেন,—ঘটনাটা এই রকম সস্তা ও খেলো ধরণের দাঁড়িয়ে যায়। এমন কি, পরে সোহিনীর যতই অসাধারণত্ব ফুটে উঠুক না কেন তাতে মনে হয় এ অসাধারণত্বের জন্য দায়ী নন্দকিশোরের স্পর্শ—কিন্তু নন্দকিশোরের সংস্পর্শে আসবার আগেও তার মধ্যে অসাধারণত্বের উপাদান ছিল, এ শুধু "তার মধ্যে ঝকঝক্ করছে ক্যারেক্টরের তেজ" এই কথায় প্রমাণিত হয় না। এর পরেই এলো নন্দকিশোরের মৃত্যু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে। তাতে নন্দকিশোরের আত্মীয়বর্গ তাঁর সম্পত্তি গ্রাস করবার মতলবে ছিলেন, কিন্তু "সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাঁচ নিতে লাগল বুঝে। তার উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিলপাড়ায়। সেটাতে তার অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোনো বালাই ছিল না। মামলায় জিতে নিল একে একে, দূর সম্পর্কের দেওর গেল জেলে, দলিল জাল করার অপরাধে।" সোহিনীর একমাত্র মেয়ে নীলা, অপরূপ সুন্দরী সে, বাঙালীর শ্যামলিমা তার মধ্যে নেই, পিঙ্গলবর্ণ চুল ও গৌরবর্ণ দেহ এবং নীল চোখ মিলে তার সৌন্দর্য অস্বাভাবিক ও অসাধারণ হয়ে উঠেছে। তার বিয়ের বেলাতেও সংস্কার মানবার কোন বালাই ছিল না, "একমাত্র ছিল মন ভোলাবার পথ, শাস্ত্রকে ডিঙিয়ে গেল তার ভেল্কি।" এক মুগ্ধ মাড়োয়ারী যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে হল, কিন্তু সে শীঘ্রই মারা গেল নীলাকে নিষ্কৃতি দিয়ে। নীলার পরবর্তী জীবনের জমি এইভাবে তৈরি হল। উদ্দাম উচ্ছৃংখলতার কোন উপকরণেরই অভাব নেই। উচ্ছৃংখল মায়ের রক্তে তার জন্ম, চোখ-ঝলসানো তার রূপ, পিতৃদত্ত অর্থের অভাব নেই, তার উপর বালবৈধব্য ঘটায় রক্তটা ঝাঁঝিয়ে উঠেছে অথচ সেই উদ্দামতার পথে বাধাও কিছু রইল না। যতই বেড়া দেওয়া যাক্ না কেন, জ্বালামুখীর অগ্নি-চাঞ্চল্য তার মনে নাড়া দিতে লাগল, এমন কি নীলার যৌবনের আঁচ সোহিনীকে পর্যন্ত তাতিয়ে তুলত অনির্দেশ্য কামনার তপ্তবাষ্পে। সেইজন্য সোহিনী নীলার জন্য একটি পাত্রের সন্ধান করতে লাগল, আবিষ্কার করল রেবতী ভট্টাচার্যকে। নিরীহ ছাত্র সে, সায়েন্সের ডাক্তার হয়ে রিসার্চ করতে চায়।

এর পর হতে গল্পটি অদ্ভুত মারপ্যাঁচের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। প্রত্যেক ঘটনাটাই অস্বাভাবিক, এবং আশ্চর্যরকম মোচড় দিয়েছে গল্পের ধারাকে। এর কারণ খুঁজতে হয় মনের অবচেতনের রহস্যময় অন্ধকারে। সোহিনীকে রবীন্দ্রনাথ গড়তে চেয়েছেন অন্তর্দ্বন্দ্বে খণ্ডিত ভাবে, সে যা করে তা খুব স্পষ্ট, কিন্তু সেটা যে সে কেন করে তা খুব স্পষ্ট নয়। কবির নিজেরই কথায়, "সোহিনী একেবারে এখনকার যুগের সাদায় কালোয় মিশনো খাঁটি রিয়ালিজম, অথচ তলায় তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজমই হোলো সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ।" (নির্বাণ, ৩৮ পৃষ্ঠা) কবি বোধ হয় বলতে চেয়েছেন যে সকল রকম সংস্কার হতে মুক্তির ফলে সোহিনীর যেমন একটি রিয়ালিজম গড়ে উঠেছে তেমনি তার স্বামীর ল্যাবরেটরির প্রতি একটি সত্যিকারের সশ্রদ্ধ নিষ্ঠা তাকে আইডিয়ালিজমে ভরে রেখেছে। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ও সেই কথাই বলেছেন। কিন্তু কবির উদ্দেশ্য যাই হোক্ না কেন, গল্পে এরকম রিয়ালিজম-আইডিয়ালিজম ফোটে নি। বরং কতকগুলি টুকরো টুকরো খেয়াল সময়ে সময়ে মাথা চাড়া দিয়েছে। তাদের কোনোটির চেহারা রিয়ালিজম, কোনোটির চেহারা আইডিয়ালিজমের ধার ঘেঁষা হলেও আসলে তারা খেয়াল ছাড়া আর কিছুই নয়। গল্পের মোড়-ফেরানো বড় বড় ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। রেবতীকে সোহিনী আবিষ্কার করল ভবিষ্যৎ জামাতা হিসেবে, তাকে হাত করবার মতলব করেছে রেবতীর প্রথম

দিকের অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরীর সহায়তায়। সোহিনী চৌধুরীকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে লাগল, অবশেষে একদিন বলল যে তার স্বামীর ল্যাবরেটরিতে এনে রেবতীকে বসাতে চায়, রেবতীকে রাজি করার ভার অধ্যাপকের। কাজটা খুব সহজ নয়। রেবতী কঠিন সংস্কারে ঘেরা, পিসিমায়ের আঁচল চাপা হয়ে মানুষ, ভীরুতার পরাকাষ্ঠা তার রক্তে। প্রথম প্যাঁচটি পড়ল এইখানে। সোহিনীর আসল লক্ষ্য রেবতীকে জামাই করা; কিন্তু সোজাসুজি সেদিকে না এগিয়ে সোহিনী বাঁকা পথে গেল, রেবতীকে নিয়ে আসতে চাইল ল্যাবরেটরির কর্তা হিসেবে। ভিতরে দুষ্ট বুদ্ধি ছিল, চৌধুরীও সেটা সন্দেহ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "রেবতীর আত্মীয়েরা বেরসিক, ভয় পেয়ে যাবে।" সোহিনী তাঁকে আশ্বস্ত করল এই বলে যে "ভয় নেই, আমি নিজের জাতেই মেয়ের বিয়ে দেব ঠিক করেছি।" যদিও কবি বলে দিয়েছেন "এটা একেবারে বানানো কথা।" সমস্যাটার গোড়াপত্তন করা হল এইভাবেঃ সোহিনী যখন রেবতীর মধ্যে পাত্র আর ল্যাবরেটরি-আচার্যের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিল তখন সে বুঝতে পারেনি ল্যাবরেটরির প্রতি তার আন্তরিক নিষ্ঠা দরকার হলেই এরকম সমন্বয়ের বিরোধিতা করবে। কিন্তু গল্পে কি ঘটল দেখা যাক্। রেবতীর পিসিমার কাহিনী শুনে সোহিনীর মনে নেশা জাগল, তার জিদ চাপলো যে "একটা মেয়ে বেরতীকে তলিয়ে দিয়েছে, আঁর একটা মেয়ে তাকে টেনে তুলবে ডাঙায় এই আমার পণ রইল।" এই পণ-সাধনের প্রথম পর্ব বোটানিকেল গার্ডেনে। সোহিনী শুনেছে রেবতী রবিবারে রবিবারে যায় বোট্যানিকেল গার্ডেনে রিসার্চ করতে, সেখানে সে হঠাৎ হাজির হল নীলাকে নিয়ে রেবতীকে ফাঁদে ফেলতে। খানিকটা কৃতকার্যও হলো। রেবতী বসলো ল্যাবরেটরির কর্তা হয়ে। কিন্তু সোহিনীর মতি তখন বদলেছে, নীলার সঙ্গে রেবতীর ঘনিষ্ঠতা সে চায় না, সেরকম ঘনিষ্ঠতা নিবারণ করবার জন্য সে ছুরি চালাতেও কুণ্ঠিত নয়। অথচ এদিকে রেবতী-নীলার প্রেম কাহিনী খুব দ্রুত জমে উঠতে লাগল, এমন কি রেবতী পর্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল নীলার যৌবনাবর্তে। সে রাজি হল তাকে বিয়ে করত; উৎসব চলছে, এমন সময় হঠাৎ দেখা দিল সোহিনী, গুণ্ডার জোরে সবাইকে তাড়াতে চায়। চমকপ্রদ ঘটনার এখানেই শেষ নয়; তর্কাতর্কির মুখে সোহিনী বলল নীলাকে, "কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস।" বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতন খবরটা! ফলে সবাই পলাতক। সোহিনী তখন কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে নীলাকে এই বলে যে "এইবার আমার মেয়ে আমার ল্যাবরেটরিকে বাঁচিয়েছে। আমি লোক চিনতে পারি নি; কিন্তু আমার মেয়ে ঠিক বুঝেছিল যে, ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসিয়ে দিয়েছিলুম।" এ-ও অতি আশ্চর্য কথা। এতদিনেও কি রেবতীকে চিনতে সোহিনীর বাকি ছিল! আর, নীলা রেবতীকে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সে কি তার যৌবন জ্বালা শান্ত করবার জন্যই, না রেবতীর নিয়োগের অর্থ যে ল্যাবরেটরিতে গোয়ালঘর বসানো এইটে প্রমাণ করবার নিঃস্বার্থ উদ্দেশ্য নিয়ে? আবার এক ঘটনা ঘটল তার পরে। রেবতী তখনও বলছে নীলাকে সে বিয়ে করবেই। "হঠাৎ আর একটা ছায়া পড়ল দেয়ালে। পিসিমা এসে দাঁড়ালেন। বললেন, রেবি চলে আয়। সুড়সুড় করে রেবতী পিসিমার পিছন পিছন চলে গেল, একবার ফিরেও তাকাল না।"

এই শেষের পাক খাওয়াটি আমার সব চেয়ে অদ্ভুত লাগে। কবি সিনেমা-পদ্ধতিতে মন্তব্যহীন এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এই ঘটনাটি দেখিয়েছেন মনস্তত্ত্বের একটা নিদারুণ প্যাঁচ দেখাবার জন্য, প্রমাণ করবার জন্য যে সংস্কার কিছুতেই মরে না। কিন্তু এই রকম প্যাঁচ শিল্পোত্তীর্ণ হয় নি: এ যেন মনস্তত্ত্বের পুঁথিগত উদাহরণ, কিন্তু মানবহৃদয়ের বর্ণনা এ নয়। এত অকারণ ঘোরপ্যাঁচ, রেবতীর এত বীরত্ব বাহাদুরির পর উলটো দিকে হঠাৎ এমন ঘুরে যাওয়ার শিল্পগত সমর্থনও করা চলে না। কবির ভাষাই চুরি করে বলতে হয় এই গল্পের মধ্যে সংগত অসংগত ঘটনা কারণে অকারণে এসে পড়ে যেন "মাতামাতির ঘোড়দৌড় চালিয়েছে।" এমন কি, সোহিনীর মত বদলেরও কোন সংগত হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। নীলার অগ্নিচাঞ্চল্য নিবারণ করবার জন্যই সোহিনী পাত্র খুঁজছিল। সে দিক্ দিয়ে ব্যাপারটা মন্দ হয় নি, নীলার মত ঝাঁঝালো যৌবনের মেয়ের ঔষধ হিসেবে রেবতীর মত একটি ভিজে নেতিয়ে-পড়া মনের লোক পাত্র হিসেবে মন্দ হত না। এক্ষেত্রে গল্পটা জমে উঠত যদি সোহিনী ধীরে ধীরে রেবতীর সংস্কারের বেড়া ভেঙে ফেলে তাকে কবলিত করতে পারত। কিন্তু তৎক্ষণে সোহিনীর মত বদলে গেল। পাত্র রেবতীর বদলে দেখা দিল সায়েন্স ছাত্র রেবতী সোহিনীর চোখে। আরও উপলব্ধি হল, যে নীলা ভাঙন ধরানো মেয়ে, "ওর হাতে যা পড়বে তা আস্ত থাকবে না।" কিন্তু রেবতীর মধ্যেই যে জামাতা ও বিজ্ঞানাচার্যের সমন্বয় ঘটাতে হবে এমন কথা কি ছিল? নীলা যে ভাঙন ধরানো মেয়ে সে খবর কি সোহিনীর গোড়ায় জানা ছিল না? রেবতীকে দেখেই কি তার মায়া জাগল যে এই ভাঙন ধরানো মেয়ের হাতে এই রকম একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পন্ন বিজ্ঞান ছাত্রকে সমর্পণ করা অন্যায় হবে? স্বামীর পূজো মন্দিরের প্রতি তার নিষ্ঠা যতই অবিচল থাক্ না কেন, তার জন্য সে রেবতীকেই নিয়ে এরকম টানাটানি করে কেন? যদি সে বুঝে থাকত রেবতীর দ্বারা পাত্রের কাজ হতে পারে বিজ্ঞানাচার্যের কাজ হতে পারে না তাহলে নতুন বিজ্ঞানাচার্য খুঁজতে তার কি বাধা ছিল? আসলে এ হচ্ছে অদৃশ্য পিসিমার সঙ্গে সোহিনীর লড়াই—রেবতীকে ডাঙায় তোলার পণ সে সফল করতে চায়। কিন্তু সে নিজেই জানে না রেবতীকে ডাঙায় তোলার অর্থ কি—সেটা কি নীলার হাতে তাকে সমর্পণ করলেই হবে, না নীলার হাত থেকে বাঁচালেই তা হবে। ঐ অসুস্থ ছটফটানির এ-ও একটা দিক্। সোহিনী যাকে ল্যাবরেটরি-নিষ্ঠা বলে মনে করে সে-ও তার মনের অবচেতনের চাপা দেওয়া ইচ্ছার রূপান্তর মাত্র। গল্পে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে একদিকে সোহিনীর ল্যাবরেটরিনিষ্ঠা ও রেবতী-উদ্ধার চেষ্টার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে আছে এই দুটির সঙ্গে রেবতীর নীলাপ্রীতি ও পিসিমা-ভীতির সংঘাত। কিন্তু এগুলি সব মিলে মিশে ভেঙে চুরে একটা সমগ্র কাহিনী হয়ে ওঠে নি; তাই গল্পের মধ্যে আছে কতকগুলি আচমকা ঘটনা আর একটা Nightmare atmosphere.

কিন্তু শুধু কি এই? ঘটনার অসঙ্গতি ও আতিশয্যের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণনারও আতিশয্য ও অসংগতি যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন, বোট্যানিক্যাল গার্ডেনের দৃশ্যটি। মনে রাখতে হবে, তার পূর্বে রেবতী সোহিনীকে দেখে নি, চৌধুরী মারফৎ কিছু কিছু শুনেছে মাত্র। এই প্রথম পরিচয়ের দিনে সোহিনী ও নীলার চালচলন কথাবার্তা সমস্তটাই খাপছাড়া। সোহিনী সেজেছে সাত্ত্বিকভাবে কাঁচা পাকা চুলে পাউডার মেখে সাদা শাড়ি পরে। কিন্তু নীলাকে সাজিয়েছে আগুনের মতঃ "তাকে পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসি শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বাসন্তী রঙের কাঁচুলি। রেবতীর মতো ভীতু পিসিমা-চালিত লোকের মন ভোলাবার কি এই পোষাক? এই প্রথম আলাপের দিনে তার ভীতু মনকে জয় করতে হলে উদ্ধত যৌবনের খোঁচা এগিয়ে যাওয়া স্বাভাবিক নয়, সে খোঁচা যথাসম্ভব মোলায়েম করে লুকিয়ে ঢেকে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তার বদলে নীলাকে নিয়ে গেল সোহিনী তার জ্বলন্ত যৌবনকে অর্ধসম্বৃত করে, তাঁকে লুকোবার কোনও চেষ্টাই করল না। ফল যা হবার তাই হল। সোহিনী দেখতে চায় পুরুষের মধ্যে পৌরুষের ম্যাগনেটিজম্,—"যেটা প্রকাশ পায়, কামনার

কথিত স্পর্ধারূপে।" রেবতীর মধ্যে তার স্পর্ধারই অভাব। যখন নীলা তার সামনে সে দাঁড়াল, তখন তাকে ভাল করে দেখবার সাহসও রেবতীর হল না। "মনে নে রেবতীকে ধিক্কার দিয়ে সাহিনী বললে, দেখো দেখো কবার চেয়ে দেখো।......ওর শাড়ির রঙের সঙ্গে পাতার রঙের কী চমৎকার মিল হয়েছে......ভিতরে বাসন্তী রং উঁকি মারছে, পরে সব্জে নীল।" সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা অবিশ্বাস্য স্থূলতা আছে। সামাজিক নীতির তরফে কোনও আপত্তি তুলছি না, কিন্তু গল্পের নীতির দিক্ থেকে আপত্তির কারণ আছে। কোনও মা কি তার মেয়ের যৌবনের নিগূঢ় ইঙ্গিতের এমন নির্লজ্জ উদ্ঘাটন করতে পারে তার মেয়ে ও ভাবী জামাতার সামনে? তাও আবার রেবতীর মত বেড়ে থাকা মনের লোকের সামনে? এর ফলে রেবতীর আরও সংকুচিত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক ছিল। শুধু এই যৌবনবিশ্লেষণেই অসংগতির শেষ নয়। প্রথম পরিচয়ের দিনেই সোহিনী এনেছে খাবার ও ফুল। "ডালিতে ছিল দুর্লভ জাতীয় অর্কিডের মঞ্জরী, রুপোর থালায় ছিল বাদামের তক্তি, পেস্তার বরফি, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের ছাঁচ, মালাইয়ের বরফি, চৌকো করে কাটা কাটা ভাপা দই।" কিন্তু বাস্তব জীবনে এই রকম বিরাট্ নাট্য সহকারে প্রথম আলাপ করার চেষ্টা অসংগত এবং অশোভন ঠেকে না কি? রেবতী যদি সোহিনীর বাড়িতে আসত তাহলে বরং এই রকম খাবার ও ফুল দেওয়া শোভা পেত। কিন্তু অপরিচিত লোকের সংগে নতুন আলাপ করতে গিয়ে বোট্যানিক্যাল গার্ডেন পর্যন্ত এই রকম খাবার ও ফুল নিয়ে যাওয়া ঠিক লাগসই হয় না। বিশেষতঃ, খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে রেবতীর সংস্কার তখনও যথেষ্ট দৃঢ়। এই রকম শিল্পগত বাড়াবাড়ি আরও আছে। মন্মথ চৌধুরীর সংগে সোহিনীর ব্যবহারের মধ্যেও তার চিহ্ন পাওয়া যায়। "সোহিনী চৌকি থেকে উঠে এসে ধাঁ করে এক হাতে চৌধুরীর গলা জড়িয়ে ধ'রে গালে চুমো খেয়ে চট ক'রে স'রে গেল, ভালমানুষের মতো বসল গিয়ে চৌকিতে।" চৌধুরী বলেন, এ হল মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর দেওয়া—কিন্তু সে কৈফিয়তে এর সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায় না। রেবতী যেদিন প্রথম এলো সেদিন তার মন ভোলাতে হবে, তবু তার সামনেই সোহিনীকে চৌধুরী ডাকছেন ভাই বলে, সোহিনী বলে, যদিও এরকম নিরাবরণ ঘনিষ্ঠতায় রেবতীর মন অভ্যস্ত নয়। কামনার আবর্তে রেবতীর মাথা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করা বৃথা; শেষকালে যে পিসিমার ডাকে ওরকম সড় সড় করে চলে যেতে পারে সে কামনার আবর্তে কিছুতেই ডুবতে পারে না। সুতরাং এই রকম উন্মত্ত যৌবনের ঘূর্ণি তার সামনে নিয়ে আসা বৃথা। তেমনই অসংগত হচ্ছে ব্রজেন্দ্র নীলার কাহিনী। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় এই কাহিনীটির সমর্থন করেছেন এই বলে যে "বাস্তব পরিবেশের সংগে এই বস্তু-প্রসংগটুকুও খাপ খাইয়া যায়; সেখানে ত স্পষ্টই দেখিতেছি আধুনিকতার ছদ্মবেশই লেখকের বক্তব্য ও বর্ণনীয় বিষয়।" কিন্তু তা নয়। কোথায় পাওয়া যায় এর মধ্যে বাস্তব পরিবেশ? সকলের সামনেই নীলাকে ব্রজেন্দ্র আড়কোলা করে তুলে নিলে, নীলা চীৎকার করে হেসে ওর গলা জড়িয়ে ধরলে, রেবতী বসে রইল মুখ অন্ধকার করে আর নীলাকে নিয়ে ব্রজেন্দ্র হালদার তখনি চলল ডায়মণ্ড-হারবার—এ রকম নারীদেহ নিয়ে লোফালুফি কোন্ বাঙালী সমাজে ঘটে থাকে, তা সে সমাজ যতই সংস্কারমুক্ত এবং যৌবনোন্মত্ত হোক্ না কেন? আর, যদি কোনও বৈঠকে তা ঘটেই, সেই কি আমাদের বর্তমান সমাজের ছবি? আমাদের সমাজের এইটেই কি বড় সত্য? তাছাড়া কবি যেভাবে এদের বর্ণনা করেছেন তাতে আধুনিকতার ছদ্মবেশই যে কবির বক্তব্য ও বর্ণনীয় বিষয় তা বলা চলে না। নীলার এই যে ঝাঁঝালো যৌবন, সেটা আধুনিকতা হতে পারে কিন্তু ছদ্মবেশ নয়। নীলার পক্ষে এগুলো জ্বলন্ত সত্য, সে যখন ব্রজেন্দ্রকে জড়িয়ে ধরে তখন তাকে সে সত্যিই জড়িয়ে ধরে, "ছোঁওয়া লাগলেও ছোঁয়াচ লাগে না" এরকম অবস্থা তো তার হয় নি। এগুলো হয়তো সমাজে খুঁজে পাওয়া যায় না, সামাজিক সত্য এগুলো নয়, কিন্তু এই গল্পে এগুলো সত্য বলেই বর্ণনা করার চেষ্টাই হয়েছে।

এই গল্পগুলি পড়লে অনেক প্রশ্নই মনে জাগে। সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এই গল্প-গুলিতে অকারণ ঘটনার মারপ্যাঁচ। তার সংগে আরও অদ্ভুত লাগে এই সব নায়ক-নায়িকারা। বারে বারে চোখে লাগে এদের অসুস্থ ছট্ফটানি। কি এদের জ্বালা, কেন এরা ছটফট্ করে? কিসের তীব্র অতৃপ্তি এদের এমন অসুস্থ অস্থির করে তুলেছে? এইখানেই আরও মৌলিক প্রশ্নে পৌঁছতে হয়। জ্বালাটা লেগেছে শুধু অভীক-সোহিনী-নীলার বুকে নয়, তার আঁচ কবির মনেও লেগেছে। তারই ফলে এই রকম চাঞ্চল্য। এরও পিছনে আর একটি কারণ আছে, সেটা সামাজিক কারণ। ডাঃ নীহার-রঞ্জন রায় লিখেছেন যে, "যে নূতন জীবন-ধারা, যে নূতন ভাব ও চিন্তা জগৎ আমাদের প্রাচীন জীবনধারা, প্রাচীন ভাব ও চিন্তা জগতের তটে আসিয়া আঘাত করিতেছে এবং যে অভিনব ভাব ও চিন্তাসম্পদের সৃষ্টি করিতেছে রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সের ক্ষীয়মান শক্তির মধ্যেও তাহা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার অনুভূতিকে তাহা স্পর্শ করিয়াছে এবং সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে তাহা রূপান্তরিত হইয়াছে।" আমাদের মনে হয়, একথা সত্য নয়। বর্তমানকালকে রবীন্দ্র-নাথ অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করেন নি, তাঁর সার্থক সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে রূপান্তরিত হয় নি। নতুন জীবনধারা রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নি। সেই অক্ষমতা থেকেই এই রকম চাঞ্চল্য ও রুচিবিচ্যুতির উদ্ভব। বাঙালী পল্লীজীবন ও সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি ছোটগল্পে আঁকবার পর যখন কবির নজর আবার আমাদের সমাজের উপর পড়ল তখন আমাদের সমাজে সত্যিই ভাঙন ধরেছে। পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণে একটা অদ্ভুত ইংগ-বংগ সমাজ, কোথায়ও কোথায়ও দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে দুচারটি রঙমাখা জাতবান্ধবী চুরুটখাওয়া মেয়ের দেখা পাওয়া যে একেবারেই অসম্ভব তা হয়তো নয়। কিন্তু ভাষায় ভাবে রঙীন কল্পনা দিয়ে সেগুলিকে বড় করে ধরলেই যে আমাদের সমাজের প্রকৃত ছবি আঁকা হল তা নয়। এই বালিগঞ্জ তো অনেকটাই কল্পনার বালিগঞ্জ, সেটা হচ্ছে একটা প্রতীক মাত্র, সত্যিকারের জগতে তাদের ছায়া হয়তো দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাদের সন্ধান বাস্তব সমাজে কতটুকু। তিল তিল সৌন্দর্য আহরণ করে তিলোত্তমা গঠিত হয়েছিল বলে প্রবাদ আছে। তেমনি বর্তমান তরুণ সমাজ মনে মনে যে সব অসম্ভব কল্পনার জন্য লাফালাফি কর-ছিলেন, কবি শুধু সেই অদ্ভুতত্বগুলি তিলে তিলে আহরণ করে এই সব অ্যাবস্ট্রাক্ট অদ্ভুতত্ব সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এরকম খেলা চমকপ্রদ হলেও বিপজ্জনক। কোন্ সমাজ আছে যার মধ্যে কিছু না কিছু অদ্ভুতত্ব নেই? এমন কি এমন মানুষ কি খুঁজে পাওয়া যায় যার মধ্যে অদ্ভুতত্বের একটুও রেশ নেই? কিন্তু তা বলে সেই মানুষের মধ্যে বা সেই সমাজের মধ্যে সেই অদ্ভুতত্বই বড় হয়ে উঠবে, তার অন্য দিকগুলি সম্পূর্ণ অবহেলিত হবে? এইখানেই বোঝা যায় কবির দৃষ্টিভংগী বদলেছে। পূর্বেই বলেছি, গোরার যুগে এই রকম সমস্যার কথা তিনি আলোচনা করেছেন, কিন্তু তবু তিনি ক্ষুদ্রতা অসম্পূর্ণতার মধ্যেও একটা মহৎ আশ্চর্য সত্তার সন্ধান দেখতে পেয়েছিলেন, সেইজন্য সেই ক্ষুদ্রতা অসম্পূর্ণতাই তাঁর চোখে তখন বড় হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এখানে ব্যাপারটি ঠিক উলটো। আমাদের সমাজের এই সব ভাঙা-চোরার মধ্য দিয়েও অগ্রগতি হতে পারে, সমাজ আপাততঃ যতই ঘুলিয়ে উঠুক না কেন সেখানেই যে তার শেষ নয়—একথা কবি এখানে বলছেন না। বরং ক্ষুদ্রদৃষ্টিসম্পন্ন আধুনিকেরা যা নিয়ে লাফালাফি করছিলেন, কবি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে তাদেরই খেলায় তাদের হারাবার জন্য এ রকম লম্বা-

চওড়া দৌড় চালিয়েছেন। তাতে আধুনিকেরা হয়তো স্তম্ভিত হ'ল; কিন্তু মোটের উপর এর ফল ভাল হয় নি। মহাকবির খেলা হিসেবে হয়তো দু একটা এরকম ধরণের উপন্যাস ভাল লাগে; কিন্তু এটা বেশীদূরে অগ্রসর হলে বিপদ ঘটে। বরং যখন এই ভাঙাচোরার সময় আমাদের মন এদিক ওদিক টলে, আসল অগ্রগতিতে আমরা বিশ্বাস হারিয়ে ইতস্ততঃ বিভ্রান্ত হতে থাকি সে সময় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আশা করা যায় ঠিক পথের নির্দেশ, সমাজের অগ্রগতির দিক নির্ণয়, মনুষ্যত্বের ভবিষ্যতে দৃঢ় বিশ্বাস। তা হলে বুঝতাম আধুনিক-কালকে রবীন্দ্রনাথ ঠিকভাবে অন্তরে গ্রহণ করতে পেরেছেন এবং তা সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্তরের সঙ্গে একালকে গ্রহণ করতে পারেন নি বলেই এযুগের সত্যি-কারের চেতনাকে অনুভব ও প্রকাশ করবার বদলে বিদ্রূপ-শ্লেষ-বক্রোক্তি-পরিহাসে একালকে অর্থাৎ একালের আবর্জনাকে, ভিতরে খানিকটা সায় দিয়ে অথচ উপরে বিপর্যস্ত করতে ব্যস্ত। একদিকে অতি রঙীণ কল্পনা, অতি চমকদার ভাষা ও ঘটনার সাহায্যে সুস্থ জীবন ও সবল বাস্তবের ছোঁওয়া ছাড়িয়ে কাহিনীকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সৌখিন ভাবময় আবহাওয়ায়, অন্যদিকে এই শ্লেষ-বিদ্রূপ ও চোরা কটাক্ষ —আধুনিক কাল এই দুদিক হতেই কবির হাতে মার খেয়েছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, যেটাকে তিনি আধুনিক কাল বলে ধরেছেন সেটা সত্য আধুনিক কাল নয়, সেটা সাময়িক ঘুলিয়ে ওঠা সমাজের এক অংশ—যাকে বড় করে ধরলে সমাজের বিকৃত ছবিকেই বড় করে ধরা হয়।

শেষের কবিতার পিছনের আবহাওয়াটা এই ধরণের ছিল। তিন সঙ্গীতে অবশ্য আরও বিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু উলটো দিকে। শেষের কবিতায় কবির খানিকটা উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান কালকে ব্যঙ্গ করা, একালের অত্যুক্তিগুলি যে কতটা অত্যুক্তি সেইটে তিনি প্রমাণ করেছেন খুব লম্বা চওড়া অত্যুক্তি করে। সেইজন্যই অমিত-কেটি-সিসির দল অত্যুক্তি, তাদের সমাজও অত্যুক্তি—আসল সমাজের চিত্র তারা নয়, তারা আসল সমাজের ব্যঙ্গচিত্র। সেইজন্য সেখানে আবহাওয়াটা কাব্যময় করে তোলা হয়েছে। কিন্তু তিন-সঙ্গীতে আর একটি ধারা দেখা গেল। এইরকম ব্যঙ্গের চেষ্টা, এইরকম রঙীন আবহাওয়া তিনসঙ্গীর মধ্যে নেই। বরং বিজ্ঞানী হবার চেষ্টা আছে, অকারণ ভাবালুতার প্রতি বিরূপতা আছে, মজুর মহারাজের তকমার জয় ঘোষণা আছে। অভীক আর্টিস্ট, কিন্তু সে যন্ত্রবিদও। নবীনমাধব কথায় কথায় আস্ফালন করে সে কঠোর বিজ্ঞানী, ভাবালুতায় আর্দ্রচিত্ত সে নয়। নন্দকিশোরও বৈজ্ঞানিক, সোহিনী-নীলাও সকল সংস্কার হতে মুক্ত, সোহিনীও আস্ফালন করে তার শুকনো পাঞ্জাবী মন, এমনকি মন্মথ চৌধুরীর পর্যন্ত অসীম ঘৃণা সেই পুরুষদের উপরে যারা মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি করে থাকে। আবহাওয়াটাকে আরও নীরস, ভাব-পলেস্তারা-বিহীন, বিজ্ঞানী করে তুলবার চেষ্টা করা হয়েছে। তার ফলও ভাল হয়নি। প্রথমত, শেষ পর্যন্ত আবহাওয়াটা ভাব-কল্পনা-বিহীন হয়ে উঠতে পারে নি, ভাব ও ভাষার কুহেলিকা যথেষ্টই এসে পড়েছে। শুধু মাঝে মাঝে ঐ চেষ্টা করার ফলে আচমকা ঘটনা কতকগুলি এসে পড়েছে—যেমন পিসিমার ডাকে রেবতীর চলে যাওয়া। কাব্যের একটানা ঝড়ে নৌকো টলমল করে সেটা বরং সহ্য হয়, কিন্তু তার বদলে হঠাৎ

দমকা হাওয়ার, ঘূর্ণাবর্তে পড়লে ভরাডুবি অনিবার্য। এখানেও ঠিক তাই ঘটেছে। শেষের কবিতায় একটা প্রবল কাব্যিক ঝড় ছিল, সম্ভব-অসম্ভব সমস্তই তার সামনে উড়ে গিয়েছে; এখানে অসম্ভব অনেক কিছুই আছে, কিন্তু সে কাব্য-ঝড়ের আর সন্ধান নেই, তার গতি নিয়ন্ত্রণের আংশিক চেষ্টা হয়েছে—ফলে অসম্ভব আরও অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, এর ফলে তিনসঙ্গীর চরিত্রগুলি আরও অ্যাবস্ট্রাক্ট হয়ে উঠেছে। শেষের কবিতায় ভিতরে ভিতরে যে একটা ব্যঙ্গের সুর ছিল এখানে ঠিক সে সুর নেই। অমিত একটা খোলাখুলি অত্যুক্তি। কিন্তু অভীক নবীনমাধব তা নয়। আসলে তারাও অসাধারণ এবং অনেক ক্ষেত্রে অদ্ভুত, কিন্তু তবুও তারা অমিতের মত একেবারে বেহিসেবি উড়নচণ্ডী বান ডেকে ছুটে চলে না বাইরের দিকে। অমিতের মত অভীক নবীনমাধবও দেখতে অসাধারণ, তাদের চমক অসাধারণ, কেউ বা একাধারে আর্টিস্ট ও যন্ত্রবিদ, কেউ বা সমন্বয় ঘটিয়েছে কেম্ব্রিজের উপাধি আর ডেট্রয়েটের অভিজ্ঞতার। অর্থশালী এরা প্রত্যেকেই, সামাজিকভাবে এরা উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং নগরনির্ভর ফ্যাশনেবল সমাজের অন্তর্ভুক্ত অথবা পরিচিত। এমন কি বিভারও টাকার অভাব নেই, সোহিনীরও না। এরকম রাজসুয় উপকরণে মণ্ডিত নায়কনায়িকা সত্যিকারের সমাজে কটাই বা দেখা যায়? আসলে এরাও তো অত্যুক্তি। কিন্তু তারা তবুও অমিতের মত নিলজ্জ নির্জলা অত্যুক্তি হতে পারে নি, বিজ্ঞানীর আবরণে নিজেদের চেপে রেখেছে, মোহমুক্তির ভান করে নিজেদের ফুটতে দেয় না। শৌখিন কুলিগিরি করা এদের পেশা। বাস্তবিকই, অভীকের মিস্ত্রিগিরি বা নন্দকিশোরের মজুরে মহারাজের তকমা পরা শৌখিন বিলাস ছাড়া কি বলব? তাদের দুঃখ কি সেই দুঃখ যাতে মানুষ সত্যিকারের মানুষ হয়ে ওঠে, পীড়নের যন্ত্রে সকল অশুদ্ধি নিষ্কাশিত হয়ে বিশুদ্ধ মনুষ্যত্ব দীপ্যমান হয়ে ওঠে? এদের দুঃখ-অভাব তো সে দুঃখ-অভাব নয় যাতে অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব আরও মহিমময় হয়ে দেখা দেয়। এগুলি যে হালকা শৌখিনতা, এগুলি যে বিশেষ গভীরে প্রবেশ করে নি তার প্রমাণ এরকম দুঃখ কষ্টে পড়েও এইসব চরিত্রগুলির দৃঢ়তা ও স্থিরতা এলো না, জীবনে আস্থা ও ভবিষ্যতে আশা দেখা দিলো না, জাগলো না প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবার দৃঢ়সংকল্প। বরং সেই অস্থির চাঞ্চল্যই সমানে দেখা যেতে লাগল। শেষের কবিতার তুলনায় বিপদ এইখানেই আরও বেশী। এই চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যঙ্গের সুর থাকলেও বোঝা যেত। কিন্তু তা সবক্ষেত্রে নেই, আধুনিকতাই অনেকক্ষেত্রে এখানে বর্ণনীয় বিষয়, অধুনিকতার ছদ্মবেশ নয়। একালের কতকগুলি চরিত্র কতকগুলি মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা এবং কতকগুলি ঘটনা খণ্ড খণ্ডভাবে কবির মনে জমা ছিল। গল্পগুলির মধ্যে কবি সেইগুলিকে এটার সঙ্গে ওটা এলোমেলো গেঁথে দিয়েছেন মাত্র। তাতে একটা একটা জায়গায় এক একটা জিনিষ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে, হয়তো সে ঝিলিকের রঙের বাহার যথেষ্ট, কিন্তু সব মিলে একটা সার্থক ও সুস্থ সাহিত্যসৃষ্টি হতে পারে নি, একালের সমাজের ছবি তো নয়ই। ব্যঙ্গের অত্যুক্তি বুঝি, কিন্তু সীরিয়াস অত্যুক্তি, তাও একালের চিত্র বলে এবং তাও রবীন্দ্রনাথের কলম থেকে, অতি সাংঘাতিক রকম বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানী আবহাওয়ায় তিনসঙ্গীর চরিত্রগুলি পূর্বের চরিত্রগুলির তুলনায় সার্থকতর হয়নি, বরং এযুগের আসল সমাজ হতে তাতে তার তফাৎ আরও বেশীই হয়ে উঠেছে। তথাকথিত নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীতে কোনও উপকার হয় নি, বরং আরও অপকারই ঘটেছে। মহৎ সৃষ্টি বলি তাকে যার মধ্যে ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের মহৎ সত্তার মহিমা বজায় থাকে। তা এরা নয়। এমন কি মহৎ সৃষ্টি না হয়েও আধুনিক সমাজের নির্মম ছবিও এরা হতে পারত, কিন্তু এই অত্যুক্তির জন্য তাও এরা হতে পারেনি। শুধু ভাষার চমক ও ঘটনার চাতুরীতেই কোনও সৃষ্টি সার্থক সৃষ্টি হয় না।

গল্পগুচ্ছে 'জয়পরাজয়' নামে একটি গল্প আছে। এক রাজার সভাকবি শেখর, পণ্ডিত সে নয়, কিন্তু যে গান তিনি গাইতেন সেগুলি ছিল সত্য এবং সম্পূর্ণ। "গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ—সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপুরের রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্যন্ত সকলেই আপনার হৃদয়ে হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একটু দক্ষিণা বাতাসের আভাস দিলেই, অমনি দেশের চতুর্দিকে কত কানন, কত পথ, কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।" "এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে দিগ্বিজয়ী কবি পুণ্ডরীক শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় দাঁড়াইলেন।...... কণ্ঠস্বর ঘরে ধরে না—বৃহৎ সভাগৃহের চারিদিকের ভিত্তিতে স্তম্ভে ছাদে সমুদ্রের তরঙ্গের মতো গম্ভীর মন্দ্রে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল এবং কেবল সেই ধ্বনির বেগে সমস্ত জনমণ্ডলীর বক্ষকবাট থর থর করিয়া স্পন্দিত হইয়া উঠিল। কত কৌশল, কত কারুকার্য, উদয়নারায়ণ নামের কতরূপে ব্যাখ্যা, রাজার নামাক্ষরের কতদিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ, কত যমক।" কিন্তু শেখরের গান অন্যরকমের। "শেখর মুখ না তুলিয়া প্রথমে অতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন......তাহার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলিলেন......সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্ধে উঠিতে লাগিল।" এইভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর চলেছে। শেষ পর্যন্ত রাজার জয়মাল্য পেল পুণ্ডরীক, কিন্তু রাজকন্যার জয়মাল্য পড়ল শেখরের কণ্ঠে।

গল্পগুচ্ছের কবির চেহারা শেখরের সঙ্গে তুলনীয়। জীবনের গভীরে যে সমস্ত সুখদুঃখের স্পন্দন আছে গল্পগুচ্ছের গল্পগুলিতে সেগুলি ধরা পড়েছে নানা ছোটবড় ঘটনার মধ্য দিয়ে। ইদানীংকার রচনায় রবীন্দ্রনাথের চেহারা অন্যরকম। তার মধ্যে কত কৌশল, কত কারুকার্য, কতদিক হতে কতরকম বিন্যাস, কত ছন্দ, কত যমক! কিন্তু তার মধ্যে একালের প্রাণের স্পন্দনটি ধরা পড়েনি, ধরা যা পড়েছে সেটা হয় ফ্যাশান অর্থাৎ মুখোস না হয় স্টাইল অর্থাৎ মুখশ্রী। কিন্তু তাতে হৃদয়ের কথা কই? হৃদয়ের কথা বলতে সেণ্টিমেণ্টালিটি বুঝছি না, তার মধ্যে সবল দৃঢ়তা এবং করুণ কোমলতা সবই থাকবে, কিন্তু সেটা গভীরের কথা হওয়া চাই, উপরকার কথা নয়। ভাঙাচোরার আড়ালে মানবমনের প্রবাহ চলছে, নতুন সমাজ গড়ছে এই বিশ্বাস থাকলে ভাঙাচোরার ইঙ্গিত অন্যরকম হত। কিন্তু এখানে কোনও বৃহত্তর পটভূমিকায় বর্তমান ভাঙাচোরা ফলবান ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। সেইজন্য এখানে রঙের উপর রঙের পোঁচ পড়েছে খুব মোটা তুলিতে, তার উপর আছে সূক্ষ্ম কারুকার্যও, কিন্তু এই রঙ্ চঙ্ অলংকার দিয়ে যাকে সাজানো হচ্ছে সে পাণ্ডুরোগী। তিনসঙ্গী সার্থক সাহিত্যসৃষ্টি নয়। শুধু যে ঘটনা বা বর্ণনাতেই স্খলন আছে তা-ই নয়, ত্রুটি আরও গভীর আরও মৌলিক, যার জন্যই এরকম অসুস্থ ছটফটানি এর সর্বত্র।

অথচ, আশ্চর্যের কথা, এই সময় রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে ঠিক একটি বিপরীত ধারা বয়ে চলেছে। এরকম আশ্চর্য কবিতা রবীন্দ্রকাব্যেও দেখা যায়নি। তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যে কবিতার সমস্ত অলংকার-বর্জিত নিরাড়ম্বর খাদবিহীন এমন একটি শুদ্ধসত্ত্ব রূপ প্রকাশ পেয়েছে যা অতুলনীয়। এরকম খাঁটি কবিতা আর কখনও দেখা যায়নি। তার মধ্যে কি প্রসন্নতা, কি বিশ্বাস, কি অটল সরলতা, মানুষের ভবিষ্যতে কি দৃঢ় আস্থা, সকলের সঙ্গে

একাত্ম হবার কি আগ্রহ! খ্যাতির শিখর-দেশে পেঁছে তিনি, লিখলেন, "আমার কবিতা জানি আমি, গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।" আর, কবিতাগুলির কি সৌম্য অথচ ভাস্বর রূপ! মনে হয় যেন ছোট ছোট সুখ-দুঃখের সীমা ছাড়িয়ে এমন একটি নিরুদ্বিগ্ন আনন্দলোকে তিনি পেঁছেছেন যেখানে এ জগতের সঙ্গে তাঁর যোগ সম্পূর্ণ আছে অথচ তাঁর একটি অন্য দৃষ্টি খুলে গিয়েছে। এ নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ নয় যে নতুন-জেগে-ওঠা উৎসজল ফেঁপে ফুলে বর্ণসমারোহে থরথর করে কেঁপে উঠবে। বরং এ যেন হচ্ছে কোনও ঊর্ধ্ব-লোকের মৃদু অথচ অত্যুজ্জ্বল নির্মল রৌদ্রে আলোকিত ও আতপ্ত তুষার-গলানো ঝকঝকে জলের ঝরঝরে প্রবাহ, তারও গতি-পথ পৃথিবীর দিকে কিন্তু তাতে একটা প্রশান্তি আছে নিরুদ্বেগ আছে যা অন্যত্র অসম্ভব। অথচ ঠিক এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ এমন গল্প লিখলেন, যার মধ্যে ঝাঁঝালো উত্তাপ ও অসুস্থ জ্বালা ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। একই মনের একই সময়ে এইরকম বিভিন্ন প্রকাশ কি করে সম্ভব হল সবিস্ময়ে ভাবতে হয়। টেকনিক ও মাধ্যমের হের ফেরেই কি এরকম ঘটলো? কবিতায় তিনি আত্মমুখীন বলে ওরকম হতে পেরেছেন আর গল্পে তিনি সমাজমুখীন বলেই কি এইরূপ ঘটছে? তা বলে তো মনে হয় না। তার কারণ, প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের এই কবিতাগুলি প্রচলিত অর্থে আত্মমুখীন একেবারেই নয়, সমাজচেতনা তাদের মধ্যে এক আশ্চর্যরকম বিশুদ্ধীকৃত আকারে প্রকাশিত—কবিতাগুলি বাস্তবিক পক্ষে আংশিক রবীন্দ্রমানসের ছবি নয়, সমগ্র রবীন্দ্র-মানসেরই প্রতিচ্ছবি। আর নতুন কালকে চিত্তের মধ্যে গ্রহণ করতে পারলে তাঁর গল্পের চেহারা যে অন্যরকম হয় তার প্রমাণও তো তিনি দিয়েছেন। একালে মানুষের মনে যে নানা জটিল রহস্য প্রবল হয়ে উঠেছে তার বিবরণ তিনি 'নষ্টনীড়' হতে শুরু করে 'মাল্যঞ্চ' 'দুই বোন'-এও দিয়েছেন। অবশ্য এই গল্পগুলির মধ্যে বহির্মুখীনতা কম, বাইরের সমাজের পরিচয় এতে বেশী নেই, ব্যক্তিগত জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতেই এদের পরিমণ্ডল ভরে আছে, কিন্তু তবুও একালের সমস্যা সার্থক সাহিত্যে রূপান্তরিত হতে পারে তার ইঙ্গিত এ হতে পাওয়া যায়। শুধু পদ্যরচনাতে নয়, গল্পস্বল্প ছেলেবেলা প্রভৃতি গদ্যরচনাতেও ইদানীং যে উজ্জ্বল প্রশান্তির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল তাতে তিন-সঙ্গীর এরকম গল্পগুলি অন্যরকম হলেই আরও স্বাভাবিক হত, আমরা রবীন্দ্র-ছোট-গল্পের আর এক নতুন রূপ দেখতে পেতাম। কিন্তু তা হয় নি। এটা কেন যে হয় নি তা সহজে বলা যায় না এই অতল রহস্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'তিনসঙ্গী'র গল্পগুলি গুরুত্ব-পূর্ণ, আধুনিককালের সার্থক ছবি হিসাবে নয়। সেই কারণে "তিনসঙ্গীর আধুনিকতার ধর্মকে লজ্জা দিতে পারেন" বাঙলা দেশে এমন আধুনিক আজও কেহ জন্মান নাই। মোহমুক্ত মানুষের যে-দাবি, সর্ববন্ধনমুক্ত, সর্বসংস্কারমুক্ত শুদ্ধ স্বচ্ছ মানবতার যে দাবি পরিণত স্থিতপ্রজ্ঞ জীবনের শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র সেই দাবি, সেই আদর্শকেই স্বীকার করিয়াছেন, আর কোনও আদর্শকেই নয়।" এই মন্তব্য অন্তত তিনসঙ্গীর বেলায় প্রযোজ্য নয়।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

ক্ষুধা বনাম রুচি

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডি-টি-এম্

ক্ষুধা ও রুচি এই দুইএর মধ্যে অনেকখানি তফাৎ। ক্ষুধার সৃষ্টি আত্মরক্ষা সম্পর্কে রুচির সৃষ্টি আত্মতৃপ্তি সম্পর্কে। খাবার ইচ্ছা, খাদ্যে প্রবৃত্তি বা রুচি মানুষের যখন-তখনই জাগতে পারে। লোভনীয় খাদ্য দেখলে ঘড়িতে নির্দিষ্ট সময়টি উপস্থিত দেখলে খাবার স্থানে গিয়ে উপস্থিত হ'লে খাদ্যের আঘ্রাণ পেলে কিংবা খাদ্য সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক আলোচনা শুনলে অপ্রয়োজনেও মনের মধ্যে খাবার ইচ্ছা জাগরূক হতে পারে এবং তখন খেতে পেলে তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়াও চলে। কিন্তু প্রকৃত ক্ষুধা যখন জাগে তখন সে নিতান্ত প্রাণরক্ষার প্রয়োজনেই জেগে ওঠে।

প্রকৃত ক্ষুধা কাকে বলে? লোকে যখন চলিত কথায় ব্যক্ত করে যে, পেটের জ্বালা ধরেছে, খিদেয় পেটের নাড়ী ছিঁড়ে যাচ্ছে, চোখে কানে কিছু দেখতে পাচ্ছি না,—তখন সেইটেই আসল ক্ষুধার অবস্থা। বস্তুত ক্ষুধা পেলে এই সকল লক্ষণই দেখা দেয়। পাকস্থলীতে যতক্ষণ কিছুমাত্রও খাদ্য থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই ধরণের ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। পাকস্থলী একেবারে শূন্য হ'য়ে যাবার পর থেকে এর সূত্রপাত হয়। তখন পাকস্থলী গাত্রের মাংসপেশীগুলি এক একবার ঢেউ ওঠার মতো সংকুচিত হ'য়ে উঠতে থাকে। এই সংকোচন ক্রিয়া রীতিমত যন্ত্রণাদায়ক। একে ঠিক জ্বালা বলা চলে না, মনে হয় যেন পেটের ভিতর আঁকড়ে ধরছে, আর প্রকৃত পক্ষে তাই‌ই হয়। পাকস্থলী থেকে শুরু ক'রে ক্রমে অন্ত্রনালীর সমস্তটাই মুচড়ে সংকুচিত হ'য়ে যেতে থাকে, আর এই ক্রিয়ার ফলে পিত্তরস অন্ত্ররস আর প্যাংক্রিয়াসের রস অনাবশ্যকভাবে অনবরত ক্ষরিত হ'য়ে পড়তে থাকে। কিন্তু এ অবস্থায় স্বয়ং পাকস্থলীর রস একটুও ক্ষরিত হয় না। পেটের ভিতরকার এই ক্ষুৎপীড়ার সঙ্গে সঙ্গে তখন মাথা ধরে ও মাথা ঘোরে, গা বমি বমি করে, সকল কাজে শৈথিল্য আসে, ঘুম পায়, আর সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অসাড় হ'য়ে যেন মূর্ছার মতো একটা অবস্থা ঘটে। এই ক্ষুধা যখন কিছুক্ষণ স্থায়ী হয় তখন আর রুচি কিংবা পছন্দ নিয়ে বিচার করবার কোনো শক্তি থাকে না। তখন খাদ্য সম্বন্ধে সারাজীবনের শিক্ষা ও সংস্কার সমস্তই লোপ পায়, সুতরাং তখন যা পাওয়া যায় তাই খাওয়া যায়। সহজ অবস্থায় যা অখাদ্য, যা দেখলেই বমি আসে, এমন জিনিস পেলেও তখন অম্লানবদনে খেয়ে নিতে হয়। যতক্ষণ ক্ষুধার প্রকোপ কম থাকে ততক্ষণ পর্যন্তই রুচির বিচার তাকে দমন ক'রে মনের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করতে পারে, কিন্তু ক্ষুধার প্রকোপ অত্যধিক হয়ে উঠলে তখন জ্ঞানচৈতন্য ঘুচে যায়, একান্তভাবে তখন কেবল ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে শরীর ও মন একযোগে উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। যুদ্ধের ক্ষুধাকাতর সৈনিকদের মধ্যে আর দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনগণের মধ্যে সম্প্রতিও এমন উদাহরণ দেখা গেছে যে, তারা সভ্য এবং রুচিসম্পন্ন হ'য়েও পরের উচ্ছিষ্ট পরিত্যক্ত বাসি খাদ্য আঁস্তাকুড় থেকে কুড়িয়ে খেয়ে নিজেদের পেটের জ্বালা নিবারণ করেছে। চার্লি চ্যাপলিনের বায়স্কোপে দেখা গিয়েছিল যে, মরুভূমিতে কোনো খাদ্য না পেয়ে সে নিজের জুতার চামড়া চিবিয়ে খাচ্ছে। এটা কিছু অসম্ভব কল্পনা নয়, ক্ষুধা এমনই একটা শারীরিক বৃত্তি যে তেমন অবস্থায় পড়লে তার তাড়নায় সব কিছুই করা সম্ভব।

তবে কেবল সুস্থ লোকের পক্ষেই ক্ষুধার এমন উদ্রেক হওয়া সম্ভব, অসুস্থ লোকের পক্ষে তা নয়। জ্বর হ'লে কিংবা কোনো কঠিন সংক্রামক রোগ হ'লে তখন খেতে না পেলেও ক্ষুধার ঐ প্রকার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। জীবনী শক্তির প্রয়াস অন্য বিষয়ে নিযুক্ত থাকাতে তখন পেটের ভিতরকার মাংসপেশীগুলির সংকোচন ক্রিয়া স্থগিত হ'য়ে যায়, আর আন্ত্রিক রসগুলিও তেমন ক্ষরিত হয় না। পরিশ্রমে অত্যন্ত কাতর হ'লে ঠিক অনুরূপ অবস্থা হয়, তখন পেটের ভিতরকার পেশীগুলি অসাড় হ'য়ে যায়, ক্ষুধা থাকলেও তার তাড়না জাগে না। তাই শ্রমক্লান্ত লোকের মুখে প্রায়ই শোনা যায় যে, এখন আর কিছু মুখে দেওয়া যাবে না, একটু শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচি।

খাদ্যে রুচি বা লালসা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। ক্ষুধার খুব প্রথম অবস্থাতেই এটা জন্মায়, তখন খেতে খুব ইচ্ছা হয়, খাবার দেখলেই মুখ থেকে লালা ও পাকস্থলী থেকে পাচকরস নিঃসৃত হ'তে থাকে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটা আসন্ন আস্বাদপ্রাপ্তি ও আরামের সম্ভাবনা জেগে উঠতে থাকে। প্রকৃত ক্ষুধার একরূপ যন্ত্রণা আছে, কিন্তু এতে সুখ ও তৃপ্তির অনুভূতি ছাড়া কোনো শারীরিক যন্ত্রণা নেই। কিন্তু ক্ষুধার পূর্ব লক্ষণ স্বরূপ এই খাদ্য স্পৃহাকে পরিতৃপ্ত না করলেই ক্রমে সেই যন্ত্রণাদায়ক ক্ষুধা তার নিজ মূর্তি ধারণ করে। ক্ষুধার প্রথম অবস্থা আরামদায়ক, কিন্তু পরের অবস্থা যন্ত্রণাদায়ক।

খাদ্যের রুচি ক্ষুধা মিটে যাবার পরেও বজায় থাকে। সেইজন্যই আমরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেতে পারি। খাবার সময় পদের পর পদ পরিবেশন করে যাবার যে প্রাচীন রীতি এখনো পর্যন্ত চলে আসছে তাতে কোনখানে থামতে হবে এ কথা বুঝিতে পারা সুস্থ লোকের পক্ষে কঠিন হ'য়ে পড়ে, কারণ প্রয়োজন মিটে যাবার পরেও খাবার লোভটি বজায় থাকে, আর সেইজন্যই বাধ্য হ'য়ে শেষ পদটি পর্যন্ত তাকে খেয়ে যেতে হয়। নিমন্ত্রণ খেতে বসে মাংসাদি বহু প্রকরণ খেয়ে পেট ভরে গেলেও তাই আমরা শেষের দই সন্দেশের লোভটুকু ত্যাগ করতে পারি না।

দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার স্পৃহা আমরা অভ্যাসবশতই আয়ত্ত করেছি। আগেকার কালে এর আবশ্যকতা ছিল। বাঘ সিংহ প্রভৃতি যে সকল জন্তুদের শিকার করে খেতে হয় তারা একদিন মাত্রই হয়তো পেট ভরে খেতে পায়, তারপর বহুদিন আর কিছু খাবার সুযোগ পায় না। সুতরাং যেদিন পাওয়া যায় সেদিন বাধ্য হ'য়ে তাদের আকণ্ঠ পেট বোঝাই ক'রে নিতে হয়, আর এইটাই তাদের অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়। পূর্বকালে আমাদেরও অনেকটা এই অবস্থাই ছিল। তখন দৈনিক নিয়মিত খাদ্য সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। হয়তো সেইজন্যই আমাদের শরীর যন্ত্রের মধ্যেও এমন ব্যবস্থান ঘটেছিল যার দ্বারা উদ্বৃত্ত খাদ্যসারকে ভবিষ্যতের সঞ্চয়রূপে পৃথক রেখে দেওয়া যেতে পারে। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যকে তাই গ্লাইকোজেনরূপে লিভারে ও পেশী মধ্যে সঞ্চয় ক'রে রাখা যেতে পারে, ভবিষ্যতের দুর্দিনের জন্য খাদ্যের ইন্ধনকে নানাস্থানে মেদরূপে জমিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু এখন সে অনিশ্চয়তার-কাল আর নেই। বর্তমানের সামাজিক ব্যবস্থায় প্রত্যহই আমরা স্বাভাবিক ক্ষেত্রে নিয়মিতরূপে খেতে পাই, সুতরাং ভবিষ্যতের সঞ্চয়ের জন্য অতিরিক্ত খাবার তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তবু খেতে পেলেই সেই বাহুল্য ক'রে খাবার অভ্যাসটা আমাদের পুরুষানুক্রমে এসে গেছে এবং সেটা যেন এখন একটা ব্যসন

হিসাবেই আমাদের জীবনে স্থান পেয়েছে। এখন তাই সভ্য জগতের আমরা আর স্বাভাবিক ক্ষুধাকে উদ্রিক্ত হবার সুযোগ দিতে পারি না, তার পূর্বেই আমাদের খাদ্য স্পৃহা প্রত্যহ চরিতার্থ হ'তে থাকে এবং সে চরিতার্থতা প্রায়ই প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম ক'রে যায়। বহুকালের অভ্যাসবশে এমনভাবে আমরা খেয়ে চলি যেন প্রত্যহই কোনো আসন্ন অভুক্ত থাকার দুর্দিনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

ক্ষুধা মৌলিক বৃত্তি, আর খাদ্যরুচি মানুষের অর্জিত বৃত্তি। তাই ক্ষুধার প্রকৃতি ও লক্ষণ আজও পর্যন্ত সকল মানুষের পক্ষেই সমান। কিন্তু রুচি-প্রকৃতি ও রুচি-বিলাস প্রত্যেক দেশে স্বতন্ত্র, প্রত্যেক সমাজে স্বতন্ত্র, প্রত্যেক সংসারে স্বতন্ত্র, এমন কি প্রতি জনে জনে স্বতন্ত্র। যার যেমন শিক্ষা ও সংস্কার তার তেমনি রুচি। কারো বা আমিষে রুচি, কারো বা রুচি নিরামিষে,—কারো বা ভাতে রুচি, কারো বা রুটিতে,—কারো বা ঝালে রুচি, কারো রুচি মিষ্টতায়,—কারো বা লবণে রুচি, কারো রুচি অম্বলে। খাদ্য সম্বন্ধে এই রুচি-বিভিন্নতা নিয়ে আমরা দেশে দেশে ও ঘরে ঘরে এক একটা স্বাতন্ত্র্য গড়ে তুলেছি। প্রত্যেকেই হয়তো বলবে, আমি যেভাবে খাদ্যকে উপভোগ ক'রে থাকি তাই সব চেয়ে উপাদেয় ও উপকারী। অবশ্য কেবল আপনাপন রুচির দ্বারাই এর বিচার করা হয়। কিন্তু মৌলিক বৃত্তি ক্ষুধা কোন কথা বলে? সে কি ঐ রুচির কথাতেই সায় দিয়ে যায়?

ক্ষুধা চায় তার প্রয়োজনের সামগ্রী, যার দ্বারা নিত্যকার দেহরক্ষা হবে। আস্বাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা তৃপ্তিদায়ক আস্বাদ থাকা চাই, নতুবা তা খেতে কারো রুচি হবে না, আর রুচি বিগর্হিত খাদ্য খেলেও তা হজম করতে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হবে। সুতরাং রুচিকে একেবারে বাদ দিয়ে ক্ষুধার প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। কিন্তু ক্ষুধার প্রয়োজনকে সম্পূর্ণ অবহেলা ক'রে কেবল রুচি অনুসারে খেয়ে যাওয়া এবং সেই রীতিকেই সর্বদা সমর্থন করা সংগত নয়। তাতে হয়তো সাময়িকভাবে তৃপ্তি পাওয়া যায়। কিন্তু আখেরে তাতে অনিষ্ট হয়।

শরীর রক্ষার প্রয়োজনে কি কি জিনিস খাওয়া দরকার তা আমরা এমন বুদ্ধিমান হ'য়েও ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু অন্যান্য নিম্ন জাতীয় প্রাণীরা এ বিষয় খুব চমৎকারভাবেই বোঝে। কোন জিনিসটা কতত্থানি খাওয়া দরকার আর কোনটার অভাব হচ্ছে, এ তারা আমাদের মতো বুদ্ধি বা সংস্কারের দ্বারা বোঝে না, আপন সহজাত প্রেরণার দ্বারাই তারা এ কথা টের পায়। এই নিয়েই সম্প্রতি নানা-রকমের এক্সপেরিমেণ্ট হ'য়ে গেছে।

এ বিষয়ে প্রথম লক্ষ্য করা যায় আমেরিকার কয়েকটি গোশালায় গরুদের একরূপ অস্বাভাবিক ব্যবহারে। দেখা গেল যে সেখানকার গরুগুলো কোথাও হাড় পেলেই তা চিবিয়ে খেতে আরম্ভ করেছে। তাদের এই অস্বাভাবিক আচরণের কারণ অনুসন্ধান করতে করতে জানা গেল, তারা যে সকল মাঠের ঘাস আর খড় খেয়ে থাকে তার জমিতে ফস্‌ফরাসের পরিমাণ অত্যন্ত কমে গেছে, সুতরাং সেখানকার ঘাসে আর খড়েও তার পরিমাণ অত্যন্ত কম। গরুরা প্রচুর পরিমাণে ফস্‌ফরাস পাচ্ছে না, তাই তারা ফস্‌ফরাসযুক্ত হাড় চিবিয়ে সেই অভাব পূরণ করে নেবার চেষ্টা করছে। যেমনি তাদের খাদ্য মধ্যে অন্য উপায়ে ফস্‌ফরাস সরবরাহ করা হ'তে লাগলো অমনি তারা এই বদ অভ্যাসটি পরিত্যাগ করলে, হাড় দেখে আর স্পর্শও করলে না।

ইঁদুরদের নিয়ে এমনি অনেক এক্সপেরিমেণ্ট ক'রে দেখা হয়েছে যে, খাদ্যের প্রকৃতি বদলে দিলে সেই সঙ্গে তাদের খাবার প্রকৃতি বদলায় কি না। বিজ্ঞান বলে যে কেবল ক্যালসিয়াম খেয়ে সেই পরিমাণে ফস্‌ফরাস না খেলে উক্ত ক্যালসিয়াম শরীরের কোনো কাজে লাগে না। ইঁদুরেরা এ কথা কিন্তু আপনা আপনিই জানে, তাদের খাদ্য থেকে ক্যাল-সিয়ামের অস্তিত্ব বাদ দিয়ে দিলেই তারা ফস্‌ফরাসযুক্ত খাদ্য খাওয়া বর্জন করে। এটা যে তারা বুদ্ধিপূর্বক করে তা নয়, নিশ্চয়ই ক্যালসিয়ামের অভাবে ফস্‌ফরাস খেয়ে তারা শরীরে কোনো অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকে। আবার যেই ক্যালসিয়াম দেওয়া হয় অমনি তারা ফস্‌ফরাস খেতে শুরু করে। কতকগুলি ইঁদুরের অভ্যস্ত খাদ্য থেকে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ইচ্ছা-পূর্বক খুব কমিয়ে দেওয়া হলো, আর তাদের খাদ্যপাত্রের কাছে দুটি পানীয় জলের পাত্র রাখা হলো, তার মধ্যে একটিতে রইল শুধু কলের জল, অপরটিতে রইল ক্যালসিয়াম মিশ্রিত জল। যতদিন তাদের খাদ্যে ক্যালসিয়মের পরিমাণ স্বাভাবিক ছিল ততদিন তারা ক্যালসিয়মযুক্ত জলের পাত্রটি স্পর্শও করতো না, কিন্তু যেমনি খাদ্যের মধ্যে উপরোক্ত পরিবর্তন করা হলো অমনি দেখা গেল যে তারা কলের জলের পরিবর্তে ক্যালসিয়ামযুক্ত পাত্রটি থেকেই বেশি বেশি জল পান করছে। কতক-গুলি ইদুরকে বেছে নেবার জন্যে দুই স্বতন্ত্র পাত্রে দুই রকম খাদ্য দেওয়া হতে লাগলো। দুই রকমের খাদ্য একই ধরণের জিনিস থেকে প্রস্তুত, দেখতেও একই রকম এবং আস্বাদেও একই রকম, কিন্তু তার মধ্যে একটিতে প্রকৃত খাদ্যগুণ খুব বেশি আর একটিতে খুব কম। দেখা গেল যে, তারা প্রত্যেক বারেই ঠিক উৎকৃষ্ট খাদ্যটি বেছে নিয়ে খায় আর নিকৃষ্ট খাদ্যটি পরিত্যাগ করে। কতকগুলি ইঁদুরের অভ্যস্ত খাদ্য থেকে হঠাৎ প্রোটিনের পরিমাণ অত্যন্ত কমিয়ে দেওয়া হলো, কিন্তু মোট খাদ্যের মাত্রা আগের চেয়ে অনেক বাড়িয়ে দেওয়া হলো। তারা তবুও পূর্বের মতোই সমান পরিমাণ খেতে লাগলো আর রোগা হ'য়ে যেতে লাগলো। আবার যেমনি প্রোটিনের মাত্রা বাড়ানো হলো অমনি তারা মোটা হ'তে লাগলো। প্রোটিনের অভাবে তাদের অনিষ্ট হচ্ছিল, খাদ্য বেশি মাত্রায় খেলে তাদের সে অভাব কিছু পূরণ হ'তে পারতো, কিন্তু সুস্থভাবে জীবন ধারণের জন্য কতটা খাদ্যের প্রয়োজন তার একটা পরিমাপ বোধ ওদের প্রকৃতির মধ্যেই আছে, তার সীমাকে কখনই তারা অতিক্রম করেনি। অথচ খাদ্যে কোনো মৌলিক পদার্থের অভাব ঘটলে সেইটির জন্য যে তারা কতখানি ব্যগ্র হয় তাও পরীক্ষা করে দেখা গেছে। একবার কতকগুলি ইঁদুরের খাদ্য থেকে ভিটামিন বি সম্পূর্ণরূপেই বাদ দিয়ে দেওয়া হলো এবং কিছুকাল পরে কৃত্রিম ভিটামিন বি জলে গুলে স্বতন্ত্র পাত্রে সরবরাহ করা হলো। তখন অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তারা সেই জল পান করতে লাগলো, এমন কি তার পাত্রটি পর্যন্ত তাদের সকলের অত্যন্ত পরিচিত হয়ে উঠলো। অন্যান্য নানা রকম জলে ভরা পাত্র তার সঙ্গে একত্রিত ক'রে দিলেও ভিটামিনের পাত্রটি তারা কেবল গন্ধের দ্বারাই তৎক্ষণাৎ চিনে নিতে লাগলো। সেই পাত্রটিকে খাঁচা থেকে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা করলে দেখা গেল যে তারা প্রাণপণে সেটিকে আঁকড়ে ধরছে, কিছুতে ছাড়তে চায় না। বোঝা গেল যে রসনার লালসায় নয়, প্রাণের প্রয়োজনীয়তার কারণেই তারা অমন আচরণ করছে।

নিম্ন জাতীয় প্রাণী মাত্রেরই এমনি প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য বাছাই ক'রে নেওয়া সম্বন্ধে স্বাভাবিক প্রেরণা আছে। যারা শুয়োর পোষে তারা বলে যে, কোনো মিশাল খাদ্য খেতে দেওয়ার চেয়ে তাদের পাঁচ রকম খাদ্য স্বতন্ত্রভাবে দিয়ে বেছে খাবার সুযোগ দিলে তারা আপন প্রয়োজন মত খেয়ে খুব মোটা আর তেজালো হয়। যারা কুকুর পোষে তারা জানে যে, অতি বাধ্য হলেও কুকুরেরা মনিবের নির্দেশমত খায় না, খায় নিজের প্রয়োজনমত। কখনো কখনো উপবাসও দেয়, আবার কখনো বনের ঘাসপাতাও চিবিয়ে খেয়ে নিজের শরীরকে

ঠিক রাখে। কেবল আমরাই বুদ্ধির প্রাচুর্যে এই স্বাভাবিক জৈব প্রকৃতিটুকু হারিয়ে ফেলেছি। মাতৃস্তন্য ত্যাগের কিছুকাল পর থেকেই যদি শিশুদের নিয়ে এই বিষয়ে পরীক্ষা করা যায় তবে দেখা যায় যে, তারাও ঐ বয়সে নিজেদের প্রয়োজন-মত সামগ্রীগুলি বেছে নিয়ে খেতে পারে, কিন্তু একটু বড় হ'য়ে উঠলেই সেটুকু আর সম্ভব হয় না। তখন শিক্ষা ও লুব্ধতা অনুসারেই তাদের খাদ্যপ্রীতি নিয়ন্ত্রিত হ'তে থাকে।

সুতরাং শরীরের মঙ্গলের দিক থেকে চাইলে আমরা কোনো রুচি বা তথাকথিত প্রেরণার উপর নির্ভর করতে পারি না। তা করতে গেলেই আমাদের ভুল হবে। প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক সহজাত প্রেরণাকে আমরা সভ্যতার মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি, তার বদলে যেটা আছে সেটা অস্বাভাবিক বৃত্তি, তা কেবল নিজেদের গড়া সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষার ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের রুচির এই কৃত্রিমতা যখন উগ্র হ'য়ে ওঠে তখন এমন কি তা বিকারেও পরিণত হয়। আর তাকে সমর্থন করতে গিয়ে আমরা নানারূপ গোঁড়ামির অবতারণা করি। এরই ফলে যারা নিরামিষ খায় তারা আমিষাশীদের বলে ম্লেচ্ছ, আর অপর পক্ষ নিরামিষাশীদের ছাতুখোর ঘাস-খোর প্রভৃতি নাম দিয়ে বিদ্রূপ করে। কিন্তু তাতে আত্মগরিমা যতই বাড়ুক, স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে কোনো পক্ষই কিছুমাত্র লাভবান হয় না।

গোঁড়ামি প্রয়োজনের নির্দেশ মানে না, সে বহুজাতীয় যুক্তির দ্বারা নিজের আচরণকে সমর্থন করতে থাকে। যারা নিরামিষাশী তারা মাংসের আঘ্রাণ পেলেই নাকে কাপড় দেয়, কেবল ডালচানা প্রভৃতি চিবিয়ে নিজেকে পরিতৃপ্ত করে, আর মনে মনে যুক্তি দেয় যে, এতেই মাংসের মতো সারবান প্রোটিন খাওয়া হচ্ছে। ফলে কিন্তু তাদের শরীরে কয়েক প্রকার মৌলিক উপাদানের অভাব ঘটতে থাকে, আর অপুষ্টির দ্বারা তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। আবার যারা গোঁড়া আমিষাশী তারা পারতপক্ষে শাক-পাতার ধার দিয়েও যায় না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাংস খেয়ে খেয়ে বাত প্রভৃতি নানা রোগে অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। তেমনি যারা অতিরিক্ত মিষ্টপ্রিয় তারা এতই মিষ্টাদি খেতে শুরু করে যে তাদের ডায়াবিটিস প্রভৃতি রোগ দাঁড়িয়ে যায়। এগুলির প্রত্যেকটিই এক এক রুচি-বিকার, নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা ও লুব্ধতাকে প্রশ্রয় দেবার অভ্যাস থেকেই অধিকাংশ অর্জিত।

শরীরকে সুস্থ রাখতে হ'লে তার চাহিদাকে সব দিক থেকে মিটিয়ে যথাযথ-ভাবে সকল রকমের খাদ্যই খাওয়া প্রয়োজন। দেখতে হবে যে, যা প্রয়োজন তার মধ্যে কোনও জিনিস না বাদ পড়ে যায়। খাদ্যবস্তুর প্রত্যেকটি পর্যায়েই নানা প্রকারভেদ আছে, তার মধ্যে বেছে নেওয়া চলতে পারে; কিন্তু বাদ দেওয়া চলতে পারে না। কোনওটিকে বাদ দেবার চেষ্টা করলেই প্রথমে রুচিবিকার এসে উপস্থিত হবে। এর ফলে দেখা যাবে একটির অভাবকে অন্যের দ্বারা পূরণ করবার চেষ্টা, তখন খাওয়ার পরিমাণটা অস্বাভাবিকরূপে বাড়তে থাকবে, কিন্তু ফল কিছুই হবে না। এই ব্যাপারটাই আমরা আমাদের দেশের দরিদ্রের ঘরে ঘরে দেখতে পাই, যেখানে লোকে প্রোটিন পায় না আর পেট পুরে কাঁসি কাঁসি ভাত গিলে ফেলা সত্ত্বেও কঙ্কালসার হয়ে থাকে। বিকৃত রুচির আরও একটা লক্ষণ দেখা যায় অখাদ্যে রুচি, যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে গরুদের হাড় চিবোনো সম্পর্কে। এই নিয়ে অনেক এক্সপেরিমেণ্টও করা হয়েছে। ভেড়ার দলকে শুকনো ভুট্টা আর পচা খড় খেতে দিলে দেখা যায় যে, তারা তখন পরস্পরের গায়ের লোম ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে আরম্ভ করে, আবার ভালো রকম খাদ্য দিলেই এ অভ্যাসটি থেমে যায়। গরু ছাগলদের অনবরত গোয়ালে বেঁধে রেখে তাজা ঘাস না দিয়ে কেবল খারাপ খোরাকি দিতে থাকলে তাদের একরকম চাটা রোগ হয়। তখন তারা দেয়াল, কাঠ, লোহা প্রভৃতি এবং পরস্পরের গা অনবরত চাটতে থাকে, কিছুতে নিবৃত্ত করা যায় না। কিন্তু মাঠে ঘাস খেতে ছেড়ে দিলেই এ রোগ সেরে যায়। মুরগীরা ভালো খাদ্য না খেতে পেলে আপন-আপন ডিমগুলো ভেঙেই খেয়ে ফেলে। মানুষের মধ্যেও এমন অস্বাভাবিক আচরণ দেখা যায়। গর্ভবতী নারীরা কেউ কেউ মাটির ভাঁড় খোলামকুচি প্রভৃতি চিবিয়ে খায়, সে অভ্যাসটি হয় সম্ভবত—ক্যালসিয়ম, ফস্‌ফরাস প্রভৃতি লবণ-জাতীয় বস্তুর অভাবে। পেটে ক্রিমি হ'লে ছেলেরা মাটি খায়, খড়ি খায়, কাগজ কাঠ প্রভৃতি চিবিয়ে খায়। এও একরকম রুচিবিকৃতি। আমরা যে পান, তামাক, মদ, চা প্রভৃতি খেতে অভ্যাস করি, তারও সূত্রপাত রুচিবিকার থেকে।

আমাদের মধ্যে অনেকের মুখে শোনা যায় যে, মোটা লাল চাল মুখে রোচে না, তাই বাধ্য হ'য়ে কলে ছাঁটা বালাম চাল খেতে হয়; কিম্বা লাল আটা সহ্য হয় না, তাই ময়দা খেতে হয়। কেউ কেউ আবার বলেন,— দুধ নাকি মোটে খাওয়াই চলে না। এপিডেমিক ড্রপ্‌সি রোগ হওয়া সত্ত্বেও কেউ কেউ বলেন, সরিষার তেল ছাড়া মোটে তরকারিই খাওয়া চলবে না। এ সমস্ত কথা রুচিকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেবার ফল। কিন্তু আমাদের জেনে রাখা উচিত যে, মানুষের রুচি কৃত্রিম ও বিকৃত, আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়, সুতরাং প্রশ্রয়যোগ্য নয়। তাই লীগ অফ নেশনস্‌-এর শ্রেষ্ঠ স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিদেরা একবাক্যে বলেছেন—

"It must be realised that in humans, instinct and appetite cannot be regarded as reliable guides to the choice of food."

অতএব বর্তমানক্ষেত্রে খাদ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের নির্দেশ মেনেই আমাদের চলতে হবে আর আমাদের রুচিকে গোড়া থেকেই তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ক'রে নিতে হবে।

অনুবাদসাহিত্য

আনন্দের অলৌকিক ক্রিয়া

রিচার্ড গার্নেট

[রিচার্ড গার্নেটের নাম সর্বজনবিদিত। তিনি ষোল বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীর সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মিল্টন, শেলী, কোলরিজ প্রভৃতির জীবনী ও কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার রচনা সকলের নিকট যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। ইংরেজি সাহিত্য ছাড়াও ফরাসি, জার্মানি, ইতালি, স্পেন দেশীয় সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এমন ছিল যে, যে-কোন বইএর উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি পৃষ্ঠা নির্দেশ করিয়া মুখস্থ বলিতে পারিতেন। তিনি কবিও ছিলেন, কিন্তু কবি হিসাবে তিনি বিশেষ কৃতকার্য হন নাই। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির পুস্তক তালিক ও The Twilight of the Gods নামক গল্পের বই তাঁহার খ্যাতি চিরকাল ঘোষণা করিবে। যে গল্পটি প্রকাশিত হইল তাহা উক্ত বইখানির Ananda the Miracle Worker বলিয়া একটি গল্পের অনুবাদ।]

শাক্যমুনি বুদ্ধ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের দিকে দিকে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিচালনার জন্য তিনি যথেষ্ট সদুপদেশ দিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচার করিতে হইলে নম্রতা, করুণা ও সংযম প্রভৃতি আয়ত্ত করা এবং আন্তরিক আগ্রহ বজায় রাখা যে একান্ত প্রয়োজন, সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়া দেন। এই সঙ্গে তিনি একটি বিষয়ে নির্দেশ দেন, যাহা পালন করা তাঁহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠাতাই প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন নাই। এ নির্দেশ ছিল—কোনপ্রকার অলৌকিক কার্য না করা।

কথিত আছে, উক্ত প্রচারকগণ প্রভুর অন্যান্য নির্দেশ পালন করিতে বাধা পাইয়াছিলেন; এমন কি সব সময় তাঁহারা ধর্মের পথে চলিতেও পারেন নাই। কিন্তু অলৌকিক কার্য সম্বন্ধে প্রভুর যে নির্দেশ ছিল, তাহা একমাত্র পুণ্যাত্মা আনন্দ ব্যতীত আর কেহ কোন কারণেই অমান্য করেন নাই! সেই আনন্দের প্রচারক-জীবনের প্রথম বৎসরের কাহিনী নিম্নে বিবৃত হইল।

আনন্দ মগধ রাজ্যে আসিয়া অধিবাসীদের ভিতর বৌদ্ধধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার প্রচারিত মতের প্রভাব এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার ফলে জনসাধারণ অতি সহজেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল এবং পূর্ববর্তী যুগে যে সকল ব্রাহ্মণকে তাহারা গুরু বলিয়া মনে করিত, তাহাদিগকে ক্রমশ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। ইহা লক্ষ্য করিয়া আনন্দ মনে মনে অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন এবং একদিন সগর্বে বলিলেনঃ

"যে প্রচারক নিজের আদর্শ ও সদুপদেশের সাহায্যে সত্য প্রচার করে, সে কি ভাগ্যবান! তার তুলনায় ব্রাহ্মণেরা কি হতভাগ্য! তারা সত্য প্রচার করে নানাভাবে নিজেদের জাহির করে আর ভূতপ্রেতের সাহায্যে।"

এই আত্মঅহংকারজনিত বাক্য উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পর্বতপ্রমাণ পুণ্যে ষোল যোজন পরিমাণ কমিয়া গেল; এবং তাঁহার গুণাবলী ও ক্ষমতা এমনভাবে লোপ পাইল যে, ইঁহার পরে তিনি যখন বক্তৃতা দেন, তখন তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলী প্রথমে ঠাট্টাবিদ্রূপ, পরে নানা প্রকার শব্দ ও পরিশেষে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বিধ্বস্ত করিল।

আনন্দের অবস্থা যখন এমনি শোচনীয়, তখন তিনি দেখিলেন, কিছু দূরে একটি বালক অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে শায়িত, আর বালক জ্ঞান অবস্থায় মাটিতে শায়িত আর তাহাকে লইয়া নিম্নশ্রেণীর কয়েকজন ব্রাহ্মণ বিশেষ ব্যস্ত। অপদেবতা বিতাড়নের নানাপ্রকার প্রক্রিয়া ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তাহাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ছিল, সে বলিল,—

"এর দেহ এমন করা যাক্, যাতে কোন অপদেবতার পক্ষে তার ভেতর অবস্থান করা কষ্টকর হবে। তাহলে নিশ্চয়ই সে আর এই দেহে থাকবে না।"

তদনুসারে বালকটির দেহাশ্রয়ী অপদেবতাকে কষ্ট দিবার উদ্দেশ্যে তাহারা তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা অচৈতন্য বালকটিকে আঘাত করিতে লাগিল এবং তাহার নাসারন্ধ্রে ধুঁয়া দিতে লাগিল। কেবল তাহাই নহে, উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহারা অন্যান্য প্রচেষ্টা করিতেও বিরত রহিল না। আনন্দের মনে প্রথম চিন্তা জাগিল, "ছেলেটি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়েছে;" দ্বিতীয় চিন্তা হইল, 'এই সব অত্যাচারকারীদের হাত থেকে একে বাঁচান পুণ্যের কাজ;" তৃতীয় চিন্তা হইল, "ঠিক মত কাজ করতে পারলে আমি উপস্থিত বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারি, তাতে মহাপুণ্যবান বুদ্ধের মহিমাও বেড়ে যেতে পারে।"

এই প্রলোভনের বশবর্তী হইয়া তিনি অগ্রসর হইলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে সরাইয়া দিয়া গম্ভীরভাবে ঊর্ধ্বে চাহিলেন ও সপ্ত-প্রেতের মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। ইহাতে কোনপ্রকার ফল হইল না দেখিয়া সাতবার সেই মন্ত্র পাঠ করিলেন। এইভাবে মন্ত্রপাঠ যখন চলিতেছিল, তখন প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে রোগীর জ্ঞান ফিরিয়া আসিল এবং রোগ উপশম হইল। বালকটি চক্ষু মেলিয়া চাহিল। আনন্দ তাহাকে তাহার আত্মীয়বর্গের নিকট অর্পণ করিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে জনসাধারণ সমস্বরে বলিতে লাগিল, "অলৌকিক কাণ্ড! অলৌকিক কাণ্ড!" ইহার পরে সকলে আনন্দের বক্তৃতা মনোযোগসহকারে শুনিতে লাগিল এবং দলে দলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। ইহাতে আনন্দ বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং আপন কর্মকুশলতা ও উপস্থিত বুদ্ধির জন্য নিজেই নিজের প্রশংসা করিয়া মনে মনে বলিলেন, "নিশ্চয়ই লক্ষ্য উপলক্ষ্যকে সার্থক করে।"

এরূপ ধর্মবিরোধী ভাব মনে উদয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিরাট শক্তি হ্রাস হইয়া একেবারে বল্মীক-স্তূপের আকার ধারণ করিল। ফলে একমাত্র অনন্ত করুণার আধার বুদ্ধ ব্যতীত আর সকল মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে তিনি অত্যন্ত হীন হইয়া গেলেন।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল এবং অনতিবিলম্বে উহা রাজার কানেও পৌঁছিল। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি সত্যই বালকটির দেহ হইতে অপদেবতা তাড়াইয়াছেন কি না; আনন্দ স্বীকার করিলেন।

রাজা তখন বলিলেন, "আমি বাস্তবিকই সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, আমার ছেলেটিকে আপনি সারিয়ে তুলবেন, ঊনবিংশ দিন হ'ল সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।"

আনন্দ বিনীতভাবে উত্তর দিলেন, "হায়! মহারাজ, যে সামান্য পুণ্যের জোরে একটি গরীবের ছেলেকে সারিয়েছি, তা দিয়ে রাজাদের মধ্যে যিনি হস্তিতুল্য, তাঁর সন্তানকে কি করে সারাব?"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপায়ে এই পুণ্য অর্জন করা হয়?"

আনন্দ বলিলেন, "কৃচ্ছ্রসাধন করে; তার সাহায্যে সাধক ঝঞ্ঝা প্রশমিত করে, জল-স্রোত প্রতিরোধ করে, বাঘের সঙ্গে বন্ধুর মত তর্ক করে, জামার আস্তিনের ভেতর

দ পুরে রাখে, তা ছাড়াও এমন অনেক সাধ্য সাধন করে যা যাদুকরকেও হার মানিয়ে দেয়।"

রাজা বলিলেন, "তাই যদি হয় তবে দেখা যাচ্ছে আমার ছেলেকে আপনি যে সুস্থ করতে পারছেন না তার মূলে রয়েছে আপনার অক্ষমতা, আপনার পুণ্যের জোর নেই বলেই এই অক্ষমতা আর কৃচ্ছ্র-সাধনের অভাব ঘটেছে বলেই পুণ্য কমে গেছে। সুতরাং আমি আপনাকে আমার ব্রাহ্মণদের হাতে দিচ্ছি, আপনার ভেতর যে জিনিসটির অভাব ঘটেছে এ'রা তার পূরণে সাহায্য করবেন।"

আনন্দ রাজাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, তিনি যে কৃচ্ছ্র-সাধনের কথা বলিয়াছেন তাহা নিতান্তই আধ্যাত্মিক। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা বিফল হইল। একজন বিধর্মীকে নিজেদের কবলে পাইয়া ব্রাহ্মণদের আনন্দের সীমা থাকিল না। তাহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধরিয়া একটি মন্দিরে লইয়া গেল। সেখানে তাঁহার বস্ত্র খুলিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া দেখিল তাঁহার দেহে কোথাও কোন ক্ষতচিহ্ন নাই। এই দেখিয়া তাহারা বলিতে লাগিল, "কি ভীষণ কথা! এই মানুষটি একেবারে অক্ষত দেহে স্বর্গে যেতে বাসনা করে!" আনন্দের পক্ষে এরূপ নিয়ম লঙ্ঘনজনিত ত্রুটি সংশোধনের জন্য তাহারা তাঁহাকে মাটিতে উপুড় করিয়া ফেলিয়া এমনভাবে বেত্রাঘাত করিল যে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। তখন তাহারা প্রস্থান করিল, কিন্তু প্রস্থানের সময় বলিয়া গেল পরদিন আবার আসিয়া তাঁহার দেহের অপরদিকের উপরেও অনুরূপ ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। বিদ্রূপ করিয়া তাহারা আনন্দকে আশ্বাসও দিল যে তাঁহার পুণ্যের জোর তপস্বীশ্রেষ্ঠ ভগীরথ কিংবা রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের অপেক্ষা কোন অংশে কম হইবে না।

আনন্দ অর্ধমৃত অবস্থায় মন্দিরের মেঝেতে পড়িয়াছিলেন এমন সময় এক গন্ধর্বের আবির্ভাবে সমগ্র মন্দির অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গন্ধর্ব আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"ওহে পশ্চাদপদ শিষ্য, এখন কি তোমার মূঢ়তা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছো?"

নিজের নিষ্ঠা বা জ্ঞান এ দুইটির কোনটির সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা আনন্দ সহ্য করিতে পারিলেন না। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি বিনীতভাবে উত্তর দিলেন,

"আমার প্রভুর ধর্ম প্রচার করতে যেয়ে যে কোন রকম শাস্তিই ভোগ করতে হোক না কেন, ভগবান না করুন, তার জন্যে যেন আমি কোন অনুশোচনা না করি।"

"তুমি কি তাহলে প্রথমে সুস্থ হয়ে পরে সমগ্র মন্দিরবাসীকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করবার কাজে সহায়তা করতে চাও?"

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করে তা সম্ভব হবে?"

গন্ধর্ব উত্তর দিলেন, "প্রতারণা এবং অবাধ্যতার পথে প্রাণপণে চলে।"

আনন্দ মুখ বিকৃত করিলেন, কিন্তু আরও সুস্পষ্ট নির্দেশের আশায় চুপ করিয়া রহিলেন।

গন্ধর্ব বলিলেন, "একথা জেনে রাখ তের দিনের শেষে রাজপুত্রের জ্ঞান ফিরবে, আসছে কাল দুপুর বেলায় তেরদিন শেষ হবে। রাজপুত্র যে খাটের ওপর শুয়ে আছে তোমার কেবল যথাসময়ে তার কাছে যেতে হবে এবং রাজপুত্রের বুকের ওপর হাত রেখে তাকে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াতে বলতে হবে। তাহলেই সে উঠে দাঁড়াবে। লোকে ভাববে তোমার অলৌকিক ক্ষমতার বলেই সে আরোগ্যলাভ করেছে, তখন বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা সহজ হয়ে আসবে। কিন্তু তার আগে আমার সাধ্যায়ত্ত যে শক্তি তাই দিয়ে তোমার পিঠের ঘা সারিয়ে দিতে হবে। তোমার কাছে আমার একমাত্র বক্তব্য, মনে রেখ এই ব্যাপারে তুমি জেনে শুনে তোমার প্রভুর উপদেশ অমান্য করছো। এটাও তোমাকে জানিয়ে রাখা ভাল, উপস্থিত বিপদ থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পেলেও ভবিষ্যতে এর চেয়ে গুরুতর বিপদে তোমাকে পড়তে হবে।"

আনন্দ ভাবিলেন, "বেত্রাঘাতের ফলে যে ধর্মপ্রচারকের পিঠের চামড়া সদ্য উঠে গেছে তার মানসিক অবস্থা বিচার করবার ক্ষমতা অশরীরী গন্ধর্বের নেই।" যাহা হউক তিনি বলিলেন, "উপস্থিত আমাকে সারিয়ে দিন, আর যদি পারেন তাহলে আপনার ভর্ৎসনা ভবিষ্যতের জন্যে জমা রাখুন।"

উত্তরে গন্ধর্ব বলিলেন, "বেশ, তাই হোক।" আনন্দের দেহের উপর নিজের হাত প্রসারিত করিতেই ক্ষত পৃষ্ঠদেশ নূতন চর্মে আবৃত হইল। গন্ধর্বও সেই মুহূর্তে অন্তর্হিত হইলেন, কিন্তু বলিয়া গেলেন, "যদি কখনও প্রয়োজন হয় তাহলে হুং হেমপনিম ওঁ এই মন্ত্রটি উচ্চারণ করবার সংগে সংগেই আমি তোমার কাছে উপস্থিত হব।"

অত্যাচারের নূতন সরঞ্জাম লইয়া মন্দিরে আসিয়া ব্রাহ্মণেরা যখন আনন্দকে সুস্থাবস্থায় দেখিল তাহাদের ক্রোধ ও বিস্ময় কতটা হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহাদের সংগে একজন রাজকর্মচারী আসিয়াছিল সে বিজয়ী আনন্দকে রাজ-প্রাসাদে লইয়া গেল, নতুবা সেদিন আনন্দের অদৃষ্টে কি ঘটিত তাহা বলা যায় না। আনন্দ রাজপুত্রের শয্যাপার্শ্বে নীত হইলেন, সেখানে তিনি কি করেন তাহা দেখিবার জন্য বহু লোক উপস্থিত হইয়াছিল। দ্বিপ্রহর হইতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। সময় কাটাইবার জন্য আনন্দ অলৌকিক ঘটনার অসম্ভবতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন, অবশ্য আনন্দ বলিলেন প্রভু বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্ম যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তৎপর তিনি বক্তৃতামঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সূর্যকে ঠিক মধ্য গগনে দেখিবামাত্র তিনি রাজপুত্রের বক্ষের উপর নিজের হাত রাখিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের জ্ঞান হইল এবং পাশা খেলিতে খেলিতে যে কথা অসমাপ্ত রাখিয়া তিনি মূর্ছিত হইয়াছিলেন সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রথমেই তাহা সমাপ্ত করিলেন।

সমাগত জনতা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, সভাসদ্গণ আনন্দে আত্মহারা হইলেন এবং ব্রাহ্মণদের মুখের ভাব মেঘ সদৃশ হইয়া উঠিল। রাজাও বিশেষ বিস্মিত হইলেন, এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অবহিত হইবার জন্য আনন্দকে অনুরোধ জানাইলেন। আনন্দ গত চব্বিশ ঘণ্টায় যে অসাধারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিলেন না। কাজেই রাজ অনুরোধ রক্ষা করিতে গিয়া তিনি জীবের কষ্ট, নির্বাণ, আনন্দ, রক্তপাত প্রভৃতি বিষয়ে বুদ্ধ প্রদত্ত উপদেশের কোন উল্লেখই করিলেন না। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ চির-দারিদ্র্য বরণ করিবেন এবং নূতন নিয়ম অনুসারে দেবোত্তর সকল সম্পত্তি রাজ-সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত হইবে।

রাজা মুগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "সত্যি কথা বলতে কি এই তো ধর্ম।"

রাজার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইতে না হইতেই সভাসদ্গণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিলেন। শত শত লোক তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। ব্রাহ্মণদের দুরবস্থার সীমা রহিল না; দেবোত্তর সম্পত্তির উপস্বত্ব হইতে তাহারা বঞ্চিত হইল। নূতন পরিমার্জিত ধর্মের নামে একদিনে যে পরিমাণ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইল পুরাতন অনুন্নত ধর্মের প্রভাবে শত বৎসরেও তাহা হয় নাই।

আনন্দ তাঁহার শত্রুদের ক্ষমা করিলেন এবং নিজেকে অসীম ক্ষমতাশালী বলিয়া বিবেচনা করিলেন। তাঁহাকে একান্তভাবে সুখী করিবার জন্যই বোধ হয় রাজা তাঁহাকে প্রাসাদে রাখিলেন এবং রাজপুত্রের শিক্ষার ভার তাঁহার হাতে দিলেন। বুদ্ধের উপদেশ অনুযায়ী আনন্দ রাজপুত্রকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কাজটি খুব সহজ হইল না, কেননা এ-কাজে রাজপুত্রের প্রধান প্রমোদের উপর হস্তক্ষেপ করিতে হইল। ছোট ছোট সাপের উপর অত্যাচার করাই ছিল এই প্রমোদের প্রধান অঙ্গ।

অল্প কিছুদিন পরেই আনন্দ পুনরায়

রাজসমীপে নীত হইলেন। তিনি দেখিলেন রাজার সম্মুখে দুই ভীষণাকৃতি ব্যক্তি উপস্থিত, তাহাদের মধ্যে একজনের হাতে প্রকাণ্ড একখানি কুঠার এবং আর এক-জনের হাতে একজোড়া চিমটা।

রাজা বলিলেন, "এদের একজন জল্লাদ ও আর একজন উৎপীড়ক।"

এরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সহিত পরিচয়ের সৌভাগ্যলাভ করিয়া আনন্দ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

রাজা বলিলেন, "মহাত্মন, আর একবার আপনার পক্ষে কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়েছে। একটি শক্তিশালী সেনা-বাহিনী আমার রাজ্যে প্রবেশ করে আমার সৈন্যদের বিধ্বস্ত করছে। ধর্মের সান্ত্বনা না পেলে আমি এতে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হতাম। কিন্তু যাই হোক না কেন, গুরুদেব, আমার বিশ্বাস আপনার ওপর। এখন যত কম সময়ের মধ্যে আপনি যত বেশি পুণ্য অর্জন করতে পারেন ততই ভাল। এবার আপনার পুরান বন্ধু ব্রাহ্মণদের ডাকিনি, কেননা আপনি জানেন তারা সম্প্রতি জাতিচ্যুত, কিন্তু তার পরিবর্তে আমার এই বিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ উপদেষ্টা-দের ডেকেছি। এদের অবশ্য দুজনের দু' মত। আমার প্রধান উৎপীড়ক খানিকটা ঠাণ্ডা মেজাজের লোক ও সদয় প্রকৃতির। সে মনে করে প্রথমত কম কষ্টদায়ক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই ভাল। এই ধরুন, আপনার পা বেঁধে মাথা নীচের দিকে দিয়ে আপনাকে ঝুলিয়ে দেওয়া, মাথা যেখানটায় ঝুলবে সেখানে কাঠ জেলে ধোঁয়া করা হবে এবং আপনার নাকের ভেতর লাল লংকা পুরে দেওয়া হবে। প্রধান জল্লাদ অবশ্য তার পদমর্যাদা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে চায়। তার মতে একখানা বড় কাঠের ওপর হাতে পায়ে পেরেক ঠুকে আপনাকে এ'টে দেওয়াই সংগত। এ বিষয়ে আপনার মতামত জানলে আমি সুখী হব।"

ভয়ে আনন্দের প্রাণ উড়িয়া গেল, তিনি প্রস্তাবিত দুইটি ব্যবস্থা সম্বন্ধেই ঘোরতর অমত জানাইলেন।

রাজা শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "ভাল কথা, ব্যবস্থা সম্বন্ধে যদি আমাদের মতের মিল না হয় তাহলে দেখছি দুইটিই অবলম্বন করতে হবে। এজন্যে আমরা কাল সকালে দু'দণ্ডের সময় জমা হব। এখনকার মত আপনি স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন।"

আনন্দ প্রস্থান করিলেন, কিন্তু স্বচ্ছন্দে নয়। তাঁহার পূর্বতন পরিত্রাতার কথা মনে না হইলে তাঁহার সকল ক্ষমতাই একেবারে লোপ পাইত। একটি নির্জন স্থানে আসিয়া তিনি সেই গুপ্ত মন্ত্রটি উচ্চারণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি একজনের উপস্থিতি অনুভব করিলেন, তিনি পূর্বের জ্যোতির্ময় গন্ধর্ব নয়, তিনি একজন যোগী পুরুষ, তাঁহার মস্তক ভস্ম সমাচ্ছন্ন এবং অঙ্গ গোময়লিপ্ত।

যোগী বলিলেন, "তোমার কালবিলম্ব করবার অবকাশ নেই। তোমাকে সত্বর আমার সঙ্গে এসে যোগীর বেশে সাজতে হবে।"

আনন্দ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিলেন, কারণ প্রভু বুদ্ধের নিকট হইতে লব্ধ শিক্ষার ফলে এই সকল উৎকট ধর্মোন্মত্তদের তিনি বরাবরই ঘৃণা করিতেন। কিন্তু তখন যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহাতে অন্য উপায় নাই বিবেচনায় তিনি যোগীর সঙ্গে রওনা হইলেন।

যোগীর বাসস্থান ছিল মাটির নীচে এক গহ্বরের ভিতর, সেখানে অসংখ্য নর-কংকাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। তথায় আসিয়া যোগী নিজের ইচ্ছামত আনন্দকে সাজাইলেন। আনন্দের চুল, খুব মসৃণ এবং হস্তপদ নখবিরল বলিয়া তিনি যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশ করিলেন। ভস্ম কালি প্রভৃতির সাহায্যে তিনি আনন্দকে এমনভাবে সাজাইলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শান্তিপূর্ণ ধর্মের প্রচারককে দেখিতে ব্যাঘ্রের মত বিচিত্র হইল। তাহার পরে যোগী আনন্দের গলায় শিশুর মাথার খুলির একটি মালা ঝুলাইয়া দিলেন এবং এক হাতে দিলেন জনৈক পাপীর মাথার খুলি ও অপর হাতে দিলেন এক যাদুকরের উরুর অস্থি। রাত্রি হইলে যোগী আনন্দকে নিকটস্থ শ্মশানে লইয়া গেলেন, তথায় একটি সদ্য-নির্বাপিত চিতার উপরে তাঁহাকে বসাইলেন ও সেই অস্থির সাহায্যে মড়ার খুলিটি বাজাইতে বলিলেন ও তৎসহ তাঁহার সহিত মন্ত্রপাঠ করিতে আদেশ দিলেন। যোগী পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিয়া মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করিলেন। এই

প্রক্রিয়ার অসাধারণ মাহাত্ম্য শীঘ্রই পরিলক্ষিত হইল। কেননা, মন্ত্রপাঠ আরম্ভের সংগে সংগেই এক ধরণের বীভৎস ঝটিকা উঠিল ও মুষলধারে বৃষ্টি নামিল, বিদ্যুৎ চমকে অন্ধকার আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিদীর্ণ হইতে লাগিল, অগণিত ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু চীৎকার করিতে করিতে দল বাঁধিয়া তাহাদের আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া আসিল এবং কোটি ভূত-প্রেত মাটির তলদেশ হইতে নির্গত হইয়া আনন্দকে আসন হইতে ছিনাইয়া লইবার জন্য তাহাদের মাংসচর্মবিহীন প্রকান্ড প্রকান্ড হস্ত প্রসারিত করিল। ভয়ে ও উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া আনন্দ প্রাণপণ শক্তিতে মড়ার খুলি বাজাইতে লাগিলেন এবং চীৎকার করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি ক্রমশ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এমন সময়ে যেন যাদুমন্ত্রবলে হঠাৎ ঝটিকা থামিয়া গেল, ভূত-প্রেতের দল অন্তর্হিত হইল এবং নিকটস্থ নগরীতে জয়ধ্বনি ও নানা প্রকার বাজনা একটি শুভ ঘটনার সূচনা করিল।

যোগী বলিলেন, "শত্রু রাজা মারা গিয়েছে, তার সেনাবাহিনীও পরাজিত হয়ে পালিয়েছে। এরা মনে করছে তোমার মন্ত্রপাঠের ফলেই শত্রুপক্ষ পরাজিত হয়েছে। সবাই তোমার খোঁজে এখানে আসছে। আমি এখন চললাম। আবার যখন তোমার দরকার হবে, আমার সংগে দেখা হবে।"

যোগী অন্তর্হিত হইলেন। বহু লোকের পদধ্বনি কানে আসিল এবং অনতিবিলম্বে নিরানন্দময় প্রত্যূষের অস্পষ্টতা ভেদ করিয়া দূরের মশাল-আলো দেখা যাইতে লাগিল। যথাসময়ে রাজা হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন ও আনন্দকে সাষ্টাংগে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "মহাত্মন! আপনি যে যোগী, সেকথা কেন আগে বলেন নি? আপনি যতদিন এই শ্মশানে অবস্থান করবেন, ততদিন আমি আর কোন শত্রুকেই ভয় করবো না।"

শ্মশানের একদিকে কতকগুলি শৃগালের বাস ছিল, তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া সেখানে আনন্দের বাসস্থান ঠিক করা হইল। রাজা আনন্দকে বেশ পরিবর্তন করিতে দিলেন না এবং তাঁহার শুচিতা রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আহার্য সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিলেন, ফলে আনন্দের পুণ্যের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। যোগী যেমন চাহিয়াছিলেন, আনন্দও তেমনি জটাযুক্ত ও দীর্ঘ নখসম্বলিত হইলেন। এমনি সময়ে একদিন রাজদূত তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। সে সংবাদ দিল, রাজা অকস্মাৎ রহস্যজনকভাবে এক দুরারোগ্য ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, আনন্দের পুণ্য ও মন্ত্রবলে তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন। আনন্দ প্রমাদ গুণিলেন। কিন্তু তিনি সাহসে ভর করিয়া শুভ ফলের আশায় যোগী প্রদত্ত অস্থি ও মড়ার খুলি লইয়া বসিলেন এবং পূর্ববৎ বাজাইতে শুরু করিলেন। কিন্তু এবার তাঁহার প্রক্রিয়ার কোন ফলই হইল না, কেবলমাত্র একটি বাদুড়ের আবির্ভাব ছাড়া কোন অপার্থিব ঘটনাই ঘটিল না। আনন্দ হতাশ হইয়া প্রক্রিয়া বন্ধ করিবেন ভাবিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, তাঁহার সম্মুখে বিরাট একটি পুরুষ দণ্ডায়মান। তাঁহার পরনে কৃষ্ণবর্ণের পোষাক এবং হাতে একটি দণ্ড। মনে হইল তিনি যেন মাটি হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

আগন্তুক বলিলেন, "কড়া প্রস্তুত।"

আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "কিসের কড়া?"

"যার ভেতর তোমাকে এখন ডোবাতে হবে।"

"আমাকে কড়ার ভেতর ডোবান? কেন?"

আগন্তুক বলিলেন, "তোমার মন্ত্রে রাজার কোন উপকার হচ্ছে না, অথচ মন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর আগের যে অভিজ্ঞতা আছে, তাতে করে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না, এবার উপকার হচ্ছে না কেন। কাজেই তিনি ভাবছেন, তাঁর রোগযন্ত্রণা যে বেড়েছে, তার মূলে রয়েছে তোমার মন্ত্রের অশুভ ফল। তাঁর অনুমান আমি সমর্থন করেছি। চিকিৎসাশাস্ত্র সংরক্ষণের জন্যে প্রয়োজন রাজরোষ আমার মত বিচক্ষণ চিকিৎসকের ওপর না পড়ে তোমার মত ভন্ডের ওপর পড়া। সুতরাং তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, সবচেয়ে বড় কড়ার ভেতরকার তরল পদার্থ সারারাত ধরে ফোটাতে হবে, তাঁর ইচ্ছে সকাল বেলায় তোমাকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা। অবশ্য ইতিমধ্যে তোমার প্রক্রিয়া থেকে তিনি যদি কোন উপকার পান, তাহলে স্বতন্ত্র কথা।"

আনন্দ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; তাঁহার কণ্ঠ দিয়া কেবল এই কয়টি কথা বাহির হইল, "ভগবান! এখন কোথায় আমি যাব?"

চিকিৎসক বলিলেন, "শ্মশানের বাইরে কোথাও তুমি যেতে পারবে না, কেননা, এর চারধার রাজসেনা ঘিরে রেখেছে।"

ভয়ার্ত প্রচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহলে আমার রক্ষার উপায়?"

চিকিৎসক বলিলেন, "সে উপায় রয়েছে এই শিশির ভেতর। এতে একটি মারাত্মক বিষ আছে। তোমাকে রাজার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে সবাইকে অনুরোধ করো। রাজার কাছে যেয়ে বলো কোন পরোপকারী উপদেবতার কাছ থেকে তুমি এই অব্যর্থ ওষুধটি পেয়েছ। তোমার কথা শুনে রাজা ওষুধটি পান করবেন এবং মারা যাবেন, আর তাঁর উত্তরাধিকারী তোমাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করবেন।"

আনন্দ শিশিটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "দূর হও, হতভাগা! আমি তোমাকে মানি না। আমি আমার পুরান পরিত্রাতাকে ডাকছি—হুং স্মেমপানিম্ ওঁ!"

কিন্তু মন্ত্রের মাহাত্ম্য অনুভূত হইল না। একমাত্র সেই চিকিৎসক ব্যতীত আর কোন মূর্তি দেখা গেল না। চিকিৎসক আনন্দের প্রতি করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং ধীরে ধীরে নিজের পোষাক ঠিক করিয়া লইয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

আনন্দ একাকী পড়িয়া রহিলেন; তখন তাঁহার মনের ভিতর দ্বন্দ্ব চলিয়াছে। চিকিৎসককে ডাকিয়া নিক্ষিপ্ত শিশির মত আর একটি বিষ পরিপূর্ণ শিশি চাহিয়া লইবার জন্য তিনি উদ্যত হইলেন, কিন্তু প্রতিবারই কি যেন একটি বস্তু তাঁহার কণ্ঠনালী রোধ করিল, ফলে তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। অবশেষে উত্তেজনা কমিয়া অসীম ক্লান্তি তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি একটি স্বপ্ন দেখিলেন।

আনন্দ দেখিলেন, তিনি অন্ধকার পাতালপুরীর বিরাট সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সেখানে একটি উৎসবের আয়োজন চলিয়াছে, সব কিছুই যেন পৈশাচিক উৎসবের জন্য প্রস্তুত। সিংহদ্বারে নানা আকৃতির অসংখ্য দৈত্য ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আলোক-সজ্জার প্রতীক্ষা করিতেছে। ছোট ছোট প্রেত-মূর্তি পরম উল্লাসে নানা রঙের প্রদীপের মালা সাজাইতেছে। তাহারা নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা তামাসা করিতেছে এবং মাঝে মাঝে বানরের মত উপরে লেজ বাধাইয়া দোল খাইতেছে। উচ্চপদস্থ প্রেতের দল এই সকল কার্যকলাপ পরিচালনা করিতেছে। আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের দেখিলে খুব গম্ভীর প্রকৃতির বলিয়া বোধ হয়। তাহাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া দণ্ড, সে সকল দণ্ডের এক দিক দিয়া হরিদ্রা রঙের অগ্নিশিখা বাহির হইতেছে। ছোট ছোট প্রেতের মধ্যে কেহ নিয়ম লংঘন করিলে এই অগ্নিশিখা দ্বারা সেই হতভাগ্যের লেজ পোড়াইয়া দেওয়া হইতেছিল। এত বড় উৎসবের কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া আনন্দ থাকিতে পারিলেন না।

যে প্রেতকে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন সে জবাব দিল, "বৌদ্ধধর্ম প্রচারকদের অন্যতম পুণ্যাত্মা আনন্দের শুভাগমন উপলক্ষে এই আয়োজন। অধীর আগ্রহে প্রতি মুহূর্তে আমরা তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করছি।"

আনন্দ ভীত হইলেন এবং বহু কষ্টে

সাহস সঞ্চয় করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নরকে সেই পুণ্যাত্মা প্রচারকের আবাস কেন নির্দিষ্ট হইল।

প্রেতটি সংক্ষেপে উত্তর দিল, "বিষ প্রয়োগ করবার অপরাধে।"

আনন্দ আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন এমন সময় দুইজন পরিদর্শক প্রেতের উগ্র বাগ্‌বিতণ্ডার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল।

তাহাদের মধ্যে একজন কর্কশ কণ্ঠে বলিল, "নিশ্চয়ই কম্মুরাগ।"

অপর জন তীক্ষ্ণস্বরে বলিয়া উঠিল, "ডম্বুরানন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

আনন্দ যে প্রেতকে প্রথমে প্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কম্মুরাগ ও ডম্বুরাননের তাৎপর্য কি?"

প্রেত উত্তর দিল, "দুটো নরককুণ্ড। কম্মুরাগ কুণ্ডে পাপীকে গলান পীচের ভেতর ফেলে দেওয়া হয় এবং গলান সীসা খাওয়ান হয়। আর ডম্বুরাননে তাকে গলান সীসার মধ্যে ফেলে দিয়ে, গলান পীচ খাওয়ান হয়। আমার সহকর্মীরা তর্ক করছে কোন্ কুণ্ডে আনন্দকে ফেল্‌লে তাঁর পাপের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।"

এই সংবাদ আনন্দ ধাতস্থ না করিতেই উপর হইতে একটি প্রেত হঠাৎ নীচে নামিয়া আসিল এবং সেই তর্করত প্রেতদ্বয়কে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া সবিনয়ে বলিল, "আপনারা আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। বুদ্ধের একমাত্র প্রচারক—যাঁর সঙ্গলাভের পরম সৌভাগ্য আমাদের হবে, সেই আনন্দকে উপযুক্তভাবে সম্মানিত করবার ক্ষমতা কি আমাদের হবে? আমার মতে কম্মুরাগ বা ডম্বুরানন কোন নরককুণ্ডই তাঁর পক্ষে উপযুক্ত হবে না। কাজেই আমি বলছিলাম দু' লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার নরককুণ্ড একত্র করে তাঁর জন্যে বিশেষ একটি নরক সৃষ্টি করা হোক্।"

পদস্থ প্রেতেরা এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইল এবং সেই প্রেতকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিল, "বা! সত্যিই তুমি উঁচুদরের প্রেত!" এই বলিয়া তাহারা প্রস্তাবিত নরক নির্মাণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিল।

আনন্দের ঘুম ভাঙিয়া গেল, কিন্তু ভয়ে তখন তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "কেন, কেন আমি ধর্মপ্রচারক হয়েছিলাম! প্রভু বুদ্ধ! প্রভু বুদ্ধ! ধর্মের পথ এত দুর্গম! শুভেচ্ছা সত্ত্বেও মানুষের এত ভুল হয়! আধ্যাত্মিক অহঙ্কারের কি শোচনীয় পরিণতি!"

হঠাৎ দৃষ্টি ফিরাইতেই আনন্দ দেখিলেন, ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং দণ্ডায়মান, তাঁহার সর্বাঙ্গে করুণার সুস্নিগ্ধ দীপ্তি। আনন্দের চোখের উপর হইতে যেন এক খণ্ড কাল মেঘ সরিয়া গেল, তিনি তাঁহার প্রভুর ভিতরে একই সঙ্গে সেই গন্ধর্ব, যোগী এবং চিকিৎসককে দেখিতে পাইলেন।

বিশেষ বিচলিত হইয়া আনন্দ বলিলেন, "প্রভু, আমি এখন কোথায় যাই? আমি যে পাপ করেছি তাতে আপনার কাছে তো আর যেতে পারি না।"

বুদ্ধ বলিলেন, "পাপের জন্যে আমার কাছে আসা তোমার নিষেধ নেই, কিন্তু নিজের দুর্বুদ্ধি এবং অবাধ্যতার ফলে যে হাস্যজনক ও উৎকট অবস্থায় পড়েছ তারই ফলে আমার কাছে আসা নিষেধ। আমি তোমার কাছে এসেছি এই খবর দিতে যে, আজ বিন্ধ্যগিরির ওপরে আমার প্রচারকেরা সকলে মিলিত হয়ে কি কি কাজ করেছে তার হিসাব দেবে। তোমার পরিবর্তে আমিই তোমার কার্যকলাপের কথা বলবো না তুমি নিজেই সে কথা বলবে আমি তাই জানতে চাই।"

আনন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিলেন, "আমি নিজের মুখেই সব কথা বলবো। নিজের পাপের কথা নিজেই বলা ভাল, তাতে যে গ্লানি আছে তা আমার ভোগ করা কর্তব্য।"

বুদ্ধ উত্তর দিলেন, "বৎস, তুমি ঠিকই বলেছ। এখন তুমি যে বেশ ধারণ করে আছ—যাকে যোগীর বেশ বলতে পার, তা পরিত্যাগ করে আমার শিষ্যেরা হলুদ রঙের যে রকম পোষাক পরে তাই পর এবং আমাদের সভায় উপস্থিত হও এই আমার আদেশ। আর একটি কথা, আজ তোমার জন্যে আমি আমার নিয়ম ভঙ্গ করবো। বিন্ধ্যগিরিতে একে একে সবাই আসতে শুরু করেছে, সেখানে আমি মুহূর্তের মধ্যে তোমাকে নিয়ে যাব, একাজও কম অলৌকিক হবে না। এ না করলে ক্ষিপ্ত জনতার হাতে তোমার ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা, কেননা শব্দ শুনে মনে হচ্ছে জনতা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তারা তোমার প্রিয় ছাত্রের প্ররোচনায় আমার ধর্মের বিলোপ সাধনে বদ্ধপরিকর হয়েছে। ব্রাহ্মণেরা বিষ দিয়ে আগের রাজাকে মেরে ফেলেছে।"

মর্মাহত আনন্দ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "প্রভু! প্রভু! সব কাজই কি নষ্ট হয়েছে আর তার মূলে রয়েছে কি কেবল আমারই অপরাধ এবং পাপ?"

বুদ্ধ বলিলেন, "যে জিনিস ফাঁকি এবং ছলনার ওপর প্রতিষ্ঠিত তা কখনও স্থায়ী হতে পারে না—পৃথিবীতে এই সব চেয়ে বড় সত্য হোক্। তুমি সান্ত্বনালাভ কর। আশা করি, ভবিষ্যতে তুমি অন্য দেশে ভালভাবে আমার ধর্ম প্রচার করবে। এবার অবশ্য তুমি তোমার কাজের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারবে না; তবুও স্বীকার করতে হবে আমার উপদেশের মর্ম অন্তরে গ্রহণ না করলেও বাইরে তুমি তা বর্ণে বর্ণে পালন করেছ, কেননা একথা কেউ বলতে পারবে না তুমি নিজে কখনও কোন অলৌকিক কাজ করেছ।"

অনুবাদক—শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্তী

ট্রামে-বাসে

মহামান্য বড়লাট বাহাদুর বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শুনিলাম, তিনি এবার আমাদের জন্য কিছুই আনেন নাই। পূজা সমাগত। আমরা আশা করিয়াছিলাম



—আর কিছু না হউক, পূজার বাজারে অন্তত কিছু টফি-চকোলেট হইলেও তিনি আমাদের জন্য আনিবেন।

* * * * * *

ইজিপ্টের শিক্ষামন্ত্রীরা বলিয়াছেন যে, ইজিপ্টের যেসব ছাত্র সরকারী সাহায্য লইয়া বিদেশে বিদ্যার্জন করিতে গিয়াছে, তারা ডিগ্রী নিয়া ফিরিয়া আসুক, ইহাই আমাদের ইচ্ছা; ডিগ্রীর বদলে স্ত্রী নিয়া ফিরিয়া আসিতে আমরা দিব না। ইজিপ্টের নিয়মকানুন নিশ্চয়ই আলাদা। আমাদের শাস্ত্রে বলে—"কিঞ্চিৎ লিখনং বিবাহের কারণং"—সুতরাং স্ত্রী নিয়াই যদি ফিরিয়া না আসিতে পারি, তবে কি ডিগ্রী ধুইয়া জল খাইব ?

* * * * * *

অসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে বলা হইয়াছিল যে, তেলের রেশনটা নাকি রেশনের দোকানেই পাওয়া যাইবে। এখন শুনিতেছি—রাতারাতি নাকি তেলের অনেক দোকানের উদ্ভব হইয়াছে এবং দোকানীদের অনেকেই নাকি যুক্তপ্রদেশের। যুক্তকর হইয়া তেল দিতে পারিলে অনেক অসাধ্যই সাধন করা যায়। বাঙালীরা এক নাসারন্ধ্র ছাড়া অন্য কোথাও তেলের ব্যবহার করিতে শিক্ষা করেন নাই।

* * * * * *

প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বক্তৃতা শোনার অপরাধে ভাগলপুর কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের প্রত্যেকের দুই টাকা করিয়া জরিমানা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিতে জটিলা-কুটিলাদের বিদ্বেষ দেখিতেছি শুধু দ্বাপরে নয়, কলিতেও বিদ্যমান।

* * * * * *

দেড় কোটি গজ কাপড় নাকি মালয়ে রপ্তানি করা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এই মাল রপ্তানিতে ভারতের বস্ত্র-ব্যবস্থার কোন ক্ষতিই হইবে না। বিশু খুড়ো বলেন—ঠাকুর ঘরে যিনি আছেন, তিনি যদি জিজ্ঞাসা করা মাত্রই বলেন যে, তিনি কলা খাইতেছেন না, তাহা হইলে কলার ক্ষতি হয় না!

* * * * * *

বাঙলার গভর্নর মিঃ কেসি ছুটি নিয়া বিলাত চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিশু খুড়ো বলিতেছেন যে, ঠিক এই সময় ছুটি নেওয়া তাঁর পক্ষে উচিত হয় নাই। আমাদের বাঙলায় নিয়ম আছে যে, ভাদ্র মাসে কেহ কোথাও যায় না। যাহা হউক; তিনি অচিরেই ফিরিয়া আসিয়া—বাজার



পরিষ্কারের গুরুভার হাতে তুলিয়া নিন, আমরা এই কামনাই করিতেছি।

* * * * * *

যুদ্ধ কবে শেষ হইবে, জাপানীরা কবে পরাজয়ের দলিলে স্বাক্ষর করিবে—এসব সম্বন্ধে যিনি নির্ভুল গণনা করিয়াছিলেন—তিনি পৃথিবী ধ্বংসের তারিখও বাৎলাইয়া দিয়াছেন। সেই মহাপ্রলয় হইবে নাকি ৩৭৭০ সালে। পাঠক তারিখটা টুকিয়া রাখিতে পারেন। যদি গণনায় ভুল হয়, তবে "ট্রামে-বাসে" আপনার প্রতিবাদপত্র ছাপাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিব।

* * * * * *

বিলাতের প্রধান মন্ত্রী মহোদয় বেতারে ভারত সম্বন্ধে কিছু বাৎচিৎ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা বলি—কর্মব্যস্ততা হইতে মন্ত্রী মহাশয়কে টানিয়া না আনিয়া



নির্ধারিত সময়ে ভারত সম্বন্ধে পুরাতন রেকর্ডগুলি বাজাইলেই কর্তৃপক্ষ সুবিবেচনার কাজ করিতেন।

* * * * * *

১৯৩৪ হইতে এ পর্যন্ত যুদ্ধ-উপকরণ প্রস্তুতের জন্য যত টাকা খরচ হইয়াছে, তা দিয়া পৃথিবীর প্রত্যেকটি নরনারীকে নাকি ১২৫ পাউণ্ড করিয়া দেওয়া যাইত। তিন পুত্র, পাঁচটি কন্যা, বৃদ্ধা মা, বিধবা ভগ্নী, সধবা স্ত্রী লইয়া বিশু খুড়ো এই হারে কত টাকা পাইতেন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন যে, "বড় দাঁওটাই ফস্কে গেল গো। যাক্‌গে, ভবিষ্যতে যুদ্ধের মাল-মশলা তৈরি না করে যদি কিছু কম হারেও টাকাটা দেয়, তাহলেই যথেষ্ট মনে করব।"

* * * * * *

ট্রাম ধর্মঘট চলিতেছে। বাসে অসম্ভব ভীড়। ঠেলায় পড়িয়া একটি ঠেলা-গাড়ি চড়িয়া অফিসে যাইতেছি। বলা বাহুল্য, ব্যবস্থাটা বিশু খুড়োর। শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবী দাবাইয়া রাখার কথা উঠিলে বিশু খুড়ো বলিলেন—কোম্পানীর দোষ নাই—তাঁরা বহুদিন হইতেই সতর্ক করিয়া আসিতেছেন—"পকেটমার হইতে সাবধান থাক।"

* * * * * *

বিলাতের পেশাদার খেলোয়াড়দের কাছে আই এফ এর পরাজয়ে দুঃখিত হইলেও কেহই বিস্মিত হন নাই। ডেনিস কম্পটন প্রভৃতি খেলোয়াড়দের উন্নততর ক্রীড়া-নৈপুণ্যের প্রতি এ দেশীয় খেলোয়াড়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অনেকেই প্রবন্ধাদি লিখিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"তাতে কোনই কাজ হবে না, দিশী খেলোয়াড়রা নিশ্চয়ই বিলিতি খেলার প্রথা-বর্জন করে চলবেন, সুতরাং 'শোচনীয় ব্যর্থতা'র ইতিহাস কায়েমী হয়েই থাকবে।"

দেশ

শারদীয়া সংখ্যা
১৩৫২

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও "দেশ"-এর শারদীয়া সংখ্যা খ্যাতনামা লেখকবৃন্দের রচনাসম্ভার ও সুনিপুণ শিল্পিবৃন্দের বহু চিত্রে সজ্জিত হইয়া শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনা ছাড়াও নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে শারদীয়া সংখ্যা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় হইবে:

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি'। একটি লুপ্তপ্রায় খাতা হইতে এই মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য রচনাবলী উদ্ধার করা হইয়াছে।

২। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা।

৩। শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্র এবং হিমাচল ভ্রমণকালে অঙ্কিত তথাকার পার্বত্য দৃশ্যের মনোরম 'স্কেচ'।

৪। শিল্পীগুরু শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক কিশোরদের জন্য লিখিত "চাঁইদাদার গল্প" নানা চিত্রে শোভিত হইয়া প্রকাশিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সকল সাহিত্যিকের রচনা প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে দেওয়া গেল:—

গল্প : রস-রচনা : নাটক

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়
শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল
শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
শ্রীসুবোধ ঘোষ
শ্রীমনোজ বসু
শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র
শ্রীতারাপদ রাহা
শ্রীবিমল মিত্র
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
শ্রীসুলতা কর

প্রবন্ধ

শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর, শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সৈয়দ মুজতবা আলী।

কবিতা

শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত শ্রীকানাই সামন্ত, শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীগোপাল ভৌমিক, শ্রীমৃণালকান্তি দাস, শ্রীকিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীসুশীল রায়, শ্রীঅরুণ সরকার।

মূল্য—১৷৷০
রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে—১৸০

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বাঙলার মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর উক্তিতে ধ্বনিত হইয়াছে—

"সংগ্রামে প্রস্তুত বীর হও।"

'অল্পদিনের মধ্যেই কংগ্রেসের তূর্যনাদ ধ্বনিত হইবে।'

যাঁহারা সাঁতরাগাছী রেলস্টেশনে ও হাওড়া ময়দানে বাঙলায় প্রত্যাগত শরৎচন্দ্রের সম্বর্ধনার্থ সমবেত জনতার ভাব লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন, বাঙালী নেতার অপেক্ষা করিতেছিল—তাঁহার আগমন ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডের স্পর্শের মত বাঙালীকে কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে প্রেরণা দিয়াছে।

আজ বাঙলার বিশেষ সমস্যাসমূহের সমাধানের কার্যভার গ্রহণ করিবার লোক বাঙলায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বাঙলায় আসিয়াই পাকিস্থান পরিকল্পনার অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

আজ মিস্টার জিন্না যে পরিকল্পনার উত্থাপন করিয়া জাতির অপরিসীম ক্ষতি করিতেছেন, তাহা এদেশে মুসলমানদিগের সৃষ্ট নহে। তাহা এদেশে ইংরেজ শাসকদিগের সৃষ্টি। বাঙলায় মুসলমানের সংখ্যাধিক্য যেমনই কেন হউক না, যে পূর্ববঙ্গে তাহাদিগের সংখ্যাধিক্য প্রবল এবং যে পূর্ববঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনকালে বিদেশী শাসকদিগের প্রদত্ত অগ্নি এখনও নির্বাপিত হয় নাই—পরন্তু জামালপুরের ঘটনার পুনরাবৃত্তি সেদিন ঢাকায় হইয়াছে সেই পূর্ববঙ্গে বঙ্গবিভাগের পূর্বে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ ছিল না। ইংরেজ শাসক ও রাজনীতিকরা—ভেদনীতির দ্বারা প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টায়—বিবাদ বাধাইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে বাঙলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বিজ্ঞ সরকারী কর্মচারী স্যার হেনরী কটন যে উক্তি করিয়াছেন, তাহাতেই প্রকৃত অবস্থা সপ্রকাশ হয়। তিনি বলিয়াছেনঃ—

"There was never any cause for quarrel between Hindoos and Mahammedans as such. As simple cultivators they live side by side, and speak the same language. For the first time in history a religious feud was established between them by the partition of the province. For the first time the principle was enunciated in official circles; Divide and Rule! The hope was held out that the partition would invest the Mahammedans with 'a unity they had not enjoyed since the days of the old Mussalman Viceroys and kings.' The Mohammedans were officially favoured in every possible way. 'My favourite wife' was the somewhat course phrase used by Sir Bamfylde Fuller to express his feelings.'

হাড়গিলচর প্রভৃতি স্থানের মামলায় দেখা গিয়াছিল, একদল লোক অজ্ঞ মুসলমানদিগকে মিথ্যা প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি অনাচারে ও অত্যাচারে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। প্রকৃত অপরাধীরা ধৃত হইলেও নামমাত্র দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল! স্যার রাসবিহারী ঘোষ বলিয়াছিলেন—সাম্প্রদায়িকতা ভূত নামান যত সহজ, ছাড়ান তত সহজ নহে। তাহাই পরেও প্রতিপন্ন হইয়াছে। পূর্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা বাতিল করিতে হয়। সেই সময় "মোমিন" গান করেন—

"কিবা হইল ওগো নানি!
বড় আশা দিছিল লাট বাহাদুর
কৈরা মেহেরবাণী—
দারগাগিরী চাকরী দিবে
সাথে বইসা খানা খাইবে—
ওরে বিলাতী মেম সাদি দিবে, মুই
দেখামু কেরদানী।"
কিন্তু শেষে কি হইল?—
"হুজুরেতে আর্জি দিলাম
দারগাগিরি না পাইলাম;
ওরে এত আশা কৈরা শেষে নাছিবে
সানকীধোয়া পানি!"

কিন্তু সেদিন যে অহিত সাধন করা হইয়াছিল, তাহার ফল লুপ্ত হয় নাই। তাহার পরেও সময় সময় ঢাকায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইয়াছে এবং কয় বৎসর মাত্র পূর্বে তাহা আবার যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে সহস্র সহস্র হিন্দু ব্রিটিশ শাসিত স্থান ত্যাগ করিয়া সামন্তরাজ্য ত্রিপুরায় আশ্রয় লইয়াছিলেন।

সেই বহ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য শরৎচন্দ্র অগ্রণী হইয়া বাঙলায় সর্বদলের সম্মিলিত সচিবসঙ্ঘ গঠনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং সে কার্যে সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহাকে বিনা-বিচারে বন্দী করা হয়।

সাম্প্রদায়িকতা বাঙলার অভিশাপ। শরৎচন্দ্র বাঙলাকে সেই অভিশাপমুক্ত করিতে স্বয়ং অসাধারণ ত্যাগস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে তদপেক্ষাও অধিক ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে।

তথাপি তিনি যে মতে অবিচলিত আছেন, তাহা তাঁহার উক্তিতেই বুঝিতে পারা যায়।

আজ তাঁহাকে আবার সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাঙলা দুর্ভিক্ষের দাবানলদগ্ধ হইয়াছে। আজও তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। আবার দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাও যে নাই, তাহা নহে। শরৎচন্দ্র কি অগ্রণী হইয়া পুনর্গঠনের কার্যে দেশের শক্তি প্রযুক্ত করিবেন? তিনি অগ্রণী হইলে কর্মীর অভাব হইবে না। এ কথা আমরা বিশেষভাবেই বলিতে পারি।

এ কাজের জন্যও সাম্প্রদায়িকতা দলিত করা প্রয়োজন। এই সাম্প্রদায়িকতা কাহারা প্রজ্বলিত রাখিয়াছে, তাহাও সকলে জানেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের যেদিন বড়লাট লর্ড মিণ্টো মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র অধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন, সেই দিনই কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁহার পত্নীকে লিখিয়াছিলেনঃ—

"A very big thing has happened to-day, a work of statesmanship that will affect India and Indian history for many years. It is nothing less than the pulling back of 62 millions of people from joining the ranks of seditious opposition."

সংগ্রাম তাহাদিগের নীতির সহিত।

আসন্ন নির্বাচনে যাহাতে হিন্দু ও মুসলমান জাতীয়তাবাদীরাই জয়ী হইতে পারেন; সে চেষ্টাও শরৎচন্দ্রকে করিতে হইবে।

বাঙলার সমস্যাগুলির গুরুত্ব অসাধারণ। সে সকল সমস্যার সমাধানের কার্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিলে বাঙলার লোক তাঁহার নেতৃত্বে কাজ করিবে।

নাজিমুদ্দীন সচিবসঙ্ঘ যে বাঙলার কোন যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন নাই, তাহা পূর্বেই জানা গিয়াছিল। দেখা যাইতেছে, সেই সচিবসঙ্ঘের পতনের পরে গভর্নরের স্বৈরশাসনশীল সরকার এক বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন এবং কেন্দ্রী সরকারের বিশেষজ্ঞদিগের সহিত তাহার আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই পরিকল্পনা যাঁহাদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছে, তাঁহারা বাঙালী নহেন এবং দেশের লোকের পরামর্শ গ্রহণ করাও প্রয়োজন মনে করেন নাই। **অর্থাৎ দেশের** লোককে তাঁহারা নাবালক ও আপনাদিগকে তাঁহাদিগের অভিভাবক ধরিয়া লইয়া কাজ করিয়াছেন। কিন্তু—

"যাহার হৃদয়ে শেল, সে জানে কেমন;
পরের কেবলমাত্র লৌকিক রোদন।"

বাঙলা সরকার যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন—তাহা ২০ বৎসরব্যাপী এবং তাহার ব্যয় ২৫০ কোটি টাকা, প্রথম ৫

বৎসরে একশত পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে এবং তাহার মধ্যে ৫৩ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইবে। ঋণ ৬০ বৎসরে শোধ করা হইবে। কেন্দ্রী সরকার ৬৯ কোটি টাকা দিবেন। আর বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের বিলোপ সাধিত হইলে বৎসরে অন্তত ৫ কোটি টাকা থাকিবে। কিন্তু আগামী ৩ বৎসরের মধ্যে যে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগ হইতে বাঙলা অব্যাহতি লাভ করিবে, এমন মনে হয় না। বাঙলার চির-স্থায়ী জমীদারী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ-সাধনে বহু অর্থ—ক্ষতিপূরণ হিসাবে—ব্যয় করিতে হইবে এবং ২৩ বৎসরে সে কাজ সম্পূর্ণ হইবে। সে কাজ আগামী বৎসর ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইবে।

ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও মেদিনীপুর জিলা খণ্ডিত করা হইবে। তাহাতে সিভিল সার্ভিসের যে সকল চাকুরীয়ার স্থান হইবে, তাঁহাদিগের সংখ্যা কি বেসামরিক সরবরাহ বিভাগে বর্তমানে নিযুক্ত ঐ সার্ভিসের চাকুরীয়াদিগের সংখ্যার সমান হইবে?

আমরা যে পূর্বেও কেন্দ্রী সরকারের ও বাঙলা সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা শুনি নাই, এমন নহে।—

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থির হয়, কেন্দ্রী সরকার ভারতে হাতের তাঁতশিল্পের উন্নতি-সাধন জন্য ৫ বৎসর বৎসরে ৫ লক্ষ টাকা দিবেন। ১৯৩৪-৩৫ সালের শেষ ৫ মাসের বরাদ্দ এইরূপ ছিলঃ—

বাঙলা	...	৩৫,৫০০	টাকা
মাদ্রাজ	...	২৬,৫০০	"
বোম্বাই	...	১৭,৫০০	"
যুক্তপ্রদেশ	...	৩২,৫০০	"
পাঞ্জাব	...	১৭,০০০	"
বিহার ও উড়িষ্যা	...	২৩,০০০	"
মধ্যপ্রদেশ	...	৭,৫০০	"
ব্রহ্মদেশ	...	৭,৫০০	"
আসাম	...	৭,৫০০	"
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	...	১,০০০	"
দিল্লী	...	২,০০০	"

পর বৎসর বাঙলার জন্য বরাদ্দ—৮০,০০০ টাকা।

সেই টাকায় যে বাঙলায় হাতের তাঁত-শিল্পের কোন উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয় নাই, তাহা অনায়াসে বলিতে পারা যায়।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে বাঙলা সরকারের শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টার বাঙলার শিল্পোন্নতির জন্য এক পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনা প্রচার করিয়াছিলেন। সেই পরি-কল্পনায়ও বাঙলার লোকের কোন উপকার সাধিত হয় নাই।

দামোদর-প্রবাহ-নিয়ন্ত্রণ এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। আমরা আমেরিকার টেনেসী উপত্যকার উন্নতিসাধনের অনেক কথা শুনিতে পাই। সেই বিষয়ে লিলিয়েন্থল যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এইমতই প্রকাশ ও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উন্নতির মূলে গণতান্ত্রিক মতের প্রয়োজন—

"Intested principles of democracy we have ready at hand a philosophy and a set of working tools that, adapted to this machine age, can guide and sustain us in increasing opportunity for individual freedom and well-being."

সেই গণতান্ত্রিক নীতির অভাব যে এদেশে বহু কল্যাণকর কার্যের বিরোধিতা করিয়াছে, তাহাতে যেমন সন্দেহ নাই—এদেশে আমলাতান্ত্রিক মত তেমনই নানা-রূপ একচেটিয়া ব্যবস্থায় লোকের কত অনিষ্ট সাধিত করিয়াছে, তাহা আমরা বাঙলায় গত দুর্ভিক্ষেও দেখিয়াছি। দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনও তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন—যে "এজেন্সীর" মারফতে চাউল সংগ্রহের ব্যবস্থার অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন হওয়ায় মাদ্রাজ, বোম্বাই, উড়িষ্যা, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্জাব সেই ব্যবস্থা বর্জন করিয়াছিল, বাঙলায় তাহার অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন হইবার পরেও যে তাহাই বহাল রাখা হইয়াছিল, তাহার কারণ কি? "এজেন্সী" প্রদানকালে একটি প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যে সচিব বলিয়াছিলেন, তাহার নানা গুণের মধ্যে মুসলিম লীগানুরক্তি অন্যতম, তাহাও আমরা অবগত আছি।

আলোচ্য পরিকল্পনা যে, বাঙলার লোকের সহিত পরামর্শ না করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতেই আমলাতন্ত্রের গণতান্ত্রিক নীতি সম্বন্ধে অপ্রীতি বুঝিতে পারা যায়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলিয়াছেন, জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি সরকারের নিকট হইতে বহু আবশ্যক তথ্য পান নাই। বাঙলার লোকের পক্ষে বাঙলা সরকারের পরিকল্পনা বাঙলার লোকের দিক হইতে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেজন্য যে সকল তথ্য প্রয়োজন, বাঙলা সরকার বাঙলার লোকের কোন সমিতি গঠিত হইলে সেই সমিতিকে দিবেন কি?

বাঙলার দুটি সমস্যা বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছেঃ—

(১) দুর্ভিক্ষের আশংকা।

(২) সাম্প্রদায়িক বিভেদ।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের শেষ হয় নাই—তাহার পরে এবার ফসল ভাল হইবে না; কাজেই এখন হইতে সেজন্য সতর্কতাবলম্বন প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে সরকারের কর্তব্যের আলোচনায় কতটুকু সুফল লাভের আশা করা যায়, তাহা বলা যায় না। তবে সরকারকে কর্তব্যে অবহিত করিবার চেষ্টা অবশ্যই করিতে হইবে। **কিন্তু প্রধান প্রয়োজন—দেশবাসীকে প্রস্তুত হইতে হইবে।**

বাঙলার নানাস্থানে আজ লোককে সাহায্য প্রদানের প্রয়োজন প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সেজন্য যে তরুণ সম্প্রদায়ের আগ্রহের অভাব নাই, তাহা আমরা অবশ্যই বলিতে পারি। কিন্তু কংগ্রেসের ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের দ্বারা দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিপন্ন অঞ্চলসমূহে সাহায্যদান-ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাঙলায় মুসলমানদিগের মধ্যে জাতীয়তা-বাদীর অভাব নাই। তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতা-দুষ্ট মনোভাব ঘৃণা করেন এবং মুসলিম লীগের সমর্থন করিতে অসম্মত। তাঁহাদিগের জাতীয়বাদিতা তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের সহিত একযোগে কাজ করিবার উপায় নির্দেশ করিয়া দিতেছে। এখন তাঁহাদিগকে সহ-যোগের জন্য আহ্বান করিলে বাঙলার সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান সহজসাধ্য হইবে।

সাহিত্য-সংবাদ

হাওড়ায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা

হাওড়া সেবা সংঘের উদ্যোগে সংঘের ষষ্ঠদশ বার্ষিক সর্বজনীন দুর্গা পূজার পূজা মণ্ডপে আগামী মহাসপ্তমী তিথিতে সন্ধ্যায় ৬ ঘটিকায় একটি আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হইবে। "দেশ সম্পাদক" শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র সেন, ভক্তি ভারতী, ভাগিরথী, মহাশয় সভাপতিত্ব করিবেন। যে কেহ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারেন। প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে একটি করিয়া রৌপ্য কাপ দেওয়া হইবে। বিষয়ঃ—রবীন্দ্রনাথের "প্রশ্ন" (ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত........), যোগ-দানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে আগামী ৬ই অক্টোবর শনিবারের মধ্যে ৩৩।১, নরসিংহ দত্ত রোডস্থ পূজা কমিটির সম্পাদককে লিখিয়া জানাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

পুস্তক-পরিচয়

ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় প্রকাশিত, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট। মূল্য আড়াই টাকা।

সাহিত্য বিচারের এক প্রধান অঙ্গ সাহিত্যের কলাকৌশলের আলোচনা। এই কলাকৌশলের যথোচিত আলোচনা করলেই সাহিত্য শিক্ষার পথ সুপ্রশস্ত হতে পারে। এ সুপরিচিত সত্যটি আমাদের দেশে এখনো অনেকাংশে উপেক্ষিত। বাঙলা দেশে সাহিত্য সমালোচনা নামে যে জিনিস আজকাল তা প্রায়শ নিতান্ত ভাসাভাসা রকমের; যে কলা কৌশলের গুণে সহজভাবে সাহিত্যিক রসের স্ফূর্তি হয় তার খোঁজ না করে বা তার প্রতি লক্ষ্যমাত্র না করে সমালোচকেরা আলোচ্য লেখক বা তাঁর লেখার বিষয়বস্তু ও ভাব গৌরবের পুনরুক্তি দিয়ে যখন পুস্তকের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে চলেন তখন তা দেখে ধৈর্য রক্ষা করা দায় হয়। বহুদিন যাবৎ প্রায়শ এ ধরণের সাহিত্য আলোচনা দেখে দেখে নিরাশ হওয়ার পর 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' বইখানি পড়ে বিশেষ আনন্দলাভ করেছি।

রবীন্দ্রনাথের পদ্য রচনা যে সকল গুণের দ্বারা রসজ্ঞ বাঙালীর চিত্তে স্থায়ী আসন লাভ করেছে তাদের অন্যতম তাঁর অপরূপ ছন্দোবৈচিত্র্য। অন্য সকল উত্তম সাহিত্যিক রচনার মতো রবীন্দ্রকাব্যও তার সামগ্রিক রূপের দ্বারাই পাঠকের রসোদ্বোধকে প্রেরণা দেয়, সেই সাধারণ পাঠক এর কোনো বিশেষ একটি দিক্—যেমন শব্দচয়ন, ধ্বনিসুষমা, ছন্দ ইত্যাদির কোন একটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার অবসর পেয়ে ওঠেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমালোচকের নিপুণ দৃষ্টি এরা এড়াতে পারে না। তিনি এদের প্রত্যেকটি নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গঠনে প্রয়াস পান। তাঁর সে প্রয়াস থেকে যে কেবল সাহিত্য-স্রষ্টা বিশেষের শক্তির যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায় তা নয়, পরন্তু যাঁরা সেই সকল বিচার বিশ্লেষণ মন দিয়ে পড়েন তাঁরা সাহিত্যবোধ ও সাহিত্য নির্মাণ সম্বন্ধে নানা মূল্যবান ইঙ্গিত লাভ করেন। একারণে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন রচিত 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' আমাদের খুব তৃপ্তি দিয়েছে। প্রায় অর্ধ শতাব্দীব্যাপী সাধনার ফলে রবীন্দ্রনাথ যে বিপুল কাব্যসঞ্চয় রেখে গিয়েছেন তাঁর ছন্দগুলি যে বিচিত্র রকমের, শুধু এটুকুন পেলে সে সকলের বিস্ময়কর রূপভেদ এবং রসব্যঞ্জনার নানামুখী শক্তির স্বল্পাংশও আন্দাজ করা যায় না। এবিষয়ে রবীন্দ্র প্রতিভার গুরুত্ব বুঝতে হলে একদিকে চাই কবিগুরুর ব্যবহৃত ছন্দগুলির গঠন প্রণালী বেশ ভালো করে বিশ্লেষণ করা আর একদিকে চাই বাঙলা ছন্দের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে ছন্দকার রবীন্দ্রনাথের স্থান নির্দেশ। এ কথা খুব আনন্দের সঙ্গে বলতে পারছি যে, রবীন্দ্র ছন্দ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্রের আলোচনা এ উভয় দিক থেকেই বেশ অভাবনীয়রূপে সার্থক হয়েছে। গ্রন্থকার ইতঃপূর্বেই ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থ তাঁর এই খ্যাতি দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করল। উপস্থিত গ্রন্থে তিনি যে কেবল রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত ছন্দগুলির বিশ্লেষণ ও তাদের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন তা নয়, রবীন্দ্র ছন্দের ক্রমবিকাশ, অন্যান্য বাঙালী কবির ছন্দের সঙ্গে রবীন্দ্র ছন্দের তুলনা ইত্যাদি বিষয়েও তিনি যথোচিত আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে তাঁর মতামত সুপরিস্ফুট করার জন্যে তিনি প্রয়োজন মত নানা সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ছন্দেরও উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রকাব্যে অনুসৃত বিচিত্র ছন্দ পর্যায়ের ক্রমাবিবর্তনের দুর্লক্ষ্য ইতিহাসটি লেখক যে সহজ ভাষায় ও চিত্তাকর্ষকরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে পদে পদে তার ধৈর্য, সতর্কতা, শৃঙ্খলাবোধ আদি পাণ্ডিত্যসুলভ গুণের পরিচয় আমাদিগকে মুগ্ধ করেছে। উপস্থিত গ্রন্থ থেকে সাধারণ পাঠকবর্গ কবিতা আবৃত্তি সম্বন্ধেও বহু মূল্যবান ইঙ্গিত লাভ করবেন। বাঙলা ছন্দ সম্বন্ধে এমন সরল ও নির্ভরযোগ্য আলোচনা ইতঃপূর্বে খুব কমই লক্ষ্য করেছি। আশা করি এ গ্রন্থ কাব্যরসিক ও কাব্য-সমালোচক এ উভয় শ্রেণীর পাঠকেরই সমানভাবে উপকার করবে।

কিন্তু এ সমালোচনার উপসংহার করবার আগে দু'একটি কথা বলে রাখা দরকার মনে করি। লেখকের সিদ্ধান্ত, বিষয় বিন্যাস ও আলোচনাভঙ্গী খুব মনোজ্ঞ এবং মূল্যবান হলেও সকলে যে তাঁর সঙ্গে সর্বাংশে একমত পোষণ করবেন তা নাও হতে পারে। বর্তমান সমালোচকও কোন কোন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথের উপাদেয়তা কিছুমাত্র কমে না। একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্রের এ বই বিদ্বৎসমাজে বাঙলা সাহিত্যের একটি মহার্ঘ্য দান বলে স্বীকৃত হবে।

শ্রীমনোমোহন ঘোষ।

যায় যদি যাক্—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশকঃ ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

১৩৪৮—৫০ সালের পটভূমিকায় শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এই উপন্যাসখানি রচিত। যুদ্ধের বিভীষিকা, বোমার আতঙ্ক, দুর্ভিক্ষের বীভৎসতা যখন কলিকাতা নগরীর সমাজ ও সভ্যতাকে ভাঙিয়া চুরিয়া একেবারে তছ্‌নছ্‌ করিয়া দিয়াছে, সেই সময়ে এক মধ্যবিত্ত অসহায় পরিবারের একটি নিরীহ তরুণী সাম্যবাদী জমিদার পুত্রের চক্রান্তে পড়িয়া ধাপের পর ধাপ নামিতে নামিতে ভিক্ষাপাত্র হাতে নগরীর রাজপথে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইল, তাহারই মর্মন্তুদ কাহিনী লইয়া এই উপন্যাস রচিত। উপন্যাসের নায়িকা সেবা চরিত্রটি অচিন্ত্যকুমারের একটি অপূর্ব সৃষ্টি। দুঃখদারিদ্র্যের নিষ্পেষণ একদিকে অপরদিকে মাংসলোলুপ সাম্যবাদী জমিদার পুত্রের টাকার প্রলোভন; এই দুয়ের টানাটানিতে বিপর্যস্ত সেবা যখন সুজনের গৃহে আশ্রয় পাইল, তখন সে শুধু বাঁচিল নহে, নূতন উদ্দীপনায় নূতন স্বপ্নে সে জীবনকে মধুর করিয়া তুলিল। কিন্তু সে স্বপ্ন বেশী দিন রহিল না। জমিদার পুত্রের চক্রান্তে সুজন চাকুরীহীন জীবনের নৈরাশ্য লইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল, সেবাকে ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়াইতে হইল রাস্তায়। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের দ্বন্দ্বময় প্রাত্যহিক জীবন অচিন্ত্যবাবু অত্যন্ত দরদ ও সমবেদনার সহিত সাধারণের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। বোমাতঙ্ক ও দুর্ভিক্ষের সময়ে কলিকাতা নগরীর একটি প্রাঞ্জল চিত্র লেখক এই গ্রন্থে দিয়াছেন। ইহা ছাড়া উপন্যাসের রচনা যেমন সবল তার ভাষাও তেমনি প্রাণবন্ত।

জলকল্লোল—প্রবোধকুমার সান্যাল। মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত। দাম সাড়ে চার টাকা।

মানুষের মতো বইয়েরও বিশেষ একটি সত্তা আছে। লেখকরূপী সৃষ্টিকার যে মুহূর্তে তাকে সৃষ্টি করে ছেড়ে দিলেন, সেই মুহূর্ত থেকে সে আর লেখকের নয়। সে একটি সত্তা, এক স্বতন্ত্র সত্য আছে তার; আছে মন, আছে হৃদয়। সমস্ত নিয়ে সে সকলের। সে সাধারণের। তার মন দিয়ে সে প্রভাবিত করবে মনকে, হৃদয় আবেগে আলোড়িত করে তুলবে হৃদয়কে, প্রাণের উচ্ছ্বাসে প্রাণকে নিয়ে করবে কাড়াকাড়ি। 'জলকল্লোলে'র লেখক কে? সেই কথা আমি এখন আর ভাবছি না। তিনি আমার কাছে অবান্তর ও উপলক্ষ্য মাত্র। পুস্তক যদি বলতে পারে যে, 'আমি নিজের জোরেই পুস্তক', তবেই আমি তাকে চোখের সামনে তুলে ধরি। অন্যথা লেখকের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন।

বহু নদনদীর কলকল্লোল শুনলাম 'জলকল্লোলে'র হৃদয়ে। কিন্তু আসল যে কল্লোলে বইখানি একটি জাগ্রত বই হয়েছে, তা ওরই অন্তরগঙ্গার কল্লোলিত ধারা। স্রোতদোদুল্যমান মনখানি বহু তরঙ্গের ধাক্কা খেতে খেতে আসল যে-পথে চলেছিল, সেই পথের শেষে ছিল——অনন্ত। সাধুর ছিন্ন শ্মশানে আমি তার মহাবিস্তার দেখলাম না। ওটি লেখকেরই একটি হারানো নদী, গ্রন্থসত্তার কেউ নয়। সুতরাং 'যে নদী মরুপথে হারালো ধারা' তার জন্য সামান্য একটু কাঁদলেও 'জলকল্লোলে'র অবশ্যম্ভাবী মহান পরিশেষের থেকে বঞ্চিত হয়েছে একথা দরদী পাঠকেরা যে মুহূর্তে বুঝবে, সেই মুহূর্তে আরো বেশী কাঁদবে। 'মহাপ্রস্থানের পথে' যে কল্লোলিনী সরস্বতীর আদিপ্রকাশ, 'জলকল্লোলে' তাঁর আবির্ভাব শেষ এই কথা কিন্তু আমি বলছি না; বলছি যে, তিনি তাঁর সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশে অনন্ত দিকের দিকে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ দিগন্তে বাধা পেলেন কেন? এই পুস্তকের রাজর্ষিসত্তা কখনোই থেমে ও থম্‌কে যেতে পারে না শ্মশানভঙ্গুরতায়। স্মৃতির শিলাস্তূপ কত যে রচনা করে গেছে 'জলকল্লোলে'র অপরূপ কবিত্ব, গভীর স্বপ্ন, দুর্দাম বেদনা! জীবন ছলছল কলকল করছে পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে। প্রবোধবাবু কবি। লেখক বা সাহিত্যিক বা রচনাকার যে মুহূর্তে প্রাণের নদীতে তুফান তোলেন ছন্দের ও সংগীতের, সেই মুহূর্ত থেকে তিনি আর সাধারণ লেখক নন, তিনি কবি। এমনি কল্লোলিনী যেন তাঁর মনোময় পর্বত থেকে আরও অবতরণ করে, হৃদয় এখানে ওখানে উজাড় করে ঢেলে দিয়ে সাগরের অনন্তলীলায় হোক তাঁর সৃষ্টি-দেবীর নিত্যলীলা। সেখানে যথাস্থানে সবাই থাকবে—সকল হারানো নদী, সকল অলব্ধ ও লব্ধ।

জ্যোতির্মালা দেবী।

জ্যান্ত ভূতের দল—অরূপ প্রণীত। প্রকাশকঃ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৮সি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

ছোটদের চিত্তাকর্ষক উপন্যাস। দেশের চোর-

জোচ্চোর, ভণ্ড দেশদ্রোহী লোকদের পাড়ার কয়েকজন জ্যান্ত ভূত কিভাবে সাজা দিয়াছিল, তাহার বলিষ্ঠ বর্ণনা আছে এই উপন্যাসে। ছেলেরা পড়িয়া প্রচুর আনন্দ পাইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু বই পড়িয়া পাড়ায় পাড়ায় যদি এই ধরণের জ্যান্তভূতের দল গঠনের উৎসাহ পায় তাহা হইলে রচনা সার্থক হইবে।

জওহরলাল—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ইউ এন ধর এণ্ড সন্স লিঃ, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ছোটদের জন্য লিখিত পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর জীবনী। রচনাশৈলীর গুণে ও ভাষার প্রাঞ্জলতায় জীবনী উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক। বইখানি ছোটদের পড়া উচিত।

মাকড়সা—রজত সেন প্রণীত। পূরবী পাবলিশার্স, ৩৭।৭, বেনেটোলা লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

বাস্তবজীবনের ঘটনা লইয়া কিশোরদের জন্য রচিত রোমাঞ্চকর কাহিনী। বইখানির ছাপা ও বাঁধাই মনোরম।

প্রাচ্য বাণী মন্দির—প্রবন্ধাবলী। প্রথম খণ্ড। সম্পাদক ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী পি এইচ-ডি (লণ্ডন), এফ আর এ এস (লণ্ডন)। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—প্রাচ্য বাণী মন্দির, ৩, ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয় প্রাচ্য বাণী মন্দিরের উদ্দেশ্য। আমরা এই মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। আলোচ্য প্রবন্ধাবলীতে কুমারী সন্ধ্যা ভাদুড়ী এম এ কর্তৃক ঋগ্বেদ হইতে কবিতা ছন্দে অনূদিত দেবতা উষা, পণ্ডিত নকুলেশ্বর শাস্ত্রী এম এ বিদ্যারত্ন লিখিত দার্শনিক ভ্রম-জ্ঞান ও অধ্যাত্মবাদ, ডক্টর তমোনাশ দাশগুপ্তের 'কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'নবীনচন্দ্রের অমিতাভ', শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ এম এ কর্তৃক লিখিত নবীনচন্দ্রের অবকাশ রঞ্জিনী, শ্রীশীতাংশুশেখর বানার্জি লিখিত মীমাংসকমতে জ্ঞাতব্য, পণ্ডিত সুরেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী তর্কতীর্থের মহিলা কবি হেমন্তবালা, শ্রীযুক্ত সুধীন্দুলাল গুপ্তের কালিদাসের মালবিকা, ডক্টর রমা চৌধুরী এম এ, ডি লিট কর্তৃক লিখিত সূফী মনস্তত্ত্ব, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর যুগপ্রবর্তক রামমোহন, শ্রীমতী অমিয়া নাগের কাশীদাসের লক্ষ্মণা, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দে এম এ কর্তৃক ঋতু সংহারের পদ্যানুবাদ এই কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি সবই সুচিন্তিত এবং সুলিখিত। এমন সারগর্ভ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা পাঠ করিয়া সকলেই উপকৃত হইবেন। আমরা প্রাচ্য বাণী মন্দিরের এই মহতী প্রচেষ্টার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

শ্রীশ্রীকালিকাকল্পামৃতম্ — শ্রীভৈরবানন্দ। কালিকাশ্রম, পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা, শ্রীকালিকানন্দকৃত 'শ্রীশ্রীবিমলানন্দময়ীস্তুতি' সম্বলিত এবং সহস্রারপদ্মাবস্থিত মহাকাল ও মহাকালীরচিত্রে সুশোভিত এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীকালিকার সম্পূর্ণ পূজাবিধির সহিত নিত্যপূজা, জগন্মঙ্গলকবচ, সহস্রনাম, কর্পূরাদিস্তোত্র, বিদ্যারাজ্ঞীশতনাম, প্রভৃতি নিবন্ধ হইয়াছে। বঙ্গদেশে এতাবৎ অপ্রকাশিত 'মহাকালিকাখড়্গমালা' ও 'কালিকা-চক্ররাজভাবনোপাসনা' এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং বিশিষ্ট সাধক এবং শ্রীমৎস্বামী বিমলানন্দের পুত্র। এই গ্রন্থের ভূমিকায় 'উদ্বোধন' এবং কালিকোপনিষদের বঙ্গানুবাদের ভিতরে প্রকৃত সাধনতত্ত্বের রহস্য তিনি অতি সুললিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। আশ্রম হইতে পূর্বপ্রকাশিত 'কুলসপর্যামৃতম্' প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় এই পুস্তকও যে সাধকসমাজের বিশেষ আনন্দ বর্ধন করিবে ইহা নিঃসন্দেহ।

FRENCH SHORT STORIES FROM ALFHONSE DAUDET—By Miss Indira Sarkar, Published by Messrs. Chuckervertty, Chatterjee & Co. Ltd.; 15, College Square, Calcutta. Price Rs. 4|-.

শ্রীমতী ইন্দিরা সরকার প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক আলফোন্স দদের সাতটি গল্প মূল ফরাসী ভাষা হইতে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। দদের রচনার সহিত বাঙালী পাঠক সাধারণ বিশেষভাবে পরিচিত নহেন। খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় দদের কয়েকখানি গ্রন্থ বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণের বই যে পরিমাণে বাঙলা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, দদের গল্পগুলি ঠিক সেই অনুপাতে বাঙলা ভাষায় অনূদিত হয় নাই। ফরাসী ভাষায় অনেকের অজ্ঞতা হয়ত ইহার একটি কারণ। লেখিকা মূল ফরাসী হইতে গল্প কয়েকটি ইংরাজিতে ভাষান্তরিত করায় দদের এই গল্পগুলি বাঙলা ভাষায় অনূদিত হওয়ার পথ সুগম হইল। এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ফরাসী লেখকের উপন্যাস, গল্প, নাটক ও অন্যান্য রচনা বাঙলা ভাষায় অনূদিত হইলে আমাদের দেশের অনুবাদ সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। সুন্দর প্রাঞ্জল ইংরাজিতে গল্পগুলি অনূদিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে তিনি দদের সম্বন্ধে একটি পরিচায়িকা প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির ছাপা, কাগজ, বাঁধাই মনোজ্ঞ।

কাব্য মালঞ্চ—আবদুল কাদের ও রেজাউল করিম সম্পাদিত। প্রকাশক—মঈনুদ্দিন হোসেন বি এ, নূর লাইব্রেরী পাবলিশার, ১২।১ সারেঙ্গ লেন, তালতলা, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ, মূল্য পাঁচ টাকা।

বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বাঙালী মুসলমানের দান সামান্য নহে। বাঙলাতে কয়েকখানা সঞ্চয়ন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত যে সব মুসলমান কবি ও কাব্যশিল্পী এদেশের সাহিত্যের সেবা এবং বঙ্গ সংস্কৃতির সমৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কবিতার সঞ্চয়ন-গ্রন্থের অভাব অনেকেই অনুভব করিতে ছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থখানার দ্বারা সেই অভাবের পূরণ হইবে। বাঙলার মুসলমান কবিদের অবদান সঞ্চয়নের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে পরমশ্রদ্ধেয় মুনসী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের অপরিসীম সাধনা ও পরিশ্রমের কথা সকলেরই মনে পড়িবে; "প্রাচীন সাহিত্যে মুসলমানের বিপুল অবদানের সম্যক্ পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই।" কাব্য মালঞ্চের সুপণ্ডিত সম্পাদকদ্বয় একথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়াছেন।

কাব্য মালঞ্চে ১১৫জন কবির কবিতাংশ সঞ্চয়ন করিয়া ক্রমপরম্পরায় সেগুলি সজ্জিত করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য, এই সঞ্চয়নকার্য সহজ নয়। বাঙলার পুঁথি সাহিত্য এক বিরাট বিষয়। বহুদিন পর্যন্ত ইহা অবহেলিত হইয়া পড়িয়াছিল, এখনও যে ইহার সম্পূর্ণ উদ্ধার সাধন সম্ভব হইয়াছে, এমন কথা বলা চলে না; তদ্ব্যতীত উপাদান সংগৃহীত হইলেও শ্রেষ্ঠাংশ নির্বাচন ব্যাপারে প্রচুর পাণ্ডিত্য এবং মনীষার প্রয়োজন হইয়া থাকে। সঞ্চয়ন গ্রন্থের সমালোচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কবিগণের কাব্য-রসের বিচার পরোক্ষ, প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয়নকারীর দক্ষতা এবং যোগ্যতার প্রশ্নই সেখানে প্রধান। 'কাব্য মালঞ্চে'র সম্পাদকদ্বয় এক্ষেত্রে প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থের ভূমিকাস্বরূপে আবদুল কাদের সাহেবের বাঙলা কাব্যের ইতিহাসে মুসলমান সাধনার ধারা শীর্ষক চিন্তাশীলতাপূর্ণ আলোচনা ঐতিহাসিক পটভূমিকার আশ্রয়ে বিভিন্ন মুসলমান কবির কাব্যরস আস্বাদনে বিশেষভাবে সাহায্য করে এবং তাঁহাদের অবদানে বাঙলা সাহিত্যের ও সংস্কৃতিতে মনস্বিতার দীপ্তি কেমনভাবে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও পরিস্ফুট হয়। সাহিত্যের রস সার্বভৌম; ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই; বাঙলার এই অসম্প্রদায়িক উদার সংস্কৃতি হিন্দু মুসলমান উভয়েরই অবদানে গঠিত হইয়াছে। পরবর্তী যুগে জাতীয় স্বাধীনতার বেদনা ইহার মূলে বৈপ্লবিক প্রাণ-শক্তির সঞ্চার করে। সমাজজীবনের এই নিবিড় প্রেমের দৃষ্টি যাহাতে পরিচ্ছন্ন না হয় এবং বিচারবুদ্ধি খণ্ডিত না হইয়া পড়ে, সেজন্য এ আলোচনায় আবেদন করা হইয়াছে। সাহিত্য-রসিক মাত্রেই এই আলোচনাংশ পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি। ইহা ছাড়া, গ্রন্থের উপসংহারভাগে পাঠক-পাঠিকাগণের বোধসৌকর্যার্থে বিভিন্ন কাব্যাংশে ব্যবহৃত বাঙলা ভাষায় সাধারণত অপ্রচলিত শব্দসমূহের অর্থ যাহাতে সকলেই উপলব্ধি করিতে পারেন, সেজন্য 'শব্দার্থ প্রকাশ' নামে একটি অধ্যায় সংযুক্ত করা হইয়াছে। অঙ্গসজ্জার দিক হইতে গ্রন্থখানা সুন্দর হইয়াছে। ছাপা নির্ভুল, বাঁধাই সুদৃশ্য, দেশী তুলোট কাগজ; পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৮। এইরূপ একখানা সঞ্চয়ন-গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়াতে বাঙলা দেশের একটি বিশেষ অভাব দূর হইল; এজন্য বঙ্গভাষা এবং সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেই 'কাব্য মালঞ্চে'র সম্পাদক এবং প্রকাশকগণের নিকট কৃতজ্ঞ।

প্রবাসে—(চীন, জাপান, ফিলিপাইন প্রভৃতি) শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপর্যটক। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য তিন টাকা।

ভূপর্যটক ক্ষিতীশচন্দ্রের লেখা বাঙলা দেশের অনেকের নিকটই সুপরিচিত। অল্পদিনের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থখানার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে তাঁহার লেখার জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকে ব্রহ্মদেশ, মালয়, চীন, জাপান, ফিলিপাইন, বলি ও জাভার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে সময়োপযোগী কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এ ভ্রমণকাহিনী উপন্যাসেরই মত চিত্তাকর্ষক এবং রমণীয়। ইহা পাঠ করিয়া সকলেই তৃপ্ত এবং উপকৃত হইবেন।

প্রাচ্য বাণী—জার্নাল অব দি প্রাচ্য বাণী মন্দির (ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েণ্টাল লার্নিং) জানুয়ারী ১৯৪৫। যুক্ত সম্পাদক শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী, যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী; প্রতি সংখ্যা—মূল্য দুই টাকা। (ইংরাজী)। কার্যালয়—প্রাচ্য বাণী মন্দির, ৩, ফেডারেশন স্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাচ্য বাণীর আলোচ্য সংখ্যায় ডক্টর বিমলাচরণ লাহা ভারত এবং সিংহলের গিরিগুহার স্থলপথ, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কালিদাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী এবং ফারসী ভাষায় অধ্যাপক এস কে রহমান সেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার জীবনী, পুণার ওয়াদিয়া কলেজের

অধ্যাপক ডক্টর এন জে সিন্ধে আথর্বনিক উপনিষদ, ডক্টর দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী পিতৃপক্ষ, বগুড়া কলেজের অধ্যাপক শিবেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্বন্ধে হেমচন্দ্র, ডক্টর রমা চৌধুরী সুফীবাদ ও বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা সবই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং জ্ঞানগর্ভ। মনস্বিতাপূর্ণ আলোচনার এরূপ সমাবেশ অন্য কোন সাময়িকপত্রে আমরা দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রাচ্য বাণী এ দেশের বিদ্বজ্জন সমাজের সর্বত্র সমাদৃত হইবে। ভারতীয় সংহতির সমৃদ্ধি প্রচারে প্রাচ্য বাণীর এই প্রচেষ্টা সর্বাংশে সার্থকতা লাভ করে, আমরা ইহাই কামনা করি।

কীর্তন—শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত। বিশ্ব-ভারতী গ্রন্থালয়, ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় কীর্তন সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। বিশ্ব-ভারতীর বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ গ্রন্থমালায় কীর্তন সম্বন্ধে তাঁহার এই আলোচনা পাঠ করিয়া আমরা উপকৃত হইয়াছি। আলোচ্য পুস্তকে কীর্তনের তাৎপর্য, নাম সংকীর্তন, লীলা কীর্তন, কীর্তন ও পদাবলী, কীর্তনে গৌর-চন্দ্রিকা, কীর্তনের ইতিহাস, গোমতীর মহোৎসব কীর্তনের শ্রেণী বিভাগ, কীর্তনের অবনতি, বৈষ্ণব ধর্ম ও কীর্তন, কীর্তনের রাগরাগিণী, কীর্তন ও ভাব, কীর্তন ও রস, কীর্তনের তাল, উপসংহার এই কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভিন্ন দিক হইতে কীর্তনের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সুপণ্ডিত লেখক ঐতিহাসিক পট-ভূমিকা অবলম্বন করিয়া কীর্তনের ক্রমাভিব্যক্তি এবং তাহার বর্তমান পরিণতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই আলোচনা তথ্যপূর্ণ এবং ভাবগর্ভ অথচ সহজ সরল এবং সুমধুর হইয়াছে।

ভক্ত মনোমোহন—প্রকাশক স্বামী আত্মবোধানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৯নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা।

ভক্ত মনোমোহন মিত্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের গৃহী শিষ্য। ভক্তের জীবন গুরুর কৃপামহিমায় মহিমান্বিত। পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসিয়া ভক্তপ্রবর নির্লিপ্ত গৃহীর আদর্শ গ্রহণ করেন। বিচিত্র ঘটনাবলী সম্বলিত মনোমোহনের সাধন-জীবনের অপূর্ব কাহিনী প্রকাশ হওয়ায় আমরা খুশী হইয়াছি। ঠাকুরের অমৃত উপদেশ থাকায় এই গ্রন্থখানি বিশেষ সমাদৃত হইবে।

প্রেক্ষিত—শিবনারায়ণ রায়। প্রকাশনী। ১৯৪৫। ১০৫ পৃ। দুই টাকা।

নিঃসন্দেহে বলা যায় এ-গ্রন্থের পাঠক সংখ্যা মুষ্টিমেয়, তবু এ জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা এবং সার্থকতা অস্বীকার করা মূঢ়তা মাত্র। সাম্প্রতিক বিদেশি সাহিত্য নিয়ে বাঙলা ভাষায় আলোচনা বিশেষ নেই: হবার পথে বাধাও বিস্তর। জেমস জয়েস, এজরা পাউণ্ড, ডেলুইস, অডেন, স্পেন্ডার প্রভৃতি যাঁদের নিয়ে আলোচনা তাঁরা কেউই, না প্রত্যয়, না আঙ্গিক, কোন দিকের দিক দিয়েই বাঙালী পাঠক বা সাহিত্যিকের নিকট আত্মীয় নয়; অথবা যে দৃষ্টি-ভংগীর সাহায্যে লেখক এঁদের কাব্যের ও সাহিত্যের আলোচনা করেছেন সে দৃষ্টিভংগীও আমাদের দেশে খুব পরিচিত নয়। এ সমস্ত জেনেও শিবনারায়ণ বাবু এই প্রচেষ্টা করেছেন এবং ভাষার আপেক্ষিক জটিলতা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, তাঁর চেষ্টা সার্থক হয়েছে। বিশেষভাবে আমি প্রশংসা করি তাঁর সাহস ও উদ্যমের—তা ছাড়া তাঁর দৃষ্টিভংগীর সংগেও আমি অনেকটা আত্মীয়তা অনুভব করি। শেষ প্রবন্ধটিতে তিনি শিল্পে রীতিবাদ নিয়ে ক্রোচের যুক্ত বিচার করেছেন—এ বিচার অতি সুনিপুণ, এবং খুব সংক্ষিপ্ত। হলেও শিবনারায়ণবাবু এই প্রসংগে যে বিচার ও মতবাদের অবতারণা করেছেন তাহাই তাঁর অন্য প্রবন্ধগুলির অন্তর্নিহিত বিচারের মূলে। পাউণ্ড, অডেন, ডেলুইস প্রভৃতি আমাদের সাম্প্রতিক কাব্য সাহিত্যে তাঁদের ছায়া ফেলেছেন, কিন্তু এই ছায়া যে কি বস্তু এবং কি যে তার প্রকৃতি এ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি স্বল্প। শিব-নারায়ণবাবু তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় সাধনের যে চেষ্টা করেছেন তার জন্য তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়।

প্রাচীর পত্র—শ্রীঅনিলকুমার সিংহ প্রণীত। প্রকাশক—ইনটার ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, ৮৭, চৌরঙ্গী রোড। মূল্য দুই টাকা।

'প্রাচীর পত্র' মোট দশটি গল্পের সমষ্টি। তম্মধ্যে 'পথ ও প্রান্ত', 'জীবিকা', 'আবর্ত' ও 'মধ্যবিত্ত' আমাদের ভাল লাগিল। সমস্ত আখ্যায়িকার মধ্যেই বঞ্চিত, নির্যাতিতের প্রতি সহজ দরদের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। বইটির ভাষা ঝরঝরে, গতিশীল। প্রচ্ছদপট অভিনব।

অসমতল (গল্প সংগ্রহ)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র—ইনটার ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, ৮৭, চৌরঙ্গী রোড। মূল্য দুই টাকা।

ছোট বড় এগারটি গল্পের সংকলন। অধিকাংশ গল্পই মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা। মন্বন্তরের সর্বনাশা সুরের সংগে সুর মিলিয়ে লেখক কেবল ভাঙনের গীতই গেয়ে যাননি। বরং এই দুর্যোগের মধ্যেও মানুষের কালচার, তার সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ যে তাকে নতুন জীবনের প্রেরণা যোগায়, এ সত্য একাধিক গল্পে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। 'জৈনুদ্দিন, অমূল্য, মুকুন্দরা প্রাণান্ত সংঘাতের মধ্য দিয়েও মন্বন্তর পার হয়ে এসেছে। এদিক দিয়ে নরেনবাবুর approach সম্পূর্ণ নতুন। আজকের সমাজে তাঁর 'রূপাভাস', 'আবরণ', 'পুনশ্চ'র মত গল্পের অনিবার্য প্রয়োজন আমরা স্বীকার করব। মন্বন্তর সাহিত্যে, যাদের ক্লান্তি এনেছে তাদের বইখানা পড়ে দেখতে বলি।

নরেনবাবুর ভাষা চিরদিনই প্রাঞ্জল ও সাবলীল। সচেষ্ট কারিকরীর ওপর তাঁর মোহ নেই বলেই তা যেমন প্রাণবন্ত তেমনি আবেদন-শীল। ছাপা বাঁধাই নিখুঁত। প্রচ্ছদপটে রুচির পরিচয় আছে।

ঈদ সংখ্যা সাপ্তাহিক কৃষক—সিরাজউদ্দীন আহমদ কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ১৲ টাকা।

অনেকগুলি গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও ব্যঙ্গ চিত্র শোভিত এই বিশেষ সংখ্যাখানা উপহার পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। নবীন ও প্রবীণ লেখকদের নানাবিষয়ক বহু সুচিন্তিত রচনা সংখ্যাটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। প্রবন্ধাদি নির্বাচনে ও বইটির বহিরাবরণে সুরুচির পরিচয় মিলে।

মধু-ভেক

অ · কৃ · ব

সরল কবিতা রচনা শিক্ষা

সেদিন যাদুকর পি সি সরকার আসিয়া কতকগুলি ম্যাজিকের খেলা শিখাইয়া গিয়াছেন। এমনভাবে শিখাইয়াছেন যে, কেহই কিছু শিখিতে পারি না—এইটুকু শুধু শিখিয়াছি যে, যাদুকর হওয়া সহজ নহে।

আমি কবিতার যাদুকর নহি। সত্য কথা বলিতে কি এত বড় পৃথিবীতে মাত্র একটি লোক আমাকে কবি বলিয়া স্বীকার করে। তাহারি নির্দেশে আমি একটি 'সরল কবিতা রচনা শিক্ষা' রচনায় হাত দিব ঠিক করিয়াছি। ঠিক করিয়াছি কবিদের হাঁড়ি হাটে ভাঙিয়া দিব।

* * * *

কবি হইতে হইলে সর্বপ্রথমে দরকার 'আমি কবি' এই বিশ্বাসটাকে মনে দৃঢ়মূল করা। বাঙলাদেশে ইহা কিছুই কঠিন নয়। বরং 'আমি কবি নহি' এরূপ বিশ্বাস করিতেই বেশ কিছু তেল নুন খরচ করিতে হয়। সুতরাং ধরিয়া নিলাম আপনি কবি এ বিশ্বাস আপনার মনে বেশ দৃঢ়মূল অবস্থায় আছে।

এখন আপনাকে ঠিক করিতে হইবে আপনি কবিতার কোন্ লাইন ধরিবেন। কবিতা নানারকমের আছে। যেমন সর্বহারা কবিতা, মিস্টিক বা 'মরমী' কবিতা, প্রেমের কবিতা, বিদ্রোহের কবিতা, পাদপূরক কবিতা, ইত্যাদি। অথবা কোনও একটি বিশেষ লাইন না ধরিয়া আপনি নির্বিশেষে সবগুলি লাইনই ধরিতে পারেন, যদি সামলাইতে পারিবেন বলিয়া মনে করেন। (মনে করা কিছু কঠিন নয়, ইহাও ব্র্যাকেটে বলিয়া রাখি।)

গদ্য কবিতা সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলা দরকার মনে করি না। প্রথমে গদ্য লিখিয়া পরে তাহা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া বিভিন্ন লাইনে একটু হিসাব করিয়া সাজাইয়া দিলেই চলিবে। আমি বলিব পদ্য কবিতার কথা। যে কবিতায় মিল ও ছন্দ দুই-ই বজায় রাখা হয়। যাঁহারা মিল ও ছন্দের ভয়েই গদ্য কবিতার আশ্রয় নিয়া থাকেন, আমার 'সরল কবিতা রচনা শিক্ষা' তহাদের এই অকারণ ভীতি দূর করিতে পারিলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

* * * * *

প্রথমেই আমার সদ্য রচিত একটি কবিতার খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছিঃ

"হে মাধবী, রাত্রি হলো ভোর।
প্রভাতের কূলে এসে কাঁদিতেছে রাতের চকোর।
রজনীর শেষ তারা
আলোর বিস্ময়ে হলো হারা,
তারি যে আভাস লেগে
বনানী উঠেছে জেগে
স্বপন ভাঙিয়া গেছে মোর।
মাধবী, জানো কি ইতিহাস?
আজি মোর বাতায়নে কেন কাঁদে উদাসী বাতাস?

ফুলডোর ছিলো হাতে
যামিনীর জোছনাতে,
কেন ফুল ঝরে গেল রয়ে গেল ডোর?
হে মাধবী, রাত্রি হলো ভোর।"

আমি তো লিখিয়া খালাস। যাহার মাথা ব্যথা সে অর্থ খুঁজুক। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি নীরবে শুধু মৃদু মৃদু হাস্য করিব, যেন কবিতার ভাবটা বড়ই গভীর। আমার কবিতার অর্থ আমি নিজেই যে কিছু বুঝি নাই, তাহা কাহাকেও বুঝিতে দিব না। অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি কবি নিজে যে কবিতার অর্থ বোঝেন নাই, পাঠক-পাঠিকারা তাহার অর্থ বুঝিয়াছে।

মিল বাহির করা কিছু কঠিন কাজ নহে, বাঙলা ভাষায় মিলের কিছু অভাব নাই। মিল এবং অর্থ এই দুটি জিনিসকে এক-সংগে গাঁথা একটু কঠিন। মিল বজায় রাখিয়া অর্থের দিকে না তাকাইলেই ব্যাপারটা সহজ হইয়া যাইবে। অর্থ যাহারা বুঝিবেন না তাহারা ভাবিবেন কবিতাটা 'মিস্টিক্'।

তবেই দেখা গেল মিস্টিক্ কবিতা লেখা কিছু কঠিন নহে। কৌশলটা এই যে বাছিয়া বাছিয়া এমন শব্দ এমনভাবে সাজাইতে হবে যেন পাঠক-পাঠিকার মনে সন্দেহ হয় কবিতাটির অর্থ আছে। একটু অভ্যাস করিলেই এরূপ কবিতা লেখা সহজ হইয়া যাইবে।

* * * *

যাঁহারা মনে করেন প্রেমে না পড়িলে প্রেমের কবিতা লেখা যায় না, তাঁহারা গোড়াতেই ভুল করেন। কবিতা লেখাটা একটি আর্ট এবং আর্ট জিনিসটা আসলে ফাঁকি। ফাঁকি দিয়া ফাঁকি ঢাকার নামই আর্ট। যিনি সত্যিই প্রেমে পড়িয়াছেন, তাহার চাইতে যিনি প্রেমের প্রেমে অথবা প্রেমের কবিতার প্রেমে পড়িয়াছেন, তিনি ঢের বেশী ভালো প্রেমের কবিতা লিখিতে পারিবেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমিই ইহার প্রমাণ। আমার রচিত নূতন প্রেমের কবিতার খানিকটা নীচে দিতেছিঃ

"আজি এই রাতে
কথা কয়ো নাকো কোনো
মনের কথাটি
মন পেতে শুধু শোনো।
নাম ধরে আজ না-ই হলো ডাকা
আজ হোক্ শুধু চুপ করে থাকা,
রূপকথা আঁকা আকাশের বুকে
আজ শুধু তারা গোনো।
নীলাকাশ হতে
চাঁদ ভাবে চেয়ে চেয়ে
আমারি মতন
কে ওই সোনার মেয়ে?
ভেবে ভেবে চাঁদ হলো যে উদাসী
তাই দেখে আমি চুপ করে' হাসি......"

ইত্যাদি।

বাকীটুকু উদ্ধৃত করা বর্তমানে সম্ভব নহে, কেন না কোনো, শোনো এবং গোনোর সংগে কি দিয়া মিলাইব তাহা এখনো ঠিক করিতে পারি নাই।

উক্ত কবিতাটি কোন প্রেমিক ছেলের উক্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কবিতাটিকে কোনো মেয়ের উক্তিতে পরিণত করিতে হইলে দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম অংশটি নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্তিত করিয়া নিলেই চলিবেঃ

নীলাকাশ হতে
চাঁদ ভাবে আঁখি মেলেঃ
'আমারি মতন
কে ওই সোনার ছেলে?'

অর্থাৎ কবি ছেলে হইলে নীলাকাশের চাঁদ নীচে তাকাইয়া সোনার চাঁদ মেয়ে দেখিবে এবং কবি মেয়ে হইলে নীলাকাশের চাঁদ নীচে সোনার চাঁদ ছেলে দেখিবে। যে সব কবিকে বন্ধুবান্ধবীদের জন্য ফরমায়েস মাফিক প্রেমের কবিতা লিখিয়া দিতে হয়, তাহাদের এইরূপ প্রয়োজন মাফিক অদল-বদলের অভ্যাস থাকা দরকার।

প্রেমের কবিতা লিখিবার কৌশল বলিতেছি। প্রথমত ধরা যাক্ শব্দ চয়ন। খুব হাল্কা শব্দ ব্যবহার করাই ভাল; মশা মারিতে কামান দাগাটা কোন কাজের কথা নয়। দ্বিতীয়ত, বেশ কায়দা করিয়া মোলায়েমভাবে বাড়াবাড়ি করিতে হইবে। উল্লিখিত কবিতাটিতে চাঁদের নীচে চাওয়ার ব্যাপারটায় যেমন করা হইয়াছে। কবিতা জিনিসটাই বাড়াবাড়ি। প্রেমের কবিতা বাড়াবাড়ির চরম।

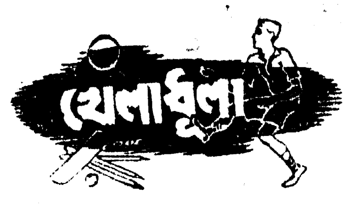
* * * *

তারপর ধরা যাক সর্বহারা-দরদী কবিতা। সর্বহারাদের কবি হইতে হইলে নিজের কিছু না হারাইলেও চলে—ফারপো'র রেস্তোরাঁয় রোস্ট ফুঁকিতে ফুঁকিতেও এই জাতীয় কবিতা মনে মনে ছকা যায়। নিজের

[ব]র্ বজায় রাখিয়াও সর্বহারাদের বেদনায় [অ]বিতস্থ কাঁদা চলে এবং ভারতরক্ষা আইন [ব]াঁচাইয়া তাহাদিগকে নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ [ক]রা চলে। আমি একটি এই জাতীয় কবিতা [ল]িখিতে শুরু করিয়াছি:

"বিশ্বের যত মজদুর আর
সর্বহারারা জাগো
সব-পাওয়াদের জব্দ করিতে
কোমর বাঁধিয়া লাগো।
তোমাদের বড় দুষমন যারা
বুকের রক্ত চোষা
শাঁস খেয়ে নিষ্কে তোমাদের ভাগে
যারা রাখে শুধু খোসা
এক জোট হয়ে আজিকে তাদের
টুটিট চেপে ধরো ভাই,
বেইমান আর শয়তানদের
ক্ষমা নাই, ক্ষমা নাই......"
ইত্যাদি।

ইহার পর আরো কতকগুলি গরম গরম কথা আছে, কাজেই উকীলের সংগে পরামর্শ না করিয়া ছাপার অক্ষরে প্রকাশ না করাই নিরাপদ। ভারতরক্ষকগণ অবশ্য জানেন যে, সর্বহারারা ক্বচিৎ কবিতা পড়ে; তবু সাবধানের মার নাই।



ফুটবল

বাঙলার ফুটবল স্ট্যান্ডার্ড খুবই নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে। বাঙলার মাঠে বাঙালী খেলোয়াড়দের মান-সম্মান একেবারেই বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। এই সময় প্রয়োজন বাঙলার ফুটবল পরিচালকদের চিন্তা করা, ব্যবস্থা করা, যাহাতে বাঙলার ফুটবল স্ট্যান্ডার্ড উন্নততর হয়, বাঙালী খেলোয়াড়রা হৃতগৌরব ফিরিয়া পায়। তাহা না করিয়া তাঁহারা মাতিয়া উঠিয়াছেন কিরূপে ইংলন্ড হইতে একটি শক্তিশালী ফুটবল দল আনিতে পারা যায়, তাহা দেখিয়া প্রকৃতই দুঃখ হইল। ইহার দ্বারা কি সুফল লাভ হইবে, ইহাও আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলোয়াড়ের খেলা দেখিবার সৌভাগ্যের কথা হয়তো ইঁহারা উল্লেখ করিবেন; কিন্তু সম্প্রতি যে সার্ভিসেস দল কলিকাতায় খেলিয়া গেল, তাহাতে কি সেই সৌভাগ্য বাঙলার উৎসাহী ফুটবল খেলোয়াড়দের হয় নাই? বৈদেশিক ফুটবল দলের খেলিবার রীতিনীতির অভিনবত্ব কি এই সার্ভিসেস দলের খেলার মধ্যে ছিল না? ইংলন্ড হইতে যদি দল আনা হয়, তাহা হইলে কি সার্ভিসেস দল অপেক্ষা উন্নততর নৈপুণ্য ও অভিনব কৌশল দেখিবার সুযোগ হইবে? আমাদের বিশ্বাস হইবে না। কেবল দল আনা ও তাহার ব্যবস্থার জন্য বহু অর্থ ব্যয় হইবে। সুফল হইবার যদি বিশেষ সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এই অর্থ ব্যয়ে আমরা আপত্তি করিতাম না। কিন্তু হইবে না, ইহা দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারি।

পরিচালকদের অর্থ-সঞ্চয় যদি বেশী হইয়া থাকে, তাহা হইলে দল না আনাইয়া ফুটবল শিক্ষক আনাইবার ব্যবস্থা করিলে বুদ্ধিমানের কার্য করিবেন। বাঙলা দেশের, বিশেষ করিয়া বাঙালী উৎসাহী ফুটবল খেলোয়াড়দের বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ক্রীড়া-কৌশল শিক্ষা দিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়াই আমাদের ধারণা। দুই-তিনজন শিক্ষককে আনাইয়া কিছুদিন বাঙলায় রাখিলে ফল ভাল হইবেই, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাঙলার ফুটবল পরিচালকগণ এই দিকে কি দৃষ্টি দিবেন?

বাঙলা ফুটবল দলকে আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাইতে আন্তঃপ্রাদেশিক সন্তোষ মেমোরিয়াল ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে হইবে। আশ্চর্যের বিষয়, বাঙলা দলের গঠনকার্য এখনও শেষ হয় নাই। বিলম্বের কারণ কি, পরিচালকগণই জানেন। তবে ইহার ফল খুব ভাল হইবে না। দল যাত্রার পূর্বে যদি কয়েকটি অনুশীলন খেলায় যোগদান করিতে পারিত, ভালই হইত। দলের খেলোয়াড়গণ নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করিয়া লইতে পারিতেন। ইহাতে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় বিজয়ী হওয়া সহজ হইত। বাঙলা দল এই প্রতিযোগিতায় গত বৎসর রানার্স আপ হইয়াছিল। এই বৎসর বিজয়ীর সম্মানলাভ করে, ইহা সকলেরই কাম্য। সুতরাং তাহা সম্ভব করিবার জন্য পরিচালকদের উচিত কার্যকরী সকল ব্যবস্থা করা। কেন করিলেন না, ইহা জানাইবার মতন সৎসাহস কি পরিচালকদের আছে?

বোম্বাইর রোভার্স কাপ প্রতিযোগিতা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কলিকাতা হইতে যে দুইটি দল গিয়াছে, তাহারা প্রতিযোগিতার বিভিন্ন খেলায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। ইহাদের মধ্যে একটি দল যদি বিজয়ীর সম্মানলাভ করে, তাহা হইলে আমরা আরও আনন্দিত হইব। কলিকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব এই প্রতিযোগিতায় যে গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহারই পুনরুদ্ধার করা হইবে। ইহাতে বাঙলার ফুটবল খেলার সম্মানও বৃদ্ধি পাইবে।

এ্যাথলেটিকস

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন প্রতি বৎসরের ন্যায় এইবারও বিভিন্ন স্পোর্টস অনুষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা প্রকাশের উদ্দেশ্য, আমাদের যতদূর ধারণা, বাঙলার এ্যাথলীটদের অনুশীলন করিবার জন্য উৎসাহিত করা। কিন্তু ইহাতে কি প্রকৃতই এ্যাথলীটরা প্রেরণা লাভ করিবে? আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি "করিবে না।" ইহার বহু কারণ আছে। সমস্ত কিছু প্রকাশ করিতে হইলে একখানি পুস্তক রচনা করিতে হয়। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহার প্রধান কারণ অব্যবস্থা। গত বৎসরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহাতে বাঙলার এ্যাথলীটরা, বিশেষ করিয়া বাঙালী এ্যাথলীটরা অলিম্পিকের অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে কোনরূপ উৎসাহ পান না। গত দুই-তিন বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে, অলিম্পিকের অনুমোদিত বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে খুব অল্পসংখ্যক বাঙালী এ্যাথলীট যোগদান করিতেছেন। গত বৎসর যে কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার পর এই বৎসর যোগদানকারীর সংখ্যা আরও কমিয়া যাইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে মনোভাব এ্যাথলীটদের মধ্যে জাগিয়াছে, তাহাতে এইরূপ এক সময় আসিবে, যখন পরিচালকগণ দেখিবেন, কোন অনুষ্ঠানে কোন বাঙালী এ্যাথলীটই যোগদান করিতেছে না। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। পরিচালকগণ এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া কেন যে সকল অবস্থা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করেন না, বুঝি না।

স্পোর্টস মরশুম এখনও আরম্ভ হয় নাই। এই সময়ের মধ্যে পরিচালকগণ ইচ্ছা করিলেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এ্যাথলীটদের একত্র করিয়া যে সকল অসুবিধা, যে সকল অভিযোগ আছে, তাহার মীমাংসা করিয়া যাহাতে বাঙলার সম্মান এ্যাথলেটিকসে বৃদ্ধি পায়, তাহার কার্যকরী ব্যবস্থা করিতে পারেন। "আমরা যাহা বুঝি, তাহাই ভাল—কাহারও মতামত গ্রহণ করিব না"—এই মনোভাব লইয়া থাকিলে কোনদিনই এই অবস্থার পরিবর্তন হইবে না।

সন্তরণ

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের নবগঠিত পরিচালকমণ্ডলীর কার্যকলাপ দেখিয়া আমরা একটু উৎসাহিত হইয়াছিলাম ও চিন্তা করিতেছিলাম, "বাঙলার সাঁতারুদের ভবিষ্যৎ ভালই হইবে।" কিন্তু সম্প্রতি কতকগুলি বিষয়ে ইঁহাদের 'খামখেয়ালী' ব্যবস্থা দেখিয়া আমাদের মত পরিবর্তন করিবার মতন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। প্রাদেশিক সন্তরণ প্রতিযোগিতার তারিখ স্থির করিয়া হঠাৎ তাঁহারা ইহার পরিবর্তন করিলেন। দুর্গাপূজার পূর্বে সাঁতারুরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া যে অবস্থায় ছিল, পূজার পরে সেই অবস্থায় থাকিবে না। আনন্দ, উৎসবের মধ্যে পড়িয়া অনুশীলনের কথা কিছুতেই তাঁহাদের মনে থাকিতে পারে না। ফলে এই হইবে প্রাদেশিক সন্তরণ অনুষ্ঠানের স্ট্যান্ডার্ড খুবই নিম্নস্তরের হইবে। যে সকল বিষয় রেকর্ড হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা হইবে না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য করিয়াছে ইঁহাদের হঠাৎ চট্টগ্রাম ভ্রমণ ব্যবস্থা করা, ঠিক সেই সময়েই যে সময়ে সকল বিশিষ্ট সাঁতারুর কলিকাতায় থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, সেই সময় তাঁহাদেরই অন্তর্ভুক্ত একটি ক্লাব এক বিশেষ সন্তরণ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়াছে। বিশিষ্ট সাঁতারুগণ সকলেই চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিবেন, আর অনুষ্ঠানের জন্য শত শত মুদ্রা ব্যয়িত হইবে কয়েকটি অপ্রাপ্তবয়স্ক সাঁতারুর জন্য। ইহা কি খুব সুখের বিষয় হইবে? উক্ত ক্লাবের পরিচালকগণ কি অনুষ্ঠান পণ্ড হইবার জন্য এসোসিয়েশনকে দায়ী করিবেন না? ইহার পর ঐ পরিচালকগণ যদি এসোসিয়েশন সম্পর্কে বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে কি খুব অন্যায় হইবে?

এই শ্রমিক আন্দোলনের দিনে এক-শ্রেণীর শ্রমিকের কথা মনে আসে, যারা এতই ভাগ্যহত যে ন্যূনতম অর্থ উপার্জনকারী কোন মজুরের চেয়েও কম পারিশ্রমিক পাওয়া সত্ত্বেও আজও কেউ তাদের কথা নিয়ে মোটেই ভাবে না। বিভিন্ন চিত্রগৃহ, রঙ্গমঞ্চ ও চিত্রনির্মাণাগারের কর্মীদের কথাই বলচি। শুনলে অবাক হ'তে হয় যে, যে সময় চালের দাম ষোল টাকা তাদের বহুজনের মাসিক বেতন কিন্তু আঠারো বিশ টাকার বেশি হয় না। চিত্র-ব্যবসায়ীরা যুদ্ধের বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ ক'রচে কিন্তু তার কর্মীদের পারি-শ্রমিক সেই যুদ্ধপূর্বকালের মতই রয়েছে। আট দশ বছর একনিষ্ঠভাবে চাকরী করেও সবচেয়ে উদার প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী গোটা চল্লিশের বেশি টাকা কিছুতেই বাগিয়ে নিয়ে পারে না; এদের জীবনে না আছে কোন বোনাস প্রাপ্তি, না কোন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড; ছুটিছাটাও জোটে না বড় একটা কারুর, কাজে না আসতে পারলেই বেতন কাটা যাবে। সব মিলিয়ে এক কলকাতাতেই এদের সংখ্যা সহস্রাধিক হবে এবং যে রেটে প্রমোদগৃহ ও স্টুডিও বাড়বার আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে বছর দুয়ের মধ্যেই সে সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণই হ'য়ে দাঁড়াবে। এরা সংঘবদ্ধও নয় যে সম্মিলিতভাবে দাবী পেশ ক'রবে আর ধর্মঘটেরও যে হুমকি দেখাবে তারও উপায় নেই কারণ এরা যে কাজে নিযুক্ত তা সাময়িকভাবে, অর্থাৎ, ধর্মঘটীদের সায়েস্তা করার জন্যে যথাপ্রয়োজন কাল পর্যন্ত অনায়াসেই চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। প্রতিদিন তিনটে প্রদর্শনীর জন্যে সকলকে দশ ঘণ্টা একটানা হাজিরে দিতে হয়, মাঝে নামমাত্র বিরাম, এ ছাড়া প্রায় প্রতি সপ্তাহে দুএক দিন অতিরিক্ত প্রদর্শনীও থাকে; হাতে এমন সময় থাকে না বা এমন শক্তিও থাকে না যে অন্য কোন কাজে শরীরকে বাইরে নেওয়া যেতে পারে। অত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হ'য়ে গেল, বোমার হিড়িকও গেল কিন্তু এদের অবস্থার দিকে কেউই ফিরে চায়নি, তখনও নয়, আর আজ তো নয়ই। আমরা সিনেমা থিয়েটারে যাচ্ছি আমাদের প্রমোদবিলাস চরিতার্থ ক'রতে, আমাদের অবসর বিনোদনের জন্যে কিন্তু আমাদের সেই আনন্দ ব্যবস্থার পিছনে সহস্রজনের রক্ত জল করা পরিশ্রম আর ভবিষ্যতের ওপর নিরাশ বুকভাঙা যে দীর্ঘশ্বাস প্রমোদ-গৃহগুলির আবহাওয়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে তা কেন আমাদের ছোঁয়া দিয়ে যায় না! যুদ্ধোত্তর কত পরিকল্পনাতেই লোক মেতে উঠছে, কিন্তু এই সব হতভাগ্য প্রমোদ-গৃহ শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির



কথা তো কারুরই কোন পরিকল্পনার মধ্যে দেখা যায় না। তাই জনসাধারণের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া দরকার হ'য়েছে এবং প্রমোদ-ব্যবসায়ীদের যাতে চোখ খোলে সে বিষয়ে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু কে এদের ভার নেবে?

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এ সপ্তাহের নতুন ছবির মধ্যে রয়েছে রূপবাণীতে মতিমহল থিয়েটার্সের পৌরাণিক ছবি 'শ্রীদুর্গা' যার পরিচালক শৈলজানন্দ হওয়ায় ছবিখানি চিত্রামোদী-দের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। সামাজিক ছবির বিষয়বস্তুর ভিতর দিয়ে দেশের মর্মকথা উদ্ঘাটনে যে ব্যক্তি নব-পর্যায়ের সূচনা করেছেন তার হাতের এই প্রগতিবিরোধী পৌরাণিক ছবি কি বাণী বহন ক'রে নিয়ে আসে দেখবার জন্যে সবাই-ই উদ্গ্রীব। ভূমিকার মধ্যেও সেরা শিল্পীদের নিয়োগ ক'রে ছবিখানির মর্যাদাও অনেকখানি বাড়িয়ে রাখা হ'য়েছে।

*   *   *   *

৫ই অক্টোবর তারিখে তালতলার ক্রাউন টকীজ ও ঠনঠনিয়ার 'বীণা টকীজ'-এর উদ্বোধন ঘোষিত হ'য়েছে যথাক্রমে 'ইসমৎ' ও 'ঘর' ছবি দুখানি নিয়ে। ঐ তারিখে অরোরার (বম্বে) ছবি 'শুনো শুনাতা হুঁ' সিটি ও ছায়াতে মুক্তিলাভ ক'রবে। সেণ্ট্রাল পার্কশো হাউসে 'এতীম'-ও মুক্তিলাভ ক'রবে ২৮শে সেপ্টেম্বর। তারিখ ঘোষিত না হ'লেও মিনার, ছবিঘর ও বিজলীতে ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর 'কলঙ্কিনী'রও দীর্ঘ অবরোধের কলঙ্ক মোচন করার সম্ভাবনা আছে।

*   *   *   *

নুতন নাটকের মধ্যে এই সপ্তাহে রঙ-মহলে মঞ্চস্থ হ'চ্ছে শরৎচন্দ্রের কাহিনী এবং দেবনারায়ণ গুপ্ত কর্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত 'অনুপমার প্রেম', এর শ্রেষ্ঠাংশে অহীন্দ্র আছেন এবং সুরযোজনা করছেন অনিল বাগচী। স্টার থিয়েটারের আগত-প্রায় নতুন নাটক হীরেন মুখার্জির রচনা 'পলাশী'। ইতিমধ্যে এই সপ্তাহ থেকে নবসাজে 'গঙ্গাবতরণ' অভিনয় আরম্ভ হচ্ছে এখানে। কালিকা, মিনার্ভাও নতুন নাটক মঞ্চস্থ করার আয়োজন করেছে, আর শ্রীরঙ্গমে 'ঘরে বাইরে' মঞ্চস্থ হওয়ার কথা তো অনেক দিন আগেই ঘোষিত হ'য়ে আছে।

বিবিধ

হাবভাব থেকে মনে হয় উদয়শঙ্করের ছবি এখনও বিশবাঁও জলে; কারণ মাত্র গত সপ্তাহে উদয়শঙ্কর বম্বেতে ছিলেন মাদ্রাজ থেকে চিত্রগ্রহণ বম্বেতে তুলে আনার ব্যবস্থা ক'রতে এবং ভালো জনকয়েক গাইয়ে ঠিক ক'রতে।

*   *   *   *

গত ১৯ তারিখে চিত্র-সাংবাদিক খগেন রায় তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'প্রতিমার'-র মহরৎ কার্য সুসম্পন্ন করেছেন।

*   *   *   *

জ্যোতির্ময় রায় ('উদয়ের পথে') বম্বেতে যাচ্ছেন নিজের সম্পূর্ণ এবং অবাধ মর্জীমত একখানা ছবি প্রযোজনার সুযোগ নিয়ে আর

তার সঙ্গে পরিচালক হিসেবে থাকবেন হেমেন গুপ্ত (স্বক্ষ)।

* * * *

একজন অভিনয় শিল্পী একইকালে যাতে একখানির বেশী ছবিতে অভিনয় ক'রতে না পারে, বম্বের চলচ্চিত্র সংঘ সে বিষয়ে একটা বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করার চেষ্টায় আছে।

* * * *

বম্বের পিপলস্ থিয়েটার যে ছবিখানি তুলছে তার কাহিনীটি বাঙলার দুর্ভিক্ষের ওপরে লেখা তিনটি বিশিষ্ট বাঙলা রচনাকে মিলিয়ে তৈরী করা হয়েছে।

* * *

শিরাজ আলি হাকিম শতকরা আশীটা শেয়ার কিনে নিয়ে বম্বে টকীজের ভাগ্য-নিয়ন্তা হ'য়ে বসেছেন। বম্বের তুলা-রাজ মানে যিনি কয়েকটি ব্যাঙ্ক পকেটে নিয়ে ঘোরেন ব'লে জনশ্রুতি সেই গোবিন্দরাম সাকসেরীয়া কি করে দমে গেলেন লোকে সেই কথা ভেবেই আশ্চর্য হচ্ছে।

* * *

প্রতিমা দাশগুপ্ত স্ত্রী জাতির 'অবলা' কলঙ্ক না ঘুচিয়ে ছাড়বেন না। এ সম্পর্কে দুটি নতুন খবর পাওয়া গেল: একটি হচ্ছে প্রতিমা ও ননদ বেগম পারা একদিন মোটরে ভ্রমণকালে এক পুরুষ কর্তৃক এক নারী প্রহৃত হ'তে দেখায় গাড়ী থেকে নেমে পুরুষকে চপেটাঘাত ও নারী জাতির প্রতি সম্মান দেখানোর বক্তৃতা দান; আর, দ্বিতীয়টি হ'চ্ছে তার ছবি 'ছমিয়া'-র উদ্বোধন উপলক্ষ্যে কোন ব্যক্তি তার সঙ্গে ইয়ার্কী ক'রতে অপসায় তাকে চপেটাঘাত। ভাল কথা, 'ছমিয়া' ছবিখানি কিন্তু প্রতিমার প্রযোজনা ও পরিচালনা দক্ষতার পরিচয় দিয়ে জনপ্রিয় হ'য়েচে। প্রতিমার পরের ছবি 'কাজী'—মুসলমান গৃহস্থ জীবনের কথা। তিনি আগামী বছরের গোড়াতেই রঙীন ছবি তোলার সরঞ্জাম সমেত নিজস্ব স্টুডিও তৈরী করবেন ব'লে ঠিক ক'রেছেন।

* * *

লাহোরের পাঞ্চোলী স্টুডিওর আগামী সামাজিক ছবির নাম 'শহর সে দূর' (শহর থেকে দূরে)।

* * *

সফল অভিনয়ের দ্বারা 'পান্না' ছবিখানিকে সফল প্রচারচিত্রে পরিণত করার কৃতিত্বে খুসী হ'য়ে ভারতীয় সরকার নায়িকা গীতা নিজামীকে ন' হাজার টাকা নজরানা দিয়েছে।

* * *

কলকাতায় অনতিবিলম্বেই দু'টি নতুন স্টুডিও গড়া হবে—একটির উদ্যোক্তা শম্ভু সিংহ, অপরটির পরিচালক প্রফুল্ল রায়।

* * *

নীরেন লাহিড়ী কে বি পিকচার্সের হ'য়ে 'ভাবীকাল' নামক যে ছবিখানি তোলা সম্প্রতি শেষ ক'রেছেন তাতে একখানিও গান থাকবে না। দুঃসাহসিক অভিযান বৈ কী!

অসাধু ব্যবসায় বন্ধ করার প্রচেষ্টা

বড়ই সুখের বিষয় যে, সুবিখ্যাত ট্রেড মার্কসমূহের জঘন্য অনুকরণ করিয়া যে অসাধু ব্যবসায় চলিয়াছে, তাহা বন্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে। কোন কোন ধরণের ছোটখাটো প্রস্তুতকারকদের মধ্যে এই অসাধু প্রচেষ্টা খুবই প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে। বড় বড় নামকরা প্রতিষ্ঠানগুলির জনপ্রিয় দ্রব্যাদি মনে করিয়া জনসাধারণ যাহাতে উহাদের দ্রব্যাদিই (সাধারণতঃ নিকৃষ্ট শ্রেণীর) গ্রহণ করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করাই হইতেছে ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য।

সম্প্রতি এই শ্রেণীর অসাধু প্রচেষ্টার একটি মোকদ্দমা কলিকাতা হাইকোর্ট সরাসরি বিচার দ্বারা নিষ্পত্তি করিয়াছেন। উহাতে কলিকাতার মাণিকতলা মেন রোডস্থ পাঞ্জাব সোপ এন্ড কেমিক্যাল ওয়ার্কস কর্তৃক প্রস্তুত "সানব্রাইট সোপ"কে লীভার ব্রাদার্সের সুবিখ্যাত "সানলাইট" সাবানের নাম, উহার চাকতি ও লেবেলের আকার ও নমুনা ইত্যাদির হুবহু অন্যায় অনুকরণ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। আদালত অনুকরণে প্রস্তুত উক্ত সাবানের সমস্ত মজুত মাল, উহার লেবেল ও উহার ছাঁচ অবিলম্বে বিনষ্ট করার জন্য আদেশ দিয়াছেন; বাদী ফার্মকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইয়াছে এবং উক্ত "সানব্রাইট সাবান" প্রস্তুত ও বিক্রয় করা বা "সানলাইট" সাবানের হুবহু অনুকরণে অন্য কোন সাবান প্রস্তুত ও বিক্রয় করা চিরতরে নিষিদ্ধ করিয়া বিবাদিগণের উপর একটি ইনজাংশনও জারী করিয়াছেন। তা' ছাড়া, এই অন্যায় কার্যের জন্য বিনাসর্তে ক্ষমা প্রার্থনারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বিবাদিগণকে মোকদ্দমার খরচা ও উক্ত ক্ষমাপ্রার্থনা সংবাদপত্রে প্রকাশ করার জন্য খরচাও বহন করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

কাহিনী খবর ভবঘুরে

নাকুয়ার বদলে নরুণ

আমেরিকার এক খবরে জানা গেছে যে, সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ইথিওপিয়ার বৈদেশিক ব্যবস্থা বিভাগ আদ্দিস আবাবাস্থ ইথিওপিয়ার সীমান্ত সংলগ্ন পূর্বতন ইতালীয় এলাকায় রাজত্ব প্রতিষ্ঠার দাবী করেছেন। ঐ এলাকা অর্থাৎ ইতালীয় সোমালীল্যাণ্ড—এখন বৃটিশ অধিকৃত এবং বৃটেন সেখানে তার মালিকানা বজায় রাখার জন্য লোহিত সাগরে উপকূলের একাংশে সবরকম তোড়জোড়ই করে চলেছেন। ওদিকে যে দিন ঐ দাবী উপস্থাপিত করা হয়েছে সেই দিনই বৃটিশ সরকার ইথিওপিয়ার সম্রাটকে সরকারী কায়দায় এক সুন্দর নতুন রোলস্ রয়েস মোটরগাড়ি উপঢৌকন দিয়েছেন। এলাকার অধিকার নিয়ে আলাপ আলোচনা বোধ হয় পরেই হবে। আগেই তাই 'নাকুয়ার বদলে নরুণের' ব্যবস্থা করলেন বৃটিশ সরকার। যুদ্ধ থামতে না থামতেই ইউরোপীয় ডিক্টেটরী ক্ষমতার আক্রমণ যে অন্য উপায়ে সুরু হলো তা দেখাই যাচ্ছে।

রাজকীয় বৈবাহিক ব্যাপার

ছ বছর পরে সুইডেনের রাজা গুস্তাফ আর ডেনমার্কের রাজা ক্রীশ্চিয়ানের প্রথম মুখোমুখি দেখা হয়েছে—এই সেদিন ডেনমার্কের আমালিয়েনবোর্গ দুর্গে। এক পারিবারিক উৎসবে। সম্প্রতি সুইডেনের ৮৭ বছরের বৃদ্ধ রাজা গুস্তাফের নাতনির বিয়ে হয়েছে রাজা ক্রীশ্চিয়ানের ছেলের সঙ্গে—তাই রাজা গুস্তাফ নাতনী আর নাত-জামাইকে সঙ্গে নিয়ে এক ডেস্ট্রয়ারে চেপে কোপেনহ্যাগেনে গেছলেন তাঁর ৭৩ বছর বয়সী পুরানো বন্ধু ও তাঁর ছেলের বেয়াই সন্দর্শনে। দুই রাজায় দেখা হতেই—সেটা হয়ে উঠলো রীতিমত রাজকীয় বৈবাহিক ব্যাপার। দুই রাজ-পরিবারের লোকজন একত্র হয়ে আমোদ উৎসব করলেন—ফটোও তোলা হয়েছে।

স্ট্যালিনের চ্যাং-পৌত্র প্রীতি

এক খবরে জানা গেছে—চীনের জেনারিলিসিমো চ্যাংকাই-শেকের নাতি সোভিয়েট রাশিয়ার জেনারিলিসিমো জোসেফ স্ট্যালিনের কাছ থেকে একটি উপহার পেয়েছেন। যিনি চ্যাং-পৌত্রের দাদামশায়ের কমিউনিস্ট বিরোধী কাজের সমর্থন করতে মনস্থ করেছেন তাঁর কাছ থেকে শুভেচ্ছা ও প্রীতিজ্ঞাপক—এই উপহার পেয়ে চ্যাং-এর নাতি খুব খুশী হয়েছে নিশ্চয়ই। কারণ উপহারটি একটি পিস্তল। এদেশের কমিউনিস্টদের পিতারা তাঁদের পৌত্রদের হাতে স্ট্যালিনের দেওয়া পিস্তল উপহার দেখবার জন্য নিশ্চয়ই দিন গণনা করছেন।

আলেকজাণ্ডারের চেয়েও বড়

ম্যানিলা অধিকার করার পর সেখানকার 'ইউনিভার্সিটি অফ্ স্যাণ্টো টমাস'—জেনারেল ডগলাস ম্যাক্‌আর্থারকে 'অনারারী ডক্টর অফ্ ল' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এই উপাধি দান উৎসবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্‌টর বক্তৃতা প্রসঙ্গে ম্যাকআর্থারের জয়গান করে বলেছেন—"ইনি আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট ও নেপোলিয়ানের চেয়েও বড় বীর, ভাগ্যবান পুরুষ এবং ক্রীশ্চান সভ্যতার মহিমাময় ত্রাণকর্তা।" রেক্‌টর মহাশয় বোধ হয় অ্যাটম বোমার কথাটা বক্তৃতা দেবার সময় ভুলে গেছলেন—সেকথা মনে হলে—তিনি নিশ্চয়ই বলতেন "ম্যাকআর্থার পরম পিতা।"

সুভাষচন্দ্র—জাপ তাঁবেদার নহে!

সিঙ্গাপুরের এক নাম করা আইন-ব্যবসায়ী—মিঃ এস সি গুহ—"সিলোন অবজারভার" পত্রিকার সংবাদদাতার কাছে এক বিবৃতিতে বলেছেন—'সুভাষচন্দ্র বসু মোটেই 'কুইসলিং' নন—তিনি ভয়ঙ্কর বৃটিশ বিরোধী এবং গোঁড়া একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। তিনি জাপ সমর্থনকারী মোটেই ছিলেন না—তবে জাপানীদের ক্ষমতাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য।' এ ছাড়া তিনি জানিয়েছেন—সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হয়েছে—একথা তিনি বিশ্বাস করেন না।

জিন্নাই জানেন না—পাকিস্থান কি?

গত ৫ই সেপ্টেম্বর করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুসলিম লীগের সভাপতি জিন্না সাহেব বড়ই বিপদে পড়েছিলেন। বিপদটা আর কিছুই নয়। যে 'পাকিস্থান' নিয়ে তিনি এত হৈ চৈ দলাদলি গোলমাল সৃষ্টি করেছেন—সেই 'পাকিস্থানে'র সংজ্ঞা কি সেই কথাই এক মুসলমান সাংবাদিক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। মিঃ জিন্না সাংবাদিকটিকে বলেন—পাকিস্থান সম্বন্ধে যে সব পুস্তিকা বেরিয়েছে, সেগুলি পড়লেই বোঝা যাবে 'পাকিস্থান' কি? সাংবাদিকটি বলেন—তিনি পাকিস্থান সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা পড়েছেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেন নি—তাঁর কাছে ওটা একটা বুলি ছাড়া আর কিছুই মনে হয় নি। জিন্না সাহেব বলেন, "বেশ তাহলে আপনি ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।" কিন্তু সাংবাদিকটি নাছোড়বান্দা তিনি দাবী করেন যে—"আপনার উচিত আমাকে পাকিস্থান কি তার সংজ্ঞা বলে দেওয়া।" জিন্না সাহেব তখন বে-কায়দায় পড়ে বলেন—পাকিস্থান কি বোঝাবার এবং পাকিস্থানের সঠিক সংজ্ঞা বলে দিতে পারার আগে—আমাকে খানিকটা সময় দিতে হবে তো।" 'পাকিস্থান' 'পাকিস্থান' করে যাঁরা মত্ত হয়েছেন—তাঁরা এ খবর শুনে নিশ্চয়ই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন।



রাজা ক্রিশ্চিয়ানের সঙ্গে নাতনি ও নাত-জামাইসহ রাজা গুস্তাফের মিলন-দৃশ্য।

নহে মাতা নহে কন্যা

কালীপদ চট্টোপাধ্যায়

মহামহিমান্বিত রেলগাড়ি, এসব ক্ষুদ্র স্টেশনে তিনি তো আর থামিতে পারেন না, থামিবার অভিনয়মাত্র করিয়া আপন অমূল্য সময়ের কয়েকটি মুহূর্ত যে অপব্যয় করিয়া যান, আমরা অগণিত যাত্রী তাহাতেই কৃতার্থ। বহু বর্ষের প্রতিদিনকার অভ্যাসমতো ওই কয়টি মুহূর্তের মধ্যেই জগতের কাছে যে হাতলটি পাইলাম তাহাই ধরিয়া ঊর্ধ্বলম্ফ মারিলাম। কি ভাগ্য যে, অন্য প্রায়-সব কামরার দরজার মতো এখানেও বাইরের পা-দানিতে লোক ঝুলিতেছে না। কাহারও ধাক্কা না খাইয়া, কাহাকেও না ঠেলিয়া একেবারে সরাসরি কক্ষের ভিতর উঠিতে পাইলাম। এমন সৌভাগ্য অন্তত বিগত ছয় মাসের মধ্যে একটিবারও হয় নাই।

মধ্যম শ্রেণীর একটি দুই-বেন্চির কামরা। কাঠের দেওয়ালে স্পষ্ট অক্ষরে রেল-কোম্পানির নির্দেশ রহিয়াছে—'১০ জন বসিবেক'। গুনিয়া দেখিলাম, সেস্থলে পনরো জন মাত্র বসিয়াছেন। কোনো তক্মাধারী আসিয়া যে এই স্পষ্টত-আইন-ভঙ্গের অপরাধে দক্ষিণ হস্ত পাতিতেছেন না, ইহার জন্য কোম্পানিকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাইলাম, রোজই জানাইতে হয়।

আমি ছাড়া কক্ষে আরো তিন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া আছেন। আমার সামনেই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, পাশের বেন্চিতে উপবিষ্ট লোকের মাথার উপর দিয়া হাত বাড়াইয়া, কাঠের দেওয়ালে ভর রাখিয়া দাঁড়াইয়া-দাঁড়াইয়াই ঝিমাইতেছেন। তাঁহার পরে দাঁড়াইয়া আছে নীল শাড়ি পরা আট নয় বছরের একটি গৌরী মেয়ে, মৃগ-চঞ্চল নয়নে সে দুনিয়ার হালচাল দেখিতেছে। তাহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন পঞ্চাশোর্ধ্ব এক প্রৌঢ়া বিধবা ভদ্রমহিলা। দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার মুখে একটু কষ্টভাব ফুটিয়াছে; ফুটিবেই, আমার মুখেও নিশ্চয়ই ফুটিয়াছে, দাঁড়াইয়া থাকিতে আর কে কবে সুখানুভব করে।

নারীরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, মনে কেমন একটা সংকোচ বোধ করিলাম। উপবিষ্ট যাঁহারা আছেন তাঁহাদের কেহ একজন উঠিয়া দাঁড়াইলেই তো ভদ্রমহিলা বসিতে পারিতেন, এবং মেয়েটিও তাঁহার কোলে বসিতে পারিত।

মনে করিলাম একটি তিরস্কারগর্ভ অনুরোধবাণী প্রয়োগ করিয়া উপবিষ্ট লোক-গুলির ভদ্রতাবোধ উদ্দীপিত করিয়া দিব। কিন্তু সংযত হইতে হইল। যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহারা সকলেই বিশিষ্ট ভদ্রলোক, ধোপদোস্ত ফরসা জামাকাপড় কোট্-পেন্টালুন পরা সব অতি অতি ভদ্রলোক, কেহ বাঙলা কেহ ইংরেজী খবরের কাগজ পড়িতেছেন, কেহ ইংরেজী, কেহ বাঙলা গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, এদিকে দরজার পাশের একজন আর ওদিকে মহিলাটির ডানদিককার একজন সাহেবায়িত লোক তো পাইপ্‌ই টানিতেছেন,—ইঁহাদের আমি ভদ্রতা শিখাইব কি? মনে মনে নিজের কান মলিলাম।

নিজে দাঁড়াইয়া মহিলাটিকে জায়গা করিয়া দিয়াই বা লোকে কষ্ট করিতে যাইবে কি কারণে? মহিলারা মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট মেয়েকামরায় উঠিলেই পারিতেন, কেন উঠিয়াছেন পুরুষদের গাড়িতে?

মেয়েকামরায় হয়তো জায়গা পাওয়া যায় নাই। আর এসব স্টেশনে গাড়ি যে কয়টি মুহূর্ত থামে তাহার মধ্যে মেয়েকামরা খুঁজিয়া বাহির করাও অসম্ভব। আর আজকাল মেয়েকামরায়ই তো পুরুষরা উঠিয়া বসিতেছে। গার্ডের কামরাতেই হুড়মুড় করিয়া লোক উঠিয়া পড়িতেছে তো মেয়ে-কামরা!

ছেলেমেয়ে মেয়েছেলেতে ভেদাভেদের দিন আর নাই, সাম্যের যুগ—এখন, আমরা দুজন পুরুষ যেমন উপবেশনের স্থানাভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়াছি, উঁহারা দুইটি নারীও তেমনি বসিবার জায়গা না পাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন—ইহা লইয়া আমিই বা মাথা ঘামাইতেছি কেন?

মহিলাটিকে বসিবার জায়গা দেওয়া সঙ্গত বোধ হইলে এইসব ভদ্রমহোদয়রা অবশ্যই তাহা করিতেন, আমার চেয়ে কর্তব্যজ্ঞান তাঁহাদের কম এমন হইতেই পারে না, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জামা-কাপড় আমার পোষাকের চেয়ে ফরসা। ক্ষুদ্র সেই কামরাজগতের পনরোটি লোকের কেহই যে-কাজ করিতে চাহিতেছেন না তাহাই করিবার ইচ্ছা যদি আমার হয়, তবে বুঝিতে হইবে আমি দুনিয়াবাসের অযোগ্য।

এই ভিড়ের দিনে ওই মহিলাটিকে আর কন্যাটিকে রেলগাড়িতে ভ্রমণ করিবার জন্য পুরুষরা কি মাথার দিব্য দিয়াছে? রেল-গাড়ির মালিক খোদ-রেল-কোম্পানী তো গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া সকলকে গাড়িতে না-উঠিবার জন্যই মাথার দিব্য দিতেছে। অফিসে যাওয়ার অন্য উপায় নাই বলিয়াই তখন আমাদের গাড়ি চাপিতে হইতেছে। কিন্তু সকন্যা ওই জননী—স-নাত্নি ঠাকুরমা বলিয়া ঠিক মনে হয় না—উঁনি গাড়িতে চাপিয়া শহরে চলিয়াছেন কোন কর্মে? হয়তো কালীদর্শনে চলিয়াছেন,—পুণ্য করিবার আর কাল পাইলেন না! হয়তো কাহার বাসায় বেড়াইতে চলিয়াছেন—কোন হতভাগ্য স্বজনের প্রাণ ওষ্ঠাগত করিতে! হয়তো কোনো স্বজনের অসুখের সংবাদ পাইয়া তাহকে দেখিতে যাইতেছেন? কিন্তু সেই রুগ্ণ ব্যক্তির এমনকি যদি বাঁচিবার আশাও না থাকে তবে ইনি গিয়া কি তাহাকে বাঁচাইতে পারিবেন? পারিবেন না, তথাপি গাড়ি চাপিয়া ইনি রেল-কোম্পানির পয়সা-খরচ-করা অনুরোধ ব্যর্থ করিয়াছেন। এখন থাকুন দাঁড়াইয়া, পুরুষদের তো তাহাতে ভারি আসিল এবং গেল।

কিন্তু তাঁহার দাঁড়াইয়া থাকা নিয়া আমিই-বা উত্তেজিত হইতেছি কি কারণে? মায়ের বয়সী মহিলা এবং কন্যার বয়সী মেয়েটি বলিয়াই যদি হয়, তাহাতেই বা কি হইয়াছে? দায়ে পড়িয়া নিজের মাকে সম্মান এবং নিজের মেয়েকে স্নেহ করিতে হয় বলিয়া কি দুনিয়া শুদ্ধ মা-মেয়ের প্রতি ভক্তিতে এবং স্নেহে বিগলিত হইয়া যাইতে হইবে নাকি—

হাত যথাশক্তি পাশের দিকে বাড়াইয়া দেওয়ালের নাগাল পাইতে পারিলাম এবং তাহার উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু মুদিয়া মনে মনে শতকিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলাম, যদি একটু ঘুমানো যায়।

পরবর্তী স্টেশনে গাড়ি থামিল। সে ধাক্কায় ঘুমন্ত মানুষরাই জাগিয়া গেল, আমি তো তখনো ঝিমন্তও নই। চকিত থামনের ক্ষণমাত্র অবকাশে আমাদের কামরায় যিনি উঠিয়া আসিতে পারিলেন, তিনি তন্বী শ্যামা এক তরুণী। কঙ্কণ-কিঙ্কিণী[illegible] প্রাণের সুর তুলিয়া, কুসুমসারসৌ[illegible] অন্তর আকুল করিয়া, বরণমোহনবস[illegible] পরনবৈচিত্র্যে পরান বিমোহিত করিয়া হরিণনয়নের চকিতদৃষ্টিতে হিয়া শিহরাইয়া তিনি আবির্ভূতা হইলেন। দেওয়ালে হাত রাখিয়া নিজের ত্রিভঙ্গবঙ্কিমঠামে দাঁড়ানোটা হাস্যকর বিবেচিত হইল এবং হাত সরাইয়া আনিয়া সোজা শোভনভঙ্গিতে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলাম। তাঁহার দিকে পিছন করিয়া দাঁড়ানো অভদ্রোচিত মনে হওয়ায় সে ত্রুটিও সারিয়া লইলাম।

বসিবার জায়গা নাই, সুতরাং আমার মতো, আমার সামনের ভদ্রলোকটির মতো, মেয়েটির মতো এবং মহিলাটির মতো সেই তরুণীকেও দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। মন হায় হায় করিতে লাগিল। আমি যদি বসিয়া থাকিতাম তবে এই মুহূর্তে দাঁড়াইয়া উঁহাকে বসিবার ঠাঁই করিয়া দিতাম, এ দাঁড়ানোর ক্লেশ সার্থকজ্ঞানে সর্বান্তঃকরণে পুলকিত হইতাম; কিন্তু কি করিব!

উপবিষ্ট ভদ্রগণ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

মনে হইল 'আগে কেবা' প্রধান 'করিবেক দান, তারই লাগি তাড়াতাড়ি' পড়িয়া গেল বলিয়া। তরুণীর বামদিকে পাশাপাশি ঠাসাঠাসি উপবিষ্ট যুবক দুইটি নিমেষ-মধ্যে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময়মাত্র করিয়াই একসঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং একজন অপরজনের চেয়েও আগে তরুণীকে অনুরোধ জানাইল, "আপনি বসুন এখানে।"

তরুণীর মুখে এক ঝলক রক্তোচ্ছ্বাস বিজলী খেলাইয়া আবার মিলাইয়া গেল; মন কহিয়া উঠিল, 'মরি মরি'! কিন্তু করুণাময়ী নিজে বসিলেন না, আমাদের কর্ণকুহরে সুধানিষেক করিয়া বীণানিন্দিত কণ্ঠে সেই মহিলার দিকে কমলায়তলোচনে চাহিয়া কহিলেন, 'আপনি এখানে এসে বসুন, এস খুকু!'

খুকু একটু চঞ্চল হইল, কিন্তু মা তাহাকে ধরিয়া রাখিলেন, তরুণীকে বলিলেন, 'বেঁচে থাকো মা, তুমিই বোসো!"

দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া আমরাও বাঁচিয়া গেলাম, তিনি যে কন্যাটিকে পাশে করিয়া খালি জায়গাটিতে আসিয়া বসিবেনই এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল না, এখন বসিলেন না দেখিয়া বিস্মিত হইলাম বটে; তাহার সঙ্গে আনন্দও বোধ করিলাম—যাহা হউক যুবক দুইটির আত্মত্যাগ মাঠে মারা গেল না, তাহাদের ছাড়িয়া দেওয়া জায়গায় তরুণীই বসিবেন।

কিন্তু তরুণীও বসিলেন না। মহিলাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিয়া আমাদের তৃষিত কর্ণকুহরও তিনি পরিতৃপ্ত করিলেন না, নীলনয়নের গভীর দৃষ্টি দূর নীলিমায় প্রসারিত করিয়া তরুণী দাঁড়াইয়া রহিলেন —অবশ্য ইহা আমার অনুমান, কেননা পিছন হইতে তাঁহার দৃষ্টি আমি দেখিতে পাইতেছিলাম না; হিরণহারবেষ্টিত তাঁহার লীলায়িত গ্রীবাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই আমাকে হাঁ করিয়া থাকিতে হইল।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামিবার একটিমাত্র মুহূর্তের বিপদ স্বীকার করিয়াও তরুণী নামিয়া গিয়া অন্য কামরায় উঠিলেন, এবং আমাদিগকে একান্ত বিস্মিত করিয়া দিয়া মহিলাটিও কন্যাকে লইয়া নামিয়া গিয়া অন্যতর কক্ষে আরোহণ করিলেন।

মহিলাটির জন্য করুণা বোধ করিলাম। মনে মনে কহিলাম, হে জননী, জগতে পারিলাম, আমাদের কাছে মান না পাইয়া তুমি অভিমান করিয়াছ। কিন্তু আমাদের কাছে সম্মান দাবি করিতেছ কি কারণে? নেহাৎ কর্তব্যের চক্ষুলজ্জার সংস্কারের দায়ে নিজের মাকে সম্মান করিতে হয় বলিয়া মায়ের বয়সী নারীমাত্রকেই সম্মান করিতে হইবে এমন কি দায়ে পড়িয়াছি? আর আমাদের প্রিয়ার মান যে মা রাখেন না সে মা-ও আমাদের কাছে কদাচ মান পাইয়া থাকেন।

নারীজাতীয়া বলিয়াই যদি তুমি সম্মান দাবি কর, তাহা হইলেও ভুল করিয়াছ। নারীর মধ্যে বিশ্ব শুধু প্রেয়সীর সন্ধানেই আকুল। যতদিন নারী প্রেয়সী হইয়া না উঠিল ততদিন, এবং যেদিন নারী প্রেয়সীত্ব হারাইল সেদিন বিশ্বের অন্তর তাহার প্রতি বিরূপ। তবে যে কদাচিৎ কোনো মাতৃজন নিজেরই জায়গা ছাড়িয়া তোমায় বসিতে দেন, সে শুধু এইটুকু স্মরণ করিয়া যে একদা তুমিও ছিলে তরুণী, ছিলে প্রেয়সী। আমাদের অন্তরের পূজা যে-নারীর পদমূলে স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে সে নহে মাতা নহে কন্যা।

মৃত্যুঞ্জয় পাখী

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ফাল্গুনের মৃত্যুঞ্জয় পাখী
বার বার ডেকে যায়
শুনি বসে ব্যথিত তন্দ্রায়
একটানা কুহু, কুহু,
হু হু করে মন।

কত কাজ!
কত অসমাপ্ত কাজ চারিদিকে জমা
সময় করে না ক্ষমা
ফুরোয় অলস রাত্রি মহাতমস্বিনী
নিঃসঙ্গ তিমিরে উদাসিনী।
কন্দন কম্পিত ছন্দে শূন্যে কাঁপে—
শ্যাম যবনিকা,
প্রেমের রজতশিখা
তারায় তারায়
চেতনা হারায়।

অনন্ত ফাল্গুনী সুর
কুহু, কুহু, কুহু!
হু হু করে শিরাস্নায়ু
কী চঞ্চল, কী উদ্দাম, যৌবনের আয়ু!
চাঁদ নেই; কোথা চাঁদ?
তারায় তারায়
প্রশ্নের সোনালি আলো কম্পিত বিবশ।
অদৃশ্য ছন্দের শিখা আত্মার নিস্তব্ধ বেদিকায়
রোমাঞ্চিত হৃদয়ের রক্তিম বাসনা:
প্রেম, প্রেম, কী গভীর প্রেম!
আকুল সর্বস্ব দিতে
অগণিত [illegible]হারা সর্বহারা মর্ত্যের মানুষে।
কত কা[illegible]
না-[illegible]কত যে ব্যথা জানাবো কেমনে?
কে নেবে আমার প্রেম?

আবার [illegible] ডাকে ফাল্গুনের মৃত্যুঞ্জয় পাখি
এক[illegible]কুহু, কুহু, হু হু করে মন,
প্রেম, প্রেম
অব[illegible]হৃদয়ের গভীর মিনতি
কে [illegible]হ, কে বুঝেছে?
স্বা[illegible]ঙ্কিত ক্লীব বিষয়ী জগতে?

সর্বনাশা [illegible]সা উন্মত্ত করেছে মন প্রাণ
[illegible]মানুষ যে বিধাতার প্রেমের সন্তান
প্রলয়-প[illegible]লে আদিম উষার কুয়াসায়
[illegible]ষ্টির প্রথমদিন থেকে;
তাই তে[illegible] আসে প্রেমের আগুনে শিখায়িত
[illegible]তনার তনুভস্মে সুরভিত আকাশ-বাতাস
স্বপ্নাতুর কুসুমের কেশরে কেশরে;

প্রেম! প্রে[illegible]
জ্বলন্ত [illegible]প্রেম শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মুখর উদ্দাম
[illegible]গ অঙ্গে অনঙ্গের আসঙ্গ বিলাস
চৈতালির মদির হাওয়ায়।
শুনি বসে তন্দ্রায়
[illegible]ঞ্জয় পাখি যায় ডেকে
[illegible]া প্রেম? কোথা প্রেম?
দুর্বোধ্য ভাষার কুহু কুহু!

দেশী সংবাদ

১৯শে সেপ্টেম্বর—ভারতের বড়লাট লর্ড ওয়াভেল ইংলণ্ডে বৃটিশ মন্ত্রিসভার সহিত ভারতীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ফিরিয়া বুধবার রাত্রিতে বেতারযোগে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত এক ঘোষণা বাণী প্রচার করেন। ঘোষণায় তিনি বলেন, যত শীঘ্র সম্ভব বৃটিশ গভর্নমেণ্ট একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়নকারী সভা আহ্বান করিতে ইচ্ছা করেন। ১৯৪২ সালের ঘোষিত বৃটিশ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য কিনা, অথবা অন্য কোন ব্যবস্থা কিংবা কোন সংশোধিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত—তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে সাধারণ প্রাথমিক কার্যপন্থা হিসাবে তাঁহাকে সাধারণ নির্বাচনের অব্যবহিত পরে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থা পরিষদের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। বড়লাট আরও বলেন, প্রাদেশিক আইন সভাসমূহের নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর একটি শাসন পরিষদ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে ক্ষমতা দিয়াছেন।

ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন তাঁহাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, সকলের খাদ্য সংস্থানের চরম দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে রহিয়াছে, রাষ্ট্রকে একথা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

গত বুধবার হইতে কলিকাতা ট্রামওয়েজ কোম্পানীর শ্রমিক ও কর্মীরা পূর্ণ ধর্মঘট আরম্ভ করিয়াছে।

বিহারে দুর্গত রাজনৈতিক কর্মীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য যে এড হক কমিটি গঠিত হইয়াছে, উহার হিসাবে প্রকাশ যে, সমগ্র প্রদেশে তিনশত জন নিহত হইয়াছে বা মারা গিয়াছে। ৯ শত জন এখনও জেলে রহিয়াছে, ১৫০ জন গৃহহীন হইয়াছে, ৩০ জন অকর্মণ্য হইয়াছে এবং ১৫০ জনকে এখনও পুলিশ খোঁজ করিতেছে।

২০শে সেপ্টেম্বর—সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন, 'ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আমি আজীবন সংগ্রাম করিব।'

২১শে সেপ্টেম্বর—সিঙ্গাপুরের যুদ্ধপূর্ব বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্রীযুত এস সি গুহ এইরূপ অভিমত পোষণ করেন বলিয়া প্রকাশ যে, শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর দেশপ্রেম তীব্র ও অকপট ছিল, তিনি বৃটিশ বিরোধী ছিলেন বটে, কিন্তু জাপানেরও পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে ভারতবর্ষে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য জাপানকে একটি প্রধান শক্তি হিসাবে ব্যবহার করিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন।

অদ্য বেলা ৩ ঘটিকার সময় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রায় ত্রিশ হাজার দর্শক ও রাষ্ট্রীয় সমিতির ২৩[illegible] জন সদস্য উপস্থিত হন।

জানা গিয়াছে, ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর অফিসার ও সৈন্যদের বিচারের নিমিত্ত [illegible] আদালত গঠিত হইয়াছে। প্রকাশ [illegible] বাহাদুর প্রমুখ বিশিষ্ট আইনজীবী [illegible] জাতীয় বাহিনীর লোকদের বিচার [illegible] বেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

মেদিনীপুরে সামরিক বিভাগের লোকদের অত্যাচারের এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, তাহারা বৃহস্পতিবার দুপুর রাত্রিকালে কয়েকজন স্ত্রীলোকের পশ্চাতে ধাওয়া করিতে করিতে জনৈক মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ী প্রবেশ করে ও বাড়ীর লোকজনকে মারধর করে। আরও প্রকাশ যে, উক্ত লোকেরা বলপূর্বক দুইটি স্ত্রীলোককে তাহাদের জিপ গাড়ী করিয়া লইয়া [illegible]য়াছে।

[illegible]শে সেপ্টেম্বর—অদ্য বেলা ২ ঘটিকায় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ১৯৪২ সালের সংগ্রাম এবং তজ্জন্য সমগ্র জাতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপক প্রস্তাব বিনা পরিবর্তনে গৃহীত হয়।

[illegible]শে সেপ্টেম্বর—নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অদ্যকার অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ভারতীয় জাতীয় বাহিনী সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবে অসন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল একটি প্রস্তাব করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হইলে রাষ্ট্রপতি আজাদ ঘোষণা করেন যে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির আর কোন অধিবেশন [illegible]পর এত সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইবে না। [illegible]দ্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধি[illegible]ন নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তাবের আলোচনা[illegible]ঙ্গ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং সর্দার [illegible]ভভাই প্যাটেল উভয়েই ঘোষণা করেন যে, [illegible]গ্রেস আর মুসলিম লীগের নেতৃবর্গের সহিত [illegible] আলোচনা করিবেন না এবং সোজাসুজি [illegible]সমান জনসাধারণের নিকট উপস্থিত হইবেন।

[illegible]৪শে সেপ্টেম্বর—ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর [illegible]ম দলের বিচার নবেম্বরের প্রথম ভাগের [illegible]র্ব হইবে না বলিয়া একটি প্রেস নোটে [illegible]ষিত হইয়াছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর—শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু [illegible]ম্বাইএ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, [illegible]টিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের নিকট যে প্রস্তাব [illegible]রিয়াছেন, তাহা দেশবাসীর গ্রহণযোগ্য নহে। [illegible]কটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত বসু বলেন, [illegible]ধীনতা অর্জনের জন্য অহিংসা প্রয়োগ ক্ষেত্রে [illegible]মি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব মানিয়া লইতে [illegible]স্তুত আছি। অহিংসার সাহায্যে হয়ত আমরা [illegible]ধীনতা লাভ করিতে পারি। তবে আমি [illegible]হাকে একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করি না।'

[illegible] কামগড় ময়দানে বোম্বাইএর এক বিরাট শ্রমিক [illegible]মাবেশে বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল [illegible]নেহরু বলেন, কংগ্রেস স্বরাজের যে আদর্শ [illegible]লিয়া ধরিয়াছে, জনসাধারণের হাতে বাস্তব [illegible]ক্ষমতা অর্পণ এবং তাহাদের ইষ্টকল্পে উহার [illegible]য়োগ [illegible]হইল ইহার উদ্দেশ্য। একমাত্র জন[illegible]সাধারণের পক্ষেই তাহা অর্জন করা সম্ভব।

তিনজন ট্রাম শ্রমিককে বরখাস্ত করায় প্রতিবাদে সিংহলে ১৫ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করিয়াছে।

সিন্ধিয়া জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রের কয়েকজন শ্রমিককে কর্মচ্যুত করার প্রতিবাদে ২০০০জন জাহাজী শ্রমিক ধর্মঘট করে।

খুলনার ১৬ই সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ৫।৬ জন ভারতীয় সৈন্য হোগা ও রাইফেল সহ হাটের বিভিন্ন দোকান হইতে সিগারেট বিড়ি, মদ ও কাপড় নেয়, কিন্তু দাম দিতে অস্বীকৃত হয়। এইভাবে জনৈক ব্যক্তির নিকট হইতে ১২টি ইলিশ মাছ নেয়। উহাতে আপত্তি করিলে ৪টি মাছ ফেরৎ দেয় এবং বাকী মাছের দামের জন্য সৈনিকদের নৌকায় যাইতে বলে। উহারা যাইতে অস্বীকার করিলে সৈনিকেরা জোর করিয়া দুইজনকে নৌকায় তুলিবার চেষ্টা করে। উহাতে অপর একজন মৎস্য বিক্রেতা চীৎকার করিলে একজন সৈনিক তাহাকে গুলী করে।

বিদেশী সংবাদ

১৯শে সেপ্টেম্বর—স্বদেশের শত্রুর সহিত যোগ দেওয়ার অভিযোগে লর্ড হ' হর প্রাণদণ্ডাদেশ হইয়াছে।

মিশরের প্রধান মন্ত্রী আমেদ মাহের পাশার হত্যাকারী মামুদ হসাবের ফাঁসী হইয়া গিয়াছে।

২০শে সেপ্টেম্বর—জাপানে কতকাল দখলকার সৈন্য মোতায়েন রাখা হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলস্থ মার্কিন বিমান বাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেঃ বার্ন বলেন যে, "প্রায় একশত বৎসর।"

২১শে সেপ্টেম্বর—লণ্ডনে পররাষ্ট্র সচিবদের যে বৈঠক চলিতেছে, তাহাতে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ আর্নেস্ট বেভিন ও রাশিয়ান পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভের মধ্যে কয়েকবার তুমুল বাগ্‌বিতণ্ডা হইয়াছে।

'ডেলি হেরাল্ড' পত্রের সাইগনস্থিত সংবাদদাতার সংবাদে প্রকাশ, আনামীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ পাইয়াছে। সাইগন শহরে সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে এবং উহা অমান্যের জন্য বুধবার রাত্রিতে এক হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২২শে সেপ্টেম্বর—হিরোসিমায় এক প্রলয়ঙ্কর ঘটিকার দরুণ ৮৭৬১ জন নিহত ও ৯১৯১ জন আহত এবং ৯৩৩ জন নিখোঁজ হইয়াছে। প্রবল বারিপাতে ১০৭৮টি বাড়ি ভাসিয়া গিয়াছে এবং তাহার ফলে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে।

২৩শে সেপ্টেম্বর—চুংকিং বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, জাপ সম্রাট হিরোহিতো সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছেন। যুবরাজ সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত হইবেন। যুবরাজের নাম আচিহিতো, তাঁহার বয়স মাত্র ১৪ বৎসর।

২৪শে সেপ্টেম্বর—মিশরের মন্ত্রিসভা কর্তৃক প্রচারিত এক ইস্তাহারে মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের দাবী করা হইয়াছে।

২৫শে সেপ্টেম্বর—জেনারেল ম্যাক আর্থারের প্রতি এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, জাপানের সহিত সম্পর্ক চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত নহে, প্রয়োজন বোধে তিনি বলপ্রয়োগ করিতে পারিবেন এবং জাপ সম্রাটকেও পদচ্যুত করিতে পারিবেন।